









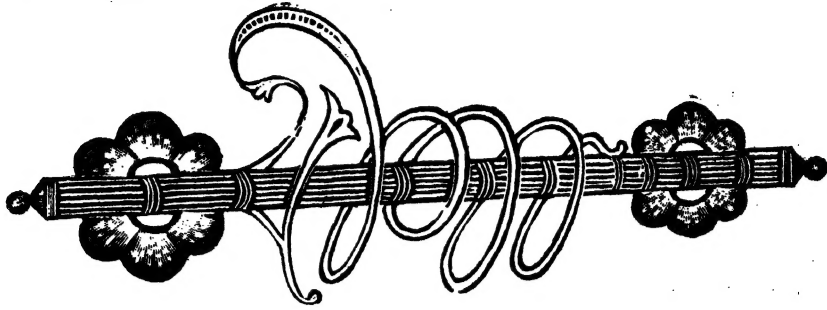


বৌগা—



Himani Dress, Calcutta.

অতুলনা



তৃতীয় বর্ষ ]

আশ্বিন, ১৩৩৪ ।

[ ১ম সংখ্যা ]

## খেলার শেষে

ঐকালিদাস রায়

দিমের বেলায়

পথের ধূলায়

মায়ের দরদ

ঢের বেশী, তাই

খেলায় খেলায় রট্নু মাতি ;

ছেলে হেথায় খেলায় মাতে,

তোমায় মাগো

ভুলিয়ে দিল

সকল খেলায়

মনটি মায়ের

খেলনা এবং সঙ্গী-সার্থী ॥

রয় যে ছেলের সাথে সাথে ।

তাই বলে' কি কখনো মা'য়

দিন ফুরালে কিরতে ঘরে,

ভুলে থাকে আপন বাছায় ?

দেখব ঘরের সোপান' পরে,

হাজার কাজের

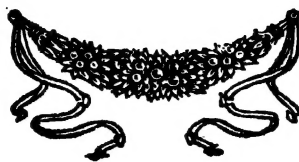
মাঝেও আছ

পথ পানে মা

চেয়ে আছ

এদিক পানে কানটি পাতি' ॥

হাতে লয়ে সাজের বাতি ।



## বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

### ১। বঙ্গ-ভাষার রচনা ও প্রকৃতি

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাঙ্গালাভাষার উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা-  
দের দেশীয় মনীষিবৃন্দের দ্বারা অনেক বিদেশী  
পণ্ডিত ব্যক্তিও আলোচনা করিয়াছেন। পরিবর্তন-  
শীল জগতে সকলই পরিবর্তনের ভিতর দিয়া চলিয়া  
আসিতেছে। ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়া-  
ছেন যে ভাষাও পরিবর্তনের হাত এড়াইতে পারে  
নাই। প্রাচীনকালে যে সব মৌলিক ভাষা ছিল, এখন  
সে সকলের মধ্যেও বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কোন  
কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে আমাদের এমিয়া  
মহাদেশই ভাষার জন্মদাতা। ইরাণ প্রদেশের উদ্ভূত  
এক আদিম ভাষা হইতেই ইউরোপের গ্রীক, ল্যাটিন,  
জার্মান, স্লাবোমিয়াস প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি।  
পারসীদিগের ধর্মগ্রন্থ এই জৈন ভাষায়ই লিখিত।  
এ সকল কথাই বিশদ ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিতে  
হইলে বহু সময়ের প্রয়োজন। এখানে ভাষার নানা  
পরিবর্তনের কথা সংক্ষেপতঃ আলোচনা করিতেছি।  
বেদ ভারতবর্ষের আদিম গ্রন্থ। বেদের বয়স লইয়া  
চতুর্যুগ বহুদিন হইতেই চলিতেছে। বেদের ভাষা  
সংস্কৃত, কিন্তু সে সংস্কৃত ও তাহার নিম্ন অত্র কোন-  
রূপ সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদের  
অনেক পরে বৈদিক সংস্কৃতের বহু পরিবর্তন সহকারে  
মহা ও বাঙ্গালিকির রামায়ণ বিরচিত হয়। রামায়ণের  
বহু পরবর্তী যুগে মহাভারতের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত  
ভাষার বহু পরিবর্তন ঘটে, সেজন্তই রামায়ণ ও মহা-  
ভারতের ভাষার মধ্যে বহু অটনৈক্য দেখিতে পাওয়া  
যায়। মহাভারতের পর বহু শত বৎসর কেবল  
পরিবর্তন চলিতে থাকে। রাষ্ট্র-বিপ্লব ইত্যাদিও  
তাহার অন্তঃম কারণ। এ সময়ের পরবর্তীকালে

ক্রমাগত নানা পরিবর্তনের মধ্যে কবিকুলরবি  
কালিদাসের উদ্ভব, তাঁহার অমৃত-নিশ্যন্দিনী ভাষা  
বিজয়গুপ্তকে যে অমৃত ধারায় অভিষিক্ত করিয়াছিল  
সে মধুর ধারা অতীব সমভাবে দেশ দেশান্তরের  
পণ্ডিত মণ্ডলী ও কাব্যপ্রিয় ব্যক্তির রসাল চিত্ত  
ধরসাল করিতেছে। কালিদাসের যুগে সংস্কৃত  
অভিনব যৌবন প্রাপ্ত করিয়াছিল। এ সময়ের পরে  
তান্ত্রিক সংস্কৃত দেশে বিস্তার লাভ করে। ভাষার  
পরিবর্তন, বর্ণবিভাগ ও উচ্চারণের তার-  
তম্যানুযায়ী ঘটে একথা বলা যাইতে পারে। ধীরে  
ধীরে বহু পরিবর্তনের পর ভাষার অতি আশ্চর্য-  
রূপ রূপান্তরিত হয়, সে বৌদ্ধযুগে। সে সময়ে  
সংস্কৃত হইতে যে ভাষার সৃষ্টি ঘটে তাহার নাম  
প্রাচ্যা। এই গাথার ভাষা সর্বসাধারণের পক্ষে  
সহজ সরল ও শ্রুতি-মধুর করিবার নিমিত্ত ব্যঞ্জন ও  
স্বরের পৃথক্ করিয়া এবং স্থানে স্থানে বিভক্তির লোপ  
বা উদ্ধার দ্বারা বিভক্তির কার্য নিষ্পন্ন করিয়া শ্রুতি-  
মধুর করা হইয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত-  
গণের মতে এই প্রাচ্যা-ভাষা প্রায় তিন শত বৎসর  
পরে রাজা অশোকের সময় 'পালি' নামে পরিচয় লাভ  
করে। এই পালি ভাষা দেশদেশান্তরে ব্যাপ্তি লাভ  
করে। অতীতি সিংহলে এই ভাষা প্রচলিত। রাজা  
অশোকের গৌরব-দীপ্তি লুপ্ত হইবার পরে তাঁহার  
রাজত্বের প্রায় শতবর্ষ পরে সংস্কৃত ও পালি ভাষার  
অপভ্রংশরূপে 'প্রাকৃতের' সৃষ্টি হয়। অতি পূর্বে  
প্রাকৃত ভাষা ছিল কিনা তাহার কোনও পরিচয়  
পাওয়া যায় না। কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত  
বলেন, যদি 'প্রাকৃত ভাষা' পূর্বে প্রচলিত থাকিত

তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাণিনির ঋষ প্রাচীন বৈয়াকরণিকের ব্যাকরণে কিংবা অজ্ঞাত সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার উল্লেখ থাকিত। যখন সে নিদর্শন নাই, তখন সকালে ‘প্রাকৃত’ ভাষা ছিল না, ইহাই বুঝিতে হইবে। প্রাকৃত যুগে অর্থাৎ সংস্কৃতের অপভ্রংশ কালে মূল সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, মাগধী, মহারাষ্ট্রীয়, শোড়াসনী, শিশাজী প্রভৃতি নানাভাষার উদ্ভব ঘটে এবং দেশ দেশান্তরে ঐ সকল ভাষা ছড়াইয়া পড়ে। তাহারই ফলে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে নানা প্রাদেশিক ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে কোন্ অপভ্রংশ ভাষা হইতে কিরূপ রূপান্তরিত ভাবে কোন্ ভাষার পরিণতি তাহা কৌতুহলোদ্দীপক এবং অনুসন্ধানযোগ্য। আমাদের বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ ভাবে বর্তমান রূপ ও প্রকৃতি লাভ করিয়াছে এখন তাহারই আলোচনা করিব।

বাঙ্গালাভাষা ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষা-সমূহের মধ্যে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ ও উন্নত ভাষা। সমুদয় প্রাদেশিক ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায়ই অধিক-সংখ্যক লোক কথা বলেন। ১৯১১ খ্রীঃ অঃ আদম জুমারীতে ৪৮, ৩৬৭, ৯১৭৫ আটলিগ কোটি তিন শত সাতষট্টি লক্ষ নয় হাজার একশত পঁচাত্তর জন লোক বাঙ্গালাভাষায় কথা বলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা বিরাট-নব্বই জন বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলেন। বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম অঞ্চলেরও কোন কোন স্থানের অধিবাসীরা বাঙ্গালা ভাষায়ই কথাবার্তা বলেন। পাশ্চবর্তী অজ্ঞাত প্রদেশ সমূহে বঙ্গভাষার অকৃতিগত ও উচ্চারণগত ঐক্য-মূলক ভাষা উড়িষ্যা, মাগধি এবং মৈথিলি। বঙ্গের পশ্চিমে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলে আসামী ভাষা প্রচলিত। হিন্দুস্থানী ভাষা ভারতের সর্বত্র যেমন আধিপত্য লাভ করিয়াছে বাঙ্গালাদেশের উপরও তেমনি তাহার প্রভাব নেহাৎ কম নয়। শিক্ষা, সভ্যতা এবং রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সহিত যতই যোগসূত্র বিস্তৃত হইতেছে ততই ভাষার আকার ও রূপ পরি-

বর্তিত হইয়া আসিতেছে। আজ তাই পার্বতীয়া বা নেপালি, ভূটানি, লেপচাদের ভাষা, সাঁওতাল, কোল, হো, মুণ্ডারি প্রভৃতির ভাষাও আসিয়া মিলিত হইয়াছে। আজ বাঙ্গালী তিব্বতীয়দের ভাষার সহিতও পরিচিত হইতেছেন। কাছাড়ী, মণিপুরী, লুসাই, আরাবানী, কুকি, চীন, বর্ম্মন ও তাহার মিশ্র আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের অজ্ঞাত আৰ্য্য ভাষার ঋষ বাঙ্গালা ভাষাও ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে। বিবিধ আদিম অধিবাসিগণের ভাষার রূপ ও প্রকৃতি যেমন কথিত ভাষার মধ্যে আসিয়া মিলিত হইতেছে তাহারও তেমনি আগনাদের ভাষাকেও অনেকস্থলে বিস্তৃত হইয়া বাঙ্গালা ভাষাকেও কথিত ভাষারূপে গ্রহণ করিতেছে। ভারতীয় আৰ্য্য ভাষাকে নিম্ন-লিখিতরূপে ভাগ করিয়া লইলে আমাদের কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

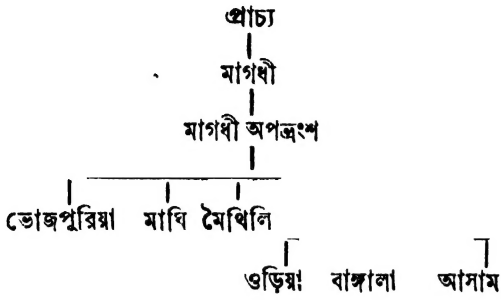
ভারতীয় আৰ্য্যভাষা হইতে বৈদিক ভাষা (Classical Sanskrit) বা সাধু সংস্কৃত ভাষা, প্রাচীন প্রাকৃত,—ইহা প্রাচীনতম খোদিতলিপি সমূহে ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। পালি এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত প্রাকৃত এবং বিবিধ ভাষার অপভ্রংশ ভাগ একত্র পরিবর্তনের রূপান্তর হইতেই ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা সমূহের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। এই সঙ্গে প্রাচীন সিংহলী ভাষা ও বর্তমান সিংহলী ভাষার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। আধুনিক পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

ভারতীয় আৰ্য্য-ভাষা

(১) ইরাণি শাখা      ভারতীয় আৰ্য্য-ভাষা

ভারতীয় আৰ্য্য ভাষা—এখানে বৈদিক ভাষার উল্লেখ করা হইয়াছে। বেদ ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ অঃ রচিত হইয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। বৈদিক ভাষার পরে প্রাকৃত ভাষার

বা কোশল দেশীয় ভাষার কথা স্মরণীয়। বুদ্ধদেবের সমকালে পূর্ব ভারতে এই প্রাচ্য ভাষার প্রচলন ছিল। এখানে নিম্নলিখিত রূপে ভাষার রূপান্তর লক্ষ্য করিতেছি।



এই ভাবে ভারতীয় আৰ্য ভাষা গান্ধার, পাঞ্জাব, গঙ্গা নদীর উপত্যকা ভাগ, উদীচ্যরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। উদীচ্য হইতে খারোস্তির উদ্ভব।

খারোস্তি ভাষায় অশোক রাজার অনেক অমুশাসনলিপি যুক্ত প্রদেশে পাওয়া গিয়াছে। খারোস্তির তৃতীয় রূপান্তর বর্তমান সিদ্ধি ভাষা। ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশের গুজরাট অঞ্চলে প্রথম প্রতীচ্য ভাষার রূপ আপনাকে প্রকাশ করে। গিরগর পাহাড়ের অশোক অমুশাসন এই ভাষায় লিখিত। **अप्र्यटन्श** অর্থাৎ কুরু পাঞ্চাল অঞ্চলে বা দোয়াব প্রদেশে শোরসেনী, শোরসেনীর অপভ্রংশ ইত্যাদি পশ্চিমা হিন্দী এবং উহা হইতে বর্তমানে প্রচলিত হিন্দুস্থানী—হিন্দী ও উর্দু, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, বৃন্দেলী, ব্রজভাষা ইত্যাদি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচ্য ভাষার ক্রমবিকাশমুখায়ী যে বঙ্গভাষার উৎপত্তি হইয়াছে সে কথা একটু পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ওদিকে দাক্ষিণাত্য বা রাষ্ট্রিকা হইতে মহারাষ্ট্রী, মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ, মারহাটি এবং কন্নড়ী ভাষার উদ্ভব। সংস্কৃত—উদীচ্য হইতে রূপান্তরিত ভাবে পালিনির ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া গীঃ পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তৎপর সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মিশ্রণে গাথার উৎপত্তি একথাও পূর্বেই সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ভাবে দেখিতে পাই যে

ভারতীয় আৰ্য ভাষা কত রূপে, কত ভাবে, কত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষা মাগধী প্রাকৃত হইতে যে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সে কথাও বেশ বুঝিতে পারিলাম।

বুদ্ধদেবের সময় বঙ্গলিপির সৃষ্টি হয়, কিন্তু সে সময়ে বঙ্গ ভাষা প্রচলিত ছিল কিনা তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাকৃত ভাষা পালিনির সময় প্রচলিত ছিল কিনা তাহারও প্রকৃত পরিচয় আমরা পাই না। থাকিলেও তাহা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। “কারণ পালিনি নিজ অষ্টাধ্যায়ীতে ‘ছান্দস’ ও ‘ভাষা’ এই দুই শব্দ দ্বারা বৈদিক ও তাঁহার সময়ে প্রচলিত’ লৌকিক সংস্কৃত ভাষারই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সময়েও সংস্কৃত যুগই চলিতেছিল। \* \* তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি, বুদ্ধদেবের সময়ে অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে সংস্কৃত সাধারণের কথিত ভাষা বলিয়া গণ্য ছিল না। এ সময়ে মধ্যবিত্ত সাধারণে যে ভাষা বৃষিত, তাহা ‘গাথা’ নামে ধরা হয়। \*\*\* তৎকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট বিদ্যুৎ সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত থাকিলেও মধ্যবিত্তদের নিকট গাথাই চলিত ভাষারূপে গণ্য হইতেছিল।” \*

প্রাকৃত ভাষা প্রাকৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী সংস্কৃত ভব, সংস্কৃতসম ও দেশী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীর মধ্যে পালিকে তৎসম, অর্দ্ধ মাগধীকে তদ্ভব শ্রেণী মধ্যে গণ্য করা হইয়া থাকে। ভাষার উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে চণ্ডাচার্য্য তাঁহার প্রাকৃত লক্ষণে, হেমচন্দ্রাচার্য্য তাঁহার প্রাকৃত ব্যাকরণে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রাকৃতচক্ষিকাক্স কৃষ্ণপণ্ডিত ছয়ত্রিশটি বিভিন্ন দেশপ্রচলিত প্রাকৃত এবং সাতাইশটি অপভ্রংশ প্রাকৃতের পরিচয় দিয়াছেন। প্রাকৃত চক্ষিকা দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত। অতএব এই প্রমাণটুকু পাইযে ঐ

\* বিখ্যাত—বাঙ্গালা ভাষা।

সকল প্রাকৃত ভাষা দ্বাদশ শতাব্দীতেই ব্যাকরণ মধ্যে স্থান পাইয়াছে। অনেকের মতে পূর্ব মাগধী ভাষার অন্তর্ভুক্ত আমাদের বাঙ্গালা ভাষা।

বাঙ্গালা ভাষা বঙ্গের বাহিরেও যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহার ইতিহাস কিংবদন্তীমূলক হইলেও একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। সিংহলীদের ভাষাও ভারতীয় আৰ্য্যভাষার অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু কি জানি কেন খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত উহার সহিত ভারতের যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন ছিল। কিংবদন্তীমূলক ইতিহাস এই যে বাঙ্গালার বিজয় সিংহ নির্ধারিত হইয়া সিংহলে যাইয়া রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার জন্মভূমি ছিল লাল্লা (Lālā) নামক স্থান। এই লাল্লা বা লাল স্থানটি কোথায় ছিল? কাহারও কাহারও মতে ইহা বঙ্গ বা পূর্ব বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কেহ বলেন পশ্চিম বঙ্গ অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চলে ছিল, আবার কেহ কেহ বলেন যে নির্ধারিত বিজয় উদ্দেশ্যবিশীন ভ্রমণ দ্বারা গুজরাট সিদ্ধ প্রদেশের অন্তর্গত লাল প্রদেশ হইতে সিংহল গিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার ঐতিহাসিকেরা বলেন,— খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে বাঙ্গালার প্রদেশের সঙ্গে সিংহলের যোগ স্থাপিত হয়। সিংহলিরা সে সময়ে মগধের সহিতও যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মূলেও বঙ্গের অধিবাসিদের যোগ ছিল।\* মধ্য যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালার সঙ্গে সিংহলের যে বিশেষ যোগ ছিল তাহার পরিচয় আমরা পাই। সিংহলেও ভারতীয় আৰ্য্য ভাষার প্রাকৃত যে প্রচলিত ছিল সিংহলের প্রাচীন খোদিত লিপিসমূহ হইতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু সে ভাষা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। বিজয় সিংহের অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষা যে সিংহলেও যাইয়া

বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা কিংবদন্তীমূলক হইলেও বঙ্গ-ভাষা-বিদ্ পণ্ডিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সিংহলের পালি ভাষায় লিখিত ইতিহাস দীপবংশ বা মহাবংশ হইতে বিজয় সিংহ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। তাঁহার পিতা সিংহবাহু পূর্ব বঙ্গের এক রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ উল্লেখ আছে। বাঙ্গালীর জন্ম যাত্রা প্রাচীন যুগে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অঙ্গের বনু বনা ব্যতীতও যে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছিল তাহা ইতিহাস সত্যরূপে আমাদের নিকট দিন দিন প্রকাশ করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষাও তখন দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিল।

পালি ভাষাও এক সময়ে ভারতের সর্বত্র প্রচলিত সাধারণ ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন—Pali as a literary language seems to have been established during the transitional M. T. A period (200 B. C.—200 A. C.,) ক্রমশঃ এই ভাষা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর ভারতবর্ষ, সিংহল, এমন কি ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধজাতকের জায় সর্বজনপরিচিত গ্রন্থ পালি ভাষায় বিরচিত। ভারতীয় আৰ্য্য ভাষা মগধ হইতেই বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। মগধবাসী-বণিক, রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী, সৈনিক, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচারকগণ দলে দলে অর্থলাভস্বরূপ ও ধর্ম প্রচার জন্ত বাঙ্গালা দেশে আসিয়া অনেকে সুল্লা সুল্লা ও শস্ত্রশাসনা বাঙ্গালাদেশেই বাসস্থান নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও ভাষার সৌন্দর্য্য বাঙ্গালার পূর্বতন অধিবাসীদের মধ্যে একটা প্রভাব বিস্তার করিল। তাহারই ফলে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ও নূতনতর শিক্ষাকে প্রিয়তর মনে করিয়া উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণ সহজেই আৰ্য্য ভাষা গ্রহণ করিলেন। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যখন সহজেই আৰ্য্য ভাষাকে

\* Later, from the 3rd century B. C. downwards, Ceylon seems to have come in touch with Magadh, through Bengal, and traditions of intimate relations between Bengal & Ceylon are preserved in medieval Bengali Literature.



গ্রহণ করিলেন তখন নিম্নশ্রেণীর পক্ষে উহাকে গ্রহণ করিতে তেমন কোন বাধা উপস্থিত হইল না। এদিকে আবার মগধ, কাশী ও অত্যাচ্ছাদিত প্রদেশ হইতে দলে দলে নিম্ন শ্রেণীর জনগণ ও বাঙ্গালাদেশে আসিতে আরম্ভ করিলে, তাহারই ফলে অতি সহজেই বাঙ্গালাদেশে আৰ্য্যভাষা প্রচলিত হইল নূতনের এই অভিযান পুরাতনের আসন টলাইয়া দিল। অনেকের মতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ ( আগাম ) এবং বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে আৰ্য্যভাষা অনেকটা পরে প্রচারিত হইয়াছিল। অধ্যাপক সুনীতি বাবু বলেন \* \* \*

This early contrast between an advanced and Aryanised North and West Bengal, and rather backward East Bengal, possibly differing linguistically and racially ( in having a prominent Tibeto-Burman element ) from West Bengal, is at the root of the contemptuous use of the term বাঙ্গাল—Bangal for an inhabitant of East Bengal ( Vang-āla ) even at the present day when the name Vanga has been extended west to Pundra and Radha ( Jointly known as Chanda-desha. ) সুনীতিবাবুর এই অদ্ভুত যুক্তি আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। যে যুগে আৰ্য্যভাষা ভাবী মগধ, কাশী কোশলের লোকেরা উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে আনিতে পারিলেন, সে যুগে পূর্ববঙ্গের পথটা কি তাঁহাদের নিকট স্মরণীয় ছিল?—‘বাঙ্গাল’ শব্দ ঘণাবাজক নহে। বঙ্গ হইতেই যে বাঙ্গালা বা বাঙ্গালাদেশের উৎপত্তি। ইহা যে বাঙ্গাল শব্দের ব্যবহার ভাষা ইত্যাদির ভেদজনিত ভাবে সে যুগে ব্যবহৃত হয় নাই তাহা বলিতে পারি—ঐ যুগের প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন হইতে বাঙ্গালা শব্দের ব্যবহার কি সুনীতিবাবু দেখাইতে পারেন? অনুমানের উপর কোন কথা ব্যবহার করা অনাবশ্যক।

প্রাচীন খোদিতলিপির মধ্যে বাকুড়াজেলায় শুকুনিয়া পাহাড়ের খোদিত লিপি হইতে চন্দ্র বর্মন নামক একজন রাজার উল্লেখ দেখিতে পাই। ইনি সিদ্ধবর্মনের পুত্র, পুষ্করের রাজা এবং চক্রবর্তী অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক। এই লিপি ব্রাহ্মি অক্ষরে খোদিত। পুষ্কর পশ্চিম বঙ্গের কোনও স্থানে হইবে বলিয়া মনে হয়। এই খোদিত লিপি প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইলে দেখা যায় যে চন্দ্রবর্মনই বাঙ্গালীর প্রাচীনতম নৃপতি। তিনি চতুর্থ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাসের রঘুর দ্বিবিজয়ে ( চতুর্থ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ ) রঘু বর্জ্বক বঙ্গ ও সূদেশ জয়ের কথা আছে। ভাষ্যপ্রীত প্রতিজ্ঞা যোগাঙ্কায়ন নাটকে লিখিত আছে বাঙ্গালার রাজপরিবারের সহিত উত্তর ভারতের রাজ পরিবারের বৈবাহিক আদান প্রদান চলিত এবং তাঁহারা তুল্য বিবেচিত হইতেন। ভাষ্য কবি কালিদাসের পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীরও পূর্বে। এয়ুগে বঙ্গদেশ অর্থাৎ বর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত।

সে বাহা হউক আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বঙ্গলিপির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিলেও বঙ্গভাষায় স্বতন্ত্র নামাকরণ হয় নাই। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মানুরাগী ওপাধিকারের সময় সংস্কৃত শাস্ত্রীয় প্রভাব প্রবেশ লাভ করিলে সংস্কৃত ও স্থানীয় ভাষার পার্থক্য নির্ণয়ের জন্ত গোড়ভাষার নামকরণ হইয়াছিল। এগময়ে বাঙ্গালার প্রাচীন খোদিত লিপিসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণগণকে ভূসম্পত্তি দানের লিপিরই অধিক। সে সকল তাম্রশাসনের মধ্যে সুস্পষ্ট লিখিত আছে—মধ্যদেশ বিনির্গত ব্রাহ্মণেরা কোথা হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে কোনরূপ বেগ পাইতে হয়না। পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে ফাহিয়ান্ নখন বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন তখন তিনি বঙ্গদেশে আৰ্য্যশিক্ষা, সভ্যতা ও ভাষার প্রাধান্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাম্রলিপিতে একটা শ্রেষ্ঠ বিখ্যাতকল্প দেখিতে

পাইয়া দেখানে ছই বৎসর অবস্থান করেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইউরানচাও বা হিউয়েনসাঙ্গ বখন বাঙ্গালাদেশে আসেন তখন তিনি সমস্ত (পূর্ববঙ্গ) অঙ্গ, পুণ্ড্রবর্ধন, উত্তর ও মধ্যবঙ্গে শিক্ষা, সভ্যতা এবং ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইউরানচাওর ভ্রমণ কাহিনী হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাঙ্গালার সর্বত্র আৰ্য্যভাষা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তখন আসামের পূর্ব পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত আৰ্য্যভাষা প্রচলিত ছিল। পুণ্ড্রবর্ধন ও কর্ণ সুবর্ণে কিরূপ ভাষা প্রচলিত ছিল সে কথাই তিনি কোন উল্লেখ করেন নাই।

বাঙ্গালাদেশে খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ অঙ্কে আৰ্য্য প্রভাব বিস্তার লাভ করে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গুপ্ত রাজাদের প্রভাব বিলুপ্ত হয়। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে শাশাঙ্গ নরেন্দ্র গুপ্তের রাজত্বকালে মগধ ও বাঙ্গালায় একটি সুবিস্তৃত স্বাধীন সাম্রাজ্য গড়িতে যাইয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের প্রভাব বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এইভাবে রাজ পরিবর্তনে বিভিন্ন জনসমাজের মিশ্রণে ভাষার মধ্যেও বিবিধ রূপান্তর ঘটে। তাহারই ফলে—মাগধী অপভ্রংশের রূপান্তর বাঙ্গালা ভাষা, আসামী, উড়িয়া, মাগধী, মৈথিলী ও ভোজপুরিয়া ভাষার সৃষ্টি হইল। ইউরানচাওর ভ্রমণকাহিনী হইতে বেশ বোঝা যায় যে সে সময়ে বিহার, বঙ্গ, আসামের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত একই ভাষা প্রচলিত ছিল। আসামীয়া ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষাকে এক বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। মগধান্ ভাষার সহিত অংশ অনেকটা পার্থক্য রহিয়াছে। ওড়িয়া ভাষা—বাঙ্গালা ও আসামীর রূপান্তর বলিলেও অত্যাুক্তি হয়না। প্রাকৃত ভাষা বা অপভ্রংশ ভাষা এইভাবে বঙ্গদেশ আসাম ও উড়িয়া অঞ্চলে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে পূর্ব মগধান্ ভাষা হইতে—বাঙ্গালা, আসামী

ও ওড়িয়া ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। মধ্য মগধান্ হইতে ভোজপুরিয়া, নাগপুরিয়া এবং সাদিন ভাষার উৎপত্তি। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে নানাদেশীয় লোকের গৌড়বঙ্গে আগমন এবং তাহাদের এখানে স্থায়ী অধিবাস হেতু প্রাচীন গৌড়ীয় ভাষায় ভারতীয় অপরাপর ভাষারও নিদর্শন রহিয়াছে।

আমরা যে সমুদয় কথার আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে ইহা বেশ সপ্রমাণ হইতেছে যে গৌরবঙ্গের ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নহে। প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন হইতে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখান যায়। বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃতেরই অধুৰূপ। প্রাকৃত ও বাঙ্গালার মধ্য সাদৃশ্য হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের খাঁটি পরিচয় আমরা পাই বৌদ্ধযুগে। এই যুগে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের রীতিমত একটা প্রভাব ব্যাপ্তি লাভ করে। সে সময়ে দেশমধ্যে নানাদেশের নানা ভাষার উচ্ছল স্রোতও খরভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল। বহু হাবির বহু গ্রন্থ রচনা করেন। বৌদ্ধযুগে আমরা যে বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচয় পাই তাহা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বাঙ্গালীর কৃতিত্বের পরিচায়ক। সেই যুগে পূর্ববঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন—তঁাহার নাম দীপঙ্কর অতিম জিজ্ঞান। তিব্বত রাজ ইঁহাকে ১০৩৮ সালে তিব্বত লইয়া যান। তঁাহার লিখিত গ্রন্থে তিনি নিজকে সর্বত্রই বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ‘একবার সাধন,’ ‘বলবিধি,’ ‘জ্ঞানসন গীতি, চর্য্যানীতি, দীপঙ্কর জিজ্ঞান ধর্ম ইত্যাদি তঁাহার বিরচিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে “তঁাহার অনেকগুলি সংকীর্ণনের পদাবলী ছিল।”

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় হাজার বছর পূর্বের বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। হাজার বছরের পুরাণা বাঙ্গালাভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা Buddhist songs and Chplets

in the Bengali language a thousand years old, এই বইখানার পাণ্ডুলিপি শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে ইহা ছাপা হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ইহা দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক ক্রীষ্ণ রাধাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের যুক্তি ঠিক নয়। এই দোহা ও গানগুলি তেতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বের নহে। এবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এখানে নিম্নোক্ত। রাধাল বাবুর কথা মানিয়া লইলেও আমরা একথা বলিতে পারি যে এই গান ও দোহা প্রায় ছয় শত বৎসরের প্রাচীন। সে কালের বাঙ্গালা কেমন ছিল তাহা আপনাদের শুনাইবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের দোহা হইতে আমরা একটা পদাবলী উদ্ধৃত করিলাম :—

টালত মোর ঘর নাহি পড় বৈশী।

হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥

বেঙ্গ সংসার বড় ছিলা জাম।

ছুছিল চুধু কি বেণ্টে আমার ॥

বসত বি আগ্রল গরিয়া বাঁখে।

পিটা দুহি এ তিনা সাঁখে ॥

এইরূপ দোহা ও গান আরও সংগৃহীত হইয়াছে। এখানে তাহার কয়েকখানার নাম করিলাম। (১) দোহা কোষ (২) ডাকার্ণব মহাযোগিনী তন্ত্র রাজ্য। ইহা একখানা বৌদ্ধ তন্ত্র গ্রন্থ। এ বই খানা কয়েকটা পাতাল অর্থাৎ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই প্রাচীনতম দোহা হইতেও আমরা আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাই। এই দোহা ও তন্ত্রের ভাষা প্রাকৃত। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার রূপ ও প্রকৃতি জানিতে হইলে এই বৌদ্ধ গান ও দোহা, দোহাকোষ ও তন্ত্র আলোচনার যোগ্য। অতএব প্রাচীন বাঙ্গালার ভাষার রূপ

ও আকৃতি কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝিতে অল্প আলোচনা অনাবশ্যক।

আজ এখানেই আমাদের কথা শেষ করিব। আমরা বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে করি।

(১) বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতমূলক নহে। ইহা প্রাকৃতেরই অল্পরূপ এবং মাগধী প্রাকৃত হইতে সমৃদ্ধত। বৌদ্ধগান ও দোহা, দোহাকোষ, ডাকার্ণব, ডাকের বচন, খনার বচন, মাণিকচন্দ্রের গীত, রমাই পণ্ডিতের শূর্য পুরাণ ইত্যাদিই তাহার প্রমাণ।

(২) বাঙ্গালা ভাষার লিখিত সাহিত্য গ্রন্থ অধিকাংশই দোহা বা গানের আকারে বিরচিত। ক্রীষ্টিয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিরচিত প্রাপ্ত গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং সে সকল গ্রন্থের রচনা ও আদর্শ যে একেবারেই সংস্কৃতমূলক নহে, তাহা বেশ বোঝা যায়।

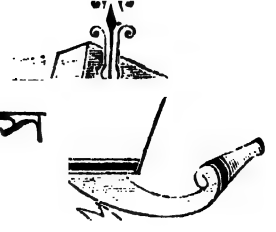
(৩) শব্দ সাদৃশ্য—সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃতের সহিতই যে তাহার একাংশী তাহার সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য এখানে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত করা গেল।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বহি	বাঙ্গালা
অনেন	ইমিন	মুচ্ছকটিক নাটক	এমনে
অষ্ট	অট্ট	"	আট
অম্ব	অম্ব	"	আম
অহং	অম্বি	"	আমি
অন্ধকাব	অন্ধকার	"	আঁধার
কর্ণ	কল্ল	"	কান
কর্ম্ম	কম্ম	"	কাম।

এইরূপ ভাবে বিস্তৃত ভাবে শব্দ-সাদৃশ্য দেখান যাইতে পারে। আমরা বারাস্তরে বৌদ্ধ যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।



উপন্যাস



## বাংলার মেয়ে

শেষ বৈশাখের একটি রাত্রি।

বৈকাল বেলায় বেশ এক পশলা রুষ্টি হয়ে গেছে, এখনও আকাশে এখানে সেখানে দুই এক টুকরা কালো মেঘ রয়ে গেছে। চাঁদের আলো আজ অল্প দিনকার মতন পরিষ্কৃত হয়ে উঠতে পারে নি, নেবে ঢাকা আকাশ তবুও উজ্জ্বল। পৃথিবীর বুকে অন্ধকার জমাট বেঁধে দাঁড়াতে পারে নি, কতকটা পাতলা হয়ে গেছে।

পথে এখনও জল জমে আছে, কোথাও বেশ কাঁদা জমে রয়েছে। পেছনে বাশ বাগানে একটা পাপিয়া আঁচমকা ঘুম হতে ছেগে উঠে তন্দ্রাজড়িত স্বরে ডাকছে “চোখ গেল, চোখ গেল”—

বিছানায় শুতে গিয়ে উঠে বসলুম। পাশের জানালা খোলা ছিল, বাইরের পানে দৃষ্টি পড়ল। কানে এল পাখীটির তন্দ্রাজড়িত সেই স্বর—চোখ গেল, চোখ গেল।

পথ দিয়ে কে গান গেয়ে যাচ্ছে—

আজ এমন বামিনী মধুর চাঁদিনী সে যদি গো

শুধু আসিত,—

আজ আমার প্রাণের নিহৃত কন্দরে এই গানটাই বেজে উঠছিল, মনে হচ্ছিল—

সকলি উঠিত পলকে বিকাশি

সে যদি গো ভালবাসিত।

বহুদূরে বিবাহের শব্দ শব্দ, হৃদয়নি কানে

আসছিল, মনে পড়ল—ঠিক এমনি একটা দিন বহু দূরে চলে গেছে। সে আমারই হতে পারত, সে কোথায় চলে গেল!

ভগবানের অপূর্ণ ব্যবস্থা। দুনিয়া খুঁজলে এমন একটা লোক পাওয়া যাবে না যে প্রকৃত সুখ পেয়েছে। জীবের অন্তরে অনন্ত পিপাসা, সে পিপাসার শাস্তি কিছুতেই হয় না, কখনও হবে না।

মনে পড়ছে আজ পূর্ববীর কথা।

সে ছিল ঠিক যেন একখানি ছবি। আজ মনে হচ্ছে সে কি সুন্দর ছিল, কিন্তু সে দিনে তা মনে হয় নি। আমারই জন্মে অর্ধ মাজিয়ে কুমারী বসেছিল, আমি তার সে অর্ধ পদাঘাতে ছুড়িয়ে ফেলেছি।

তখন আমি কলেজে বি, এ, পড়ি। বোর্ডিংয়ে থাকতুম, ছুটি হলে বাড়ী যেতুম। সেবার বাড়ী গিয়ে মেয়েটিকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলুম।

সংসারে ছিলেন বউদি, মা ছিলেন না। বউদির মুখে শুনলুম মেয়েটা তাঁরই সম্পর্কীয় বোন। তার এক মাত্র মা ছাড়া আর কেউ ছিল না, মা মারা যাওয়ায় নিরাশ্রয়া বালিকাকে অগত্যা বউদির কাছে আসতে হয়েছে।

মেয়েটার বয়স তখন চৌদ্দ পনের হবে। দেখলুম বউদি তার পরে তত সন্তুষ্ট নন, দাদাও তাকে গনগ্রহ মনে করছেন। শুনলুম তার বাপ মা এমন একটা পরমা রেখে যান নি যার সহায়তায় এই মেয়েটার

বিবাহ হতে পারে। বউদি স্পষ্টই বললেন,—“সেই তো মরলেনই—মেয়েটার বিয়ে দিয়ে গেলে আর কোন দায়িত্ব কাউকে নিতে হ’ত না। এখন এর উপায় কেই বা করে, কেই দেখে শোনে ?”

দেখতুম—আমার দিকেও সে আসত না। আমি যে কয়দিন বাড়ীতে ছিলাম সে অনেক দূরে থাকত। তার হুঃখ আমি কষ্ট অনুভব করতুম কিন্তু তা বলে এই অনুভূতি মেয়েটাকে নিজে গ্রহণ করার ইচ্ছা আমি কোন দিনই করি নি।

সে বারে বি এ একজামিনে স্কলারশিপ পেয়ে এম, এ, পড়তে আরম্ভ করলুম। দাদার বুক গর্দে ভরে উঠেছিল, তিনি আমার জন্তে মনের মত পাণ্ডী খোঁজ করতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল অর্ধেক রাজস্ব সহ একটা রাজকন্ডা এনে তাঁর ভাইকে বরণ করবে। বউদিও আমার খুব মন রেখে চলতেন। আমার বিবাহ—রাজকন্ডার সঙ্গে না হোক, জমীদার কন্ডার সঙ্গে যে হবে এ তিনি ঠিকই জেনে নিয়েছিলেন। আমিও যে সে আশা করি নি এ কথা বললে ভুল হবে।

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু সূতেন রায়ের বাড়ী ছিল বোর্ডিংয়ের পাশে, এই বাড়ীতে আমার অগাধ গতিবিধি ছিল। সূতেনের বোন সুনীতা, সে তখন সবোচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে আই, এ, পড়ছিল। কবে যে এই মেয়েটাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম তা বলতে পারি নে। মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল বিবাহ যদি করতে হয় তবে সুনীতাকে ছাড়া আর কাউকে নয়।

হয় তো প্রবীকে ভালবাসতে পারতুম যদি সুনীতা আমার সামনে সেই সময়ে এসে ন. দাঁড়াত।

আমি যখন দেশে যেতুম সুনীতা আমায় পত্র দিত। অবশ্য যদিও সে পত্র নিতান্ত সাদাসিধা তবু সেই পত্র নিয়েই বউদি আমায় তামাসা করতে ছাড়তেন না। সুনীতার কথা তিনি আমারই মুখে শুনেছিলেন, বাড়ীতে একরকম সবাই জানত একদিন সেই মেয়েটাই বধূরূপে এই বাড়ীতে আসবে।

বউদি প্রস্তাব করলেন—এইবার তোমার বিয়ের ঠিক করে ফেলি—কি বল ঠাকুর পো? তোমার দাদাকে একবার সুনীতার বাপের কাছে পাঠিয়ে দেই, সম্বন্ধটা পাকা করে রাখাই ভাল।

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বল্লেম,—এখনই কেন বউদি? আমার একজামিনটা আগে শেষ হয়ে যাক, তারপরে।

সেবার পূজার বন্ধে বাড়ী এলুম।

দেখলুম বউদি সেবার রান্নাবরে। জিজ্ঞাসা কল্লেম, “বাপার কি বউদি, তুমি যে রান্নাবরে?”

অন্ধকার মুখে বউদি বললেন,—“কি করব বল ভাই, তিনি তো নিত্য জর করে পড়ে আছেন, রান্নাবরে না এলে দে শুকিয়ে মরতে হয়।”

সেইদিন কথায় কথায় বউদি বললেন,—“হ্যাঁ ঠাকুর পো, শুনেছি কলকাতার ছেলেরা মিলে একটা কি সমিতি করেছে। তারা নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে বিনাপণে বিয়ে করবে। একবার ভাল করে খোঁজটা নিতে পার?”

বুল্লেম কেন, তবুও অনভিজ্ঞের মত বললুম, “কেন বউদি, হঠাৎ সে খোঁজে তোমার কি দরকার?”

বিকৃত মুখে বউদি বললেন, “হঠাৎ নয় ভাই। দেখছ না বুকের’ পরে কি বোকা চাপানো রয়েছে? কোথাকার কে—ধরতে গেলে কেউই নয়—ওই অতবড় এক কুমারী মেয়ে রয়েছে ওটাকে পার করতে হবে তো। বয়েস ও তো বড় কম হয় নি, এই সন্তের বছর হল, আর কতকাল এমনি করে রাখব?”

বললুম, “কি জানো বউদি, ওই যে বিনাপণে বিবাহ করব বলে প্রতিজ্ঞা করা, ওর মধ্যে খুব বড় মানে আছে। বিনাপণে যারা বিয়ে করবে তারা কি গরীবের মেয়ে নেবে? ওরা চায় একটিলে ছই পানী মারতে, অর্থাৎ বিনাপণে বড় লোকের মেয়ে ওরা নেবে যাতে নামও থাকেবে অথচ অল্প দিক দিয়ে যথেষ্ট পাওয়াও যাবে।”

বউদি খানিকটা চুপ করে রইলেন। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন “এ রকম মেয়ে মরাই ভাল।”

কথাটা তিনি বললেন বেশ, আমার মনে একটা দাগ থেকে গেল। হায় রে অভাগিনী বাংলার মেয়ে, তোমাদের ছুঃখ কষ্ট বুঝবে কে ? তোমরা জন্মগ্রহণ কর শুধু বেদনা সহ্য করার জন্যে, আমরা ছুঃখ কষ্টই সয়ে যাও।

জান করতে বাটে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম, দেখলুম পুরবী কাঁপতে কাঁপতে এক ঘড়া জল নিয়ে উঠছে। সেই দিন আমি প্রথম তার মুখখানা ভাঙ্গ করে দেখলুম।

কি বেদনাতুরা তার চোখ দুটি, তার দৃষ্টি তার অন্তরকে প্রকাশ করে দিচ্ছে। মেঘে ঢাকা সূর্যের আলোর মধ্যে আমি তার সেই যে মুখখানি দেখলুম তা এখনও আমার মনে আঁকা আছে।

অত জরে জল বইতে সে পারছিল না। তার বড় কষ্ট হচ্ছে দেখে এগিয়ে গেলুম, বললুম—“আমাকে ঘড়া দাও পুরবী, আমি দিয়ে আসছি।”

মনে হল হঠাৎ তার চোখ দুইটা যেন জলে ভরে উঠল, সে একটা কথা বললেন না, একবার মুখ ফিরালে না, তেমনি ভাবে চলে গেল।

সে দিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরে এসে দেখি ভীষণ কাণ্ড বেধে গেছে। পুরবী ভাতের ফেন সরাতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছে, ভাতগুলোও সব উনানে পড়ে গেছে। বউদি বাগাণ্ডায় বসে অশ্রু গালি বর্ষণ করছেন, অপরাধিনী পুরবী আড়ষ্ট হয়ে সামনে নতমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এর পর আমি লক্ষ্য করতে লাগলুম—কারণ অকারণে এই মেয়েটা কি রকম ভাবে লাজিত হয়। নীরবে সে সব সয়ে যায়, একটা কথা তার মুখে শুনি নি।

একদিন বৃষ্টি তার অসহ্য হয়েছিল। সে দিনে সে বউদির পায়ের কাছে ঢিপ্ ঢিপ্ করে মাথা খুড়ছিল, অশ্রুর কণ্ঠে বলছিল,—আমার বিয়ের

সময় তোমাদের করতে হবে না দিদি, আমার এমনি ভাবে থাকতে দাও। শুনেছি সেকালে অনেক মেয়ে কুমারী হয়ে জীবন কাটাত, এখনও দুই একটা কুমারী দেখতে পাওয়া যায়। আমার তাদের মত থাকতে দাও, দিদি, আমার জন্যে তোমাদের এতটুকু ব্যস্ত করতে আমি চাইনে

কতখানি ব্যথা যে তার বুকে জমেছিল তা তার এই কথায় বুঝতে পারলুম। মনে হল—বাংলায় মেয়ে জন্মায় কেন ?

বউদিকে আড়ালে জিজ্ঞাসা করলুম, “আজ তোমার বোন অত কাঁদছিল কেন বউদি ?”

বউদি দপ্ করে জলে উঠে বিকৃত মুখে বিকৃত স্বরে বললেন, “ওর কথা আর বল না ভাই, কায়ার কপাল নিয়ে এলেই কাঁদতে হয়। ওর মা সব টাকা কড়ি সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ের বাড়ীতে যান, এখন ওর মামারা সব নিয়ে দূর করে দিয়েছে, পত্র লিখলেও আর উত্তর দেয় না। বিয়ে দিতে হবে সে দায় যেন আমাদেরই—তাদের কেউ নয়। মেয়ে বলে—কুমারী হয়ে থাকব, ওর জন্যে আমরা একঘরে হয়ে থাকি আর কি ? তুমি যদি এক কাজ কর ভাই ঠাকুর পো,—ওকে যদি ওর মামার বাড়ি শাক-দহতে রেখে আসতে পার—আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। তোমার দাদার অফিসের এখন ছুটি নেই, নইলে তিনিই নিয়ে যেতেন।”

আমি বললুম, “যদি তারা জায়গা না দেয়—?”

বউদি বললেন, দেবে বই কি ? মামা আছেন তিনি কি আর তাড়িয়ে দেবেন ? ঘাড়ে গিয়ে পড়লে যা হোক একটা উপায় তাঁকে করতেই হবে।

ভেবে দেখলুম কথাটা সত্য। মামা বর্তমান, মামী যত্ন না করলেও মামা একটু দেখবেন নিশ্চয়ই। আর এখানে দিনরাত লাজনা গল্পনা নিজেরই চোখে দেখতে পারছি না।

বললুম, “কিন্তু তোমার কষ্ট হবে তো ?”

বউদি অবহেলার ভাবে বললেন, “চিরকাল তো

ও এখানে ছিল না কিবা থাকবেও না। আমার কষ্ট চিরকালের, হুদিন ও এখানে আছে, না হয়, একটু কষ্ট দূর হচ্ছে, খণ্ডখণ্ড গেলোও সেই আমাকেই তো সব করতে হবে।”

আমি বলে দিলুম, তবে ছ’একদিনের মধ্যে যাওয়ার বন্দোবস্ত ঠিক করা হোক, আমি-সোমবারে কলিকাতায় যাব।

আমার কাছে পল্লীগ্রাম ভাল না লাগলেও মাঝে মাঝে আসতে হতো। শাঁকদহতে আমার যাওয়ার কথা শুনে দাদা যে প্রথমটায় আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন তাতে কিছুই বিচিত্রতা ছিল না। আমি ভাললুম মুখ ফুটে বলি পূর্ববীকে, এখানকার অত্যাচার, কষ্ট হতে বাঁচানোর জন্তে আমি শাঁকদহ যেতে চাই, কিন্তু সে কথা বলতে পারলুম না।

যাওয়ার দিন সকাল বেলা পূর্ববীর দেখা পেলুম। সে কি করছিল, তাকে ডেকে বললুম, “একটু তাড়াতাড়ি করে যাও, সকাল সকাল বেরুতে হবে।”

সে শুনে গেল মাত্র, বরাবর যেমন একটা কথাও বলেনি, তেমনি একটা কথাও বললো না।

গাড়ী তৈয়ারী, পূর্ববীর দেখা নেই। বউদি এসে দারুণ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, “ভাল বিপদে পড়েছি ঠাকুর পো, সে মেয়ে যে কিছুতেই যাবে না বলছে।”

রাগ হয়ে গেল,—“যাবে না কি রকম?”

তিনি অতুলনপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, “তুমি একবার চেষ্টা দেখ না ভাই, আমি হার মেনেছি।”

পূর্ববীর ঘরে গিয়ে দেখলুম সে উপড় হয়ে পড়ে রয়েছে; বোধ হয় নিশ্চন্দ্রে চোখের জল ফেলছে। কোনও ভূমিকা না করে বলে উঠলুম, “গাড়ী এনেছে, উঠবে চল পূর্ববী। এখন যাওয়ার সময় তোমার এ রকম কাণ্ড ভাল লাগে না।”

সে উঠে বসল, চুলগুলো এলিয়ে পড়েছিল, তাড়াতাড়ি সে গুলোকে জড়িয়ে ফেললে; খানিক

চুপ করে বসে থেকে হঠাৎ আমার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। ছই হাতে আমার পা তখনো চেপে ধরে অশ্রুধ্বজ কণ্ঠে সে বললে, “নিশিবাবু, দিদি আমার উপর নির্ভর হয়ে আমায় সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আমি অনেক কৈদেছি তবু তিনি আমার একটা কথা শুনলেন না। আপনার পায়ের পড়ি—আপনি আমায় পাঠাবেন না, আপনি আমায় সেখানে রেখে আসতে যাবেন না। এখানে এই এত বড় সংসারে আমার একটু স্থান হবে না কি? আপনার বিয়ে হলে আপনার জীবন দাসীর মতো আমি এখানে থাকব। দিদি যদি না চান তাঁর কাছে থাকব না। আপনি যদি বলেন—তবে দিদি আমায় এখনি দূর করতে পারবেন না। আমায় বাঁচান, সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে আমায় হত্যা করবেন না।”

কি গানি কি রকম হয়ে গিয়েছিলুম। জোর করে তার হাতখানা ধরে টেনে তাকে তুললুম, তার অশ্রু বিগলিত মলিন মুখখানা দেখলুম, মনে হল তার অন্তরটা আমার সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

তাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলে যেতে বারান্দায় সামনে পড়লেন বউদি। বললুম, “সে যাবে না বউদি। তেমনরা অল্প লোককে দিয়ে ওকে পাঠিয়ে দাও, আমি শাঁকদহে যেতে পারব না।”

বউদি আশ্চর্য্য হয়ে যে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তা আমি দেখলুম না, ছুটে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লুম।

আজ এই প্রথম আমার মনে হল—পূর্ববী আমায় ভালবাসে আর সেইজন্তেই সে এত লাজনা সহ্য করেও এখানে পড়ে থাকতে চায়।

আবার ভাললুম, আমি এর কে? কোথায় সে আর কোথায় আমি, সে কি আর আমি কি—এ বিচার না করেই অভাগিনী কেন আমায় ভালবাসলে? সে স্পষ্টই জানে আমার ভালবাসা অর্থে হুঃখ যাতনা বরণ করা, কারণ আমি তার

হুখে কষ্টে সহায়ত্ব দেথালেও তাকে বিবাহ করতে পারব না।

মনে করলুম—বৌড়িকে কিছু না বলে নিজে তফাতে থাকাই ভাল, কোনদিন না কোনদিন ওর ভালবাসার মোহটা দূর হতেও পারে।

তার পরদিনই কলিকাতায় চলে গেলুম।

এর পর বড়দিনের বন্ধ এল, আমি বাড়ী গেলুম না। দাদার পত্রোত্তরে লিখে দিলুম আমি এবার দার্জিলিং বেড়াতে যাচ্ছি, এর পরের ছুটিতে বাড়ী যাব।

বাড়ীর পত্রে সকলেরই সংবাদ পেতুম, সংবাদ পেতুম না শুধু সেই মেয়েজীর। মাঝে মাঝে তার সংবাদ পাওয়ার ইচ্ছা হত, তখনই বিদ্রোহী মনকে ধমক দিয়ে বশে আনতুম। যাতে একমাত্র স্ত্রীতাকে ভালবাসতে পারি তারই চেষ্টা করতুম।

দাদা কলিকাতায় এসে স্ত্রীতার সঙ্গে আমার বিবাহের পাকাপাকি কথা ঠিক করে গেলেন। বৈশাখের শেষে বিবাহ। দাদা বৈশাখের প্রথমই আমায় বাড়ী যাওয়ার অনুরোধ করে গেলেন। তার মুখেও পূর্ববীর কথা শুনতে পেলুম না, আমিও নিজে হতে তার কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না।

বৈশাখ মাসের ছই তারিখে সন্ধ্যার টেণে বাড়ী গেলুম। বিস্মিত হয়ে দেখলুম—সেই দিন পূর্ববীর বিবাহ। দাদা ও বউদি কেউই আশাতে করেন নি আমি আজই বাড়ী আসব। আমি এর আগে পত্র দিয়েছিলুম, আমি সাতই আটই বাড়ী আসব। আমায় দেখে তারা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন দেখলুম।

তখনও বর আসে নি, শুনলুম—বর পাঁচপোড়া গ্রাম নিবাসী, অবস্থা বেশ ভাল, পূর্ববীর বেশ মুখে থাকতে পারবে। পূর্ববীর মামা এই সম্বন্ধ করেছেন এবং দাদা ও বউদি মহানন্দে এতে সম্মতি দিয়েছেন। বরপক্ষকে কিছু দিতে হবে না বরং তারা খরচপত্র দিয়ে বিয়ে দেবে।

এমন পাত্রও এ দেশে আছে, শুনে একটু আনন্দ পেয়েছিলুম। পূর্ববীরকে একবার দূর হতে দেখেছিলুম তার মুখখানা তখন শবের মত মগ্ন বোধ হয়েছিল।

বাজনাসহ বর যখন উপস্থিত হল তখন সকলের সঙ্গে আমিও দেখতে গেলুম। পালকী হ'তে বর নামছিলেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে আমার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। এই অরাজীর্ণ বৃদ্ধ, চলতে যার পা কাঁপছে, এই কি সুন্দরী তরুণ পূর্ববীর স্বামী হওয়ার উপযুক্ত পাত্র? বললুম—কেন দাদা ও বউদি আমায় দেখে সন্তুষ্ট হয়ে পড়েছেন। তাঁরা বেশ জানেন আমি এ বিয়ের সমর্থন কখনই করব না।

বউদিকে আড়ালে ডেকে বললুম, “পূর্ববীর সঙ্গে এই পাত্রের বিয়ে দিচ্ছা বউ দি? এর নামতো বিয়ে নয়, এর নাম হাত পা ধরে জলে ফেলে দেওয়া যে।”

বউদি হুঃখিত ভাবে বললেন “তা কি করব ভাই, গোড়া বাংলা দেশে কি পাত্র মিলবার যো আছে; বিনা পয়সায় কেউ তো নিতে চায় না ভাই, কাজেই বাধ্য হয়ে”—

ক্ষুদ্র ভাবে বললুম, “বাধ্য হয়ে এমনই নির্দিষ্ট বৈধবোর মধ্যে তাকে না ফেলে দিয়ে আজীবন কোমার্য পালন কর্তে দিলেই ভাল হ'ত বো দি।”

বউদি মাথা তুলে বললেন, “বলাটা বড় গৃহজ কিস্ত কাজ করা বড় শক্ত ভাই, ঠাকুর পো। জাত কুটুম নিয়ে সকলকেই তো ঘর করতে হবে, ওর জন্ত আমরা সব তো বিসর্জন দিতে পারি নি।”

বললুম, “পূর্ববীর মত দিয়েছে?”

রাগত হয়ে বউদি বললেন, “ওর আবার মত কি? এ দেশের মেয়েদের মতামত নিয়ে কাজ করতে হবে এমন দেশ এখনও হয় নি ঠাকুর পো। যার হাতে দেওয়া যাবে তাকেই বিয়ে



করতে হবে এই হচ্ছে এদেশের মেয়েদের শিক্ষা। আর সেই লোককেই দেবতা বলে পূজা করতে হবে এই হচ্ছে ধর্ম। সেকালে শুনেছি শ্রাশান-যাত্রী বুড়োর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়ের কোমার্য্যখণ্ডন করে নেওয়া হত, এতো তার চেয়ে অনেক ভাল।”

আর শুনতে পারলেম না, অত্যন্ত অসহ্য হওয়ায় বাড়ী ছেড়ে বাইরে চলে গেলুম।

গ্রামের প্রান্তরীমায় ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত, স্থানটা বড় নির্জন বলে আমার বড় ভাল লাগত। সেই জন্ত আমি প্রায়ই এখানে এসে বসে থাকতুম। আজও ভারি ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে আমি এই নদীর ধারে এসে বসলুম।

বাড়ীতে একটা বলিদান পর্কের উদ্ভাগ চলছিল, ঘন ঘন শব্দের শব্দ উঠছিল, আমি সে বলিদান দেখতে পারব না।

হায় রে, এমনি করে কত তরুণী নির্দিষ্ট বৈধব্যকে আলিঙ্গন করছে কে তার খবর রাখে? আমারই মত কত গর্ভিত যুবক আছে যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখে না, ক্ষমতা থাকলেও ঐতিবিধান করে না, দিন দিন দেশে অনাধিনী তরুণী বিধবার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে মাত্র। আমি নিজে বিধবাদের হুঃখ কষ্ট কত জায়গায় জলন্ত অক্ষরে বর্ণনা করেছি, কত জায়গায় বিধবার কষ্ট নিবারণ করতে অর্থ সাহায্য করেছি, বিধবাকে স্বাবলম্বিনী করবার জন্ত নিজে অনেক পরিশ্রম করেছি, কিন্তু কেন যে তারা বিধবা হল, মেয়েদের বৈধব্য কেমন করে নিবাসিত হতে পারে সে দিকটা তো দেখি নি। এই যে আমার সামনে আজ একটা তরুণী জেনে শুনে বৈধব্য দশাকে আলিঙ্গন করছে, ইচ্ছা করলে একে তো আমি রক্ষা করতে পারতুম।

মনের মধ্যে ভেসে উঠল স্থনীতার মূর্তিখা। আমি যে তাকে বড় ভালবাসি ;—স্থন

ভাগ্য করে পূরবীকে আমি গ্রহণ করতে পারতুম কি ?

কর্তব্য মাথা তুললে নিশ্চই পারতুম। আমি পুরুষ, অনেক শক্ত আঘাত সহ্য করার শক্তি ভগবান আমায় দিয়েছেন, এ আঘাতও আমি সহিতে পারতুম। কিন্তু এই তরুণী বালিকা মাত্র, সর্বস্ব হারিয়ে এ কেমন করে বেঁচে থাকবে ?

নদীর ওপারে পাপিয়া ডাকছিল—ঠিক আজ রাতের মতই। এমনই মেঘে ঢাকা আকাশ খানায়, চাঁদের আলো স্ফুট হয়ে উঠতে পারে নি।

বিবাহ বাড়ীতে শব্দ বাজতে বাজতে থেমে গেল, জলু ধ্বনি হঠাৎ থেমে গেল। মনে হল বীণা বাজতে বাজতে তার তারটা যেন ছিড়ে গেল।

একটা তীব্র চীৎকার যেন কানে ভেসে এল—  
“কি হল গো,—”

তারপর আর কোন শব্দ নেই। বাতাসের বর বর শব্দ আর নদীর একটানা কুল কুল শব্দ ভেসে যাচ্ছিল। পাপিয়া আচমকা, চীৎকারে ভয় পেয়ে নিরব হয়ে গেল, আর গান গাইলে না।

উঠে পড়লুম—বাড়ীর দিকে ছুটলুম।

সমস্ত চুপ—বাজনা থেমে গেছে; অতগুলি শোক যে জমেছে—কারও মুখে একটা উচ্চ কথা নেই। বাড়ীর ভেতর গেলুম, দেখলুম যে আলিঙ্গন দেওয়া হয়েছিল তা সেখানে পড়ে রয়েছে। পূরবী তার বসবার পিড়ির পাশে পড়ে। বৃদ্ধ বর আড়ষ্ট ভাবে নিজের পিড়িতে বসে।

বউদির কোলে পূরবীর মাথা—তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠে খানিকটা জায়গা প্রাবিত হয়ে গেছে।

আমার দেখেই বউদি মুখ নিচু করলেন, মেয়েরা চুপি চুপি জানালেন—পিড়ীতে করে আনার সময় পূরবী পড়ে গেছে, বুকে খুব লাগায় বুকে রক্ত উঠছে।

কিন্তু সে যে বিষপান করেছে তা আমি দেখেই বুঝতে পারলুম। তার হাত মুখ নীল

হয়ে গেছে, তখনও তার দেহে জীবন আছে।

আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, সে তার নিম্নলিখিত প্রায় চোখ দুটি যথাসাধ্য বিস্তৃত করে আমার মুখের পানে তুলে বরকে কি বলবার জন্ত তার ঠোঁট দুখানা এফবার নাড়ল মাত্র, কিন্তু একটা শব্দও তার মুখে ফুটল না। আর হাত খানা নড়ল—শাড়ীর অঞ্চলে একবার প্রাণপণে টানতে গেল, পারলে না।

হুই একবার একটু নড়ল মাত্র, তারপর সে একেবারেই স্থির হয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম—এ দেশের মেয়েরা কেমন করে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়, মরণকে এরা কতখানি ভালবাসে।

\* \* \* \*

তাকে দাহ করতে নিয়ে যাওয়ার সময় অঞ্চলের দিকে চোখ পড়ল, দাদা তার অঞ্চলের গিরো খুলে একখানা পত্র পেয়ে আমার হাতে দিলেন।

দাহ শেষে শ্রান্তদেহে বাড়ীতে ফিরে পাত্রখানা দেখতে বসলুম। পত্রে আমার নাম লেখা ছিল, ভিতরে সামান্য ছ'চার কথা মাত্র।

অকিঞ্চিৎকর দেহটাকে টেনে নিয়ে আর ফেরাতে পারব না নিশ্চিত জেনে মৃত্যুকে বরণ করতে যাচ্ছি। তুমি ইচ্ছা করলে আমার এই নির্দিষ্ট মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারতে, কিন্তু তুমি তা করলে না। তুমি বুঝতে চাইলে যে আমি তোমায় কতখানি ভালবেসেছিলুম আর সেই জন্তই এক জনকে হৃদয় দিয়ে আর এক জনকে দেহ দিয়ে ছিচারিগী হতে পারব না বলে চলে যাচ্ছি। বৈচে থেকে তিলে তিলে মরতে পারব না, বুকে এতখানি দুখ রেখে মুখে, মুখের অভিনয় করা আমার পক্ষে অদৃশ্য, তাই

চললুম। সকলে আমার আজ অপরাধিনী ভাবছে কিন্তু হে আমার দেবতা, তুমি আমার অপরাধিনী ভেব না। তুমি শুধু মনে ক'র আমি তোমায় ভালবেসেছিলুম। ব্যর্থতা আমার জীবনের সাধী, তাই নিয়েই চললুম।”

\* \* \* \*

তারপর সুদীর্ঘ তের বৎসর কেটে গেছে। আজও তেমনি বেশ সমান ভাবে আবার সেই পাপিষ্ঠা গান করে, তেমনি মেঘে ঢাকা চাঁদ থাকে।

সুনীতাকে বিবাহ করতে পারি নি। আমি যে দাগী আসামী, আমি যে অপরাধী। একজনকে হত্যা করেছি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজীবন করতে হবে।

আজও শুনছি সেই পাপিষ্ঠাটা অবিশ্রান্ত চীৎকার করছে—চোখ গেল, চোখ গেল।

মনে হল—বলি—ভেসে যা ভেসে যা। যে চোখ দিয়ে তাকে দেখেছিলি, দেখার আগে ভবিষ্যৎ ভেবে সেই চোখ দুটো কেন নষ্ট করে ফেলিস্ নি? আমাকেও একদিন একজন দেখেছিল, আমি তাই—সে যদি অন্ধ হতো তা হলে সেও বাঁচত আমিও বাঁচতুম।

তাই আজও বলি হুগিণী বাংলার মেয়ে ঘরে ঘরে এমনি কত নিষ্ঠ্যাতনই না সখ্য করছে, কে দেখছে এদের, কে শুনছে এদের করুণ কাহিনী? কে কোথায় সরে পড়েছে কেই বা তার হিসাব রাখে? পূর্ববীর রক্ত আমার অন্তরে জমে আছে, এমনি কত কুমারীর বুকের রক্ত দেশ মাতৃকার চারিদিকে জমছে কেউ তা কি দেখতে পাচ্ছে? যদি দেখত—তা হলে বালিকার বুদ্ধাধামী এখনও দেখতে পাওয়া যেত না, ঘরে ঘরে বিধবার এত বেশী সৃষ্টি হত না।

## গাঁয়ের পথিক ।

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

ওপারের রবি চ'লেছে ফিরিয়া সোণার রথে  
পাখি আসে ফিরে, দূর ঘিরে ঘিরে কূলায় ল'তে ।

গোষ্ঠ হ'তে ধীরে ফিরিতেছে ধেমু

বাজিতেছে দূরে রাখালের বেণু,

ঘর-ছাড়া এক পথিক চ'লেছে গাঁয়ের পথে ।

পথিক চ'লেছে এক-মনে, নাহি ফিরায় আঁখি

বকুলের ফুল কাঁদিছে কত না তাহারে ডাকি !

“ও পথিক, শুধু অঞ্চল পাতি’

কোন্ তরু-তলে কাটাবে এ রাত্রি,

কেন যাও দূরে ? যাওনা আজিকে এ গাঁয়ে

থাকি ?”

চূত-তরু-শাখে মুকুল-রেণুরা কাঁদিছে ফুলি’

অভিমান-ব্যথা পাতায় পাতায় উঠিছে ঢুলি’ ।

“হে পথিক, যদি এলে এই গাঁয়ে

থেকে যাও আজি, আমাদের ছায়ে

ভোরের শিশির-পরশে বেদনা যাবে গো ভুলি’ ।”

গাঁয়ের বাতাস ডাকিছে পথিকে আকুল হয়ে’

টানিছে কতই, ফিরাতে তাহারে আঁচল ল’য়ে ।

“ও পথিক, তুমি এস এস ফিরি’

কাটাৰ এ রাত্রি সবে তোমা ঘিরি,’

স্ববাসের কণা তব তরে মোরা আনিব ব’য়ে ।”

বকুলের ফুল বৃথা ব’রে গেল-—আপন হারা

আমের মুকুল বৃথা কেঁদে গেল—পাগল-পারা ।

উদাসী-বায়ুর বুক-ভরা গানে

কোন কথা তার পশিল না কানে,

গাঁর পথ ধ’রে যেতেছে পথিক—আবাস ছাড়া ।

## ঋণ-পরিশোধ

( কথা-চিত্র ) .

শ্রীম্বরজিৎ দাস গুপ্ত ।

কালো, বিষম কালো ; ঋণানের পোড়া কাঠের মতো রঙ তার, হাত পা পঁকাটি একটা লোক প'ড়ে আছে রাজবাড়ীর আস্তাবলের পাশে, একটা ফুটো মালা, কয়েক টুকরো ময়লা আকড়া এই সমস্ত নিয়ে ।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে রোজই দেখি, আর ভাবি, লোকটা কে !

একদিন দেখি, কুড়িয়ে পাওয়া এক টুকড়ো কাগজ পেতে ময়লা ছেঁড়া আকড়ায় বেঁধে যা ভাত এনেছিলো, তাই ব'সে ব'সে চিবোচ্ছে । একটা রোয়া-হঠা রোগা কুকুর পাশে ব'সে ।

সে যখন ভাতে হাত দেয়, আমাকে দেবে ভেবে কুকুরটা খুসি হ'য়ে লেজ নাড়ে । দিলে না দেখে নিরাশ মনে মুখ পানে চেয়ে থাকে ।

ভাত থেকে হাত তুলতেই, মাছিগুলো ভাত ঢেকে কালো ক'রে ফেলে । হাত নামালে ভ্যান্-ভ্যানিয়ে উড়ে কুকুরটার ঘায়ে গিয়ে বসে ।

আমি কাছে যেতেই বলা-চোখের ঝাপসা দৃষ্টি তুলে আমার পানে চেয়ে রইলো । মুখে পোরা শুকনো ভাতের গ্রাসটা তাড়াতাড়ি গিলতে গিয়ে বিষম খেয়ে উঠলো ।

একমালা জল খেয়ে একটু সামলে নিয়ে বা হাতটা বুকে বুগ'তে বুগ'তে ব'ললে—কেয়া বাবু ?

আমি তখন জানতে চাইলাম—সে কে ।

সে হিন্দিতে ব'ললে—বাড়ী তার গোরখপুর জেলায় । দেশে অভয়া হ'লো ; জমিদারের বাজনা দিতে জমি বন্দক দিয়ে মহাজনের কাছে ঋণ হ'য়েছে, তিন ফুড়ি পাচ রূপিয়া । তা' স্ত্রী সোহাগী ব'ললে—

ভিখুরা বাড়ীলো মুলুকে নোকড়ি ক'রে সাধি ক'রেছে । তাই বাড়ীলো মুলুকে বহুৎ রূপিয়া আছে শুনে, লেড়কী শুক জেনানাকে তা'র বাপের বাড়ী রেখে আট মাস হয় মমিন্-সংহ এসে এক মোক্তারের বাড়ী চাকরি করছিলো ।

মমিন মিঞা নোকর্দমায় হেরে আখেজে দিলে মোক্তারের বাড়ী আগুন ধরিয়ে । রাত ছপুরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে আগুন দেখে চোঁচোমেচি । সবাই ছুটলো আগুন নেবাত, ছেলেপুলে টাকা পরমা সামলাতে । গোয়ালের গাভীন গাই চায়টে বাঁধা, কারো হাঁস হ'লো না সে দিকে ।

সে ছুটে গিয়ে গরুর দড়ি কেটে দিলে । গরু বাঁচলো ; জলন্ত খড়ের চাল চেপে প'ড়লো তা'র ঘাড়ে । মরেই যেতো ; কোন রকমে বেরিয়ে এসে সারারাত পুকুরে প'ড়ে রইলো ।

সকালে তা'র মুনীব হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন ।

ডাক্তার সাহেব ক'দিন রেখে, আর রাখবার আইন নেই ব'লে বের করে দিলেন ।

ফের মুনীবের কাছে এলো । তিনি ছ'দিন রেখে কুঁড়ে ব'লে তাড়িয়ে দিলেন । সেই থেকে ভিক্ষা ক'রে খায় । সহরের লোক ভিখু দেয় না ;—বা বেটা খেটে যা গে!—ব'লে হাঁকিয়ে দেয় । তাই গায়ে এসেছে ।

এই ব'লে লোকটা হাঁপাতে লাগলো । প্রতি নিঃশ্বাসে তা'র বুকের চামড়া পাঞ্জরে সঁদোচ্ছিলো ।

২

ক'দিন হয় আর সে রাস্তার যাই না । আজ হঠাৎ মনে হ'ল । গিয়ে দেখি লোকটা সেখানে

নেই। মনে করলাম মরে গেছে। সেইসুদের জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি,

—বাবু, হি—ম্মা!

ফিরে দেখি গাছতলায় ব'সে সেই লোকটা।

কাছে যেতে ব'ল্লে—ম'রে যাবো ব'লে সরকারের লোক এসে তাড়িয়ে দিয়েছে।

একটা ছোটো ডাল ভেঙ্গে, তাই দিয়ে গাছতলা ঝেড়ে, তা'র সেই কুটো মালা, ভাঙা এনামেলের শাস, ছেঁড়া নেকড়া নিয়ে, আস্তাবলের দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছে। কদিন ওখানে ছিলো কিনা, মায়া ব'সে গেছে। তাই তাড়িয়ে দিলেও এমন জায়গায় ব'সেছে, যাতে সে জায়গাটা দেখতে পায়। 'ঐখানে ছিলাম', এ মনে করেও আরাম।

সামনে এক মুঠো ভিজ়ে ছোলা। বোধ হয় সেইসরা দন্না ক'রে দিয়ে গেছে। তাই একটা একটা ক'রে মুখে দিচ্ছে, পাছে ফুরিয়ে যায়।

৩

রাত্রে খুব ঝড়বৃষ্টি ব'য়ে গেছে। সকালে এসে দেখি, বাজারের হাট চালাতে মাটিতে ব'সে মুচি জুতা সেলাই করছে। তা'রই পাশে ব'সে সেই লোকটা একটা ময়লা চট গায়ে দিয়ে।

আমাকে দেখে ব'লে উঠলো—বাবু, রাতে বহুৎ বাদল হ'য়েছিলো, আস্তাবলে ঢুকতে দিলে না। গাছতলায় টুকতে না পেরে এখানে এসেছি। মুচি ভেইয়া তাড়িয়ে দেয় নি; আরো তা'র পেতে বসা চটখানা গায়ে দিতে দিয়েছে।

এই ব'লে খুসি হ'য়ে চট দেখিয়ে হাসতে লাগলো। তা'র ক্লম মুখে হাসির রেখা প'ড়লো না। সন্ধ্যার কালো মেঘে পড়া এক চম্কা আলোর মতো মিলিয়ে গেলো।

বসা চোখ আরো ব'সে, বেরোনো দাঁত আরো বেরিয়ে, কৌচকানো গাল আরো কুঁক, হাসি বিকট কান্নার মতো দেখালো।

মুচি ব'ল্লে—বাবু, সেলাম।

আমি তার সেলাম সহিতে না পেরে চ'লে এলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরছি, দেখি মুচি নাই। লোকটা চট মুড়ি দিয়ে কুঁকড়ে শুকড়ে শীতে কাৎরাচ্ছে। সব গা ঢাকতে পারছে না। যখন বড় শীত পাচ্ছে, তখন মাথা থেকে চট নামিয়ে পা ঢাকছে, আর—'নাঃ, মাঃ' করছে।

৫

সকালে দেখি, একহাঁটু তুলে, একহাত পেটে দিয়ে চিং হ'য়ে প'ড়ে আছে। ছ'চা'র জন পথিক চ'লতে চ'লতে থেমে দাঁড়িয়ে দেখছে, নাকে কাপড় দিয়ে।

ম'রে গেছে!

বুঝি বড়ো জলছিলো। চট্টা গা থেকে ফেলে দিয়েছে। কোমরে বাঁধা জাল থলিতে একটা টাকা, তাই মুঠো ক'রে ধ'রে আছে। মরার পর যদি কেউ কেড়ে নেয়।

এতো কষ্টেও টাকাটা খরচ করেনি। মহাজনের ঋণ শুধতে হবে যে!

দাঁত বের করা, চোখ চাওয়া, হাঁ করে আছে।

সেদিন হাসি দেখাছিলো, কান্নার মতো; আজ মৃত্যু বাতনার কান্নার চিহ্ন তার মুখে লেগে আছে হাসির মতো।

সে যেনো আমার দিকে চেয়ে ব'ল্ছে—ওরে, তোদের এতো বড়ো দুনিয়ায় আমার সাড়ে তিন হাত জায়গা হ'ল না। একমুঠো ভাত মিললো না! দেখ আজ একজন ত'র অমল হাতে সকল মলা মুছে, আমার কোলে তুলে নিয়েছে।

হট্ট যাও বাবু!

ফিরে চেয়ে দেখি, কোদাল কাঁধে ঘাসী মেথর, সঙ্গে বাঁশ ঘাড়ে আর একজন কে।

\* \* \*

সরকার তার সৎকারের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন।

## নূতন কেতন

( মালাই পাস্তম্ )

শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

( এই “নূতন কেতন” শীর্ষক কবিতাটি একটি মালাই পাস্তম্ । ইটালির যেমন সনেট, আমাদের যেমন তান্কা, মলয় উপদ্বীপের তেমনি “পাস্তম্” । “পাস্তম্” অর্থে গান বা গীতি-কবিতা । পাস্তম্‌য়ের প্রতি স্লোকের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চরণ পরবর্তী স্লোকের প্রথম এবং তৃতীয় চরণরূপে ব্যবহৃত হয় । ওত্যেক স্লোকের ( Stanza ) চারি চরণ পাকা আবদ্ধক, এবং সাধারণতঃ চারি স্লোকে একটি পাস্তম্ সম্পূর্ণ হয় । তদ্বিত্ত প্রতি স্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি-সঙ্গে তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিগুলির বর্ণিতব্য বিষয়ের পঞ্চম স্থলে গঙ্গা যমুনার মত একেবারে পাশাপাশি থাকে । সম্বন্ধে, সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকাই নিয়ম । মাইকেল মধুসূদন যেমন বঙ্গভাষায় প্রথম সনেট লেখেন, ভিক্টর হুগো তেমনি ফরাসী ভাষায়

হেথায় নিত্য চির-চেতনের নূতন কেতন ওড়ে !  
অবুঝ্ সবুজ সতেজ সজীব চিরদিন লভে জয় !  
পুরাতন শুধু মৃত্যু-যাতনে নিয়তহাত পা ছোঁড়ে  
জীর্ণ শীর্ণ দীর্ণ ত্যক্ত জগতের কেহ নয় ।

অবুঝ্ সবুজ সতেজ সজীব চিরদিন লভে জয় !  
মৃত্যুঞ্জয় নূতনের করে আত্ম-সমর্পণ ।  
জীর্ণ শীর্ণ দীর্ণ ত্যক্ত জগতের কেহ নয় ;  
ব্যর্থতা নিয়ে ধ্বংসের মাঝে মিছাই আশ্ফালন !

মৃত্যুঞ্জয় নূতনের করে আত্ম-সমর্পণ ।  
নবীনের জয় ঘোষিতে প্রকৃতি নিশিদিন রহে  
সেজে ।—

প্রথম পাস্তম্‌য়ের অনুবাদ করেন । হুগো মৌলিক পাস্তম্‌ রচনা না করিলেও তৎকৃত অনুবাদের প্রকাশিত হইবার পর হইতে ফরাসী সাহিত্যে পাস্তম্‌য়ের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিয়া আসিয়াছে । পরবর্তী অনেক কবি অনেকগুলি হুন্সর হুন্সর মৌলিক পাস্তম্‌ রচনা করিয়া স্বদেশের ছন্দোবিদ্যা ও কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন ।” ছন্দের ‘পিতল’ কবি-বন্ধু সত্যেন্দ্র নাথ হুগো কৃত একটি মালাই পাস্তম্‌য়ের ফরাসী অনুবাদ হইতে বাঙলায় অনুবাদ করিয়া প্রথমতঃ মালাই পাস্তম্‌ আশ্রয়ানী করিয়াছেন । তারপর আর কোনো বাঙালী কবি ঐ পাস্তম্‌ রচনা আর পর্য্যন্ত করেন নাই । আমি এই খাবৎ দুইটি মৌলিক মালাই পাস্তম্‌ রচনা করিয়াছি । একটির নাম “রজনীগন্ধা”, আর একটির নাম “নূতন কেতন” । )

ব্যর্থতা নিয়ে ধ্বংসের মাঝে মিছাই আশ্ফালন !  
যুঝিবার যার শক্তি নাহি গো, বাঁচিতে আসে  
সে যে !

নবীনের জয় ঘোষিতে প্রকৃতি নিশিদিন রহে  
সেজে !  
তারি পদ-ভরে কাঁপিতেছে আজি স-সাগরা  
এই ক্ষিতি !

যুঝিবার যার শক্তি নাহি গো, বাঁচিতে আসে  
সে যে !  
যোগ্যতমের উদ্ধর্তন—এই তো খাতার রীতি !

## খেয়ার যাত্রী

( কথানাট্য )

শ্রীশ্রামাচরণ বসাক ।

( রোগশয্যায় সরযু শুইয়া আছে । রাত্রিকাল, শরৎকালের আকাশ, কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন—বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা, সরযুর ছোট বোন লীলা ঘরে প্রবেশ করিল । )

সরযু—কে ?

লীলা—আমি লীলা ।

সরযু—কাছে এসে ব'স ভাই, - ছ'টো কথা কয়ে বাঁচি ।

লীলা—দিদি—

সরযু—কি বলছিস ?

লীলা—কেমন আছ ?

সরযু—আমার থাকা থাকি কিছুই নেই ভাই !

লীলা—ওকথা ব'ল না দিদি, আমাদের মনে বড় কষ্ট হয় ।

সরযু—কষ্ট হয়—এখনও কষ্ট হয় ! এই কঙ্কাল থানার জন্ত তোরা এখনও ভাবিস্ ? আমার মায়া মাজ ও কাটাতে পারিলি না, আমি আর ক'দিন !

লীলা—দিদি, আমাদের অদৃষ্টে যদি তেমন দিনই আসে.....না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, ওকথা আর ব'ল না । মা শুনতে পেলো এখনি কঁাদবেন । জানহ, মা এখনও রাগের শোক ভুলতে পারেন নি ।

সরযু—রাগ আমাদের ছেড়ে কতদিন গেছে, আজ ছ'মাস নয় ?

লীলা—না, প্রায় তিন মাস হ'ল ।

সরযু—তিনমাস—মোট তিনমাস ! দিন এত বড় হয়ে গেছে যে আর কাটাতে চায় না । আমি আজ কতদিন বিছানায় পড়ে আছি ?

লীলা—পাঁচ মাস ।

সরযু—ওঃ ! এতদিন তোদেরকে এই রকম করে কষ্ট দিয়েছি ; আরও কতদিন কষ্ট দেব জানি না । না, এ আমার সত্যই ভাল লাগে না । এখন যত শীঘ্র মরতে পারি ততই ভাল ।

লীলা—আমাদের যেটুকু আশা—তোমার মুখে ওকথা শুনলে তাও থাকে না । তুমি ভাল হও আর না হও, তার জন্তে আমরা ভাবিনা । তুমি এমনি করেই পড়ে থাকো তাতেই আমরা শান্তি পাব ।

সরযু—আমার মত একটা বিধবার প্রাণের কোন দাম নাই—তার জন্ত কাউকে দরদী হতেও হ'বে না । একি আমার স্ব্থের জীবনরে লীলা ! নিজের সব থাকতেও কিছুই নাই—সকল কাজেই অগরের সাহায্য নিতে হয় । আমার জীবন ত একটা বোঝা । যদি চোখে দেখতেও পেতুম—

লীলা কেন, সেদিক কি আমরা হোমায় অযত্ন করেছি ?

সরযু—না অযত্ন ত করিসই নি, বরং যা করেছিস তা অনেকে করে না, কিন্তু ভাই, আমার এই এক দেয়ে জীবন যে আর ভাল লাগে না ।

লীলা—দিদি, কঁাদচ ?

সরযু—হুঃখ রয়ে গেল—জীবনটা অনেক থানি অসম্পূর্ণ হয়ে রইল । যদি একটুও দেখতে পেতুম—

লীলা—দেখতে নাই বা পেলো তাতে হুঃখ কি ?

সরযু—আগে হুঃখ করতুম না । কিন্তু তাঁকে হারাবার পর থেকে হুঃখ হয় । তিনি থাকতে চোখের অভাব বুঝতে পারতুম না—এখন সেটা বিশেষ ভাবে বোধ হয় । ওকি ! জানলা বন্ধ করছিস কেন ?

লীলা—বৃষ্টি পড়ছে ।

সরযু—না না বন্ধ করিস নি ভাই, খুলে দে ।

লীলা—সে কি ?

সরযু—না, না, তুই খুলে দে।

লীলা—ঠাণ্ডা লাগলে তোমার অস্থখ বাড়বে যে ?

সরযু—বাড়বে না। যদি বাড়ে, কোন ক্ষতি নাই তুই খুলে দে। কই, খুলে দিলি না ?

লীলা—এই দেখ দিদি, জলের কাপটা ঘরের ভিতর আসছে।

সরযু—আস্থক। এ আমার ভারী ভাল কাগে কিন্তু, গন্ধ পাচ্ছিস লীলা ? ঘর একেবারে গন্ধে ভরে গেছে।

লীলা—দিদি এই বার বন্ধ করেদি ?

সরযু—দিবি দে। তুই আজ আমায় বৃষ্টির জ্ঞ বকছিস—এর জন্মে এমনি ভাবে কতদিন তাঁর কাছেও তিরস্কার সহ্য করেছি। বৃষ্টি পড়লেই মন ব্যাকুল হয়ে উঠত—জানলা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম। বৃষ্টির ছাঁট এসে আমার শরীর ঠাণ্ডা করে দিত—আমার এলোচুলগুলো বাদল বাতাসের সঙ্গে লুটোপুটি লাগিয়ে দিত—আমার যে কি আনন্দ হ'ত, তা আর কি বলব ! কোন কোন দিন ধরা পড়ে যেতুম ; তিনি এসে তিরস্কার করে জানালার ধার থেকে টে'নে এনে আমার ভিজে চুলগুলো শুষ্কিয়ে দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে নিষেধ করতেন। তারপর পড়তেন মেঘদূত—সেই আষাঢ়ের প্রথম দিবসের কথা—তাঁর মুখে কি মিষ্টিই লাগত। হাঁরে, বৃষ্টি কি এর মধ্যে ধরে গেল—আর যে শব্দ পাচ্ছি না।

লীলা—( জানালা খুলিয়া ) হাঁ বৃষ্টি ধরে গিয়ে চাঁদ উঠেছে।

সরযু—থাক থাক, জানলা খোলা থাক। চাঁদের আলোয় ঘর ভরে যাক। এই চাঁদ উঠলে কত কথাই মনে পড়ে। কত পূর্ণিমা রাত যে আমরা দুজনে জেগে কাটিয়েছি তার সংখ্যা নাই। ছাতে তাঁর মাথাটা কোলে নিয়ে বসে থাকতুম—তিনি আমাকে সব বুঝিয়ে দিতেন। তারপর কত গল্প, কত কথা, তার ঠিক নাই, পূর্বের চাঁদ পশ্চিমে হেলে পড়ত—

আমাদের কথার শেষ হত না। ভোরের আকাশের কোলে যখন শুকতারা মিলিয়ে যেত—তখন আমরা ছাত থেকে নামতুম। এখন ভাবি এত কথা কোথা থেকে আসত ! কোন দিন তিনি হয়ত আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন—আমি তাঁর গায়ে হাত বুলায়ে দিতুম—মন ভরে কাঁদা আসত—এমন প্রেমময় স্বামীর মুখ জীবনে একদিনের জন্মও দেখতে পেলুম না—একি আমার কম দুঃখ ?

লীলা—দিদি, চুপ কর।

সরযু—মনে ত করি চুপ করব কিন্তু পারি না। মনের মাঝ থেকে কথা ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়—লস্টি ! দিদিটা আমার ! রাগ করিস না ভাই।

লীলা—না দিদি, রাগ করব কেন ? একটা কথা তোমায় বলব বলব ভেবেও বলতে সাহস পাই নি, আজ যখন তুমি বলছ, তখন জিজ্ঞাসা করছি—তিনি কি সত্যি তোমাকে ভাল বাসতেন ?

সরযু—তুই কি বলিস লীলা ! ভাল বাসতেন কিনা ! তিনি ভাল বাসতেন—কিন্তু সে যে কি রকম ভালবাসা—সে আমি মুখে বলতে পারব না। পাছে আমি কষ্ট পাই ভেবে এমন কি বাতাস পর্যন্ত করতে দিতেন না। হাঁরে লীলা—তোরা ছেলে কোথায় ? তাকে একবার নিয়ে আস না।

লীলা—ভুলে গেছ, তিনি তাঁকে আমার শাণ্ডীর কাছে নিয়ে গেছেন।

সরযু—হাঁ, তাও বটে ! তোরা ছেলেও যে কেমন হ'ল তাও দেখতে পেলুম না। একটা সত্যি কথা বলবি ভাই ? আমার ছেলেটা কি আমারই মত দৃষ্টিহারা হয়ে পৃথিবীতে এসেছিল ? খুলে বল ভাই, আমার মনে উৎকর্ষা রাখিস না।

লীলা—কেন দিদি, এ কথা ত তোমায় কতদিন বলেছি—তোমার পা ছুঁয়ে সত্যিই বলছি—সে ঠিক তার বাপের মত হয়েছিল। সে চাইলেই তার বাপকে মনে পড়ত।

সরযু—কি জানি কেন বিশ্বাস হয় না। আমার



এ পোড়াকপালে ভাই, কিছুই সইল না, ছেলে, স্বামী  
সব হারিয়ে নিজে বসে রইলুম।

লীলা—বা হয়ে গেছে, তার জন্ত দুঃখ করে কি  
করবে? ভগবানকে ডাক, মনে সাহসনা পাবে।

সরযু—ভগবান কেমন জামি না, কোন দিন সে  
কথাও ভাবি নি। আজ কোন কিছু ভাবতে গেলে  
সকল ভাবনা ছাপিয়ে বারে বারে স্বামীকেই মনে  
পড়ে। তাঁর স্মৃতি যে আমার মনের অনেকখানি-  
জুড়ে আছে। পে যে সহজে ভুলতে পারি না।

লীলা—কেন ভেবে ভেবে মন খারাপ কর।

সরযু—মন খারাপ করি নায়ে—দ্যান করি।  
তখন প্রাণের কাছে পেয়েও যতটা অনুভব করতে

পারিনি, এখন তিনি দূরে চলে গেলেও তাঁকে প্রাণের  
অতি নিকটে অনুভব করি।

লীলা—দিদি?

সরযু—কি বোন—

লীলা—না কিছু নয়।

সরযু—কি বলছিলি বল না—

লীলা—না কিছু নয়, বাই ভাই, মা আবার ওই  
ডাকছেন। (প্রস্থান)

সরযু—আয় ভাই! এই আলীকাদ করি সুখী হ  
বোন। আমাদের জীবন ত জলেপুড়ে গেছে, তোদের  
সুখী দেখতে পেলেও আমাদের সাহসনা। জানি না--  
আর কতকাল এই দুর্ভিক্ষ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকব।  
(দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া গুইল।)

## পেন্সে-হারাগোর ব্যাখা

শ্রীমদীর্ঘচন্দ্র সেন রায়

অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় যে মানুষ কোন  
একটা কাণ্ডের উপর তার স্থির বিশ্বাস সঙ্গেও দুর্বলতা  
হেতু নিঃশঙ্কে এমন বিব্রত করে তোলে যার দরুণ  
সত্য ও কর্তব্যের অনুকূলে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করবার  
শক্তিটুকু পর্যাপ্ত সে তখন হারিয়ে ফেলে।

তারপর এই দুর্বলতা ও শক্তি হারিয়ে ফেলার  
দৃশ্যের ভেতর দিয়ে এমন একটা ঘটনা ঘটে যায়, যার  
দরুণ তাকে সারাটা জীবন অনুতাপ ও দুঃখ করতে হয়।

আজ প্রায় অনেক দিনের কথা - কি একটা  
উৎসব উপলক্ষে আমার দূর সম্পর্কীয় বিনয়দা ও  
বৌদি তার ছেলেনয়েদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়ী  
এলেন বেড়াতে।

এই তাদের প্রথম আমাদের বাড়ী আসা।

কাজেই রাণু, ইলা, প্রীতি, গীতা, রাতুল, চরণ, ও  
অতুল সবাই আমার অপরিচিত হলেও বৌদির ভগ্নীর  
মেয়ে গীতার সাথেই যে কেমন করে আমার ভাবটা  
হয়ে গেল তা কিন্তু আমি নিজেই বুঝতে পারলুম না।  
তাকে আমার পড়বার ঘর দেখিয়ে, স্কুলে যে আমি  
একজন ভাল ছেলে তৎসম্বন্ধে 'টিচারদের' অভিমত  
আনিয়ে, আমি যে ভাল কুটবল খেলাতে পারি এই  
সম্বন্ধে, খেলার মাঠে আমাকে যে যার দলে পাবার জন্ত  
সবার কি বিপুল আগ্রহ—বাণী বাজানোও আমার  
বেশ অভ্যাস আছে ইত্যাদি নানা আলাপের মধ্যে  
আমাদের উভয়ের ভেতর অপরিচিতের যে একটু  
সঙ্কোচ ও 'বাধ-বাধ' ভাব ছিল তা কেটে গিয়ে ভাবটা  
বেশ জমে উঠলো।

গীতাকে কিন্তু আমার খুব ভাল লেগেছে। সাত আট দিন এই উৎসব ও আনন্দের মাঝে কাটিয়ে গীতা-ওরা সবাই যেদিন চলে গেল, সত্যি বলতে কী, সেদিন ওদের বিচ্ছেদ ব্যথায় প্রাণটা ভ'রে উঠলো। এ'কটা দিন কি মহানন্দে কেটেছে।.....চোখ দু'টো ঝাপসা হ'য়ে আসতেই ওদের দিক থেকে মুখখানা অস্ত্র দিকে ফিরিয়ে নিলুম.....। প্রাচীন্দ্র ছেড়ে যাওয়া গাড়ীর লম্বা বড়-বড় শব্দের ফাকে শুনলুম গীতা ডেকে বলেছে—সজলদা, চিঠি দিও কিন্তু। আমি যেনেই পৌছ সংবাদ দেব আগে। অনেক শুভো দিন কেটে গেছে। এর ভেতর গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ ক'রে পর পর দুটো 'ডিগ্রি' লাভ ক'রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ এম্., এ পরীক্ষা দিয়ে যখন বাড়ী চ'লে এলুম, সত্যি তখন মনে হ'লো যেন 'শরীরে আর পদাঙ্গ নেই'।.....

ভাবছিলাম এই সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের তিনটা মাস নেহাৎ চুপ্ ক'রে বাড়ী ব'সেই কাটিয়ে দেব, না একটু ঘুরে বেড়াব-এমন সময় গীতার সাহুনয় অহরোধ এলো ওদের ওখানে কয়েকটা দিন বেড়িয়ে আসার জন্তে। অবশ্য আমার ভেতরটাও যে ওদের সান্নিধ্য না চাইছিল একথা না বলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

\* \* \* \*

গীতাদের বাড়ীর বাইরের আঙ্গিনায় পা দিতেই সন্ধ্যার তরল ধূসর ছায়া সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো।

হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার দেখতে পেয়ে বৌদি ওরা একটু আশ্চর্য্য হলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য হয়নি বোধ হয় একজন যার দেখা পেলুন অনেকক্ষণ পর, যখন আমি সবার কাছে বেশ একটু পুরাণো হ'য়ে পড়লুম।

চিপ্ ক'রে আমার একটা প্রশ্নাম ক'রে গীতা বলে—আমাদের মনে আছে তো সজলদা?

হেসে বল্লুম—তোমাদের মনে না থাকার কারণ তো কিছুই দেখছি না গীতা! হ্যা, তারপর ছিলে

কোথা এতক্ষণ? অমন লুকিয়ে থাকার মানে কি? লজ্জা বোধ করছিলে বুঝি আমার সামনে আসতে?

যাঃ ধোং, তুমি ভারি ছুট্টা।—দেখলুম গীতার মুখখানা হঠাৎ লাল হ'য়ে উঠলো।

যাও, জামা কাপড় গুলো এখন ছেড়ে ফেল, আমি চা নিবে আসছি—এই ব'লে সে চলে যেতে যেতে একটু অল্পক স্বরে বলে—তোমার কাছে আবার লজ্জা কিসের সজলদা? খোলা ছাদের কোণে টবটার গোলাপ গাছে যে নূতন ফুল ফুটেছে ব'সে তাই দেখছিলুম।

সারাটা পশ্চিম আকাশ আবিরের মত লাল হ'য়ে উঠলো। অস্ত রবির দীপ্তি টুকু সন্ধ্যার আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছিল সোনালি সেই আলোর রাশি। ভাবছিলুম—

মাহুঘের জীবনে এমন কেন একটা সময় আসে যখন তার চোখে পৃথিবী, নূতন রং রঙ্গিন হ'য়ে উঠে, চাঁদের আলো ও প্রভাত বায়ু কত নূতন সাজে সেজে প্রাণে সোণালি আলো জ্বলে দেয়—আকাশের রং গভীর নীলিমায় ভ'রে যায়, বাতাস সৌরভে মূচ্ছিত হ'য়ে কাণে কত অব্যক্ত কথা ক'য়ে যায়, মায়েল, দিলসফি তখন একত্রে নীরস ও শুষ্ক ব'লে বোধ হয়।

হৃদয়ের তারে কত নূতন রাগিনী মোহন ছন্দে বেজে উঠে। তখন বুঝি সে নিজের হৃদয়মানি নিয়ে তৃপ্ত হ'তে পারেনা, তা' থেকে অপরকে কিছু অংশ দিতে ও সেই অপরের হৃদয়ের কিছু ভাগ নিতে সে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। এমন কেন হয়?

আর এ সোণার স্বপ্ন তা'কে কেন এমন অভিভূত করতে চায়? শতবার নিজের মনে প্রশ্ন ক'রে ত সে এ 'কেন'র কোন একটা মীমাংসা করতে পারলে না, তবে ইহাতে সে তার হৃদয়ের নিভৃত কোণে কিসের একটা অব্যক্ত অভাব জাগিয়ে দিয়েছে তা সে বেশ অনুভব করতে পারল।

অনেকক্ষণ এইরূপ ভেবে বাকীটি হাতে ক'রে

নিলুম। আচম্কা একটা ভারী নিশ্বাস বেড়িয়ে পড়লো।

তারপর উচ্ছ্বাসিত হ'য়ে সমস্ত প্রাণ ঢেলে বাজাতে আরম্ভ করলুম।

\* \* \* \*

গীতা নীরব উপাসনায় বাধা দিল না। সে নিশ্পন্দ হ'য়ে পিছনে দাঁড়িয়ে রইল, বেহাগের করুণ সুরে কাতর প্রার্থনা মুচ্ছনার পর মুচ্ছনা উদার ভার্য্য উঠিয়া মামিয়া তার প্রাণে এক অব্যক্ত বিষাদ করুণ ভাবের সৃষ্টি করলে, সে সুর তার কাণে যেন কত মিনতি কত আবেগ কত আকুল প্রার্থনা জানিয়ে প্রাণকে এক মোহমগ্ন বিহ্বল স করুণ মাধুর্য্যে বিভোর ক'রে ফেলল।

কৈদে কৈদে অবশেষে বাঁশী নীরব হ'ল। সুরের রেশ কিন্তু থেমে গেল না, শেষ রেশ টুকু নৈশ বায়ুর মধ্যে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, হাতের বাঁশী কোলে ফেলে স্থির শূন্য দৃষ্টিতে নীলাকাশের পানে চেয়ে রইলুম।

সুন্দরী আকাশে তখন শুক্লাষ্টমীর চাঁদ হেসে কোমুদী বিতরণ করছিল, আর আলোকের সেই ঝরণা ধারায়' জ্ঞান করতে লাগল নীচের এই ধরা-বন্ধের বিশ্ববাসী।

আমার এ নীরব উপাসনায় বাধা দিয়ে গীতা ডাকল—সঙলনা'।

এত তনয় হ'য়ে গিয়েছিলুম যে গীতা কখন যে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে—তা মোটেই জানতে পারিনি।

চমকে কিরে চাইলুম। দৃষ্টি পড়ল তম্বী, সুন্দরী গীতার চল্‌চলে পুশিত যৌবনের' পরে। হৃদয়ে যে কিসের এক মিলনের উচ্ছ্বাস-তরঙ্গ খেলে গেল।

অন্তমনস্ত ভাবে বললুম—কেন গীতা!

গীতা প্রশংসা ভরা কণ্ঠে বলল—কি সুন্দর, কি চমৎকার সুর! শুধু বাজানো নয় - তোমার এই বাঁশীর সুর মানুষকে কাঁদিয়ে তায়, তারি মিস্তি কিন্তু।

কোন প্রভাতর না করে শুধু চুপ ক'রে বসেই রইলুম। উদাস দৃষ্টি নিয়ে গীতার মুখেও কোন কথা ফুটল না। নীরবতার মাঝেই উত্তরের কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপর ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এসে গীতা সহজ কোমলকণ্ঠে বললে—কি ভাবছ সজলদা?

একটু বিচলিত হ'য়ে অন্তমনস্ত ভাবে বললুম—কই,—না! তেমন কিছু ভাবছি না ত' গীতা! তবে.....।

আগ্রহ ভরে গীতা বললে—তবে কি?—

একটু হেসে বললুম—বৌদি বলছিলেন তুমি নাকি বেশ বড় হ'য়ে পড়েছ, ঘরে রাখা নাকি আর চলে না, বিয়ে দিতে হবে তোমায়। তাই ভাবছি কোথা থেকে কোন্ দিন কে একজন সাঁঝের আলোর মিলনের গীতি গে'য়ে আলো ও উৎসবের মাঝে তোমায় আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে—তখন কি আর আমাদের কথা মনে থাকবে গীতা? আমরা যে তখন তোমার পর হ'য়ে যাব। গীতার মুখখানা হঠাৎ লাল হ'য়ে উঠে তক্ষুনি সাদা হ'য়ে গেল।

সে নীরবে খানিকক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে রইল। তারপর আমার মুখের 'পরে তার জুইটা চোখের করুণ দৃষ্টি রেখে সঙ্কোচজড়িত স্বরে বললে—তোমারাই ত আমার দূরে সরিয়ে দিচ্ছ, পর ক'রে দিচ্ছ সজলদা, এ ত আমার ইচ্ছাকৃত সাধ নয়!

তোমরা প্রকৃত মানুষ, তোমাদের ইচ্ছায় চলতে পার, কিন্তু আমরা নারী আমাদের সব-ই তোমাদের উপর নির্ভর ক'রতে হয়, প্রবৃত্তিও তোমাদের আক্ষাধীন। ভাষা থাকতে আমরা মুক, চোখ থাকতেও অন্ধ, স্রব, হৃৎথের অস্বভূতি থাকা সত্ত্বেও হৃদয় আমাদের জড়, আশা আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও প্রাণ আমাদের স্পন্দনহীন।.....

উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে ছায়ার মত-ই সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

গভীর বিষময়ে শুক্ল হ'য়ে ব'সে রইলুম। গীতার

এই কথ'গুলো ভাবতে ভাবতে প্রাণে যেন কিসের একটা অজানা পুলক শিহরণ অনুভব করলুম। আজ অতর্কিতে কোথা হ'তে এ কোন এক 'সুরের আগুণ ছড়িয়ে দিলে আমার প্রাণে'—

ঠিক এমনই সময় শুনলুম গীতা তার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাইছে—

'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে  
বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।  
এ মোর হৃদয়ের বিজ্ঞান আকাশে,  
তোমার মহাসন আলোতে বাতাসে;  
গভীর কি আশায় বিপুল পুলকে,  
কাহার পানে চাই হুবাছ বাড়ায়ে ॥'

\* \* \* \*

সেদিন যেন কী একটা উপলক্ষে কলেজ ছুটি ছিল। কর্মহীন অলস ছুপুরটা যা হোক যতীনদের বাড়ী একটু ভাস পিটিয়েই কাটিয়ে দেবো এই মনে ক'রে বেরোবার উত্তোঙ্গ ক'রতে বাবা ডেকে পাঠালেন।

অত্যন্ত বিস্মিত হলুম। এমন অসময়ে ডেকে পাঠান'র মানে ?

বাবার ঘরে ঢুকতেই তিনি বল্লেন—বসো আমার এই পাশটায় বিছানার উপর। বাবার পাশে বসে পড়তেই তিনি বল্লেন—ক'দিন ধরেই তোমার একটা কথা বলব বলব ভাবছি। জানি আমার ইচ্ছা ও মতের বিরুদ্ধে তোমার আপত্তি করবার কিছুই থাকতে পারে না। তথাপি তোমায় এখন আমার একবার রিজেক্স করা দরকার, কারণ তুমি প্রাপ্ত-বয়স্ক।

শ্রায় অস্ত্রের বিচার বোধশক্তি তোমার এখন সম্পূর্ণ আছে। বিনয় তার ঞ্চালিকা অনুকূপার মেয়ে গীতার সাথে তোমার বিবাহ প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে। তারপর শুনেছি গীতাকে নাকি তুমি বেশ পছন্দও করেছ। আর গীতাও অবশ্য তোমার গৃহ-লক্ষ্মী হবার উপযুক্ত বটে। কিন্তু আমার ইচ্ছা সংস্কার এ কার্য

হতে আমার বিরত থাকতে হল। তার কারণ শুনেছি গীতার এক মাসীমা ধর্মাস্ত্র গ্রহণ করে কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে কুলের বার হয়ে গেছে। কাজেই এই কলঙ্কারোপিত পরিবারের সাথে আমি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে বংশ-মর্যাদার গোঁরব খর্ব্ব করে দিতে পারি নে ও লোক-চক্ষে হেয় হতে পারিনি।

আশা করি এ বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া তুমিও যুক্তিসঙ্গত মনে করবে না।

নীরবে মাটির পানে চেয়ে রইলুম। এতোখানি বড় হইয়েও একদিনের জ্ঞাত বায় মুখের পানে চেয়ে সহজ ভাবে কথাটা পর্য্যন্ত বলতে সাহস পাইনি আজ কি ভাবে তাঁর এতো বড় গুরুতর আলোচনার ভেতর মাথা তুলে প্রতিবাদ করবো! সে সাহস যে আমার নেই।

কিন্তু অন্তর আমার ভেতরে থেকে থেকে বলছিল—কেন, একজননের অজ্ঞারে কী সবাই দোষী বলে সাব্যস্ত হবে, একজননের কলঙ্কের বোঝা কি অপর নির্দোষ সবাই মাথা পেতে নেবে, একের অপরাধে কী সবাই তার গুণ লালিত হবে ?

এত বড় সত্য কথাগুলো বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইলেও কী যেন অন্তরের দুর্বলতার নিপীড়নে ভেতরেই রয়ে গেল।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বাবা বল্লেন—কী চুপ করে রইলি যে ? বল, তোর কি ইচ্ছা।

তেমনি মাথা নীচু করেই ধীরে ধীরে বল্লুম—ওসব আমার জিজ্ঞেস কচ্ছেন কেন ? আপনি বা ভাল বুঝবেন তাই হবে, এবং তাই আমি মাথা পেতে নেব।

তিনি বল্লেন—বেশ, তা'হলে তুমি এখন যেতে পার।

বেশ অনুভব করলুম বাবা যেন কী একটা গুরুতর সমস্যা থেকে অনেকটা হালকা হয়ে পড়লেন।

দীর্ঘ পাঁচটা বছর কেটে গেছে।

মাথার উপর দিয়ে কত ঝঞ্ঝা, বিপদ বয়ে গেছে। মা নেই অনেক দিন। স্নেহময় পিতার আদরে মা'র স্মৃতি প্রায় ভুলে গিয়েছিলুম, কিন্তু তিনিও যেদিন আমার সকল বন্ধ ও চেষ্টা বিফল করে দিয়ে চ'লে গেলেন কোন অজানার ডাক শুনে।

মনটা যেন কেমন উদাস হ'য়ে উঠলো। কিছুই যে আর ভাল লাগে না। চতুর্দিক যেন নীরস বিশ্বাদ!

পুরানো বৃদ্ধ ম্যানেজার হরিদাস'র উপর জমিদারীর ভার দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম .....।

এখানে সেখানে ঘুরে পুরী স্বর্ণহুয়ারে সাগরের ঠিক উপরেই একখানা বাড়ী নিয়েছি—নিঃসঙ্গ জীবনটা কোন রকমে কাটিয়ে দেবার জন্তে।

\* \* \* \*

টেবিলটার উপর রূপোর ফ্রেমে আঁটা গীতার ফটো খানার পানে চেয়ে ভাবছিলুম—যে কোন দিন কিছু পেলো না, জীবনের বোধন মগ্ন ধামতে না ধামতেই যার বিসর্জনের রাগিণী বেজে উঠলো তার এই হারানো স্মৃতির স্মৃতির সম্বল টুকুও যে তার নেই! এই ছোটো দিনের জীবনে যে পেয়ে হারানোর ব্যথা স্বচ্ছায় বুঝ দিয়ে গ্রহণ করলুম সে ব্যথার পূজার কবে সমাপন হবে! আজ যে এ 'ব্যাকুল বাদল সাঁঝে' আমি নিতান্ত নিঃস্ব—রিক্ত ও বাধন-হারা।

ছন্দয়ের কোণ থেকে কে যেন ব'লে বসলে—ইচ্ছে করলেই ত তুমি তাকে পেতে পারতে, ইচ্ছে করেই ত তুমি তাকে হারিয়ে ফেলেছ, সে ত তোমারি স্মৃতির পানে চেয়ে ছিল, সে যে তোমায়ই চাইছিল .....

আর ভাবতে পারলুম না। উদাস দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। আর ব্যথাতুর মনটা ভেসে গেল সীমাহীন দিগন্তের পানে।

বিয়ের এক বছর না যেতেই নিরাভরণা গীতা যেদিন সাদা থান পরে এসে উপস্থিত হ'লো সেই যে হঠাৎ তার বাবা বুকে বেদনা পেলেন তাতে তাঁকে শয্যা গ্রহণ করতে হ'ল।.....

ক্রমাগত ছয় মাস অনেক চেষ্টা বহু সত্বেও রোগের কোনরূপ উপশম দেখা গেল না। অবশেষে ডাক্তার মত দিলেন, সাগরের উন্মুক্ত নিশ্চল বায়ু গায় লাগাতে। অনেক জল্পনার পর ও বাড়ীর সকলের অহুরোধে বিজন বাবু পুরী যাওয়াই স্থির করিলেন।

\* \* \* \*

ভাল লাগে না—ওগো, আমার যে আর কিছুই ভাল লাগেনা.....। দিন দিন অন্তর্বেদনা যে আমার পাগল করে তুলছে.....আজ কত দিন তাকে দেখিনি—কোথায় সে—কে জানে?

তা'কে যতই ভুলতে চেষ্টা করছি ততই যে তার স্মৃতিতে ঝড়িয়ে পড়ছি . . . .।

সে তো আমার চায়নি। তবে তার এই না-চাওয়ার ভেতরেও তার জন্তে প্রাণে আমার এ ব্যাকুলতা কেন? কে সে আমার!

কথাটা মনে করতেই গীতার চোখ, ছোটো অশ্রু-পূরিত হয়ে উঠলো।

না, না—সে যে আমার—আমার দেবতা, আমার প্রিয়। আমার অশ্রুট প্রেম কাকলী যে তারই পরশে বিকসিত হয়ে উঠেছে—সে যে আমার ভাল বাসতে শিখিয়েছে। এ তৃপ্ত বিক্ষুব্ধ হিয়া যে এখন ও তারি জন্তে কেঁদে কেঁদে মরছে। আমার সর্বেশ্বর যে তাকে পেতেই উন্মুগ্ন হয়েছিল! তবে আমি কেমন করে তাকে চেষ্টা ফেলব! . . . . .

নারী আমি সব কথা শুনিবে ব'লবার মত শক্তি যে আমার নেই! তাই বুঝি আমার পরিচয় একটুও পেলো না। অভিমান হ'লো—আমার আর তোমার করে নিলে না।

ওগো অভিমানী, ওগো আমার দয়ীত, কতখানি যতনা যে এ ব্যর্থতা আমার দিচ্ছে তা বুঝতে পারছ কি?

উঃ.....মাগো, আর যে পারি না আমি। বল, ওগো—কত কাল, কত যুগ এমনি ক'রে তোমার চাওয়ার প্রতীক্ষায় ব'সে থাকতে হবে!

গীতার চোখ ফেটে অশ্রুর বন্যা বইল। সে গৃহে একা অনেক ক্ষণ কঁদে কাটালে। তারপর নিজেকে শাসনা দিয়ে চোখ মুছে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো। একটা তপ্ত নিশ্বাস তার অন্তর থেকে বেরিয়ে বাতাসে মিশে গেল।

সন্ধ্যা তখন তার কালো শাড়ীর আঁচল খানি বিছিয়ে দিলে সারাটা জগতের উপর। মলয় হাওয়া যেন বিরহে উত্তল হ'য়ে মৃদু লঘু ভাবে সারা বিশ্বে ঘুরে মরছিল কোন প্রিয়ার সন্ধানে। বসন্ত-বিরহ-কাতর কোকিল কঁদে কঁদে অস্থির হচ্ছে। গীতা একমনে লঘু মৃদু চরণ ক্ষেপে সাগর পারে হেঁটে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎ দিগন্ত কাঁপিয়ে কার এ করুণ উদাসবাঁশীর সুর তার কাণে পৌছে বুকের ভেতর কার চাপা ব্যথা আগিয়ে তুললে!

এ যে সেই বাঁশী! সেই যৌবন প্রভাতে প্রথম দেখা তার সাথে—প্রথম শোনা তাঁর বাশা। তারপর কত ঝিল্লি মন্দ মুখরিত রাত, কত সাঁঝের বেলা, কত অলস শ্রম-ক্লান্ত ছপুরে সে ঐ বাঁশীর আকুল উচ্ছ্বাস শুনে প্রাণে কত আকুলতা অনুভব করেছে।

কৌতূহলী গীতা সেই সুর লক্ষ্য ক'রে চলল। সহসা তার গতি রুদ্ধ হয়ে গেল—এ কী.....!

অতি কাতর ও করুণ স্বরে সে ডাকলে—সজল দা।

বাঁশী বাজানো তখন আমার শেষ হয়েছিল। হঠাৎ এ কার কণ্ঠস্বর এই নির্জন কান্ডারে? মুখ ফিরে চাইলুম—শুভ্র-বসনা, মূর্তিমতী বিবাদিনী।

বিশ্বয়ের মাতা অনেকটা কমে আসতে সহজ স্বরে বললুম—এ কী গীতা?

গীতা দীর্ঘ সংযত স্বরে বললে—খুব আশ্চর্য্য হচ্ছে সজল দা, না! কিন্তু তোমরা আমার আহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইলেও আমার কিন্তু আবার তোমাদের কাছেই ফিরে আসতে হলো। কী করি বল!

চোখ দুটো ভারী হ'য়ে এলো। গলার স্বরটা কেমন ধরে গেল। ধরা গলায়ই বললুম—আর কেন গীতা, জেনে শুনে যে স্বেচ্ছায় দুঃখকে বরণ করে নিলে, অনাহৃত রিক্ততাকে যে সাদরে হৃদয়ে গ্রহণ করলে সে যে অন্তর জীবনে সার্থকতা ফুটিয়ে তোলবার মত শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারে নি। আমার ক্ষমা কর গীতা, ভুলে যাও সে সকল।

গীতা মাথা নীচু ক'রে বললে—আমিও কিন্তু এখন সেইটেই ইচ্ছে করি সজলদা। কিন্তু ভুলে যেতে পারছি না ব'লেই ভাবছি ভালবাসায় বুঝি দুঃখ আর কান্না ছাড়া কিছুই নেই। তা নয় তো পিছনে এই যে একজন নিজের বুকের গোপন ব্যর্থতার বেদনা টুকু নিয়ে সারা জীবনটা কঁদে কঁদে ম'রবে তার অপরাধ কোথায় সজল দা? যার পানে একবার কেউ ভুলেও ফিরে চাইলে না! যাক—আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তবে আর কোন দিন তার সাথে তোমার দেখা হয় এ তার এখন মোটেই ইচ্ছে নয়।...

\* \* \* \*

সে চলে যেতেই ডাকলুম—গীতা!

সে তেমনি চলে যেতে যেতেই মুখ ফিরে শুধু একবার চাইলে। দেখলুম—চোখ দুটো তার কান্নায় ভরে উঠেছে।

## বিশ্বসৃষ্টি শ্রীচিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায়

সমাপ্ত হইল যবে সর্ব আয়োজন,  
কঠিন ধরণী-পৃষ্ঠে লতা, গুল্ম, বন  
সহসা শ্যামল শোভা করিল বিস্তার।  
পর্বতের বক্ষ ভেদি তীব্র শ্রোতধার  
বহিল বিপুল বেগে ; শস্য, ফল, ফুল।  
সে ধারায় শ্রাণ পেয়ে ভরিল দু'কুল।  
জলে স্থলে লক্ষ লক্ষ জনমিল প্রাণী ;  
তারপর কে আসিবে করে কাণাকাণি  
দেবতা মণ্ডলী—

এই ধরণী—বিশাল

সুধু কি পশুর ভোগ্য রবে চিরকাল ?  
আশাহীন, ভাষাহীন, জড়-পিণ্ড-প্রায়  
চিরদিন সুধু শ্রীতি আহারে নিদ্রায়।  
অনাদি, বিজ্ঞানময় বিধাতার কর  
সৃজন করিল যেই আত্মা অনখর,  
সে কি এই পশু, পক্ষী, কীটের ভিতরে  
আবদ্ধ হইয়ে রবে চিরদিন তনে ?  
নহে, নহে,

সৃষ্টি হোক আর একদল—

সর্বজীব অধিপতি, সুন্দর, সবল,  
কমনীয়, সুখপ্রিয়--কিস্তি নিরলস,  
ভোগ-অভিলাষী—নহে রিপু-পরবশ ;  
পরাক্রান্ত, তবু ক্ষমাশীল ; অভিমানী,  
তবু সহ্যে ধীরভাবে শত শত শ্রানি  
আশ্রিত রক্ষণে ; মহীয়াণ্ড, গরীয়ান্।  
স্বর্গরাজ্য হ'তে আরো শ্রেষ্ঠতর স্থান  
করে আকিঞ্চন। জ্ঞানে, ধর্মে, তপস্যায়  
বিধাতার ভূল্য যারা সদা হ'তে চায়  
বিভূতি, বৈভবে।

———সৃষ্টি হলো নর, নারী

আদি পিতা, আদি মাতা—কিশোর, কিশোরী।  
প্রকৃতির নব শিশু, সুন্দর, সরল,  
প্রতি পদক্ষেপে ঝড়ে লাবণ্য তরল ;  
অঙ্গে অঙ্গে আনন্দের কিবা কোলাহল !  
এখনো করে নি পান তীব্র হলাহল  
বাসনার। সুখ স্বপ্নে মগ্ন সদা রয়,  
ভবিষ্যৎ জ্ঞানহীন, নিশ্চিন্ত, নির্ভয়।  
সুগঠিত, নগ্নব্ধ, নাহি লজ্জাশেষ,  
নাহি আবরণ ; সুধু অবিশ্রান্ত কেশ  
গুচ্ছে গুচ্ছে পৃষ্ঠে, বক্ষে অপূর্ব প্রথায়  
খেলে লুকোচুরি যেন সর্প-শিশু-প্রায়  
প্রথম প্রভাতে।

তরুণ অরুণ করে—

জ্যোতিঃ সূৰ্ত্তিমতী হয়ে দিক্ আলো করে,  
নন্দন-কানন সম বন-প্রাস্তভাগে।  
যুগল সুরতি ঘিরি যেন বা সোহাগে  
শেফালী, বকুল ঝড়ে ; মলয় পবন,  
কি এক মোহের স্বপ্ন করিছে বপন।  
দয়েল, কোকিল, আর পাণ্ডুর তান  
করে নব বসন্তের আগমন গান।  
শাখে শাখে পাখী, বনে যুগ যুগীগণ  
যুগলে যুগলে করে প্রেম আলাপন  
মুখে মুখ রাখি ;

ফুলে মধুপান করে

আত্মহারা মত্তভূজ গুণ গুণ স্বরে।  
সহসা হইল বন চঞ্চল মুখর।  
অমুরাগে ধরে আসি কিশোরের কর  
সুন্দরী কিশোরী। রোমাঞ্চিত কলেবর  
আবেশে অবশ হয়ে কাঁপে থর থর।

অজানিত কি প্রচণ্ড স্রুতের প্রবাহ  
শিরায় শিরায় বহে। বিধে অহরহ  
সৃষ্টি-বীজ পুষ্ট করে যেই আকর্ষণ,  
আজি হ'তে হলো তার প্রথম গঠন।  
প্রিয়া-মুখ দেখে নর অতৃপ্ত নয়নে,  
বাঁধে বন্ধঃ মাঝে তারে নিবিড় বন্ধনে

চির জীবনের তরে।  
করে আয়োজন  
আপনারে নানারূপে করিতে সজ্জন।  
আদি পিতা, আদি মাতা সেই সৃষ্টি দিয়া  
পুত্রকন্যারূপে বিধে রয়েছে বাঁচিয়া।

## পারের খেয়া

( নক্সা )

ত্রি.....

অদূরে পাহাড়ের পর পাহাড় আর আঁকা বাঁকা  
নদীর তীরে ঘাসে ঢাকা পথের রেখা ;—তারই ধারে  
খেত পাথরের বড় বাড়ীটা।

ভোরের হাওয়ায় ভেসে সে কোকিল পাখির  
প্রাণমাতানো সুরের রেশটুকু। জেগে ওঠে—দোল  
দেওয়া গাছের পাতায় পাতায় বসন্তের আকুল করা  
শিহরণ—চুমু খেয়ে যায় কুয়াসাকাটা সূর্য্যের তরুণ  
আলো—প্রাণ মেতে' যায় ঝরা শিউলির অফুরন্ত  
সুবাসে। পাগল হাওয়ার পরশ লাগে ছোট নদীর  
বুকের উপর—নেচে যায় ছোট ছোট ঢেউগুলি  
তালে তালে।

চারদিকে যখন এমনি বিচित्रতা—ঘুম-ভাঙ্গা  
আঁখি নিয়ে সে জাগলো বিভোর বিহ্বল আত্মহারা  
হ'য়ে।

সে ধীরে ধীরে বসলো যেয়ে ঝর্ণার পাড়ে, বেলি  
ঝরের পাশে একখানা পালিশ মর্ষরের উপর—উদাস  
ভাবকের মতো।

ভোরের হাওয়ার মাতামাতি নূতন আলোর স্নিগ্ধ  
কিরণ আর পাতার কাঁপুনি দেখলো। পাখীর  
গানের নহ'বৎ ঝর্ণার ঝর ঝর, পাতার ঝির ঝির  
মন দিয়ে শুনলো—

পাগল হ'য়ে উঠলো, অস্থির হয়ে গেল, কোন  
অজানার ব্যাকুল করা ডাকে।

রৌদ্রের তাপ বেড়ে যেতে সে চলে এলো সেখান  
থেকে। তারপর ফুল কুড়ালো মালা গাথলো, ছপ্পরের  
জমাট-বাধা নিস্তরক গুঁমট যখন বাহিরের পিঠ পোড়ান  
রৌদ্রের দোলায় চড়ে সংহার লীলা আরম্ভ করলে—  
পারলো না সে তখন তার চিন্তার ধারা ঠিক রাখতে,  
সব এলোমেগো হ'য়ে গেল।

ভোরের আলোর মধুর পরশে—ফল ফুলের  
পশরায়, পাখীর গানে, ঝর্ণার আকুল শিহরণে প্রাণে যে  
কোমলতা পেয়েছিল—তা এখন রুদ্র কঠোর হ'য়ে  
উঠল বাহিরের রৌদ্রেরই মত।

সে যেয়ে ফুলগুলি ছিড়ে দিলে—ডালগুলি মুচুড়ে



দিলে, কোকিল পাপিয়াকে টিল ছুড়ে তাড়িয়ে দিলে..... ।

রোদের তেজের নেতিয়ে পড়া ফুলগুলি আবার বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়ার শীতলতা পে'য়ে সজীব হ'য়ে উঠল। ঘর ছেড়ে যাওয়া পাখীর দল আবার গাছের পাতার আড়ালে ব'সে নূতন সুরে গান ধরলো—করণ কোমল সুর।

এবার আর ভোরের মত জাগিয়ে দেওয়া গান নয় কর্মরাস্তা বিদায় বেলায় অবসাদের গান। প্রভাতের সোনালী আলো রূপের রুদ্রমুর্তি ছেড়ে আবার আপনার কোমলতা ফিরে পে'ল।

তা'র মনও কেমন হ'য়ে গেল। প্রকৃতির সাথে সাথে সেও যেন কোমল শান্ত হ'য়ে এল। সে গিয়ে জু'ই কেমার মালা গাঁথল। মনে হল তা'র আর সময় নেই। বিদায়ের গান যেন গুমুরিয়ে উঠছে প্রকৃতির প্রত্যেক ভিনিষের ভেতর দিয়ে ভাষাহীন নীরব সঙ্গীতে..... ।

.....সে হেঁটে গেল পাহাড়ের কাছে-হৃদয়ের ভক্তি অর্থা দিয়ে গাঁথা মালাগুলি হাতে ক'রে। সে আজ এসেছে বিদায়ের পূর্বে এগুলি পাহাড়ে নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিতে।

কারণ সে ভাবলো হয়ত তা'র এই ভেসে যাওয়া অর্থাৎ একদিন আকাশ-চুম্বী সাগরের সেই সীমাহীন নিগন্তে তা'র দেবতার কাছে গিয়ে পৌঁছবে।

.....নদীর জলে সে তা'র মালাগুলি ভাসিয়ে দিল। স্রোতের অমুকুলে মালাগুলি ভেগে চললে সাগর অভিসারে। সেও আপন কুটরে ফিরে এল..... ।

\* \* \*

পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্যের শেষ আলোটুকু বখন মুছে যাচ্ছিল সে দেখলে, দূরে সমুদ্রের পাড়ে খেয়ারী তার আপন নৌকা বোঝাই কর'ছে।

সে পাগলের মত ছুটে বেরুল, এ খেয়ায় না গেলে যে তা'র আর আজ যাওয়া হবে না! .... ।

যৌদের শেষ বলক তখন আকাশের কোণ থেকে একেবারে মুছে গে।

সমুদ্রের পারে ছোট একখানি খেয়া- একজন খেয়ারী মাঝি, নৌকায় আর একজন হ'লেই এ খেয়া চলে যাবে অকুল সমুদ্রের অজানাভীরে... .. ।

সন্ধ্যার কালো ছায়া বনিয়ে এসেছে, পাখীর কোলাহল থেমে গেছে। শুধু বাতাসের হুহু শোনা যায়।

এক যাত্রী—সে বায়ুর বেগে চলেছে—খেয়া ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় সে ঘাটে এসে প'ড়ল... । খেয়া চলেছে, উঃ—তার কি আনন্দ!

বুক তা'র ভ'রে গে'ছে অপার্থিব আলোকের পরশে—ঐ 'মহাসিদ্ধুর ওপার থেকে ভেসে' আসা স্বর্গীয় সঙ্গীতের লহরে, চেয়ে রই'লে নির্নিমেষে সে অজানা ভীরের যাত্রীর পানে।

জ্যোৎস্না জাগলো তা'র স্নিগ্ধ মধুর আলো নিয়ে..... ।

খেয়া নৌকা কিন্তু তখন অনেক দূর চলে গেছে।

## সৈনিকের চিঠি

( চ )

... ডেলী, ফ্রান্স ।

২৪শে আগষ্ট, ১৯১১

সকাল ।

প্রিয়তমা, মানসী আমার !!!

গত চিঠিতেই জানিয়েছি কোথায় এসে পৌঁছেছি । এই উপত্যকার নাম আমি জানি নে । তাই লিখলুমও না । তুমি যে এতে আমাকে একটা আহাম্মক ভাব্বে তা' বেশ বুঝতে পারছি । কিন্তু পরের কাছে আহাম্মক বনতে যাওয়ার চেয়ে, তোমার কাছে আহাম্মক বনব এতে আমার মোটেই দুঃখ নেই ।

আমি যেখানে আছি সেখানে শত্রুরাও ময় আস্তানা ফেলে বসে আছে । আমাদের তাই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে । তারাও কিন্তু কম হসিয়ার নয় । সন্ধ্যোগ বুকে, তারাও আমাদের কম জ্বল করে নি ।

বাপরে ! বন্দী হয়েছিলুম আর কি, যদি না লুইস গানটা' কাছে থাকত । মিনিটে ছ' আউন্স করে গুলী ছুড়ে ওদের আর অগ্নসর হ'তে দিই নি । তারা কিন্তু প্রায় আমাদের কেম্পের ( Camp ) উপর এসে পড়েছিল । যা'হুক্ এবারকার মতো কোনো রকমে বন্দী হতে হতে বেঁচে গেলুম ।

মেজর সাহেবকে সব খবর জানালুম । কয়েকজন এখানে পাহাড়া রেখে আমাকে আবার তাঁর ওখানে ফিরে যেতে হুকুম করেছেন ।

তাই এখানে ফিরে এসেছি ।

—এইমাত্র ডাক এসেছে । ডাক রাত্রেই আসে আজ কি কারণে সকালে আসতে বাধা হয়েছে । গোলাগুলি যে গাড়ীতে আসে, সেই গাড়ীতেই ডাক আসে কি না । আজ এই বিলম্বটুকু সৈনিকদের

ভেতর কি যে একটা অবসাদ এনেছিলো তোমাকে লিখে বুঝাতে পারব না—তুমিও হ্রস্ত বুঝতে পারবে না । কার্কালিক এমিড্ গায়ে পড়লে, সাপ ঘেমন এলিয়ে পড়ে আমাদেরও সেই অবস্থা হয়েছিল অনেকটা । আমাদের দেহ যেন কেমন অবশ হয়ে পড়েছিল ।

সব্বাই কেবল, কখন আসে কখন আসে এই রকম করে ঘর বার হচ্ছিল । যেই মাত্র গাড়ী এলো ছড়্, ছড়্ করে সব ছুটে বেরিয়ে গেলো ।

এই যে সময়টুকু—এর জন্তে যে আমাদের কতটুকু আগ্রহ, কত ব্যাগ্রতা,—তা তুমি বুঝবে না । যদি বুঝতে তবে— । থাক্, সব এক লাইন করে দাঁড়িয়ে গেছে—মাটির নীচে গর্ত পর্যন্ত । সব গোলাগুলি ওখানেই জমা হয় কিনা, সব নামানো হচ্ছে—হাতে হাতে গর্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে । কারণ, গোলাগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না গর্তে জমা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত mail bag খোলা হবে না । তাই সন্ধ্যাই মিলে, মিলে, তাড়াতাড়ি সব নামিয়ে নিচ্ছে ।

যেইমাত্র শেষ গোলাটি গর্তে জমা হল, অমুনি সকলে সার্জেন্ট মেজরের হলের দিকে ছুটল । যাদের চিঠি আসার কথা তারাও ছুটে,—যাদের আসবে না জানে, তারাও যায়, যদি কেউ লিখে থাকে—আর যাদের কোন দিনই আসেনা, আজো আসবে না তারাও যায়, কি জানি, যদি এ ছাড়াছাড়ির বেলায় হঠাৎ কেউ মনে করে থাকে ? উঃ কি হুড়াহুড়ি, আর কি ব্যাগ্রতা !

সার্জেন্ট মেজর একে একে নাম পড়ে যেতে লাগলেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড bag সব শূন্য হয়ে গেলো। ধীরে ধীরে সকলে চলে গেলো। আবার সেই স্থান নির্জন হয়ে উঠল। কেবল যাদের চিঠি আসে নি, তারা দাঁড়িয়ে রইল কি জানি হয়তঃ bagএর মধ্যে ছু একটা রয়ে গেছে। সার্জেন্ট মেজর সব bag গুলো আবার উল্টিয়ে ঝেড়ে দেখলেন। নেই কারো কিছু নেই। আজকের যত পথ চাওয়া সকলেরই ফুরালো।

তুমি হয়ত জিজ্ঞেস করবে সৈনিকরা কেন আগে মালপত্র নামিয়ে নিতে ছুটে যায় ?

কেম যায় জান ? আমাদের নিয়ম যতক্ষণ না শেষ শেলটি গর্ভে জমা হবে ততক্ষণ mail bag খোলা হবে না। যত বিলম্বই হোক, — নির্ঝিরে সব গর্ভে না পৌঁছান পর্যন্ত প্রণয়িনীর, বন্ধুর, মায়ের, প্রিয়তমা পত্নীর, ছেলে মেয়ের সকলের চিঠি খলিতেই আবদ্ধ থাকবে। এখানে কোন ওর আপত্তি খাটে না— অর্থাৎ আমাদের মোটেই সব্ব করবার ঐধ্য থাকে না। তাই আমরা গোলাগুলি নামিয়ে নিতে ছুটে বাই যদিও আমাদের কাজ তা' নয়।

তুমি ভেবো না যে, আমিও সাধারণ সৈনিকদের মতো ছুটে যাই। তা' হবার উপায় মেই। কিন্তু আমার প্রাণ চায়, যদি অন্ততঃ এই সময়টুকুর জগ্গেও আমি সাধারণের মতো হ'তে পারতুম।

আমার চিঠি আদালীতে এনে দেয়। আমি কিন্তু মোটেই সেই সময়টুকু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারিনে। কেবল ছুটফুট করতে থাকি। সময় সময় নানা অছিলায় বেরিয়ে দেখি আদালীটা আসছে কি না।

এইমাত্র আদালী ডাক দিয়ে গেলো। নিম্নেই সব কটা চিঠির উপর চোখ বুলিয়ে গেলুম,—কিন্তু আমার সব চেয়ে পরিচিত মানুষটির কোন চিঠি নেই দেখলুম। বড্ড হুঃখ হল। তোমার নিষ্ঠুরতাকে গাল না দিয়ে থাকতে পারলুম না। আমার যে কত কষ্টে দিন কাটছে, তা' কি বুঝনা, তুমি কেন

বুঝে না ? আমার এক একট মিনিট যেন এক একটা ঘণ্টা বলে মনে হচ্ছে।

এতক্ষণ বসে ভাবছিলাম, তোমার চিঠিটা কতবার পড়ব হয়ত শুধে শেষই করতে পারব না। আর যে সব জায়গা খুব ভালো ঠেকবে, সে সব জায়গা কত শতবার পড়ে ফেলব—কষ্টই করে ফেলব,—আর সময় সময় আরুত্তি করব। কিন্তু আমি ভুলেই গিয়েছিলুম, যে—অতবড় সৌভাগ্য নিয়ে আমি জন্মি নি।

সবাই চিঠি নিয়ে বসে গেছে—অংশু যারা যারা পেয়েছে। আর যারা পায় নি, তারা কেউ শুয়ে আছে,—আর কেউ বন্ধুর চিঠি পড়েই নিজের অভাবটুকু পূরণ করছে। আমি একবার চোখ তুলে ওদের দিকে তাকালুম। কণকালের জন্তে যুদ্ধের সব হান্ধামা খেমে গেছে সবাই যেন মুহূর্তের জন্তে স্থিতি শাস্তি ও স্নেহের কোলে ফিরে গেছে।

আজ প্রায় সবাই ছু একখানা পেয়েছে। সবচেয়ে বেশী পেয়েছে Daluni (ডেলুনী)। তার পত্নীর কাছথেকেই পেয়েছে তিনখানা। বছর তিন আগে, অর্থাৎ যুদ্ধের কিছু আগে তাদের বিয়ে হয়। কিন্তু বেচারী তার প্রিয়তমাকে নিয়ে হানিমুন (Honey moon) খেলার অবসর পায়নি মোটেই। সে যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে বিয়ে করে এসেছে কেন জান ? তার ভয় যদি যুদ্ধ শেষে গিয়ে তাঁকে না পায় ? মিলনটাও তাদের খুব আশ্চর্য রকমের এবং বেশ রোমান্টিক।

অবশ্য, বেচারী মরণকে বড্ড বেশী ভয় করে—কিন্তু সমুখ বিপদে কখনো পিঠটান দেয় না। অস্ত্রাশ্র বীরের মতো সেও এগিয়ে চলে। সে ভীক মোটেই নয়। সে আমাকে খুব ভালোবাসে, তাই তার প্রেমের কথা সব আমাকে বলেছে। তোমারও হয়ত বড্ড সাধ হচ্ছে জানতে, নয় ? আচ্ছা বলছি তা হলে।

'জুলী' (Jully) সঙ্গে আমার দেখা এক 'হোটেল পেভিলনে'। (Hotel pavillon) জুলী ছিল সেখানে একজন সিগারেট বিক্রেতা। সেখানে

সে একাঠ ছিল না। স্বত বিক্রেতা ছিল সকলেই ছিল মেয়ে—সুন্দরী যুবতী। সে একটি কোনে ক্রেতার আশায় বসেছিল। প্রথমে কিন্তু কেউ তাকে লক্ষ্যও করেনি। কিন্তু যখন তাঁর দিকে সকলের চোখ পড়ল, তখন আর কেউ অস্ত্রের কাছে যেতে চাইল না। ইস্! তাঁর দোকানে কি ভিড় জমে গেলো। সত্যি, সেখানে তাঁর মতো সুন্দরী আর কেউ ছিল না। সুন্দরের একটা আকর্ষণী শক্তি আছে কি না, তাই বোধ হয় সব সেখানে জড় হচ্ছিল। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কেউ বেশীক্ষণ সেখানে থাকতে পারছিল না। কিন্তু আবার কোনো কিছু নেবার অহিলায় ফিরে আস্ত—মিষ্টি আলাপ জমাবার চেষ্টা করত।

আমি যখন সেখানে গেলুম, তখনও বেশ ভিড় ছিল। আমাকে সে হেসে অভিনন্দন জানালে। এতে সেখানকার সকলের চোখে মুখে একটা বিহ্বল খেল গেলো। সব চেয়ে বেশী বিমর্ষ হ'ল 'ফিলিপ' (Phillip)। পরে জানতে পেরেছিলুম, 'জুলী' সাথে নাকি 'ফিলিপের' কোর্টসিপ্ চলেছে। যাক, আমি যে তাঁকে তক্ষুণি ভালোবেসে ফেললুম, তা তোমাকে না বললেও হয়ত বেশ বুঝতে পারছ। কিন্তু অজ্ঞাতদের মতো আমাকেও ভদ্রতার খাতিরে চলে যেতে হলো—যদিও তক্ষুণি আবার সিগারেট কিনবার অহিলায় তাঁর কাছে ফিরে এসেছিলুম। সিগারেট দেবার সময় আমার মুখের দিকে চেয়ে দিচ্ছিলেন গিয়ে তাঁর হাত আমার হাতে ঠেকে গেলো। অল্পভব করলুম, তাঁর হাত যেন একটু কেঁপে উঠল। আমাকে ভালোবাসার দরুণ যদি তাঁর এ রকম হয়ে থাকে, তবে—

যাক আমি চলে এলুম। পরদিন তাঁর আমার আবার দেখা—এক নাচের মজলিসে। তাঁর সাথে যে 'ফিলিপ'ও ছিল, তা' হয়ত না বললেও বেশ বুঝতে পারছ। 'জুলী' আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে অভিনন্দন জানালো এবং আমার সাথেই একটা কোঁচে বসে পড়ল। বিদায়-বেলা, সে

আমাকে পরের দিন তাঁর বাড়ীতে সাক্ষ্য ভোজনে উপস্থিত থাকতে অহুরোধ করে গেলো। আমি কিন্তু মোটেই আশ্চর্য হই নি, কারণ আমার বিশ্বাস আছে যে,—সে আমার, সে আমার হবেই—যদি তাঁকে সত্যি ভালোবাসতে পারি।

আমাদের আশে পাশে আর যে ছ-চারজন তরুণ যুবক বসেছিলেন, তারা 'জুলীর' সাথে এলোমেলো আলাপ জমাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু 'জুলী' তেমন করে তাদের সাথে যোগ দিচ্ছিল না।

পরদিন আমি কিন্তু সময় হবার আগেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলুম। সে আমাকে অভ্যর্থনা করে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলো। বাসন্তী রংয়ের পোষাকে, সে সেদিন সজ্জিত হয়েছিলো, মাথায় একটা মথ্মলের টুপী বাঁকা করে বসান ছিল এবং তাতে তাঁর সৌন্দর্য আরো বেড়ে উঠেছিল। কি বলব, সেদিন কি অপূর্ণ বেশে তাঁকে দেখেছিলুম—আর কত সুন্দর তাঁকে দেখেছিলুম! আমি ভুলেই যাচ্ছিলুম যে সে 'জুলী' বসন্ত-রানী নয়! সবচেয়ে সুন্দর লেগেছিল তাঁর তরুণ চোখের চক্কল চাহনী। আমার মধ্যে যেন সে চাহনী বসে যাচ্ছিল—আর আমার তরুণ বুকে শিহরণ এনে দিচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য হলুম এই জন্তে যে, সেদিন 'ফিলিপকে' সেখানে দেখতে পেলুম না।

ভোজ-শেষে যখন ফিরে যাচ্ছি, তখন রাত দশটা হয়ে গেছে। 'জুলীদের' বাগান পার হ'তে যাচ্ছি, হঠাৎ গুলী খেয়ে পড়ে গেলুম। শব্দ শুনে জুলীরা সব ছুটে এলো, আমাকে তাঁদের বাড়ী নিয়ে গেলো এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমি আমার লুণ্ণ জ্ঞান ফিরে পেলুম—অবশ্য ডাক্তারদের ঐকান্তিক যত্নের ফলে। গুলী আমার পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল তাই বেঁচে গেলুম।

পরে জেনেছিলুম ফিলিপ জুলীকে হারাবার ভয়ে আমাকে এ ছুনিয়ার কাছ থেকে বিদায় দিতে চেয়েছিল। অবশ্য জুলীও যখন এ খবর শুনল তখন থেকেই 'ফিলিপের' সঙ্গে সমস্ত সখ্য ছিন্ন করে দিলো।

এতে 'ফিলিপ' আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং আমাকে বিপন্ন করবার সুযোগ খুঁজতে লাগলো। কিন্তু ভগবানের অমুগ্রহে আমি আর বিশেষ কোনো বিপদে পড়িনি; কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা—আমার ঐ আঘাতই আমাকে জুর্নীর স্বপ্ন জর করবার সুযোগ করে দিলো। শেষে আমাদের মিলন হয়ে গেলো। যুদ্ধে চলে আসার বেলায়ও 'জুর্নী' সেই বাসন্তী রংয়ের গোবাক পড়ে মঞ্চমলের টুপীটা উড়িয়ে আমার বিদায় দিয়েছিল।

সত্যি ডেলুনীর সুখে আমার বড্ড হিংসা হয়। আজ আমারও যদি এমনটি হ'ত, তো কত সুখী হতুম জীবনে। তার মত চিঠি পেতুম। জুর্নী যেমনি ভাবে তাকে চলতে বলে, তুমিও তেমনি করে আমার আদেশ দিতে, আমি চলতুম, বুকভরা সাহস নিয়ে চলতুম।

কিন্তু তা'তো হ'বার নয়! আচ্ছা—তা না হলেও তো আমরা একজন আরেক জনকে ভালোবাসি—খুব ভালোবাসি! আমাদের চিঠি লিখতে দোষ কি? দোষ যে কিছুই নেই, তা' তুমিও বেশ বুঝ কিন্তু তবু কেন লিখ না? অবসর মেলে না? অত কি কাজ থাকো রাগী? কিসে ব্যস্ত থাক? লেখাপড়া? সেলাই? না হাঁসপাতাল duty? কন্সট? ওঃ—সত্যিই তো তোমাকে টের কাজ করতে হয়!

ঐ যাঃ—ভুলেই গেছলুম যে তোমার 'ভৃগু' বেড়ালটা তিনটে বাচ্চা দিয়েছে—তাই নিয়েই তুমি ভয়ানক ব্যস্ত! ভগবান করুন, ওগুলো শীগগীর মরে যাক। না না—বেচে উঠুক,—শীগগীর বেড়ে উঠুক। বাপরে! মরলে হয়ত আর কলমই কালীতে ভিজবে না—তা' আমার খেয়ালই ছিল না।

হাঁ—একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। 'ডেলুনী' আমার বলে কি জান? সে বলে যে জুর্নীর মতো সুন্দরী সুনিম্ন আর কেউ নেই। তাঁকে যে দেখবে সেই তাঁকে পেতে ব্যগ্র হবে। পাগল আর কি! ও জানে না যে, আমার অন্তরের, আমার কলিঙ্গার

মাহুঘটীর চেয়ে সুন্দরী, 'জুর্নী' হতেই পারে না। সে তোমার দেখেনি তা বলেই ও কথা বলছে। সেই হেনার ঝাড়ের ধারে যদি একদিন তোমার সে দেখত তবে হয়ত তার সে ভুল ভেঙ্গে যেতো। আমি তাকে এ কথা বলেছি কিন্তু সে কিছুতেই তা' স্বীকার করছে না। যাক সে স্বীকার করুক আর না ই করুক, আমার মনের কোণে চোখের সামনে সবই স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠছে—কত সুন্দর তুমি!!!

উঃ!—কি আশুণ রুটি আর কি ভয়ানক শব্দ! আকাশ ধোঁওয়ার অন্ধকার হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়! মনে হচ্ছে, যেন সমস্ত পৃথিবীতে কে আশুণ ধরিয়ে দিয়েছে। চারিদিক থেকে বোমা আর গোলা ফেটে আশুণের ফিনকি বেরুচ্ছে! কি মন্ততা আশুণের? যেদিকে চাওয়া যায়, আশুণ আর ধোঁওয়া ছাড়া—আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তুমি হয়ত আমার কথা মোটেই বুঝতে পারবে না—প্রচুর কল্পনা থাকলেও না।

চারিদিকেই লাল! আকাশ লাল—মাটি লাল—মাহুঘের দেহ লাল—কেবল লাল আর লাল। আশুণের ফিনকিতে আকাশ লাল হয়ে গেছে, রক্তে মাটি লাল হয়ে গেছে, বোমার ষায়ে, বোমোনেটের খোঁচার রক্ত ছুটে মাহুঘের দেহও লাল হয়ে গেছে। তুমি যদি দেখতে তো নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যেতে!

ইস! কি বিজ্ঞী গন্ধ! শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে—ভিতরের সমস্ত নাড়ী যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে! বাপরে!—মাহুঘ-মারা ধোঁওয়া। মাহুঘ মারার যত ফন্দী—এখানে এই যুদ্ধক্ষেত্রে।

ধোঁওয়ার কথাটাও হয়ত তুমি বুঝতে পারলে না। এক রকম ধোঁওয়ার মতো গ্যাস—মাহুঘ মারার জন্তে তৈরী হয়। শত্রুদের আন্তানা কোন-দিকে, যদি জানা থাকে আর বাতাস যদি ঐ দিকেই বইতে থাকে—তবে সে গ্যাস বাতাসে ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠে এবং যারা

ঐ বাতাস টেনে নেয়, তৎক্ষণাৎ তাদের মৃত্যু হয়। কখন কখন আবার নিজেদের লোকও মরে। হয় ত বাতাসে গ্যাস্ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আর হঠাৎ বাতাসের গতি ঘুরে গিয়েছে—তখন শত্রুরা না মরে নিজেরাই মরে। ভারী বিস্ত্রী জিনিষ এ-টা!

ঐ যাঃ! আমার আর্দ্রাণীটা মারা পড়ল। বেশ ঘুম ঘুঘুচ্ছে সে। আর জাগবে না—কোনোদিন! এক সঙ্গে শত শত কামান যদি গর্জ্জে উঠে গুরুম্ গুরুম্ শব্দে, শত শত বোমা যদি কেটে উঠে ক্রম ক্রম শব্দে—সহস্র সহস্র রাইফেল যদি গর্জ্জে উঠে ফট্ ফট্ শব্দে—তবু না। তবু আর চোখ খুলে চাইবে না। সে বেশ শান্তিতে ঘুঘুচ্ছে।

মা গো—কি ভয়ানক তেষ্ঠা পেয়েছে। আমার ‘ওয়াটার বটলে’ (water bottle) ও যে এক রত্তি জল নেই। সব ফুরিয়ে গেছে দেখছি। আজ বড্ড হররাণ হয়ে পড়েছি। তেষ্ঠায় বুকের ছাতি কেটে যাবার জোগাড়। কাছেও তো আর কেউ নেই, যে চেষ্টা নেবো!—সব মারা পড়েছে। আমি একা বঁচে থেকে লড়ছি—শত্রুদের অগ্রসরে বাঁধা দিচ্ছি। না, আর যে পারছি না। কোয়ার্টারে ফোন করলুম কিন্তু কেউ এলো না রিলিভ করতে। আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। একটু জল যদি পেতুম।—

দেখি গার্ড বন্ধ তো হাঁ করে মরে পড়ে আছে;

তার ‘বটল টায়’ একটু আছে কি না। আছে—আছে, একটু মাত্র! কি বন্ধ! হাঁ করে আছে যে। তোমারও তেষ্ঠা পেয়েছে না কি? না, যাক্—নিজে বাঁচলে তো তোমায় দেবো? তোমার কথা ভাবতে গেলে এখন আমার চলবে কেন?

আঃ এক ফোটা জল কত মিষ্টি! গভীর কৃষ্ণায় এক কোঁটা জল যে কত মিষ্টি—যারা এ অবস্থায় পড়েনি কোনো দিন, তারা কি করে বুঝবে—আর আমিই বা কেমন করে বুঝাব?

ঐ যাঃ—‘লুইস্ গানটা’ও যে আমারই মতো হররাণ হয়ে পড়েছে দেখছি! কি হে,—চল্ছ না যে আর? না না—তোমার তো হররাণ হলে চল্বে না? তোমাকে যে চলতেই হবে—আমাকে বাঁচাতেই হবে। তোমার এ বেলা শক্ততা করলে চল্বে কেন?

না—হ’ল না! অনবরত চালিয়ে চালিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ঐ যে, ওখানে আর একটা রয়েছে—ওটাতেই কাজ চালাতে হবে। কিন্তু ওখানে যাই কি করে? যে ভাবে গুলী ছুড়ছে শত্রুরা—কি সাধ্য অগ্রসর হব? বসে থাকলেও তো চল্বে না। যেতেই হবে—যা’ থাকে কপালে!

ঝপ্! ঝপ্!! ঝপ্!!! লেফ্! রাইট!! লেফ্! ঐ আমার সাহায্যকারী দল এলো! যাক্—

উহ্—মা—গো—

—শান্তি চোখুরী।



## মিলন শঙ্খ

( বড় গল্প )

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

( এক )

হৃদ্যবনা বখন মাহুঘের মনকে আশ্রয় করে.....  
তখন মনে জেগে ওঠে নানা অবাস্তব কথা.....  
প্রকৃতির শ্রাম শোভাই বা শাস্তি দেয় এই সময়.....  
দৃঢ় হৃদয় নিয়ে পল্লীর কোলাহল-মুখের কুটার হ'তে  
শাস্ত স্তব্ধ কালোজলে পূর্ণ বড় গুরুতর সান বাঁধানো  
ঘাটে এসে বসলুম। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে.....  
চারিদিকেই শান্তির আগমন মূর্ত হয়ে উঠেছে— সান্ধ্য  
বায়ুর স্পর্শে জলের হৃদয়ে স্পন্দনের সৃজন হ'লো.....  
সেই স্পন্দন রবির রাঙা মুখখানা বৃকে করে তার  
আরক্তিম গাও শত শত চুমার স্পর্শ এঁকে দেবার জন্ত  
ছুটে আসছে.....কি সুন্দর.. .....কি মনোহর!  
সাঁঝ আকাশের সেই সোনার ছবি.....কোন্ অদৃশ্য  
ঐশ্বর্যালিকের মত এই ছবি তার কুহক মস্তের  
প্রভাবে ভুলিয়ে দিলে সব জালা..... সকল যন্ত্রণা  
ডুবলো ও কালোজলে..... সবুজ মনটাকে পেষণ  
যন্ত্রণার মাঝে ফেলে দেয় যে সব দানব.....  
বাদের সহকারী ক্রুদ্ধ গর্জন সমুদ্রের ফেনিল তরঙ্গের  
মত বিষ উদ্‌গীরণ করে.....সে সব চলে যায়  
দূরে ...বহু দূরে...।

জলের কালো বৃক হ'তে কনক রশ্মিরেখা মিলিয়ে  
দিয়ে সূর্য্য লুকিয়ে পড়ল গাছের আড়ালে.....  
তার গোপন গ্রিহা সন্ধ্যার সহিত লুকোচুরি খেলা  
আরম্ভ হ'ল। সন্ধ্যা তারার মালার দিকে চেয়ে  
ধাক্কে ধাক্কে মনে হ'ল আমার স্নেহময়ী মার কথা,  
আমর, ভালোবাসার কথা..... সেই মুখ, সেই  
জ্ঞান মুখ যেন জগতের ব্যথার স্রিয়মান। মনে  
পড়ল পাঁচ ভাই বখন বড়বয়স করে মৃত্যুরহস্তের  
সিঁদ্বাস্ত করতে অজানা রাজ্যে expedition আরম্ভ

করল.....আর বাবাও যেন তাদের বড়বয়স  
ফাঁস করবার জন্ত কয়ল মাত্র সম্বল করে ছুটে  
বেরুলেন.....বর্তমানের তীব্র বিভীষিকার দিকে  
পশ্চাৎ করে কোন অজ্ঞেয় লক্ষ্যহীন ভবিষ্যতের  
গর্ভে.... এই সব ঝড় ঝাপটা সহ্য করেও  
সর্ব্বসহা বসুন্ধরার মত মা আমার সে সব সহ্য করে  
পক্ষীমাতার মত তাঁর মেহপ্রবণ ডানা দিয়ে  
আমাদের ছুই ভাই বোনকে সকল রকম দুঃখ দাহন  
হ'তে আড়াল করে রেখেছিলেন..... আজ সে  
সব স্মৃতির আবাত নতুন করে মনে জাগল। যে দিন  
ওপার থেকে তাঁরও ডাক এল, তখন মনে হ'ল  
স্বপ্নের আশ্রয় আমাদের কাছে স্মার মত নিষিদ্ধ  
.....আমরা শুধু অসুস্থব করতে এসেছি  
দৈত্যের হাট্কার...ব্যথার আর্তনাদ!...

দাদা অতুগ ছিলেন। তাঁর ছিল স্নেহ ভালোবাসা  
.....আর আমার এই তরুণ হৃদয়ের অতৃপ্ত  
কামনা আকাজকা...। একদিন বিধাতা এ দুয়ের  
মাঝেও বিরাট চীনের প্রাচীর গাঁথে দিলে.....  
সে আমারই সমবয়সী একটা মেয়ে। আমার আশ্রয়  
অভিমান সব ভাসিয়ে দিলে সেই চঞ্চলা কিশোরীর  
ক্রুদ্ধ ফুৎকার..... অতুৎকার বিনিময়ে শ্রদ্ধা  
ভক্তি সম্মানের ঝুগি উড়াড় করে তাঁকে দিয়ে আমার  
তাঁর প্রসাদ কামনা করতে হ'বে।

এই সব অতীতের ইতিহাসের পাতার পর পাতা  
অমনোযোগী পাঠকের মত উন্টিয়ে চলেছি.....  
সন্ধ্যা রাণীর চঞ্চল পাদ বিক্ষেপে বিধাতা ঠাকুরের  
বিরাট কালির দোয়াত উন্টে যেয়ে ধরণী মণীময়ী  
হয়ে গেছে... ..হঠাৎ কার স্পর্শ গারে ঠেকল

সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষ কণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল ? কে,কে এখানে .  
কে আপনি এত রাত্রে..... ? উঠে দাঁড়াতে না  
দাঁড়াতেই আবার বললুম.... ।

মাগ করবেন—অন্ধকারে দেখতে পাইনি ...  
কিন্তু আমি সংকার করে ফিরছিলাম.....  
আপনাকে এই রাত্রে আবার স্নান করতে হ'বে ।

মনে হ'ল এ যেন চেনা গলা .....সাহসে  
বুক বেঁধে বললুম কে..... রবিদা ?

তুই লীলা..... ? খন্টি মেয়ে না হোক...  
এই অন্ধকার রাত্রে একি ছেলে মানুষী তোর ?....  
এত রাত্রি হ'ল—

.....সে ত হ'ল— ; কিন্তু রবিদা'!—তুমি  
যে রাত্রির বারোটাই হোক - আর তিন টাই হোক...  
বেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও তোমার বাবা কিছু  
বলেন না ? আর নারী আমরা আমাদের বেলাতেই  
বুঝি শাসন.....মানসিক যন্ত্রণা হ'তে দূরে  
থাকবার জন্ত ঘাটে বসে থাকটাই দোষের.....  
কেন এ প্রভেদ ? কেন এ অবিচার ? বৌ ত'  
আমায় দেখলেই বাঁটা তোলে.....তার রণচণ্ডী  
মূর্তির বিকাশ আমার টলাতে পারবে না—কথ'খনো  
পারবে না—এ আমি বলে রাখলুম ।

বক্তৃতা পথে যেতে যেতে শুনবো লীলা.....  
দাঁড়া একটু—হুটো ডুব দিয়ে নিই... ।

( ছই )

পূর্ব সন্ধ্যের দোহাই দিতে গেলে বাঙলা দেশের  
পনেরো আনা কুলীনকে পরস্পর কুটুন্ডিতার বন্ধনে  
বদ্ধ দেখতে পাওয়া যায় । ঐ রবিদার সঙ্গেও  
আমাদের একটা ঐরূপ সন্ধ আছে.....রবিদা'র  
বৃদ্ধ প্রপিতামহ আর আমার প্রপিতামহ ছিলেন  
মামাতো পিস্তুতো ভাই... ।

মা ছিলেন যে বংশের মেয়ে, তাঁদের সঙ্গে নাকি  
কয়েক পুরুষ আগে মুসলমানদের সহিত সংস্পর্শ আসে ।  
অবশ্য সেটা উহাদের অজ্ঞাতসারে বিধব্রা যখন  
অনীদারের প্রভাবেই হয়েছিল । এত বড় কলঙ্কটা

যে কিরূপে এই দীর্ঘ দুশো বৎসর চাপা দিল তা ভাবা  
যায় না । এর চেয়ে আরও আশ্চর্য্য এই প্রাগ্-  
ঐতিহাসিক ব্যাপার কিরূপে প্রত্নতত্ত্ববিদ সমাজ-  
পতির দুশো বৎসর পরে পুনরায় আবিষ্কার করলেন ।  
বাবার নিজের আচরণগুলোও নাকি শুনেছি পাড়ার  
লোকাপবাদের সাথে খাপ খেত না—তিনি যখন ছোটো  
তিনটে পাশ করেও কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির  
প্রস্তাবিত ঐ রূপের প্রত্যাখ্যান করিয়া.....  
মার মতন এক গরীব ঘরের মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী  
করিয়া আনিলেন তখন পাড়ার লোকেরা অবাক  
হইয়া গিয়াছিল । নববধূ মার অলঙ্কারের মধ্যে ছিল  
সিন্দূর আর মাঁখা, আর পরনে ছিল সাড়ী.....এই  
মার মুখ থেকে শোনা । এই সব দেখে শুনে পাড়ার  
দেবতারা চটে গেলেন—আর তারই পর বছরে সেই  
অপূর্ব ইতিহাস প্রকাশ হ'ল !

বাবার যেমন আয় ছিল পকেটের ছেঁড়া অংশটাও  
সেইরূপ ছিল । আতুর অনাথ.....গরীব দুঃখীদের  
প্রার্থনায় তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত । স্নতরাং তিনি  
যখন নিকৃদ্দেশের যাত্রী হ'লেন তখন আমাদের  
সম্পত্তির মধ্যে ছিল পাড়াগাঁয়ের ভদ্রাসনখানি ।

মা যে প্রদীপটি ধরে পথ দেখিয়ে চলছিলেন মাঝ  
খানে দম্কা হাওয়ায় তা গেল নিভে । সেই দিনই  
বই খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অনির্দিষ্টের পথে ছুটতে  
লাগলুম ।

বাবা তাঁর সারা জীবনের কার্যাবলীতে তাঁর পূর্ব  
পুরুষদের সংস্কারের ছাপ ছাড়াতে পারেন নি । সেজন্য  
সেই গুলাকে দুর্জলতার চিহ্ন মনে করেছিলেন ।  
তিনি নিত গাঁয়ের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান কন্ডার  
পাণিগ্রহণ করেছিলেন এবং পুরামাত্রাতে কোরাণ  
যেনে চলতে লাগলেন । সমাজের দিক থেকে এত  
পরিবর্তন ঘটলেও রবিদা'দের সঙ্গে আমাদের কোনও  
রূপ সামাজিক পরিবর্তন হয় নাই । রায় কাঁকা  
আমাদের তাঁর নিজের ছেলে মেয়ের মতন  
ভালোবাসতেন । মা আর কাকিমার মধ্যে বেশ



অন্তরঙ্গতা ছিল। সেই থানেই নাকি রবিদার আর আমার একই সঙ্গে জন্ম হয়। মাত্র দু'চার ঘণ্টার তফাৎ—সকলেই রবিদারকে দাদা বলত তখন আমিই তাকে নাম ধরে ডাকি কেন ?

রবিদাও আমাদেরই মত দুঃখ দৈন্তের মধ্য দিয়া মাহুয। তারও মা নাই... রবিদা' হবার একটু আগেই পড়ে গিয়ে তার চোখ মট্ট হয়ে যায় সেই সময় তাঁর চিকিৎসা করতে রামুকা'কে সর্বস্বান্ত হ'তে হয়েছিল।

রামু কা'কা চাকুরী ছাড়িয়া বাড়ী ফিরলেন। বর্তমানে মঙ্গলেরিয়া প্রসীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন কাজেই কোন প্রকারে দিন চালান ভার হইয়া পড়িয়াছে। শে'কে তাপে ভরা রামু কা'কার হৃদয়টা সমতার ভরা ..... আমি, দাদা ও বৌ তিনজনেই তাঁর কাছে গল্প শুন্তে বাই। রবিদাদের স্কুল এখান থেকে কিছু দূরে। বাতায়নের অস্থবিধার জন্য সেই থানেই একজনদের বাড়ী থাকে। মাঝে মাঝে

বাড়ী আসে। বৌ তার সামনে বোয়োর না..... আমি তার সঙ্গে কথা কইলে সে চোটে যায়। আমি যেন রবিদা'দের বাড়ীতে পা না দেই... .... এই রকম কতকগুলো রুল জারী করেছে। কিন্তু শোনে কে— ?

( ভিন্ন )

রতন সর্দার প্রাশিক্ষিত না করে মারা গেছে বলে তার মৃত দেহটা স্পর্শ করা অশাস্ত্রীয় ব্যাপার, এই কথাটা শিরোমণি ঠাকুর ঘোষণা করে দিলেন। সে মরেছে—সমাজের দেনা শোধ দেবার ক্ষমতা তার নাই, কিন্তু তা বলে ত আর এত বড় অশাস্ত্রীয় কাজটা হ'তে পারে না... তবে যদি কালীতলায় এর দণ্ডস্বরূপ কিছু মূল্য দেওয়া হয় তবে তাঁর কোন আপত্তি নাই... তিনি আরও বললেন . এ-ত আর তাঁর নিজস্ব পাওনা নয় যে মাক কর্কেন, এ সমাজের কথা... এখানে ত আর দয়া দেখিয়ে অনাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

( ক্রমঃ )

## ভ্রান্তি

শ্রীঅণীশচন্দ্র চক্রবর্তী

—১—

বিশ্ব-কবির শিষ্য হইয়া—

কেমনে বলিছ নিঃস্ব—

জগৎ-মাতার সন্তান তুমি

রাজ্য নিখিল বিশ্ব।

—২—

কণ্ঠে তোমার অমিয় পয়োধি

মাগিয়া নিভেছ তিস্ত—

বিরাত তোমারে ঘেরিয়ে রয়েছে

তবুও বলিছ রিস্ত ?

—৩—

দিবা অবসানে আবরি তোমারে

মুছায়ে দিতেছে ভ্রান্তি।

(ভব) আপনার কেবা বুঝিয়া লইতে

তবুও গেল না ভ্রান্তি ?



## নিশীথের আলো

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

( ১ )

আকাশে সেদিন সকাল হইতে মেঘ সাজিয়া আসিয়াছিল। বৃষ্টি মাঝে মাঝে বর্ষ বর্ষ ধারে ধরণীর গায় বরিয়া পড়িতেছিল। এক একবার এক এক-নিকষ কালো মেঘ আকাশের গায়ে দোলা খাইতে খাইতে উঠিয়া অপর পার্শ্বে নামিয়া পড়িতেছিল। সকাল হইতে রৌদ্রের দেখা পাওয়া যায় নাই, সমস্ত পৃথিবীর উপর আকাশের মলিন ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল।

প্রগতি জানালার পর্দা সরাইয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিল। সে দিন রবিবার, স্কুলে যাইতে হয় নাই, তথাপি নিয়মিত ঠিক দশটার মধ্যেই আহার হইয়া গিয়াছে। আজিকার দিনটা অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়াই ঠেকিতেছিল, এ যেন কোনও মতে আর কাটিতে চাহিতেছিল না।

আহারের পরে সময় কাটাইবার জন্ত সে বই লইয়া বসিয়াছে, একভাবে চোখ রাখিতে রাখিতে চোখ জ্বালা করিতে লাগিল, সে অত্যন্ত শ্রান্তভাবে বইখানা টেবলের উপর রাখিল। আজিকার এ দীর্ঘ দিনমান কাটিবে না কি ?

কর্মপূর্ণ জীবনটায় অতদিন কষ্টের ঢেউ আসিয়া লাগে, যাহাতে বুঝা যায় না কখন দিন আসিল, কখন

দিন চলিয়া গেল। আজিকার অগস্ত্যভরা এই আষাঢ়ের নীরব মধ্যাহ্নটি, এ যেন বোঝা-স্বরূপই আসিয়াছে, তৈলিয়া সরাইয়া দিতে চাহিলেও এ কিছুতেই বাইতে চাহিতেছে না।

দেয়ালের ঘড়িতে সে চাহিয়া দেখিল তিনটা বাজিতে পনের মিনিট দেবী আছে। প্রগতি বিরক্ত-ভরে উঠিয়া পড়িল, আর এমন করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকা যায় না।

দরজার পর্দা সরাইয়া সে বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সূর্যের আবরণ নিকষ কালো মেঘটা ভাসিতে ভাসিতে দূরে গিয়া পড়িয়াছে, সাদা মেঘের মাঝখানে সূর্যের আকৃতি অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে, মলিন আলো ধরার বৃকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মৃদু বাতাসে উঠানের মাঝখানে মারিকেল গাছের পাতাগুলি সরসর করিয়া কাঁপিতেছে, প্রাচীরের ওপারে বাগানে কয়েকটা বাবলাগাছে আগা-গোড়া ফুল ধরিয়াছিল, সেগুলি কাঁপিতেছে। অদূরে নদীর ধারে কয়েকটা পাখী বিকট চিংকার করিতেছে, তাহার শব্দ কাণে ভাসিয়া আসিতেছে।

প্রগতি শ্রান্তদৃষ্টিতে একবার এই স্থলর শান্ত-দৃশ্য দেখিয়া লইল। তাহার পর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

“বাপুয়া—”

সে ভৃত্যকে ডাকিল, কিন্তু বালক ভৃত্য বাপুয়া তখন পাশের ঘরে ঘুমাইয়া, তাহাকে আর মা ডাকিয়া প্রণতি নিষেই একটা গ্লাসের সন্ধানে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। হুর্ভাগ্য হেতু ছইটা গ্লাসই উঠানে পড়িয়া আছে, এখনও মাজা হয় নাই। ছয় সাত দিন হইল মাত্র সে এখানে আসিয়াছে, বেশী বাসন কিছু আনে নাই, নিত্যন্ত যাহা দরকার তাহাই আনিয়াছে মাত্র।

অগত্যা একটা গ্লাস লইয়া সে যে সময় মাজিতে-ছিল সেই সময়ে বাপুয়া ঘুম হইতে উঠিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। প্রণতিকে নিজের হাতে গ্লাস মাজিতে দেখিয়া সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, “এ কি দিদিমণি, আপনি বাসন মাঙ্কছেন, আমায় ডাকলেই তো পারতেন।”

হাসিমুখে গ্লাসটা ধুইতে ধুইতে প্রণতি বলিল, “তাতে কি হয়েছে রে ? একটা গ্লাস মাঙ্কলেই আমার হাতটা কিছু ক্ষয়ে যাবে না। তোকে একবার ডেকেছিলুম, সাড়া পেলুম না ; ভাবলুম খেটে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ডেকে অনর্থক তোকে কষ্ট দেব।”

বাপুয়া মুখখানা অন্ধকার করিয়া বলিল, “হ্যাঁ, কষ্ট আবার কি ! দিন গ্লাসটা, আমি ধুয়ে জল এনে দি।”

তাহার একান্ত জেদে প্রণতি হাসিয়া গ্লাসটা তাহার হাতে দিল, বাপুয়া গ্লাস ধুইয়া জল আনিয়া দিল। প্রণতি জলপানান্তে গ্লাসটা তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, “বস বাপুয়া, ততক্ষণ তোর সঙ্গে একটু গল্প করি।”

বাপুয়া ভারিচালে হাসিয়া বলিল, “গল্প, তবেই হয়েছে দিদিমণি, গল্প আমি মোটেই জানিনে।”

প্রণতি বলিল, “তোকে আমি রূপকথার গল্প বলতে বলছিলাম, আমি তোদের দেশের গল্প শুনতে চাচ্ছি। তোদেরই তো এই দেশটা, তোর একে জানিস চিনিস, আমি এর কাউকে চিনিনে এখনও, জানিও নে। এ কয়দিন নানা গোলমাগেই তো

কেটে গেল, এখনও তোর কাছ হ’তে কিছু শুনতে পেলুম না।”

“এই দেশের আবার গল্প—” বাপুয়ার মুখে হাসি আর ধরে না ; তবু সে বসিল, বলিল, “দেশের গল্প কি তা তো আমি জানিনে দিদিমণি।”

প্রণতি বলিল, “দেশের আবার কি গল্প ! তোদের এ দেশে কত লোক আছে ?”

উৎসাহিত বাপুয়া বলিয়া উঠিল, “উঃ, তা চের।”

প্রণতি জিজ্ঞাসা করিল, “ভদ্রলোক।”

বাপুয়া অঙ্গুলির পর্ক দ্রুত গণনা করিয়া যাইতে লাগিল, “বামুন বোধ হয় দেড়শো ঘর হবে, কায়স্থ তারও বেশী ; এ ছাড়া কৈবর্ত, তেলি, নাপিত, ধোপা—”

প্রণতি তাহাকে থামাইয়া দিল, “থাম বাপু ; খুব হিসেব দিয়েছিস, তুই কি—সাঁওতাল তো—?”

তাহার কথায় হঠাৎ বাধা দেওয়ার বাপুয়া একটু মর্ম্মাহত হইয়াছিল, একটা দম লইয়া বলিল, “হ্যাঁ, আমি সাঁওতালই বটে।”

প্রণতি জিজ্ঞাসা করিল, “তোর জাত এখানে আছে ?”

বাপুয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্লিষ্ট কর্তে বলিল, “না।”

প্রণতি বলিল, “তুই কি করে তবে এখানে এলি ?”

বাপুয়া আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহার ইতিহাস দ্রুত বলিয়া গেল। তাহার মা একটা কি অপরাধে তাহাদের সমাজ হইতে ভাঙিতা হইয়াছিল ; তখন সে খুব ছোট ছিল, সে কথা এখন তাহার অল্প অল্প মনে পড়ে মাত্র। তাহার পর যে কেমন করিয়া তাহার মা তাহাকে লইয়া এ গ্রামে আসে এবং পাঁচ বছরের ছেলে বাপুয়াকে রাখিয়া সে যে কেমন করিয়া পথের ধারে মারা যায় সে সব কথা বর্ণনা করিতে করিতে বাপুয়ার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিল, মায়ের সেই মরণের কথাটা তাহার মনে স্পষ্ট হইয়া জাগিয়াই ছিল, সেই কথা মনে পড়িতে তাহার চোখ ছইটা অশ্রু অশ্রু

জলে ভরিয়া উঠিল, তাহার পর হঠাৎ এক সময় উছলাইয়া গণ্ড খোঁত করিয়া কোলের উপর করিয়া পড়িল।

প্রণতি স্তম্ভভাবে মেঘে ছাওয়া আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল; তাহার মনটায় অতীতের কোন একটা দিনের পথের ধারের একটা বিবাসময় দৃশ্যের ছায়া পড়িয়াছিল, তাহার মুখখানা অত্যন্ত মগ্ন হইয়া উঠিল।

“হ্যারে বাপুয়া, তোর মাকে এ গ্রামের কেউ দেখে নি, কেউ এতটুকু আশ্রয় দেয়নি যেখানে সে মাথাটুকু রাখতে পারে? এত ব্রাহ্মণ কায়স্থ রয়েছে কেউ তোর মাকে দেখেনি, কেউ ভার নেয়নি?”

বাপুয়া চোখ মুছিয়া ভারি গলায় বলিল, “কেউ না দিদিমণি, কেউ না। কেউ আমার মার দিকে চাইলে না, কেউ তাকে একমুঠো খেতে দিলে না, ডাকা তো পরের কথা। আমার মা আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে পথের ধারেই পড়ে রইল। পথ দিয়ে এত লোক গেল এল, কেউ জিজ্ঞাসা করলে না কি হয়েছে।”

আঃ, কি নির্দিষ্ট, কি পাষণ্ডস্বয়ং এই দেশবাসী! পথের ধারে মৃত্যুশয্যাশায়িনী মা, বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে পাঁচ বৎসরের ছেলেটাকে, মৃত্যু তাহার কণ্ঠকে হয়তো আগেই রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু গোখ তো তখনও সে মূদে নাই, জ্ঞান হয়তো তখনও তাহার মধ্যে মধ্যে জাগছিল। সে হয়তো আর্ন্তবাকুলনেত্রে পথের লোকের পানে চাহিতেছিল যদি কাহারও প্রাণে করুণা জাগিয়া উঠে, যদি কেহ কাছে আসে, শিশু পুত্রটাকে তাহার হাতে দিয়া সে নিশ্চিন্তভাবে মৃত্যুর কবলে নিজকে সমর্পণ করিয়া দেয়। হায়রে, কেহই আসে নাই এ কথাটা ভাবিতে হৃদয় যে ব্যথায় ভরিয়া উঠে, চোখে যে জল আসিয়া দাঁড়ায়।

প্রণতি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তারপর তুই কি করলি বাপুয়া?”

বাপুয়া হাসিল; তাহার সে হাসিতে প্রণতির

বুকে বড় ব্যথা বাজিল—আহা রে অভাগা বালক!

বাপুয়া বলিল, “আমি আর কি করব্ দিদিমণি? দেখতেই পাচ্ছেন—মরিনি, বেঁচে আছি। এর দোরে যাঁচি খেতে দেয়, ওর দোরে যাঁচি খেতে দেয়, এমন দিনগুলো কেটে যাচ্ছে মন্দ নয়। এমনি করে—মা মরার পরে এই দশটা বছর তো কেটেছে এমনি করে, আরও বছর কত কেটে যাবে। আপনি আসবেন শুনে স্ত্রীনাথ বাবু আমায় ডেকে বললেন, এখানে কাজ করতে হবে, আমি খুব আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম।”

প্রণতি আর্জকণ্ঠে বলিল, “আনন্দের সঙ্গে রাজি হলি কেন রে?”

বাপুয়া বলিল, “জানি আপনি আমার মারবেশ না।”

প্রণতি জিজ্ঞাসা করিল, “কেম, এখানে সবাই তোকে মারে নাকি?”

বাপুয়া পিঠের গামছাখানা সরাইয়া দিয়া বলিল, “এই দেখুন না দিদিমণি, কত মারের দাগ পিঠে দেখতে পাবেন। কাজ করছি কিন্তু তাতে যদি একটু গাঙ্কিলতি হয়, মারতে তো কেউ কন্ডুর করে না।”

প্রণতির চোখ দুইটা বৃষ্টি সজল হইয়া উঠিতেছিল, সে অল্প দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, “লোকে তোকে মারত আর তুই তা নীরবে সঙ্গে যেতিস বাপুয়া, একটা কথা বলতিস নে?”

বাপুয়া বড় ব্যথায় মুখখানা বিকৃত করিল, “না দিদিমণি, কথা বলবার মত মুখ আমার কই? ভগবান যে আমার উপর নির্দিষ্ট, নইলে মা কেন এমন করে তাড়াতাড়ি মরে যাবে? আমি সাঁওতালের ছেলে, বাঙ্গালার ছেলে নই, আমার রাগ গরম, ঠাণ্ডা নয়; মার খেলে আমরা মারতে জানি, আমার যে সে সাহস নেই, দিদিমণি।”

তাহার চোখ দুইটা জলভারে আনত হইয়া পড়িল, প্রণতি করুণ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, “তা বেশ, আমার কাছেই থাক। আমি বলছি আমি যতদিন বাঁচব ততদিন আমার কাছে তুই থাকতে পারবি, কেউ তোকে আমার কাছে হতে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না। কেমন? রাজি আছিস্ তো বাপুয়া?”

বাপুয়া নিঃশেষে শুধু তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার সেই চোখের দৃষ্টিতে তাহার হৃদয়ের নীরব ভাষা মূর্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিল, বাক্যে তাহা বুঝানো যায় না।

মাত্র পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক সে, পাঁচ বৎসর বয়সে তাহার মা মারা গিয়াছে, এই দশটা বছর সে লক্ষ্মী-ছাড়ার মতই দরজায় দরজায় ক্লপাক্লিকি ভিখা করিয়া কিরিয়াছে, দয়া সে পায় নাই। সকলেই তাহার সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে, কেহ তাহাকে এতটুকু সহানুভূতি দেখায় নাই।

গায়ের রংটা তাহার মিকম্ব কাণো হইলেও বেশ মন্থন চকচকে, চেহারাটা বেশ স্বঠুপুঠ। দাঁতগুলি ছোট ছোট, শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানো, মুক্তার মতই ঝলঝলে পরিষ্কার। সামনের চুলগুলো সম্মুখের দিকে বেশ বড়, তেল চকচকে, সম্বন্ধে টেড তোলানো। কাজে কস্মে সে খুব চটপটে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তাহার মজাগত স্বভাব।

প্রগতি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর সে কথা কিরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “শ্রীনাথ বাবুকে দেখলুম। তিনি জমিদারের দেওয়ান। জমিদার কোথায়, তাঁকে তো দেখলুম না।”

বাপুয়া বলিল, “আমিই একবার মাত্র তাঁকে দেখেছিলাম। সে অনেক কাল আগে, বোধ হয় পাঁচ সাত বছরের কথা হবে—তিনি দেশে এসেছিলেন। শুনিছি তিনি আজকালই দেশে আসবেন। তাঁর হুকুমে নতুন ইন্সুল হয়েছে, দেখতে আসবেন না?”

প্রগতি চিন্তিত মুখে বলিল, “তিনি তো থাকেন কলকাতায়, দেশের সঙ্গে তাঁর কোম সম্পর্কই নেই, তবে দেশে হঠাৎ এই মেয়ে ইন্সপেক্টর বসালেন কেন তা জানিস, বাপুয়া?”

বাপুয়া বুক ফুলাইয়া মুখখানা ভারি করিয়া “তিনি বলেছেন সব দেশে ইন্সুল আছে আমাদের দেশে কেন থাকবে না?”

প্রগতি বলিল, “সব টাকা বুঝি তাঁরই?”

কথাটা সে স্বভাবতঃই বলিল, কিন্তু বাপুয়া সে কথা গায়ে পাতিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ মাথা কাত করিয়া বলিল, “নিশ্চয়ই।”

প্রগতি শ্রীনাথ বাবুর মুখেও শুনিয়াছিল জমিদার শরৎকুমার আজ কালই দেশে আসবেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, “জমিদার বাবুর ছেলে মেয়ে কয়টা জানিস?”

বাপুয়া উচ্চ হাসিয়া উঠিল—“বউই নেই—তা ছেলে মেয়ে।”

প্রগতি জরাজীর্ণ করিয়া বলিল “তাঁর বিয়ে হয়নি, না, বিয়ে হওয়ার পরে স্ত্রী মারা গেছেন?”

বাপুয়া মাথা হুলাইয়া বলিল, “বাবু মোটে বিয়েই করেন নি। যে মাতাল তাতে—”

প্রগতি শঙ্কিতভাবে বলিল, “মাতাল—?”

বাপুয়া বলিল, “ভয়ানক মাতাল। এই দেশে আত্মন না, দেখতে পাবেন, শুনেতেও পাবেন। তিনি দিনরাতই নাকি মদ খান, মদ পেলে আর কিছু চান না। কিন্তু মাতাল হলে কি হয় দিদিমণি, লোক এদিকে বড় ভাল। আমি সাঁওতালের ছেলে, কেউ আমায় কাছে ডাকে না—এই ভয়েই তাঁর কাছে যাইনি, তিনি আমায় কাছে ডেকে কত কথা জিজ্ঞাসা করলেন, শেষে দশটা টাকা আমার হাতে দিয়ে বিদায় করলেন। দেশের যত কান্দাল ছঃখী সকলকে তিনি বড় ভালবাসেন, তাদেরকে কাছে ডেকে তাদের প্রতিদিনকার খরচ দেন। এই যে তিনি কলকাতায় থাকেন—দেশের যার যা অভাব আছে তাঁর কাছে গিয়ে জানালেই হুকুম হবে—দাও টাকা। মাতাল হলে কি হয় দিদিমণি, এমন উঁচু মেজাজের লোক ছনিয়া ঘুরলে আর একটা পাওয়া যাবে না।”

কিন্তু তা হোক, লোকটা যে মাতাল এই কথাটাই প্রগতির মনে বিষম ত্রাসের উদ্রেক করিয়া দিল। সে

ছোটবেলা হইতে মাতালকে ভয় করে, আন্তরিক স্বগ করে। মাতাল হইলে তাহার সে মনুষ্যত্ব থাকে না সে তাহাই জানে। স্কুলের টিচার সে, স্কুলের যে কর্তা তাহার সম্মুখে তাহাকে বাহির হইতেই হইবে, কথা কহিতেই হইবে, মাতালকে বিশ্বাস কি? হয়তো সে এমন একটা কথা বলিয়া বসিবে—

প্রণতির কান পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিল, নাঃ এখানকার স্কুলে তাহার কাজ করা হইবে না, শীঘ্রই তাহাকে বিদায় লইতে হইবে। একে এই পল্লীগ্রামে নিঃসঙ্গ অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার পর মাতাল প্রভুর কথা শুনিয়া তাহার মনে হইতেছিল এখনই কাজে ইস্তফা দেই।

আর ছ'চার দিন পরে সে নিঃশব্দ কৰ্ত্তব্য পালন করিবে ঠিক করিয়া রাখিল।

(২)

জমিদার শরৎকুমার রায় একদিন বহুকাল পরে গ্রামবক্ষে পদার্পণ করিলেন।

পল্লীগ্রামে তিনি মোটেই আসিতে চাহিতেন না। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে একবার আসিয়াছিলেন মাত্র, ইহার মধ্যে গ্রামবাসী আর তাঁহার সাক্ষাৎ পায় নাই। দেশের সঙ্গে পরিচয় তাঁহার মোটেই ছিল না, ধরিতে গেলে বরাবরই তিনি কলিকাতাবাসী। বাস করিবেন বলিয়া এইবার তিনি গ্রামে ফিরিয়াছেন।

শ্রীনাথ বাবু মহা সমাদরে তরুণ জমিদারকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মুখে প্রকল্পতার হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে গেলে জমিদারের শুভাগমনে তিনি মোটেই প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই।

আজ তিন বৎসর হইল বৃদ্ধ জমিদার ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে শ্রীনাথ বাবু অনেক জিনিস অনেক অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন। শরৎ যে দেশে আসিতে পারেন, বাস করিতে পারেন তাহা তিনি কোন দিনই ভাবেন নাই, সে বিষয়ে তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

শরতের কাকিয়া ইন্দুবালাও এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি এই সম্পত্তির ছয় আনি জমিদার ছিলেন, কিন্তু শ্রীনাথ বাবুকে হস্তগত করিয়া তিনি বার আনা বিষয় উপভোগ করিতেন। এবার শরৎ গ্রামে বাস করিতে আসায় তাঁহারও অনেকটা স্বার্থ হানি হইল। অনেকেরই স্বার্থ হানি হইল, অনেকেরই বুকে আগুণ জ্বলিল, তথাপি মুখে হাসি টানিয়া আনিতে হইল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি শরতের বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না, তিনিও খুব চালাক ছিলেন। তাই ‘শটে শাঠ্য’ মন্ত্রণামুসারে চলিতে লাগিলেন।

গ্রামের ছোট বড় সবলই তরুণ জমিদারকে দেখিতে আসিয়াছিল। প্রভুভক্ত শ্রীনাথ বাবু গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র করিয়া দিতে ভুলেন নাই জমিদার মদ্যপায়ী অসচ্চরিত্র, কেবল সেই জন্তই তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া পল্লীতে আসেন। জমিদার অত্যন্ত দুর্শ্মুখ, যখন মাতাল হন তখন কাহাকে যে কি বলেন তাহার ঠিক নাই। পরিশেষে, দুঃখের সহিত ইহাও বলিয়াছিলেন— “এমন লোকটা—আগা, কেবল নেশা করেই বয়ে গেল। নেশার জন্তই লোকটার মাথার ঠিক নেই। নইলে রীতিমত শিক্ষিতও বটে, বয়েসও এমন কিছু বেশী নয়, আহা—”

তিনি খুব আপশোষের সহিত প্রভুশুণকীর্তনের ছলে নিন্দাকীর্তনই করিয়া গিয়াছিলেন। লোকে তাঁহার এই সহজ সরল ছলনাটুকু ধরিতে পারে নাই, তাহার শরৎকে যথার্থই মত্তপ অসচ্চরিত্র জানিয়াছিল।

শরৎ কথা বার্তায় সকলকেই তুষ্ট করিলেন, প্রত্যেককেই ঘনিষ্ঠ ভাবে ধরিয়া লইলেন। তাঁহার কথা বার্তা, চালচলনে শিক্ষিত বড়লোকের অহঙ্কার ছিল না, মত্তপ অসচ্চরিত্রের ক্ষততাপূর্ণ নীচতা ছিল না। তিনি কিন্তু ছিলেন, যথার্থ সরল উচ্চ হৃদয় বলিতে যাহা বুঝায় তাহা। দেশে না আসিয়াও দেশবাসীর সহিত সম্পর্ক উঠাইয়া দেন নাই, দেশবাসীর সকল কার্যেই

তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। দেশের নদী মজিয়া গিয়াছিল তিনি অনেকখানি সংস্কার করাইয়া দিয়াছেন; রায়েদের বড় পুকুর শুকাইয়া গিয়াছিল, তিনি নূতন করিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন। দেশের কয়েকটা পথ, তাঁহারই অর্থে পাকা হইয়া গিয়াছে, দেশের জঙ্গল কাটাইবার জন্ত প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া যায়। তিনি দেশের সংই করিতেন কিন্তু একটা বিশেষ দোষ তাঁহার ছিল তিনি নিজে কোন দিনই কিছুই মধ্যে জড়াইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন না। কৰ্মচারীগণ এক টাকা খরচ করিয়া পাঁচ টাকা খরচ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকট যে হিসাব দাখিল করে, তাহাদের হালচাল জানিয়াও তিনি তাহাই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে চান। সত্য কখনও গোপনে থাকে না; মনের মধ্যে সত্য আঘাত করিলেও তিনি জোর করিয়া মিথ্যার আবরণে তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে চান।

এরূপ লোককে প্রতারণা করিতে একটুকুও কষ্ট পাইতে হয় না, সরলপ্রকৃতি মনিবকে তাই জীনাথ বাবু ঠকাইতেন বেশ। তিনি থাকিতেন কলিকাতায়, গ্রামের কোন কথা তাঁহার কানে গিয়া পৌছিত না।

বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই প্রথমে শরতের দৃষ্টি পড়িল পুরাতন ঠাকুর বাড়ীর প্রতি। একখানা কড়ি খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, বরগা কতকগুলি একেবারেই নাই, কয়েকখানা এখনও পড়িয়া যাইবার অবস্থায় রহিয়াছে। এই ঠাকুর বাড়ীটির ভার ছিল শরতের কাকা জগৎপতির উপরে, তাঁহার পরলোকান্তে তাঁহার তৃতীয় পক্ষ ইন্দু-রাণীর উপর, কিন্তু তৃতীয় পক্ষ যাহা কিছু পাইতেন, তাহা সঞ্চয়ই করিয়া যাইতেন, পুরাতন ঠাকুর বাড়ীটির জন্ত তাহা হইতে একটা পরস্যা ব্যয় করিতে পারেন নাই। এই ভগ্ন মন্দিরেই বৎসর বৎসর জুর্গার শুভাগমন হইত, এবার বাহিরে ত্রিপল খাটাইয়া তিনি কোন ক্রমে তিনটা দিন কাটাইয়া

বিদায় লইয়া গিয়াছেন, পূজার দালানে আর আগুণ হয় নাই।

গত বৎসর পূজার মাস ছই আগে কুলপুরোহিত যাদব ভট্টাচার্য্য শরতের নিকটে গিয়াছিলেন। অনেক ছুঃখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন কেবল-মাত্র ছোটমার অমনোযোগিতাতেই রায়বাড়ীর ঠাকুর বাড়ীটা একেবারেই পড়িয়া যায়। অবশ্য বাদও এখন ইহা ছোটমারই অধিকাংশভুক্ত, তথাপি শরতের অর্থেই বৎসর বৎসর পূর্বকার মতই জননী আনন্দময়ী রায়বাড়ীতে আবির্ভূতা হন। এই ঠাকুর বাড়ীটা একেবারেই যায়, ছোট মা অমনোযোগিনী হইলেও শরতের উদাসীন থাকা উচিত নয়, কেননা, এটা তাঁহারই পৈত্রিক জিনিস।

কুলধমে পূজা এ বাড়ীতে চলিয়া আসিতেছে, ঠাকুর বাড়ী পড়িয়া গেলে পূজাও চিরতরে উঠিয়া যাইবে ইহা ভাবিতেও শরতের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি তখনই জীনাথ বাবুকে আদেশ দিয়া পাঠাইলেন পূজার দালান যেন নূতন করিয়া তৈয়ারী করা হয়, ইহাতে যত টাকা দরকার পড়ে তাহা যেন দেওয়া হয়।

আজ পূজার দালানের পানে তাকাইতেই তাঁহার সে কথা মনে পড়িয়া গেল। যেমন ভাঙ্গা দালান তেমনই পড়িয়া আছে, সারান দূরে থাক, সংস্কার পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহার মুখের উপর অন্ধকার বনাইয়া আসিল, শুষ্ককণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, “জীনাথ বাবু।”

“বলুন—” বলিয়া জীনাথ বাবু তাড়াতাড়ি পাশে আসিলেন।

শরৎ ঠাকুরবাড়ীর পানে চাহিয়া কথাটা বলিবার আগেই চতুর জীনাথ বাবু আন্ডাজে তাহা বুঝিয়া লইয়া বলিলেন, “ওঃ, এই ঠাকুর বাড়ীর কথা বলছেন তো! আমি আপনায় হুকুম পেয়েই ছোট মার কাছে গেলুম কিন্তু তিনি একবারে সপথমে চড়ে উঠলেন, কাজেই—”

বাধা দিয়া শরৎ বলিলেন, “সপ্তমে চড়ে উঠবার কারণ?”

শ্রীনাথ বাবুর মুখে একটু হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল, শরতের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহা এড়াইয়া যাইতে পারি নাই। শ্রীনাথ বাবু নিতান্ত নিরীহের মত মুখ করিয়া বলিলেন, “তখন আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি নি। ফিরে এসে তার পরদিন যখন তিনি আফ্রিক করতে যান সেই সময়টার মনটা তাঁর ভাল থাকে জেনে গেলুম। তিনি আমার কথা শুনে মুখখানা শুষ্ককার করে বললেন, “আমার দালান ভাঙ্গুক, পড়ুক তাতে কারও হাত দিতে আসতে হবে না। আমার যখন অবস্থা ভাল বুঝব তখন সারাব। এখন আমার ঠাকুর বাড়ী ছুটে জন ধরিয়ে সারিয়ে শরৎ যে নিজের করে নেবে তা আমি করতে দেব না।”

শরৎ একমুহূর্ত্ত নীরব হইয়া রহিলেন, তাহার পরই তাঁহার মুখে চিত্তান্ত মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল—“মেয়ে মানুষের বুদ্ধি বটে, আমি পূজার দালান সারিয়ে নিজের করে নেব এইটে তাঁর ধারণা হলো? আচ্ছা, এ বিষয়ে তাঁকে রাজি করার চেষ্টা দেখব। বললে বুঝবেন অন্ততঃ এ বুদ্ধিটুকু তাঁর আছে। যদিও তিনি কখনও আমার দেখেন নি আমিও কখনও তাঁকে দেখি নি, তবু তিনি আমারই কাকার স্ত্রী, আমার মাতৃ স্থানীয়া প্রণম্য খুড়িমা। আরও আমি শুনেছি তিনি বেশ লেখাপড়া জানেন, তাঁর মন উন্নত সরল—”

শ্রীনাথ বাবু সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া বলিলেন, “সে আর একবার করে নয়, শরৎ বাবু, হাজার বার বলছি বার্থে তাঁর মনটা ভারি সরল উন্নত। তবে জানেন কি, এই সরল লোকেরাই ভারি একরোখা হয়, অর্থাৎ তারা সত্য বলে যেটা একবার জেনে নেয় সেটা আর কিছুতেই মিথ্যে বলতে পারে না। সরল লোক একবার রাগলে

তাদের ঠাণ্ডা করা ভারি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তা হোক, আপনি ছোট মাকে একবার বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন তা আমি ঠিক করে বলছি। পাঁচ বছর আগে যখন আপনি দেশে এসেছিলেন তখন ছোট বাবু ঢাকার কি কাজ করতেন। আপনি তখনও সংসারের কিছু জানতেন না—”

দেওয়ান একবার বিশৃঙ্খল শ্বশুর তা দিয়া লইলেন। শরৎ ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, “জানি নে শ্রীনাথ বাবু।”

শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, “এই আপনার কাকার সঙ্গে বড় বাবুর ঝগড়ার কথা। খুব ঝগড়া করে ছোট বাবু কোথায় চলে গেলেন, তার পর বার তের বছর তাঁর আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নি। বড় বাবু ভাই বলতে অজ্ঞান হতেন, তিনি কেঁদে কেঁদে কত জায়গায় সন্ধান নিলেন, কোনও খবর পাওয়া গেল না। তারপর আজ বছর চারেকের কথা—সেবার পূণ্যর সময়ে বড় বাবু কলকাতা হতে বাড়ী এলেন পূজা করবার জন্য, আপনি তখন কোথায় বেড়াতে গেছেন—”

অতীত সেই কথাটা মনে করিয়া শরৎ বলিলেন, “হ্যাঁ, এই বার মনে পড়েছে, আমি সেবার পুরীতে গেছলুম। সেখানে বাবার পত্র পেলুম, কাকা ফিরে এসেছেন।”

শ্রীনাথ বাবু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন ‘হ্যাঁ, আমিই সেই পত্রখানা লিখেছিলাম, বড় বাবু নিজের নামটা নিজের হাতে দস্তখৎ করেছিলেন। ছোট বাবু ফিরে এলেন, সঙ্গে ছোট মা। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ এখানেই গতামুঃ হয়েছিলেন, তিনি দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন, আর বিয়ে করব না, তাই তাঁর সঙ্গে এই তৃতীয় পক্ষকে দেখে আমরা সবাই প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়ে গেছলুম। শুনেতে পেলুম তিনি ঢাকার থাকতে ছোট মার বাবা এসে তাঁর হাতে পারে ধরে মেয়েটাকে দান করে



গেছেন। এই ঠাকুর বাড়ী নিয়েই বগড়া বেধেছিল, তাই বড় বাবু তাঁকে ঠাকুর বাড়ী একেবারে রেজেষ্ট্রী করে দিলেন আর ভূমিদারী একেবারে তাঁকে দিলেন।”

শরৎ বলিলেন, “বাবা বড় ভাইয়ের উপযুক্ত কাজই করে গেছেন। শুনেছি এর মাসখানেক বামেই ছোট কাঁকা মারা যান।”

শ্রীনাথ বাবু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “নিয়তি! মরণ যে মাথার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছিল তা কেউই বুঝতে পারে নি। পেলেন সব, নিলেন সব, কিন্তু ভোগ করতে পারলেন না, একি বড় কম কষ্টের কথা!”

শরৎ চুপ করিয়া গেলেন, আর কোনও কথা তুলিলেন না। বৈকালে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে চা খাবার আসিয়া পৌঁছিল। শরৎ চা খাবার বহনকারিণী দাসীকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন এখন কি খুড়িমায় সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে? ইন্দুরাণী সম্মতি দিয়া পাঠাইলেন।

যে অন্তঃপুরে একদিন অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল আজ সেই অন্তঃপুরে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবেই শরৎকে প্রবেশ করিতে হইল। আজ অন্তঃপুরে নূতন কর্তার রাজত্ব, শরৎ তাঁহার অপরিচিত।

বিতলের বারান্দায় ইন্দুরাণী দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মুখে জীবৎ অবগুণ্ঠন, সে দীর্ঘাকী উন্নত-দেহা, বলিষ্ঠ। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল গোর, বয়স তেইশ চব্বিশ হইবে। পাতলা কাপড়ের মধ্য হইতে তাহার উজ্জ্বল বর্ণবিভা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। বড় বড় স্তম্ভ-তার চোখ ছাট চাকা, কিন্তু সে চোখে যে দীপ্তি ছিল তাহা অবগুণ্ঠনের আড়ালে রাখা যায় না।

শরৎ একবার চোখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইলেন। একবার দৃষ্টিপাতেই তিনি বুঝিলেন এই মেয়েটি যথার্থই বড় সহজ নহে। ইহার মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে যাহা সাধারণ মেয়েদের মধ্যে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না; আর সেই শক্তি বলেই সে তাহার নিজ অংশের জমিদারির কাজ

অবহেলায় নিজেই করিয়া যাইতেছে। নিকটে এক-খানা কার্পেটের আসন পাতা ছিল, ইন্দুরাণী আসন খানার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয় মৃদুশব্দে বলিল, “এই আসনে বসো।”

শরৎ বসিবার আগে নত হইয়া একটা প্রণাম করিলেন, ইন্দুরাণী অসঙ্কোচে এই প্রণাম গ্রহণ করিল, যেন ইহা তাহার প্রাপ্য এবং সে ইহার প্রত্যাশাই করিতেছিল।

শরৎ বসিয়া বলিল, “আমায় আপনার ছেলে বলেই জানবেন কাকি মা, মা কাকিতে পার্থক্য নেই। অনেকদিন হতে আশা ছিল মাকে দেখব, এবার সে আশাটা পূর্ণ হলো।”

ইন্দুরাণী অবগুণ্ঠনটা একটু কমাইয়া দিল। শরতের উজ্জ্বল শান্ত মুখখানার পানে চাহিয়া একটু আশ্চর্য হইয়া গেল। সে শরৎকে কখনো দেখে নাই। এতক্ষণ সে চোখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিতে পারে নাই, শরতের মুখের বড় মিষ্ট এই মাতৃ-সম্বোধনটা তাহার মনের রাজ্য, বিরুদ্ধভাব সব দূর করিয়া দিল, সে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না।

উন্নত দীর্ঘাকৃতি, উদার মুখ। বড় বড় দুইটা চোখ, ইহাতে একটু কুটিলতা নাই, এই চোখ দেখিয়া এই ছেলেটির হৃদয়ের আমূল সংবাদ সবই পাওয়া যাইতে পারে। মাথার চুলগুলি কক্ষ অবিচ্ছিন্ন; গায়ের সাদা পাঞ্জাবীটা আধ ময়লা, ছুই এক জায়গায় ছিন্নও আছে। পরণের কাপড় খানা, তাও তেমনি আধ ময়লা, পায়ের কাছে খানিকটা উড়িয়া গিয়াছে। এ কথায়, ছেলেটা যে সকল বিষয়েই অমনোযোগী তাহা তাহার বয়সোচিত বেশভূষার এই অমনোযোগি-তাই বোঝা যাইতেছে। তাহার বেরূপ স্নানর আকৃতি তাহাতে সব রকমেই তাহাকে মানাইয়া যাইত যদি সে পোষাক পরচ্ছদের দিকে মনোযোগী হইত। আর—মনোযোগ দিবেই বা কি? মদ খাইয়া বাহার দিনরাত কোথা দিয়া কাটিয়া যায় সে আবার ভক্ত-লোকের উপযুক্ত বেশে থাকিবে! শ্রীনাথ বাবু

শরতের যেকুপ পরিচয় দিয়াছেন তাহা মনে করিতে  
মুণায় সর্কশরীর শিহরিয়া উঠে।

ইন্দুরাণী বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। সে কথা  
কহে না দেখিয়া শরৎ বলিলেন, “আমি এখানে বাস  
করুতে এসেছি অথচ আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়  
নেই। আমরা পর নই, আপনি মা আমি ছেলে;  
মা ছেলের মধ্যে অপরিচিত ভাব থাকলে চলবে না,  
তাই আপনি না ডাকলেও আমি ছুটে এসেছি মা।”

তাহার কথাগুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কিন্তু ত্রীনাথ  
বাবুর কথা মনে পড়িল—“সে তারি পুষ্ঠ ছোট মা,  
মুখে এমন ভাবে কথা বলবে যেন কতই ভাল মানুষ,  
কিন্তু ভেতরে জানবেন বিষে ভরা। আপনি প্রথমই  
তাকে দেখে ভুলে যাবেন সেইজন্তে সাবধান করে  
দিচ্ছি। সে পুষ্ঠের কথায় যেন ভুলে যাবেন না; সে  
বড় সাংঘাতিক লোক, আপনার জমীদারি দেখতে  
অভিভাবক কেউ নেই, আপনার অভিাবক হওয়ার  
অছিলায় সে সব হাতিয়ে নেবে মনে রাখবেন।”

ইন্দুর মনে হইল সংসারে একুপ লোক ছুস্তাপ্য নয়,  
সে চকিতে তাই কোমলতাকে মন হইতে দূর করিয়া  
দিয়া শক্ত হইয়া উঠিল। শরতের ভক্তিপূর্ণ কথার  
বিনিময়ে সে একটু নড়িয়া চড়িয়া, ছবার কাশিয়া  
উত্তর দিল “সে আমারই সোভাগা, বাবা। আমি  
তোমাদের ঘরের বউ, বাইরে যাওয়ার অধিকার  
আমার নেই, তোমরা দয়া করে দর্শন না দিলে আমি  
তোমাদের দেখতে পাব না। তবে—সত্যি কথা  
বলছি বাবা, আমি আশা করিনি যে তুমি আমার  
আমাকেও দেখতে আসবে।”

শরৎ একটু হাসিয়া বলিলেন, “আপনি আমার  
চেনেন না তাই এ কথা বলছেন মা; আর সম্ভব  
কেউ কেউ আমার নামে অনেক কথা আপনাকে  
লাগিয়ে দেছে, তাইতেই এই অবগুস্তাবিত আমার  
আসাকে আপনি একেবারে অসম্ভব বলেই জেনে  
রেখেছেন। আপনি এটা জানবেন কাকিমা, ছেলে  
যাই হোক, যত বড় উচ্ছলই হোক, অত্যাচারীই

হোক, মায়ের কাছে যে যে ছেলে সেই ছেলেই থাকে,  
মা কোনও পরিবর্তন দেখতে পান না, ছেলেও মা  
বলে তাঁর পরে’ নির্ভর করে।”

স্পষ্ট বক্ত্রী ইন্দু মাথা নাড়িল—“মা হয় বটে বাবা,  
কিন্তু ছেলে তেমনটাই হয় না।”

শরৎ বলিলেন, “হয় তো তার মূলে থাকে আর  
একটা কিছু। মেহ বরাবর নীচের দিকে গড়িয়ে  
যায় মা, তাই মায়ের অকুরন্ত মেহধারা বারে পড়ে  
সন্তানের’ পরে, তারাও আবার তাদের সন্তানকে  
তেমনি মেহ ঢেলে দেয়। কিন্তু এখানে তো তা হবে  
না মা আমার, আপনার আমার মাঝখানে আর তো  
কেউ নেই যে আমার বুকের ভিত্তি কুড়িয়ে নিতে  
আসবে, এ ছুটি মা ছেলের মাঝে আর তো কেউ নেই  
মা, কে বাধা দেবে।”

মুখরা ইন্দু পম্বজর মানিল, এবার সত্যিই সে  
অবগুষ্ঠন সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া ফেলিল, তাহার মুক্ত মুখ  
সম্পূর্ণভাবে শরতের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল।  
শান্তদৃষ্টি সে শরতের মুখের উপর স্থাপন করিয়া  
শান্তিকণ্ঠে বলিল, “তোমার কথাগুলো ঠিক, সত্যি  
বাবা, তোমার কথা দিয়েই তোমার বেশ চিনতে  
পারা যায়।”

শরৎ হাসিলেন, “না মা, আপনি আমার চিনতে  
পারবেন না। আমি নিজেই নিজেকে চিনতে  
পারিনে, আপনি আমার চিনবেন কি করে? যাক  
সে সব কথা, পরিচয় তো হল, এখন আমি যে কাজের  
জন্তে এসেছি সেইটা বল শুনুন।”

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, “কি কথা?”

শরতের মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি  
বলিলেন “পুজোর দালান ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে  
সেইজন্তে আমি এটা আজই সংস্কার করতে চাই।  
গত বছর এই জন্তে ত্রীনাথ বাবুকে বলেছিলুম, তাঁকে  
সব ভার দিয়েছিলুম কিন্তু—”

ইন্দু শুককণ্ঠে বলিল, “আমিই তাঁকে করতে দেই  
নি। এ দোষ তাঁর নয়। তিনি কর্তব্য পালন করতে

এসে অপমানিত হয়ে ফিরে গেছেন, সে কথা বোধ হয় শোন নি ।”

এই মেয়েটির কথার ভঙ্গী দেখিয়া শরৎ আশ্চর্য হইয়া যাইতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন অপমানিত হলেন ?”

ইন্দু বলিল, “কেন হলেন এ প্রশ্নের উত্তর আমি যদি না দেই বাবা, জোর করে জানবার অধিকার তোমার নেই ।”

হার মানিয়া শরৎ বলিলেন, “সে আপনার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে কাকিমা, জোর করে জানার অধিকার আমার নেই এ কথা যথার্থ। তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দিতে পেরেছেন তা বলে আমার তো অপমান করে তাড়াতে পারবেন না। কেন না আমি আপনার ছেলে। মা কখনও ছেলেকে তাড়াতে পারবেন না, তাই জেমে সেই ঠাকুর দালানের উদ্দেশ্য নিয়ে আমিও আজ আপনার ছয়ায় প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছি কাকিমা ।”

ইন্দুর আয়ত চোখ দুটি মুহূর্তের তরে জলিয়া উঠিল, চাপা স্বরে সে বলিল, “তা আমি বুঝেছি ।”

তাহার কথাটা চাপা স্বরে উক্ত হইলেও তাহার মধ্যে তীব্রতা যে কতখানি ছিল তাহা শরৎ অন্তর দিয়া অনুভব করিলেন ; তিনি তাঁহার চিরসংযতভাব ত্যাগ করিলেন না, বলিলেন, “বেশ করে বুঝে দেখুন কাকিমা, আমি এটা মন্দ করব না। দালানটা ভাল

হলেও আপনারই থাকবে, আমার কেউ নেই যে শেষটার ভোগ করবে। আমার নিজের যা আছে এই আমার প্রচুর, এর চেয়ে বেশী আমি আর কিছু চাই নি, চাইবও না ।”

ইন্দু চুপ করিয়া রহিল, হঠাৎ উত্তর দিল না।

শরৎ ডাকিলেন, “কাকিমা—”

“হ্যাঁ, একুনিই আমি এর উত্তর দিতে পারছি নে ; আগে বেশ করে ভেবে দেখি তারপর তোমায় জানাব ।”

সে যে কি ভাবিয়া দেখিবে শরৎ তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়াও হাসিমুখে তিনি বলিলেন, “সেই ভাল মা, তবে তাই হোক ; আপনি ভাল করে ভেবে দেখুন, তারপর যা আপনার মতামত হয় আমার শীগগির করেই জানাবেন। আজ আমি তাহলে উঠি—”

বাস্তবাবে ইন্দু বলিল, “তাই কি হয় বাবা ? এসেছ যদি, একটু বসো, একটু জলখাবার—”

“মাপ করবেন মা ; এরপর কত খাব। আজ ঘণ্টাখানেক আগে একবার বাইরে চা খাবার পাঠিয়েছেন, এখন কি আর খেতে পারা যায় ? এরপর একদিন পেটুক ছেলেকে সামনে বসিয়ে খাইয়ে দেখবেন, আজ মাপ করতেই হবে ।”

শরৎ উঠিয়া পড়িলেন।

ক্রমশঃ—



## সম্বন্ধ নুণের হৃদ

মহামহোপদেশক পণ্ডিত

৥রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিজ্ঞাতৃষণ

এম্, আর, এ, এম্।

সম্বন্ধ হৃদের নাম অনেকেরই শুনিয়া থাকিবেন কিন্তু সম্বন্ধের হৃদ কেহ বাঙ্গালা দেশে বসিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সম্বন্ধ রাজপুতনায়া। এ হৃদটির মালিক জয়পুর ও বোধপুর রাজস্বয়। ই রাজ বণিকবের নিকট তাঁহারা বহু বর্ষের জন্ত ইজারা দিয়াছেন। আগে দেশীয় লোকেরা লবণ তুলিয়া যে লাভ করিত ইংরেজেরা তদপেক্ষা বহু পরিমাণ লাভ করিতেছেন। এখানে রেল হইয়াছে। তাঁহারা ষ্টেশন হইতে লবণের কাথানা পর্যন্ত লবণ চাণান দেওয়ার জন্ত রেল লাইন নিয়াছেন। আর এখানে তাঁহারা ইংরেজ ও দেশীয় কর্মচারীর জন্ত অনেকগুলি বাঙ্গলা, একটা হাঁসপাতাল, মিশনরীর একটা স্কুল স্থাপন করিয়াছেন ও স্থানটিকে নানারকমে স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিয়াছেন। আমি আগরা থাকাকালে এ হেন হৃদ দেখিবার জন্ত ব্যাকুল হই। আগরার বন্ধু তথায় আমার যাওয়ার বিষয় কোন বাঙ্গালী কর্মচারীর নিকট পত্র দেন। আমি আগরা হইতে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে অল্পজ গিয়া-ছিলাম। তিন দিন পরে আর একটা রেল জংশনে আসিয়া আটক পড়ি। যদি আমার ভুল না হয় তবে তাহার নাম কুলেরা জংশন। কুলেরা হইতে আর একটা রেল লাইন সম্বন্ধের উপর দিয়া গিয়াছে, আমাকে সেই গাড়ীতে যাইতে হইবে। কুলেরা নামিয়া বাঙ্গালী ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা হইল। তাহার নাম দাশরথী রায়। পদাবলী সৃষ্টিকর্তা কবি দাশরথী রায়ের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলিয়া এ নাম আর তুলিব না। দাশরথী বাবু আমাকে এখানে দু' একদিন অপেক্ষা করিয়া যাইতে অমরোধ্য

করিলেন কিন্তু এ মরুভূমিতে কি আমাদের মত বাঙ্গালী-প্রাণ থাকিতে চায়? আমি নানা অভ্যুহাত দেখাইয়া দেখিনই যাইব ও ফিরিবার বেলা এখানে আসিব ভরসা দিয়া আসিলাম। দাশরথী বাবু তথাপি ছাড়িলেন না, তিনি গৃহে গিয়া আমার জল খাবারের আয়োজন করিলেন। সে এক বিরাট ব্যাপার, গরম গরম সব আমাদের দেশী মিঠাই। এদেশে একরূপ মিঠাই পাওয়া যায় না, ইহারা ছানা কাটে না, এদেশে সবই ক্ষীরের মিঠাই। তদীয় গৃহিণীর হস্তের প্রস্তুত মিঠাই, বেশ ভাল লাগিল।

তাড়াতাড়ি গিয়া রেল ধরিব মনস্থ করিতেছি, দাশরথী বাবু বলিলেন, "তাড়াতাড়ি নাই, গাড়ী এখন হইতেই ছাড়ে, আমি না গেলে গাড়ী ছাড়িবে না।" গিয়া দেখি গাড়ী ছাড়ার সময় হইয়াছে। এখন হইতে গাড়ী ছাড়িল, বড় ধূলোময় পথ, যত গোক দেখিতেছি সবই গায় মাথায় ধূলোমাথা, মাথার চুলগুলি সকলই সাদা বলিয়া বোধ হয়। গাড়ীটেও সাদা। পথিকদের নাগরা জুতার গুড়ালী ভাঙ্গিয়া এক অপূর্ণ শ্রী হইয়াছে, আর সেই নাগরা জুতার চটপটাপ শব্দ, আর তাহা হইতে ধূলী উড়িয়া আকাশ পাতাল রঞ্জিত করিয়াছে। আমাদের গাড়ীতে সেই ধূলীরাশি আমাদের বিনামূল্যে প্রবেশ নিষেধ বাধা না মানিয়া অবলীলাক্রমে প্রবেশ করিতেছে। যাত্রীরাও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মাঠের মাঝে মাঝে ষ্টেশন। ষ্টেশনের চারিদিকে আর মানুষ নাই। গাড়ীর মধ্য হইতে দেখি আকাশটা যেন স্ফুটন্ত গিয়া মাটীতে ঠেকিয়াছে। পথে কাক, শালিকের দেখাও পাইলাম

না, শেরাল কুকুরের ত কথাই নাই। মাঝে মাঝে মাল্লেশেরা গাড়ী ধরিবার জ্ঞাও গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতেছে।

সন্ধ্যার প্রাকালে গিণ দম্বর পহুছিলাম। গাড়ীতে থাকিতেও দেখি কয়েকজন বাঙ্গালী বাবু বাঙ্গালীর সন্ধ্যানে গাড়ী খুজিতেছেন। আমাকে পাইয়া বুঝি তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। আমাকে তীর্থযাত্রীর পাণ্ডার ভ্রাতৃ তাঁহারা ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, “আমরা আপনাকে ক’দিমের গাড়ীতেই খুজিতেছি। আজ আর জ্ঞা গাড়ী দেখি নাই। এ বেলায় বেড়াইতে আসিয়া এই আপনাকে পাইলাম। যে বাবুর বাড়ী আপনি আসিবেন তিনি দুই দিম গাড়ী দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। আমাদেরিগকেই সে ভার দিয়াছেন।” সে দেশী ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে তাঁরা পরিচয় করিয়া দিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার বাবু আমাদেরিগকে বসিবার আসন দিয়া চা প্রস্তুত করিয়া আনাইলেন তখন লীতকাল, চা-টা ভালই লাগিয়াছিল।

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া গেল! রাস্তায় আলো জ্বলিল। আমি তাঁহাদের সঙ্গে চলিলাম। দুইধারে গাছের শ্রেণী, মধ্যদিয়া পথ, একজন কুলী আমার লট বহর লইয়া চলিল। কিছু দূর যাইতেই রাস্তার পাশের এক বাঙ্গলা হইতে একজন ইংরাজ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের আগরা হইতে আগত বন্ধু কি আসিয়াছেন?” তাঁহারা সহুত্তর দিলেন। আমি মনে করিলাম আমার আগমনটা প্রাইভেট হয় নাই। আমাকে তাঁহারা বাড়ী দেখাইয়া দিলেন, আমি আগে আগে চলিয়া গেলাম। আমি সে বাড়ীতে প্রবেশ করিব এমন সময় এক ছদ্মস্ত সারমেনবীর সশস্ত্রে পথ রোধ করিল। পিছন হইতে তাঁহারা ডাকিয়া কহিলেন, “বাড়ীর ভিতর যাইবেন না, কুকুর কামড়াইবে। আমরা আসিতেছি।” তারপর তাঁহারা আসিলেন, গৃহস্থানীও বাহির হইয়া আমাকে আশ্রয়িত করিয়া ঘরে নিয়া বসাইলেন। কুকুরটা বে-অস্থব হইয়াছে। সে আমার গায়ের অলটার

ধরিয়া বড় কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল, যেন তার কত অপরাধ হইয়াছে। কুকুরটাকে আমি আদর করিলাম।

তারপর আমার আসিবার বিলম্বের কারণ কহিলাম। হাত, মুখ ধুইয়া আশ্লিক করিয়া আবার চা ও জলযোগ। তারপর সকলে উঠিয়া যাইবেন, একজন কহিলেন, “আজ আর তবে সন্ধ্যাতালোচনা হবে না কি?” গৃহকর্তা আমার সম্মতি চাহিলেন। আমি কহিলাম, “অমৃত কি অল্পটি আছে? অমৃত সব সময়ই অমৃত।” তারপর সকলে উঠিয়া গেলেন। কিছুকাল পর তাঁহারা সন্ধ্যাতয়ন লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সে গৃহে গান, বাজনা তখন বেশ হইল। অনেক রাত্র পরে আহালাদি করিয়া নিদ্রার আয়োজন করিলাম। শয়নের পূর্বে গৃহস্থানী কহিলেন, “রাত্রে ঘরের বাহির হইলে আওয়াজ করিবেন নতুবা কুকুর কামড়াইয়া ধরবে।” আমার আর রাত্রে বাহির হইবার প্রয়োজন হইল না। প্রাতে বাহির হইয়া দেখি সারমেনবীর বন্ধন দশায় পড়িয়াছেন। রাত্রে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাই আর কোন অপরিচিত ব্যক্তি ইহার বিক্রমে বাড়ীর জিনিসমানার প্রবেশ করিতে পারে না। চোর ডাকাত প্রভৃতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার এই সারমেনবীর দৃঢ় পাহাড়া-ওয়াল।

প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া চা জলযোগ হইল। তারপর কি করিব তাহার আলোচনা করিতেছি। গৃহস্থানী নিমকের বাবু—তিনি কহিলেন, “নিমকের দারোগাকে আনিয়া আপনার সঙ্গে দিব, আমার পুত্রও আপনার সঙ্গে যাইবে।” নিমকের দারোগার কাছে থবর গেলে তিনি আসিলেন। আমি তাঁহাকে লইয়া পুত্র সহ চলিলাম। প্রথমে যেখানে লবণ প্রস্তুত হয় সেখানে গেলাম। স্থানে স্থানে পুকুর কাটা হইয়াছে, ত্রুদের জল সে পুকুরে আনিয়া তাহাতে বালুকা ও রাজ্যের বত আবর্জনা কেলা হয়, তাহা পটিয়া বড় দুর্গন্ধ হইয়াছে। আমাকে নাক চাপিয়া যাইতে হইয়াছিল। তারপর

যেখানে লবণের স্তূপ করিয়া রাখা হইয়াছে সেদিকে গেলাম। এক একটা প্রকাণ্ড স্তূপ, দেখিলে মনে হয় যেন এক একটা প্রকাণ্ড তাধু সজ্জিত রহিয়াছে। সবগুল স্তূপই প্রকাণ্ড তাধু বা আমাদের দেশী চৌরী ঘরের মত। এই সকল দেখিয়া বাড়ী আসিয়া দেখি গৃহস্থামী আফিসে গিয়াছেন। গৃহিণী ও তদীয় পুত্র আমার আহ্বারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এখানে দুধ তরিতরকারী বেশ পাওয়া যায়। মাছ পাওয়া যায় না।

আহার করিয়া বিশ্রাম করিলাম। তারপর বাইব। তদনুসারে দারোগা আসিলেন, আমিও প্রস্তুত হইলাম। গৃহস্থামীর পুত্র সেদিন আর স্কুলে গেল না, আমার সঙ্গে পুনরায় চলিল। আমার শরীরটা কেমন করিতেছিল তথাপি উৎসাহে চলিলাম। আফিসের কাছ দিয়া যাইবার সময় গৃহস্থামী কোন্ কোন্ স্থানে এ বেলায় আমাকে লইয়া যাইবেন তাহা বলিয়া দিলেন। আফিসের পাশ দিয়াই যাইতে হইল। ওপাশে গেলে একটা পাকা ইঁদুরা পাইলাম। তাহার কাছ যাইতেই আমি পড়িয়া গেলাম ও সঙ্গে সঙ্গে অট্টেত্ত হইলাম, তারপর বমি হইলে শান্তি লাভ করিলাম। জ্ঞান হইলে চাহিয়া দেখি আফিসের সাহেব, বাঙ্গালী সব একত্র হইয়া আমার সেবার নিযুক্ত হইয়াছেন। কেহ মাথায় জল ঢালিতেছেন, কেহ ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছেন, কেহ পাখা আনিতে বাড়ীতে দৌড়িয়াছেন। আমার অট্টেত্ত অবস্থার কোথায় ভগবানের নাম করিব আর আমি কিনা তখন গৃহের স্ত্রী, পুত্রের কথাই ভাবি। হায়রে অকৃতজ্ঞ মানব! মরিতে বসিয়াও ভগবানের নাম নাই, তবে আর কবে তাঁর নাম লইবে? আমি গৃহে নীত হইলাম। আমার আর সে দিন বাহির হইতে হইল না। যদিও ঔষধের প্রয়োজন ছিল না, ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিলেন। গৃহিণী বারবার গৃহ হইতে তত্ব পাঠাইতে লাগিলেন। আমার নাকি বমি হইয়া সব পড়িয়া গিয়াছে, আবার জলযোগ করিতে। আমি এখন কিছু খাইব না

বলিয়া বার বারই বলিতে লাগিলাম! ক্ষণেক পরে গৃহ-প্রস্তুত থাকাবের দিয়া জলযোগ করিলাম।

গৃহস্থামী আফিস হইতে আসিলেন। সন্ধ্যার সময় আবার ডাক্তার আসিলেন। এ ডাক্তার নিমকের সাহেব বাবুদের জন্তই। সন্ধ্যার সময় সকলে সমবেত হইলেন, তাঁহারা আমার অসুস্থতার জন্ত আজ আর গান বাজনা করিবেন না স্থির করিলেন। আমি কহিলাম, “আমি এখন ত আর অসুস্থতা অনুভব করিতেছি না, বরং গান, বাজনার ভাগই থাকিব,” তারপর তাঁহারা উঠিয়া গিয়া সরঞ্জামাদি লইয়া আসিলেন। একজন বাঙ্গালী গান, বাজনার পারদর্শী বলিয়াই ভাল চাকরী নিমক মহলে পাইয়াছেন। তিনিও সঙ্গীতে যোগ ছিলেন।

সেদিন সকলে হুকুম করিয়া গেলেন, আমার শরীর অসুস্থ, আর তিন চার দিন গেলে সব দেখিতে পাইব। সুতরাং আমাকে আর কয়দিন থাকিতে হইবে বলা যায় না। পরদিন প্রাতে উঠিয়া ষ্টেশনে বেড়াইতে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি হুদে যাইবার জন্ত কয়খানা গাড়ীসহ একটা এঞ্জিন প্রস্তুত হইয়াছে। এই গাড়ী লগ্ন আনিতে যাইতেছে। সে লবণ অন্ত্র ঢালান যাইবে। আমি সে গাড়ীতে চাপিয়া হুদে চলিয়া গেলাম। হুদেটা ২০ মাইল দীর্ঘ, চারি মাইল প্রশস্ত, জল তিন চারি হাতের বেশী নয়। এই হুদে এক একবার এক এক দিকে লবণ তোলা হয়। হুদের অপর দিকে একটা লাগ পাহাড় দেখা গেল তাহা গিরিমাটির পাহাড়। একদিন সে পাহাড় দেখিতে গিয়াছিলাম, প্রস্তুতগুলি সবই লাগ—গিরি-মাটির রং। মধ্যাহ্নাহার করিয়া খুব বিশ্রাম করিলাম, দারোগাকে ডাকিয়া আমি বাস্তির হইলাম। কুণী ও পাহাড় ওয়ালাদের আড্ডা দেখিলাম। লবণ কেহ চুরী করিয়া না নিতে পারে তজ্জন্ত দিন রাত্রি পাহাড়া চলিতেছে।

ইংরেজরা আসিয়া এখানে প্রত্যহ হাট করিয়াছেন। আগে সাপ্তাহিক হাট ছিল। এখানে তহশীল-

দারেরা তহশীল ছাড়া দেওয়ানী, ফৌজদারী মামলার বিচার করেন। লবণ চুরী হইলে তাহার বিচার ইংরেজেরা করেন। তজ্জন্ত ৫১ জন অপরাধী থাকিতে পারে এমন একটি জেলখানা আছে। রাজাদের জেলখানা বড়। ভয়পুর ও যোধপুর রাজার ইহা এজমালী কাছাড়ী। সম অংশে তাঁহারা মালিক। ইংরেজ সওদাগরেরা তাঁহাদের প্রজা হইলেও রাজারা তাহাদের নিকট কাণ্ড হইয়াছেন। এখানে একজন তহশীলদার বা হাকিম আছেন। তিনি তহশীল ব্যতীত দেওয়ানী, ফৌজদারী মামলাও করিয়া থাকেন, ইংরেজ সওদাগরদিগের নিকট তাহার কিছু হাত আছে বলিয়া বোধ হইল না।

সম্রের লবণ রাজপুতনা ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে চলে। বাঙ্গালা পর্য্যন্ত উহা আসে না। এই লবণ দেখিতে কিছু কালো, বিলাতি লবণের মত ইহা এত পরিষ্কার হয় না। ইহা বিশুদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মচারিণী বিধবারা পর্য্যন্ত সাদরে গ্রহণ করেন। এখানের প্রায় সবই লোণা বা খাটাজলবিশিষ্ট কূপ। তবে মাঝে মাঝে উহাদেরই ধারে কাছে মিঠা জলের কূয়া আছে। উহাদিগকে এ দেশে মিঠা কূয়া কহে। এখানে কূপ খননের পূর্বে মাটি দেখিয়া কূপ খনন করিতে হয়, মাটি পরীক্ষা করিলেই উহার জল মিঠা কি খাটো হইবে তা বুঝা যায়। মিঠা জলের কূয়া হইতে সকলে জল নিয়া পানার্থ ব্যবহার করে। হুদে মৎস্ত আছে কিন্তু উহা অখাদ্য, মাছগুলি কেমন এক ভুসভুসে রকমের, উহার স্বাদ বিস্তী ও লোণা। তাই মৎস্তাহারী প্রবাসী বাঙ্গালীরাও উহা ব্যবহার করে না। এদেশে প্রচুর হুদ, নানা প্রকার ফল পাওয়া যায়। তাই মৎস্তের তেমন আবশ্যক হয় না।

এখানকার হুদ সম্বন্ধে একটা প্রবাদ কথা এদেশে সর্বত্র প্রচলিত আছে। এখানকার রাজা কালীভক্ত ছিলেন, তিনি দেবী কালীর নিকট বর প্রার্থনা করিলেন, “কিসে আমার ধন বৃদ্ধি হয়।” কালীদেবী তাঁহাকে বলিলেন, “ভূমি ঘোড়ার চড়িয়া পশ্চাদিকে

না চাহিয়া যত চলিয়া যাইবে, সেই প্রদেশে সোনা ফলিবে, তাহাতেই ভূমি ধনশালী হইবে।” রাজাও তদনুসারে অস্বারোহণ করিলেন। ২০ মাইল ক্রমাগত গিয়া পিছনের দিকে চাহিবার তাহার খেয়াল হইল। চাহিয়া দেখেন তাঁহার পিছনে বিস্তৃত সমুদ্র। রাজা উর্দ্ধে চাহিয়া কহিলেন, “হায়, মা, কি করিলে?” কালীদেবী উর্দ্ধ হইতে আদেশ করিলেন, “ভয় করিওনা, এই জল-সমুদ্রেই সোনা ফলিবে।” তারপর দেখিলেন উহাতে লবণ হইয়াছে। সেই হইতে এ হুদে লবণ উঠিতেছে। এই লবণের হুদে রাজারা প্রচুর ধনাঙ্কন করেন। রাজার আদেশে সেইখানে একটা কালীদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এখানে সেই কালীদেবীর সেবাপূজা রাজ-প্রদত্ত নিকর ভূমির আয় হইতে হইতেছে। উহা সম্র হইতে ১৪ মাইল দূরে। আমি একদিন উহা দেখিতে গিয়াছিলাম। সেবাহিত ব্রাহ্মণেরা আমাকে বিশেষ যত্ন, সমাদর করিয়াছিলেন। সম্র হইতে সেখানে গোগাড়ীতে যাইতে হয়। যাইবার অস্ত্র উপায় নাই, তবে আমি চাহিলে রাজ কাছারীর হাতীতে যাইতে পারিতাম কিন্তু তদপেক্ষা গো-গাড়ীতে যাওয়াই আরাম-প্রদ। উহা একটা গ্রাম। আমার ভ্রাতৃ উৎসাহশীল বাঙ্গালী ব্যতীত অপর কেহ তথায় যায় না। কেবল বালুকারাশির উপর দিয়া কষ্ট করিয়া যাইতে কেহ রাজী হয় না। যে গ্রামে গিয়াছিলাম সেখানে মুসলমান নাই, কেবলই হিন্দু। বিশেষতঃ এ প্রদেশে মুসলমান অতি অল্প, তাহারাই হিন্দুর বাধ্য।

আমি তথা হইতে পুনরায় সম্র আসিয়া অগ্রজ বাওয়ার চেষ্টা করিলাম সেখানে বাঙ্গালী অভ্যস্ত। সেখান হইতে কোন বাঙ্গালী ভ্রমণকারী সম্র চলিয়া আসিতে পারে না। প্রবাসী বাঙ্গালীরা তাহাদিগকে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় আরো কয়েকদিন রাখিয়া দেন। আমিও সেইরূপ ব্যাপারেই পড়িয়াছিলাম। সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া একদিন তাহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বে সম্রত্যাগ করিলাম। তাঁহারা সকলে আমার সঙ্গে আসিয়া সেইখানে তুলিয়া দিয়া গেলেন। তখন হয়ত তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, “যারে বিদেশী বন্ধু এখন তোরে চাই না।”

জুজু

**အကုသိုလ်မရှိစေရန်**

১।	শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়।	৬।	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সরকার বি, এ।
২।	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	৭।	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৩।	শ্রীসতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত।	৮।	শ্রীহিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়।
৪।	শ্রীশ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ বি, এল্।	৯।	শ্রীতরেন্দ্রনাথ রায়।
৫।	শ্রীপরিমল কুমার ঘোষ এম্, এ	১০।	শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্, এ, ডি, এল্।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সরকার বি, এ, সাহিত্য-ভারতী

উঁহার পরিবারে উঁহার পত্নী জয়ন্তী, দুই কন্যা রেখা ও প্রতিমা এবং এক পুত্র অশোক। রেখার বয়স চতুর্দশ বৎসর—প্রতিমা একাদশে। পদার্পণ করিয়াছে। জয়ন্তীর অমুরোধে ও ডাক্তার বোসের পরামর্শে মনোরমা স্বাস্থ্যের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন করিতে কাশী যাত্রা করিল। জগদীশ দুই মাসের ছুটি লইয়া সঙ্গে চলিল। বিমল ডাঃ বোসের বাসায় রহিল। কাশীর পথে গাড়ীতে একেসার উৎকলের সহিত জগদীশের আলাপ পরিচয় হয়। উৎকলের পত্নী চাক্ষুশীলা ঘোড়ী তরুণী— উঁহার পিতার নামও জগদীশ। সে জগদীশকে পিতৃসম্বোধন করে এবং মনোরমাকে মা বলে। চাক্ষুশীলা ও অমলা কয়েক বস্তার কথোপকথনে সম্পর্কটাকে পাকাইয়া তোলে। উৎকলের ও চাক্ষুর যত্নে রোগক্লিষ্টা মনোরমার পথটা বেশ আরামেই কাটিয়া যায়। কাশীতে পৌঁছিয়া পিতামাতার



আদর সোহাগে ও যত্নে মনোরমার দিনগুলো বেশ কাটিতে লাগিল। দৈবাৎ একদিন মহেশবাবু নিরাভরণা কন্ঠার লেংটা মূর্তি দেখেন। মনোরমা পিতার নিকট আর আশ্বগোপন করিতে পারিল না। মহেশবাবু ক্ষোভে ও দুঃখে জামাতা জগদীশকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটা অপ্রিয় কথা বলেন। জগদীশ অন্তরালে থাকিয়া তাহা শুনিতে পায় এবং দৃষ্টির ও অপমানে মৃত্যুযাতনা ভোগ করে। মনোরমাও স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত অপমানে মৃতপ্রায় হইল এবং নানা উপায়ে স্বামীর মনোরঞ্জন করিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু অন্তরে যার ব্যথা উপর প্রলেপে তাহার কি হইবে? খণ্ডের তীত্র বাণে বিক্ষুব্ধিত জগদীশ আত্মমর্যাদাকে গুরুতর মনে করিয়া মনোরমার শত প্রয়াস ব্যর্থ করতঃ একদিন কাশী পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইল। মিং বোসের বাসায় গিয়া যখন দেখিল যে দুই মাস মধ্যেই বিমলের অপূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে তখন ‘জগদীশের মনে হইতে লাগিল যেন সমগ্র ভবিষ্যৎটা একটা গভীর অন্ধকারের

শত জিজ্ঞাসা প্রসারিত করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে।’ জগদীশ ভাবিল, দারিদ্র্যই আপনার জনকে পর করিয়া দেয়। সুতরাং ‘প্রচুর অর্থ চাই, যেন দৈত্যের সঙ্ঘোচ এড়াইয়া প্রিয়জনকে একান্তভাবে আপন করিয়া লওয়া যায়।’ সে চেষ্টার ক্রটি হইল না, আফিসে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কলমপেশার পর সকাল সন্ধ্যায় দুইটা টিউসনী জুটাইয়া লইল। তাহাতেও পিপাসার নিবৃত্তি হইল না। জগদীশ উপায়ান্তর অবেষণ করিতে লাগিল। সুযোগও ঘটিল। একদিন আফিস ছুটির পর ট্রামে নকুরচন্দ্র দার সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। নকুড়চন্দ্র উপভাসের পব্শিলায়। তিনি জগদীশকে উপভাস লিখিতে উৎসাহিত করেন এবং রাতারাতি বড় লোক হইবার ইহাই একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দেশ করেন। আগে জগদীশের শিথিলতার একটু একটু বাতিক ছিল। নকুড়চন্দ্র তাহাতে ইন্ধন যোগাইলেন। জগদীশ এবার মরিয়া হইয়া অর্থোপার্জনের পথটা পরিষ্কার করিয়া লইতে] মনঃ করিল।]

— এক —

সেদিনকার নকুড়চন্দ্রের উপদেশের ঝাঁজটা জগদীশের মাথায় পাকা বন্দোবস্ত করিয়া বসিল। জগদীশ বাসায় পৌছিয়া জামা কাপড় ছাড়িয়া দক্ষিণের বারান্দার বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। মুহূ মন্দ দক্ষিণে হাওয়া তাহার ধরা মাথাটা একটু শান্ত শীতল করিয়া দিল।

জগদীশ কেবলই ভাবিতে লাগিল একটা উপভাসের গুট। গুট কত রকমে মাথায় খেলিতে লাগিল, এক একবার এক এক রকম design করিয়া কল্পনার তুলিতে আঁকিয়া তখনই তাহা কাটিয়া ছাটিয়া আবার ভাবিতে লাগিল।

শিরপুচ্ছ কিছুই ঠিক রহিল না—সব ওলট পালট হইয়া গেল। জগদীশের অশান্ত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। উঠিয়া আসিয়া স্বীয় কক্ষে কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিল।

এ ভাবে বহু চেষ্টায় মাস তিনেক অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া জগদীশ একখানি উপভাস খাড়া করিল—‘শুভ দিন দেখিয়া উহার নামাকরণ করা হইল—“দরিদ্রের কু আশা।”

জগদীশ উপভাসখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া অসংলগ্ন স্থান কাটিয়া ছাটিয়া, আবশ্যক স্থল পূরণ করিয়া একদিন আফিসের পর অপরাহ্নে শ্রীমন্-নকুড়চন্দ্রের উদ্দেশে ছুটিল। পথে যাইতে যাইতে কল্পনার মোহময় মদিরায় মত্ত জগদীশের হৃদয়াকাশে ঘন ঘন আশার বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল মাঝে মাঝে আশির উপরে উৎফুল্ল অন্তরের বহির্নিষ্কাশ প্রকটিত হইতে লাগিল। জগদীশ কল্পনা-বলে তাহার ভবিষ্য অদৃষ্টাকাশে সুরম্য দৃশ্য নির্মাণ করিতে লাগিল। তাহার চিত্তচকোর সেই স্বপ্ন-স্বপ্না পানের নিমিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

অতি সতর্ক অনুসন্ধানের পরও যখন নকুড়চন্দ্রের সন্ধান মিলিল না, তখন সহসা তাহার আশা-শৌখিনীরাশার বজ্রাঘাতে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। জগদীশ ভাবিল, “হায়! ‘অভাগা যত্নপি চার, সাগর শুকায়ে যায়’;—এই বিশ্ব-সংসারই কি দরিদ্রের প্রতি এমন নিশ্চয় অকুটি করিয়া থাকে? জগদীশের স্বরণ হইল—যত্নে কৃত যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ। অনুসন্ধানের ফল হইল ভাবিয়া পকেট হইতে নোটবুক খুলিয়া বাড়ীর নম্বর দেখিয়া লইল। মা, তুল ত হয় নি—এই যে—নং বাড়ী। তবে কি সব উপহাস? বিংশিতার বিংশলীলা কি তা হ’লে বিরাট উপহাসেরই একটা জলন্ত বিকাশ?” হৃৎথে ও কোম্পানিতে জগদীশের বুকটা টন টন করিয়া উঠিল।

বেদনা ভরা বুক জগদীশ নকুড়চন্দ্রের চোক্ষ পুরুষের উদ্ধার কামনা করিতে করিতে এবং স্বীয় দক্ষ অদৃষ্টকে ধিকার দিতে দিতে মেষের দিকে প্রস্থান করিল। বাস্তবিক তাহার তৎকালীন বিবাহ-মাথা মুখখামা আঘাতে মেষের মতো গুরু গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল। মেষ হইতে ক্রমে তাহার অন্তরমধ্যে বিষম ঝটিকা উথিত হইল এবং অবশেষে যখন বর্ষণ আরম্ভ হইল, তখন সহসা তাহার কানে গেল,—“ওগো, মশাই!”

জগদীশ তাড়াতাড়ি নিজকে সামলাইয়া লইয়া উৎকর্ণ হইয়া ফিরিয়া চাহিল, দেখিল অজ্ঞাত-কুল-শীল জনৈক ভদ্রলোক। জগদীশ অগ্রসর হইয়া কাছে আসিলে ভদ্রলোক বলিলেন, “কাকে চান, আপনি?”

জগদীশ স্নানমুখে বলিল, “নকুড় বাবুকে।”

ভদ্রলোক সবিস্ময়ে একবার জগদীশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “নকুড় বাবু! নকুড় ব’লে ত এখানে কেউ নেই—ঠিকানা ভুল করেছেন বোধ হয়।”

জগদীশ পুনরায় নোটবুক consult করিয়া বলিল, “হাঁ, এই ঠিকানাই বটে। নকুড়চন্দ্র দা—নং কলেজ ঠাই। নকুড় বাবু পুস্তক পবলিশ করে থাকেন।”

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ স্থতির পর্যালোচনা করিয়া বলিলেন, “ও হোঃ, সেই নকুড়চন্দ্রের কথা বলছেন! তিনি তিন হুণ্ডা হ’ল কাজ গুটিয়ে উঠাও হ’য়েছেন। কত ভদ্রলোকের সর্বনাশ ক’রেছেন তিনি তার সংখ্যা নেই। আপনিও বোধ হয় একজন অথর (author), না? তা হ’লে—”

ভদ্রলোকটা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। জগদীশ একটু বিরক্তির স্বরে বলিল, “মা না, তা নয়, তবে আমার একটু প্রয়োজন ছিল, তাই—”

“ওঃ, আমার মনে হয়েছিল কি জামেন? খুব মেরে নিয়েছে বুঝি আপনার। যাক, ভাগ্যিস মেরে গেছেন কিন্তু এবার। কেন মশাই, এসব খুচরো পবলিশারের পেছনে ঘুরে নিজের এনাঙ্কটাকে নষ্ট করে দেন? যান না, একবার গুরুদাস বাবুর ওখানে, বেশ ছ’পয়সা হবে, নাম কামাতেও বেশী সময় লাগবে না।”

জগদীশের অতটা শুনিবার মতো ধৈর্য ছিল না। তাই “ধন্যবাদ” বলিয়া পঁচো মুখে সে স্থান ত্যাগ করিল। ‘কালনেমির লঙ্কাভাগে’র কথাটা স্বরণ হইতেই তাহার মনের ভিতরে এত হৃৎথেও একটু হাসি পাইল।

জগদীশের মাথাটা কম কন্ করিতে লাগিল। তখন গ্যাসের আলোর সহরটাকে ফুট ফুটে জ্যোৎস্নার মতো ছাইয়া ফেলিয়াছে। জগদীশ খেয়ালের বোকে সোজা পথ ছাড়িয়া বাঁ-হাতি রাস্তা ধরিল। রাস্তা একটা সরু গলির ভিতর দিয়া—সেখানে আলোর তত জাঁকজমক নাই। এখানে সেখানে ছ’একটা লাইট পোষ্ট যেম অন্ধকারে লাল নিশান উড়াইয়া বৃদ্ধাঙ্কুর প্রদর্শনে পথিকের কম্পাসের কাজ করিতেছে।

বহুক্ষণ ঘুরিয়া কিরিয়া শ্রান্ত দেহে জগদীশ মেষের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হৃৎথে ও বিরক্তিতে উপভাস লেখার নেশাটা তাহার একদম ছুটিয়া গেল।

—হুই—

এক বৎসর পরে।

বাহিরে গাঢ় অন্ধকার—অবিশ্রাম বৃষ্টি। সমস্ত বিশ্বের উপর কে যেন একখানা কালো পর্দা মুড়িয়া দিয়াছে—বিশ্বের নিখাস বৃষ্টি সে চাপে বন্ধ হইয়া যায়।

জগদীশ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, বসিয়া ভাবিতেছিল—জীবনটার উপর দিয়া কি বাড়ি বহিয়া যায়? এই সুখ, এই দুঃখ, আবার সুখ, আবার দুঃখ—ভারী বিচিত্র ব্যাপার! কাল এমন সময় আকাশ কেমন পরিষ্কার ছিল, উজ্জ্বল ছিল—হঠাৎ কোথা হইতে মেঘ আসিয়া সে উজ্জ্বলতা মুছিয়া দিয়াছে—আর আজ, সেই আকাশই কি কালো, কি অঁধারে ঘেরা! জীবনের প্রভাতে দিনগুলি তার উজ্জ্বল ছিল, আজ দুর্দশার মেঘে সেই দিনই ঘনকন্ধ্যা আবরণে আপনার সমস্ত উজ্জ্বলতা চাপা দিয়া বসিয়াছে!

মেসের কি আসিয়া বলিল, “ওগো, বাহিরে কে ডাকছে যে!”

এই বৃষ্টিতে বাহিরে কে ডাকিবে? জগদীশের পুকটা হঠাৎ ছাঁয়া করিয়া উঠিল, হৃদয়ে কেমন অত্যন্ত ঝাণিল, শরীর শিহরিয়া উঠিল। কানটা খাড়া করিয়া শুনিল সতাই বাহির হইতে কে ডাকিতেছে বটে। জগদীশ বাহির হইয়া আসিল; দেখিল বাহিরে দাঁড়াইয়া একটা ভদ্রলোক, মাথায় ছাতা—বৃষ্টিতে জামা কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। জগদীশ বলিল, “কে আপনি?”

ভদ্রলোক সবিনয়ে বলিলেন, “আমি উৎকল,—কাশী থেকে আসছি।” বলিয়া জগদীশের পদযুগল গ্রহণ করিলেন।

“বাবা, উৎকল,—বলিয়া জগদীশ হুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। জগদীশের হুই চোখ দিয়া অন্ধ নির্গত হইল। গদগদ স্বরে বলিল, “এস বাবা, যেতাম এস।”

ভিতরে গিয়া উভয়ে উপবেশন করিলে জগদীশ বলিল, “কাপড় ছেড়ে দাও, সব ভিজে গেছে যে!”

“না বাবা, এক্ষুনি আবার যেতে হবে। তা না হ’লে ওদিকে অস্থবিশেষ হবে যে!”

“এখনই যেতে পার না বাবা। এ দুঃখোগে এখানেই থাক, তারপর কাল যা হয় করো।”

“ওদিকে শিবকে দিয়ে সবাইকে বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছি—না গেলেই নয়।”

জগদীশ প্রফুল্ল মুখে বলিল, “তা’হলে মাও এসেছে, বল।”

“হা, প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার চাকুরী হয়েছে কিনা তাই! বাড়ী ভাড়া ঠিক হয়ে গেছে। মা ব’লে দিয়েছেন আজই আপনার সঙ্গে দেখা কর্তে, তাই তাদের পাঠিয়ে দিয়ে আমি বরাবর এখানে চলে এসেছি। এদিকে ভারী দুঃখোগ—এ গনিটুকু পেড়িয়ে আসতেই সব ভিজে গেছে।”

“কাশীর সব ভাল ত?”

হা। মা দু’তিন দিনের ভেতরই চলে আসবেন। তিনি বলেন, “বাসা ছেড়ে ভাল করেন না। আপনার শরীরও ভাল নয় দেখছি—এ দু’দিনের মধ্যেই একটা বাসা দেখুন।”

জগদীশ ভাবিতে লাগিল—সবই নিয়তির নিয়ম উপহাস বই ত নয়! গরীবের প্রতি এ অত্যাচার কেন বিধাতা?—জগদীশকে চিন্তিত দেখিয়া উৎকল বলিলেন, “মেসে থেকে খাওয়া দাওয়ার ভারী কষ্ট হচ্ছে—তা আপনার শরীরে সহিবে কেন? বাসা না হ’লে মারা যাবেন যে!”

জগদীশের বক্ষ হইতে একটা লঘু উচ্ছ্বাস বাহির হইয়া আসিল—বলিল, “বাবা, তা মাহুষ-মাত্রেরই ইচ্ছা বটে, তবে মাহুষের সবই জোটে না, ঈশ্বরের করুণা না হ’লে। দারিদ্র্যই সকল দুঃখ, সকল আকাক্ষার ধ্বংস করে থাকে। কলকাতার বাড়ীতে পোষা নিয়ে থাকা আমার পোষায় না যে।”

“সে জ্ঞাত ভাবতে হবে না। আমার যে বাড়ী ভাড়া হয়েছে, তাতে আপনাদেরও স্থান কুলাবে। জানেন ত, আমার লোকজন বেশী নেই। আপনার মেয়ে বলছে, এত বড় বাসায় তার একা মন কেমন করবে। তাই, মা থাকলে সংসারটাও চলবে ভাল। আপনার চেয়ে আমারই সুবিধে বেশী।”

জগদীশ রুতুজ্ঞতার অশ্রুমোচন করিয়া বলিল, “না বাবা, অত কষ্টে হবে না। আমরা যে গরীব। গরীবের দাঁতে অতটা সহিবে না। বেঁচে থাক তোমরা। তোমাদের যশে পৃথিবী ভরে থাক্—দেখে শুনে সুখী হই।”

উৎকল ছাড়িবার পাত্র নয়। দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, “তা হ’লে আমাদের পর ভাবেন আপনি? আমরা কিছ ছাড়িছি নে। আপনার না হোক আমাদের স্রবিশেষ তত্ত্ব অস্ততঃ মাকে আমাদের বাসায় রাখতেই হবে। আপনি অমত কর্কেন না বাবা, তা হ’লে বড় হুংস হ’বে।”

জগদীশ একবার আকাশ পানে চাহিয়া দেখিল, ঘন ঘন বিজ্যং চমকিতেছে। তাহার হৃদয়ের মধ্যেও একটা অনন্ততৃপ্তপূর্ণ আনন্দের তড়িৎ বহিয়া গেল। জগদীশ ভাবিতেছিল—এ সংসারটা মক্ভূমি। এখানে দয়া, মমতা, য়েহ বলিয়া কোন জিনিসই নাই। এই নিষ্ঠুর ধরণীর আব্রহ্মন্তব্য পর্যাস্ত সকল পদার্থই অর্থের লালসায় বদন ব্যাদান করিয়া আছে। হায়, অর্থই কি সব? যার অর্থ নাই সে কি বিধাতার নিষ্ঠুর অভিশাপ? যেখানে মানুষ নিজকে পর আর পরকে আপন করে নেয় সে স্থান কি অপক্লপ! উৎকল আমার কে যে, এতটা কষ্ট স্বাকার ক’রে, আর্থিক ক্ষতি গ্রাহ না ক’রে আজ তার করুণ বাহু বিস্তার করতঃ মূর্তিমতী করুণার মতোই আমায় হুংস দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্ত কর্কার জ্ঞাত প্রয়াস পাচ্ছে? ইহাই বোধ হয় করুণাময় পরমেশ্বরের অশঙ্কিত হস্ত-বিগলিত করুণার পবিত্র অমৃত-ধারা।

জগদীশকে নীরব দেখিয়া উৎকল সাগ্রহে কহিলেন,—“তা হ’লে আব এ দুর্যোগে আজ গিয়ে কাজ নেই। কাল সকালেই আমি শিবুকে দিয়ে গাড়ী পাঠিয়ে দোব। সব জুড়িয়ে রাখবেন আপনি। আর যেন কোন—”

জগদীশ বাধা দিয়া বলিল, “বাবা, তোমারও মায়ের এ অশাচিত করণাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। যদি সময় সময় তোমাদের দেখতে পাই তা হলেই আমার সকল দৈন্ত, সকল ক্লেশ দূর হ’য়ে যাবে। তুমি কিছু ভেবো না। আমি কালই একটা বাসা ঠিক করে ফেলবো, তোমার মা এসে সেখানেই থাকবেন। চাকুও ঘেন এতে অমত না করে।”

উৎকলের বুঝিতে থাকী রহিল না যে, মানুষ যে সে শত হুংসদন্ত-পীড়িত হইলেও কিছুতেই আত্ম-মর্যাদা ক্লু করিতে চায় না। জগদীশেরও তাহাই হইয়াছে। সে অকাতরে সকল সুখ বিসর্জন দিতে পারে, সংসারের গুণা, অবহেলা তাহার অচল-সদৃশ হৃদয় টগাইতে পারে না, কিন্তু আত্মমর্যাদা ক্লু হইলে তাহার মৃত্যুও শ্রেয়ঃ মনে হয়।

উৎকল শেষ চেষ্টা দেখিলেন, বলিলেন, “তা হ’লে ছেলে মেয়েকে ছেড়ে আপনি থাকতে চান, বণুন। তা না হ’বেই বা কেন? আমরা ত আর আপনার পর বই নয়।”

কথাগুলি জগদীশের মনঃস্পর্শ করিল। জগদীশ অগত্যা স্বীকৃত হইল। করুণা যেখানে মূর্তিমতী, সেখানে পাবাণ বিগলিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

—তিন—

পরদিন সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়াই জগদীশ দেখিতে পাইল শিবু গাড়ী লইয়া হাজির। মনোরমার ঐকান্তিকতা, চাকরীলার আবদার ও উৎকলের অনুরোধ এই ত্রাহস্পর্শ যোগে একান্ত বাধ্য হইয়াই জগদীশ তাহার থাক্তীয় আনন্দাংগু সহ শ্রুতঃ

উৎকল্লের দ্বিতল বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বাড়ীখানা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, প্রাঙ্গণে ময়লা নাই, মেজে তক্তকে। দ্বিতলের একটা বিস্তৃত প্রকোষ্ঠে জগদীশের স্থান হইল। ভৃত্য শিবু চাকরীলার ইজিতে ইতিপূর্বেই যথোপযুক্ত গৃহ সজ্জা করিয়া রাখিয়াছিল। এখন নবান্নীত স্রাবাদি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া স্বকার্যে চলিয়া গেল।

জগদীশ একাকী কক্ষে বসিয়া স্বীয় অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছে। এ'ত দিনের প্রতি দয়া, স্বীয় দৌর্বল্যের পরিচায়ক হচ্ছে উৎকল্লের এই করুণার দান। জগদীশের দীর্ঘ বক্ষ ভেদ করিয়া একটা উষ্ণ শ্বাস বাহির হইয়া অনন্ত প্রবাহে মিশিয়া গেল।

এমন সময় চাকরীলার প্রবেশ। চাকর জগদীশের চরণে প্রণাম করিয়া বলিল, “বাবা, আপনার শরীর ভাল ত?”

জগদীশ শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, “হাঁ মা, ভালই আছে।”

“মা বোধ হয় কালই আসবেন। এদিকে যা যা দরকার আমার একটা তালিকা দিন।”

“তালিকার দরকার কি মা? আমার যা দরকার নিজেই নিয়ে আস্বে। আজ ত রববার—আফিস নেই।”

“না থাক্। শিবুই নিয়ে আস্বে, আপনার কষ্ট কষ্টে হবে না।”

জগদীশ বলিল, “এত সুখ সহ্য হ'লে ত মা! যার নিত্য ভিক্ষা তত্ত্ব রক্ষা তার এত বড়-মানুষীতে দরকার কি?”

“জগদীশের অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা দীর্ঘশ্বাস অগত্যা বাহির হইয়া পড়িল। চাকর জিজ্ঞাসিল, “কি ভাবছেন বাবা?”

“ভাবছি তোমরা আর জন্মে আমাদের কি ছিলে?”

“আর জন্মে কি ছিলেম বলতে পারি নে অবশ্য, তবে এ জন্মে আপনাদেরই ছেলে মেয়ে তা জানি।”

এই আন্তরিক সরলতা এবং জগদীশ ও

মনোরমার প্রতি প্রীতি যে অকৃত্রিম তাহা জগদীশ অন্তরের অন্তরে বুঝিতে পারিল। তথাপি কি জানি কি একটা অভাবে নিতাই তাহার ভিতরটা একেবারে ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল।

চাকর নির্বন্ধাতিশাযে জগদীশ একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলে চাকর চলিয়া গেল।

উৎকল্ল সকালে কলেজের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া জগদীশের আগমনে তিনি যে কত সুখী ও কৃতজ্ঞ তাহারই একটা ক্ষুদ্র ভূমিকা দিয়া জগদীশকে আপ্যায়িত করিলেন।

পরদিন সন্ধ্যার পর মনোরমা ও কল্যাণ অমলা আসিয়া উৎকল্লের বাসা আগে করিয়া বসিল। জগদীশের আজ আফিস হইতে আসিতে গৌণ হইল। যেহেতু নূতন সাহেব গত কাল মাত্র আসিয়াছেন। আফিসের কাজ কর্ম বুঝাইয়া দিতে হইবে।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর। জগদীশ সারাদিনের কর্ম ক্লাস্ত দেহ লইয়া ছিন্ন পাছকা ও ভগ্ন ছাতা হস্তে গৃহে প্রবেশ করিল। দ্বারে মনোরমা—অমলা ইতিমধ্যেই নিজার ক্রোড়ে সারাদিনের খেলা ধুলার অবসান করিয়াছে। জগদীশ হাসিমুখে বলিল, “কখন এলে মনো?”

মনোরমা স্বামীর পদধূলি মস্তকে স্পর্শ করাইয়া বলিল, “এই ত সন্ধ্যাকালে। তোমার শরীর ভাল ত?”

জগদীশ উপবেশনান্তে মূহু হাস্তে বলিল—“হাঁ প্রাণগতিক ভালই আছি।”

মনোরমা ক্ষুদ্র স্বরে বলিল,—“প্রাণগতিক কেমন?”

“অর্থাৎ শরীরটা টিকে আছে বটে, মনটা বুঝি আর থাকে না।”

মনোরমা চম্ভিত হইয়া বলিল, “তুমি এত ভাবো কেন বল ত? ভেবে কি জগতে কেউ কিছু কষ্টে পেরেছে? যা যখন হ'বার হ'বেই। বিবিসিপি

কেউ খঙাতে পারে না। তবে ছাঁদনের সংগার, এর জন্ত ভেবে ভেবে শরীর খারাপ কর্তে যাই কেন? সুখ দিয়ে কি কর্কো, মনে শাস্তি থাকলেই হ'ল। তাতেই ত লোকে বলে "সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল।"

এদিকে চারুর ইঙ্গিতে শিবু একটি পরিষ্কার ঝাধানো ছাঁকোয় গম্বার সুগন্ধি তামাক মাজিয়া জগদীশের হাতে দিয়া গেল। জগদীশ তামাকে এক দম দিয়া বলিল, "যা বলে সত্যি বটে। দেখ ত কোথেকে কে এসে না আবার তোমার মেয়ে হ'য়ে বসুলো। ফলে, গম্বার তামাক, আর একেবারে From log cabin to white house কুড়ে গেছে প্রাসাদে।"

এই বলিয়াই জগদীশ হো হো করিয়া হাসিল। বহু দিন পর এই মন খোলা হাসি সত্যি সত্যিই জগদীশের বহুদিনকার একটা বৃকের বোঝা হালকা করিয়া দিল।

মনোরমা কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় চারু আসিয়া বলিল, "বাবা, আগে চাট খেয়ে নিন্, সারাদিনের খাটুনার পর বড্ড কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়।"

"কষ্ট কি মা? তুমি যে জলখাবার টেকে দিয়েছিলে তাতে যে ছাঁজনের পেট ভরে যায়। এতটা করো না, মা, এ শরীরে সইলে ত?"

"দেখ কথার ছিরি" বলিয়া চারু চলিয়া গেল। মনোরমা বলিল, "যাও, রাত হয়েছে। মেয়েটা তোমার জন্তে ভাত কোলে ক'রে বসে আছে, এখনও খান্নি। বলে,—না খেতে খেয়ে বসে থাক্‌বো, ছিঃ।"

জগদীশ মনে মনে চারুর কুশল কামনা করিয়া আনিকান্তে আহার সন্ধান করিল।

\* \* \* \*

কপ্‌কাতা নিরব নিম্ন—সকলেই নিজার কোলে অধোর নিজায় মগ্ন। জগদীশের গোখে ঘুম নাই—কেবল এপাশ ওপাশ করিতেছে। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, কোথাকার কে উৎফুল্ল আর চারু? পথের চেনা বই ত নয়। আর কোথায় কে কার

জন্তে এত করে? নিজে আছি বেশ, তা নয় আবার সপরিবারে। মেয়েটাও ত বাড়ন্ত কম নয়—যেন জিওমেট্রিকেল প্রোগ্রেশনে বাড়ছে। সেদিনকার মেয়ে। আর বড় জোর এক বছর—তারপর? তারপর আর কি, বাঙ্গালার মেয়েদের যা ঘটে থাকে তাই—বলিদান। তা বই কি? যার পেটে ভাত নেই, পরিধানে বস্ত্র নেই, এমন কি থাকবার যোগ্য একখানা কুড়েও নেই—যা পথের ভিখারীদেরও থাকে—তার আবার মেয়ে কেন? লোকে বলে, যার যার কপাল জোরেই চলে যায়, কে কার কি কর্তে পারে? মনোরমাও দেখছি তাই ভেবে ব'সে আছে। আরে, পারে না বটে, তবে কেবল কপালজোরেই ত সব চলে যায় না, একটু চেষ্টা উজোগণ্ড ত চাই। 'ধর রে লক্ষণ' বললেই ত চলবে না। যাক্, ভেবে কি হ'বে?

জগদীশের দেহ চিন্তায় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তবু চিন্তার স্রোত চারুপাঠবর্ণিত পুরুভুজের মতই একটীর পর একটা গজাইয়া জগদীশের ক্লান্ত মনকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। তাহার এই চলচ্চিত্রতা মনোরমার চক্ষু এড়াইতে পারিল না। মনোরমা বলিল, "তোমার কি হ'য়েছে? তুমি অমন করছো কেন?"

জগদীশ কুকর্ষাসক্তের মতো শিহরিয়া বলিল, "কি করছি, মনো?"

"ঘুমোচ্ছ না যে!"

জগদীশ হাসিয়া উঠিল,—মনোরমা অমুভব করিল, সে হাসি যেন জোর করা হাসি, প্রাণের ক্ষুষ্টি তাতে নাই।

মনোরমা বলিতে লাগিল, "কেমন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছ, খাও দাও না তেমন। মুখখানিও ব্যাজার, ব্যাজার। কি যেন ভাব, রেতেও ঘুম নেই।"

জগদীশ আবার হাসিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু হাসিটা আগেরকারের মতই ফুটিল না। "পাগল! পাগল!" বলিয়া হাতখানি মনোরমার কাঁধের উপর

ফেলিয়া, জগদীশ মনোরমাকে আপনার বুকের কাছে টানিয়া লইল।

মনোরমা আদর করিয়া বলিল, “বল, সত্যি বল, তুমি কি ভাবছো?”

জগদীশ মনোরমার মুখখানি আদর করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল, “কি মনে করি, শুনবে মনো? আমার ঘরের হাসি, প্রাণের হাসি তুমি, সেই হাসি যেন ম্লান করো না? তুমি আমার সেবার দাসী, রসালোপে সখী, পরামর্শে মন্ত্রী—জানলে?”

এই বলিয়া জগদীশ মনোরমার মুখখানিতে শুক অধরে একটা চুষন মুদ্রিত করিয়া দিল। মনোরমা মুখ ছাড়াইয়া লইয়া, অপর দিকে ফিরাইয়া ছ’ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল, স্বামীর অজ্ঞাতে মুছিয়া ফেলিল। তারপর কিরিয়া স্নেহবিগলিত স্বরে বলিল, “ও সব হাসি-টাসি খেলার কথা এখন থাক। তোমার জী আমি, কিন্তু তুমি আমার কিছু বললে না।”

“কি বলবো মনো?”

“তোমার মনের সব কথা।”

“তা শুনলে তোমারও যে ঘুম হ’বে না, মনো!”

“চাই নে এমন ঘুম, তুমি বল। তুমি সহিতে পারলে আমিও খুব পারবো।”

“পারবো? তবে শোন। দারিদ্র্যই আমার ভাবনার মূল। দারিদ্র্যই পিতা পুত্র, পতি পত্নীতে অনৈক্য ঘটে। দারিদ্র্য বিধাতার নিষ্ঠুর অভিশাপ। এই অভিশাপের অলস্ত আশুনে তোমার আমার, বিমলে ও সর্বোপরি অমলার গুড়ে ছাই হ’তে হবে। আশুনে ফুংকার দিলে তা না নিভে যেমন আরো দপ-দপ-অলতে থাকে, মানুষের করুণার দান তেমনি দারিদ্র্যকে আরো নির্মম সুস্পষ্ট করে তোলে, বুঝলে?”

শেষটায় মনোরমার অন্তরে তীব্র কষাঘাত করিল। মনোরমা বলিল, “কমা কর এবার, তারপর তুমি যা করবে তাতে আর কিছুই বলবো না।”

—চান্দ—

ভাগ্য দেবতার কাছে কোন্ অজানিত অপরাধের ফলে পরিপূর্ণ ঘোবনেই যেদিন রেখা ভোগ ঐশ্বর্যের রাজ্য হইতে নির্বাসিতা হইয়া ব্রহ্মচারিণীর ব্রত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল সে দিন হইতেই ডাঃ বোসের পরিবারে একটা আকস্মিক পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। বোস পরিবারে সে হাসি, সে আনন্দ নাই,—সহসা যেন একটা দম্কা হাওয়া আসিয়া সে হাসি আনন্দের দীপটাকে নির্বাপিত করিয়া আবার কোন্ অজানা দেশে উধাও হইল।

সর্ব্বদারা নিঃস্বল্প যখন সাহারার মাঝখানে শান্তিধারার আশ্রয় দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছিল তখন আপনার অস্তিত্বটাকে সম্পূর্ণরূপে তুলিবার জন্ত রেখা কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু ইহাতে প্রতিবন্ধক ছিল তাহারই অন্ধের নড়ি, স্বামীর শেনদান—লেখা। লেখাকে লইয়া সম্ভববিধা রেখা সাতিশয় দুঃখ দৈন্তের মধ্য দিয়া, পার্থিব সকল আলোচনা সমা-লোচনার সীমা অতিক্রম করিয়া এ যাবৎ স্বামীর মাটি কামড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমেই যখন দেবর কাশীনাথ দিনের পর দিন নানা ছলে বলে কৌশলে বিধবার সম্পত্তিগুলি হস্তগত করিয়া অবশেষে শেষ সম্বল বাস্তভিটানিও গ্রাস করিল তখন হতভাগিনী রেখার এক মুহূর্তের জন্তও সোয়াস্তি ছিল না। সে স্বর্ধ্যকরোচ্ছল পৃথিবীটাকে শীতের কুরাসাচ্ছন্ন রজনীর মতো অন্ধকারময় দেখিতে লাগিল। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বামীর ভিটের দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু রাখিয়া রেখা পিতামাতার আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

বাস্তবিক কাশীনাথ ছিল সেই প্রকৃতির লোক যে বোঝার উপর শাঁকের আটটাকেও অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক ভার বলিয়া বোধ করে। কিন্তু যখন লেখার পিতা পত্নী ও কন্তাকে রাখিয়া অজানা দেশের পশ্চিক হইলেন তখন দাদার মোটা পাওনা সম্বন্ধে কাশীনাথের একটা বড় রকমের বরাদ্দ ছিল। যেহেতু

দাদা তহশীলদারের কার্য করিতেন এবং তাঁহার চালচলনও খুব বড়মানুষী ছিল। কিন্তু সে যখন দেখিল দাদার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বোদির ও লেখার উদর পোষণ সম্বন্ধে নিতান্তই অপর্যাপ্ত, তখন তাহার বোদির প্রতি অকৃত্রিম ভক্তিটা নিমেষে কর্পুরের মতো উবিল্লা গেল। এবার সত্যসত্যই রেখা ও লেখার শুভাগমনটা তাহার নিকট নিতান্ত অশুভ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে নিজের মূর্ত্তার জন্ত অহরহ নিজকে বিক্রয় দিতে লাগিল।

বাহা হোক কাশীনাথকে সেজন্য বেগীদিন অমুতপ্ত হইতে হয় নাই। তাহার সহধর্ম্মিণী ভৈরবী (পিতৃদত্ত নামটা কি জানা নাই, তবে বিশ্বস্ত হৃদ্রে অবগত হইয়াছি সে পিত্রালয়ে কাণীতার নামে অভিহিত হইত। নামটার সঙ্গে বর্ণের সৌন্দর্য আছে বলিয়া ইহা দুই গোকের অভিধান হইতে পারে। যেহেতু পিতামাতার কাছে ‘কাণা ছেলে পদ্মলোচন’ হইয়া থাকে। বাহা হোক আমরা কাশীনাথ-পত্নীকে ভৈরবী নামেই অভিহিত করিব, কারণ, তাহার ক্রোধদীপ্ত চামুণ্ডামূর্ত্তি ঋগুরের দেশে তাহার ভৈরবী নামের সার্বকতা সম্পাদন করিয়াছে।) স্বামীর চিন্তার ভার লবু করিবার জন্ত নিতান্ত গায়ে পড়িয়াই একদিন বলিল, “বলিহারি, তুমি যে বুদ্ধির কাঁঠাল! ‘আপনি শোবার স্থান নেই শক্তরাকে ডাকে।’ নিজেরই পেট পূরে ছ’বেলা জোটে না, আবার বারো ভূতের পেটযোগানোর দানলজ খুলে ব’সে আছ। ঈশ্বর ছ’টো গুড়ো দেখিয়েছেন, নিজের ভেবে ভেবে দিন দিন সারা হচ্ছে। ঈশ্বর না করুন, যদি এটা ভাল মন্দ হয় তা হ’লে ওদের নিয়ে পথে বসতে হবে দেখছি।”

কাশীনাথ অমুতপ্ত হয়ে বলিল, “তাই ত, কি করি বল। খুব ঠকেছি কিন্তু এবার।”

ভৈরবী নথ নাড়িয়া বলিল, “ঠকবে না! তোমার ঘটে যে বুদ্ধি! তাদের পাঠিয়ে দাও না বৌর বাপের বাড়ী। শুনছি তারা বড়গোক।”

“হাঁ, বলা সহজ বটে। আমিও যে তা না

ভেবেছি তা নয়। জানই ত, দাদা যখন মারা যান, তখন তাদের নিতে এয়েছিল বৌর বাপের বাড়ী থেকে, কিন্তু বৌ এই চুলোর মাটা কামড়ে র’ল এখানে।”

ভৈরবী বলিল, “খোৎ! তাই তোমায় লোকে বলে ‘গোবর গণেশ’।”

“লোকে নয়, তুমিই—”

উভয়ে যুগপৎ উচ্চ হাসিয়া উঠিল। হাত্ত সংযত করিয়া ভৈরবী বলিল, “তাদের ভিটে মাটা ছাড়া না কল্লো এখানেই পড়ে থাকবে।”

“ঠিক বলেছ, কিন্তু মেও ধবে কে?”

ভৈরবী পুনরী দাঁতে দাঁত খিচাইয়া কাশীনাথের কানে কি পরামর্শ দিল। প্রকাশ্যে বলিল, “বুলে? সাপও মরে, লাঠীও না ভাঙ্গে।”

“একে মনসা তার আবার ধ্যার গন্ধ”—কাশীনাথ লাফাইয়া উঠিল।

আর কথা হইল না। কাশীনাথের ম্যাক্বেথের বঙ্গানুবাদ পড়া ছিল। স্বীয় পত্নীর দিকে একবার চাহিয়া লেডী ম্যাক্বেথের কথা স্মরণ হইল। বুকটা দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভৈরবীর ভৈরব হৃদ্য তাহার সকল চিন্তার অবসান করিয়া দিল—“কালই একাজ কর্তে হ’বে।”

“তথাস্ত”—বলিয়া কাশীনাথ নিদ্রার কোলে বিশ্রাম করিল।

পরদিন সকাল বেলা। কাশীনাথ মহাজন নিমচাঁদের সঙ্গে কি পরামর্শ করিয়া আসিল। কেহ কিছু জানিল না—সরগা রেখার মস্তক লক্ষ্য করিয়া যে বজ্র উত্তত হইয়াছে তাহা সে ঘুগাকরেও টের পায় নাই—পাওয়ার আবশ্যকতাও তাহার ছিল না, সে আপন মনে নিজ কর্তব্য করিয়া যাইতে লাগিল।

ফলে দেখা গেল ত্রিরাত্রি না যাইতেই বিধবার খুঁদে মাটা নিমচাঁদের করাল কবলে। কাশীনাথ প্রকাশ্যে বলিল—“কি কর্কী, সকলই অদৃষ্ট! তা না হ’লে দাদা এত বড় চাকরে হয়েও নিমচাঁদের



দায়মুক্ত না হ'য়ে যাবেন তা কে স্বপ্নেও ভেবেছে ? হাঁ, ঋণদায় বড় দায়। শাস্ত্রেও আছে, ঋণের শেষ, পাপের শেষ রাখতে নেই। দাদা ঋণমুক্ত হ'লেন তাই যথেষ্ট।”

দাদার ঋণ-মুক্তিই কানীনাথের অভিপ্রায়-তাই সে নিমচাঁদের কার্য্য অবৈধ মনে করিতে পারিল না, বরং বৌদি ও ভাইঝি ত আর পর নয়, তাহাকেই এদের পালন করিতে হইবে ইত্যাদি বলিয়া সে সকলের নিকট আত্মদোষ-ক্ষালনের সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিল না। কিন্তু বাস্তবিক বাহারা কানীনাথকে জানিত তাহারা গোপনে কানাবুধা করিল।

একদিন ভৈরবী স্বামীকে গোপনে পাইয়া হাসির লহর তুলিয়া বলিল, “দেখ্লে, কেমন বুজির দৌড় !”

কানীনাথ স্নান মুখে বলিল, “হাঁ, জীবুজি প্রলয়ঙ্করী।”

ভৈরবী হাসিয়া বলিল, “হবেই ত—আমার ওকালতির ফিস্টা—”

“ওঃ, না, মারা যাবে না। নিমচাঁদ থেকে নিও।”

“কি বলছো তুমি ? পাগল হ'লে নাকি ?”

“পাগল হই নি, সত্যি বলছি। ভোগটা যখন তার পেটেই গেল, ফিস্টা সে দেবে না ত কি আমি দেবো ?”

“সত্যি ?” ভৈরবীর কালো মুখখানা আরো কালো হইয়া গেল।

“কানীনাথ জুকুট করিয়া বলিল, “সত্যি না ত কি আর মিথ্যে বলছি ? দরকার ?”

ভৈরবী এবার একদম বসিয়া পড়িল।

নিমতি অলক্ষ্যে থাকিয়া বোধ হয় হাসিলেন।

— পাঁচ—

প্রতিমা দিনের পর দিন শত্রুর মুখে ছাই দিয়া, লোকনিন্দার পূর্ণ উৎস খুলিয়া বারো পাড়িয়ে তেরোয় পা দিয়াছে। বয়স কাচা হইলেও তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শনে তাহাকে ঘোড়শী তরুণী বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। প্রতিমা সত্য সত্যি প্রতিমা—সুনিপুণ তুলিকার

পূর্ণ বিকাশ। যেদিন বিমলদের বাড়ীতে তাহার সহিত বিমলের প্রথম সাক্ষাৎ হয় সেদিন তাহার চাক্ষু্য সকলকে উত্ৰাক্ত করিয়াছিল, কিন্তু তার পর দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই প্রতিমার দেহে যৌবনের লক্ষণ-গুলি বিকাশ লাভ করিয়া তাহাকে জানি না, কোন্ ইন্দ্রজাল-প্রভাবে সহসা স্ত্রীলা ও গৃহকর্মে নিপুণা করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার চরিত্রের এই অপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিমলকে একদিকে যেমন বিস্মিত করিল, অপরদিকে তেমনি সে যেন কি একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে তাহার নিতান্ত পক্ষপাঠী হইয়া উঠিল। প্রতিমার চরণ-ক্ষেপণ, কঙ্কন-নিকন, বিশেষতঃ কোকিল কণ্ঠস্বর বিমলকে কি এক মোহমদিরায় মত্ত করিয়া তুলিত, তাহা সে খোস মেজাজে বাহাণ তবিরতে চিন্তা করিয়া নিজেই মনে মনে নিতান্ত লজ্জিত হইত। প্রতিমাও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিমলের চঞ্চল ত্বিৎ চক্ষুর্দ্বয়ের নিতান্ত ভুলভ হইয়া উঠিল। এই দুরত্ব বিমলের চিত্ত-পটে প্রতিমার এক অপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিত।

বাহা হোক সুযোগ ঘটয়া গেল। যে দিন রেখা তাহার বৈধব্যের বেশ ধারণ করিয়া পুনরায় পিত্রালয়ে আসিয়া পূর্ণস্থান অধিকার করিল সেদিন হইতে প্রতিমার মনে কি জানি কি একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটয়া গেল। রেখার সেই দীন বেশ, রুস্ত কেশ ও সর্বোপরি নিয়ত স্নান মুখখানি প্রতিমার অন্তরে এক বিভীষিকার সঞ্চার করিল—সে সর্বদা রেখার চক্ষুর অন্তরালে নিজকে টানিয়া রাখিত। ইহা রেখার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না বটে, কিন্তু প্রতিমার সেই নির্মল মূর্তিখানিতে কালিমা স্পর্শ করে তাহা তাহার আদৌ সহ্য হইত না। তাই সে প্রতিমার স্বেচ্ছাগতিতে কখনো বাধা দিত না।

প্রতিমার সঙ্গী ছিল লেখা। লেখার ক্ষুদ্র চম্পক-কালিকা সদৃশ অঙ্গুলিগুলি টিপিয়া ধরিয়া যখন তার গণ্ডদেশে যথেষ্ট চূষন মুদ্রিত করিয়া দিত তখন কি এক প্রেমরসে কিশোরীর সর্বদেহ সিঞ্চিত হইত।

মাঝে মাঝে পুলকিত দেহে বালিকার ক্ষুদ্র অঙ্গ বক্ষে  
চাপিয়া ধরিয়া সে অশ্রু মোচন করিত ।

একদিন ছপুর বেলা—বিমল তখন কলেজে ।  
সকাল বেলা হইতেই আকাশে মেঘগুলা আনাগোনা  
করিতেছিল । টুপ্ টাপ্ করিয়া ছই এক ফোঁটা  
বৃষ্টি পড়িতেছে ।

লেখা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে । প্রতিমা নিজকে  
নিতাস্ত নিঃসঙ্গ বোধ করিতে লাগিল । সে ধীরে ধীরে  
বিমলের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহারই হারমোনিয়মটা  
খুলিয়া স্বর ধরিল, কিন্তু বহু দিনের পরিত্যক্ত  
হারমোনিয়ম বেহুয়ো বাজিতে লাগিল । প্রতিমা  
এদিক ওদিক নাড়িয়া, স্বীয় বজ্রাঞ্চলে ইহার হারমোনিয়ম-  
জীবন ধন্ত করিয়া পুনরায় কোমল অঙ্গুলি-সংযোগে  
'সা, রে, গা, মা' ভাজিতে লাগিল । এবার স্বর  
উঠিল । প্রতিমা গান ধরিল—

তুমি কেমন করে' গান কর যে গুলী,

আমি অবাধ হয়ে শুনি, কেবল শুনি ।

স্বরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে

স্বরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে

পাখাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে

বহিয়া যায় স্বরের সুরধুনী !

প্রতিমার সেই বলিত কণ্ঠের বিচিত্র স্বর কক্ষ  
ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে অনন্ত আকাশে ছড়াইয়া  
পড়িল । সে জানিতে পারিল না যে তাহারই  
প্রতীক্ষায় যে এতদিন তুষিত চাতকের মতো আকাশ  
পানে চাহিয়াছিল সে তাহারই কক্ষে বসিয়া  
তাহারই গুচ্ছ কণ্ঠে সুলীতল অমৃতধারা ঢালিয়া  
দিতেছে । বিমল কিছুদিন হইল সময়ে অসময়ে  
প্রায়ই কলেজ হইতে চলিয়া আসিত । সেদিনও  
আসিল, দেখিল কাকের নীড়ে কোকিলা—তাহারই  
মানস-প্রতিমা । তখন বিমল অন্তরে একটা উৎকট  
উৎকণ্ঠা নিয়া কক্ষের পশ্চাৎভাগে নিঃস্পন্দ ভাবে  
নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া প্রতিমার কণ্ঠবিগলিত সুরধুর  
সঙ্গীতের অমৃতধারা ধখেছ পান করিতে লাগিল ।

কিন্তু যখন বিমল খিড়কীর পথে প্রতিমার অনিন্দ্য-  
সুন্দর প্রতিমাখানি দেখিয়া লইল তখন একটা ভাবী  
অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল ।  
সে দেখিল প্রতিমার চোখ দুটোতে যেন আঁধা সে  
স্বাভাবিক দীপ্তিটুকু নাই, মুখেও কেমন বিষন্নতার  
ছায়া পড়িয়াছে । একটা তীব্র বেদনার তাহার মন  
টন টন করিয়া উঠিল ।

ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি নামিল - ঘন ঘন বিদ্যুতের খেলা,  
বাতাসও বেশ প্রবল । আকাশে একুতির তাপ-ব-  
লীলা । বিমল আর নিভৃত আত্মগোপন সমীচীন  
মনে না করিয়া চঞ্চল পদে কক্ষে প্রবেশ করিল ।

সহসা পথে সাপ দেখিলে পথিক যেমন চমকিয়া  
উঠে প্রতিমাও তেমনি অকস্মাৎ বিমলের অভাবনীয়  
আগমনে নিতাস্ত অপ্রতিভ হইল । তাহার গোলাপী  
গণ্ডম্বর দেখিতে দেখিতে আরো রক্তাভ হইল, সঙ্গীতের  
স্বর কোন্ এক অদ্ভুত কবাঘাতে সহসা থামিয়া  
গেল, হারমোনিয়মটা বৎসহারা গাভীর মতো বেতালে  
হাষারব করিতে লাগিল ।

বিমলও প্রতিমাকে দেখিয়া বিশ্বাসের একটা  
কৃত্রিম অভিনয় করিল । কিন্তু কণ্ঠে সহসা বাক্‌স্ফুটি  
হইল না । সে কথা কহিবে কি—তাহার বাক্‌শক্তি  
একেবারে গোপ পাইয়াছিল । প্রতিমার কণ্ঠনিঃসৃত  
সেই অপূর্ণ সঙ্গীতস্বর, আর তাহার স্নেহ বজ্রাস্ত্রের  
অভ্যন্তরে যে মোহিনী প্রতিমা—তাহা দেখিয়া সে  
এমনই আত্মহারা হইয়া পড়িল যে তাহার খেয়ালই  
ছিল না, এই যে অনুভূতি তাহাকে গ্রাস করিতেছে  
ইহা সুখের, না, যাতনার । তাহার মনটা এক  
বিষম ঘূর্ণীগাকের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে  
লাগিল । হাঁস ছিল না । তার পর হঠাৎ তাহারই  
সম্পূর্ণ অজ্ঞাতভাবে একটা কম্পিত স্বর ফুটিয়া  
উঠিল, —“প্রতিমা—”

সহসা কাহাকেও অতর্কিত চাবুক মারিলে  
তাহার যেমন মুখের ভাব হয় প্রতিমার মুখেও  
ঠিক তেমনি একটা কাতরতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল ।

বিমলের সতর্ক দৃষ্টি তাহা ধরিয়া ফেলিল। সে সাহস সঞ্চয় করিয়া পুনরায় ডাকিল—“প্রতিমা—”

এবার প্রতিমা হারমোনিয়মটা ধীরে ধীরে যথাস্থানে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অপলক দৃষ্টিতে বিমলের মুখপানে চাহিয়া নত বদনে উত্তর করিল, “কি?”

উত্তরটা বড়ই সংক্ষিপ্ত হইল। বিমল ভাবিল, সেই চঞ্চলা পরিহাসরসিকা প্রতিমার এ কি অদ্ভুত পরিবর্তন! সে বড় দায়ে পড়িল। এখন আবার কি জিজ্ঞাসা করিবে তাহাই ভাবিয়া কুল পাইল না। কিন্তু কিছু না বলিলেই নয় ভাবিয়া বলিল, “তুমি আজকাল পড়াশুনা করছো না যে!”

প্রতিমা বিমলের নিকটই পড়া বলিত। বলিল, “ছেড়ে দিয়েছি।”

আবার সংক্ষেপ! বিমল একটু পরিহাস-লসিত কর্তে বলিল, “গান বাজনাও—”

প্রতিমা নিরুত্তর। সে যে লুকাইয়া গান বাজানো করে তা বিমলের কাছে আর গোপন করা চলে না।

বিমল ধীরে ধীরে এক খামি চেয়ার টানিয়া বলিল। প্রতিমার চাঞ্চল্য দেখিয়া বলিল, “যেও না, প্রতিমা ভয়ানক জল যে। একটু অপেক্ষা কর জল খেমে যাক!”

বিমলের কক্ষ অন্তরীকটি হইতে একটু দূরে ছিল। সুতরাং প্রতিমাকে যাইতে হইলে জল মাথায় না করিয়া যাওয়ার উপায় ছিল না। অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও লজ্জা ও সঙ্কোচে কাতর হইয়া সে যথাস্থানে উপবেশন করিল।

উভয়ে নীরব—কিন্তু উভয়েরই অভ্যন্তরে তুমুল ঝটিকা বহিতেছে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ খেলিতেছে, আবার আধারে চারদিক্ ছাইয়া ফেলিতেছে। বিমল এক সময় চাহিয়া দেখিল, প্রতিমা বাহিরের নূক প্রকৃতির দিকে চাহিয়া আছে। বলি বলি করিয়াও বিমলের কি জানি কি বলা হইতেছে না। অবিরত তাহার

অন্তরে প্রতিমার সেই বাশরী-কণ্ঠ মিহিস্বরে বাজিয়া উঠিতে লাগিল।

সহসা ককড় শব্দে চারদিক কাঁপাইয়া দীপ্ত আলোর আকাশ ভরাইয়া অদূরে বাজ পড়িল। প্রতিমা সরিয়া আসিয়া বিমলের হাত চাপিয়া ধরিল। বিমলের দেহের মধ্য দিয়া এক তীব্র বিদ্যুৎ-শিখা — গেল। সে মুহূর্ত্তে ডাকিল,—“প্রতিমা—

প্রতিমা কথা কহিল না। বিমলের মাথা ঘুরিতেছিল—পাংগলের মতো সহসা সে ছুই হাতে প্রতিমাকে আপনার বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “প্রতিমা, আমি তোমায় ভালবাসি, বড় ভালবাসি।”

প্রতিমার মুখে তেজের একটা দীপ্ত রেখা ফুটয়া উঠিল। সহসা সে বিমলকে প্রচণ্ড ভাবে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, “বিমল দা—”

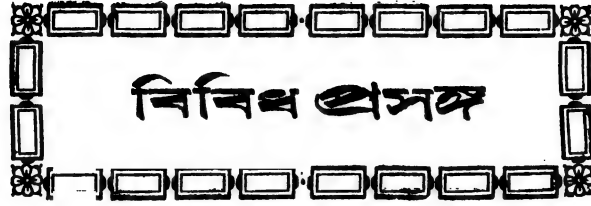
বিমল একেবারে ভড়কাইয়া গেল। প্রতিমা বলিতে লাগিল, “এত স্পর্ধা আপনার! একা পেয়ে আজ আমার এমন অপমান!”

বিমলের শরীর অবসর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে সসঙ্কোচে ক্ষুণ্ণ চিত্তে বলিল, “ক্ষমা কর, প্রতিমা, আমি সত্যি তোমায় বড় ভালবাসি।”

প্রতিমা আরো দৃপ্ত স্বরে বলিল, “ভালবাসা আর উচ্ছৃঙ্খলতা এক নয়, বিমল দা। জগতে অনেকেই অনেকে ভালবাসে থাকে, তা ব’লে ভালবাসার অপমান করে কেউ ভালবাসা লাভ করে নি, কর্তে পারে নি।”

বিমল লজ্জায়, ক্ষোভে ও হুঃখে নিতান্ত ভ্রিয়মান হইল। প্রতিমা বলিতে লাগিল, “এ আত্মসম্মান ক্ষমা নেই। অবলা পেয়ে পুরুষরা মেয়েদের অপমান কর্কে, আর তারা মীরবে সচ্ছ কর্কে? কথখনো না, সচ্ছেরও একটা সীমা আছে। আপনি সে সীমা অতিক্রম করিয়েছেন। যান, একুনি চ’লে যান আপনি।”

এই বলিয়া প্রতিমা বিদ্যুৎ-শিখার মতো ক্ষিপ্ত সে কক্ষ ত্যাগ করিল। বিমল হতাশ চিত্তে সেই শূন্য কক্ষে বসিয়া বাহিরের বিতীষিকাময়ী প্রকৃতির দিকে উদাস প্রাণে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া বারিধারা অজস্র নির্গত হইতে লাগিল—সে অবশ্যই প্রেমের জীতল অশ্রু নয়, ঘৃণার ও অপমানের তপ্ত অশ্রু-ধারা। অতঃপর বিমল জলধারা মাথায় করিয়া রাস্তার বাহির হইয়া পড়িল।



## বিবিধ প্রসঙ্গ

### তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্য ও লাভ

অধ্যাপক শ্রীমাধবদাস চক্রবর্তী

এম্ এ, সাংখ্যতীর্থ

যশপুত্র, পুণ্য পুত্র ব্রত হইতে আরম্ভ করিয়া অহং গ্রহ উপাসনা পর্যন্ত হিন্দুর সমুদয় কর্মই ব্রহ্মাভিমুখী। হিন্দুর শাস্ত্রানুসারে আহাঁর বিহার প্রভৃতি সকলই তাহার শরীরকে প্রক্ষাণ্ডিত উপযুক্ত করিয়া তোলে। রাহিব্রাহ্মেই সব, রজঃ তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ বর্তমান আছে। তমোগুণি রাহিষের চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া রাখে, ত্রিনিষের প্রকৃত বরূপ দেখিতে দেয় না এবং শরীরকে গুরুভারযুক্ত করে বলিয়া নড়িবার চড়িবার সামর্থ্যও থাকে না। রজোগুণি মানুষকে কর্ণে চালিত করে, কিন্তু অহির-বভাব বলিয়া তাহা দিগকে হুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। সবগুণি শরীরকে লম্বু ও উত্থানযোগ্য করে এবং অককারের ধবমিকা দূর করিয়া দিয়া বস্তুর বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়। সত্যের ধরূপ অবগত হওয়াই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, তাই সমুদয়গুণ অশূল্য করিতে হইবে।

মানব-শরীরে দুই প্রকার বল আছে—বাহ্য বল ও আন্তর বল। এই বিবিধ বল দূর করিতে আন্তর ও বাহ্য এই বিবিধ পৌণ্ডের প্রয়োজন। যুক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে বাহিরের বল এবং মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তরীক্ষের নিগ্রহ দ্বারা ভিতরের বলের শোধন করিতে হয়। শরীরে ধূলি কাঁচা লাগিলে অথবা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে পিচুটি, খইল প্রভৃতি নির্গত হইলে অল ও কার যুক্তিকার সাহায্যে তাহা অনায়াসে দূর করিতে পারা যায়, কিন্তু মন বুদ্ধ্যাদির দৃষ্ট ভাব অপনোদন করা অতীব কষ্টসাধ্য কার্য। শরীরের সহিত মনের যে সখ্য, বহিঃ পৌণ্ডের সহিত অন্তঃপৌণ্ডেরও সেই সখ্য। য রীর ভাল না থাকিলে যেমন মনও ভাল থাকে না, বহিঃ

পৌণ্ডের অনুষ্ঠান না করিলেও সেইরূপ অন্তঃপৌণ্ডের অধিকারী হইতে পারা যায় না। এই অধিকারিৎ বিরূপই হিন্দুর ধর্ম ও সামাজিক জীবনের ভীষণ সমস্যা। হিন্দুশাস্ত্র অধিকারী-ভেদে কর্ম-ভেদের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভগবৎ-প্রদত্ত এই অপূর্ব বিধানের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বিজ্ঞানমগ্নবিরত হিন্দু সমাজ আজ আলেয়ার পেছনে পথ প্রাপ্ত পথিকের দ্যায় লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া, অর্কটান-প্রচারিত সামান্যদের চাক্চিক্যে বিভোহিত হইয়া যুরিয়া বেড়াইতেছে। লক্ষ্য রাহিব্রাহ্মেরই এক, কিন্তু অধিকারী ভেদে গন্তব্য পথ ভিন্ন ভিন্ন। বিজ্ঞান রাহিব্রাহ্ম আজ এই মহাসত্য ভুলিয়া খেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়াই সনাতন আর্ধ্য সমাজের আজ এই দুর্দশা ও অধঃপতন।

তীর্থযাত্রা হিন্দুর ধর্মজীবনের একটা বিশেষ কর্তব্য। ইহা দ্বারা স্বা-বলম্বন, নান্দা-ব্রহ্মদ্বন্দ্বী আভিভূততা, সামাজিক উৎকর্ষ লাভন, লাম্বু-লক্ষ্য, লক্ষ্য-প্রাপ্ত লাভ, স্তম্ভবানে আত্ম-লক্ষ্যপণ ও বৈরাগ্য লাভ প্রভৃতি অমূল্য ধনে ধনী হইতে পারা যায়। ইহা একাধারে আন্তর ও বাহ্য উত্তরবিধ বল দুরীকরণে সক্ষম। এই স্তম্ভ ত্রিকালজ আর্ধ্যধর্মিগণ আত্মীয় প্রতি তীর্থযাত্রার উপদেশ করিয়াছেন।

তু বাতুর উত্তর থক্ প্রত্যয় করিয়া তীর্থ পথ নিশ্চয় হইয়াছে। বাহ্য হইতে অর্ধ্য বাহ্য সংস্পর্শে আসিলে পাপাদি দুরীভূত হইয়া যায় তাহাই তীর্থ। তীর্থ ও আরতন ভেদে পুণ্য স্থান বিবিধ—প্রভাস পুত্র প্রভৃতি অল-সমিহিত

পুণ্য প্রদেশ তীর্থ নামে এবং পশুপত্তিনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতির মন্দির এবং ঋষি প্রভৃতির তপোবনাদি আয়তন নামে প্রসিদ্ধ। এই উভয়বিধ তীর্থ-গমনের দ্বারা ই অতীত কল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাশীখণ্ডে উক্ত আছে যে হাবর জন্ম ও মানস ভেদে তীর্থ ত্রিবিধ। গঙ্গাদি পুণ্য প্রদেশ হাবর তীর্থ, ব্রাহ্মণ জন্ম তীর্থ এবং সত্য, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ সর্লভূত-দয়া, সয়লতা, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য, শ্রিয়বাসিতা, জ্ঞান, ধৃতি, পুণ্য এবং মনের বিগুহতা সর্লপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ। হাবর ও মানস তীর্থে নিত্য অবগাহন করিলে মাংস পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহার মোক্ষ লাভ হয়। জন্ম তীর্থ সম্বন্ধে কাশীখণ্ড বলেন—

“ব্রাহ্মণা জন্ম তীর্থ নির্মলং সর্লকামিকম্।

যেথাং বাক্যাদ্যেকেনৈব শুভান্তি মলিনা জনাঃ।”

ব্রাহ্মণ জন্ম তীর্থ, তিনি নির্মল ও সর্লকামপ্রদ। উহারে বাক্য প্রবণ করিলেই মলিন ব্যক্তির অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়া যায়। এক্ষণে তীর্থযাত্রার অধিকারী সম্বন্ধে [সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলা যাউতেছে।

জন্ম তীর্থযাত্রা সর্লকালেই প্রচলিত ছিল। হাবর তীর্থ-যাত্রা কতদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, তবে ইহা যে অতি প্রাচীনতম যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। মহাভারতের বনপর্বে আমরা তীর্থযাত্রার বিবরণ দেখিতে পাই। তদুত্তরে বংশ, ব্রহ্মবৈবর্ত, পদ্ম, শৃঙ্খ প্রভৃতি পুরাণেও তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে।

শ্রেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির যখন পত্নী ও ভ্রাতৃগণের সহিত কাম্যক বনে বাস করিতেছিলেন সেই সময় একদিন দেবর্ষি নারদ তথায় আগমন করেন। যুধিষ্ঠির দেবর্ষিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! যে ব্যক্তি তীর্থ যাত্রার অভিলষী হইয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে তাহার কি ফল হয়, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন। উত্তরে নারদ বলিলেন—মহাত্মা ভীষ্ম যখন পিত্র্য ব্রত অবলম্বন করিয়া গঙ্গা-দ্বারে (হরিদ্বারে) ভাগীরথী তীরে মুনীগণের সহিত বাস করিতে ছিলেন, তখন একদা ঋষিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য তথায় উপস্থিত হন। ধার্মিক-প্রবর ভীষ্ম তাঁহাকে পাত্ত, অর্ঘ্য দান করিয়া, আপনি আমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ঠিক সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাশক্তি পুলস্ত্য যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন আপনার অবগতির নিমিত্ত আমি তাহাই বিবৃত করিতেছি। পুলস্ত্যের উত্তর হইতে তীর্থযাত্রার অধিকারী ও তাহার ফল একাধারে প্রকাশ পাইবে। পুরাণ সমূহের বিবরণ

মহাভারতের বিবরণেরই অনুরূপ। হুতরাং বাহ্যভ্যন্তরে শুদ্ধ মহাভারতের বিবরণই এখানে প্রদান করা যাউতেছে—যাহার হস্ত পদ এবং মন হুসংযত অর্থাৎ যিনি অন্তর্য প্রতিগ্রহ ও পর-পীড়াদি হইতে বিরত, যিনি দৃষ্টিপুত বেশে পাদক্ষেপ করিয়া থাকেন এবং কথনও পরের অন্তি চিন্তা করেন না, যিনি বিদ্ভা, তপস্তা ও কীৰ্ত্তিযুক্ত তিনিই তীর্থ যাত্রার ফল লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অন্তর্য দান গ্রহণ করেন না, যে আপনায় বাহ্যিক কিছু আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট, ইন্দ্রিয়সমূহ বাহার বশীভূত বাহার অন্তরে ও বাহিরে সালিঙ্গ নাই, এবং যে অহঙ্কার-বিরহিত, সেই ব্যক্তি তীর্থ যাত্রার ফল পাইয়া থাকে। বাহার কপটতা নাই, যে ব্যক্তি অন্ন আহার করিয়া থাকেন; যে অপরের নিকট আহাৰ্য্য বস্ত্র ভিক্ষা করেন না কিন্তু লোকসমূহ যাহাকে অঘাচিত ভাবে দান করিয়া থাকে, যিনি সংযমযুক্ত ও সর্লদোষ-মুক্ত তিনি তীর্থ যাত্রার ফল পাইয়া থাকেন। হে রাজশ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি ক্রোধশূন্য, সত্যবাদী, গৃহীতব্রত এবং সুদয় প্রাণীকে আপনায় স্তায় ধেরিয়া থাকে সে ব্যক্তিই তীর্থযাত্রার ফল পাইয়া থাকে। ঋষিগণ দেবতা ও মানবগণের জন্ত নানারূপ যজ্ঞের বিধান এবং ইহকালে ও পরকালে উহার যে সমস্ত ফল পাওয়া যায় তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। বহু ব্যয় ও পরিশ্রমসাধ্য যজ্ঞাদি কার্য শুধু ধনী ও রাজগণই করিতে পারেন। দরিদ্রগণ উহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না। পুণ্যপ্রদ তীর্থগমন এবং দরিদ্রের পক্ষেও সম্ভব; অথচ ইহা যজ্ঞ হইতে অধিক ফলপ্রদ। তীর্থে গমন করিয়া স্নাত্ত উপবাস এবং কাঞ্চন ও গোদান না করিলে দরিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। অগ্নিস্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তীর্থ যাত্রার দ্বারা তাহা হইতেও অধিক ফল পাওয়া যায়।

তীর্থ গমনের প্রকৃত উদ্দেশ্যে চিন্তের বিগুহ-সম্পাদন। হৃদয় পবিত্র না হইলে যোগ, যাগ, তপস্তা আরাধনা, সংসর্গ প্রভৃতি সকলই নিষ্ফল। পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করিয়াছেন, তিনি যে স্থানে বাস করেন সেই স্থানেই তাঁহার কুরুক্ষেত্র প্রয়াগ ও পুষ্কর তীর্থের ফল লাভ হয়। এ জন্ত ব্রহ্মপুরাণ বলিয়াছেন যে বিগুহ মনই মানবের তীর্থ। যজ্ঞ পাত্র যেমন শত বার ধোত করিলেও পবিত্র হয় না, অবিশুদ্ধায়া লোকও সেইরূপ শত তীর্থজলে স্নান করিয়াও তীর্থ-ফল প্রাপ্ত হয় না। তীর্থ গমন করিয়াও বাহ্যিকের অন্তরের মল দূর হয় নাই, তাহাদের তীর্থ গমনের কোন ফল হয় নাই।

সংযমী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রকার সহিত তীর্থে জন্ম

করিলে অতি কণ্ঠিত ব্যক্তির অন্তঃকরণও নির্মল হয়। তীর্থে গমন করিলে হীনবোরিতে বা কু-দেশে জন্ম হয় না। বাহ্যিক সীতোক্ষ ও বাত বৃষ্টিাদি সহ্য করিয়া বিধি পূর্বক ধীর ভাবে তীর্থ গমন করে, অন্তরে তাহাদের অক্ষয় স্বর্ণ লাভ হয়।

সমর্থ হইলে তীর্থযাত্রী যান, ছত্র ও পাছকা ব্যবহার করিবে না। ঐশ্বর্য-মগ্নে মত্ত হইয়া যে সকল ধনী যান বাহনাদি দ্বারা তীর্থ যাত্রা করে তাহারা সেই তীর্থ নিষ্ফল হয়।\*

কর্ম লোচনে উজ্জ্বল হইয়াছে যে, যানের দ্বারা তীর্থ গমন করিলে অর্ধেক পুণ্য নষ্ট হয়, ছত্র ও পাছকা লইয়া তীর্থে গমন করিলে তদধিক বিনষ্ট হয়; তীর্থে তৈল ও মাংস ব্যবহার করিলে তাহারও অর্ধেক নষ্ট হয় এবং তীর্থে মৈথুন আচরণে সমুদয় পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়†।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণগণ হাবর তীর্থ। ব্রাহ্মণ শব্দে এখানে প্রধানতঃ আৰ্য্য-ঋষিগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহারা ধর্মের সংস্থাপক ও সমাজের হর্তা কর্তা ছিলেন। ইহারা লোকালয়ের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া প্রায়ই নির্জন অরণ্যে, নদীতটে ও গিরি-গুহা আশ্রয় করিয়া বাস করিতেন। হৃদয় দেশ বিদেশ হইতে বিত্তার্থী ও রাজস্ববর্ণগুণ্ধু হইয়া তাঁহাদের পদ প্রান্তে উপস্থিত হইত। কোনও জটিল ধর্ম মীমাংসা করিতে হইলে ঋষিগণ পর্বত শিখরে বা অজ কোন পবিত্র নির্জন স্থানে সমবেত হইয়া তাঁহারা মীমাংসা করিতেন। এই সকল জন্ম তীর্থের আবাসস্থলসমূহ এখনও হিন্দুর নিকট পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র রূপে পরিগণিত হইতেছে। এখনও বাস, বশিষ্ঠ, কণ্ঠাশ্রম প্রভৃতি—তীর্থ স্থান-গুলি ভারতের অতীত শ্রুতি-চিহ্নরূপে মানবদৃষ্টিতে জাগরুক রহিয়াছে।

বৈদিক যুগের ধর্ম প্রধানতঃ কর্মবহুল ছিল। ঋষিগণ স্ব স্ব তপোবনে এবং রাজগণ কোনও পবিত্র নদীতটে বা রাজধানীতে বজ্রাদি কার্য সম্পাদন করাইতেন। এই বজ্রবাটে নিষ্প্রতি ব্রাহ্মণগণ নানা তত্ত্বের বিচার ও মীমাংসা এবং নানা পৌরাণিক কথার অবতারণা করিতেন। এই রূপে জন্ম জন্মের যজ্ঞ ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন কর্তৃক মহাভারত কবিত হইয়াছিল। কন্থল-নন্দ, অরণ্য প্রভৃতি স্থান এই প্রকারেই তীর্থ রূপে পরিগণিত হইয়াছে।

\* ঐশ্বর্য লাভ সাহায্যে গচ্ছ্যে যানেন সো নরঃ।

নিষ্ফল তত্ত্ব তত্তীর্ণ তস্যাত্মানং বিবর্জয়েৎ।

† পুণ্যার্ঘ্য হরতি যানে তদধিকঃ ছত্রপাছকৈঃ।

তদধিকঃ তৈল মাংসাত্ম্যং সর্বং হরতি মৈথুনে॥

বৈদিক যুগের পর ভারতের ধর্ম-জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। বৈদিক যুগ বজ্র বিস্তার আরোহণপূর্ণ ও ব্যয়-বহুল ছিল বলিয়া জনসাধারণ উহার অনুষ্ঠানে আর তত মনোযোগী ছিল না। উপনিষদের জ্ঞান-গর্ভ উচ্চাঙ্গের উপদেশ শুধু বিজ্ঞাতের বিধানের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। শ্রুত ও স্মৃতি জাতিগণ এই সকল কাজ কর্মের অধিকারী ছিল না। কাল-ক্রমে ইহার এক প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। এই সকল ধর্মে চারি বর্ষ ও সমুদয় জাতিই অধিকার ছিল। এই সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতা ও প্রতিষ্ঠাপ্রণয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য নানা স্থানে মঠ, মন্দির, চৈত্য, বিহার, স্তূপ, স্তম্ভ প্রভৃতি নির্মাণ করিতে লাগিল। কালে এ সকল স্থানও তীর্থক্ষেত্র রূপে পরিগণিত হইল।

এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে ধর্ম-প্রাণ হিন্দু স্বধর্ম লোপের আশঙ্কা করিয়াছিল। কিন্তু সমাজন হিন্দু ধর্ম কালবশে স্তান্নিযুক্ত হইলেও একেবারে বিনষ্ট হইতে পারেনা। ভগবান নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যখন ধর্মের স্তান্নি উপস্থিত হইয়া অধর্মের প্রাদুর্ভাব হইবে তখন তখন তিনি আবির্ভূত হইয়া এই ধর্মবিপ্লব দূর করিবেন। তাই স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া তিনি শতরূপে আবির্ভূত হইলেন। তিনি কুমারিকা হইতে হিমাচল ও পুরী হইতে দ্বারকা পর্যন্ত ভারতের সমুদয় স্থান ভ্রমণ করিয়া প্রতিষন্দিগণকে ধর্ম-মুখে পরাজয় করিয়া হিন্দু ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে আবার মুসলমান ধর্মের দ্বারা হিন্দু ধর্ম বিপর্যস্ত হইলে চৈতন্য কবীর রামানন্দ, তুকারাম প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া উপনিষদাদিতে প্রচারিত উচ্চাঙ্গের ধর্মকে পৌরাণিক তত্ত্বের ভিতর দিয়া আড়ম্বরশূন্য ও সর্ব-জনের প্রিয় করিয়া প্রকাশিত করিলেন। এইরূপে বহু পুরাণবর্ণিত দেব দেবীর মূর্তি ও তীর্থ নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল। কালে উহারও তত্ত্ব-সম্প্রদায়ের নিষিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইল।

অবশেষে বস্তগুলিই দার্শনিক আচার্য্যগণের মতে বহির্জগতে বিকাশিত হইয়া থাকে। হৃদয় বহির্জগতের স্থাপিত ও প্রকাশিত দেব দেবীর মূর্তি গুলি যে সেই পরম ও চরম পদার্থের অভিব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। মানুষ ইচ্ছা করিলে এই বাহ্য প্রকৃতির ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের মূল স্রষ্টাগুলিকে পৌহিতে পারে। তাই প্রাচীন ঋষিগণ এই সকল তীর্থ ও দেবায়তনগুলির এত সাহায্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রোক্ত ফল ব্যতীত ও তীর্থগমনে নানা প্রকার ফল বর্তমান রহিয়াছে। নিম্নে ২১০ টির উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্বে আজকালকার যান বাহনের বন্দোবস্ত ছিল না বলিয়া তীর্থ-বাত্তীকে পদব্রজেই সন্মুখ হানে যাইতে হইত। পূর্বে বলা হইয়াছে যে পদব্রজেই তীর্থে গমন করা উচিত। গুর ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসই তীর্থ গমনের প্রয়োজক। বাহাদেব দেব বিজে ও শাস্ত্রাদিতে বিশ্বাস নাই, তাহার তীর্থ গমন নিষ্ফলোক্ত। তবে অভিজ্ঞতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের শোভা নিরীক্ষণ করিবার জন্য বাহাদী তীর্থ বাত্মা করেন তাহাদের ও তীর্থবাত্মা একেবারে বিফল যাত্রা না। অনেক সময় দেখা যায় যে, সাধু সাধু ব্যক্তিকে উপহাস করিতে আসিয়াও তাহার সংস্পর্শে সাধু হইয়া গিয়াছে। হতভাগ্য পুরুষোক্তরূপ তীর্থবাত্মা করিয়াও অনেকে হানসাহায্যে অন্তরূপে পরিবর্তিত হইতে পারেন। অতএব যে ভাবে যে তীর্থ বাত্মা করুক তাহাতে উপকার বই অপকার হয় না। আধ্যাত্মিক ভাবে উপকৃত না হইলেও লৌকিক উপকারিতা ইহাতে নিশ্চয়ই আছে।

বাহাদী নিঃসম্বল বা অঙ্গ সম্বল লইয়া তীর্থ বাত্মার বাহির হন তাহাদিগকে নিজ কাণ্ড নিজেরই করিয়া নিতে হয়। বাসস্থান, খাদ্য সংস্থান ও আবশ্যিক সংবাদ সংগ্রহ প্রভৃতি কার্যে তাহাদিগকে নানা জাতীয় লোকের সহিত সেলা বেশা করিতে হয়। এইরূপে লোকপ্রকৃতি অধ্যয়ন করার অতি হুম্মর অসমর পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে নিতান্ত অনাচারী এবং অপরিচিত ব্যক্তিও রক্ত তীর্থবাত্মীর সহযাত্রী হইয়া অন্তরঙ্গ আত্মীর স্তায় তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে, আবার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও দুর্গত ব্যক্তিকে নিতান্ত পরের স্তায় অসমর ও অহানে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমার এবারকার ভ্রমণে এরূপ ৩০টি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাহাদী কখনও একাকী বিশেষে গমন করেন নাই প্রথম প্রথম তাহাদের একটু অসুবিধা মনে হয় বটে, কিন্তু কয়েক দিন চলিয়া গেলে এ কষ্ট আর থাকে না। সুখে সুখে, ইহকালে পরকালে একমাত্র ভগবানই সহায়। তাহার নাম স্মরণ করিয়াই সর্বদা সর্বত্র বিচরণ করিতে হয়। তীর্থের পথে অনেক স্থানে ইন্সপাতাল প্রকৃতি লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু ঐ সকল ইন্সপাতালে বাহাদী যাইয়া উপস্থিত হয় তাহাদিগেরই আশ্রয় মিলে। তাহারো সোপান খুঁজিয়া লইয়া যায় না। কাজেই রাতার রক্ত বা রক্ত অবস্থার সঙ্গী-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে তাহার কষ্ট ও হতভাগের সীমা থাকে না। একমাত্র ভগবানই ভখন সহায়। তিনি কোন উপায় করিয়া দিলে উদ্ধার নতুবা বহুবাহন-পরিত্যক্ত দেশে

নির্জন তাহার প্রাণ বিরোধ বা বিপদের কথা মনে হইলে লোক ভগবানে আশ্রয় সন্নিবেশ করিতে বাধ্য হয়।

পূর্ব জন্মের স্মৃতি থাকিলে অনেক সময় তীর্থ বাত্মা এসেছে সাধু মহাত্মগণের সহিত সাক্ষাৎ ও সংগত লাভ ঘটাই থাকে। সাধু মহাত্মগণ আবাদিগকে উপদেশ প্রদান না করিলেও তাহাদের আচার ব্যবহার ও শৈশালাপ হইতে আদর। যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারি। একধিকে সাধুসঙ্গ ও অপরিচিকে হানের সাহায্য। তাহাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়া ও তাহাদের আচরিত পথে বিচরণ করিয়া আমরা নিজেদের গলদ অনেকটা পরিবর্তন করিয়া মনের উৎকর্ষ সম্পাদন করিতে পারি। কোন সাধু মহাত্মার কৃপা হইলে হরত বা মানব জীবনের আকাঙ্ক্ষিত সেই নিত্য নিরঞ্জন পথের সম্মান পর্যন্ত লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারা যায়।

তীর্থ ভ্রমণ দ্বারা প্রত্যক্ষ নূতন নূতন বস্তু দর্শন, নূতন স্থানে আগমন, অপরিচিতের সহিত সহবাস, যথেষ্ট প্রয়োজনীয় কার্যাদির অধিকাংশ সম্পাদন ও অন্তর্ভুক্ত কার্যাদি সম্পাদন দর্শন প্রকৃতি নানা বিষয়িণী অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে। এ অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশী। পুস্তকাদি পাঠ ও অন্তর কার্য দর্শন করিয়া আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করি তাহা কমিয়া লইবার সুযোগ আমাদের গৃহে থাকিয়া প্রায়ই ঘটিল উঠে না, কিন্তু তীর্থ ক্ষেত্রে আমরা এ অভিজ্ঞতার মূল্য নিজ হাতে বাচাই করিয়া নিতে সমর্থ হই এবং অপারকেও এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারি।

তীর্থ বাত্মার দ্বারা শরীর ও মনের স্বচ্ছন্দতা লাভ হয়। বহিনারায়ণ প্রকৃতি পথে প্রতিদিন নিরাসিত ভ্রমণের দ্বারা শরীরের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং শরীর লঘু ও কর্কশ হইয়া উঠে। পথে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য ও নানাবিধ বস্তু দর্শন করিয়া এবং প্রাকৃতিক বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া মনও অনির্বচনীয় আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠে। আজকাল কর্কশ জীবনের প্রকৃতি আনন্দ করিবার জন্য ও অবসাদগ্রস্ত শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করিবার অভিপ্রায়ে লোকে বাহ্যকর স্থানে হাওয়া পরিবর্তন করিতে যান। তীর্থ ভ্রমণের দ্বারা একাধারে দুইটি কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা শরীর ও মনের প্রকৃতি লাভ হয় এবং আধ্যাত্মিক ভ্রমণেরও অনেকটা তত্ত্ব পাইতে পারা যায়। তীর্থক্ষেত্রে প্রাকৃতিক অবস্থাতে এমন একটা বৈশিষ্ট্য বর্তমান রহিয়াছে যে একাধার সহিত ঐ বিষয়ের চিন্তা করিলে ভাবকের অন্তর বিষম ও প্রেম-রসে অভিভূত হইয়া পড়ে। বীরব প্রকৃতির আধিপত্য সাধারণ মানবের অধঃকরণের উপরও নিতান্ত কম নয়। প্রকৃতি



নীয়ে লোকের চিত্তে নানা সদ্যবের প্রেরণা জাগাইয়া দেয়। প্রকৃতির বৈচিত্র্যে ভগবানের সাক্ষাৎ হস্ত দেখিতে পাইয়া নিভাত্ত পারায়ের সনও অনেক সময়ে ধর্মভাবরসে আদ্রুত হইয়া উঠে। এইরূপে সংসারাসক্ত পঙ্কিল মনকেও ভগবন্-সুখী করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ধর্মের পত্তি অতিশয় স্থূণ্য। উহার স্বরূপ অবগত হইতে হইলে সহাজনগণের পূহা অনুসরণ করাই কর্তব্য। বেদের তত্ত্ব অবগত হইয়া উহার সাহায্যেও ধর্মের স্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়, কিন্তু উহা বহু সময় ও তপশ্চা সাপেক্ষ। কলির জীব সাধারণতঃ চঞ্চলপ্রকৃতি ও অজ্ঞানী। উচ্চ অঙ্গের সাধনা এমুণে দুলভ। বাহাঘারা অতি সহজে এ তত্ত্ব জানিতে পারা যায় তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। তীর্থ গমন ইহাদের মধ্যে অন্ততম।

জগতে নিখুঁত ষাঁটি জিনিষ খুলিয়া পাওয়া ভার। মানুষ সাধারণতঃই প্রকৃতির দাস। তাহার ইন্দ্রিয়ের শ্রোতে পা ভাসাইয়া দিয়া নিবৃত্তি মার্গের কথা একেবারেই ভুলিয়া যায়। যে মহান উদ্দেশ্য লইয়া তীর্থ যাত্রার মোহাশ্রা উল্লেখ্য হইয়াছিল সে উদ্দেশ্য এখন অনেকাংশে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। মানুষ শুধু সংস্কার-বশে স্বয়-চালিত পুস্তলিকার স্থার তীর্থ ক্ষেত্রে গমন করিতেছে। যে পাণ্ডাগণের উপর এই তীর্থ ক্ষেত্রের পবিত্রতা রক্ষার ভার অর্পিত ছিল, তীর্থবাগিণের অশ্রম-রাত্যের ভাবসমূহ ফুটাইয়া উঠাইতে বাহারা প্রাণপণ সাহায্য করিত, অনেক স্থলে আজ তাহারা স্বীয় কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া ব্যক্তিচারের শ্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। আধ্যাত্মিকতার উচ্চ রাজ্য হইতে তাহাদের দৃষ্টি কিরিয়া আসিয়া এখন বাগিণের টাকার ধলিয়ার ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। পবিত্র দেব মন্দির ও তীর্থ স্থান সমূহ এখন কুংসিত কিয়ার রক্তভূমি হইয়াছে। মোহান্তগণ এখন মোহের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া ধৃতি ও সংযমের সুধাধান করিতেছে না, কিন্তু ভগবানের নামে অর্জিত অর্থের অসদ্ব্যবহার করিয়া অলস ও উদাস জীবন অতিবাহিত করিতেছে। যে সকল স্থানে এরূপ ব্যক্তিচারের শ্রোত প্রবাহিত হইতেছে তীর্থের পূর্ক সাহায্য কিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত ধর্মপ্রাণ হিন্দুযাত্রেরই উহার প্রতিরোধে বহুবান হওয়া একান্ত কর্তব্য।

বৎকাল হইতে হিন্দু-ধর্মের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন

চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু তথাপি ইহা ভারতের স্বক হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, জগতের বিভিন্ন স্থানে বহু ধর্মমত জল-বুদ্বুদের মত উখিত হইয়া আবার বিলীন হইয়া গিয়াছে। ভারতের সনাতন ধর্ম যে শত অত্যাচার ও উৎপীড়নে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা কি ভাবিয়া দেখিবার কথা নয়? অতিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে অবশ্যই দেখা যাইবে যে, সনাতন আধ্য-ধর্মের মূল-মন্ত্র একটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যের স্বভাবই এই যে উহা বাহিরের আবরণে আবৃত হইলেও উহার প্রকৃত স্বরূপ কখনও অন্তরূপ হইয়া যায় না। হিন্দুধর্ম একটু ম্লান হইলেও উহা একেবারে নষ্ট হইবে না, হইতে পারে না।

বর্তমানে হিন্দু-ধর্মের উপর আর একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। এই বিপ্লবটা বাহির হইতে আসে নাই, এটা অন্তরের বিপ্লব। ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুযাত্রেরই এ বিষয়ে অবস্থিত হওয়া কর্তব্য। সাম্যবাদের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া একঘল কর্ম্মী এখন হিন্দুধর্মের সংস্কার করিতে বহুপন হইয়াছেন। তাহারা বর্ণে বর্ণে বা জাতিতে বিভিন্নতা রাখিতে চাহেন না। তাহারা বলেন যে, ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র সকলেই এক পরমেশ্বরের সমান, হুত্তরাং সমুদয় কার্যেই সকলের সমান অধিকার থাকিবে। কিন্তু হুৎথের বিষয়, তাহারা একবারও ভাবিয়া যেনেন না যে, স্বয়ং ভগবানের সৃষ্টিই এইরূপ বৈচিত্র্য ও বৈষম্য-পূর্ণ। হাবর জঙ্গম প্রকৃতি সমুদয় প্রকৃতিতে এ বৈষম্য দেদীপ্যমান। মনুত, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রকৃতি সমুদয় সৃষ্টিই ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও শূত্র শূত্রে বিভক্ত। এ শুধু শাঙ্গীর প্রমাণ-সিদ্ধ নহে, আমরা চক্ষের উপরেও ইহার জলন্ত সত্য দেখিতে পাইতেছি। সিংহ ব্যাঘ্র অপেক্ষা বলবান ও বুদ্ধি-সম্পন্ন; আম গাছ, তেঁতুল বৃক্ষ হইতে উৎকৃষ্ট। আবার সিংহ হইতে সিংহ ও ব্যাঘ্র হইতে ব্যাঘ্রেরই উৎপত্তি হয়। আম গাছে শত চোঁতাতেও জাম ফলাইতে পারা যায় না। এই সকল বিষয়ের বিশেষ প্রণিধান সহকারে দেখিয়া বিধান ও ভাবুকগণের একটা সীমানার উপনীত হওয়া উচিত। মনগড়া গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা জাতির সৃষ্টি হইতে পারে কিনা এ সকল বিষয়ের পর্যালোচনা ছাড়িয়া দিয়া এখন প্রকৃতির অনুসরণ করা যাইতেছে।



## দন্তরুচি-কৌমুদী।

॥নরেন্দ্র দেব

সেদিন অরুণ এসেছিল তার বন্ধু রজতের সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু রজৎ তখন বাড়ী ছিল না। তাই সে রজতের ভগ্নী কুমারী অশোকার সঙ্গে বসে গল্প করছিল।

তারা দুজনে অনেকগুলি ব'সে ব'সে কথা কইছিল। ঘরের দরজাটি ভেজানো ছিল। হঠাৎ দরজা খুলে অশোকার বাপ মিঃ চৌধুরী ঘরে ঢুকে অরুণের দিকে চেয়ে বললেন

“রাত্রি কত হয়েছে জানো?”

অরুণ খতমত খেয়ে উঠে পড়ল এবং বিনা বাক্য-ব্যয়ে তাদের বাড়ী থেকে পালিয়ে এলো।

মিঃ চৌধুরী অশোকাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এ ছেলের কি মাথা খারাপ?”

অশোকা বললে—“না! আমার সঙ্গে তো উনি বেশ কথা বলছিলেন! এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন বাবা?”

মিঃ চৌধুরী বললেন “আমার ঘড়ীটা বন্ধ হ'য়ে গেছে। আমি তাই সময়টা জানবার জন্য, —কত রাত হয়েছে ওকে জিজ্ঞাসা করলুম তা ও ছোকরা কোনও জবাব না দিয়ে অমন চমকে উঠে পালালো কেন?”

২

বীরের দেশ থেকে একখানি চিঠি এসেছিল।

বী চিঠিখানি দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে এ চিঠিখানি তার মানুষটি লিখেছে; কিন্তু কি লিখেছে সে পড়তে জানেনা বলে বুঝতে পারছিল না, তাই অনেক ভেবে চিন্তে খানিকটা তুলো হাতে করে চিঠিখানা নিয়ে সে বাইরে কর্তাবাবুর কাছে গেল।

কর্তা তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—“কিরে বী, কী দরকার?”

বী সলজ্জভাবে বললে, “আজ্ঞে কর্তা, আমার দেশ থেকে এই পত্রখানি পচার বাপু আমাকে লিখেছে।”

কর্তা বললেন—“তা কি হয়েছে? আবার দেশে যাবি নাকি? এই ত সে দিন দেশ থেকে এলি!”

বী আমতা আমতা ক'রে বললে—“আজ্ঞে না কর্তা; দেশে যাবো না, কিন্তু মানুষটা কি লিখলে কিছু বুঝতে পারছি নে, তাই বলছিলুম আপনি যদি এই তুলোটুকু কাণে দিয়ে পত্রখানা আমাকে পোড়ে দেন, তাহ'লে—”

কর্তা বললেন—“তা কাণে তুলো দিয়ে পড়তে যাবো কেন—?”

বী একেবারে জড়সড় হ'য়ে বাড়ি হেঁট ক'রে বললে—“আজ্ঞে, কর্তা আপনি মনিব, পিতৃতুল্য। মিনুসেটা যদি চিঠির মধ্যে কিছু বেরাদঙ্গী ক'রে থাকে, সেটা আর তা হ'লে ছদ্মের কাণে যাবে না।”



## ক্যাথেরিন্ মেয়ো ও মান্দার ইণ্ডিয়া—

সম্প্রতি আমাদের দেশে ক্যাথেরিন্ মোয়োর 'ভারতমাতা' নামক বইখানা লইয়া খুবই আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের দেশের মহিলা সমাজের প্রতি অতি জ্বলন্ত ভাবে আক্রমণ করিয়া জগৎ-সমক্ষে ভারতের নারী-সমাজকে হেয় করাই হইতেছে এই লেখিকার উদ্দেশ্য। মিস্ মেয়ো তাহার বইতে এই কথাই সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে—“ভারতীয়দের বিশেষতঃ ভারতীয় নারী ও শিশুদের দৃষ্ণে আমার অন্তর কাঁদিয়া উঠিতেছে। আশা করি আমার লেখা তাহাদের কিছু উপকার করিবে।” ডাঃ আনি বোশাস্ত,—“মান্দার ইণ্ডিয়া” বহির তীব্র নিন্দা করিয়া কহিয়াছেন যে, এই বইখানির উদ্দেশ্য কেবল গলদ কাটিয়া বাহির করা,—“ভারতকে যে জাতি দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের তথা সমগ্র স্বৈতজাতির গৌরব-বৃদ্ধি ও তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে।” এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। দেশের সর্বত্র এ বিষয়ে আন্দোলন চলিতেছে। সভাসমিতি হইতেছে, পুরুষ ও নারী সমান ভাবে যোগ দিতেছেন। এই প্রতিবাদের ফলে মিস্ মেয়োর বইখানার ক্ষতি অপেক্ষা লাভ হইতেছে এই যে বই খানা হাজারে হাজারে হু হু করিয়া বিক্রম হইতেছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। মিস্ মেয়োর এই তীব্র আক্রমণে আমাদের কোন জ্ঞান হইবে কি? আমরা আমাদের নারী-

সমাজের কল্যাণ-কল্পে কোনরূপ মনোযোগী হইব কি? এই যে শিশুর মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, এই খোনারী-সমাজ দিন দিন ধ্বংস হইতেছে তাহার প্রতিকার আমরা কি করিতেছি? তারপর আমাদের সাহিত্য আজ কাল যে আবর্জনার পরিণত হইতেছে সে দিকে কে লক্ষ্য করেন? আমাদের দেশের নৈতিক স্বাস্থ্য যে হীন হইয়া পড়িয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? এই সব বই ইংরাজীতে তর্জমা হইয়া দেশে বিদেশে প্রচারিত হইলে আমাদের কোন্ দিকে মুখোজ্জল করিবে? এমন সব দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি যাহাতে নিজেদের কলঙ্ক বই গোববের কিছুই নাই। মিস্ মেয়ো ‘তোদের শিল তোদের নোড়া, তোদেরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া’ এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের দৃষ্ণ হয় যে আমরা মানুষ নই। ইউরোপ ও আমেরিকায় নৈতিক হীনতা ব্যভিচারের লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত ত আমাদের অজ্ঞাত নাই! কিন্তু মিস্ মেয়ো যে আমাদের লিখিত বিবরণী ইত্যাদি হইতেই সব কথা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাই যে দৃষ্ণের কথা। আমাদের মানুষ হইয়া ইহার প্রতিবাদ কার্য্য দ্বারা দেখান উচিত। আমরা যে কতদূর অপদার্থ তাহা ভাদের ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত **বঙ্কম নাট্য-নির্ব্যাতন** শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে ছুই একটা কথা তুলিয়া সপ্রমাণ করিতেছি। \* \* \* যের অমায়ুষ **আত্মসমীক্ষা** দ্বারা, বাহিরে পণ্ড প্রকৃতি অল্প লোকদের দ্বারা অনেক বঙ্গনারীর নির্ব্যাতন চলিতেছে। ইহা জঘন্ত কাপুরুষতা, এবং পণ্ডত্বেরও অধম, কারণ পণ্ডরা

এরূপ অত্যাচার করে না। এই সকল অত্যাচারের সুযোগ যে সকল সামাজিক প্রথা বা অশুভ রীতিনীতি হইতেই হউক না কেন, তাহার উল্লেখ দ্বারা নরান্থদের দুর্ভাগ্যের আংশিক দোষ ক্ষালনও নিম্নলিখিত। ভক্তলোকের মত ঐ সব কুপ্রথা ও কুরীতির উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করিবার অধিকার অবশ্য সকলেরই আছে। \* \* \* ১৩৩৩ সালে অত্যাচারের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। কেন? ইহার উত্তর কি বক্তৃতা-বাগীশেরা দিন না? তারপর শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাসের বৃদ্ধাধিকার রোজনামাচাখানি কেহ পড়িয়া দেখিয়াছেন কি?

### সাহিত্যিকের সম্মান—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালাভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. মহাশয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এম্. এ. উপাধি (honorary) দান করিয়াছেন। তাঁহার এই সম্মানে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

### ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলমান ছাত্র—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র সিংহ মহাশয় অর্থ-নীতি-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি ছাত্রাবাসের ৪০১ জন ছাত্রের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। তাহাদের মধ্যে ২৮৪জন হিন্দু, ১১৭জন মুসলমান। এই অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৬২ জন এমন সব পরিবারের ছেলে যাহাদের আয় বাচিয়া থাকিবার মত অতি সামান্য—নয় টাকারও কম! আর হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জনের বাড়ীর আয় বাচিয়া থাকিবার আয় অপেক্ষা কম, শতকরা ৭ জনের বাড়ীর আয় বাচিয়া থাকিবার মত, এবং শতকরা ৬০ জনের বাড়ীর আয় তার চেয়ে বেশী। অতএব দেখা যাইতেছে, মুসলমান ছাত্রদের অধিকাংশ

গরীব। এতদিন সিংহমহাশয়ের স্থায় অমূল্য রত্নটা কোন্ অন্ধকার খনিতে লুকাইয়াছিলেন?—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গুণ এই যে তাহার রত্ন চরনে অসাধারণ। আমরা বিশ্বস্ত-স্বত্রে জ্ঞানিলাম যে অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র সিংহকে খান বাহাদুর উপাধি প্রদত্ত হইবে। এই সিংহ মহাশয়ের অর্থ-নীতি সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য কত বড় সে বিষয়ে আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

### অধ্যাপকের ইউরোপ পরিভ্রমণ—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আগামী বৎসর ইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা করিবেন। আমরা তাঁহার এই ভ্রমণ সংবাদে আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু এইবার

লেগে যাবে কাড়া কাড়ি;

কে হবে Provost ভগ্নাথ হলে

কে জিনিবে, কেবা হারি!

অধ্যাপকদের মধ্যে এখন হইতেই চিন্তা-চঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, অনেকের যে সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটতেছে সে সংবাদও আমাদের অজ্ঞাত নাই।

### স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বোসের স্মৃতি-সভা—

বিগত ১৫ই সেপ্টেম্বর ২২ শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় স্থায় দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সভাপতিত্বে—স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বোস বিজ্ঞানাগার মহাশয়ের স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছে। খান বাহাদুর তগদক আশুদেব, শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ চক্রবর্তী, যোগেন্দ্রকুমার গুহ ঠাকুরতা, গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য, গিরিশচন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সভাপতির অভিভাষণটা বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। কালীপ্রসন্নের মৃত্যু হইয়াছিল শ্রাবণ মাসে আর স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইল তাদের শেষে!—এইরূপ অত্যাচার বাবস্থা হয় কেন?

..





তৃতীয় বর্ষ ]

কার্তিক, ১৩৩৪

[ ২য় সংখ্যা

তান্কা-ষোড়শী  
শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ক্লিষ্ট জীবন !  
নিয়ত কি যাতনা !  
দেহ-পিঞ্জরে  
প্রাণ মম আকুলি'  
ডানা সদা ঝাপটে !  
বড় বিষাদ !  
কোথা আছ, রূপসী !  
বিরহে ভোর  
রহিব কি একাকী  
আজীবন জগতে !  
এসো সকাশে  
যুচাতে এ বিচ্ছেদ !  
গানে তোমার  
দাও প্রাণে আনন্দ ।

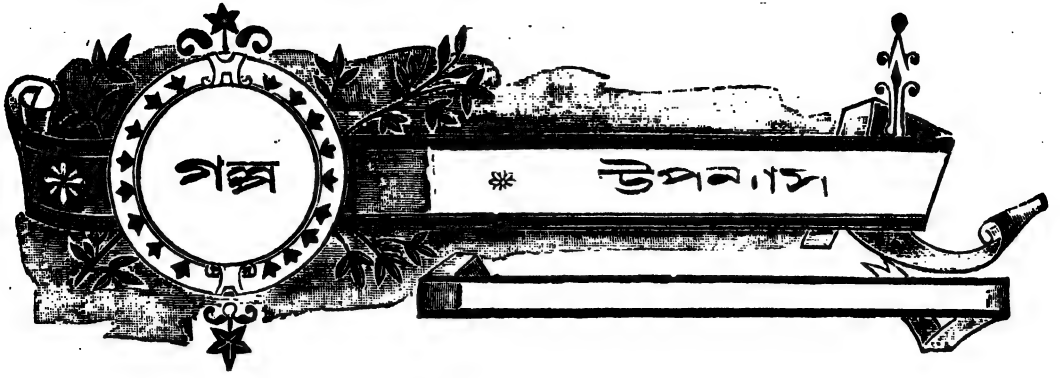
জয়ী করো জীবনে !  
নব যৌবনে  
লভেছিলাম তোমা' !  
মোর তখন  
সবি ছিল জীবনে !  
সুখ-স্বপ্ন কত না !  
চুম্বনে তব  
জনমে প্রেম মম !  
জীবন ধন্য  
মানিয়াছি সে দিন !  
সে' চুমু কোথা এবে  
সে ভালোবাসা  
ডুলিবার নহে গো !  
সে কল্প স্পর্শে

ভাগে যে শিহরণ,  
 আজো ভাগে স্মরণে !  
 'বউ-কথা-ক'  
 ভাকে পাখী প্রভাতে !  
 আমিও, প্রিয়ে,  
 ডাকি তোমা' এরূপে  
 অন্তরের অন্তরে ।  
 এ সম্ভাষণ,  
 কাতরতা কখনো  
 পশিয়া প্রাণে  
 করে কি আনমন  
 তোমারেও নিশীথে ?  
 মানি, লো মানী !  
 মোর মতো তুমিও  
 সহিছ স্বালা,  
 লভিয়া আন জনে  
 দিনে রাতে কেবলি !  
 এ চুক্তিবন্ধ  
 বিবাহ কি বিবাহ ?  
 গলে খুলায়ে  
 দিলে কি গো অমনি  
 আত্মীয় সে আত্মার !  
 দৈহিক ক্ষুধা  
 মিটিছে দেহ পেয়ে ;  
 অন্তর-ক্ষুধা  
 বিনে আর মেটে না

প্রেম-সুখা তোমারি !  
 সে সুখা-বিন্দু  
 দাও, দাও, প্রেরণী !  
 ছাড়ো গো লজ্জা  
 কপটতা নাশিয়া !  
 খুলে' কহ সকলি !  
 মিলিব আজি  
 সর্ব্ব অঙ্গে তোমারি !  
 আমি ও তুমি  
 এক হবো শরীরে  
 সর্ব্ব বাধা ঘুচায়ে !  
 সবি অলীক !  
 প্রেম সত্য ভুবনে !  
 কেন গো তবে  
 ডুবে' রবো বিষাদে  
 আজীবন দুজনে !  
 হে মূর্ত্ত শাস্তি,  
 শাস্তিদাত্রী তুমি যে !  
 লো মনোরমা,  
 ঘোবনের মধ্যাহ্নে  
 নাশো হেন বিরহ !  
 দিবা তো যায় !  
 রজনী কাটে কই !  
 চাপিতে অশ্রু  
 কপোলে ধারা রয় !  
 কপালে ছিল এই !! \*

\* ইতালির সনেট, মল্লর উপরীপের পাত্তম্ এবং আপানের  
 ভান্কা এক শ্রেণীরই বটে। এতোক ভান্কা পাঁচ ছত্রেই  
 শেষ হয়। প্রথম ও তৃতীয় ছত্রে পাঁচটি করিয়া এবং দ্বিতীয়,  
 চতুর্থ ও পঞ্চম ছত্রে সাতটি করিয়া অক্ষর থাকে। ভান্কা  
 অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হইবার নিয়ম। কিন্তু অপূর্ণ শক্তিলালী

কবিরক্ত সত্যেন্দ্রনাথ নিরবের ব্যতিক্রম করিয়া ভান্কা  
 মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিয়া গিয়াছেন এবং প্রথম ও তৃতীয় ছত্রে  
 পাঁচটির পরিবর্তে ছয়টি এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ছত্রে  
 সাতটির পরিবর্তে আটটি করিয়া অক্ষর ব্যবহার করিয়া নূতনত্ব  
 দেখাইয়া গিয়াছেন। এই নূতনতার মধুরতাই বাড়িয়াছে বটে ;



## নিশীথের আলে।

### শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

( ৩ )

স্কুলে মেয়ে জুটিয়াছিল অনেকগুলি, প্রগতি প্রথম দিনেই এতগুলি মেয়ের সমাগম দেখিয়া ভারি খুসি হইয়া উঠিল। সে বেশ বুঝিল দিনগুলো যত নিরানন্দে কাটিয়া যাইবার আশা সে করিয়াছিল ততটা নিরানন্দে কাটিবে না। এই স্কুল লইয়া থাকিলে তাহার দিন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিবে।

আজ কয়দিন হইল জমিদার মহাশয় গ্রামে আসিয়াছেন ইহার মধ্যে সে এক দিনও তাঁহার সাক্ষাৎ পায় নাই। সে ভাবিয়াছিল স্কুল-প্রতিষ্ঠাতা জমিদার মহাশয় আসিয়াই স্কুল দেখিতে আসিবেন, কিন্তু কয়দিনের মধ্যে তিনি আসিলেন না।

এই লোকটার সম্বন্ধে তাহার মনে একটা বিরাট কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছিল। না জানি ইহার আকৃতি কেমন, হয় তো তাহার প্রকৃতিরই অনুরূপ। মাতালের আকৃতি যেরূপ কর্কশ, তাহারও তেমনি, তাহার মধ্যে কোমলতা এতটুকু জাগিয়া নাই।

বাগুয়ার কাছে আকৃতি সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞানিবার উপায় ছিল না। সে তাহার সাঁওতালি বুদ্ধিতে বলিয়া দিয়াছে মানুষ যেমন দেখা যায় জমিদার বাবুও তেমনিই, তাহাপেক্ষা বেশী বাহুল্যতা তাহার মধ্যে একটু নাই। বাগুয়ার যেমন দুইটা হাত, দুইটা পা, একটা মাথা দুইটা চোখ প্রভৃতি আছে, জমিদার

মহাশয়েরও তেমনিই আছে। জমিদার বলিয়া তাঁহার চারিটা হাত, দুইটা মাথা, গোটা দশেক চোখ নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই তো গেল বাগুয়ার কথা। তাহাকে আর বেশী জিজ্ঞাসা করাই ঝক্‌মারী।

কিন্তু লোকটা যাহাই হোক, সে যে এড়াইয়া গেল ইহাতে যথার্থই প্রগতি একটা শাস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। মাতালের সঙ্গে মিশিতে না হয় সেই-ই ভাল। একবার সে বড় বিপদেই পড়িয়াছিল সে কথা আজও বেশ তাহার মনে আছে। ম্যাট্রিক পাস করিয়াই সে এক ভঙ্গলোকের বাড়ীতে শিক্ষার কার্য পাইয়াছিল। গৃহস্বামী মাতাল তাহা সে জানিত, কিন্তু চরিত্র যে যথার্থই তাঁহার স্থপিত তাহা সে জানিত না। একদিন সে যা বিপদে পড়িয়াছিল—দৈবযোগে তাহার ছাত্রী গৃহস্বামিনী আসিয়া পড়িয়া তাহাকে রক্ষা করেন। সেই পর্যন্ত প্রগতি মাতালের উপর চটিয়াছিল। মাতাল হইলেই ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান হারায়, মনুষ্যত্ব বর্জিত হয়, সে ইহাই জানিয়াছিল, প্রাণপণে সে তাই মাতালের সান্নিধ্য কাটাইয়া চলিত।

সে দিন বুধবার ছিল। যথা সময়ে স্কুলের ছুট দিয়া শ্রান্ত পদে বাসায় ফিরিয়াই প্রগতি বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। শরীরটা আজ তাহার সকাল হইতেই



অসুস্থ ছিল, কেবল সে না গেলে স্থল চলবে না বলিয়াই অসুস্থ শরীর লইয়াও স্থলে গিয়াছিল। ইহার পর সমস্ত দিন মেয়েদের সহিত চীৎকার করিয়া মাথাটাও বড় বেশী রকম খরিয়া উঠিয়াছিল।

বাপুয়া উনানে আগুণ দিয়া চাল কয়টা লইয়া খুইতে যাইবার উত্তোপ করিতেছিল, প্রণতিকে বাসায় ফিরিয়াই স্থলের পোষাক সূক্ষ বিছানায় শুইয়া পড়িতে দেখিয়া চাল ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল, “কি হয়েছে দিদিমণি, শুয়ে পড়লেন যে?”

হাসিমুখে প্রণতি বলিল, “কিছুই হয় নি রে, যা তুই, তোর কাজ কর গিয়ে। আজ আমার চাল দিল নে বাপুয়া, রাত্রে আমি ভাত খাব না।”

বাপুয়া বলিল “তবে যে বলছেন কিছু হয় নি! এই বলছেন ভাত ছুইবেন না; আবার বলছেন কিছু হয় নি, ভাল আছি। আপনার বোধ হয় জর হয়েছে দিদিমণি, দেখি আপনার হাতখানা। আমি বেশ হাত দেখতে জানি।”

প্রণতি বলিল, “না রে আমার জর হয় নি।”

বাপুয়া জেদ করিয়া বলিল, “হ্যাঁ আপনার জর হয়েছে নইলে এমন ভাবে শুয়ে পড়েছেন কেন? আপনার মুখখানাও যেন কি রকম দেখাচ্ছে, ঠিক জর হলে যে রকম হয় সেই রকম। দেখিনা, দিন একবার হাত খানা, আমি নাড়ী দেখে ঠিক ধরে দেব।”

প্রণতি হাসি মুখে তাহার উজ্জল স্নগোর হাতখানা বাড়াইয়া দিল, বাপুয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহার হাতের চুড়ি করগাছি সরাইয়া নাড়ী খুঁজিতে লাগিল।

প্রণতি হাসি চাপিয়া বলিল, “কিরে, নাড়ী পাচ্ছিসনে নাকি?”

বাপুয়া অপ্রস্তুত হইবার পাত্রই ছিলনা, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “এই যে নাড়ী পেয়েছি। এই নাড়ী না—এই যে টিপ টিপ করেছে?”

প্রণতি এবার আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না, হাসিয়া উঠিয়া সে হাতখানা টানিয়া লইয়া বলিল

“পাক থাক, যথেষ্ট দেখেছিল; আর দেখতে গেলে এর পর আর বাচতে হবে না।”

বাপুয়া যে বিশেষ কষ্ট পাইল তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই জানিতে পারা গেল। দিদিমণি জানিল সে নাড়ী দেখিতে জানেনা, মিথ্যা বাক্চাতুরী করিতেছে, এ কষ্ট মরিলেও যায় না।

“বাপুয়া—”

বাহির হইতে মোটা গলায় কে ডাকিল।

প্রণতি কান উচু করিয়া বলিল, “তোকে কে ডাকলে যেন বাপুয়া; একবার চট করে বারটা দেখে আস।”

বাপুয়ার কানে সে আহ্বান যায় নাই, সে নিজের কণ্ঠে নিজকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; মুখখানা অত্যন্ত বিরস অন্ধকার করিয়া সে বলিল, “কই কে ডাকছে দিদিমণি? ও আপনার শুনতে ভুল হয়েছে, কেউ ডাকছে না।”

প্রণতি ধমক দিয়া বলিল, “না, কেউ ডাকছে না বই কি। আমি নিজের কানে শুনলুম কে তোর নাম ধরে...”

“বাপুয়া, বাড়ী আছিস নাকি?”

এবার বাপুয়ার কানে সে ভারি স্বর পশিল,—চিনিল এ শ্রীনাথ বাবুর কণ্ঠস্বর।—“দেওয়ান মশাই এসেছেন—” বলিয়াই সে বাহিরে দৌড়াইল।

দেওয়ান শ্রীনাথ বাবু ও শরৎ সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সংসারের অভ্যস্তরূপ ব্যাপারে আসিয়া জড়াইয়া পড়ায় স্থল বা এই নবনিযুক্ত টিচারের কথা শরতের মোটেই মনে ছিলনা। আজ এইদিকে বেড়াইতে আসিয়া শ্রীনাথ বাবু তাঁহাকে টানিয়া আনিয়াছেন। শরৎ প্রথমতঃ অপরিস্রাট মহিলার নিকট আসিতে কোনমতেই রাজি হন নাই, শ্রীনাথ বাবু তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন দেখা করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য কার্য, তাহারই স্থল, তাঁহারই বেতনভোগিনী টিচার, যখন তিনি গ্রামে আসিয়াছেন তখন টিচারের সহিত দেখা শুনা করিয়া তাঁহার অভাব অভিযোগের কথা শ্রবণ করা তাঁহার উচিত।

শরৎ ভাবিয়া দেখিলেন কথাটা ঠিক, যথার্থই ইহা তাঁহার কর্তব্য কার্য্য ; তাই তিনি আসিয়াছেন।

বাপুয়া বাহির হইতেই শ্রীনাথ বাবু ক্রিয়য়া উঠিলেন “এতক্ষণ কোথায় ছিলি বেটা, নবাব হয়েছিস-না? ডাকতে ডাকতে মাঝবের গলা ভেঙ্গে যায়, বেটা সাঁওতাল ভূত তবু যদি সাড়া দেয়।”

শরৎ বাপুয়ার নিমেষে শুকাইয়া উঠা মলিন মুখখানার পানে চাহিয়া মিষ্টকণ্ঠে বলিলেন “মিস বোস এসেছেন স্কুল হতে?”

বাপুয়া একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল- “হঁ। তিনি এসেছেন। তাঁর শরীর ভারি খারাপ হয়েছে, তাই তাঁর কাছে ছিলুম, শুনতে পাইনি যে আপনারা ডাকছেন।”

শরৎ বলিলেন “তাঁর শরীর খারাপ হয়েছে? তবে আজ ফেরা যাক শ্রীনাথ বাবু, আর একদিন আসা যাবে তিনি ভাল হলে!” আগেই তিনি ফিরিলেন।

ক্রুদ্ধিত করিয়া শ্রীনাথ বাবু বলিলেন “ফিরছেন কেন? শরীর একটু খারাপ হয়েছে তাতে কি, তাইতে আপনি তার প্রভু জমিদার তাঁর দরজা হতে ফিরে যাবেন? এ কখনও হতে পারবে না শরৎ বাবু, এত ছেয় আপনি নন। এই বাপুয়া, মিস বোসকে খবর দে, জমিদার বাবু এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।”

“আজ্ঞে যাই—।

বাপুয়া ভিতরে ছুটিল।

জমিদার বাবু আসিয়াছেন শুনিয়া প্রণতি সম্বলিত হইয়া উঠিল, বিস্তৃত বসনাদি সংযত করিয়া সে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, বাপুয়া শ্রীনাথ বাবুকে খবর দিতে গেল।

আগে শরৎকে তাহার পর শ্রীনাথ বাবুকে অভিবাদন করিয়া দুইখানা চেয়ার নির্দেশ করিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, “বসুন।”

শরৎ প্রত্যভিবাদন করিলেন, কিন্তু গর্জিত শ্রীনাথ বাবু সামান্য একটা স্কুল মিষ্ট্রসকে একটু সম্মান দেখাইতে পারিলেন না। উভয়ে প্রণতির

নির্দিষ্ট হুখান্য চেয়ার অধিকার করিয়া বসিলেন; শরৎ বলিলেন “আপনিও বসুন মিস বোস।”

প্রণতি একখানা চেয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে সে একবার শরতের উন্নত বলিষ্ঠ দেহের পানে চাহিল,—কই মাতালের যেমন চেহারা তেমন ত নয়। লাবণ্য উহার দেহে মুখে উছলাইয়া পড়িতেছে যে। চোখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া দেখিল সে চোখে এতটুকু কুটিলতা নাই। শিশুর মত সরল সঙ্কোচশূন্য দৃষ্টিতে ভরা।

শরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার নাকি শরীর খারাপ হয়েছে?”

অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া প্রণতি বলিল “দেখছি এর মধ্যে বাপুয়া সে খবরটাও আপনাদের দিয়েছে, না, শরীর এমন কিছু খারাপ হয়নি, অতিরিক্ত গরমে মাথাটা দুপুর হতে বড় ধরে উঠেছে মাত্র।

শরৎ শ্রীনাথ বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন “স্কুলে বোধ হয় টানা পাখার বন্দোবস্ত নেই শ্রীনাথ বাবু?”

শ্রীনাথ বাবু একটু ইতঃস্তত করিয়া বলিলেন, “না, তা নেই, আপনার আদেশ ত পাই নি।”

শরৎ একটু ভাবিয়া বলিলেন “কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি যেন পাখার কথা বলেছিলুম আর হিসাবেও ধরেছিলুম। যাই হোক স্কুলে পাখার বন্দোবস্তটা আগে ক’রে দেবেন শ্রীনাথ বাবু, নইলে বাস্তবিকই ইনি আর মেয়েরা সবাই কষ্ট পাবেন। আপনিই ভেবে দেখুন না, গরমটা বড় কম নয়।”

শ্রীনাথ বাবুর পরিস্কার লগাটে কয়েকটা রেখা আগিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল, তিনি নরমস্বরে বলিলেন “পাখা আনিবে ছ, চারদিনের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত করে দেব।”

শরৎ তাঁহার পানে আর চাহিলেন না, প্রণতির দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার এখানে থাকার নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হচ্ছে, না?”

প্রণতির মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, “না, কষ্ট আর কি?”

শরৎ হাসিলেন, বলিলেন “আপনি না বললেও আমি তা বেশ বুঝতে পেরেছি। আপনি চিরকাল কলিকাতাতেই কাটিয়েছেন, সেখান হতে এই নীরব শাস্ত্র পল্লীগ্রামে এসে নির্বাসিত জীবন ভোগ করা যে কি তা আপনি না বললেও আমি বেশ জানি। প্রথম প্রথম অমনি আমারও কষ্ট বোধ হয়, তারপর দু চারদিন থাকতে থাকতে আবার সবই সয়ে যায়। কেমন যায় না কি, আপনিই তা বলুন না? প্রথম যেদিন এই পল্লীবক্ষে পা দিলেন সেদিনে চারিদিকে ঘন ঝোপ জঙ্গল, বড় বড় গাছ আর পানভরা পুকুর শুভো দেখে সত্যি আপনার প্রাণটা আঁতকে ওঠে নি?”

প্রণতি এই সদালাপী তরুণ যুবকটিকে জমিদার শরৎকুমার তাহার মনিব বলিয়া ভাবিয়া রাখিতে পারিল না। সে দেখিল তিনি মহামান্ত্র প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার নহেন, শিশুর স্তায় তরল মন। সরল প্রকৃতির একটি যুবক মাত্র। সে বলিল, “সত্যের খাতিরে যদি বলতে হয় তবে অবশ্যই তা আমার স্বীকার করতেই হবে।”

শরৎ বলিলেন “তারপর এসে স্কুলের মেয়েগুলো ছাড়া আর কোনও মেয়ের সাহায্য পান নি, কেউ আপনার কাছেও আসে নি।”

প্রণতি অত্যন্ত হইয়া গিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। তিনি যে কি করিয়া এ সব কথা জানিতে পারিলেন তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

শরৎ তাহার বিস্ময়ভরা চোখ দুটি দেখিয়াই তাহার মনের খবর জানিয়া লইলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন “দেখছেন আমি কি করে এ সব কথা জানতে পারলুম। দেখুন, এটা জানা কিছু বিচিত্র নয়। কেননা আমাদের এ সব পল্লীতে শিক্ষিতা মেয়ের সম্মান কেউ করতে জানে না। যে দেশের মেয়েদের মুখে তিনহাত ঘোমটা থাকে সে দেশের মেয়েরা সবলের সামনে মুখ খুলে রাখা ভারি খারাপ বলেই জেনে রাখে। বিশেষ আপনি স্কুলের টিচার, হিন্দু নন, ব্রাহ্ম কহা—”

শুককণ্ঠে প্রণতি বলিল “তা যদি ভেবে থাকেন তবে শুধু তারাই ভুল করে নি, আপনিও ভুল করেছেন। মেথেরা শিক্ষিতা হলে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেই যে সে ব্রাহ্ম হয় এমন কোনও কথা নেই। আজকাল অনেক হিন্দুর মেয়েও পড়া শুনা করছেন; লেখা পড়া কোনও একটা শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই তা তো জানেন। আমি ব্রাহ্ম নই, হিন্দুর মেয়ে।”

শরৎ প্রণতির মুখের পানে শুকনেন্দ্রে খানিক চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, “সত্যি ভুল করেছিলুম, ক্ষমা করবেন। আচ্ছা, তাই হোক, আপনি হিন্দুই হোন, সেটা মনে প্রাণে মেনে নিলুম আমি কিন্তু এদেশের লোক তো তা মানতে চাইবে না; কোন মেয়ে বিশ্বাস করবে না ওদেরই মত একটা মেয়ে আপনি। হয়তো কোনও দ্বায়ে পড়ে নিতান্ত বাধ্য হয়েই কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। কাজেই—বুঝতেই পারছেন কেউ আপনার সঙ্গে মিশতে আসবে না; ছাত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক আপনার পড়ার, তার গার্হস্থ্য-জীবনের সংশ্লেষে যেতে পারেন না।”

গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রণতি বলিল “আমি এখানে বাস করলে, আমার পরিচয় পেলেও তারা আর আসবে না।”

শরৎ আবার হাসিলেন, “ওই টুকুই এই পতিত হিন্দু সমাজের বৈচিত্র্য মিসবোস, ওই সঙ্কোচটুকুর জন্মেই যে হিন্দু সমাজ টিকে আছে—এই পল্লীগ্রামের লোকগুলোর তাই বিশ্বাস। পল্লীবাসির পরিচয় আপনি পাননি কখনও, এইবার পাবেন, একটা দামি অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। আপনার বয়স খুব কম, তা হলেও যে অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করতে পারতেন তা পাননি, তার কারণ সহরে যারা লালিতপালিত, পারিপার্শ্বিক কোনও খোঁজ খবর তারা রাখে না। পল্লীগ্রামে দারা বাস করে পারিপার্শ্বিক সব খবরই তারা রাখে, প্রত্যেকেই এক একটা কেন্দ্র হয়ে এখানে রয়েছে। আপনি ছদ্ম থাকলেই পল্লীগ্রাম

চিনতে পারবেন, অবশ্য সামাজিক হিসাবে নয়, কেন না পল্লী সমাজ চিরদিনই আপনার সামনে রুদ্ধ হয়েই থাকবে। যাই হোক, বার হতে যা দেখবেন তাতেই বাংলার পল্লীর অবস্থা বেশ বুঝতে পারবেন। এরা আপনাকে কাছে যাওয়ার অধিকার হতে বিচ্যুত করলে ভেবে হতাশিতা হবেন না মিসবোস, এরা যে স্বচ্ছন্দ নিজদের কাছ হতে আপনাকে দূরে রাখলে এ শুধু ভগবানের দয়াতেই, এই দয়ার জন্তে তাঁকে আপনার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আমার মতে আমি বলি বাংলার পল্লী সমাজের কাছ হতে দূরে থাকাই মানুষের শৃঙ্খলার কারণ, দূরে না গেলে সে কিছুতেই উন্নত হতে পারবে না। এর বিচিত্রতা এই কাছে এলেই গলা জড়িয়ে ধরে এই প'কের মধ্যে ফেলবেই, সেখান হতে মুক্তিলাভ করার আশা বামন হয়ে চাঁদ ধরার মত। দূরে থাকুন, কেউ আপনার দিকে একটা চোখ রেখে সর্বদা সজ্জ্ব থাকবে না, আপনার ভাল হলে কারও বুক কেটে যাবে না, আপনার মন্দ হলে কেউ মৌখিক সহানুভূতি দেখাতে আসবে না। দেশের লোক ভাবে আপনাকে তারা নিজেদের কাছে না নিয়ে গিয়ে আপনাকে শাসিত করে রাখলে, পদানতা করে রাখলে, কিন্তু আমি বলছি আপনি তাদের পদানতা করে ফেললেন তিনি না আপনি সমাজের বাইরে, এর সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্কই নেই, আপনার তোষামোদ করতে কেউ আসবে না, শত মুখে নিন্দেও কেউ করবে না। মানুষ যদি প্রার্থনা করে তবে যেন এই সমাজের বাইরে এমনি একা থাকার প্রার্থনাই সে করে যায়।

কথাগুলি তিনি যে গভীর সুরে বলিতেছিলেন, সেই গভীর সুরের মাঝখান চাইতে কিসের একটা অজানা ব্যথা আসিয়া প্রগতির বক্ষ স্পর্শ করিল। সে চোখ তুলিয়া শরতের মুখখানার উপর রাখিল, সেই শাস্ত মুখে সে বিবাদের রেখা ফুটিয়া উঠিতে দেখিল।

এই প্রথমদিনের সাক্ষাতে এবং সামান্য দুই চারিটা কথাবার্তায় সে সহজেই ধরিয়া ফেলিল শরতের বৃকের

মধ্যে কোথায় একটা ব্যথার কাঁটা ফুটিয়া আছে, ঘুরিতে ফিরিতে নড়িতে চড়িতে তাহা খচ-খচ করিয়া উঠে !

শরতের দৃষ্টি প্রগতির মুখের উপর পড়িতেই সে চোখ নামাইয়া লইল। শরৎ বলিলেন “আপনি ভাবছেন কেন আমি এ সব কথা বলছি কিন্তু—না থাক আজকে একথা, সে একদিন হবে। আপনার শরীর খারাপ হয়েই বলেছেন চাকরটাকে পাঠিয়ে দেবেন আমার বাড়ীতে সেখানে একটা ডিস্পেনসারী আছে, আমার বন্ধু একজন এক ঘণ্টা করে সেখানে বসেন। সেখান হতে ঔষধ নিয়ে আসবে। একটু সাবধানে থাকবেন, একে পল্লীগ্রাম, তার পরে বর্ষাকাল, একটু অনিয়ম করলেই জ্বর হয়ে পড়বে।”

বাপুয়া কুয়ার নিকটে চালা ধুইতেছিল, তাহার দিকে তাকাইয়া শরৎ ডাকিলেন “এই—এই চাকরটা—”

বাপুয়া ধতমত খাইয়া চালের পাত্র ফেলিয়া একবারে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, হাত দুখানা জোড় করিয়া বলিল “হজুর, আমার নাম বাপুয়া।”

শরৎ বলিলেন “বেশ নাম তোরা। যাক, আমার সঙ্গে চল, এঁর জন্তে ঔষধ নিয়ে আসবি।”

প্রগতি একটু হাসিয়া বলিল “আপনার দয়াকে ধন্যবাদ, কিন্তু, এখন ঔষধ দেবার কোনও দরকার নেই, এ রকম আমার প্রায়ই হয়, সেয়েও যায়।”

শরৎ তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন “রোগ একটু প্রশ্রয় পেলেই চেপে ধরে তা জানেন না বোধ হয়। রোগ আর পাপ, এই দুটি ভীষণ শত্রু অহরহ আমাদের চারদিকে ঘুরছে, এতটুকু ছিদ্র পেলে কখন এসে পড়বে আর ছাড়ানো যাবে না। অল্পেতেই সারাবার চেষ্টা করবেন নচেৎ নিস্তার পাবেন না। চলুন শ্রীনাথ বাবু, এখন ওঠা যাক।”

প্রবীণ শ্রীনাথ বাবুর এ সব কথা আদর্শেই ভাল লাগিতেছিল না। তিনি বসিয়াছিলেন নেহাৎ দাম্পত্য পড়িয়া নচেৎ থাকিতেন না। প্রগতি নিজে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও তিনি কিছুতেই ইহা বিশ্বাস

করিতেন না। এই ব্রাহ্মদের তিনি মোটেই দেখিতে পারিতেন না। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন এবং আপনার শুচিতা প্রাপণে বাঁচাইয়া চলিতেন। আজ বাধা হইয়া তাঁহাকে এই ব্রাহ্ম মেয়ের ঘরে উঠিতে হইয়াছে। ইহার জন্য তিনি নিজকে ভারি অপবিত্র বোধ করিতেছিলেন।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া শরৎ বলিলেন, “আপনার যখন বা অসুবিধা হবে তা আমার জানাবেন, আপনার এই বাপুয়াকে দিয়ে খবর পাঠালেই চলবে। এ ছোকরা বেশ ছটফুটে, আর চালাক। আচ্ছা আসি তবে, নমস্কার।”

প্রণতিও নমস্কার করিল, সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গেল। শরৎ ও স্ত্রীনাথ বাবু চলিয়া গেলেন।

( ৪ )

ইন্দুরাণীর অসম্মতি সত্ত্বেও শরৎ যেদিন পূজার দালান সেরামত করিতে মিস্ত্রী ধরিলেন, সেদিন ইন্দুমতী একেবারে জলিয়া উঠিল।

এ তো স্পষ্টই তাহাকে ছাটিয়া ফেলা। যেন সে জমিদারির মালিক নয়, সবই শরতের, পূজার দালান যে তাহার, সে দানপত্র এখনও তাহার সিঁদুকে রহিয়াছে। শরৎ ছলে বলে কৌশলে বিধাতার সম্পত্তি হস্তগত করিতে চান, কিন্তু ইন্দু সে ধরণের মেয়ে নয়; তাহার কেহ সহায় না থাক, সে নিজেই ইহার প্রতিবিধান করিবে।

ইন্দুরাণী তখনই শরৎকে ডাকিয়া পাঠাইল, এখনি আমার দরকার, নহিলে চলিবে না।

কি যে চলিবে না তাহা শরৎ বেশ বুঝিলেন, বিরক্তি না করিয়া তিনি অন্তঃপুরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “আমার ডাকছেন কাকি মা?”

ইন্দুরাণী দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখখানা নিদারুণ মনোকেটে, নিদারুণ অপমান করিয়া কি মর্মে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শরতের কথা শুনিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—

“হ্যা ডেকেছি।”

শরৎ বলিলেন, “কি দরকার বল।”

ইন্দুরাণী বলিল, “আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আমার অনভিমতে আমার জিনিসে হাত দেবার তুমি কে?”

শরৎ একটু হাসিলেন, পরমুহূর্তে গম্ভীর হইয়া বলিলেন “কেউ নই কাকিমা, তুমি আমার মা, আমি তোমার কেউ নই।”

ইন্দুরাণী দ্বন্দ্ব অধর চাপিয়া বলিল “ওটা নেহাৎ ভুগানো কথা বাছা তোমার। যদি সেই রকম যথার্থই মনের ভাব হতো তোমার; কখনই আমার জিনিসে হাত দিতে পারতে না।”

শরৎ এবার একটু কঠিনস্বরে বলিলেন, “আমার মনের ভাব তুমি কি রকম দেখছে?”

ইন্দু কালবিলম্ব না করিয়া বলিল “সন্দেহ না নিয়ে আমার জিনিসে হাত দিচ্ছে তখন এতে তোমার গোপন মতলব নেই কেমন করে তা বিশ্বাস করব? বিনা স্বার্থে কেউ এ জগতে কোন কাজ করে না বলেই আমি জানি।”

শরতের স্ত্রীগোর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, তিনি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন “অবশ্য স্বার্থ একটু আছে বই কি কাকিমা, বিনা স্বার্থে কেউ যে কোন কাজ করে না এ ঠিক কথাই বলেছ। আমারও স্বার্থ আছে বই কি, যেহেতু আমার পিতৃ পিতামহের বড় আদরের পুত্রের দালান একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন তরুণীর খেয়ালের বেশে নষ্ট হওয়া আমি দেখতে পারছি। বাবা জানতে পারেন নি যে তার বুকের পাঁজর এই পুত্রের দালানটী অবশেষে একটী এই রকম জ্ঞানহীন বিধবার সম্পত্তি-রূপে গণ্য হবে, তা জামলে তিনি কখনই এই পৈতৃক দালান হাত-ছাড়া করতেন না। তুমি পুত্রের দালান সমতল করতে চাও কিন্তু যত দিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন তা পারবে না—আমার পূর্ব পুরুষের কোন চিহ্ন এতটুকু আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না। আমার এই স্পষ্ট কথা শোন কাকিমা, তোমার যা তা তোমারই

থাকবে, ভবিষ্যতে আজ হতে কেউ যে তাতে হাত দিতে আসবে তা আমি হতে দেব না। আমি যতদিন থাকব আমিই দেখাশুনা করব, নিঃসম্পন্নীয় পুরুষ শ্রীনাথ বাবু এর মধ্যে আসতে পারবেন না। তোমার যা দরকার তা তুমি আমার বলতে পার, আমার অন্তঃপুরে অল্প পুরুষ যে অবাধে প্রবেশ করবে আমার আদেশে তুমি তা করতে পারবে না। আমি আশা করছি আমার অন্তঃপুরের পবিত্রতা রক্ষা করতে আমি যা বলব তা তুমি শুনবে, আমার কথাগুলো চলেবে, আমার শেষটা তোমার “পরে স্নেহ করতে হবে না। ভদ্র লোকের জমিদারের অন্তঃপুর যেমন থাকে আজ হতে তাই হবে, স্বেচ্ছাচারিতা এখানে কিছুতেই চলবে না।”

শরতের তীক্ষ্ণ কর্কশ কথাগুলিতে ইন্দু খতমত খাইয়া গিয়াছিল, সে আর একটা কথাও বলিতে পারিল না। গভীর মুখে ধীর পদে শরৎ চলিয়া গেলেন, ইন্দু নত মুখে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রথমটা সে শরতের কথা মোটে বুঝিতেই পারে নাই, তাহার গর্জিত বাক্যটাই এই অতর্কিত আঘাতে যেন কি রকম হইয়া গিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার আত্মগর্ক ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

কি, এতদূর? শরৎ মনে করিয়াছে সে সাধারণ মেয়ে, তাই তাহাকে প্রথমে মিষ্ট কথা দিয়া শেষকালে চোখ রাঙাইয়া বশ করিতে চায়, দমন করিতে চায়? সে জানে না ইন্দুর হৃদয় কি উপাদানে নির্মিত, তাই সে বেশ সহজেই তাহাকে দমনে রাখিবার কথা জানাইয়া গেল। ইন্দু কি সত্যই তাই, সত্যই সে কি মাথা পাতিয়া এই অসম্মান নীরবে বহন করিবে, নীরবে সব সহিয়া যাইবে? আপনার যাহা কিছু সব পরের হাতে সঁপিরা দিয়া সে সামান্য নারীর মতই পরমুখাপেক্ষী হইয়া অন্তঃপুরে গোপনতার অন্তরালে বাস করিবে? সে নারী বলিয়াই কি এই নির্ধ্যাতন সহিয়া যাইবে? নারী কি যাহা নর, নারী কি প্রকৃত্ত ভাবে জীবনানি পরিচালনা করিতে পারে না,

নারীর হৃদয় কি এতই হীন, নারী কি পুরুষের সমান অধিকার পাইতে পারে না? ছি ছি, শরৎ তাহাকে ভাবিয়াছে কি, অপমানমণ্ডলিষ্ট মুখখানা ইন্দু লুকাইবে কোথায়? দাসী ভৃত্য বর্ষচরীগণ এই প্রবলপ্রতাপবিত্ত অধিনারীর কথায় উঠে বসে তাহারা যখন জানিবে ইন্দু নামে জমিদার হইলেও কাজে তাহাদেরই মত পরের মুখাপেক্ষিনী তখন তাহারা ইন্দুকে মানিবে কি?

কল্পনায় নিজের সেই হৃতমানাবস্থা দেখিতে দেখিতে ইন্দু আত্মহারা হইয়া পড়িল। পরম বিশ্বাসী একান্ত শুভামুখায়া শ্রীনাথ বাবুর মুখে ইতিপূর্বে সে এই বিপদেরই আভাস পাইয়াছিল। সুন্দরশী:শ্রীনাথ বাবু মনশ্চক্ষে এই দৃশ্যটাই বহু পূর্বে দেখিতে পাইয়াছিলেন, কতাপ্রতিম এই ইন্দুকে তিনি তাহারই ভাবী সম্ভাবনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দুকে তিনি যতটা নির্দোষ ভাবিয়াছিলেন সে তাহা নয়, অনেক বিষয়ে সে শ্রীনাথ বাবুকেই শিফা দিতে পারিত চিরকাল যাহারা কষ্টে, মাছুষ হয় তাহারা অনেক বিষয়ে এমন অভিজ্ঞতা লাভ করে যেমন একটা শিক্ষিত পুরুষ লাভ করিতে পারে না। পরমা টাকার দিকে দৃষ্টি তাহার খুব বেশী সেই জন্তই এই কমটা বৎসরের মধ্যে জমিদারের চালও শিখিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাকে কঁাকি দেওয়া বড় কম কথা ছিল না।

সে নিজে এখনই শরতের বিপক্ষে দাঁড়াইতে পারিত, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিত, কিন্তু অতদূর সাহস তাহার হইতেছে না, কেননা সে নারী। তাহার আর একটা সাহায্যকারীর দরকার যে সব স্থানে বাহির হইতে পারিবে, সকলের সহিত জোর গলায় কথা কহিতে পারিবে। সে হিন্দুর ঘরের মেয়ে, অবাধ স্বাধীনতা সে পায় নাই, শরতের সহিত প্রকাত্ত বুদ্ধ ঘোষণা করিতে সে তাই পিছাইয়া গেল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে যখন কোনও উপায় স্থির করিতে পারিল না তখন শ্রীনাথ বাবুকে একবার অবশ্য আসিবার কথা বলিতে দাসীকে পাঠাইয়া দিল।

শ্রীনাথ বাবু জানাইলেন জমিদার তাঁহাকে আদেশ দিয়াছেন ভবিষ্যতে ছোট তরফের কোন কাজ তাঁহাকে না জানাইয়া করিতে পারিবেন না। ছোট তরফের নামেব গোমস্তা পেদাদা প্রভৃতি তিনিই ঠিক করিয়া দিবেন, এ বিষয়ে কথাবার্তা বাহা বলা দরকার ইন্দুরাণী শরৎকে বলিবেন, শ্রীনাথ বাবুর তাহাতে মাথা ঘামাইবার কোনও আবশ্যক নাই। একটা ছুর্কলচিত্তা বিধবার উপরে তিনি জমিদারী ভার ফেলিয়া দেওয়া সম্ভব মনে করেন না, বিশেষ সে বিধবাটী অল্পবয়স্ক। তিনি এ বিষয়ে সরকারে জানাইয়াছেন বাহাতে তিনি এই বিধবার গার্জ্জন হইতে পারেন। তিনি এখন গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যাইবেন না, নিব্বের হাতেই সব ভার রাখিবেন, সব দেখা শুনা করিবেন। খাজনা পত্রাদির হিসাব নিকাশ তিনিই দিবেন সে বিষয়ে পরের সাহায্য অনাবশ্যক। জমিদারের ভয়ে শ্রীনাথ বাবু ইন্দুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অন্তঃপুরে আর যাইতে পারিবেন না, তবে যদি ইন্দুরাণী ইচ্ছা করেন তবে; ধর্মমাতা শ্রীনাথ বাবুর জ্ঞান সহিত দেখা করিতে তাঁহার বাড়ী আসিতে পারেন।

ইন্দু তখনই পাকী আনিতে আদেশ দিল। একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি পুরুষের পরামর্শ এ সময় আবশ্যক, সে নিজেকে নিজে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। অন্তরটা তার ক্ষুদ্র রোষে ফাটিয়া যাইতেছিল, রাগের মাথায় কি করিয়া বলিবে তাহার ঠিক কি? শ্রীনাথ বাবুর মত কূটবুদ্ধি আর কাহারও ছিল না, স্তত্রাং এ বিপদে তিনি বই আর কেহ নাই যে ইন্দুকে সাহায্য করে।

ইন্দুর পাকী যখন বহির্কীটী দিয়া যাইতেছিল শরৎ সে সময় বাহিরের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া মিস্ত্রীদের সহিত কথা কহিতেছিলেন। দাসীকে পাকীর সহিত যাইতে দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন কে যাইতেছে, তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন “কে যাচ্ছে?”

দাসী সন্তোষের সহিত উত্তর দিল “রাণীমা।”

সকলে ইন্দুকে রাণীমা বলিয়া সম্বোধন করিত।

শরৎ আর কথা কহিলেন না, তাঁহার জানিতে বাকি ছিল না ইন্দু কোথায় কেন যাইতেছে। নিম্নেষে তাঁহার মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিয়া তখনই পরিস্কার হইয়া গেল।

শ্রীনাথ বাবুর পত্নী আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া ইন্দুকে নামাইয়া লইলেন। ব্যগ্র কণ্ঠে ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল “শ্রীনাথ বাবু কোথায়, তাঁর কাছে আমার বিশেষ প্রয়োজন।”

শ্রীনাথ বাবুর পত্নী বলিলেন “তিনি বৈঠকখানায় আছেন, আমি তাঁকে ডাকতে পাঠাচ্ছি।”

ইন্দুকে বসাইয়া তিনি শ্রীনাথ বাবুকে ডাকিতে পাঠাইলেন, ইন্দু আসিয়াছে শুনিয়া শ্রীনাথ বাবু তখনই উঠিয়া আসিলেন।

“এই যে, মা জননী আমার নিজেই এসে হাজির হয়েছেন। ওগো, তুমি চুপটা করে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে, দেখছ না, মা আমার যেম্নে নেয়ে উঠেছেন, একখানা পাখা এনে বাতাস দাও না।”

ইন্দু একটু হাসিল, অঞ্চলাগ্রে ললাটের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া বলিল,—“না পাখা আনবার কোনও দরকার নেই। আপনি বসুন দেওয়ান মশাই, আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, সেই জন্তে আজ নিজেই চলে এসেছি।”

দেওয়ান বসিয়া বলিলেন, “তাতো বুঝেছি মা লক্ষ্মী, তোমার দরকার ছিল বলেই ঝিকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলে। কোনদিন তোমার কথা না শুনি বল মা, কিন্তু আজ আর তা পারলাম না। জমিদার এমন চালাক—তার চালাকি ধরা আমার মত লোকের কাজ নয়। মুখে বেশ হুস্ততা জানায়, যা বলছি তাই যেন শুনছে, এমনি ভাব দেখায়, কিন্তু আসলে তার কিছু নয়। মনের মধ্যে যে সময় সে একখানা কথা ভাবছে, মুখে সেই সময় অন্য কথা বলে যাচ্ছে, এ রকম লোককে চিনতে কেউ কখনো পারবে না। জমিদার চিরকাল জমিদারী চাল নিয়ে কলকাতাতেই বাস করে, পল্লীগোমের সঙ্গে সম্পর্ক তার কতটুকু?”



তোমার জমিদারেরা বাস করে কলকাতায়, মটর হাঁকার, জুড়ি হাঁকার, বড় জোর পূজোর সময় কি শীতের সময় বন্ধ বান্ধব নিয়ে ছুটার দিনের জন্তে বাড়ী আসে, এই তো এই বাংলাদেশের জমিদারের প্রথা। দেশের সঙ্গে জমিদারের সম্পর্ক বরাবর ছুটার দিনের, কিন্তু এই হতভাগা জমিদারকুলের কলঙ্ক তা উন্টাতে চায় কে। লেখাপড়া সামান্য একটু শিখেছে তাই, নইলে গণ্ডমূর্থ বলেই উড়িয়ে দেওয়া যেত।”

ইন্দু অধীর হইয়া বলিল, “আপনি যা বলছেন কথাগুলো ঠিক, কিন্তু আগে আমার বিষয়টা—”

শান্তভাবে মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, “তবে আর বলছি কি মা লক্ষ্মী, তোমার কথাতেই তো কথাটা উঠেছে। সকাল বেলা—কোথাও কিছু না, এসে শুকুমজারি করলে আজ হতে অস্তঃপুরের সঙ্গে আমাদের কোথাও সম্পর্ক নেই। তখন লেখা হয়ে গেল, কোথায় তা পাঠানোও হয়ে গেল। কি করব মা, তারই কাজ করি, বেতনও পাচ্ছি তার কাছ হতে, শুকুম অবশ্যই শুনতে হবে। এমন মাথা পাগলা লোক ছুনিয়ায় যদি আর ছুটি থাকে। মাতালদের ভাবই এই রকম, এ কিছু নূতন ধারা নয়। ওদের মনের গতি কখন কেমন হয় তা বুঝতে পারা যায়। ছিঃ, ছিঃ, মাতালকে কেউ মাছুষ বলে? সে—”

বাধা দিয়া ইন্দু বলিল, “আপনি মনে সে কথা জেনেও, তাকে আন্তরিক ঘৃণা করেও তবু তার কাজে রয়েছেন বলে একটা কথা মুখে আনতে সাহস করছেন না। আমি তার সঙ্গে কোনও রকমে জড়িয়ে না থেকেও যে জড়িয়ে পড়েছি, আমি একেবারে সম্পূর্ণ-রূপে তার হাতের মধ্যে এসে পড়েছি, তার অধীনা হয়েছি।”

তাহার কণ্ঠস্বর বেদনাক্লিষ্ট।

শ্রীনাথ বাবু চিন্তিত মুখে বলিলেন, “কি করব মা; আমি চাকর সে মনিব, মন না মানলেও স্বীকার করতে হবে হ্যাঁ, সে মাছুষ, চোখে তার বুদ্ধিহীনতা

দেখেও বলতে হবে সে বুদ্ধিমান, পদে পদে তার দোষ দেখলেও বলতে হবে সে গুণবান। আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক আলাদা, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে—, তুমি যে মেয়ে কাছেই—”

ইন্দু সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, “মেয়ে বলে আমার কোনও অধিকার নেই, আপনি এ বেশ কথা বলছেন দেওয়ান মশাই। আমার জিনিস, আমি ছয় আনির বখরা পাব, জমিদার তো আমিও বটে, সে আমার পরে অনায়াসে শুকুম চালিয়ে যাবে, আমার পরে এমনি অত্যাচার করবে? আমার জিনিসে সে অনায়াসে হাত দেবে, আমি তা সহ্য করে যাব?”

তাহার চক্ষু দুইটা ভীষণ রকম দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে উত্তরের প্রতীক্ষায় শ্রীনাথ বাবুর পানে চাহিয়া রহিল।

শ্রীনাথ বাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, “তোমার এমন কোন একজন আত্মীয় চাই যে বেশ শক্ত, কিছুতেই দমবে না, যার আড়ালে তুমি দাঁড়িয়ে সমান লড়তে পারবে। আমার দ্বারা তা হবে না মা; লুকিয়ে আমি তোমার সংপরাশর্ম দিতে পারি, প্রকাশ্যে আমার তোমার শত্রু বলেই জানতে হবে।”

ইন্দু বলিল, “আমার ভাইকে আন্লে হয় না? সে বেশ লেখাপড়া জানে, চালাক চতুর ও আছে, সে আমার সম্পত্তি বুক দিয়ে রক্ষা করবে।”

শ্রীনাথ বাবু প্রশ্ন মুখে বলিলেন, “সেই ভাল হবে মা, তোমার ভাই থাকলে তোমার এতটা পর সুখা-পেক্ষী হয়ে থাকবার দরকারটাই বা কি?”

ইন্দু বলিল, “তবে আপনি তাকে এখনই একখানা টেলিগ্রাম করে দিন, আমি ভারি বিপদগ্রস্ত, সে যেমন অবস্থায় আছে তেমনি অবস্থাতেই যেন চলে আসে। সে ঢাকার বন্দীবাজারে একটা মেসে আছে, তার নম্বরটা তো আপনার কাছেই আছে।”

শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, “অগত্যা তাই করে দিতে হবে; নইলে তো আর কোনও উপায় নেই।”

ইন্দু অকুল পাথারে কুল পাইল। ভাই আসিলে



সে অনেকটা নিশ্চিত হইতে পারিবে, এত ভাবনার বোঝা তাহার মাথায় থাকিবে না। সে বলিল, “আচ্ছা, শরৎ যে পুজার দালান সারাতে মিস্ত্রি লাগিয়েছে, এতে কি করি বলুন তো।”

ঈনাথ বাবু বলিলেন, “করছে করুক না। তার বাপ যে উইল করে তোমার স্বামিকে দিয়ে গেছেন, সে উইল আছে তো?”

ইন্দু উত্তর দিল, “আছে।”

“সেটা খুব সাবধানে রেখে মা, তোমার শত্রু তোমার ঘরে তা বুকে চলো। বাইরের শত্রুকে পার আছে কিন্তু ঘরের শত্রুকে পার নেই। সে যে রকম মাতাল, তাতে বেশী দিন যে জমিদারি রাখতে পারবে তা বোধ হয় না। শুনেছি অনেক টাকা দেনা হয়েছে, সেই দেনা শোধ করবার টাকা যোগাড় করবার জন্তেই এখানে এসেছে। জমিদারির যা আয় তা হুদিনে উড়িয়ে দিয়ে, উটে দেনায় মাথার চুল বিকিয়ে যাবে, তখন তোমার ভাগে হাত পড়বে সেই চেষ্টায় আছে। ও সব লোককে এতটুকু বিশ্বাস কর না মা। এই তো পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়েস এখনই এই—এখনও সমস্ত জীবনটা পেছনে পড়ে আছে। জেনো—ওর এক পরস্যাও থাকবে না, শেষটার পথে দাঁড়াতে হবে। যে সব ভূত প্রেত এসে জুটেছে চারিদিকে এরাই সব থাকবে। যাক গিয়ে ও সব কথা। তোমার ভাইকে আমি আঙাই টেলিগ্রাম করে দেব এখন, তার জন্তে তোমায় ভাবতে হবে না।

তুমি যেমন চুপি চুপি এসেছ তেমনি চুপি চুপি ফিরে যাও, সে যেন জানতে না পারে তুমি আমার এখানে এসেছিলে। আমি গোপনে তোমায় যতদূর পারি সাহায্য করব, প্রকাশে কিছু পারব না।

ইন্দু বলিল, “শরৎ জানে আমি এখানে এসেছি।”

বিবর্ণ মুখে ঈনাথ বাবু বলিলেন, “জানে?”

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, সে আমি সামলে নেব। তুমি আর দেৱী করোনা মা; বাড়ী যাও।”

লোকটার কাপুরুষতা দেখিয়া ইন্দুর মনে এতটুকু শ্রদ্ধা রহিল না, ঘুণাটাই জাগিয়া উঠিল। সে উঠিল, অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, “শরতের কি ঠাকুর দেবতার ‘পরে ভক্তি আছে?’”

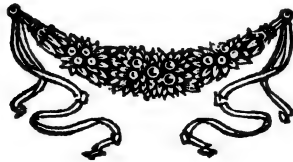
বিকৃত মুখে ঈনাথ বাবু বলিলেন, “রামো; ও রকম লোকদের আবার ঠাকুর দেবতার ভক্তি? না করে এমন কাজ নেই, না থায় এমন জিনিস নেই। সেবার কলকাতায় বাসায় দেখলুম আশাচুল্লা খানসামা টেবিলে বাবুদের সব পরিবেশন করছে। আরে ছিঃ, ওরা কি জাত মানে, না ধর্ম কর্ম মানে? একেবারে যাকে বলে খুঁটান—তাই। এই যে নূতন টিচারটা এসেছে এর সঙ্গে মিলবে ভাল।”

ইন্দু গম্ভীর মুখে শুধু বলিল, “হু।”

সে পাগলীতে উঠিল।

তাহাকে বিদায় দিয়া ঈনাথ বাবু ফিরিয়া আসিলেন।

ক্রমশঃ



## কাশীর কথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীরবীন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী

দীর্ঘে দীর্ঘে নৌকা দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। মুরলীবাবু গান ধরিলেন - বেশ আমোদ হইতেছিল। মাঝী প্রত্যেক বৎসর যাত্রী আনিতে বাংলায় যাওয়ার গল্প আরম্ভ করিল। বাংলায় বিভিন্ন জেলায় সে গিয়াছে। দিন পনের পরে এবারও সে মৈমনসিংহ যাইবে বলিল।

গঙ্গাবক্ষে হইতে কাশীর দৃশ্য অতি মনোরম। সৌধকিরিটানী সহরখানা গঙ্গার ধার ব্যাপিয়া ধ্যানমগ্ন যোগীর স্তায় নীরবে অবস্থিত। অট্টালিকার পর অট্টালিকা। গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ। অসংখ্য মন্দিরের চুঁড়া কাশীর সৌন্দর্য শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। বর্ষাকালে গঙ্গার জল যখন স্ফীত হয় তখন মনে হয় কাশী সহরখানা যেন গঙ্গার উপর ভাসমান।

কিয়দূর অগ্রসর হইয়া কাশীর রাজবাড়ী ঠিক গঙ্গার উপরেই অবস্থিত। এই প্রাসাদ অনেকটা ছুর্গের মত। বর্ষাকালে গঙ্গার উচ্ছলিত বারি দুর্গ প্রাকার ধৌত করিয়া চলিয়া যায়। গঙ্গার উপরেই তিনটি গবাক্ষ,—মাঝি মধ্যে জানালাটি নির্দেশ করিয়া বলিল যে ওখান হইতে গঙ্গাবক্ষে স্বম্প্রদান করিয়া কাশীর তদানীন্তন অধিপতি চৈৎসিংহ পলায়ন করিয়াছিলেন। এই প্রস্তরনির্মিত সুদৃঢ় প্রাসাদ এক শোচনীয় স্থিতি বিজড়িত। সে ঘটনা ইতিহাস প্রসিদ্ধ “Plunder of Chaitising”—চতুরপ্রবর Lord Clive পলাশীর আত্মকাননে বৃটিশ রাজ্যের ভিত্তি প্রোথিত করিয়া বিলাতে চলিয়া গিয়াছেন,—কূটনীতি পরায়ণ Warren Hastings ভারতের শাসন গদীতে উপবিষ্ট—খণ্ড বিখণ্ড রাজ্যগুলিকে অধীনতা পাশে বদ্ধ করিবার জন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ইংরাজী ১৭৭৮ খৃঃ অঃ “প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধ” আরম্ভ হইল; দাক্ষিণাত্যে আগুন জ্বলিল। ভারতের

তদানীন্তন সর্বপ্রধান শক্তি মহারাষ্ট্রগণ বিপুল বিক্রমে Warren Hastingsকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। এই সময়ে ফরাসীর সহিত ইংরেজের পূর্ব শত্রুতা আবার জাগিয়া উঠিল। প্রথম মহীশূর যুদ্ধের সন্ধি সর্ব ভঙ্গ করিয়া Hastings মহীশূর রাজ্যের ফরাসী অধিকৃত ‘মাহী’ নামক স্থান অধিকার করেন। এই ঘটনায় মহীশূরের নবাব হাইদর আলী সিংহের মত গজ্জিয়া উঠিলেন। অনতিবিলম্বে হাইদর আলী প্রবল পরাক্রান্ত একদল সৈন্য নিয়া ইংরাজাধিকারে প্রবেশ করিয়া অমাবুঘী অত্যাচারে শত মাইল ব্যাপিয়া গ্রামের পর গ্রাম ভস্মরূপে পরিণত করতঃ ক্রোধানলে কিঞ্চিৎ বারিসিঞ্চন করিলেন। মহারাষ্ট্র ও হাইদর আলীর সম্মিলিত শক্তি ইংরেজদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। এই সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহের জন্ত বিলাতে Court of Directors Hastings কে দায়ী করেন এবং যুদ্ধের ব্যয় বহন করিতে অস্বীকার করেন। উপায়াস্তরবিহীন Hastings অযোধ্যার নবাবের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। তারপরে অহর্যাম্পশ্রা বেগমগণের উপর অকথা অত্যাচার করিয়া তাহাদের ৭৬ লক্ষ টাকা অপহরণ করা হয়; তাহা ইতিহাস পাঠক মাঝেই জানেন। ভারতের ইতিহাসে সে ঘটনা “Extinction of the Begums of Oudh” বলিয়া অঙ্গদাক্ষরে লিখা রহিয়াছে।

১৭৭৮ খৃঃ অঃ Hastings কাশীরাজ চৈৎসিংহের নিকট ৫ লক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করিতে তিনি তাহা প্রদান করেন। ১৭৮০ খৃঃ অঃ Hastings আরও ৫ লক্ষ দাবী করেন। রজকোষের হ্রদশা দর্শনে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ Hastings তাহার ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা ডাকিয়া দিলেন এবং টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত সৈন্য সামন্ত নিয়া যয়ঃ

কাশীতে উপস্থিত হইয়া অবিলম্বে কাশীরাজকে বন্দী করেন। কাশীর প্রজাসাধারণ ক্ষেপিয়া উঠিল। উন্নত প্রজাবৃন্দ গারদ ভাঙ্গিয়া চৈৎসিংহকে মুক্ত করে। Hastings সাক্ষ্য পোষাক পরিধান করিতেছিলেন এমন সময় চৈৎসিংহের মুক্তির সংবাদ তাহার নিকট পৌঁছিল। প্রাণত্যাগে Hastings সেই সন্ধ্যাকালে অসমাপ্ত পোষাকে বেগবান অশ্বে আরোহণ পূর্বক চুনীর দুর্গে যাইয়া আশ্রয় নেন।

চৈৎসিংহ গারদ হইতে বাহির হইয়া প্রবল Hastings এর ভয়ে অস্থির হইয়া পড়েন এবং তাঁহার সঙ্গে সৌম্য স্থাপন মানসে কাস্ত মুদীর শরণাপন্ন হন। কাস্তমুদী এই উপলক্ষে কাশীরাজের নিকট হইতে প্রচুর উৎকোচ প্রাপ্ত হন। কিছুতেই কিছু হইলনা। বহু সৈন্য নিয়া Hastings পুনরায় কাশীতে উপস্থিত হইলেন। ভীক কাশীরাজ Hastings এর আগমন সংবাদে ভীত হইয়া প্রাণের ভয়ে গবাক্ষপথে উচ্ছলিত বেগা ভাগীরথি বক্ষে বাষ্প প্রদান করিয়া পলায়ন করেন। প্রতিহিংসাপরাধ হেষ্টিংস রামনগর অধিকার পূর্বক রাজ্যচ্যুত চৈৎসিংহের পরিবর্তে এক ক্ষুদ্র বালককে কাশীর গদীতে অধিষ্ঠিত করেন। আজ কয়েক বৎসর যাবত কাশীরাজ অত্যাচার করদ নৃপতি বৃন্দের মত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্ষুদ্র গবাক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দুর্গচূড়ে স্বাধীনতার যে বিজয় পতাকা একদিন সগর্বে উড়িত সে স্থান আজ শূন্য, সে স্থান আজ নীরব। ধীরে ধীরে নৌকা নারদ ঘাটে থামিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাসায় পৌঁছিলাম। আহা! তাহার পর আমবাড়িয়া ছাড়ে গেলাম।

বারাণসী প্রবাসকালে আমবাড়িয়া ছত্রের ছাদের উপর উন্মুক্ত আকাশ তলে বেশ আরামেই ঘুমাইতাম। প্রথর সূর্য্যকরে ছাদ অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া থাকিত; কিন্তু মুরলীবাবু ভৃত্যবর্গের সাহায্যে বৈকালে ছাদে জল ঢালিয়া আটকাইয়া রাখিতেন এবং ঘণ্টা খনেক পরে জল ছাড়িয়া দিতেন। কাজেই

আমরা খুব আরামেই রাজি বাপন করিতাম। শেদিন শেষ রাত্রিতে জাগিলে পর দূরগত স্মৃষ্টি শানাইয়ের সুরলহরী কর্ণকূহরে অমিয়ধারা বর্ষণ করিল। সেই সুরলহরী এত মিষ্ট, এত করুণ যে বহুকণ তন্ত্রাচ্ছন্ন ভাবে পড়িয়া থাকিয়াও প্রাণ তৃপ্ত হইলনা। অবশেষে ভোরের একটু পূর্বে উঠিয়া মুরলী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম দুর্গাবাড়ীতে প্রত্যহ শেষ-রাত্রিতে শানাইয়ে ভৈরবী আলাপ করা হয়। রাত্ৰায় সন্ধান নিয়া আমি ও প্রমদাচরণ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাবাড়ীর দিকে রওনা হইলাম। শুনিয়াছিলাম দুর্গাবাড়ীতে বানরের অত্যন্ত উৎপাত, তাই রাস্তা হইতে কিছু কলা কিনিয়া নিলাম। দুর্গাবাড়ীর সিংহ-দ্বারের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড তৈল গাছ—সেটাই বানরগণের আস্তানা। আমরা সিংহদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র একদল বানর লাফাইয়া নীচে নামিয়া আসিল—আমরা কদলী দানে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া নন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

দুর্গাবাড়ী হইতে ঘুরিতে ২ ইতিহাসগ্রন্থিক মানমন্দিরে গেলাম। মানমন্দির বৈজ্ঞানিকগণের আনন্দদায়ক হইতে পারে কিন্তু তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তথা হইতে শিবাবতার শঙ্করের আশ্রমে যাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু প্রথর রৌদ্রে এবং ক্ষুণ্ণিপাসায় কাতর বলিয়া ফিরিতে হইল। একথানা এক্কাতে বেলা ১০ই ঘটিকায় দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছিলাম।

সহর হিসাবে কাশী নিতান্ত ছোট নয়। লোক-সংখ্যা প্রায় কলিকাতার সমান হইবে। সমগ্র গঙ্গার ধার ব্যাপিয়া সৌখ্যের পর সৌখ্য দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ। বাঙ্গালীটোলার রাস্তায় বাহির হইলে মনে হয়না যে কোন অবাকালী সহরে উপস্থিত হইয়াছি।

গ্রীষ্মের ভয়ে প্রয়াগ যাওয়া স্থগিত রাখিয়া একদিন সন্ধ্যাবেলা কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলাম। মোগল-সরাই পৌঁছিয়া কলিকাতাগামী Bombay mail-এ বেঞ্চের উপর লম্বা হইয়া পড়িলাম। -ভোর

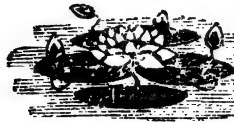
বেলা গম্বাতে পৌছিয়া হাতমুখ ধুইয়া নিলাম। তারপরে ট্রেন পার্শ্বত্যাগপ্রদেশে প্রবেশ করিল। ট্রেন চলিতেছে বেলা তখন ৯টা হইবে। হঠাৎ এক গভীর অন্ধকারের মধ্যে পারিপার্শ্বিক পার্শ্বত্যাগ দৃশ্য আশ্চর্য্যাপন করিল। আমি তো একেবারে চমকিয়া উঠিলাম। প্রায় ৫ মিনিট পরে আবার আলোতে পৌছিয়া হাঁফ ছাড়িলাম। পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া

দেখিলাম একটা অন্ধকার টানেল পাহাড়ের বাকে অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে। পথে আরো ২টা টানেল অতিক্রম করিত হইল। পরে কয়লার রাজ্যের ভিতর দিয়া ট্রেন দুর্জয় বিক্রমে ছুটিতে ছুটিতে Howrah Burdwan Chord Line দিয়া বেলা তিনটায় হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিল।

## প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

ক্ষমা কোরো বন্ধু মোর ;	আজি মোরে সেই লজ্জা তীক্ষ্ণ হোয়ে
তোমারি সে প্রিয়তমা,	তব প্রেম ডোর
বঁধিয়াছে হৃদিতার—	বিঁধে অনিবার।
না জানিয়া, বার বার	কেন বন্ধু বল নাই,
হোয়েছে যে ত্রুটি,	তুমি যারে হৃদিপথে
সে তুমি রেখোনা মনে, মাগি এই জুড়ি পাণি ছুটি।	সুখে দেহ ঠাই
প্রণয়ের সম্বোধন	সেতো নহে এ মনের,
তোমার প্রিয়ারে প্রিয় !	শুধু যোগ্য প্রণামের
গাঁগিয়াছি চন্দ্রে গানে	বহুদূর হোতে —
আনন্দিত স্নিগ্ধ প্রাণে	ভুল কোরে ভেসেছি, প্রীতি ভাবি, কলঙ্কের
	শ্রোতে
মুরতি তাহার,	



## পূজার ভূত

( ভৌতিক কাহিনী )

শ্রীচিন্তাম্বর চট্টোপাধ্যায় ।

পরেশ বাবু উকীল ও নরেশ বাবু পুলিশের দারোগা। উভয়েই কলিকাতাবাসী এবং এক পাড়াতেই বাস করা হেতু পরস্পরের মধ্যে দৃঢ় সৌহার্দ্য বন্ধন ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে ৮ শারদীয়া পূজার সময়ে তাঁহারা জনৈক জমিদার বন্ধু কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বরিশালের অন্তর্গত + + + গ্রামে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিল পরেশ বাবুর পুরাতন ভৃত্য ফকীর চাঁদ দাস।

ফকীরচাঁদ স্থলবুদ্ধি ও ভয়তড়াসে লোক বলিয়া তাকে লইয়া নরেশ বাবু প্রায়ই কৌতুক করিতেন। মহাষ্টমীর দিনও সে প্রলোভন তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সন্ধ্যার পরে পরেশ বাবু যখন আরামে শয়না তান্ত্রকূট সেবন করিতে করিতে একখামা ডিটেক্টিভ উপগ্রাস পাঠ করিতেছিলেন, তখন নরেশ বাবু, গম্ভীরভাবে বলিলেন “ফকীর, আজিকার রাতটা ভালোয় ভালোয় কাটলে হয়।” ফকীর, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নরেশ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নরেশবাবু আবার বলিলেন, “আজিই সেইদিন।”

ফকীর ভয়ে ভয়ে বলিল “সেইদিন কি?” নরেশ বাবু বলিলেন “মহাষ্টমীর দিনে এবাড়ীর কর্তা, গিন্নি, ঢাকী, পুরোহিত প্রভৃতি সকলের এক সঙ্গে মৃত্যু হয়েছিল। সে কথা এ অঞ্চলে সকলেই জানে; সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।”

বৃদ্ধ ফকীরের ভীতি উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতেছিল। সে কাতর স্বরে বলিল “দারোগা বাবু, এ সকল কথা রাখে নাই বা বললেন, কা’ল শুন্ব দিনের বেলায়।” নরেশ বাবু, বিস্ময়ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন “সূর্য, আজ বাঁচলে ত তোমার কাছে কা’ল গল্প বলব।

আজ যে মহাষ্টমী। মনে রেখো রাত বারোটা।”

গল্প শুনিবার সাহস না থাকিলেও ফকীরের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—“রাত্রি ১২ টার সময় কি হয়েছিল বাবু?”

নরেশ বাবু আরও গম্ভীরভাবে বলিলেন, “তবে শোন ফকীর। যখন সন্ধ্যা পূজার পরে বলির বাস্তবোজ্জ্বল ইঠলে, তখন সকলে দেখলে যে পাঠার পরিবর্তে বাড়ীর কর্তারই পুন্ড্রের কাটা শরীরটা পড়ে আছে। দেখে কর্তা ও গিন্নি মুচ্ছা গেলেন। বাস্তবোজ্জ্বল শেষে সকলে দেখিল যে কর্তা থেকে ভূতা পর্যন্ত সকলেরই মৃত দেহগুলি মাটিতে লুটাইতেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে কারো মাথা পাওয়া গেলনা।”

ফকীর শুককণ্ঠে বলিল, “এতগুলি মাথা গেল কোথায়?” নরেশবাবু বলিলেন, “সেইতো ভয়ের কথা। মাথাগুলি সব নাকি ভূত হয়ে আছে।”

পরেশ বাবু, এই সময়ে হুকা রাখিয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন “মিথ্যাবাদী, মাথা না থাকলে লোক গুলিকে চেনা গেল কি করে?”

নরেশ বাবু হটিবার পাত্র নহেন। হাদিয়া বলিলেন “এতকাল ওকালতী করেও এ বুদ্ধি তোমার হলোনা?—কাপড় দেখে চেনা গিয়েছিল। পুরোহিত ভূতের নাকি পৈতে ও নামাবলী ছিল; পায়ের হাতীর দাঁতের খড়ম। ঢাকীর কাঁধে ঢাক ছিল; কর্তার গায়ে শিকের চাদর; গিন্নির বেনারসী শাড়ী; আর ঢাকরের—”

বাধা দিয়া নরেশ বাবু বলিলেন “থাম, থাকলে, ফকীর চাঁদকে হত্যা না করে তুমি ছাড়বেনা দেখছি। ঐ দেখ, উহার নাতীশাস উপস্থিত।”

প্রকৃতই ফকীরের অবস্থা তখন শোচনীয়। সে স্থির দৃষ্টিতে দক্ষিণ দিকে চাহিয়াছিল; তাহার সর্বশরীর বেতস পঞ্জের ছায় কল্পিত হইতেছিল।

পরেণ বাবু ও নরেশ বাবু অনেক জিজ্ঞাসা বাদ করিয়াও কোনও উত্তর পাইলেন না। তখন যেদিকে ফকীর চাহিয়াছিল তাঁহাও সেই দিকে চাহিলেন; তখন তাঁহাদের দৃষ্টিও দক্ষিণে নিবন্ধ হইল এবং তাঁহারাও কাঁপিতে কাঁপিতে ছইজনে ছইজনকে জড়াইয়া ধরিলেন। কাহারও মুখে বাকা সরিল না।

\* \* \*

ফকীর চাঁদের দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সভয়ে দেখিলেন—গৌরবর্ণ, গলায় রক্তাক্ষমালা ও যজ্ঞোপবীত, গায়ে নামাবলী এক ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি কোথাকুবি হাতে লইয়া তাঁদের পানে জলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহার সর্বশরীর রুধিরান্বিত। পরেশ বাবু কিছুকাল পরে সভয়ে বলিলেন, “নরেশ, এই কি তোমার গল্পের পুরোহিত?” নরেশ বাবুও কিছু না ভাবিয়া চিস্তিয়া পূর্বের ছায় বলিবার ভঙ্গীতেই বলিলেন, “হাঁ ইনিই সেই পুরোহিত বটে।” বলিয়াই তিনি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। কেননা, এ ব্যক্তিকে তিনি ইতিপূর্বে কখনও দেখেন নাই।

পুরোহিত, অগ্রসর হইয়া গভীর স্বরে কহিলেন “হাঁ, আমিই সেই পুরোহিত, যার কথা নরেশ বাবু বলছিলেন।”

নরেশ বাবু একটু সাহস পাইয়া বলিলেন, “আজ্ঞে, আমি একটা ভূতের গল্প অনেক দিন আগে শুনে ছিলাম। তার সঙ্গে কতকগুলি আজও বি কল্পনা যোগ করে ফকীর চাঁদকে ভয় দেখাবার জন্যে এই গল্প রচনা করেছিলাম। এ বাড়ীতে কোনো ঘটনা ঘটেছে কি না তাহা আমি জান্তেম না। কি করে আমার মিথ্যা কথা সত্যে পরিণত হলো, তা বুঝতে পারছি না।”

পুরোহিত তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, “মূর্খ!

বলে কিনা—‘মথো কথা’,—গালগল্প।’ এর এক বর্ণও মিথ্যা নয়; সব জলন্ত সত্য।”

নরেশ বাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, “যে কথা আমার অজ্ঞাত, তা আমার মুখ দিয়ে বেরুলো কি করে?”

পুরোহিত বলিলেন, “আমিই তোমাকে দিয়ে বলিয়েছি এ সব। সে আজ ৪০ বছরের কথা। এই বাড়ীর বর্তমান কর্তার পিতামহ কোনও মহাপাতকের কার্য্য করায় মহাষ্টমী নিশায় জীপুত্র সহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন আমিও সেই সঙ্গে মরে প্রেতঘোনী প্রাপ্ত হয়েছি। কিন্তু তুমি ৪০ বৎসর পরে কেন এতদূর অলীক গল্প বলতে চেষ্টা করে আমাকে পুরাণো কথা মনে করিয়ে দিলে? তুমি কি জাননা, মানুষের কাণের ছায় চিন্তাও কখনো বিফল হয় না? তোমার চিন্তা দ্বারা সৃষ্ট ছায়ামূর্ত্তি আমাকে আকর্ষণ করে এখানে এনেছে, চল্লিশ বছর আগেকার দৃষ্ট অভিনীত করিতে। মনে থাকে যেন—রাত্রি ১২টা।” এই বলিয়া পুরোহিতের প্রেতমূর্ত্তি হাওয়ার মিলিয়ে গেল।

পরেণ বাবু ও নরেশ বাবুর মুখ কাগজের ছায় সাদা হইয়া গেল। ফকীরের অন্তর্জালীর সময় সমাগত বুঝিতে পারিয়া তাহাকে আলো লইয়া গ্রামের এক কুবকের বাড়ীতে রাখিয়া আসা হইল।

\* \* \*

সে রাত্রিতে গ্রামের কয়েকজন সাহসী লোক পরেশ বাবু ও নরেশ বাবুর সঙ্গে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। কোতূহলপ্রযুক্তই হোক বা ভয়ভাৱা রক্ষার জন্তই হোক বর্তমান কর্তাও তাঁহাদের সঙ্গেই রহিলেন।

রাত্রি যখন ১০টা বাজিল, তখন অনেকে মধুহৃদন নাম জপ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ১১টা বাজিয়া গেল। ঘর এমন নিস্তব্ধ যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শোনা যায়, কাহারও মুখে একটাও কথা নাই। এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় চং চং করিয়া ১২টা বাজিবার আওয়াজ হইল। সঙ্গে সঙ্গে কি এক ইচ্ছার প্রেরণায় সকলেই বাইরে বাইতে যেন বাধ্য হইল।

তাহারা বাহিরে যাইয়া দেখিল, দুর্গামণ্ডপ আলোকিত। যদিও বহুদিন যাবৎ এবাড়ীতে পূজা হয় না, তবু বজ্রালঙ্কারভূষিতা দুর্গাপ্রতিমা ও পূজার আয়োজন দৃষ্ট হইল। মহাধুমধামে সন্ধিপূজা হইতেছে ও ঘোর রবে পূজার বাজ্য বাজিতেছে। পুরোহিত মনোচ্চারণ পূর্বক পূজা করিতেছে। কেবল বাড়ীর কর্তাটী উপস্থিত নাই। বলির সময় অতিবাহিত হইয়া যায় দেখিয়া সকলে কর্তার খোঁজ করিতে লাগিল। গ্রামস্থ লোকজনের সঙ্গে পরেশ বাবু, নরেশ বাবু ও বাড়ীর বর্তমান কর্তা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। কি এক অতিমামুষী শক্তিতে শক্তিমান হইয়া সকলেই দেখিতে পাইল, একটা রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে তদানীন্তন কর্তা (বর্তমান কর্তার পিতামহ) একজন বিধবা স্ত্রীলোকের দুইখানি হাত ধরিয়া রাখিয়াছেন। রুদ্ধ থাকা সত্বেও ভিতরের দৃশ্য তাহারা যেন কাচের অপার পার্শ্বস্থ দৃশ্যের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাইল। বিধবা, বারম্বার কাতর কণ্ঠে বলিতেছে, “ওগো, আমার ইজ্জত মেরোনা; আমি তোমার কছা, তুমি আমার পিতা। আমি আর কখনও এ বাড়ীতে পূজো দেখতে আসব না। আমার ছেড়ে দাও, তোমার ছটা পায়ে পড়ি।” কর্তা, এ কাকুতি মিনতিতে কর্ণপাতও করিলেন না। তাঁহার লালসাদীপ্ত নয়ন হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতে ছিল। তিনি একটা উন্নত পশুর ন্যায় সেই স্ত্রীলোকটীকে ঘরের কোণের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। তখনও “আমার ইজ্জত মেরোনা, আমার ইজ্জত মেরোনা, আমি তোমার কছা” এই ধ্বনি বাহির হইতে শ্রুত হইতেছিল।

কিছুকাল পরে কর্তা বাহিরে আসিলেন। উৎপীড়িতা বিধবাও আলুথালু বেশে তাঁহার পশ্চাতেই

গৃহ হইতে বাহির হইল। সেখানে একখানা বটিকা পড়িয়াছিল। উন্মাদিনী নারী, সেই দা লইয়া তাহার নিজের কণ্ঠচ্ছেদন করিল।

কর্তা, বাহির হইয়াই মণ্ডপে গেলেন। অমনি বলি হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, ছাগের পরিবর্তে কর্তার পুত্রের মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। কর্তা ও গিন্নি-মুচ্ছিত হইয়া সেইখানেই পড়িয়া রহিলেন। পুরোহিত, পাঠা উৎসর্গ করিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; কর্তা, গিন্নির সহিত তাঁহারও মৃতদেহ মাটিতে লুটাইতে লাগিল। যাহারা—পূজা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া ছুটিয়া পলাইল। বাড়ীর কর্তা নতমস্তকে অন্ধরে চলিয়া গেলেন। দীপ নিবিয়া গেল। সকল দৃশ্যই নিমেষ মধ্যে অন্তহৃত হইল।

পরেশ বাবু, নরেশ বাবুকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “এই জন্তই আমি পুলিশের সঙ্গে পছন্দ করি না। বরঞ্চ দুই দিন বাঘের সঙ্গে এক গছবরে নিশা বাপন করিব, তবু পুলিশের সঙ্গে আর এক মিনিটও থাকা হবেনা।”

পরেশ বাবু, তখনই সেই গৃহ ত্যাগ করিলেন। নরেশ বাবুও অগত্যা এই ভীষণ বাড়ী ত্যাগ করিলেন।

শুনা যায়, নরেশ বাবু সেই বৎসরই পুলিশের চাকুরীতে ইন্তফা দিয়া প্রয়াগে মাথা মুড়াইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। পরেশ বাবু এখনও কলিকাতাতেই স্থলের মাষ্টারী করিতেছেন—আইন পুস্তকগুলি গঙ্গার ফেলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হতভাগ্য ফকীর টাঁদের আর কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

## আমি কুলটা

( গল্প নহে )

পণ্ডিত—শ্রীমাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিজ্ঞানভূষণ এম, আর, এ, এস্।

কুলটার কি চূর্ণা তাহা আমার চরিত্র চিত্রেই বিলক্ষণ জানা বাইবে। আমি পিতামাতার একমাত্র কন্যা, তাহারা আমাকে বড় ভালবাসিতেন। এই ভালবাসাই আমার সৰ্ব্বনাশের কারণ হইল। পিতা ভালবাসিয়া আমাকে একটা সুপাত্রে ছয় বৎসর বয়সে বিবাহ দিলেন। সমবয়স্কদের সহিত খেলার ঘরে “বউ বউ” খেলিতাম। বউ সাজিয়া কৃত্রিম উপায়ে অনন্যজ্ঞান রাখিয়া নিমজ্জিতদের পাতে ভাত দিতাম, পাড়া পড়সীদের সঙ্গে পুতুল লইয়া ছেলে মেয়ে বিবাহ দিতাম, আরো কত কিছু। আমার পুতুল খেলার সময়ই সত্যিকারের বউ সাজিলাম। আমি ইহাকে একটা খেলার জিনিষই করিয়া লইলাম; যিনি আমার বর তিনিও আমাকে ভালবাসিতেন, চুমু খাইতেন। তিনি কলিকাতা পড়েন কাজেই তার সঙ্গে বড় দেখা শুনা হইত না, তিনি চলিয়া গেলে আমি যেন একটা বড় অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলাম। স্বপুত্র, খাণ্ডুী তারা সবাই আমাকে ভালবাসিতেন—আমাকে কোলে করিয়া বেড়াইতেন। আমি নাকি বড় সুন্দরী তাই তারা আমাকে বেশী করিয়া আদর করিতেন।

একদিন বাড়ীতে কান্নাকাটি, আমি নাকি বিধবা হইয়াছি, আমার বর কলিকাতায় মেসে ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সকলেই কাঁদে, আমার কান্না না আসিলেও কাঁদি। সকলে কহিল, আমি বিধবা হইয়াছি। জোর করিয়া তারা আমার গায়ের গহনা খুলিল আমি তখন খুবই কাঁদিলাম। আমি গহনা খুলিতে দিবনা, একথা কে শুনে? পাড়া প্রতিবাসীরা হুলা করিয়া আমার গায়ের গহনা খুলিয়া লইল। পরণের সাড়ি ছাড়াইয়া থান কাপড় পরাইল। শীতের রাজ্জে ঘাটে গিয়া স্নান করাইয়া আনিল।

আমি দেখিলাম বিধবা হওয়াতে আমার গায়ের কোন অঙ্গ খসিয়া পড়ে নাই। আমি বিধবা হইয়াছি, আর ত কেহ বিধবা হয় নাই, বাবা, মা, দাদা তারা কেহই বিধবা হয় নাই। আমি বিধবা হওয়ার তারা কেন কাঁদে। আমি ব্রাহ্মণ কন্যা স্নাতরাং একাদশ দিনে স্বামীর নামে কি এক কার্য করিয়া শুদ্ধ হইলাম।

তার পরই আমার ভাঙ্গা কপাল আরো ভাঙিল। স্বপুত্র, খাণ্ডুী যারা আমাকে এত আদর যত্ন করিতেন তারা আমার উপর বিরূপ হইলেন। আমার বয়স তখন সাত বৎসর, কিইবা বুঝি। আমি অলক্ষণে মেয়ে বলিয়া তারা আমাকে পিড়ালয় পাঠাইয়া দিলেন। বাবা, মা আমাকে দেখিয়া খুব করিয়া কাঁদিলেন, আমাকে কোলে করিয়া লইয়া অশ্রুর বজা ছুটাইলেন। আমার মাছ খাওয়া বন্ধ হইয়াছে। আমি আসিবার পর হইতে বাবা, মা তারাও মৎস্তাহার আমার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি একাদশী করি, তারাও তাই করেন। উঃ, একাদশীর দিনে কি কষ্ট, গরমের দিনে নির্জলা একাদশী, আমি একেবারে মুছাঁয় চলিয়া পড়ি। “জল জল” করিয়া কাঁদিলেও বাবা, মা আমাকে বুঝান, “একাদশী দিন জল খাইতে নাই, অমঙ্গল হবে।” আমি কিন্তু বুঝিলামনা কেন বা একাদশী, কেনইবা জল খাইতে নাই একাদশী দিন ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হইলে স্নান করাইয়া আনিতেন, আর মাঝে মাঝে মাথা ধুইয়া, গা মুছাইয়া দিতেন।

এইরূপ মর্শ্ব বাতনার ভিতর দিয়া আমি বাড়িয়া উঠিলাম। আমার দুঃখে বাবা আর বেশী দিন বাঁচিলেন না, তিনি চলিয়া গেলে মায়ের একাদশীও আমার সঙ্গে আসিয়া যোগ দিল। মায়েরও বেশী দিন আর



একাদশী করিতে হইল না। আমি ভাবিয়াছিলাম মায়ের কোলে থাকিয়াই বাড়িয়া উঠিব, কিন্তু সে ভাগ্যেও আমি বঞ্চিত হইলাম। তাঁরা চলিয়া গেলে আমার জেঠাইমা ও জেঠাতাতু ভ্রাতাদের অধীনে গেলাম। আমার দাদা স্কুলে পড়িত, তাহার পড়া বন্ধ হইল, সে গিয়া এক ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার হইল। আমার বলিতে আমিই একটা বাড়ীতে রহিলাম।

আমি বাড়িয়া উঠিলাম, আমার সৌন্দর্য্য উৎলাইয়া উঠিল। জেঠাতাতু ভ্রাতা আমাকে খুব আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে খুব ভালবাসিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে কাপড়টা, আয়না, চিকণীটা কিনিয়া আনিয়া দিয়া ভালবাসার নমুনা দেখাইতেন। তিনি আমার ক্রপের লালসায় মজিয়া গেলেন, আমিও আর পারিলাম না। তাহাকেই সময়ের সাথী বলিয়া আমার রূপ, যৌবন তাহার পায় ঢালিয়া দিলাম। গ্রামে আমাদের কথা লইয়া কাণা ঘুসা হইতে লাগিল। গ্রামের যুবকেরা আসিয়া আমাকে পুনরায় বিবাহ দিতে চাহিল, কিন্তু আমার জেঠা মহাশয় একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাহার প্রতিবন্ধকতায় যুবকেরা সরিয়া পড়িল। আমার ভাঙ্গা কপাল আরো ভাঙ্গিতে লাগিল। আমি যে বিধবা তা বুঝিলাম, বিধবার যে কি কষ্ট তাও বুঝিতে বাকী রহিল না। পাড়ার ডেকরা ছোড়ারা আমায় দেখিয়া ইসারা করে, প্রেমের গান করে, ঘাটে গেলে তারা গিয়া আমার কাছে নানা কথা বলে। আমি তাদের কারো কারো সঙ্গে মজিয়া পড়িলাম। বিশেষতঃ গ্রামে দেখিতাম একরূপ পল্লীবেষ্টিত অভাব নাই।

দেখিতে দেখিতে আমার গর্ভ হইল। এ গর্ভের নেতা আমার জেঠাতাতু ভাই। আমার গর্ভের যখন পাঁচ মাস তখন বাড়ী শুষ্ক লোক ভীত হইলেন। কি উপায়ে গর্ভ নষ্ট করা যায় তাহার অদম্য চেষ্টা চলিল। ঔষধ খাওয়াইয়া গর্ভ নষ্ট করিতে চাহিল, আমি তাহাতে রাজী হইলাম না। ও পাড়ার বিন্দু পিপি

নাকি এইরূপে গর্ভ নষ্ট করিতে গিয়া তিনি শুদ্ধ মারা গিয়াছিলেন। আমি গর্ভ নষ্ট করিতে না চাহিলে আমার উপর শারীরিক অত্যাচার আরম্ভ হইল। একদিন আমার জেঠাতাতু ভ্রাতা আমাকে বরের দ্বার বন্ধ করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া আমার উপর অত্যাচার শুরু করিলেন। সে কি ভীষণ অত্যাচার, আমাকে চীৎ করিয়া ফেলিয়া আমার পেটের উপর দাঁড়াইয়া অসহ যন্ত্রণা দিতে লাগিল, তারপর চড়, কিল, লাথি কোনটারই অভাব ছিল না। আমি অসহ যন্ত্রণায় চীৎকার করিলে বাড়ীর লোকে কহিত, “একটু সহ করিয়া থাক, পেটটা ঝালাস হইয়া যাউক।” আমি ভাবিতাম আমার মরণ হইলে বুঝিবা ভাল হইত। এই সকল চেষ্টা করিয়াও আমার গর্ভ নষ্ট হইল না। আমি উঠিতে অশক্তি হইলেও কোন প্রকারে গিয়া এক প্রতিবাসীর বাড়ী উঠিলাম, তিনি বাবার বন্ধু ছিলেন। তিনি আমাকে সাদরে তাহার বাড়ীতে স্থান দিলেন। এখানেও নিরাপদ হইল না, আমার জেঠাতাতু ভাই ও তাহার লোকেরা আমাকে লইয়া যাইবার জন্য উপদ্রব করিত, কিন্তু গৃহস্থানী জানিতেন, গর্ভ নষ্ট করার জন্য আমার উপর নূতন অত্যাচার আরম্ভ হইবে, তাই তিনি আর তাহাদের আশ্রয়ে আমাকে থাকিতে দিতেন না। আমি এ বাড়ী সে বাড়ী যাইয়াও দিন কাটাইয়াছি।

একদিন গর্ভ বেদনা উপস্থিত হইলে একটা সাধারণ কুঁড়ে ঘরে অল্পে আমার এক কস্তারত্ন এসব হইল। আমি গর্ভ নষ্ট করিতে দিই নাই সেই অপরাধে আমি জাতিচ্যুত হইলাম। পাড়ার সকলে আসিয়া কহিতেন, “আগেই বলিয়াছিলাম অমুখ খাইয়া গর্ভ নষ্ট করিয়া দাও, এখনো বল মেয়েটাকে মারিয়া ফেল, তোমাকে জাতিতে তুলিয়া রাখিব।” সে কি পারা যায়, কেমন করিয়া পেটের ছেলেকে মারা যায়, এমন পিশাচ কি মানুষ হইতে পারে? আমি জাতিচ্যুত হইতে রাজী হইলাম, তথাপি নিরপরাধী মেয়েটাকে মারিতে দিলাম না। একদিন জেঠাতাতু

ভাইকে কহিলাম, “দাদা, এ মেয়ে যে তোমারই, তোমার কি ইহার উপর একটা মমতা আসে না?” তুমি ইহার একটা উপায় করিতে পার না কি? তিনি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন, তাহা কে আর কিছু কহিলাম না।

ইহার পর আমার উপর গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্ত সকলের আদেশ হইল। কোথায় যাইব এমন স্থান ত খুঁজিয়া পাইলাম না। ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার আমার ভ্রাতা আসিয়া আমাকে সহরের এক আশ্রয়ের গৃহে রাখিয়া গেল। তিন মাস স্থান দিয়া তিনি আর আমাকে তাহার গৃহে রাখিলেন না – সেই নাকি তার জাতি যায়। আমি পথে উঠিলাম, আমি এক গৃহে পাচিকা বৃত্তি অবলম্বন করিলাম। ইহাতে আশ্রয়েরা আসিয়া আমাকে ছাড়াইয়া লইলেন, আমি পাচিকা বৃত্তির কাজ করিলে তাহাদের মান হানি হয় কিন্তু কেহই আমার ভরণ পোষণের ভার নিতে রাজী হইলেন না। হায় রে সমাজ, আমি পাচিকা হইলে তাহাদের মান নাশ হয় না কিন্তু আমি বেশ্রা হইলে বুঝিবা তাহাদের মানের পশার বাড়িয়া উঠে। আমি যে গৃহে পাচিকা ছিলাম, সে গৃহে একটা জীলোক বস্ত্র বিক্রীর ব্যবসায়ে যাতায়াত

করিত, তাহার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, তাহার গৃহে একদিন দেখিয়া আসিয়াছিলাম। একদিন আমি আশ্রয়দের তাড়নায় পাচিকা বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সেই বস্ত্র ব্যবসায়িনীর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম, সে আমাকে সাদরে স্থান দিল। মাসিক ৭১ তাড়ায় একখানা ঘর দিল, সঙ্গে একখানা ক্ষুদ্র পাকের ঘরও ছিল। এখানে আসিয়া দেখি এটা একটা বেস্তালয়। অনেকগুলি ঘরে তাহারা যে যার মত বাস করে ও স্থণিত ব্যবসা চালায়। আগে আমি ইহাকে স্থণিত স্থান বলিয়া জানিতে পারি নাই। সন্ধ্যার পর হইতে পুরুষ মাল্লুষের আনাগোণায় ইহা বৃত্তিতে পারিলাম। আমার আশ্রয়গণকে তত্ত্ব দিলাম, তাহারা আসিলেন না। পাচিকা বৃত্তিতে তাহাদের মান যায় কিন্তু বেস্তাবৃত্তিতে তাহাদের মান বাইবে না।

স্বদেশী যুবকেরা আমাকে এই স্থান হইতে মুক্ত করিয়া নিল, তাহারা নারীরক্ষা সমিতিতে আমাকে নিয়া রাখিল। তাহারা বলিল, তাহারা আমাকে শিক্ষিত করিবে ও বিবাহ দিয়া দিবে। কিন্তু নানা ভাব ধরিতে আমার আবার কপাল পুড়িল, সেই বস্ত্র ব্যবসায়িনী পতিতা নারী আমাকে কোশলে বাক্যমুগ্ধ করিয়া পুনরায় তাহার গৃহে লইয়া আসিল।



## “মিটেনি যদিও ক্ষুধা তবু তৃপ্ত আজি—”

শ্রীপীচুগোপাল মিত্র

‘Tis better to have loved and lost  
Than never to have loved at all.”

—Tennyson.

— এক—

রাত প্রায় বারোটটা।... আকাশে ছাদশীর চাঁদ...।  
পৃথিবীর গায়ে জ্যোৎস্নাধারা ঝরে পড়ছে... বেশ  
মিঠে হাওয়া বইচে।... ঘরটার ভেতর শুধু শতদল  
আর অশোকা। শতদল কবিতা লিখে, অশোকা  
নত নেত্রে চেয়ে নেত্রে... আর কেউ নেই, শব্দটা  
পর্যন্ত নেই...। নিরুপ, নিশ্চিন্ত নিশি....।

... ..

কবিতা লেখা হ’য়ে গেল, শতদল বাড় তুলল।  
কপালের ওপর থেকে এলোমেলো চুলগুলো সরিয়ে  
দিলে।... অশোকের পানে চাইলে।... অশোকা মুগ্ধ  
নয়নে চেয়ে আছে। চারটে চোখ এক হ’তেই  
অশোকের রাঙা অধরে একটু হাসি ছোঁয়া দিল, ..  
মুখখানি ও বেশ টকটকিয়ে উঠল...।

অশোকা।

হ’ল ?...

শতদল

হ্যা, হ’য়েচে ..... শোন ! ...

শতদল পড়তে লাগল, কখনো ধীরে ... কখনো  
গভীরে ... কখনো অতি মৃদু স্বরে ...। প্রতি অঙ্গ  
তার নাচতে লাগল, ... চরণ তার সমতালে মাটির  
চুমু নিতে লাগল। .. পর্দা হ’তে পর্দায় ওঠা নামা  
ক’রে তারপর ধেমেলি গেল তার স্বর।...

অশোকা—

বেশ—সুন্দর...।

তরুণ কবির সকল প্রেমের সার্থক হ’ল।  
সাক্ষ্যের আনন্দে চোখ জোড়া গরবের দীপ্তিতে ভরে  
উঠল।... তার সাধনার সিদ্ধিতে এই খানেই...।

অশোকা—

ওটা কালকেই “মাধবিকা”র পাঠিয়ে দাও।  
আসচে হুগার ঠিক বেরিয়ে যাবে।...

শতদল

(চালাকীর ভাবে)

হ্যা, এ আবার বেকবে—

অশোকা—

বেকবে গো বেকবে। আমি বলছি—, তুমি  
পাঠিয়েই দাওনা ছাই।...

কথার ধরণ দেখে শতদলের চোঁট খানা রাঙিয়ে  
উঠল।... কেমন একটা সব চে’ আপনকে আদরের  
ভাব তার প্রাণে জেগে উঠল।.. অশোকের দেহ-  
লতাটা বাহু-পাশে জড়িয়ে ধরে তার ডালিম ফোটা  
কপোল তলে মোহাগ, স্নেহ, ভালবাসা সব জানিয়ে  
দিল মধুর একটা প্রাণ ভরানো চুমু দিয়ে।... নিমেষের  
তরে শুধু...। বেতস বনে কাঁপন জাগার মত,  
কাঁপনে নাচিয়ে তুলল অশোকের সারা অঙ্গ খানি।...  
নিদ্রের নেশায় চোখ ছোটো জড়িয়ে আসার মত হ’ল।  
... কপোল তলে লালচে অভা ফুটে উঠল.., থাঁ থাঁ  
করা বুকে যেন কাঁদতে লাগল ভক্তি হবার  
জন্তে।... পাঁচ মিনিট! কেটে গেল অসাড়ে . চুপ  
ক’রেই...। অশোকা বাহু পাশ থেকে সরিয়ে নিলে  
নিজেকে...।

অশোকা

শত দা.....

কাল্লা এসে তার কথার বাধা দিয়ে দিল।

শতদল

অশো, মাগ কর আমার—

অশোকা—

এ কী ক’রলে শত দা।... ছাঃখিনী, আমার তুমি  
এ কী ক’রলে...।

শতদল—

পারিনি অশো...। খেমে থাকতে পারিনি।  
অস্তরের ভেতর কে যেন গেয়ে গেল,—ওরে এই তো  
তোর মানসী, শ্রেয়সী, এই তোর চির যুগের দয়িতা।  
... তাই অশো হারিয়ে ফেলেছিলুম নিজকে। ভুলে  
গেছিলুম কী ক’রচি? কিন্তু অশো নিতান্তই কি অন্ডার  
ক’রেচি আমি?

অশোকা—

অন্ডার.....! চুপ...চুপ...। খেমে যাও শতদা,  
তায় অন্ডারের সমস্তা এনে আমার প্রাণে চিন্তা তুলে  
দিও না।... পায়ে পড়ি তোমার.....

একটু চুপ, থাকার পর পানলের মত আপন  
খেয়ালে—

বেশ সুন্দর লাগছে আজ,—ঐ শাদ, স্থির, ধীর,  
নিশ্চিন্ত আকাশ, ঐ লাজ-হীন, অমলিন জ্যোৎস্না,  
এই নিঝুম নিরালার স’ব্ধে নেশা, এই নিথর নিশার  
আঁচল হাওয়া.....। মনের গোপন কাননে অশ্রুত—  
কলি ফুটে উঠেচে, প্রাণের পেয়ালার রসের স্রব  
উপচে উঠেছে...চুম্বর অরুণ পরশনে ঘুমের স্বপ্ন  
জেগে উঠেচে..... বাঃ .. বাঃ ...

হঠাৎ যেন হারিয়ে যাওয়া পথের রেখার আবার  
ফিরে এল।... চমকে উঠে—

শতদা, শতদা একী ক’রলে তুমি? এই বিপ্লব  
জাগিয়ে দিলে আমার প্রাণে?

শতদল—

অশো! বিপ্লব কেন যদি!... আমি তোমায়  
ভাল বাসি। পুরো পাঁচটা বছর ছুজনে এক সঙ্গে  
রয়েচি। কৈশোরের অ-বোঝা স্বপ্ন লোক থেকে  
ঘোবনের চাঁদিনী ভরা স্বপ্নপূরে এসে পৌঁছেচি,...  
কত নিরঞ্জন রাত্রি ঘুম-হারা নয়নে শুধু তোমার  
কথা ভেবেচি, ..কতদিন সঙ্গী-হারা পথে তোমায়

ভাবতে ভাবতে চ’লেচি...ভেবে ভেবে পাগল হবার  
মত হ’য়ে গেচি মাঝে মাঝে, আমার নিজের অজান্তে  
তোমায় আপন ক’রে এঁকে নিয়েচি বুকের ভেতর,  
তাই অশো আজ আর হৃদয়কে ধ’রে রাখতে পারিনি,  
মনকে চোখ রাঙিয়ে শাসন ক’রতে পারিনি,—  
স্রোতে ভাসা কুটোর মত, নেশার ভাসা মন আমার  
আদরে, সোহাগে বরণ ক’রেচে তোমা’রে..তাকে  
ফিরিয়ে দিও না প্রিয়তমে! ..

অশোকা।

সে কি শতদা। হৃৎখিনী আমি; অভাগিনী,  
নিরাশ্রয় আমি। এ কি প্রলোভন দেখালে প্রভু?  
এ কী হুরাশা জাগালে প্রিয়তম?

শতদল

প্রলোভন, হুরাশা কেন প্রিয়ে?...তুমি আমার  
দয়িতা, তুমি আমার চির জনমের ফিরে পাওয়া হৃদয়ের  
রাণী।...এস অশোকা, এস প্রিয়া মোর, এই ছন্দ  
ছাড়া, উচ্ছ্বল জীবন-যাত্রা ছেড়ে আমরা শুনিরে  
নিই আমাদের...জীবনটা আর কতদিন এলোমেলো  
ফেলে রাখবে প্রাণেশ্বরী?

অশোকা

পথের কাঁটা আমি যে নাথ।...জনম ভোর  
পথে পথেই বেড়িয়েচি। যার ছয়োরে গেছি  
তাড়িয়ে দিয়েচে, শশব্যস্তে স’রে দাঁড়িয়েচি। পাছে  
কাঁটা আমি...আমায় থেকে ব্যথা পায় তারা।...  
অনাদর, অবহেলা যখন নিয়ে চ’লছিল আমার মরণের  
তীরের পানে, তুমি তখন এসে আমায় ফিরিয়ে নিলে।  
...আশ্রয় দিলে, কাঁটাকে যতন ক’রে তুলে রাখলে!  
...কেন তুলে ছিলে সখা, কেন ভেবে দেখানি  
একটু? তা হ’লে তো কাঁটার বা আজ লাগতো  
না তোমায়!...

## শতদল

কমল তো কাঁটাতেই থাকে অশো। কমল তুলতে কার অসাধ বল?.....অতীতের কথা ভুলে যাও রাণী।.....সামনের পানে ফিরে চাও।... ..

অশোকা নীরব হ'য়ে কী ভাবছিল।.....অনেক-ক্ষণ কেটে গেল। আগ্রহ আকুল নয়নে শতদল তার পানে চেয়ে রইল .....। অশোকা অশ্রুঝরা মুখখানি তুলে তার প্রিয়তমের দিকে একবার চাইলে, .....অতৃপ্ত দৃষ্টি তার সজল হ'য়ে উঠল ক্রমেই.....। শতদল সামুনা নিয়ে এল, হু'হাতে তার মুখখানি তুলে ব'ল্ল—ছিঃ, কাঁদ কেন অশো? অশোকা নিরুত্তর হ'য়ে রইল। শুধু মাথাটা তার প্রিয়'র বৃকে "লুটিয়ে প'ড়ল।..... শতদল তার গলাটা জড়িয়ে ধ'রে কপোল তলে সোহাগ-লাগিমা ফুটিয়ে দিলে।... ..অঝোঝরা কান্না নিয়ে চুপ ক'রে ব'লে আছে শতদল। সে অশোকাকে পায় নি,.....পেতে পারে নি। সরকার গোমস্তা কি একটা খরচ দিয়ে আনিয়েচে তার মাকে,

বাবাকে।.....মা কেঁদেচেন অনেক ক'রে।.... নারীর কান্নায় নারীর হিয়া গ'লে গেছে। অশোকা সহিতে পারেনি নারীর ব্যথা। চ'লে গেছে সে।... .. কোথায়,.....কেউ জানেনা,.....কেউ পায়নি।... ভাবছিল, শতদল—এই অচেনা অজানা নারী আর পাঁচ পাঁচটা বছর তার সাথে ছিল, সুখ-দুঃখের অংশ ভাগিনী হ'য়েছিল। তার দুঃখের কথা শুনে ভারী ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছিল তার মন। তাই মেস্ ছেড়ে তাকে আলাদা বাড়ীতে এনে স্থান দিয়েছিল। তার কত অভিমান, অগ্নায় সহ ক'রেছে সে। এই কবিতা লেখা .....এর জন্তে কত উৎসাহ দিয়েছে সে।.. কোথায় গেল চ'লে আজ।... ..অশোকা,..... অশো আমার! কোথা তুই আজ প্রিয়তমে? শুম্রিয়ে কেঁদে উঠল শতদলের ব্যথিত চিত্ত। অশ্রু সিক্ত স্বরে ব'ল্ল কবি,—

অশো, রাণী আমার! যেথা-ই যা' তুই, তোকে আমি ভুলবোনা। ভালবেসে তোকে পাইনি আমি, কিন্তু ভালবেসেটি তোকে... ..তাতেই আমার সকল দুঃখ যুচে যাচ্ছে।.....

## মিলন শঙ্খ

## শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়।

শিরোমণি ঠাকুর জোর গলায় বলেন...অমন করে সমাজের হয়ে দম্ব দেখারে শেষে কি সনাতন আৰ্য্য ধর্মের মধ্যে একটা অনাচার ঘটিয়ে তুলবেন। এখনও যদি কেউ গদাই এর হয়ে ৮ শীতলা তলায় পূজা দিবার জন্ত একটা পাঁঠার দাম ইত্যাদি করে মাত্র দশ টাকা ধার না দেয় তাহা হ'লে মড়া সেখানে পচুক ... তাঁর কোনও আপত্তি নেই। শিরোমণি ঠাকুর এতে বলেন প্রায়শ্চিত্তের পূর্বে মড়া যদি কেউ হোঁয় ত তাকে গ্রাম ছাড়া করবেন।

সামনেই পরীক্ষা...Test ইহা গিয়াছে...আজ তারই fee জমা দিবার জন্ত রবিদা' স্কুল যাইবার পথে সংবাদ শুনেই গদাই এর বাড়ী গিয়ে হাজির। ছেঁড়া কাঁথার জন্ত কেহই অর্থ দিতে রাজি হ'ল না; শেষে রবিদা' তাঁর ছেলেপড়ান পরিশ্রমের পরমা স্কুলে জমা দিবার জন্ত নিয়ে যাচ্ছিলেন তাই খরচ করে ফেলেন; এ দিকে কালকের মধ্যে টাকা জমা না দিলে উপায় নেই, অতোগুলো টাকাও কালকের মধ্যে সংগ্রহ করা অসম্ভব—কাজেই বোধ হয় এবছর আর পরীক্ষা

দেওরা হ'লোনা তবু রবিদা'র হৃৎ নেই, সাক্ষ্যের আনন্দে তার বুক ভরে উঠেছে...

তাই বসে বসে ভাবছিলুম...হিন্দুদের সমাজের বাইরে এসে পড়েছি সত্য, কিন্তু এ সময়ে অনেক রকম ভালোমন্দ নির্ধারণ নিতাই দেখি; তাই এদের জটিল অর্থটা বুঝবার জন্য অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছি কিন্তু অল্প বুদ্ধিতে তা নির্ণয় করে উঠতে পারিনি। তবু কোন দিন এদের উপর আমার রাগ বা রাগ হয়নি— আজ আর নিজেদের সংঘত রাগে পাবলুম না। বড় ভীত বিতৃষ্ণার ভাব মনে জাগল। আবার নিজের অলক্ষ্যেই আমার বৃকের সশ্রদ্ধ অর্ঘ্যডালি রবিদা'র শাস্ত নোয়া হৃদয়ের সামনে উৎসর্গীকৃত হোলো। রবিদার কথা শেষ হ'য়ে গেলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি চুপ করেছিলুম—কথা কইতে পারিনি নীরবে শুধু কেঁদেছি...

রাজের শেষ ক' ঘটনা রবিদা'র বাড়ীতেই কাটিয়ে দিলাম।

দাদার কাছে রাজের অভিযানের কথা বলতে বলতে চোখের পাতা ভিজে গিচ্ছিল। দুকোঁটা জল মুছিয়ে দিয়ে তিনি বলেন..কাল থেকে কিছু খান্নি বৃষ্টি। আমারও আজ সকাল সকাল বেরুতে হবে। একটু তাড়াতাড়ি করে সেয়ে নিয়ে আমি কাকার হাতে টাকা দিয়েই আসছি এখন—।

এতদিন দেখে এসেছি রাগ হ'লে বৌ তা কথার ব্যবহারে প্রকাশ করত, আপন মনেই কত কি বকে যেত, মুখের সামনে উপস্থিত হ'লেই সাধ পুরুষের নাম নতুন ভাবে নতুন ধাঁজে বিনিয়ে বিনিয়ে শুনিতে দিত। সমস্ত দিন ভাত বাড়ি পড়ে থাকত ছুঁতোওনা আর রাত হ'লে সেজদার সামনে আমার নাম করে কত রকম যে অভিযোগ করত তা কি বলব। প্রথম প্রথম আমিও তাকে হুকথা শুনিতে দিয়েছি কিন্তু বধন বুঝলুম এরূপ করার লাভ ত নেই, বরং গালমশেলের ছড়া শুলো অধিকতর তাড়াতাড়িই উজারিত হ'তো তখন থেকেই আমি এ সব ব্যাপারে

সম্পূর্ণ মৌনভাবে অবলম্বন করেছি। অবশ্য কাজে দেখাতে ছাড়তুম না যে আমাকে শুধরাবার চলে যে সব উপদেশের নামে গালিগালাজ দিত আমি তা গ্রাহ্য করতুম না।

তার স্বভাবের এই রকম ভাবটার সহিত আগেই পরিচিত ছিলাম বরাবর, তাই আজ তার ব্যবহারে কোনও রাগের লক্ষণ না দেখে আশ্চর্য্য হ'য়েছিলুম। পরেই আমার কাছে এসে রক্তন সংক্রান্ত কাজের অংশ গ্রহণ করলে, কথাবার্তার আজিও কিছু উগ্রভাব প্রকাশ করলেনা...আর ভাত খাবার সময় ক্ষুধা পূর্ণ হ'বার পূর্বে উঠে যায় না, তাই মনে ভাবলুম আজ হয়ত সত্যি ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

### —'চান্ন'—

এই ছোটো মাসের ভিতর বোধ হয় সারা জগতটাই নতুন হ'য়ে গেছে। এতদিনকার অভিজ্ঞতা...এতদিনকার ধারণা...নতুন একটা আলোর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। গত জীবনের ষোলটা বছরের সীমান্তেই আজ বুঝলুম লক্ষ্যহীন যাত্রাপথে কাটিয়ে এসেছি। ছোটো মাস আমার সেই ব্যর্থ জীবনের ধারার মধ্যে নতুন করে স্রোত খেলিয়ে দিলে, সব বাধা বিঘ্ন ভাসিয়ে দিলে... কিন্তু কেমন করে যে এতটা পরিবর্তন ঘটল তা আমিই বুঝে উঠতে পারিনি।

রবিদা'কে আজ নতুন করে চিনলুম। পাড়াগাঁর স্কুলটার প্রতি পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করেছেন এ খবরটা সকলেই জানত। কিন্তু ইহার মধ্যেই বাহিরে যে তাঁর একটা বৃহৎ কর্মক্ষেত্র আছে সেটা বিশেষ জানা ছিলনা। বায়নের হোক বা অন্য যে কোন জাতের হোক মড়া তিনি কয়েক বার সংস্কার করেছেন এটা শুধু লোকমুখে শুনেছিলাম মাত্র। গদাইএর মৃত্যুর দিন...দীঘির ধারে খোলা মাঠে সেই প্রথম প্রত্যক্ষ করি। আর এই দিনটার পর থেকেই আমার পুনর্জন্ম হয়েছে বলতে হ'বে। এই দিনটা থেকেই রবিদা'র অন্তর্নিহিত উজ্জল আলো দেখে ধস্ত হয়েছি, প্রত্যেক কাজের মাঝে তাঁর এমন

একটা প্রাণের পরিচয় পেয়েছি যা আকাশের মত উদার...প্রভাত অরুণের আলোর মত নির্মল। শিশুর মুখের চকল হাসি কান্নার মত স্বর্গীয়। এর আগে যে এটা বুঝিনি তার কারণ বোধ হয় আমি চোক থাকি সব্বদা অন্ধ ছিলাম।

দিনু মাইতীর সর্কাজে মায়ের অমুগ্ধ দেখা দিলে রবিদা' তার শুক্রমা করে রাত কাটালেন। দক্ষিণ পাড়ার গোবিন্দ হালদারের মেয়ের বিয়েতে তাঁকে বর যাত্রীদের তামাক সাজা থেকে মরণা ছেনে দেওয়া পর্যন্ত সব কাজেই ছুটাছুটি করতে দেখেছি। বহিষ্কৃত মিত্রের ছেলের অমুগ্ধ হ'তে রবিদা' সেই হুকুম দূর থেকে ডাকার ডেকে আনলেন। জানি এই বালিকার ক্ষুদ্র শক্তিতে তাঁর কায়ের অমুকরণ করা সম্ভবে না, তবু ক্ষুদ্র তৃণ হ'তেও ত' মানুষের উপকার হয়। আমি প্রকৃত্তেই তাঁর সাথে এপাড়া ওপাড়া ঘুরে বেড়িয়েছি; যেখানেই দুঃখ দৈন্তের কাতরতা প্রত্যক্ষ করেছি সারা চিত্ত দিয়ে তা মোচন করবার প্রয়াস পেয়েছি। লোকের কষ্টের কথা শুনে ছুটে গিয়েছি।

বৌরাণীকেও এতদিনে বুঝি...বুঝলুম এতদিন তার সন্ধর্কে কিছুই ধারণা করতে পারিনি—তার বাক্যবজ্রের মধ্যে লুকিয়ে ছিল হৃদয়ের স্নেহ গলান স্নানধর বরবার ধারা। সে আমাকে এতদিন যে বকে এসেছে...সে শুধু স্নেহের আতিশয্যে...আর আমি অমুগ্ধের মত মান করেছি।

তার এই কল্পন স্নিগ্ধ স্নেহধারা এতদিন কোন মেঘের অন্তরালে লুকিয়ে ছিল বুঝতে পারিনি...সে আমার কি ভেবেছে সেই জানে...এখন সে আমার প্রতি কাজে উৎসাহ দেয়—ভৎস'নার পরিবর্তে আজ ক'দিন ধরে' দেখছি তার মুখ যেন কি বলতে চায় বুক বাধা দেয়...কথা কহিতে কহিতে সে অন্তমনস্ক হ'য়ে পড়ে...প্রশ্ন করলে হেসে উড়িয়ে দেয়... সেদিন তাকে বল্লম...তুই কি বলতে চান বলে কেল আজ বলতেই হ'বে।

খানিক ইতস্ততঃ করে সে বলে উঠল, ছেলেবেলার কথা তোর মনে পড়ে ?

আমি হেসে বল্লম, আমি কি ছোট ছিলাম না কি... বাঃ রে—

সে বলে, না না বলনা—আমার একটা দরকার আছে তাই জানতে চাইছি—আচ্ছা সেই কোলকাতার থাকার কথা মনে প'ড়ে...

বল্লম...খুব...শুধু সে ক'দিনের কথা ভালো করেই মনে আছে...একদিন রবিদাকে এমন কামড়ে দিয়েছিলুম যে কঁদে ফেলে দিল...সেদিন বাবা আমার একটা চড় মেরে ছিলেন কি কারণ কে জানে ? আর একদিন হ'ল আমার বে—

বে ? বে হোল সেকি... ?...

বাঃ তা বুঝি জানিস না...দাদা বলেনি ?...তা দাদা ত' সেখানে তখন ছিলই না...ছিলেন শুধু মা কাকিমা বড়দা আর মেজদা—আর রবিদা...সন্ধ্যা হ'লে মা সাজগোজ করিয়ে বলে, বর আসছে বে করতে...ঐ খানে বোস...আমরা ততক্ষণ আর সব উত্তোষ করি...কাকীমা ছিলেন আমার কাছে...তারপর সিঁড়িতে জুতার শব্দের সাথে শাঁখ বেজে উঠল...কাকীমা বলেন ঐ বুঝি. পুরুত আসছে...আমি একহাত ঘোমটা বাড়িয়ে দিলুম...বর আর আসে না...মে'জদা বলে রবি'র বিয়ে..কনেও স্থির হ'য়ে গেছে...তারা সব চলল।

রবিদা'র বে'র পর ফিরে এলে আমার বে' হ'বে। আমি কি আর অতক্ষণ জেগে থাকতে পারি ? ঘুমিয়ে পড়লুম। সকালে শুনেলুম বে' হ'য়ে গেছে...কিন্তু বে'র পর যখন ঘুম ভাঙল না তখন বর রাগ করে চলে গেল..রবিদার নাকি সেই অবস্থা...বে' করতে কনের বাড়ীতে গেল আর এলনা...

বুঝেছি তোর মতন রবিদার কনে'ত পালিয়েছিল না...

কাকীমা বলেছিলেন . তোরা যদি সাত রাত্তির একসঙ্গে জেগে থাকতে পারিস...তবেই বর এসে দেখা দে'বে...

রবিদা'র ও বুঝি ঐ ব্যবস্থা, তাই বুঝি তোরা  
সাত রাত্তির জেগে কাটাবার জ্ঞান কার বসন্ত হ'য়েছে,  
কা'র কল্যাণ—এই করে বেড়াই—?

দূর তা বই কি? খুব তা জানিস্। না বলে  
পালিয়ে গেলুম কিন্তু এই কথা কটা বলবার জ্ঞান  
অত কুঠা হয়েছিল কেন? সেই কথাটাই মনের  
মাকে জেগে উঠছিল।

### পাঁচ

পাড়াগাঁর স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করে রবিদা'র পনের  
টাকা বৃত্তি পেল...গ্রামে হলুদ পড়ে গেল, প্রকাশ  
সভার তাকে মালা পরাবে বলে উত্তোষ আয়োজন  
আরম্ভ হলো।

আমার মনে তখন কি আনন্দের ঢেউ খেললে  
তা কি বলব? তার কাছে এত বৎসরের এত  
আয়োজন...তুচ্ছ নগণ্য। রবিদা'র আমাকে সে দিন  
চুপি চুপি বললে...তুই সেই সময়ে টাকা কয়টা দিয়ে  
দিলি বলেই আমার এই সাফল্য...এই সম্মান, এ  
আমার চিরকাল মনে থাকবে।

আমি হেসে উঠলুম...

সে বললে—আমি ঠাট্টা করছি না লীলা—চিরদিন  
তোরা স্নেহের ঋণ আমার মনে থাকবে—

উপমা দিয়ে মন ভুলিয়ে রাখতে চাও। আমি ত  
এর এক বিন্দুও,....

বেশ, কি করলে বিশ্বাস হ'বে—?

আমি তোমার কোন প্রতিজ্ঞার কথা বলিনি...  
যে আলোর সন্ধান তুমি দেখিয়েছ...তার তুলনার  
সবই তুচ্ছ। তোমার এই গৌরবে তোমার বত না  
আনন্দ হয়েছে আমার হয়েছে তার বেশী।

জানি লীলা—জানি তুই—

ধাক্কা এ সব কথার আলোচনা এখন...দেখ  
আমরা পতিত...আমরা মুসলমান কিন্তু হিন্দুর গৌরব  
হিন্দুর স্মৃতি ভুলিনি...আমি অনেক মন্ত্র মার কাছ  
থেকে শিখেছি...আমার শরীরের প্রতি রক্তকণা  
হিন্দুদের গরিমা মাধানো...আজ আমার কামনা  
জন্মের সেই চিরস্মরণ, চিরজাগ্রত চিরমহানকে  
পূজা করবো তুমি হ'বে তার পুরোহিত—বল আসবে  
গ্রামের কোলাহল যখন নীরবতাকে বরণ করবে...নীল  
আকাশের চাঁদ যখন হাসবে তুমি তখন...মন্ত্রের  
শুঁকরে জগৎ কাঁপিয়ে তুলবে...বল আসবে?

আসবে—লীলা কিন্তু—

কিছু আটকাবে না, এ পূজার মন্ত্রের আবশ্যক  
নেই, চাই শুধু প্রাণভরা ভক্তি।

আসবে, কিন্তু পুরোহিত দামিনার কথা মনে থাকে  
যেন। জানিস্ ত' বামুন বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই  
জান...বুঝি।

( আগামী বারে সমাপ্য )





## গজল

কাজি নজরুল ইসলাম ।

কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে আস্লে প্রাতে পুষ্প-চোর ।  
 ডাক্ছে পাখী, বৌগো জাগো আর যুমাননা রাত্রি ভোর ॥  
 ঘুঁই কুঁড়িরা চোখ মেলে চায়, চুম্ব কুড়ি দেয় মোমাছি ।  
 শাপলা বনে চাঁদ ডুবে যায় স্নান চোখ হায় চায় চকোর ॥  
 বোম্টা ঠেলি কয় চামেলি, গোল করোনা গুল-ডাকাত ।  
 ঢুলছে নয়ন ঢুলছে গলায় বেলু টগরের ছিন্ন ডোর ॥  
 গুন গুনিয়ে মোর আঁড়িনায় কোন্ সতীতীর গাইছ গুল ।  
 কোন্ মালঞ্চ ফুল ফুটায়ে ছল ফুটালে বন্ধে মোর ॥  
 বোরকা খুলে বন্ কেতকীর ফুল-রেণুতে রাঙলে গা' ।  
 পারুল-বধুর মাগলে মধু হাসনা হেনার ভাঙলে জোর ॥  
 গায় কাওয়ালী বাদলি রুমরুম, তায় কাওয়ালী নাচে মৌর ।  
 বুঝে কদম, মেঘ-ভ্রমালে বিজলি চোখ চায় কিশোর ॥  
 শোন্‌রে কবি পুষ্প লোভী, আজ ধরেছি ফুল চুরি ।  
 ছল ফুটায়ে ফুল বালাদের কুল ভুলানো ভাঙব তোর ॥  
 কৃষ্ণ নগর ।

## দন্তরুচি কৌমুদী

তিনরেন্দ্র দেব

( ৩ )

রেলগাড়ীতে পূজার ছুটির ভিড় লেগেছে । কোনও  
 গাড়ীতেই বসবার জায়গা নেই । একটি লোক  
 প্লাটফর্মের এদিকে থেকে ওদিক পর্যন্ত ছুটোছুটি  
 করে সব গাড়ী থানা খুঁজে বেড়ালে, কিন্তু কোথাও  
 একটু জায়গা খালি আছে দেখতে পেলেনা, কেবল  
 একখানা গাড়ীতে দেখলে একটি বসবার জায়গার  
 একটা মন্ত ‘স্লট কেস’ বসানো রয়েছে । ভ্রমলোক  
 গাড়ীর কামরার ভিতর ঢুক পড়ে জিজ্ঞাসা করলে  
 “এখানে এই স্লট কেসটি কে রেখেছেন ?”

কেউ সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন না ।

ভ্রমলোক আবার একবার উচ কঠে জিজ্ঞাসা  
 করতে সামনের বেকের একজন মোটা সোটা লোক  
 হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন “আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটি একটি  
 ভ্রমলোক রেখে গেছেন, এবং আমাকে ওটার উপর  
 নজর রাখতে বলেছেন ।”

একটু পরেই গার্ড সাহেবের বাঁশী শোনা গেল,  
 এবং সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠে এজিন গাড়ী টানতে  
 সুরু করে দিলে ।

মাগন্ধক ভ্রমলোকটি শশব্যস্তে স্লট-কেসটা

তুলে নিয়ে জানালা গলিরে প্লাটফর্মের উপর ফেলে  
দিয়ে বলেন—“ভাগ্যিস, ভুললোকটি দেখছি গাড়ীতে  
উঠতে পারেন নি, স্লটকেসটি তাঁর বেগুয়ারিস চলে  
বাচ্ছিল আর একটু হলোই।”

বলতে বলতে তিনি সেই স্থানটি দখল ক’রে বসে  
পড়লেন।

ব্যাপারটা এমন চক্ষুর নিমেষে ~~হলো~~, যে সেই  
মোটো লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে ~~হল~~বার সুযোগই  
পেলো না যে, “স্লট কেসটি” তাঁর নিজেরই।

(৪)

পুলিশ কোর্টে একটা মামলা চলছিল। উকীল  
সাক্ষীকে জেরা করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন—

“তোমার ঠিক স্মরণ আছে যে এই আসামীর সঙ্গে  
সে দিন রাত্রে যখন পথে তোমার দেখা হয় তখন রাত্রি  
এগারোটা বেজে গেছে?”

সাক্ষী—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উকীল—সেটা অমাবস্তা রাত্রি ছিল না?

সাক্ষী—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উকীল—রাত্তা একেবারে অন্ধকার ছিল ত?

সাক্ষী—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উকীল—অতরায়ে পথ তখন একেবারে জনমানব  
শূন্য হয়ে পড়ে ছিল বোধ হয়?

সাক্ষী—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উকীল—তোমার কাছে ঘড়ী ছিল না বলছিলেন  
না?

সাক্ষী—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উকীল—কাছাকাছি আর কোথাও ঘড়ী ছিল না  
নিশ্চয়?

সাক্ষী—আজ্ঞে না।

উকীল—তবে তুমি কি করে জানলে যে রাত্রি  
এগারোটা বেজে গেছে!

সাক্ষী—আজ্ঞে, আসামীর সঙ্গে দেখা হ’তেই  
আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম “কটা বেজেছে বলতে  
পারেন?”

ও বলেছিল—“রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে।”

## অজিত বাদলের অন্ধকারে

ঐপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(গান)

অজিত বাদলের অন্ধকারে

দিনের আলো নিভুলো রে,

ফুল বাগিচায় ভুল করে কে

কার পিছুতে ছুটলো রে।

পাগলা পবন বেতস বনে হায়,

বাস্তব আজি কার আসা আশায়?

তড়িৎ শিখায় চকিৎ আলোর

মনটা নেচে উঠলো রে।

বাদল এলো নদীর তীরে তীরে,

কাজল মেঘে নাচছে ঘিরে ঘিরে,

তন্দ্রাতুরা তটিনী ওই

জোয়ার ভলে জাগলো রে।

কুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জনাতে ওই

অখোড় দেয়া সজোর মাতে সই—

উত্তল উচ্ছ্বাস প্রাণ সাগরে

ভাবের তরী বইলো রে।

## সৈনিকের চিঠি

মিলিটারী হাসপাতাল,  
প্যারী।

১৫ই সেপ্টেম্বর—সকাল।

প্রিয়তমা, মানসী আমার !!!

ঐ দিন, যেদিন তোমাকে শেষ চিঠি লিখছিলাম আমি ভীষণ ভাবে আহত হয়েছি। বুকের বা পাঁজরটা এক রকম ভেঙ্গে গেছে। আজ একটু সুস্থ বোধ করছি তাই কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। আনিদা শেষ করতে পারব কি না, শেষ করে তাকে ছাড়তে পারব কি না? হাসপাতালের আইন অনুসারে কোন কিছু লিখা বা বিছানা ছেড়ে ওঠা নিষেধ, কিন্তু নিষেধ সত্ত্বেও তো আমি থাকতে পারছি না তোমাকে চিঠি না লিখে! কিন্তু রাগী! তুমি তো আমার ব্যাকুলতা, আমার বুকজোড়া ব্যথা বুঝতে চাও না!

আমার একজন special নার্স আছে। তার নাম রেনী (Reni)। সে আমার খুব ভালবাসে—আমার এ অন্তর্থে প্রাণপণে সেবা করছে। তার জন্তেই আজ এ বাধাবাধি নিয়মের ব্যতিক্রম করেও তোমার চিঠি লিখতে পারছি। নইলে পারতুম না নিশ্চয়ই।

এ কয়দিন আমার বেশ কষ্টে কেটেছে। কি যে ব্যথা, বেদনা তা' লিখে বুঝাতে পারব না। তা' ছাড়াও আরেক কাজ আমার পৃথিবীর কথা ভেবে মরা। যখন বুকে ছিলাম, তখন পৃথিবীর কথা ভাববার অবসর আমার মোটেই ছিল না। কিন্তু এখন, নিরিবিলা বিছানার শুয়ে থেকে আমার মনটা বড় দমে গেছে। কিন্তু তাই আমি নিজের কথা ভাববার মোটেই অবসর পাই না—যত ভাবি অস্ত্রের কথা। তাই বলে তুমি মনে করোনা, যে তোমার কথা আমি ভাবিনে! আমি আমার আশাতের কথাও ভাববার ফুরসৎ পাইনা—সবচেয়ে বেশী আমার তোমার প্রতিই মনের বনে উঁকি দেয়।

আমি ভাবি সেদিনের কথা, যেদিন তুমি আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম বোট (Boat) করে। তুমি হালে বলেছিলে আমি পাড় টানছিলাম আর মাঝে মাঝে ব্যাকুল চাহনী দিয়ে তোমাকে আমার ব্যথার কথা জানাবার চেষ্টা পাচ্ছিলাম। তুমিও হয়ত আমার মনের গোপন কথা জাক্ত পেয়ে করুণ নয়নে চেয়েছিলে কিন্তু অন্তরের ব্যথা বুঝবার চেষ্টা করেছিলে কি না, কে জানে?

যাক্,—তুমি আমাকে পদ্মবনে বোট নিয়ে যেতে আদেশ করলে কারণ, তোমার পদ্ম চাই, তুমি নিজ হাতে পদ্ম ছিড়বে। আমি কত উৎসাহে তোমাকে পদ্মবনে নিয়ে গেলুম—আশা হচ্ছিল, এ পদ্মবনেই বোধ হয় তোমার আমার প্রথম—।

কিন্তু একটাও পদ্ম পেলুম না। সম্ভ্রা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে হররাণ হয়ে মোটরে উঠলুম। সোকারকে, বাজারে মোটর নিয়ে যেতে বললুম। সেদিন এক শুচ্ছ বাজারের পদ্মই তোমাকে উপহার দিয়েছিলুম, তার পরিবর্তে তুমি আমার বাটন হোলে (button hole) একটি লাল টুকটুকে গোলাপ পড়িয়ে দিয়েছিলে।

আমি ভেবেছিলাম—এই বোধ হয় আমাদের প্রথম প্রেম বিনিময়। এই লাল ফুলেই আমাদের আজ প্রথম মিলন। ঐ লাল গোলাপ যেন আমার বুকের রক্ত হয়ে আমার বলছিল—আজ আমি আমার বুকের রক্তে তোমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। এস ওগো আমার চির নূতন, চির পুরাতন অতিথি, তুমি আমার জীবনে এস। আমাকেও জীবনে ধস্ত কর।

কিন্তু হায়! তোমার মনের গোপন কথাই আমি তো জানতুম না বুঝতে পারিনি। আমি যা'

ভেবেছিলুম, ভীষণ স্বার্থপরের মতই ভেবেছিলুম। আর কোন বিপরীত ভাব তো আমার মনে আসেনি। কিন্তু আজ ভাবতে গিয়ে দেখছি তুমি যে সত্যিই অল্প ভাব নিয়ে আমাকে গোলাপ উপহার দিয়েছিলে। এখনো সে ফুলটি আমি যত্ন করে রেখেছি তুমি পদ্মগুলো রেখেছ কি না, জানিনে। হয়ত রাখ নাই।

হাঁ তোমার গোলাপ আমাকে এখন কি বলে জান। সে বলে—ভুল বুঝে আমার বুকে ধরেছিলে। আমি তো তোমার অভিনন্দন দিইনি? তোমার পবিত্র প্রেম, যা' পুত-অনবস্ত-পুত্র, তা'কে পারে মাড়িয়ে গর্গর ভরে চলে গিয়েছি—তোমার ব্যথার দানের প্রত্যাশার দিয়েছি।

উঃ এত নির্ভর তুমি? কিন্তু এখন আর তো তুমি তা নও? এখন যে তুমি আমাকে বুকে স্থান দিয়েছ। তবু, নির্ভর বলে তোমাকে আর অপবাদ দিই কেন? কিন্তু মণি, একটু নির্ভর তুমিচিঠি দেবার বেলায়। এই তো, আজ ক' মাসের ভেতর কোন চিঠি নেই। এখন যদি তোমাকে নির্ভর বলে গাল দিতে হয় তবে এই দোষটুকুর জন্তেই দেওয়া যেতে পারে।

বড্ড হাঁপিয়ে উঠেছি—একটু জল খেয়েনি। উহ্, ঘামিয়েও তো উঠেছি। কিন্তু রুমাল যে একটিও নেই? এবার করেকটা রুমাল পাঠিয়ে তো লক্ষ্মী! পাঠাবে তো?

একটা কথা, যা' আমার মনে দিনরাত্রি উঁকি মারছে তা' আমাকে বড্ড অস্থির করে তুলছে। আমার মনে হচ্ছে কি জান? তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাবে—নিশ্চয়ই যাবে। সেদিনও খুব দূরে নয়। আমার চারিদিকের আকাশ বাতাস অন্ধকার করে সেদিন ঐ আসছে। আমি জানিনা ইহা সত্য হবে কি না? যদি সত্যই হয়, তবে—তবে—উহ্ বুঝবে না তুমি, কি নিষ্করণ ভাবে আমার বুকেটা ভেঙ্গে যাবে তা' তুমি বুঝবে না।

সত্যি, আমিও দেখছি—আমি কিছুতেই

তোমাকে আমার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছি না। তুমি তো জান যে আমার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা সব—সবই ওই দেহেতে বিরাজ করছে। আমার জীবনের আনন্দ, সুখ, শান্তি সবই তোমার একটি কথার উপর, তোমার করুণার উপর নির্ভর করছে। তবু তোমার এ হল করে ছুটে চলা কেন প্রিয়?

তুমি আমাকে যখন চিঠি দাও, দেখি কোন সম্বোধন নেই। কেন তুমি ও রকম কর? এ যে তীর হয়ে আমার বুকে বিঁধে? আমি কত আশা করে তোমার ওই 'সম্বোধনার' অপেক্ষার থাকি—কিন্তু কই, তুমি তো আমার ডাক না। ডাকবে কি? চিঠি লিখলে তো ডাকবে? নির্ভর! আমাকে এ ভাবে ছুঁতে দিয়ে তোমার কি লাভ?

আচ্ছা মণি, তুমি হয়ত আমাকে ভালবাস। হয়ত কি বল্চি—সত্যিই ভালবাস, করুণা কর। কিন্তু, তবু কেন চিঠি দাও না? আমার মনে হয়, তুমি আমার জন্য এতটুকু ভাব না—নইলে এ ভাবে প্রতীক্ষা করে করে কি নিরাশ হতুম? তুমি হয়ত কৈফিয়ৎ দিবে যে, লিখেছ—লিখে ডাকে দিয়েছ অথবা ডাকে ছাড়তে ভুলে গেছ—কারণ, তুমি এখন বড্ড ব্যস্ত। কিন্তু আমার মনে তা' মোটেই খাপ খাচ্ছেনা। আমার অল্প রকম ভাবনাই হচ্ছে—অধিক।

প্রিয়া আমার!!! আমার অনুরোধ, তুমি আমাকে একটা ছবি বা ময়না ভেবোনা—আমাকে চিন্‌বার একটু চেষ্টা করো। তোমার আমি কত ভালবাসি—তোমার করুণার আমি কতটুকু প্রত্যাশী—তোমার হুকুমের আমি কতটুকু বাধ্য—এগুলো একবার তলিয়ে দেখো। কোন দিকে আমার হল চাতুরী নেই—দেখবে।

তুমি আমাকে করুণা কর না, একথা আমি বলতে পারব না। যদি নিতান্ত স্বার্থপরের মতও ভাবতে বাই, তবু তোমার করুণাকে বাদ দিতে পারি না। আমি সত্যি আশ্চর্য হয়ে বাই।

তা' ছাড়া, আজকাল হাঁসপাতালে তুমি কত ঘেঁহেই না আনি রোগীদের শুশ্রূষা করছ—সেবার ভার হাতে তুলে নিছ—তা' কি তুলতে পারি? সত্যি, তোমার উচ্চ জন্মের পরিচয় পেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এ ভাবে পেতে চেয়েছি।

আমাকে যে কোন কালে বুদ্ধ আসতে হবে, খুন করতে হবে—তা' তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে

পারিনি। কোন লোককে যে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে পারি, এ যে আমার ধারণারও অতীত। কিন্তু সবই আমাকে করতে হয়েছে, এ জীবনে সবই সত্য হয়েছে।

( ক্রমশঃ )

শান্তি চৌধুরী

## “গ্রহের ফেঁড়”

ত্রিহিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞাবিনোদ সাহিত্য রত্ন—

প্রভা শশবাস্তে ব'লে উঠল, “করছ কি, এখনি কেউ এসে পড়বে।”

বীরেন—আহা-হা এত আজ নূতন কিছু একটা করছি না—রোজই একটু আধটু স্মৃতি চাই কি না! স্বামীর স্বভাব প্রভার অজ্ঞাত ছিলনা—তাই সে তাড়াতাড়ি তার চোখ থেকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর্তে লাগল। এমন সময় কর্তার গলার স্বর শুনে বীরেন—ভীত হয়ে বলল, থাক এখানে রয়ে আর কাজ নেই—বাবার গলার স্বর শুনছি তিনি বোধ হয় এখনি এসে আমাকে ধরে ফেলবেন।

প্রভা—এখন কোথায় পালাচ্ছ—বাবাকে আসতে দাও, তোমার মাতামাতির কথা এখনি বলে দিচ্ছি—দাঁড়াও।

বীরেনের মুখখানা একটু সাদা হ'য়ে উঠল—সে খানিকটা আপনাকে সারলে নিয়ে সজল ঢক্ষে প্রভার মুখের দিকে চেয়ে বলল—

প্রভা আমি মাতাল নই—মাতাল করেছ তুমি। তুমি আমার মাথাটা খেয়েছ—।

এই বলতে বলতে বীরেন বাঁকীর বাহিরে চ'লে গেল।

জন্মে নিষ্ঠুর আঘাত পেয়ে, হঠাৎ প্রভার চোখে জল এসে পড়ল।

প্রভা অনেক কাল স্বামীর ঘরে এসেও স্বপ্নের সংসারকে সংসার ব'লে চিনতে পারল না।

সে ব'সে থাকতে পারল না—ঘরে গিয়ে শু'য়ে পড়ল। তার বুকের ভেতর কান্নার ঢেউ ফুলে ফুলে উঠল।

ভগবানের রাজ্যের ভেতর স্থখ ও দুঃখ, মাহুকের এদের হাত হ'তে অব্যাহতি পাওয়ার জো মাত্রেই নেই। শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কর্মের ফলভোগ ব্যক্তিমাত্রেই অবশ্যস্বাবী। মোহিনী মোহন বাগচী আনন্দের উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে জমিদারীর উন্নতির ভ্রম এক সময় যথেষ্ট খেটেছিলেন—বুদ্ধবয়সে এখন পুত্রের ব্যবহার দেখে শুনে হাড়ে হাড়ে চ'টে সংসারের অস্ত্র কোণে এসে বসলেন।

মোহিনীবাবুর আদি নিবাস হুগলি। তাঁহার পিতা, খুব বড় একজন জমিদার না হলেও নাম যশ সে সময় যথেষ্ট ছিল। মোটের উপর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্বের সময় নামজাদা লোক ছিলেন। জমিদারীর আর হাজার ছাব্বিশ টাকার উপর ছিল।

বর্তমানে মোহিনীবাবুর নাম নানা কারণে জেলার সর্বত্র খুব বিখ্যাত। ধনের খ্যাতি ত তাঁহার ছিলই, তাহা ছাড়া মনেরও অস্ত ছিল না। জেলার অনারারী মেজিষ্ট্রেট, নিজে বি, এল, তাহার উপর রায় বাহাদুর, এতগুলি খ্যাতি ছিল। জমিদার বংশের সন্তান হইয়াও জমিদারস্বগত আমোদপ্রমোদে মাত্রই তাঁহার রুচি ছিল না।

আজ প্রায় বছর দশ হ'ল মোহিনীবাবুর জীবন ৮গঙ্গা প্রাপ্তি হ'য়েছে। মোহিনীবাবু সংসারে মরমে মরিয়া একমাত্র পুত্র বীরেনের মুখের দিকে চে'য়ে গণার দিনগুলি কাটাচ্ছিলেন।

বীরেননাথ ছয়বার বি, এ ফেল হয়ে সাত বারে পাশ করে, ইয়ার বদ্ধ বাক্যকে নিরে কলকাতারই থাক্ত, দেশে বড় একটা আস্ত না। সে মনে ভে'বে ছিল সারা জীবনটা যদি বাবুনানা করে কে'টে যায় তা-হ'লে এ কাজ করলে ক্ষতিই বা কি ?

মোহিনী বাবু পুত্রের এরূপ তাব ভক্তি দেখে শুনে পরিণাম যে অতি ভয়ানক দাঁড়াবে ভাবতে লাগলেন।

মোহিনী বাবুর শরীরের অবস্থাও দিন দিন ক্রমশঃ খারাপ হ'য়ে আসছে। তাঁহার পূর্বের মত উৎসাহ নাই, জমিদারীর কাজ কর্ত্তের ভার কৰ্মচারিদিগের উপর রেখে পরপারের যাত্রার আয়োজনের অস্ত প্রতীক্ষা করছেন। তাঁহার পাণ্ডুবর্ণ মুখখানিতে যেন সর্বদাই একটা করাণ হৃষ্টিক্তার ছায়া ছেয়ে ছিল।

পুত্র বধু প্রভা ঋতুরের স্বাস্থ্য দেখে শুনে আকাশ পাতাল ভাবতেন। সময় সময় তার বুক হুক হুক কঁপে উঠত।

একদিন সন্ধ্যার পর মোহিনী বাবু শয়ন কক্ষে বসিয়া প্রত্যেকে নানা প্রকার বুঝ প্রবেশ দিচ্ছিলেন। অনেক কথার পর ঢোক গিলতে গিলতে বলেন—  
“না বা হবার ভাব হয়েছে। আমার বিবেচনার এখন গত কথা ভুলে বাওয়াই মঙ্গল।”

প্রভা বিশ্ব বিস্ফারিত নেজে ঋতুরের দিকে চেয়ে বিরক্তিবাক্যক স্বরে বলল—“বাবা, বুঝলুম না। -”

“না, এ সোজা কথাটা বুঝতে পারলে না - বীরেনকে ক্ষমা কর, তবে সে আমার বাড়ীর ছেলে বাড়ী আসবে।”

প্রভা কিছুক্ষণ ভেবে হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল “বাবা, এ উচ্ছ্বলকে প্রশ্রয় দিলে অস্ত্রায়ের পূজা করা হয়। আজ পাঁচ বছর বাবং ছ'বেলা বেস্তার অগ্নে বাহার দেহের পুষ্টি হচ্ছে - পৈশাচিক কার্য বাহার খেলার বিষয় তাহাকে ক্ষমা তাহার পৈশাচিক কার্যকলাপ ভুলে যাবো— এ জীবনে নয়, পর জন্মেও ভুলতে পারি কি না সন্দেহ।” মোহিনী বাবু পুত্রবধুর কথার মিশ্রণ প্রস্তরখণ্ডের মত একখানি ইজি চেয়ারের উপর ব'সে পড়লেন। তাঁহার মুখখানি লাল হ'য়ে উঠল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, বৌমা সংসারে সময় কাহার সমান যায় না।

প্রভা একটু ছুপ করিয়া থাকিয়া বেদমারুদ্ধ কণ্ঠে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করল “ভগবানের জ্ঞান দণ্ড হ'তে দূরে পালাবার জো কার ?”

এমম সময় মোহিনী বাবুর দূর সম্পর্কীয় এক খুড়িমা আসিয়া ক্র কুঞ্চিত করিয়া বাড় বাকাইয়া কহিল—“আরে মোহিনী, বলি সংসারটা কি বোকা, পাজি, বদমাইসদেরই আড্ডা ? দয়া ধর্ম বলি কি একটা জিনিষ নেই ? দিনরাত্রি এখনো সত্যি যুগের মতই আছে ! এখনো চন্দ্র সূর্য উঠছে ! কলকাতার গুণ্ডারা কি ভাবে যে চার পোয়া কলির রাজ্য আরম্ভ করেছে ! বলি, বীরেন এমন ভাল ছেলে হয়ে একটা রাগির জন্তে মাসে একশত টাকা ব্যয় করছে। আর দেখ কি না কত কত গুণ্ডা মাগি মদে রাজার রাজ্য উড়িয়ে দিচ্ছে। বলি দিদিমণি ভাগ্যে চাও ভাতারকে বশ করে মিরে আস।”

মাথা হেঁট ক'রে দিদি ঋতুরীর কথাগুলি ভাবতে ভাবতে প্রভার কত কথা মনে উঠল। কত দিক

দিয়া সমাজের কত সংস্কার কত অসুস্থতার আশ্রয়  
উৎপাটনের প্রয়োজন আছে। একে একে মনে কত  
কথাই আসল। নিদারুণ হতাশের ভিতর সে স্থির  
করল—এখন আর বাড়ীতে বসে থাকলে চলবে না  
—কলকাতার কিছুদিনের জন্ত থাকা যায় কি না?

এমন ভাবে প্রভার বছর পাঁচেক কেটে গেল,  
বীরেনেরও কোন সারাশব্দ পাওয়া গেলনা—

সন্ধ্যা হ'তে কিছু বিলম্ব ছিল। বর্ষার-বর্ষণ-কাস্ত-  
আকাশে বিদ্যায়মান সূর্যের শেষ রশ্মিচ্ছটা বিচিত্র  
বর্ণে ও বিবিধ আকারে নিজদের গঠিত ও সজ্জিত  
করিতে ব্যস্ত ছিল।

কলকাতার সহরের সাকুলার রোডের একটা  
বাড়ীতে প্রভার পিতা গুরুদাস লাহিড়ী পল্লীগ্রাম  
ছাড়িয়া বসবাস করিতে ছিলেন। তিনি পল্লীবাসের  
উপর ছোট বেলা হতে বড় একটা অস্বস্তি ছিলেননা।  
একজন্ম কলকাতার থাকা তাহার খুবই ভাল লাগত।

এমন সময় একটা যুবক ট্রামের অপেক্ষার  
ছুটপাথে হাঁড়িরে গল্প করিতেছিল। তাহার  
চেহারার মধ্যে বিশেষত্ব আর কিছুই ছিলনা—কেবল  
রঙ উজ্জল শ্রামবর্ণ। বেশভূষার পরিপাটি, হাতে  
ওরেট-এণ্ড রিষ্টওয়াচ, বুক পকেটের ভেতর একটা  
সোনার বাঁধানো ফাউন্টেন পেন।

এমন সময় যুবকের পিঠে এক চর মেরে জন্ত  
একটা যুবক চীৎকার করে বলল “তুই এমন  
লক্ষ্মীছাড়া—এখানে কি করে এলি রে—“এ যে আমার  
ভাবী স্বপ্নের বাসা”—

“এ্যা আমার ভাবী স্বপ্নের”—কেমন কথা  
বলছিল—আর একটা বে কচ্ছিস্ নাকি। ভবেশ?

ভবেশ—তবে এস আমার গিন্নির সঙ্গে হুঁ একটা  
আলাপ করে যাও। ভবেশের কথার বীরেনের  
বিন্দুরের আর লীলা রহিল না—সে অবাক হ'য়ে  
ভবেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভবেশ অতি কষ্টে একটু হাসিল—তাহার মুখে  
হাসি ফুটিল না—

বীরেন—তবে চল তোমার ভাবী গিন্নির সঙ্গে  
আলাপ করে আসা যাক—আচ্ছা ভবেশ, তোর স্বপ্নের  
আমার দেখে কোন আগন্তি করবেনা? তবে কিন্তু  
নাকাল বনতে হ'বে ভাই।

তোর এই সব মন্তব্য শুনে কার না রাগ হয়?  
বীরেন—“রাগ করোনা—তুমি যে একজন সাহিত্যিক  
সে জন্ত আগন্তিকে নিজেকে সামলায়ে নিতে হয়”—

মেঘ উঠছে, সন্ধ্যাবেলা—ভবেশ বীরেনকে  
নিরে ঘরে ঢুকেই দেখলে অমলা আরক্ত মুখখানা  
নীচু করে একটু সলাঞ্জ হাসি হাসছে.....

অমলা আর হাসি চাপিয়া রাখতে না পেরে—  
ভবেশের মুখের দিকে তাকাইয়া—“ভবেশ বাবু—এ  
ভদ্রলোককে কাকুর সঙ্গে সম্পর্ক পাতবার জন্ত সঙ্গে  
করে নিয়ে এসেছেন”.....

ভবেশ একটু ক্ষীণস্বরে বলল—ছেড়ে দাও অমলা  
তোমার বাচ্চানী—

ভবেশ বীরেনকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে  
দেখিয়া-বলল “ভান্না-কি শরৎচন্দ্রের—বোড়ানীতে  
জীবানন্দ হয়েছ না কি—তবে এখন অভিনেত্রী  
চাকরীলা কোথা”?

অমলা নিজের হাসিটা সামলাইয়া উঠতেই  
অনেক ব্যস্ত ছিল। বীরেন অপরিসীম স্থলে একটু  
লজ্জিত হ'য়ে কৈফিয়তের স্বরে বলে উঠল—আচ্ছা  
ভবেশ আজ তুমিই—শিশির কুমার হয়েছ—তাতে  
দোষ কি, আমি যে চিরদিনই শরৎচন্দ্রের জীবানন্দ হয়ে  
বসে আছি।

ভবেশ হাসিয়া বলিল—বোস বোস এখনি তোকে  
লাল সরবৎ খাওয়াচ্ছি আর আমাকে জীবানন্দ সেজে  
শিশিরকুমার হবার জন্ত তোর জেদ করতে হ'বে না।

ভবেশ সিগারেট গণ্ডায় গণ্ডায় ধরেন্দ্র করিয়া আর  
সময় সময় টেবিলের উপর পা ছ'থানা উঠাইয়া দিয়া—  
সংসারের হাসি খেলার গল্প জুড়িয়া দিল—অমলা  
সিগিএ আটা ইলেকট্রিক ফেনের স্নইচ টিপিয়া দিল।  
খানসামা আসিয়া টেবিলের উপর ছ'থানের চা ও

খাবার গুলি সাজাইয়া বাইতেছিল মাঝখানে বীরেন এক 'পেগ্' (গেলাস) হুকুম চালাইতে লাগিল।

ভবেশ হাসিয়া বলিল—বেশ জীবানন্দ এক পেগ কেন এক বোতল হ'লেই ভাল হ'ত, সারারাত অবাধে চলে যেত।

বীরেন—তোম্ব কি কোন আপত্তি করবার আছে—যদি থাকে তবে বেশ খোলাকথা বলে ফেল ভায়া—একটু আধুটুকু ক্ষুষ্টিতুষ্টি কর্তে চাই কিনা না তা ছাড়া আর পোণে যোল আনা জীবানন্দ হ'তে পারলাম কই?

শরৎচন্দ্র যে মিথ্যা হ'য়ে যাবে।

যদি ভায়া একবার স্বাদ পাও তা হ'লে চিরজীবনের মত জীবানন্দ সেজে যেতে পারবে বই কি?

অতি অল্প সময়ের মধ্যে খানসামা বীরেনের হুকুম তামিল কর্তে কক্ষর করল না।

ভবেশ বীরেনকে ছ'মিনিটের কথা বলে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। অমলা বীরেনের সঙ্গে আলাপ করছিল, মধ্যে মধ্যে ঠাট্টা তামাসাও হইতেছিল—বীরেন সময় সময় কল্পনার নেশা ছেড়ে চির অভ্যস্ত নেকা সেজে রসিকতার চেষ্টার রহিল—সে দিন গুরু পক্ষেরই রাত্রির—জ্যোৎস্না প্রাবৃত—বীরেন চকিতে চাহিয়া দেখল—অপূর্ণ রূপবতী সুবতী, ধীরে ধীরে দরজার পর্দা সরাইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

বীরেন—সুবতীর দিকে তাকাইয়া আর চাহিতে পারিল না—সুবতীর চোখে একি লক্ষ্যহীন শূন্যদৃষ্টি;

বীরেন ভাবল একি অপ্রকাশিত আত্মান, বীরেন আবার চাহিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিল—যদি দয়া করে দেখা দিতে এগেছেন তবে বহন। সুবতী অতি কষ্টে নিজকে সামলাইয়া লইয়া পারের কাছে নতজানু হইয়া বলিয়া পা ছ'থানার উপর রাখা রাখিল। অতীতের শত সহস্র কথা তার মনে জেগে উঠল—

এমন সময় ভবেশ আসিয়া একখানা চেয়ার দখল করল। অমলা এক ধারে চুপ ক'রে বসে রইল—

বীরেন—কি হে ভবেশ প্রাণঢালা সঙ্গীত একটুকো চাই কিনা? তাতেও কি তোমার আপত্তি আছে? তবে কেন সাহানা দেবীর একটা গান গাওনা?

ভবেশ—পিয়ানো বাজাইতে ছিল—সুবতী গাইতে লাগল—

মাঝি! এবার তোমার আপন হাতে বেয়ে চল দাঁড়! তোমার হাতেই কাণ্ডারী গো? দিলাম সকল ভার?

এখন— ইচ্ছা তোমার ফ্যালো ধরো,

দুঃখ দেখে আদর করো,

আমি শুধু চাইব তোমার চরণ পারাবার?

বইব তোমার দত্ত সুখা, - ঝক্ক অশ্রুধার?

কুলের কথা ভুলল যে মন ভাসল অকুলে,

তুমি এবার বাওগো তরী, হালটা নাও তুলে?

এবার— তোমার স্নেহ পীযুষ ধারার

সিক্ত কর রিক্ত আমার

না হয়— কেড়ে নিয়ে সকল বালাই মারো বারম্বার?

জানব— এই তোমারি পারের কড়ি নিলে কণধার!

সুবতীর প্রাণ ঢালা সঙ্গীতে বীরেন আর স্থির থাকতে পারল না; সে চেয়ার ছাড়িয়া বাহিরে গেল... ভবেশ ও হাসতে হাসতে বীরেনের সঙ্গে বাহিরে এল—রক্ত মাংসের মায়া—বাবা বড় ভয়ানক জিনিষ হে.....

বীরেন—যাঃ যাঃ ওসব বাজে কথা কেন বলছিস। সত্যি সত্যি মেয়ে মানুষটার গলার স্বর বেশ মিষ্ট। এর দর্শনী কত দিতে হবে.....

এ তোমার কি হয় ভবেশ—

ভবেশ—বীরেনের কথায় চুপ ক'রে রইল; তারপর একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলল—ইনি একজন সাহিত্যিক তাই এখানে এত আসা যাওয়া।

বীরেন—আর ত্রাণা সাজতে হ'বে না। সুবতীর সৌন্দর্য্য বীরেনের হৃদয় বড়ই অভিভূত করিয়া তাকে অভিষ্ট করে তুলিল। সুবতীর প্রাণ কবিত্বপ্রবণ, সঙ্গোবের কোন সাধই তাঁর জীবনে মিটেনি, কত



আশা নিরাশার কথা সুখতীর বুকে গুমড়িয়া উঠিতেছিল।

বীরেন চেয়ে দেখল ভবেশের মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গেছে। হঠাৎ সে গভীর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে—বীরেন আজ তবে এখন আসি কাল বৈকালে তোমার এই নূতন পরিচিতা সাহিত্যিকাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করে যাওনা কেন ভাই—?

বীরেন—সে যে তাহার সৌজন্য—আচ্ছা, ইনি কি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর্ণেন—

ভবেশ—প্রাণের সঙ্গে যদি এর ভালবাসার কোন সম্বন্ধ থাকে তবে কি ইনি তোমার জন্য এত আকুল হন।

বীরেন—ইনি কি সত্যি আমাকে ভালবেসেছেন ইহার সঙ্গে ত আমার পূর্বে আর কখনো দেখা হয় নি, তবে কেমন করে ভালবেসে ফেলেন.....

ভবেশ—যাকে যে ভালবাসবে তার কি বহুদিনের চেনা জানা আবশ্যক—মাত্র চোখের এক মিনিটের দেখার সব হয়।

বীরেন—আচ্ছা যদি তিনি আমাকে ভালবেসে থাকেন তার পরিচয় পেলুম কোথায়?

ভবেশ—যদি তোমার ভালবাসা না চাইতেই এসে থাকে তবে তোমার প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল কেন?

প্রমাণ চাও তবে এখনি তোমায় দিচ্ছি—

প্রণয়িনী প্রণয়ীকে ভাঁড়ানো.....আজ দেখছি তোমার কাছে এতটা নূতন।

ভবেশ—তুমি জান আমি মাতাল, আমি প্রভাকে প্রত্যাশিত আশায় বঞ্চিত করে চির জীবনের জন্য রেখেছি—কিন্তু পরজী দর্শনে আমার সৌজন্যের কিছুই নাই তবে আজ ইহার একটা গান শুনে আমার অনেক দিনের লালসার বহি জলে উঠল।

ভবেশ—তুমি কি প্রভার জন্য সত্যি ভাব? ভবেশের কথায় বীরেনের স্বরটা কেঁপে উঠল। তারপর

সে টেঁচিয়ে বলে উঠল—প্রভার জন্য ভাববার কি অ'ছে ভবেশ—বাবার অজস্র বিষয় সম্পত্তির একমাত্র মালিক প্রভা—তবে জীবনের চরম দুর্ভাগ্য একমাত্র স্বামী সুখ—সেটা হচ্ছে আমার অদৃষ্ট প্রভার হাতের লেখা বলতে হ'বে।

ভবেশ—শুনে সুখী হলুম, তুমিত প্রভার জন্য ভাবো; আচ্ছা ক'বছর বাবু তোমাদের উভয়ের দেখা শুনা নেই—

বীরেন একটু শ্বেবের স্বরে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল—ছেড়ে দাও ওসব বাজে কথা! দিকি আরামে দিনগুলি কাটিয়ে দিচ্ছি—“আচ্ছা তবে এখন যাওয়া যাক” তব্ধ—

কাল একে নিমন্ত্রণ করে যাওয়াই ভাল—আমি এখনে ঝাঁড়ালুম তুই গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আয়—

সে রাজে বীরেনের ভাল নিম্মা হল না—কাহার জন্য প্রাণ যেন.....কল্লনার রাজস্ব বাস কর্তে ছিল—ঝি আসিয়া সংবাদ দিল—“বাবু, আপনাকে ভবেশ বাবু রাস্তায় ডাকছেন”।

বিছানা থেকে চট করে উঠে রাস্তার ভবেশের সঙ্গে দেখা কর্তে গেল। ভবেশ ধীরে ধীরে তার পকেট থেকে একখানা চিঠি তাহার হাতে দিয়ে—গাড়ীতে গিয়ে বসে—গাড়োয়ানকে গাড়ী হাঁকাইতে বলল—

ভবেশ বিদায় দিয়ে বারান্দার একখানা ইজি-চেয়ারের উপর বসে—তারপর ধীরে ধীরে এন্ডেলোপ খানা ছিঁড়ে দেখল সেই সুখতী.....চিঠির শেষে লেখা ছিল “সেবিকা তোমার হাসিরাশি দেবী”—

বীরেন আর বারান্দার বসে থাকতে পারলোনা—সে বিছানার শুয়ে শুয়ে—আকাশ পাতাল ভাবছিল। এমন সময় ঝি আসিয়া একটা তার বাবুর হাতে দিয়ে—অন্ত কাজে চলে গেল। তারে লেখা ছিল,

Daughter-in-law died yesterday at 4-50 P. M.

“Father”

বীরেন চীৎকার করে কেঁদে উঠল—প্রভা প্রভা আমার বেড়ে পালালে—আমি যে তোমার ঋণ শোধ করবার সুযোগ এ জীবনে পাই ন—তবে আমাকে ঋণী করে মর্ত্যে রেখে গেলে.....শোক সম্ভূত বীরেন বেদনার পীড়নে আর কিছু বলতে পারলোনা—

সে যে নারীর প্রেমের অপমান করেছে—প্রভা! যে বড় অভিমानी ছিল—অর্ধ মুদ্রিত চোখ রগড়াতে রগড়াতে টেবিলের উপর তার দৃষ্টি পড়ল—

সঙ্গে সঙ্গে ষোতলের ছিবি খুলিয়া একটা মাসে ঢালিয়া—খোস্ মেজাজী সামল—।

সংসারের মুখ দুঃখ কিছু সময়ের জন্য লাঘব করে অজ্ঞান অচেতন হ'য়ে বিছানার উপরে গুয়ে পড়ল—।

সন্ধ্যার সময় ভবেশ একখানা গাড়ী করে—নিমজ্জিত সাহিত্যিকাকে নিয়ে বীরেনের বাসায় আসল—

বীরেন—অগ্ন থেকে জ্বগে উঠল—সারাদিন সে মদে বিভোর ছিল, তাই সে খাওয়া দাওয়ার জন্য ভাবে নাই—ভাববারও সময় ছিল না—

একত মাতাল—প্রভার মৃত্যু সংবাদে একেবারে মরমে মরে গিয়েছে—

ভবেশ ও সুবতীকে দেখে বীরেনের চোখ দিয়ে—বড় বড় অশ্রু ফোঁটা ঝরে পড়তে লাগল—

ভবেশ বীরেনকে হৃহাত দিয়ে জরিরে ধরে তার কোলের উপর মাথা রাখল—সুবতী তখন বেশ ব্রূতে পারল—“বীরেন ও প্রভার মধ্যে কতখানি ভালবাসা ছিল”—

সুবতী প্রতিহিংসার পরিবর্তে একটু গর্ক অহুভব করল—

বীরেন মুখ তুলে অশ্রুধারা অঞ্চলে মুছে রুদ্ধ স্বরে বলল—আপনারা বসুন আমি এখনি আসছি—কম্পিত পদে ড্রাইং রুমে প্রবেশ করে—হু'একবার এদিক ওদিক তাকাইল তারপর একটা কোটা হ'তে—একটা কাল রঙের হু'টা জুগি একসঙ্গে গিলিয়া ফেলল—ভবেশ অনেকক্ষণ বসে থেকে চেয়ার ছেড়ে

বীরেনের বিবর্ণ মুখ দেখে ভয়ে শিহরিয়া উঠল—.....

চীৎকার করে ডাকলে—আর বসে আছেন কেন সর্বনাশ হ'য়েছে—বীরেন আকস্মিক খেয়েছে—সুবতীর মনে হ'ল পৃথিবী যেন চক্রে তার তাহার পারের নীচে ঘুরছে কম্পিত চরণে—তার গুঠভেদ করে একটা শব্দ বের হ'ল—“মাগো কে আহ আমার”

বারান্দার বি-চাকর বসে আলাপ করছিল—কক্ষ কামার স্বর শুনে একে একে সকলেই হাজির হ'ল—

সকলে বিম্মিত দৃষ্টিতে বীরেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—

ভবেশ সকলকে ধমক দিয়ে বলল—এখনও দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছ “ডাক্তার ডাকো”—বাবু বিশ্ব খেয়েছে—

বি—ভবেশের কথা ব্রূতে পাচ্ছিল না—ভবেশ আবার একটু চেচিয়ে বলল—এখন দৌড়িয়ে গিয়ে ডাক্তার নিয়ে এসো জীবনের আশা আছে—ভর কি।

প্রভার নরনের কোণে হু' বিন্দু অশ্রু চক্ চক্ করে ঝলসে উঠল—ভবেশ তাই তুমি আমার কি শক্রর মত না কাজ করে ফেলো—এমন সময় ডাক্তার নিয়ে বি আসল ডাক্তার বীরেনের অবস্থা ভাল করে দেখে বলল—আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নেই—এখনি আর একজন ডাক্তার ডাকুন। তারপর লোক অধীরা প্রভার দিকে ফিরে চেয়ে বলল—ইনি বোধ হয় আপনার স্বামী—.....

প্রভা ব্যথিত দৃষ্টি ডাক্তারের মুখের উপর রেখে—নীরবে হু'টা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—“বি শিগ্গীর ডাক্তার ডাক”—

ভবেশ উত্তর করল—“ডাক্তার ডাকতে গিয়েছে”—

কক্ষের সকলেই নীরবে ডাক্তারের চিকিৎসা দেখতে লাগল সে রাত্তির—ডাক্তারদের আর বাড়ী যাওয়ার অবসর হ'লনা। পরদিন বেলাও এমনভাবে কেটে গেল—বীরেনের কোন সারা পাওয়া গেল না—।

রাজি আটটার পর একবার চোক মেলে চেয়ে—তারপর চোখ মুদ্রিত করল—

সকলেই মনে করল এখন জীবনের আশা করা

যায়—সে রাজির জন্ত ডাক্তারদের বিদায় দিতে চাহিল—  
কিন্তু প্রভার একান্ত অমুরোধে কাহাকেও বিদায়  
দেওয়া পেল না।

সকাল বেলা গুরুদাস বাবু—বৈবাহিক মোহিনী  
বাবুকে সঙ্গে করে—বীরেনকে দেখতে আসল—

ডাক্তারদের আদেশানুসারে ভবেশ ছাড়া সকলের  
আশা নিষেধ হ'ল—কারণ হঠাৎ এভাবে চিন্তে  
পেরে হার্টফেল কর্তে পারে—গুরুদাস বাবুর ও  
মোহিনী বাবু প্রভাকে নিয়ে বাসায় আসল—এমনি  
ভাবে সপ্তাহ কয়েক কেটে গেল। বীরেন এখন বেশ  
সুস্থ হ'য়ে উঠছে—তার সঙ্গে সঙ্গে ভবেশ সর্বদা  
থাকে—

যখন বীরেন একটু ভালর দিকে আসতে লাগল  
তখন ভবেশ একদিন একটু হেসে বলল—আসছে  
কাল তোমার দ্বীপ আশ্রয়ের দিন—আমি তোমার  
বন্ধুবান্ধব সকলকে নিমন্ত্রণ করে এসেছি—

বীরেন কিছুক্ষণ নীরবে থেকে তারপর বলল—  
বেশ করেছ তোমার সেই সাহিত্যিকাকে কিন্তু নিমন্ত্রণ

কন্তে ভুলে যেওনা—সঙ্গে যেন তার ছোট বোন  
অমলাদেবীকে ও নিয়ে আসেন।

ভবেশ একগাল গম্ভীর হাসি হাসিয়া বলল—সে  
সব দিকে আমার মাত্র ভুল হ'বেনা—তুমি কিন্তু ভুলে  
যেওনা—

ভবেশ ভাবছিল এই হান্তময় স্বনিকা শেষ বোধ  
হয় এখানেই। “মানব জীবনের অনেক ভুল”—তাই  
সে কথাটা মনের ভেতর চেপে রেখে অল্প কাজে ব্যস্ত  
হয়ে পড়ল—পরদিন দুপুরবেলা নিমন্ত্রিত সকলেই  
আসল পুরোহিত ঠাকুর ভবেশের আদেশানুসারে  
বীরেনকে শ্রান্তিস্তের মন্ত্র পড়াইলেন। গুরুদাস  
বাবু ও মোহিনী বাবু বাসার সকলকে নিয়ে  
আসলেন।

প্রভার দিকে চেয়ে বীরেনের চোখে যেন দামোদরের  
বান ডেকে উঠল।

প্রভা খিল খিল করে হেসে বলল—মরা মানুষ যে  
বেচে এসেছে—আর শ্রান্তের মন্ত্র পড়তে হবে না।

“এ যে তোমার আমার গ্রহের কেঁর” ॥



ভিত্তান্ত্রিনী—পদ্য গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ  
দাশগুপ্ত প্রণীত। আমরা এই কবিতা গ্রন্থখানি পড়িয়া  
সুখী হইলাম। সকল কবিতাই প্রসাদ-গুণ-যুক্ত—  
ইহাতে হেয়ালি নাই। রাবীন্দ্রিক যুগে কবি আপনার  
স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। কবিত্বের পরিচয়,

বিশ্বপ্রেম, অতিথি, তমসো মা জ্যোতির্গময়, এসো,  
আনন্দ প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা আমাদের বেশ ভাল  
লাগিয়াছে। পুস্তকের প্রাপ্তিস্থান—বী প্রেস, ৩৩নং  
গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা।



## শিক্ষার ত্রিধারা !

শ্রী সেন গুপ্ত ।

এ সংসারে সবাই শিক্ষাকে শ্রদ্ধা করে, শিক্ষিতের মুখে ছুঁটো কথা শুনে চায়, শিক্ষিতের সঙ্গে বিশৃঙ্খলিত পারলে আপনাকে বস্ত্র মনে করে। কিন্তু শিক্ষা কি, প্রকৃত শিক্ষিত কে, তাহার ঠিক ধারণা প্রায় অধিকাংশেরই নাই। শিক্ষার বিকৃতিকেই তারা প্রকৃত শিক্ষা ভাবে। শিক্ষিত বলে তারা যার পায় শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিতে যায়, সে হয়ত শিক্ষিতের একটা বহিরাবরণ, তার ভিতরটা গোপন করে মানুষকে পদে পদে ঠকাই; তার বিচার বলির বাষ্পের মাঝে আপন ঘৃণিত স্বভাবটাকে অতি সহজেই গোপন করে ফেলে। সাধারণ লোক আশ্র-হারী হ'য়ে যার পিছনে ছোটো, সে জানেনা আশ্রীর বোধে 'আলাদীন' মত কোন মৈত্রেয় পিছনে ছুটেছে। যখন চমক কিরে, তখন আর কিরবার পথ খুঁজে পাওয়া তার হ'য়ে ওঠে।

এক দল লোক আছে, তাদের ধারণা যে যত বেশী পড়েছে, যে যত বেশী জেনেছে, সেই তত বড় শিক্ষিত। তাই যখন শাব্বের দুরূহ শ্লোকগুলি কেউ আওরায়, দর্শন, বিজ্ঞান জ্যানিতির সূত্রগুলি অনর্গল বলে যায় হোমার, সেক্সপীয়র, মিল্টন কিংবা অসম্ভবীয় মহাকাব্য বাঙ্গালী, বেদব্যাস, কালিদাসের কাব্য হ'তে দুচারটা বচন উল্লেখ করে, এ দলের লোক তাদের পানে নির্ভীক বিন্মরে তাকিয়ে থাকে, ভাবে, অগাধ পাণ্ডিত্য তাদের ভিতরেই আশ্রয় নিয়েছে। এদের বক্তৃতায় তারা মুগ্ধ হ'য়ে বাহবা দেয়, চলনভঙ্গীতে পণ্ডিত্যের রস ধারী দেখতে পায়, এরা যে পথ দিয়ে চলে, আপন অঙ্গে সেখানকার ধূলি মেখে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। জানেনা এ শিক্ষিত গণ (?) ( অবশ্য সকলে নয় ) নিজেকে প্রচার করবার লগ্নই ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ওঠে এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে কতকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা শিখে নেয়। তারা যখন বক্তৃতা করে, তখন মাঝে মাঝে একবার চারিধিকে চেয়ে দেখে,

কেউ সে কথায় আকৃষ্ট হচ্ছে কিনা; শ্রোতৃ-মণ্ডলীর বাহবা পেলে মনটা খুশী হ'য়ে ওঠে, ভাবে জীবনটা সার্থক হ'য়ে গেল। কিন্তু যেখানে নাম, যশ লাভের জন্য শিক্ষা, তা অতি অধম শিক্ষা। এরা অনেকেই নিজেদের চরিত্র হয়ত সংশোধন করতে পারে নাই কিন্তু লোককে চরিত্রবান হওয়ার জন্য জলদ-গভীর স্বরে উপদেশ দেয়। নিজেরা হয়ত অতি হীন স্বার্থপর, পরকে তারা স্বার্থশূন্য হতে উপদেশ দেয়। তারা চায় 'নাম'। নাম, যশের জন্য তাহারা অতি কলুষিত কার্যেও লিপ্ত হ'তে বিধা বোধ করেনা। এদের উপদেশও অনেক সময় অস্পষ্ট স্বার্থবোধক থাকে। কতকগুলি প্রতি মধুর বাক্য ছোটোয় শ্রোতাকে সন্তোষিত করিয়া বীরে বীরে ভিন্ন পথে নিয়ে যায়। এরা বাহবা চায়, যশ চায়, এর জন্য সব করতে পারে, কিন্তু যে পথে নাম যশ নাই, সে পথ সর্বমঙ্গলকর হ'লেও তাদের পক্ষে সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য। এরা শিক্ষা পেয়েছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে প্রাণের যোগ নাই, তাই 'বাহবার' জন্য তাদের মিথ্যা আশ্বাসন মিথ্যাতাই বৃথা। এনাম যশের কি মূল্য? এ শিক্ষা অধম শিক্ষা।

আরেক দল শিক্ষিত লোক আছে, যারা নামও চায়, কাজও করে। এরা সত্য সত্যই দেশের উপকারের জন্য ব্যস্ত হয়, পরের জন্য প্রাণ দিতেও পারে কিন্তু নাম-মহিরা পেলে খুশী হ'য়ে ওঠে। এদের প্রাণে যা' পড়েছে, পরের হিতের জন্য এরা ব্যস্ত। তবে ছু'একটা নামের স্বযোগ পেলে এরা আশ্র-বিস্মৃত হয়ে পরে। এক হাতে নামের মহিরা, আরেক হাতে কাজের বিধাণ। এরা কাজের শ্রোত-ধারায় সবচেয়ে ছুটে চলেছে, তবু নামের ঘূর্ণাবর্তে পরে একটু বিহ্বল হ'য়ে পরে। এ ধরনের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মধ্যম থাকের লোক।

অগতে আরেক শ্রেণীর লোক আছে। যারা নাম যশের প্রার্থী নয়। নাম যশের হিসাব করে তারা অগতের কাছে

অগ্রসর হয় না। পূর্ণ জ্ঞান তাদের ভিতর বিকাশ পেয়েছে, আত্মানন্দে তারা আপনাইয়া। তাদের লোকের কাছে বলে বেড়াতে হয়না ওগো আমাকে দেখ, আমি কত বড়। তারা আপনাদিগকে লোকালয়ের বাহিরে, গভীর বনে কিংবা পর্বত গুহায় প্রচ্ছন্ন রাখতে চায়, কিন্তু মানুষ তাদের খুঁজে বাহির করে নেয়। তারা গোপন থাকতে চায় গোপনে, সে গোপন-বিহারীর প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হয় কিন্তু মানুষ তাদের গোপনে থাকতে দেয়না। তাদের হৃদয়ের পরিচয় আপন হ'তে দিকে ও প্রসারিত হয় আর মধুলক মৌন-ছিন্ন মত স্বীকে স্বীকে লোক তাদের আত্মিনায় উপস্থিত হয়। তারা নাম বশ চায়না, মান সম্মন চায়না, এসব তাদের পায়েয় তলয়। যে আনন্দের উৎস তাদের হৃদয়ে উৎসারিত, মীলকঠের মত অগতের গরল পান করেও তারা অমর। লেখাপড়ার জ্ঞান, থাকে সাধারণ লোকে 'শিক্ষা' বলে হয়ত তাদের কেউ করে নাই, তবু তারা যে শিক্ষার ধনে ধনী, জগতে তার তুলনা মিলেনা। শিক্ষার সার তারা পেয়েছে। শিক্ষা তাদের মাঝেই সফলতা লাভ করেছে। মানুষ এ গুরে উঠতে

পারলেই যন্ত হয়ে যায়। তার আর কিছুই চাওয়ার থাকেনা। তারাই উত্তম ও প্রকৃত শিক্ষিত।

জগতে এই তিন শ্রেণীর শিক্ষিত লোক দেখতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে যারা নামের কান্দাল নামের ফেরি করে বেড়ায় তাদের চেয়ে লেখা-পড়া জ্ঞানশূন্য মূর্থ চাষার বল চেয়ে ভাল। তাদের ভিতর সরলতা আছে এবং অগতের কাজে নিজ শক্তিকে প্রাণ পণ করে খাটাচ্ছে। কিন্তু অসরল প্রবঞ্চনা পরায়ণ, বশের কান্দাল, শিক্ষিত নামধারী লোকগণ জগতকে শুধু মিথ্যার পথে নিয়ে চলেছে। যদি আত্মার ও জগতের মঙ্গল সাধন করতে হয়, তবে এই নাম বশের কান্দালবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। সত্যের পথে, আনন্দের পথে নির্বিকার চিত্তে নীরব সাধনা কবে অগ্রসর হ'তে হবে। তা'লেই শান্তি পাওয়া যাবে। নতুন মিথ্যা নাম বশের প্রলোভনে অসত্যের পথে, অজ্ঞানের পথে যেতে যেতে এমন একখানে এসে ঠেঙেতে হবেন, যেখানে এই মিথ্যা বশ, অপবণ হয়ে কীদে চেপে বসবে।

বীণার অন্যতম কার্য্যদক্ষ শ্রীমান  
প্রফুল্লচন্দ্র সেন শৃঙ্গের আকর্ষক মৃত্যুতে  
আমরা গ্রাহক ও অনুগ্রাহক বর্গের নিকট  
গভীর বেদনা জানাইতেছি।

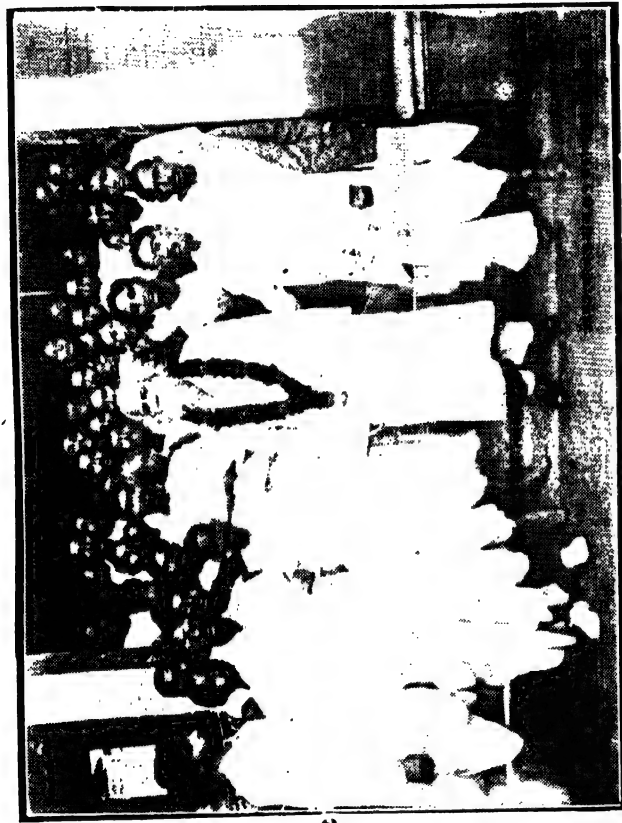
সং বীঃ—



—স্বপ্না—

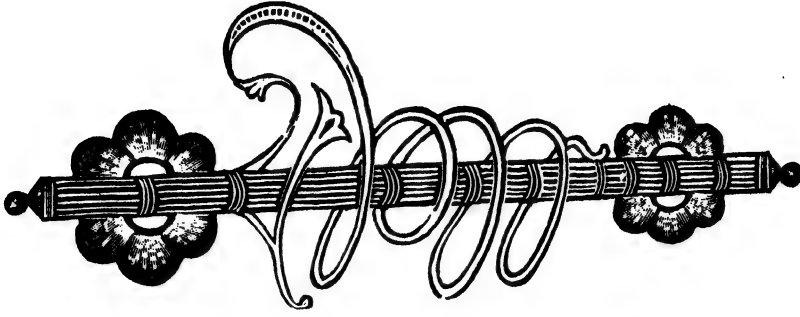
সংগীত

—অজিত—



ঢাকা সাহিত্য-সম্মিলনীর উপলক্ষে  
কবিসভাই ত্রিযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংগীত



## সচিত্র মাসিক পত্র

তৃতীয় বর্ষ ]

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ ।

[ ৩য় সংখ্যা

### আগুণের প্রীতি ।\*

শ্রীকুমুদ-রঞ্জন মল্লিক

সুদূর সুদূর অরোরার দেশ  
পরিধানে পুরা বিদেশীর বেশ  
বিজাতীয় ভাষা সভ্যতা লয়ে  
চলেছি জাহাজে চড়ি,  
উদ্বেল নীল সাগরের জল  
কল কল্লোলে ছুটে অবিরল;  
অর্থবিহীন শব্দের রোল  
শ্রবণ দিতেছে ভরি ।  
বিদেশ বিদেশ একেবারে পর,  
নাই চেনা মুখ, নাই চেনা স্বর,  
সহসা কেমনে চমকি উঠিলু  
পরিচিত সুর শুনি,  
বন্দরে এক জাহাজ উপর  
ছুটিছে মালা লোক লস্কর,  
তাদেরি কণ্ঠে শুনিতে পেলাম  
আগুণ আগুণ ধ্বনি ।

ছোট দুটা কথা তাও ভীতিময়  
এলো মোর কাছে হয়ে প্রীতিময়,  
নয়নে আবার ফুটায়ে তুলিল  
গোটা বাঙ্গলার স্মৃতি,  
ভয়ের পিনিষে কি করিয়া হায়  
এত মধুরস ঢেলে দেওয়া যায়,  
ভয়াল কণ্ঠে কে দিল এমন  
হৃদয় ভোলানো গীতি ।  
বঙ্গভাষারে আগুণের মাঝ  
সীতার মতন নেহারিলু আজ  
হেরি উজ্জ্বল সোণার বাঙলা  
আখি জলে এলো ছেয়ে,  
মাতৃভাষা ! কি দারুণ টান  
এক করে দিল অচেনা পরাণ  
মরি লজ্জায় বিদেশীর দল  
হাসে মুখ পানে চেয়ে ।

\* কোনো বঙ্গমহিলার অরণ-বৃত্তান্ত পড়িয়াছিলাম। তিনি  
সুদূর দূরদেশে এক পৃথক জাহাজে চাউনিয়ার খালসীপনের

মুখে 'আগুণ' 'আগুণ' শব্দ শুনিয়া বিষয়ে পূরকে আহ্বায়া  
হন, তাহার টান এমনি মধুর ।



## গল্প নয় ।

### ত্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

রাত্রি ত্রিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে । শাহান শা তখনও দরবারে বসিয়া আছেন । সম্রাটের বয়স ত্রিশ বৎসর—পূর্ণ যৌবন । শরীরে অসীম শক্তি, মনে অসাধারণ সাহস, প্রাণে সজীবতার, উৎসাহের, উজ্জ্বলতার আর অন্ত নাই, মুখখানি সর্বদা আনন্দের জ্যোতিতে উজ্জ্বলিত ।

সহসা চর আসিয়া দরবার কক্ষে প্রবেশ করিল এবং কুনিশ করিয়া এক পাশে দাঁড়াইল । সম্রাট মুহূর্ত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি খবর ? চর বলিল—গোপনে বলতে চাই, জাহাপনা !

সম্রাট বলিলেন,—এখানেই বল—এখানে সকলেই অন্তরঙ্গ দরবারী ।

চর বলিল, জাহাপনা, ইব্রাহিম হোসেন আজ সম্রাটের হিতকামী রোস্তমকে বধ করেছে—সম্রাটের হিতকামনাই ছিল তাহার একমাত্র অপরাধ । আর এমনি দুঃসাহসী এই হত্যাকারী যে মাত্র আট ক্রোশ দূর দিগে সদলবলে সে চলেছে,—যেন সম্রাটকে সে গ্রাসাই করে না !

ক্রোধে সম্রাটের স্বর্গের মুখমণ্ডল মুহূর্ত্তের জ্ঞান রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—পর মুহূর্ত্তেই আর তাহা দেখা গেল না, কেবল বলিলেন—বেশ, তুমি যেতে পার ।

চর কক্ষ ত্যাগ করিবামাত্র সম্রাট ডাকিলেন,—শাহাবাজ !

নিঃশব্দে দরবারীগণের মধ্য হইতে একটি যুবক উঠিয়া আসিয়া নতবদনে কুনিশ করিয়া দাঁড়াইল ।

সম্রাট বলিলেন—দুপুর রাত,—ঘুমতে চাও, না ঘোড়া ছুটাতে চাও ?

শাহাবাজ মুহূর্ত্তে হাসিয়া বলিল—ঘুমার জীলোকে, জাহাপনা, কোন দিকে যেতে হবে ?

সম্রাট সম্মুখে তাহার পাঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—আজ ভোরে ভগবান দাস, মানসিংহ, কুলি খাঁ, খাঁ বার্মা, আরও সব গেছে মির্জাদের দমন কর্ত্তে । তুমি এক্ষণি ঘোড়া ছুটিয়ে যাও—বল্বে সব যেন সারনাগের দিকে যায়, এই ইব্রাহিমের দমন আমি চাই সকলের আগে ।

“জাহাপনা, ভগবান দাস এরা কোন দিকে গেছে ?”

“জানিনা, রওনা হওয়ার পরে আর কোন খবর পাইনি, তোমাকে খুঁজি নিতে হবে ।”

“ক্রো জুকুম” বলিয়া সেই নির্ভীক যুবক সেই অন্ধকার গভীর রাত্রে সেই অপরিচিত দেশে অজ্ঞাত অবস্থায় ভগবান দাসের দলকে খুঁজিতে বাহির হইয়া গেল ।

দরবারীগণের দিকে চাহিয়া সম্রাট বলিলেন—“ইব্রাহিমের দমনের সম্মান পাবে, ভগবান দাসের দল, না আমরা ?”

দরবারীগণ সম্মুখে বলিয়া উঠিলেন—আমরা—আমরা । মুহূর্ত্তে সকলে দাঁড়াইয়া উঠিলেন—কোষে তাহাদের অসি বনংকার করিয়া উঠিল !

সম্রাট খুসী হইয়া বলিলেন,—সাবাস বীরগণ ! কিন্তু এক্ষণি নয়, শেষ রাত্রে । রাত ছ’ ঘড়ী থাকতে রওনা হবে—সবাই তৈয়ার থেকো । একেবারে খাস চাকর ছ’ একজন ছাড়া সঙ্গে আর বেশী লোক নেওয়া নিষেধ ।

এই সম্রাট যে সম্রাট আকবর তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না । স্থান গুজরাট, আহমদাবাদের মিকট,—কাল ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি—উপলক্ষ আকবরের প্রথম গুজরাট অভিযান ।

কৌতূহলী পাঠক বেভারিঙ্গ কৃত আকবরনামার  
অনুবাদের তৃতীয় খণ্ডের ১৬ পৃষ্ঠা হইতে পড়িয়া  
দেখিতে পারেন যে উপরে লিখিত একটি ঘটনাও  
অনৈতিকহাসিক বা কাল্পনিক নহে।

২

প্রহরখানিক পরে রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকা অবশিষ্ট  
থাকিতে নিঃশব্দে তাঁবুর বাহিরে বিলম্বসহিষ্ণু  
অখারোহী বীরগণ একে একে সমবেত হইতে  
লাগিলেন—আবদালা, জালাল খাঁ, রায়শাল, মথুরা  
দাস, আদম্ তাঞ্জবন্দ এবং আরও পাঁচ সাত জন।

বীরে নাতিদীর্ঘ, বলদর্পিত, বিশাল বক্ষ একজন  
যুবক নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল,  
—প্রতি পাদক্ষেপে যেন তাহার অঙ্গ হইতে সেই  
অন্ধকারেও রাজকী ফাটিয়া পড়িতেছিল—রাজটীকা  
ললাটে পরাইয়াই যেন বিধাতা তাহাকে ধরায় পাঠাইয়া  
ছিলেন। পিছনে পিছনে অমুচর দৃষ্ট অশ্বের বরা  
ধরিয়া আনিল। সকলে নিঃশব্দে মাথা নত করিয়া  
যুবককে অভিবাदन করিল।

যুবক মুহূর্ত্তে জিজ্ঞাসা করিল—করজন?

তেমনি স্বরে আদম তাঞ্জবন্দ উত্তর দিল—এগার  
জন।

“বেশ,—দিলাওয়ার খাঁ, তাঁবুর পাছাড়ায় থাক।”

অন্ধকারে দেখা গেল না, কিন্তু এই আদেশ  
শুনিয়া দিলাওয়ারের মুখখানা যে মলিন হইয়া গেল,  
তাহা তাহার নত বদন দেখিয়াই বুঝা গেল।

“জাহাপনা, এ বান্দাকে বিনা দোষে সঙ্গে যাইবার  
সম্মান হইতে বঞ্চিত করিতেছেন!”

“তার চেয়ে বড় সম্মান তোমাকে দিবে গেলাম,  
তুমি দেখবে, আমি অল্প অমুচর নিয়ে হুঃসাহসিক  
কাজে রওনা হয়েছি এই আশঙ্কায় আর কেউ আমার  
সাহায্য করতে রওনা হয়ে যেন আমার অপমান না  
করে। চালাও—”

একলক্ষে সম্রাট ঘোড়ায় চড়িয়া ঘোড়া ছুটাইয়া  
দিলেন—পিছনে টকাটুক টকাটুক দশ ঘোড়ার চল্লিশ

কদমে নির্জন পথ শব্দায়মান হইয়া উঠিল। একটু  
দূরে তাহারও পিছনে ছুটিল আরও জনত্রিশেক অমুচর।

কাহারও মুখে কথা নাই—সকলেই অবিজ্ঞান  
চলিয়াছে—আকবর সকলের অগ্রে। তাঁহারও অগ্রে  
একজন পথপ্রদর্শক। ক্রমশঃ পূর্বাকাশ লোহিত রাগে  
রঞ্জিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কৈ, এতক্ষণে তো শত্রুর  
নিকটে শৌছিবাব কথা। তবে কি ইব্রাহিম টের  
পাইয়া পলাইয়া গেল? ক্ষণেকের জন্ত আকবর  
রশ্মিগৎযত করিলেন—অখারোহীগণ সকলেই থামিল।

আকবরের আছবানে পথপ্রদর্শকগণ মুখ মলিন  
করিয়া আসিয়া সম্রাটের নিকট দাঁড়াইল। বলিল,—  
জাহাপনা,—পথ ভুল করেছি, আমায় শাস্তি দিন।

সম্রাট হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা, শাস্তি সময়মত  
পাবে,—এখন যাও, এই দূরের বস্তিতে জিজ্ঞেস করে  
পথ জেনে এস।

পথ-প্রদর্শক পথ জানিতে চলিয়া গেল, যোদ্ধাগণ  
ললাটের ঘর্ষ মুছিয়া ফেলিলেন। হিন্দু নায়কগণ  
উদীয়মান দিনকরকে ঘোড়ার উপর হইতেই নত  
মস্তকে বন্দনা করিলেন।

জালাল খাঁ বলিল,—জাহাপনার যাত্রাটা বড় সুবিধার  
হয় নাই, প্রথমেই রাস্তা ভুল!

ঠিক এমনি সময়ে দেখা গেল দূরে একটি হরিণ  
ঘাস খাইতেছে। হস্ত একদল হরিণই বনাস্তরালে  
চরিতেছিল, - কিন্তু মাঠের প্রান্তে দেখা গেল মোটে  
একটিকে!

আকবরের শিকারের সখ ছিল অসামান্য! এমন  
কি শেষ রাত্রের এমন অদ্ভুত রণযাত্রায়ও তাহার  
প্রধান শিকারী ঘোড়ার উপর চড়াইয়া শিকারী বাজ  
ও ক্ষুদ্রকায় চিতা বাঘ লইয়া সম্রাটের অনুসরণ করিতে  
বিরত হয় নাই।

সম্রাট হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা, দেখা যাক জালাল  
খাঁর কথা সত্য কি না! রোস্তম খাঁ,—চিতা,—

রোস্তম খাঁ ঘোড়া ছুটাইয়া আকবরের পাশে  
আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার ঘোড়ার জিন সাধারণ

জিন অপেক্ষা পিছন দিকে একটু বেশী বিস্তৃত, আরোহীর পিছনে সেই বিস্তৃত অংশের উপরে একটি বহুমূল্য বস্ত্রের থলিয়া, জিনের সঙ্গে বেশ সুচারুরূপে সম্বন্ধ। আকবর ডাকিলেন, সমন্-মাণিক। শুনিবামাত্র সেই থলিয়া নড়িয়া উঠিল, এক লম্ফে তাহার ভিতর হইতে যে জানোয়ারটি বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে একটি বৃহদাকার বিড়াল বলিলেও চলে। থলিয়া হইতে বাহির হইয়াই দিব্য সপ্রতিভ ভাবে সে আকবরের কোলে লাফাইয়া পড়িল। আকবর তাহাকে একটু আদর করিয়া দূরে বনাস্থে দণ্ডায়মান হরিণটির দিকে তাহার মুখ ফিরাইয়া কানে কানে কি বলিলেন। অমনি একলম্ফে ঘোড়া হইতে প্রায় ১০ হাত দূরে বাইয়া সে পড়িল এবং হরিণকে লক্ষ্য করিয়া বিহ্বলবেগে ছুটিল। হরিণও এতক্ষণে আসন্ন বিপদ বুঝিয়া এক লম্ফে বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। সমস্ত ব্যাপারটি সমাধা হইতে বোধ হয় একমিনিট সময়ও লাগে নাই।

যোদ্ধাগণ রুদ্ধভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—  
কি হয়। কি হয়!

বীর শিকারী রোস্তম খাঁর কাণ খাড়া ছিল তাহার পরম আদরের চিতা। “সমন্-মাণিকের” গতি পথের দিকে। সহসা দূরে চিতার কণ্ঠ শুনা গেল এবং রোস্তম সোমাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—জাহাপানা, পড়েছে—পড়েছে,—পর মুহূর্তেই সে জঙ্গলের দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। শিকারসহায়ক অমুচর কয়েকজনও তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল। অনতি-বিলম্বেই তাহার ফিরিয়া আসিল—রোস্তমের কোলে তাহার সমন্-মাণিক,—অমুচরগণ ঘোড়ার পাঠে চড়াইয়া গিয়া আসিল হতভাগ্য ছিন্নকণ্ঠ রক্তাশ্রুত হরিণের দেহ!

আকবর সমন্-মাণিককে রোস্তমের নিকট হইতে নিয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন—জালাল খাঁ, কি মনে হয়, ব্যাটা কি অশুভ?

৩

দ্বিপ্রহরে একস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া শূলপক হরিণের মাংসের সহিত নিজ নিজ গৃষ্ঠে বাহিত রুটি চর্বণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া যোদ্ধাগণ আবার ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছিলেন। বেলা যখন মাত্র আর ৪।৫ দণ্ড আছে এমন সময় রাস্তায় এক ব্রাহ্মণের সহিত যোদ্ধাগণের দেখা হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল—সারনাগ সহর আর অল্প দূর, বিদ্রোহীগণ তথায়ই রাজি যাপনের ব্যবস্থা করিয়াছে। সারনাগ পৌছিতে আর এক ঘণ্টাও লাগিবে না।

এইবার আক্রমণ-পদ্ধতি স্থির করিতে পরামর্শ আরম্ভ হইল।

জালাল খাঁ বলিল—আমরা সবশুদ্ধ মাত্র চল্লিশজন, আর বিদ্রোহীরা বোধ হয় দুই হাজারের কম নয়। দিনের বেলা আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

আকবর ভ্রতঙ্গী করিয়া বলিলেন,—ভয় পেয়েছ, জালাল খাঁ? প্রাণের মায়ী কি এতই বেশী?

জালাল খাঁ কাতর হইয়া বলিল,—জাহাপানা, জালাল খাঁর প্রাণের মায়ী কত তার প্রমাণ অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে হ’য়ে গেছে। আপনার প্রাণের উপর আমাদের মায়ী সত্যি বড় বেশী।

আকবর হাসিয়া জালাল খাঁর পাঠ চাপড়াইয়া বলিলেন,—তা জানি বন্ধু, তাই প্রাণটাকে বার বার যাচাই করে দেখছি সত্যি এটার কোন মূল্য আছে কিনা! রাত্রির অন্ধকারে আক্রমণ—শত্রুমিত্র চেনা যাবে না—ও আমি পারব না। আর ওটা আমার কাছে যেন জাল জুরাচুরীর মত মনে হয়, আত্মাটা সঙ্কুচিত হয়ে যায়। কোন ভয় নাই বীরগণ, সাহসে বুক বাঁধ—আমরা চল্লিশ জনে চল্লিশ শত্রু নিপাত তো প্রথমেই করব, তার পরে দেখতে চাই কজন ফের দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে!

আবদালা বলিল,—জাহাপানা একদিন বলেছিলেন এক মরদ হাতী দশ শত্রু মারে—আমরা এক এক জনে দশ দশ জন মারব, পরে অল্প কথা,—

আকবর সোম্মালে চাঁৎকার করিলেন—কেদ্বাং  
বহত আচ্ছা,—চালাও।

আবার ঘোড়া ছুটল এবং কিছুক্ষণ পরেই একটি  
পাহাড়ের মাথায় সারনাগল সহর যেন একখানি ছবির  
জায় আকাশের পটে ভাসিয়া উঠিল। সম্মুখেই মাছী  
নদী। উহা উত্তীর্ণ হইয়া সারনাগলে পৌঁছিতে হইবে।

আকবর ডাকিয়া বলিলেন—বজ্রগণ, বড় গরমীর  
সময় আসচে, এবার ঠাণ্ডা জামাটা গায়ে দিয়্যে ফেল।  
অমুচরকে নিকটে ডাকিয়া তাহার নিকট হইতে  
ইম্পাতের মোটা তারে গড়া ঠাস্ বুনানীর আমার  
আকারে নিশ্চিত বর্মটা চাহিয়া লইলেন, অমুচর  
পরিতে সাহায্য করিল। ঘোড়াগণ সম্রাটের ইঙ্গিত  
মত সকলেই বর্ম পরিধান করিতে লাগিল।

ঠিক এমন সময় দেখা গেল ঘোড়ার খুড়ের ধূলার  
রাস্তা অন্ধকার করিয়া একদল অঝোরোহী আসিতেছে।

আকবর ডাকিয়া বলিলেন—হুসিয়ার—বীরগণ—  
মুহুর্ত্তে সকলে দশ দশ করিয়া চারি দলে বিভক্ত  
হইয়া খাপ হইতে তরবারী খুন্সিয়া দাঁড়াইল—কাহারও  
মুখে কথা নাই।

কিছু পরেই আকবরের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল—  
তিনি হাসিয়া তরবারী কোষবদ্ধ করিয়া ডাকিয়া  
বলিলেন—মিত্র পক্ষ,—ভগবান দাসের দল!

দেখিতে দেখিতে নূতন দল নিকটে আসিয়া  
পড়িল—সর্বাগ্রে ভগবান দাস, তাহার পশ্চাতে  
বিশ্রুতকীর্ত্তি মানসিংহ, এবং আরও নয়-দশজন সেনা-  
নায়ক। সঙ্গে তাহাদের প্রায় দেড়শত বাছা বাছা  
ঘোড় সোয়ার।

ভগবান দাস আসিয়া কুর্ণিশ করিলে আকবর  
মুখ ভার করিয়া বলিলেন—রাস্তার ঘুমাইয়া  
পড়িয়াছিলে বোধ হয়?

“জাহাপনা, শাহাবাজকে জিজ্ঞাসা করুন, কত  
ঘুমাইয়াছি! সারা রাস্তা কেবল জাহাপনার শিরহীন  
দেহ স্বপ্ন দেখাইতে দেখাইতে যেন জিনে উড়াইয়া  
আনিয়াছে।”

আকবর হাসিয়া বলিলেন—গোস্তাকি! যাও,  
তোমরা ফিরে যাও—তোমাদেরে যুদ্ধ করতে দেওয়া  
হবে না।

বিশেষ বিবরণ শুনিয়া বুঝা গেল,—শাহাবাজও  
অন্ধকার রাত্রে অনেক ঘুরিয়াছে এবং আকবরের দল  
কোন দিকে গেল তাহা খুজিতে ভগবান দাসের  
দলকেও অনেক ঘুরিতে হইয়াছে।

মানসিংহ অগ্রসর হইয়া বলিল—জাহাপনা, পিছনে  
পড়েছিলাম, অপরাধ হয়েছে, এবার প্রায়শ্চিত্ত  
করতে চাই, সর্বাগ্রে নদী পার হতে চাই।

আকবর হাসিয়া বলিলেন—আমরা দলে কজন  
বা লোক এর আর আগপাছ নেই,—সবাইকে এক  
সঙ্গে নদী পার হতে হবে,—আচ্ছা মানসিংহ, তোমার  
আরজী মঞ্জুর। তুমি নদীতে নামলেই আমরা সবাই  
একসঙ্গে নদীতে নেমে পরব।

একটা ঢালু যায়গা দেখিয়া মানসিংহ সাবধানে  
ঘোড়া চালাইয়া নদীতে নামিয়া পড়িলেন—অমনি  
বাকী সব যেন যেমনে পারিল নদীতে নামিয়া পড়িল।  
নদীর তোর দেখিয়া সকলেই আশঙ্কা করিয়াছিল যে  
সাঁতার জল হইবে—নামিলে কিন্তু দেখা গেল যে  
ঘোড়া হাটিয়াই পার হইতে পারিল। স্রোতের বেগে  
হুই এক জনের ঘোড়া কতকদূর ভাসিয়া গেল বটে  
কিন্তু বেশীদূর নহে।

অঝোরোহীদল নদীর মাঝামাঝি গিয়াছে এমন  
সময় শন্-শন্, ঠক্ করিয়া একটা তীর আসিয়া  
অগ্রগামী মানসিংহের বর্মে ঠেকিল।

আকবর ডাকিয়া বলিলেন,—হুসিয়ার, মানসিংহ!  
নদীতীরে শত্রু পাহারা আছে! দেখা গেল জন পাঁচেক  
ধনুকধারী অঝোরোহীগণকে লক্ষ্য করিয়া পার হইতে  
তীর ছুড়িতেছে। মানসিংহ জিনসংলগ্ন বন্দুক  
উঠাইলেন।

“এই রাজপুতগণের মাথায় যদি বিন্দুমাত্র  
মগজ থাকে! ও কর কি? বন্দুক ছুড়না—শব্দ  
কেনে যদি শত্রু এসে পড়ে তবে এই খাড়া পাড়

বেয়ে নদী হতে আর উঠতে হবে না” — বলিতে বলিতে আকবর জিন্ সংলগ্ন ক্ষুদ্র সুগঠিত ধনু তুলিয়া লইয়া তাহাতে জ্যা আরোপণ করিলেন। শন্ শন্ শন্ শন্ শন্ শব্দে পাঁচটা তীর পর পর আকবরের ধনু হইতে ছুটিয়া গেল—পাঁচ জন শত্রুই ভুলুঙিত হইল, —তিনজন একেবারে পারে দাঁড়াইয়াছিল—গড়াইয়া নদীর মধ্যে আসিয়া পড়িল।

“শাহান শার সমস্ত শত্রু এইরূপে নিপাত হউক” — বলিয়া মানসিংহ অল্প জল পাইয়া ঘোড়া চালাইয়া দিলেন। খাড়া পার বাহিয়া ঘোড়ার উঠিতে কষ্ট হইবে দেখিয়া একলক্ষ গুলু ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া বন্না ধরিয়া ঘোড়াকে টানিয়া লইয়া দৌড়িয়া পারে যাইয়া উঠিলেন।

দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহীগণ যে যেমনে পারিল পারে যাইয়া উঠিল। আহত প্রহরীগণের একজন যাইয়া ইতিমধ্যে সহরে খবর দিয়াছিল এবং তথায় বিষম সোর গোল পড়িয়া গিয়াছিল। এই সঙ্গীর্ণ গুলি সমাকীর্ণ ক্ষুদ্র সহরে যুদ্ধ ও আত্মরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া ইব্রাহিম হোসেন সদলবলে সহরের পশ্চাতে এক উচ্চ স্থানে যাইয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সহরের সম্মুখের দরজার ইব্রাহিম যে কয়েক জন প্রহরী রাখিয়া গিয়াছিল তাহারা তো প্রথম আক্রমণেই যেন ঝড়ে উড়িয়া গেল। তেমনি ঝড়ের বেগে সম্রাটের দল সারনাথ সহরের মধ্য দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া অগ্রসর হইল। সকলের আগে চলিয়াছেন সম্রাট নিজে— ভগবান দাস কষ্টে তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। মানসিংহ কয়েক জন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পিছনে পড়িয়া গিয়াছেন। ভগবানের ভ্রাতা ভূপৎ বীরের মত যুদ্ধ করিয়া ইতিমধ্যেই বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন।

কিন্তু ঐ যে অসমসাহসী নির্ভীকহৃদয় সম্রাট বিপদে দৃকপাত মাত্র না করিয়া, কে পড়িল কে উঠিল, তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে কেহ আছে কিনা, তাহার বিচার মাত্র না করিয়া রণ-মন্ডে মাতিয়া শত্রু মারিতে

মারিতে অগ্রসর হইতেছে, সে কি একটিবারও বিবেচনা করে না যে তাহার একলার জীবনের উপর মোগল সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা নির্ভর করিতেছে? আকবর মৃত ভূমিতে তো কথাই নাই, আকবর শয্যাগত শুনিলেও হিন্দুধানের সর্বত্র বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে এবং তাসের প্রাসাদের মত সেই সম্ভ্রান্তে নব-গঠিত মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। সে কি নিজেই দৈব-রক্ষিত বলিয়া মনে করে? শত্রুর অস্ত্র কি তাহাকে স্পর্শ করিতে ভয় পায়?

এই রকমই ছিল আকবরের চরিত্র এবং এই বিচারবিতর্কহীন দুঃসাহসই তাঁহাকে তাঁহার অমুচরবর্গের এমন প্রাণাপেক্ষা প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

সহর হইতে বাহির হইবামাত্র শত্রুর দল চোখে পড়িল। উন্নত ভূমির উপর রণসজ্জায় তাহার আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতেছে।

সহসা তিন জন অশ্বারোহী শত্রু অগ্রগামী আকবর ও ভগবান দাসকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। একজন ভগবানদাসকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিল, নিজের হাতের বর্শার আন্দোলনে উহাকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিয়া এক আঘাতেই ভগবান তাহাকে ধংশায়ী করিলেন। অত্র দুই জন ইত্যবসরে আকবরকে আক্রমণ করিল। দুই ধারে কাঁটা গাছের কোপ—সম্মুখ হইতে দুই শত্রু আক্রমণ করিতে আসিতেছে—এক লক্ষ্যে আকবরের সুশিক্ষিত অশ্ব কাঁটা গাছ ডিঙ্গাইয়া পার্শ্বে অনেক দূরে যাইয়া পড়িল। এই সময় ভগবান দাস আসিয়া উপস্থিত হইতেই আততায়ী দুই জন পলাইয়া গেল। ইত্যবসরে অত্যাচার অশ্বারোহীগণও আসিয়া পৌঁছিল এবং সকলে মিলিয়া প্রবল বাতায়র মত যাইয়া শত্রুর উপর পড়িল। শত্রুর দুই হাজারের দল এই দুই শত দুর্দর্ষ যোদ্ধার আক্রমণে দেখিতে দেখিতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সরিয়া পড়িল। শত্রুজয় করিয়া আকবর পরের দিন নিজের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।

ইংরেজীতে যাহাকে বলে Reckless এবং যাহার প্রতিশব্দ আমরা বানাইয়াছি বেপরওয়া আকবর ছিলেন তাহাই। উপরে তাহার এক মূর্তি দেখাইলাম, আচ্ছা, তার আর একটি মূর্তিও দেখান যাক্।

সারনালের যুদ্ধের কয়েক মাস পরের কথা। শুজরাট অভিযান সাফল্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে—সুৱাট দুর্গের পতন হইয়াছে, শাহান শার দিল্ বেশ প্রক্লম। রাত্রিতে অন্তরঙ্গগণ লইয়া বৈঠক বলিয়াছে, প্রত্যেকের হাতেই সুৱাপাত্র—ঘন ঘন পাত্র নিঃশেষ হইতেছে। পদ মর্যাদার পার্থক্য প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—যেন এক দল ইয়ার, ইয়ারকিতে একেবারে মসৃণ!

আকবর বলিলেন—বাবা মানসিংহ, তোমরা রাজপুত, যুদ্ধ করিতে জান বটে, কিন্তু তোমাদের মাথায় মগজ আদবেই নাই।

ভগবান দাস জড়িত স্বরে বলিল—আলবৎ আছে, একেবারে ঠাসা—এই দেয়ালে মাথা ঠুকে দেখাতে পারি এক শুতোয় একেবারে এক পিপা মগজ বেরিয়ে আসবে।

কেহ থামাইবার পূর্বেই ভগবান দাস এমন জোরে দেয়ালে ঘাইয়া মাথা ঠুকিল যে অমনি অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে লোটাইয়া পড়িল। অল্পচরগণ তাহাকে উঠাইয়া অন্ত প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল এবং শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

আকবর বলিলেন—দেখলে বোকা রাজপুত বেটার আকল?—বেটা মাথার খুলি ভেঙ্গে আমাকে মগজ দেখাবে; আরে মাথার খুলির ভিতর মগজ তো গাধারও আছে! মগজ কাজে খাটাতে পারলে তবে তো হয়! সংগ্রাম সিংহের মাথায় কি মগজ ছিল না—কিন্তু খাটাতে পারলে কই?

“মগজ ছিল জাহাপান্না, কিন্তু খাটাতে পারলে না—পারলে না”—বলিয়া এক রাজপুত ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

আদম তাজবন্দ বলিল,—‘কিন্তু সাহস আছে, মগজ বেশী থাকলে সাহস আবার তেমনি কম থাকে।’

ক্রন্দন পরায়ণ রাজপুত অমনি ক্রন্দন থামাইয়া বীর দর্পে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আলবৎ সাহস আছে—খুব আছে—অনেক আছে।

“সাহস মোগলেরও আছে।”

“না, রাজপুতের মত সাহস। কই দেখাও দেখি বাপধন! পারবে? আমরা কি করি জান? এক থানা দোরোখা বর্শা লই—মধ্যে বাট—হুঁধারে দুখানা যুথ—একজন বাটে ধরে, অন্য দুজনে হৃদিক থেকে ছুটে গিয়ে বর্শার উপর পড়ি—বাস্—বর্শা একদম পীঠ দিয়ে ফুড়ে বের হয়। পার তোমরা? রাজপুতকে ঠকিয়ে যুদ্ধ জয় কত্তেই পার—এ আর পারতে হয় না।”

রাজপুত বীর বুক ফুলাইয়া কক্ষমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল!

হঠাৎ আকবর লাফাইয়া উঠিলেন,—আলবৎ পারি—এক শ’ বার পারি।

নেশা তখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। কি যে হইতেছে তাহার ফল যে কি, তাহা বিবেচনা করিবার মত শক্তি তখন বড় কাহারও ছিল না। তামাসা দেখিবার উৎসাহে তখন সকলে আকবরের দিকে কঁুকিয়া পড়িল।

আকবর টলিতে টলিতে কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া দেয়ালে টামাইলেন এবং তজ্জনৌ ও অক্লুষ্ঠ দিয়া তাহার অগ্রভাগ তুলিয়া লইয়া নিজের বক্ষে স্থাপিত করিলেন।

রাজপুতের দিকে চাহিয়া বলিলেন—“কেমন পারি কি না?”

রাজপুত বীর মাথা নাড়িয়া বলিল—না পারেন না—মোগলের সে সাহস নেই—পারলে এতক্ষণে পীঠ দিয়ে তরবারির কলা বেরিয়ে আসত!

আকবর পৃষ্ঠ দেশে হাত দিয়া দেখিলেন—

তরবারির ফলা সতাই তখনও বাহির হয় নাই। বলিলেন—“আচ্ছা, এবার ঠিক বেরবে।”

মানসিংহ মদটা তখন পর্য্যন্ত কিছু কম করিয়া থাইত—সে প্রায় প্রকৃতিস্থই ছিল, সে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—জাহাপনা, একি করচেন? একনি যে রক্তগঙ্গা হয়ে যাবে।

আকবর শুধু বলিলেন,—সরে যাও, আমি পারি, এই দেখ পারি—

সহসা মানসিংহের বস্ত্র মুষ্টি ছুটিয়া গিয়া আকবরের বক্ষে পড়িল—তরবারি ছাড়িয়া দিতেই আকবরের তর্জনি ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্য স্থান কাটিয়া হাত রক্তে ভাসিয়া গেল।

মানসিংহের মুষ্টিগাঘাতে আকবর ভূমিতে লোটাইয়া পড়িয়াছিলেন। পর মুহূর্ত্তেই লক্ষ দিয়া উঠিয়া সেই মহামল্ল মোগল সম্রাট মানসিংহকে কুস্তির প্যাচে আপটাইয়া ধরিলেন। মল্ল বিজ্ঞান মানসিংহও কম পারদর্শী নহেন। তখন কীচক ও ভীমের মত এই দুই মল্ল বীর একবার এ উপরে—আবার ও উপরে এই ভাবে যুদ্ধিতে লাগিলেন। কাটা হাতের বেদনায় ক্রম্বেপ নাই, রক্তে উভয়ের বস্ত্র রঞ্জিত হইতেছে সে

দিকে আকবরের দৃষ্টি নাই!—কিছুক্ষণ ধন্যভাবিতর পর মানসিংহকে ভূমিতে কেলিয়া আকবর তাহার বৃকে চাড়িয়া বলিলেন এবং এমন জোরে মানসিংহের গলা টিপিয়া ধরিলেন যে মানসিংহের প্রাণ যায় আর কি! ওমরাহগণ এতক্ষণ তামাসাই দেখিতেছিলেন এবং বাহাবা দিতেছিলেন—এক্ষণ ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া সৈয়দ মুজাফর বাইদা দুই জনকে ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বস্ত্রমুষ্টি ছাড়ায় কাহার সাধ্য! অবশেষে সম্মুখিত হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী পিছন দিকে মোচড়াইয়া ধরিলে বেদনায় আকবর মানসিংহকে ছাড়িয়া দিলেন। মানসিংহকে কয়েক জনে টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল।

পরদিন প্রাতে যখন উভয়ের দেখা হইল তখন হাকিম আকবরের কাটা হাতের চিকিৎসা করিতেছে। আকবর হাসিয়া বলিলেন,—নাঃ—রাজপুতেরও যে মাথায় মগজ আছে এবং সময়মত তার ব্যবস্থা সে করতে পারে—কাল রাতে তার প্রমাণ হয়ে গেছে।

পাঠকগণকে আবার মনে করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে বর্ণিত ঘটনাগুলি গল্প নহে, ইহাদের অধিকাংশ ব্যাপারের বর্ণনাই আকবর-নাশাতে আছে।

## অশ্রুহীরা

শ্রীকালিদাস রায়।

( সাদীর ভাবানুসরণে )

ফটিকের বেদী কিবা                      বিভুর চরণ বিভা-

ছটা জালে জ্বলে,

ভক্তগণ তার মাঝে                      সানন্দ শরণে রাজে

স্বচ্ছ কুতূহলে।

লুক্ক মন যদি তথা                      সাধী হ'তে ব্যাকুলতা,

শোন উপদেশ,

অশ্রুহীরা খণ্ড দিয়া                      ফটিকেরে বিদারিয়া

করনা প্রবেশ।



## নিশীথের আলো

শ্রী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ক্ষুদ্র গ্রামটির অনতিদূরে গ্রাম্য নদী প্রবাহিত।  
ফাস্তন চৈত্র মাসের দিকে জল আগে এক হাঁটুর বেশী  
থাকিত না, সংস্কার করানোর ফলে এখন অনেক জল  
থাকে। বর্ষায় নদী-বক্ষে ঢল নামিয়াছে, একটা নদী  
ফুলিয়া দশটা হইয়াছে, ঈষৎ আরক্তিম জল ঘুরিতে  
ঘুরিতে ছুটিয়াছে।

নদীর ঘাট পর-পর যতগুলি আছে সবই মাটির,  
একটা মাত্র বাঁধা ঘাট আছে সেটা জমীদার বাড়ির।  
গ্রামের কেহ সে ঘাটে বাইত না, ইহারো অত্র ঘাট  
ব্যবহার করিত।

প্রগতি অবসরকালে প্রায়ই আসিয়া এই নিম্নক  
নদীর তীরে বসিয়া থাকিত। এই নির্জন তীরটিকে  
তাহার বড় ভাল লাগিয়াছিল, সে বাসাতেও আর  
টিকিতে পারিত না।

সে দিন আকাশখানা বাদলমেঘে ছাইয়া ফেলিয়া-  
ছিল; ঠাণ্ডা বাতাস সোঁ। সোঁ করিয়া নদীর বুকের  
উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। নদীর দু'পারে  
বাবলাগাছগুলিতে হরিদ্রা রঙ্গের ফুল ফুটিয়া গাছ  
আলো করিয়াছিল। দু'পরে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া  
গিয়াছিল, সেই জলে ভিজিয়া ফুলগুলো ভারি হইয়াছিল,  
বাতাস লাগিতে বন্ বন্ করিয়া বৃষ্টিধারার মত বরিয়া  
তলা বিছাইয়া ফেলিতেছিল।

প্রগতি ঘাটের পাশে যে একটা গাছের মূল কাটা  
পড়িয়াছিল তাহার উপর বসিয়া শ্রান্ত নরনে নদীর

দু'ধারের সুন্দর দৃশ্য দেখিতেছিল। তাহার মনে  
কলিকাতার কথা জাগিতেছিল,—একখানা স্নেহমাখা  
বাড়ীর কথা তাহার হৃদয়ে ভাসিয়া উঠিয়াছিল—যে  
বাড়ীটিতে সে এতকাল ছিল। জীবনে কখনও সে  
কলিকাতা ছাড়িয়া বাহির হয় নাই। আগে কলি-  
কাতা ছাড়িয়া বাহির হইবার নাম শুনিলে তাহার  
প্রাণ শুকাইয়া উঠিত, সেই কলিকাতা ছাড়িয়া সে  
আজ কতদিন এখানে রহিয়াছে, আসিয়াও তো  
বেশই আছে। আগে সে ভাবিত বাংলার কোথাও  
পল্লীগ্রামে যদি যাইতে হয় সে মরিয়া যাইবে, কিন্তু সে  
তো মরে নাই।

একটু মৃদু হাসির রেখা তাহার ওষ্ঠে ভাসিয়া  
উঠিল, মরিব ভাবে সবাই—সেই শুধু একলা  
মরিব ভাবে নাই। শরৎও একদিন তাহারে এই  
কথাই বলিয়াছিলেন, কারণ তিনি জানেন যাহারা  
কলিকাতাবাসী তাহারা পল্লীগ্রামের নাম শুনিলে  
শিহরিয়া উঠে। অথচ এই পল্লীগ্রামের সকল সৌন্দর্য  
লুণ্ঠন করিয়াই সহর আজ সৌন্দর্যমণ্ডিত, শীর্ষস্থানীয়  
হইয়াছে।

অদূর হইতে শিশুকণ্ঠের আর্ন্ত চিৎকার প্রগতির  
কাণে আসিল, সে চাহিয়া দেখিল একটা অস্থিচর্মসার  
শিশুকে আর কয়েকটা সবল শিশু আক্রমণ করিয়াছে,  
সেই রুগ্ন শিশুটি প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাদের হাত হইতে  
মুক্ত হইয়া পলাইয়া আসিতেছে।



দুর্কলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার-স্মৃতি স্বাভাবিক  
এ ক্ষেত্রে ও তাহাই ঘটয়াছিল। কাছাকাছি আসিয়া  
রুগ্ন দুর্কল ছেলেটা পড়িয়া গেল, সবল ছেলের দল  
মহানন্দে তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

“এই,—এই ছেলেগুলো—”

বিস্মিতনেত্রে প্রণতি চাহিয়া দেখিল শরৎ তাহা-  
দের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে  
দেখিবামাত্র ছেলেগুলি সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল,  
দুর্কল ছেলেটা আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল।

তাহার কঙ্কালসার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে  
শরৎ তিরস্কারের সুরে বলিলেন, “ফের বেরিয়েছিস  
মাণিক, তোকে না হাজার বার বারণ করেছি বাড়ীর  
যায় হস্ নে ?”

মাণিক চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধকণ্ঠে কি বলিল  
তাহা শোনা গেল না। তাহার উত্তর শুনিয়া শরতের  
মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল, “আঃ, তোকে নিয়ে  
আমি ভারি মুশ্কেলই পড়েছি।”

তাঁহার চোখ প্রণতির উপর পড়িতেই তিনি  
অগ্রসর হইলেন, তাঁহার হাত সেই রুগ্ন ছেলেটা শক্ত  
করিয়া ছই হাতে জড়াইয়াছিল। প্রণতি সপ্রতিভ-  
ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিল,  
“ছেলেটাকে পেয়েছেন বুঝি ?”

প্রতি-নমস্কার করিয়া শরৎ বলিলেন, “তাই বটে ;  
ধুন্ধন, একরকম কুড়িয়ে পাওয়া। এ একটা বাগদীর  
ছেলে ; এর বাপের আর কেউ না থাকায় আমার  
হাতে একে দিয়ে বুলাবনে না কোথায় চলে গেছে।  
যদি তখন সহজ জ্ঞান থাকত তা হলে কি নিতুম ?  
নিশ্চয়ই শুনেছেন আমি মাতাল, বন্ধ মাতাল যাকে  
বলে তাই। মদ খেলে যে সময় জ্ঞান থাকে না সেই  
সময় আমাকে দিয়ে অনেকে অনেক কাজ করিয়ে  
নেন। এর জন্তে আমার শেষে পস্তাতেও হয় বড়  
কম নয়।

সে কেমন অসঙ্কোচে বলিয়া গেল সে  
মাতাল—মদ খাইলে তাহার এতটুকু জ্ঞান থাকে না।

প্রণতি এই সরল সত্য কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া  
তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

শরৎ তাহার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন,  
“ভাবছেন আমি কেমন করে অসঙ্কোচে বললুম  
আমি মাতাল। দেখুন, সত্যি কথাটা যত বেশী  
ব্যবহার করতে পারা যায় ততই ভাল। মিথ্যে তো  
আছেই ; আমাদের এই জীবনটাই যখন মিথ্যে তখন  
আমরা মিথ্যাকে ছাড়াতে পারছি কই ? তবু এই  
মিথ্যার মধ্যেও সত্যিটাকে যদি এতটুকুও ব্যবহার  
করতে পারা যায় তাতে পাপ হয় না। এটা সর্ব-  
সম্মত কথা যে আমি পূর্ণমাতাল, আপনিও নিশ্চয়  
এ কথা শুনেছেন। আমার জমীদারি বড় কম নয়  
তা জানেন। এর মধ্যে এমন কেউ নেই যে জানতে  
পারে নি আমি মাতাল। আপনিও এদেশে  
পদার্পণ করবামাত্র এ কথা শুনেতে পেয়েছেন।  
আমিও মিথ্যার মুখোঁস পরে জানাতে চাইনে আমি  
মাতাল নই। আমি যা তা বলতে দোষ কি তা  
বলুন।”

প্রণতি কথার কোন জবাব দিল না, শুধু চাহিয়া  
রহিল, মাতাল অবস্থায় কত লোকে আমার দিয়ে কত  
কাজ করিয়ে নেন। বুঝতে পারি সব, জানতে পারি  
সব, তবু জেনে বুঝেও বোকা হয়ে থাকি। সে দিন  
মদ খেয়ে বেহুস হয়ে পড়ে, ছিলুম, এই ছোঁড়ার বাপ  
এসে একে দিয়ে গেল। মন তখন উঁচু হয়ে বাঁধা,  
‘নেব না’ বলতে পারলুম না। এমনি করে—আপনি  
বিশ্বাস করবেন কি, আমার স্নানাম গেছে, অর্থ গেছে,  
আমি এখন ঋণে জড়িয়ে পড়েছি।”

শরৎ যেক্রপ অকপটভাবে কথা বলিতেছিলেন  
তাহা শুনিয়া প্রণতি নিজেকে আর দূরে রাখিতে  
পারিল না, আত্মীয়্যার মত নিজেকে মনে করিয়া  
স্নেহের সুরে বলিল, “জেনে শুনে তবে মদ খান কেন ?  
এতে আপনার লাভ তো কিছুই দেখছি, দেখছি  
কেবল ক্ষতি, এ ক্ষতির বোঝা অনর্থক মাথায় করে  
বয়ে বেড়ানোর দরকার কি ? আমার মাপ করবেন,

আপনাকে আমিই আবার উপদেশ দিতে বাচ্ছি, কিন্তু—”

শরৎ খুব খুশী হইয়া বলিলেন, “না, আপনি বলুন, আমার তিরস্কার করুন। যথার্থ কথা বলছি আমি এ জগতে আমার বাপের কাছ ছাড়া আর কারও কাছে তিরস্কৃত হই নি। তিরস্কারের মধ্যে বাড়ীর সমবেদনার যে সুর বেজে ওঠে, তা স্পর্শ করতে আমার বুক বহুকাল হ’তে বঞ্চিত হয়ে আছে। আপনি বলবেন আমি বড়লোক জমীদার, আমার আবার অভাব কিসের? আমার মুখের একটা কথা রাখবার জন্তে লোকে কত ব্যগ্র, আমি কারও দিকে চাইলে সে কৃতার্থ হয়ে যায়; আমার কত চাকর, কত কর্মচারি, আমার মন যোগানের জন্তে এরা সবাই ব্যস্ত। আমার চারিদিকে কত স্তাবক, কত বন্ধু, কিন্তু সত্যি কথা বলবেন মিস বোস, এরা কি আমার সম্মান করছে, আমার ভালবাসছে, না আমার অর্ধেক ভালবাসছে? আমি দেখছি এরা সকলেই অন্তরে আমার ঘৃণা করে, সময় সময় সে ঘৃণা মুখের পর ফুটে বার হয়ে পড়ে তা আমি দেখতে পাই, তবু তারা প্রকাশে আমার ভালবাসে দেখায়; আমার এতটুকু মাথা ধরলে তারা যেন কতই অস্থির হয়ে পড়ে এমনি ভাব দেখায়; অথচ আমি পৃথিবী হ’তে একেবারে যখন মরে যাব তখন এরা কেউ আমার জন্তে এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও তাদের পড়বে না, তারা শাস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলবে, যাক্, আপদ গেল। এ জগতে এসে আমি কারও কাছ হ’তে একটা উপদেশ পেলুম না, কাউকে এমন কাছে পেলুম না যাকে আমার বুকের ব্যথা জানাতে পারি। আমি কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছি নে, কাজেই ওদের মত গোপনতার আড়ালে আমাকেও লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। এই না পাওয়ার কষ্ট ভুলে থাকতে কেবল মদখাচ্ছি, আমার ব্যথা জুড়িয়ে দিতে জগতে এই একমাত্র বন্ধু আছে, আর কেউ নেই। যখন মদ খাই তখন মনে হয়

হুনিয়ার কেউ আমার পর নেই, সব আপনার, এদের কপট স্নেহ তখন সত্যি বলেই মনে হয়। মদ যখন না পাই তখন বুকের মধ্যে জ্বালা জ্বলে ওঠে, এ জগৎ শুধু নিতে জানে, দিতে জানে না। আমি নিঃশেষে দানই করে যাচ্ছি কিন্তু কারও কাছ হ’তে কখনও কিছুই তো পেলুম না মিস বোস।”

তঁহার গোপন ব্যথা আজ মূর্ত হইয়া ব্যথার সুরে ঝরিয়া পড়িল, তঁহার সদাহাসিমাখা মুখখানা বিষন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

আজ প্রণতি তঁহার পরিচয় ভালরূপেই পাইল। সে এবার করুণাপূর্ণ নেত্রে এই যথার্থ হতভাগ্য যুবকের পানে চাহিল, তাহার নারী-হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। একটা গোপন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল— “আমায় যে বিশ্বাস করে আপনার গোপন কথা বললেন, ধরুন, আমি ও তো সংসারের জীব, জগতের নিয়মামুসারে আমিও চলি, সেই রকম নীচ মন আমার, অবশ্যই স্বর্গীয় মন আমার নেই।”

মলিন হাসি শরতের মুখের উপর খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, “নিশ্চয়ই জগতের জীবকে জগতের প্রচলিত নিয়ম অনুসারেই চলতে হবে। আমার মতের সঙ্গে মিলতে গেলে জগৎ ছাড়া জীব হ’তে হয়। গোপন কথা একে বলবেন না, এর মধ্যে গোপনীয় আমার কিছুই নেই। তবে সব সময়ে একথাগুলো ব্যবহার করিনে তার অন্য কারণ আছে। সে কারণটা এই যে কেউ সত্যি কথা সহিতে পারে না। গোপনতার আড়ালে, মুখে মুখোস চাপা দিয়ে মানুষ কিছু তার দীর্ঘজীবনকালটা কাটাতে পারে না। হয় তো কোন সময়ে কোন এক অতর্কিত আঘাতে তার সেই গোপনতাটুকু লুকিয়ে পড়ে, মুখোস খসে পড়ে যায়, আর তার স্বরূপটা সেই সময়েই প্রকাশ হ’য়ে পড়ে। আজ এই ছেলেরটা সঙ্গে নিজের অবস্থা মিলিয়ে দেখে মনটা বড় খারাপ হ’য়ে গেল, দেখলুম— এও যেমন জগতের স্থণিত আবর্জনা স্বরূপ আমিও তেমনি।”

প্রগতি বিষয়ে আড়ষ্ট হইয়া বলিল, “আপনি আবর্জনা?”

শরৎ শাস্ত্র রূরে বলিলেন, “তা নয় তো কি মিস বোস? আপনি কি বলতে চান আমি জগতে একটা উজ্জল রত্ন হ’য়ে এসেছি, অগ্নিফুলিঙ্গ হ’য়ে জন্মেছি? কিছু না মিস বোস, কিছু না। আমি দেখছি আমি ষোল আনা মিথ্যে মানুষ, আমার দ্বারা এ জগতে এতটুকু উপকার হবে না, অপকার যথেষ্ট হবে, এই ছেলেটা কেমন দুর্বল—আমি তার চেয়েও বেশী দুর্বল। আপনি অবাক হ’য়ে আমার পানে তাকিয়ে ভাবছেন—সে আবার কি কথা,—কেমন এই ভাবছেন না?”

বলিতে বলিতে তিনি নিজেই হাসিয়া উঠিলেন, তখনই আবার মুখখানা গভীর করিয়া বলিলেন, “সত্যিই বড় দুর্বল। কারও সাহায্য না নিয়ে যখন আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই, তখন আমি সবল এ কথা আমি কিছুতেই বলতে পারিনে। সামনে দেখুন,—ওই যে নদীর স্রোত বয়ে চলেছে, ও শুধু একটানা বয়েই যাচ্ছে। তীর দুটো হাঁ করে জড়ের মত তাকিয়ে আছে, তা বলে ভাববেন না তীরের কোন আকর্ষণ নেই। তীর সে স্রোতকে আকর্ষণ করে নিজের পানে আনবার চেষ্টা করছে, হুই একটা ছোট ছোট ঢেউ কাছেও আসছে, কিন্তু তীরের চেয়ে জলের বড় ঢেউয়ের টান আরও বেশী তাই যে ঢেউগুলো দল ছাড়া হ’য়ে তীরের পানে আসছিল, তারা আবার ফিরে গিয়ে বড় ঢেউয়ের পেছনে—তাদের যতটুকু শক্তি আছে তা দিয়ে ঠেলা দিয়ে সামনের পথে আরও এগিয়ে দিচ্ছে। এটা আমার মনের উপমা—আমার মন বলতে এখানে যে বৃত্তি-গুলো আমার চালনা করছে তাদেরই বুঝাচ্ছে। ওই রকম একটানা পথে আমার দুর্দান্ত বৃত্তিগুলোও চলেছে। সংসারের আকর্ষণ তাদের হুই একটাকে টেনে আনলেও ধরে রাখতে পারছে না, তারা দ্বিগুণ বলে ফিরে গিয়ে অস্ত্রগুলির পেছন হ’তে তাদের সামনে ঠেলে দিচ্ছে।

প্রগতি মুখ ফিরাইয়া বলিল, “নদীর ঢেউয়ের যাওয়ার স্থান আছে, তারা চলেছে সমুদ্রে মিশতে, আপনার মনোবৃত্তি চলছে তার শেষ কোথায়?”

শরৎ একটু হাসিলেন, “আমার শেষ মদে। চরম লক্ষ্য আমার সেই ঠিক করে রেখেছে, মনোবৃত্তি উত্তেজিত হ’য়ে এগিয়ে চলেছে। মাতাল কখনও কোন সংকল্প করতে পেয়েছে শুনেছেন কি? মাতালের দ্বারা ভাল কিছু কখনও হয় নি, কখন হ’বেও না। তবে যেটুকু তাকে প্রকৃতিস্থ পাওয়া যায়, যেটুকু ভাল পাওয়া যায় সেটা সেই তীরের আকর্ষণে যে হুই এক পলকের জন্তে কাছাকাছি আসে—তখন। যাক, অনেক বকেছি, আপনাকেও আচ্ছা বিরক্ত করে তুলেছি, আর বিরক্ত করব না।”

বাগ্র কণ্ঠে প্রগতি বলিল, “না, না, বিরক্ত আমি মোটেই হইনি। আপনার কথা শুনে আমার হৃদয় হুঃখ হচ্ছে।”

এক পা অগ্রসর হইয়া শরৎ বলিয়া উঠিলেন, “না, না, হুঃখ করবেন না। আমার জন্তে হুঃখিত হওয়া আমার মোটেই সহ্য হয় না। আমার জন্তে কেউ বাধা পাবে এ আমি ইচ্ছে করিনে, মিস বোস। আমি চিরকাল জগতের বাইরের জীব, জগৎ আমার কাছ হ’তে কোনদিন কিছু পায়নি, পাবেও না। আচ্ছা, আসি তবে আজকার মত, নমস্কার।”

নমস্কার করিয়া তিনি মাণিকের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। বাইতে বাইতে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, “বাড়ী যান, সন্ধ্যা হ’য়ে গেছে। একা এখানে আর বসে থাকবেন না।”

যতক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় প্রগতি চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার তখন পৃথিবীর বুকে ঘনাইয়া আসিয়াছিল, দূরবর্তী স্থানগুলিতে অন্ধকার ঘনীভূত বলিয়া অম্লভব হইতেছিল। তরল অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে শরৎ অদৃশ হইয়া গেলেন।

প্রগতি উঠিয়া পড়িল।

আজ খুব সহজেই এই লোকটাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল। বাস্তবিকই বেদনায় তাহার হৃদয়টা ভরিয়া উঠিতেছিল। এমন অসহায় অবস্থায় পড়িতে প্রায়ই কাহাকেও দেখা যায় না। ইহাকে প্রকৃত স্নেহ করিতে, প্রকৃত ভালবাসিতে এ জগতে কেহ নাই। যন্ত্রণায় হৃদয় ফাটিয়া গেলেও সে একটা কথা

কাহারও কাছে প্রকাশ করতে পারে না অথচ তাহার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন সবই আছে।

প্রণতি যতই শরতের অসহায় অবস্থা ভাবিতেছিল ততই তাহার চিত্ত করুণায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

## শিউলি তলার স্মৃতি-

শ্রীপ্রণব রায়

পথের ধারের শিউলি-তলা অশ্রু-স্মৃতি-মাথা

আজও আছে আঁকা

বেদন-রাঙা মরম-কোনে।

ছেলে বেলায় স্বপ্নপুরী সবুজ গাঁটী যখন পরে মনে

হারিয়ে-যাওয়া-স্মৃতির স্রাবস জাগায় শুধু ব্যথা,

—মনে পড়ে দুটি চোখের সজল কাতরতা।...

মুখুঘোদের বাড়ীর একটা পাশে

শ্রামল কোমল দুর্কাঘাসে

বাগানখানি ঢাকা ছিল; তারই দখিল ধারে

পায়ে-চলা মেঠো পথের পারে

শিউলি ফুলের গাছটা ছিল ফুলের ভায়ে নত

—সুত্র বেশা কোন্ রূপসীর মত।

তারি তলায়

প্রতি বিকেল বেলায়

পাড়ার যত ছেলে-মেয়ে সবাই হ'ত জড়

—ছোট এবং বড়।

সেই খানেতেই হয়

সাত-বছরের বেলায় সাথে প্রথম পরিচয়।...

বেলা আমার সারাক্ষণের সাথী,

ছায়ার মত সাথে সাথে কিন্ত দিবস রাত্তি।

অকারণে সেই আমার শতক অত্যাচার,

ঝগড়া হোলে তারই হ'ত হার।

কত সময় ঝগড়া কোরে চড় মেরেচি তাকে,

কান্না ভুলে কিন্তু আবার ফিরত আমার ডাকে।

মোর তরে সে আনত আচার লুকিয়ে ছপুর বেলায়,

থাকত পাশে পুকুর ঘাটে মাছ ধরবার খেলায়।

সকল কাজে সারা দিবস ভোর

তাকে ছাড়া একদণ্ডও চলত না কোঁ মোর।

মোর অপরাধ গোপন কোরে শাস্তি নিত নিজে—

সে সব স্মৃতি স্মরণ কোরে চোখদুটো আজ উঠছে

জলে ভিজে।...

শিউলি তলায় রোঙ্কই হ'ত লুকোচুরি খেলা;

দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলা.

গভীর সুরে শব্দ উঠত গেয়ে

বধূর রাঙা অধর পরশ পেয়ে।

দেবাগনে উঠত জ'লে সন্ধ্যারতির শিখা,

ছায়া-নিবিড় দীঘির জলে মিলিয়ে যেত অন্ত-রবির লিখা।

তখন সবাই ফিরে গিয়ে ঘরে

শুভুম দাওয়ার পরে;

ঠান্দি বুড়ীর গল্প অফুগান্

রূপকথার কোন্ কল্প-লোকে পাঠিয়ে দিত প্রাণ।...

না হ'তে শেষ রাত্তি,

না নিভতে শুক তারাতীর বাতি,

তরু শাখায় থাকত লেগে নিশার কালো ঘোর,

আলোর কুঁড়ির হয় নি বিকাশ ; হয় নি তখন তোর।

চুপি চুপি হাজির হতুম শিউলি-গাছের নীচে—

সাজি হাতে বেলা আস্ত পিছে।

নাড়া পেয়ে গাছের শিউলি যত

ঝরু ঝরু ঝরু পড়ত ক'রে অশ্রু-ধারার মত।

সাজি ভ'রে বেলা তখন কুড়িয়ে নিত ফুল,

—পিঠ-ভরা তার ছলত এলো-চুল।

যৌবনেরই ফাস্তনী হাওয়ার

ফুটল বেলায় রূপের মুকুল শতমলের প্রায়।

পৌঁছেল তার কিশোর বৃকে বসন্তেরই রঙিন

লিপিখানি।

বাকুল ক'রে তুলত মোরে বাতায় বেলায় কেশের  
গন্ধ আনি'।

ভাগর তাহার স্নিগ্ধ আঁধির ছায়া

ঘুমন্ত মোর প্রাণের পরে বুলিয়ে দিল সোনার কাঠির  
মায়া।

নতুন ক'রে মুখখানি তার লাগল আমার ভালো—

সে যেন মোর চিন্তাকাশে তরুণ উষার আলো।

শুনতে পেলুম, ঠিক হোয়েচে তার সাথে মোর বিয়ে—

এমন সময় হু'হাত আমি নিয়ে

বেলায় বাবার সাথে বাবার বাথল বগড়া কাঁটি।

হ'ল লাঠালাঠি।

বর্ষাকালের নদীর প্রোতের মত

উভয় দলের মোকদ্দমা চলল অবিরত।

অবশেষে বাবার হ'ল হার,

পরাজয়ের লজ্জা-মানি বাথল বৃকে তাঁর।

বাবা উঠলেন গর্জে রোষে ফুলে—

“...বোম্ব-বংশের মেয়ে কত আনন্দ নাকো কুলে...”

বন্ধ হ'ল ওদের বাড়ী নিত্য যা'রো আসা—

নিভল সকল আশা !...

গোপন ব্যথার বোকা নিয়ে বৃকে

বেতে হোল কল্‌কাতাতে কলেজ অভিযুগে।

বিদায়-বেলা কার সে আকুল টানে

চাইছ কিরে ওদের বাড়ীর পানে—

জান্‌লা-ক'কে বিদায়-করণ মুখটা বেলায় আগে,

উতল হাওয়ার কল্প অলক মুখের পরে লাগে...

অশ্রু-সজল নয়ন ছটীর দৃষ্টি নিমেষ-হারা—

—যেন সাঁঝের তারা।

\* \* \* \* \*

বছর কয়েক পরে।...

আমি থাকি কল্‌কাতার এক ছাত্রাবাসের ঘরে।

কাজ শুধু মোর কলেজ আনাগোনা,

রাত্রি জেগে তৈরী করা 'বি,এ'র পড়াশোনা।

কোথায় বা সেই পল্লী-নভের মুক্ত অরুণ আলো।

অন্ধ আকাশ হেথায় শুধু কলের ধোঁয়ায় কালো।

হেথায় ভীষণ যন্ত্রাঙ্গের চলচে বিরাট স্ততি,

রক্ত-শোষা কলের মুখে মানুষ জীবন দিতেছে আহুতি।

ছরস্ত সেই মেঠো হাওয়ার তরে

প্রাণটা আমার হাঁপিয়ে ওঠে ইট-কাঠের এই প্রাচীরে  
ঘেরা ঘরে।...

তরু অলস অবসরের ক্ষণে

কোন দূরে এক পল্লীবালায় স্মৃতি পড়ে মনে।

পুঁথির পাতায় ফুট ওঠে তারি মুখের ছবি—

ভুলিয়ে দে' যায় সব।...

খবর পেলুম এক শ্রমভাঙে—

রাজীব বোসের সাথে

বেলায় নাকি এই শ্রাবণেই বিয়ে!

তীক্ষ্ণ নিচুর তীরের মত এই কথাটা বিধ্বল বৃকে গিয়ে।

বেলায় শুভ হস্ত-উজ্জল ফুল ঘুণী-মুখ

ভ'রে আছে আম'র তরুণ বৃক।

সেই যে আমার প্রথম ভালো লাগা,

যৌবন-মালকে মোর প্রথম ফাগুণ-জাগা।...

আমার প্রাণের দেউল শূন্য ক'রে

বধু-বেলা চ'লে যাবে অচিন্ত্য পরের ঘরে।

মর্শ্ব-বীণার ছিন্ন-তারে তাই

বাথল শুধু বিসর্জনের বেহর সূচ্ছ নাই।...

কিন্তু তাদের মিলন শুভ হোক—

বেলায় পথে পড়ুক স্নেহের মজল আলোক।

আমি শুধু ছদয় দেউলে

গোপন ব্যথার রক্ত গোলাপ-ফুলে

সাজিয়ে দেব নিতি

শিউলি তলার স্মৃতি।.....



## ভয় কিসে ?

শ্রীদেবেন্দ্রলাল বোষ রায়

মৃত্যুরে সবে রস্তা দেখাও

মরিয়া নিজের ধর্মতরে ;

শত্রু-মনে জাগাও শঙ্কা

আমিত শৌর্য-বর্ষ পরে' ।

## অহঙ্কারী মেয়ে ।

শ্রীশ্রবোধ রায়

শ্রীভের উগার এসেছিল কথাটা ।

ভাবলুম ব'লেই ফেলি । একটু শ্রুতিকটু কাঠ-  
খোঁটা ধরণের শুনতে হবে বটে । তা' হোক । বড়  
লোকের মেয়ে ব'লে তা'র সব কথাই যে বেমানুম সহ্য  
ক'রে যেতে হবে, আমার অসহিষ্ণু মনের অতোখানি  
প্রসারতা নেই ।

কিন্তু তখুনি আর একটা কথাও মনে হলো—  
মেয়েদের সঙ্গে এই রকম ভাবে তর্ক-বিতর্ক অথবা  
বাদ-প্রতিবাদ করা কি খুব উচিত হবে ? সেটা যে  
ভারী নিলানীর—জন্তাবিরুদ্ধ কাজ ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐযথ্য ধারণ ক'রে একেবারে  
নিশ্চুপ হয়ে থাকতে পারলুম না । খুব ধীরে পরিষ্কার  
কল্পে বস্তু—কিন্তু কাজটা আপনাতর খুব অস্তায়

হয়েচে । সামান্য একটা কারণে মায়ী দেবীকে ঐ  
রকম ভাবে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেওয়াটা—

মরাল গ্রীবাটি লীলারিত ভঙ্গিতে সঞ্চালন ক'রে  
জুঁকুঁকে চোখ ছুঁটা ডাগর করে নিভা বলে—  
কোন্থানটা অস্তায় হ'য়েচে শুনি ?...একটা রাষ্ট্রিক,  
আনকালচার্ড্ গার্ল যদি না বুঝে রাগই করে, সেজন্য  
কি আমরা দোষী নাকি ? তা'কে ত' আর গলায়  
হাত দিয়ে তাড়িয়ে দিতে বাই নি ?

—অবশ্য দয়া ক'রে গলায় হাত দেন নি স্বীকার  
করি, কিন্তু যা' বলেচেন, আমার মনে হয় যে কোনো  
লোককে তাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে ঐ টুকুই যথেষ্ট ।  
একেবারেই আত্ম-মৰ্যাদা ধাঁদের নেই, তাঁদের কথা  
অবজ্ঞা করতে পারিনি ।

—কি এমন মর্মস্বাতী কথা বলিচ্ছিল তাকে ? একেবারে নবীন পুতুল আর কি ! ফুলের ঘায়ে মুচ্ছা যান। অত যারা সেন্সিটিভ, তারা ওক করতেই বা কোন্ সাহসে আসে ? গানের ‘গ’ জানেন না, তিনি আবার আসেন সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করতে। হাসি পায়, যত সব অদ্ভুত রিডিকিউলাস্ ব্যাপার !

—কিন্তু আপনি যে চটেছেন সে ত’ শুধু মায়াদেবী এই আলোচনার যোগদান ক’রেছিলেন বলে নয়, তিনি যে আপনার সম্মুখেও সাহস ক’রে লহরী ও রেগুকা দেবীর গানের প্রশংসা ক’রেছিলেন, আসলে সেই স্পর্কটুকুই আপনার কাছে অত্যন্ত অসহ্য ও বিরক্তিকর মনে হ’য়েছিল। সত্যি বলুন ত’ নিভা দেবী, আমি যা’ অহুমান করছি তার কি সবটাই মিথ্যা ?

একটা তাত্ত্বিক-স্বচক মুখভঙ্গী ক’রে নিভা বলে—অল্ হাম্বাগ্। আপনি এ সব ছাই পাশ কি বলছেন অশাস্ত বাবু ? হ্যাভ্ ইউ লষ্ট ইওর ব্রেন্ ? আপনি চেনেন না ঐ মায়া মেয়েটিকে, অত বড় পর-জীকাতর সেল্ফিস্ মেয়ে আমি ত’ আর দেখিনি। ব্যাক্ ব্যাইটিংএ বোধ হয় ওর জুড়ি মেলে না। অথচ এমি মণ্ডি কথা বার্তা যে ফস্ ক’রে কিছু ধরাও যায় না। একদম পরোমুখ বিষকুস্ত থাকে বলে।

তারপর একটু থেমে মাথাটা ছলিয়ে আবার বলে—সেদিন টেনিস্ খেলার সময় মনে আছে ত’ আপনি ত’ মেজ্জার সঙ্গে খেলা দেখছিলেন—কি রকম অভয়ের মতো একটা টক্টিং রিমার্ক্ পাস্ করলে ! শুনেছেন ত’...না হয় ইংরাজিতেও একটা কথার উত্তর দিয়েছিলুম। ফস্ ক’রে বলে কিনা—যে রকম দেখছি মিস্ নেভির বাংলা শেখবার জন্য হ’দিন পর একটা পণ্ডিত মশায়ের প্রয়োজন হ’তে পারে। তারপর আমার হাব-ভাব ভঙ্গী নিয়ে, এমন কি আমার খোপা বাঁধা থেকে ‘ভি’ কলারের ব্লাউস্ আর কিন্ফিনে পাতলা শাড়ীটিরও পর্যন্ত খুঁত-ধ’রে সে সব বিকী আলোচনা করে, তা’ শুনে সত্যি

কাণে আঙ্গুল দিতে ইচ্ছে করে। কি রকম ফণ্ট্, ফাইণ্ডিং নেচার দেখেচেন ? ঐ সব সার্বকাজম এর অর্থ বুঝিনে, এতই কি ছাকা আমি ?

—আপনি অনর্থক নিজকে উত্তেজিত ক’রে তুলছেন নিভা দেবী। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু যে ঠাট্টারই সম্পর্ক একথা ভুলে যাচ্ছেন কেন ? তা ছাড়া তিনি ত’ আপনাকে এমন কিছু অজ্ঞার কথা বলেন নি। আপনি আজ যে রকম নির্মম ভাবে তাঁকে তাঁর দারিদ্র্যের কথা ভুলে মর্মে আঘাত দিয়েছেন, শুধু তিনি গরীব বলেই সকলের সামনে তাঁকে যে রকম অপদস্থ অপমান ক’রেছেন—

—একটা ফলস্ কলারিং দিয়ে ব্যাপারটাকে ক্রমশই আপনি অতিরঞ্জিত ক’রে তুলছেন দেখছি। উচ্চ শিক্ষা পেয়েও কেন যে আপনার এই কমন্ সেন্স টুকুর অভাব হচ্ছে বুঝতে পারছি নে। এত স্নো আওয়ারষ্ট্যান্ডিং বা’র তা’র কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ করতে যাওয়াই আত্মকি। ...হুঃখ হয়। ভেবেছিলুম আপনার মধ্যে কিছু পদার্থ আছে।

—এখন বুঝি দেখলেন, একেবারেই অপদার্থ।

—তা ছাড়া কি ? এসব বিষয় নিয়ে ধানাই পানাই করা কি পুরুষের কাজ নাকি ? ... মায়ার পক্ষ নিয়ে প্রিন্ড্ করতে এসেছেন লজ্জা লাগে না আপনার ? আমাদের মেরেদের ব্যাপারে আপনার ইণ্টারকিয়ার্ ক’রবারই বা কি রাইট্ আছে শুনি ?

—অধিকার আছে কি না জানি না, তবে আমার মনে হয় এই অধিকারটুকু সম্পূর্ণ ভাবেই পেতুম যদি মায়া দেবীর আচরণের মিথ্যা নিন্দা ক’রে আপনার পক্ষ সমর্থন করতে পারতুম। আপনার মনস্তি সম্পাদন করতে পারিনি বলে আমি সত্যিই হুঃখিত। আমার ক্ষমা কর্ণেন।

ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে নিভা বলে—আই বিসিট্ ইউ অশাস্ত বাবু, প্রিন্ড্ রেসপেক্ট্ ইওর টাং। ইউ আর সিম্পলি টকিং ননসেন্স্। একজন ভুল্লোকের মেয়ের সে প্রেজিঙ্ক্ যেরে কথা বলতে পারে না তার

সঙ্গে কথা বলতে আমি ঘৃণা বোধ করি। ... কত বড় অজ্ঞান যে ক'রেচেন, সে কথা বাড়ীতে গিয়ে একবার ভেবে দেখবেন।

—অজ্ঞান ? অজ্ঞানের প্রতিবিধান করতে যাওয়া যদি অজ্ঞান হয়, তা' হ'লে প্রার্থনা করুন নিভা দেবী, ভবিষ্যতে এরকম সহস্র অজ্ঞান করতেও কখনো যেন বিচলিত না হই।

বুঝলুম প্রতিবাদ করতে যাওয়াই বুঝা। তর্কে যে আজ পর্য্যন্ত কোথাও পরাজয় স্বীকার করেনি, তা'কে পরাস্ত করা আমার সাধ্য নয়। হয় ত হু' একজন ছাড়া তর্ক কেও করেও নি—ভয়েই করেনি নিশ্চয়। নিভা বোসের মতো বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে অসম্ভাব রেখে কে-ই বা তা'র দুর্গভ সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হ'তে চায় ?

একটা কথাও না ব'লে একদম চুপ ক'রে গেলুম। আমার দিকে একটা ঘৃণাবিরজ্জিভরা তীব্র কটাক্ষ হেনে নিভা তাঁর হাই হিল জুতোর খটখট শব্দ ক'রে বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর নূতন কেনা আইভরি রঙের মিনার্ভা গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

\* \* \*

এখানে নিভারাগী কিম্বা মিস্ নেভি বোসের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। স্বনাম-ধন্য ব্যারিষ্টার সর্বজন-পরিচিত মিঃ এন্ এন্ বোসের তিনিই সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠা স্নতরাং আদরিণী কন্যা।

বেথুনে পর পর দু'টা বার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় হয়ত ঐ কলেজেরই প্রতি কিরূপ বিতৃষ্ণ হ'য়ে, সম্ভ্রতি তিনি ডায়োসিসানে ভর্তি হ'য়েচেন। ... ফেল করার একটা দুর্গম ঘূচাবার জন্ত একেবারে প্রাণান্ত পরিশ্রম ক'রেই তিনি এবার পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হ'য়েছিলেন। ফলে তৃতীয় বিভাগে পাশ ক'রে দুর্গমও অনেক খানি ঘূচাতে সক্ষম হ'য়েছিলেন।

তৃতীয় বিভাগে পাশ ক'রে যারা খুঁত খুঁত করেন, তাঁরা যেন কোনও রকমে নিভা দেবীর

আনন্দোজ্জ্বল গর্কোৎফুল্ল সনাহাস্তময় মুখখানি শুধু একটা নিমেষের জন্তও ভাল ক'রে নিরীক্ষণ করেন। ..... অবশ্য তিনি দর্শন-মূলভ বলেই এ কথা বলতে সাহসী হলুম। অভিনয় অথবা দিনেমাতে তিনি ত নিয়মিত ভাবে যান-ই, তা ছাড়া University Institute, Albert Hall, কিংবা Y. M. C. A.তে ও তাঁর অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি। কোনো বিশেষ অভিনয় অথবা সঙ্গীত সম্মিলনীতেও তাঁকে অমুপস্থিত থাকতে দেখতে পাওয়া যায় না। ..... তাঁর হালকা রেশমের মতো চুল আর ফিন্‌ফিনে শাড়ীর উড়ন্ত আঁচল শহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় কত ভাবুক কত উদাসী পথিকের বে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেচে তার আর সংখ্যা নেই।

অত্যন্ত বিস্মৃতিশীল লোকও তাঁর তিন খানি মোটরের নম্বর মনে রেখে একটু আনন্দ-ভরা গর্ব অমুভব করেন।

ঠিক সন্ধ্যার সময় তিনি নিয়মিত ভাবে গড়ের মাঠে, কিম্বা ইডেন গার্ডেন, আউটরাম ঘাট, হিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল অথবা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটেও বেড়াতে যান। স্নতরাং নিভা-দর্শনেচ্ছু কোনো নূতন বিদেশী লোকের সঙ্গে ঐ সব জায়গাতেও তাঁর দর্শন লাভ ঘটা খুবই সম্ভব। ... ..

অবশ্য তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একটা দুর্দম বাসনা মনের মধ্যে পোষণ ক'রে যদি কেও ব্যর্থ-মনোরথ হন, তা হ'লে সে দোষ তাঁরই। কারণ তিনি স্বভাবতঃই ওজন ক'রে কেবল মাত্র হু'চারিটি কথা বলেন, আর তাও শুধু রীতিমত আলোক প্রাপ্ত ধনী পরিবারের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে। মধ্যবিত্ত কিম্বা সাধারণ গৃহস্থ ঘরের কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচয় রাখাকে তিনি অত্যন্ত লজ্জা এবং অপমানের বিষয় বলে মনে করতেন। ... ..

অর্থ সম্পদ ছাড়াও নিভার আরও একটা যে জিনিষ ছিল, সে হচ্ছে তাঁর রূপ। রূপ বটে! অমন মন-মাতানো, প্রাণ-ভোলানো, চোখ-ঝল্‌মানো রূপ



সচরাচর খুব কমই চোখে পড়ে। ... ... শ্রামবাজার থেকে আরম্ভ ক'রে কালী ঘাটের ট্রাম ডিপো পর্যন্ত এমন কোনো প্রেমিক যুবক ছিল না, যার মর্মভাঙা মুখে ষাওয়া প্রাণটি তাঁর রূপের কেজায় বন্দী হয় নি।

সুতরাং রূপের অহঙ্কারও তার কোনো সেরা রূপসীর চাইতেও কম ছিল না। কুরূপ কুৎসিৎদের তিনি আবর্জনার সামিল মনে করতেন, কথা বলতেন শুধু স্তন্দরী মেয়ে এবং স্তন্দর ছেলেদের সঙ্গে। আর তাঁর কথা বলার মধ্যে বিশিষ্টতা ছিল এইটুকু যে বাংলা কথার মধ্যে মাঝে মাঝে ইংরেজী বুকনি না দিয়ে তিনি কোনো একটা পদকেই পূরণ করতে পারতেন না।

এ হেন অহঙ্কারী চালিয়াৎ মেয়ের ন্যাটিকুলেশন পাশ ক'রে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হওয়াতে যে অহঙ্কার আরও বেড়ে উঠবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। ... ...

আধুনিক রুচি ও ষ্টাইল জুয়ায়ী নিত্য নূন রকম সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে আজকাল কোন দিন তিনি মিনার্ভা, কোনো দিন উল্‌সলি কোনো দিন বা এসেঙ্ক গাড়ীতে চড়ে কলেজে যান। তারপর কলেজে গিয়ে চক্‌চকে নূতন বইয়ের ব্যাগটি হাতে নিয়ে মন্দাক্রান্তা ছন্দের তালে নেভি ব্লুরঙের নাগুরা পায়ে কোরিডোরে খুব আন্তে পা ফেলে ফেলে হাঁটেন। ... ...

কলেজে স্বেচ্ছায় প্রসন্ন মনে যে ছ'টা মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের নাম লতিকা ও অবলা। ছ'জনেই অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। আর খুব অনিচ্ছায় একান্ত বাধ্য হ'য়ে যে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেন, তিনি গরীব। নাম মায়ী চৌধুরী। ... এই মেয়েটি তাঁর স্নিগ্ধ রূপ ও মিষ্টি ব্যবহার দিয়ে কলেজের সকলকেই আপন ক'রে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া তাঁর আরও একটা যে প্রশংসনীয় দুলভ গুণ ছিল, সেটি হচ্ছে তিনি আজ পর্যন্ত বরাবর সব ক্লাশেই প্রথম স্থানটি বেমালুম ভাবে দখল ক'রে এসেছেন। ... ...

লতিকা ও অবলা দেবী এই মায়ী মেয়েটিকে এক

মুহূর্ত্তও কাছ ছাড়া ক'রে থাকতে পারতেন না। তাঁর রহস্য-পটুতা ও শুঁছয়ে কথা বলবার বিচিত্র স্তন্দর ভঙ্গীটুকু তাঁদের ছ'জনেরই হৃদয় ভারী মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিল। ... ...

দোষের মধ্যে মায়ী দেবী ছিলেন একটু বেন অতিরিক্ত রকমের স্পষ্টবাদী। রেখে ঢেকে তিনি কথা বলতে পারতেন না। প্রয়োজন হ'লে নিভা বোসকেও তিনি স্পষ্ট কথা বলতে কোনো দিন কুণ্ঠিত হন নি। এ জন্ম অনেক সময় অনেক অভিযোগও শুন্তে হয়েছে তাঁকে। এমন কি প্রকাশ্য ভাবে নিভা বোসের কয়েকজন ধামাধরা খোসামুদে বন্ধু তাঁকে অপমানহুচক অনেক কর্কশ কটু কথাও বলেছেন।

দারিদ্র্যের অসম্মান ক'রে মায়ী দেবী তবু আজ পর্যন্ত কোনো অত্যাচারই প্রশ্রয় দিতে পারেন নি। ...

হয় ত এই একমাত্র কারণেই তিনি নিভা দেবীর অভ্যন্ত চক্ষুশূল ছিলেন। একজন হীন দরিদ্র ঘরের মেয়ের এই রকম অস্বাভাবিক স্পষ্টবাদিতার স্পর্ধা দেখে নিভা দেবী প্রথম দিনই তাঁর ওপর হাড়ে চটে গিয়েছিলেন। তবু যে অত বড় অপরাধকেও ক্ষমা করে তিনি আজও দয়া ক'রে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন, সে শুধু অবলা ও লতিকার খাতিরে, প্রিন্সিপ্যাল ও প্রফেসরেরা নেহাৎ তাঁকে ভালবাসেন ব'লে।

নিভা দেবীর চরিত্রের আরও কয়েকটা দিক দেখাতে পারা যেত, কিন্তু তা হ'লে অনাবশ্যক ভাবে গর ত' বড় হ'তোই, উপরন্তু নিভা দেবীও আমার ওপর মোটেই প্রসন্ন হ'তেন না। পৃথিবীতে একটা মেয়েকেও বিশেষতঃ তাঁর মতো বড় লোকের মেয়েকে চটিয়ে রাখি এ আমার আদৌ ইচ্ছা নয়। সুতরাং তাঁর এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেয়েই আপাততঃ আপনাদের সন্তুষ্ট থাকুন।

( ২ )

একটা বিজী এক ঘোঁষেমির মধ্যে প্রাণটা হাঁকিয়ে উঠছিল। কতক্ষণ আর এমিভাবে চূপচাপ ব'সে থাকি যার?...সময় কাটাবার জন্ম ওর ডিডাক্টিভ

লজিকটাই হাতে নিয়ে বসি—কিছুক্ষণ পরেই আবার বিরক্তি আসে।.....ওর নোটের খাতাগুলো খুলে কিন্তু আগাগোড়া পড়তে ইচ্ছে হয়। মেয়েলি ছাঁদে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে কি সুন্দর স্পষ্ট ওব লেখা।

অক্ষরগুলো একটীর পর একটা ক'রে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখি।.....

আশ্চর্য্য! ওর টেবিলটার কিন্তু কোনো লক্ষ্মী হাতের নিপুণতার আভাস পাইনে। কেমন যেন বিশৃঙ্খল এলোমেলো ভাব! সত্যোন বাবু 'মণি মঞ্জুষা' আর রবীন্দ্রনাথের 'দীপালি' থেকে আরম্ভ ক'রে 'রঘুবংশ' আর 'রোমের হিষ্টি' সব যেন মিথালি পাতিয়েছে—যেন সহোদর ভাই!

কিন্তু এ যে আধ ঘণ্টারও ওপর হ'য়ে গ্যাল। না, আর অপেক্ষা করা চলে না। ছোটো একটা স্লিপের ওপর কয়েকটি কথা লিখে রেখে সীসের পেপার ওয়েটটা চাপা দিতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ কার মুখ সম্ভর্ষণ পদক্ষেপ কাণে এসে পৌঁছুলো।

ছ'টা চোখে এক রাশ বিস্ময় ভ'রে এগিয়ে এসে ময়া জিজ্ঞাসা করলে—ও না—আপনি কখন এসেচেন, সুশান্ত বাবু?

—অনেক্ষণ। প্রায় আধ ঘণ্টারও ওপর।

—বলেন কি? মাকে দিয়ে আমার ডেকে পাঠাননি কেন? আপনার মতো আর লাজুক দেখিনি। কেন মন্টুও ত' আছে বাড়ীতে।

বলুম—মাসীমার কাছেই প্রথম গিয়েছিলুম—দেখলুম তিনি আত্মিক কর্চেন, তাই আর ডাকিনি তাঁকে।

—ছিঃ—আপনার হয় ত' অনেক ক্ষতি হ'লো কাজের। আমার ক্ষমা করবেন সুশান্ত বাবু—আমার কোনো দোষ ছিল না। আপনি এসেছেন জানলে কাপড় কাচার কাজটা আজ আমি বিকেলের জন্তই রেখে দিতুম।

বিনয় ও কৃত্যার কণ্ঠস্বরটা যেন ওর ভারী হ'য়ে ওঠে।...চেয়ে দেখলুম দীর্ঘপল্লবধন ওর ছ'টা চোখ

খুব মিষ্টি স্থির ভাবে চেয়ে আছে। ডান হাতের কম্বইয়ের ওপর কতকগুলো নিংড়ে নেওয়া কাচা কাপড় ব্লাউস ও সেমিজ নিয়ে কাঁধের ওপরেও কতকগুলো ভিজে কাপড় নিয়ে হয় ত' ঐ সোপ কেস্টি রাখবার জন্তই ও এঘরে ঢুকেছিল।

বলুম—আপনি অত ব্যস্ত হবেন না, আমার এমন কিছুই কাজ ছিল না।...অবশ্য মিথ্যা কথাই বলুম। ভদ্রতার খাতিরে অনেক সময় এমন অনেক কথাই বলতে হয়।

সেলফের ওপর সোপ কেস্টি রেখে একটু ব্যস্ততার ভঙ্গীতেই ময়া বলে,—একটু বসুন আপনি। এই তিনটি মিনিট। আমি চট্ ক'রে এই কাপড়গুলো মেলে দিয়েই আস্চি।

গতি-চঞ্চলা লজ্জাবনতা সেই মুষ্টির পানে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম—মুগ্ধ নয়নে।

একটুও বুঝি রোদ সন্ন না। সর্কাস্বে বেয়ে ওর ঘাম ঝরে। ঘামে ত' না যেন নেয়ে ওঠে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে বলে—বাপ্—যা' গরম পড়েচে।...একটু হাঁকায়ও।

হঠাৎ আমার হাতে ওর নোট খাতাখানি দেখে একেবারে বিম্বুৎবেগে ছুটে এসে খাতাখানি ছিনিয়ে নিলে। কী সে অশাস্ত অস্থিরতা!

খাতা ত' নয় যেন গোপন চিঠি।

তারপর ক্ষিপ্র হাতে খুব তৎপরতার সঙ্গেই টেবিল থেকে সমস্ত খাতাগুলো সরিয়ে রেখে অক্ষুট মুহূর্ত্তে বলে—আচ্ছা ত' চোর আপনি। ছিঃ, ঐ সব বিজ্ঞী লেখাগুলো—

হাস্তে হাস্তে বলুম—বেশ ত' না হয় চোরই হলুম, এখন কি জন্ত ডেকেচেন আমার তাই বলুন। আপাততঃ আমি সেই কথাটা জানবার জন্তই বেশী ব্যস্ত হ'য়ে পড়েচি।

অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে ও বলে,—হ্যাঁ বল্চি। এক নিমেষেই ওর সমস্ত মুখখানি কেমন যেন রক্তহীন ফ্যাকাসে হ'য়ে ওঠে...অপলক দৃষ্টিটা মাটির দিকে নিবদ্ধ ক'রে কি যেন ভাবে।

ওর মুখের ঐ ভাবান্তরটুকু লক্ষ্য ক'রে ধিমা-  
কম্পিত কণ্ঠে বল্লম—বলুন। চুপ ক'রে রইলেন যে!

ভৎসনার ভঙ্গীতে সোজা হ'য়ে বসে ও বল্লম—  
আমার পক্ষ নিয়ে নিভার সঙ্গে সেদিন আপনি তর্ক  
করতে গেলেন কেন?

আকর্ষ উদ্বেগ অতিকষ্টে চেপে সহজ ভাবেই  
বল্লম—জায়ের পক্ষ নিয়ে কলহ করাই আমার স্বভাব।  
কেন কি হ'য়েচে শুনি?

কাঁধের সামনে এলিয়ে পড়া ভিজ়ে চুল থেকে  
তখনও ছ'এক ফোঁটা জল ওর গায়ে বুকে টস্ টস্  
ক'রে ঝরে পড়ছিল। চুলগুলোকে পিঠের দিকে  
সরিয়ে দিয়ে ও আবেগ ভরা জড়িত কণ্ঠে বল্লম—খুব  
অজ্ঞান হ'য়েচে আপনার। নিভার কথার উত্তর  
আমিই ত' দিয়ে এসেছিলাম, আপনি আবার ঐ কথা  
নিয়ে কেন নাড়াচাড়া করতে গেলেন? আমার  
মান-অপমান নিয়ে আপনারই বা হঠাৎ অত মাথাব্যথা  
করবার প্রয়োজন হ'ল কেন? প্রতিবাদ করবার  
আগে আপনি যদি সেদিন একটাবারও তার ফলাফল-  
টার কথা ভাবতে পারতেন ত'হলে হয় ত' আজ—

ওর দু'টা চোখে একটা অসহায় বেদনা—একটা  
নিবিড় হুঃখের ভাবই ফুটে উঠল।

একটু থেমে আবার বল্লম—নিজের দুর্নামের জ্ঞান  
আমি হয় ত' অতখানি বিচলিত হতুম না, কিন্তু  
আমার নামের সঙ্গে আপনার নামটিকেও জড়িয়ে  
ওরা—যে রকম নির্লজ্জের মতো বিক্রী কুৎসা রটালে  
তা' সত্যিই অসহ্য। আশ্চর্য্য হই এমন নিষ্ঠুর  
আনন্দে ও মানুষের মন মেতে ওঠে?...ক্লাসে আগে যে  
সব মেয়েরা সব চেয়ে মুখচোরা লাজুক ছিল, তারাও  
আজকাল হঠাৎ পরিহাস-চঞ্চলা মুখরা হ'য়ে উঠেচে।  
ভাবচি এমন মর্শাস্তিকি লাজুনা সওয়াও অদৃষ্টে ছিল?

বল্লম—অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে  
আমি যে আপনাকে এমন ভাবে অপমানিত করব,  
তা' আগে কল্পনাও করতে পারি নি।...আমার যে  
কি অহুতাশ হচ্ছে!

অবিচলিত মুদ্রায় ও বল্লম—আর একটুও হুঃখ  
নেই মুশাস্ত বাবু। এই সব কুৎসিৎ অপবাদ শোনা  
থেকে নিকৃতি পাওয়ার একটা মাত্র যে উপায় ছিল,  
সেই উপায়ই অবলম্বন করলুম। ঠিক ক'রেচি আজ  
থেকে আর যাব না কলেজে। অবশ্য অনেক ভেবেই  
স্থির ক'রেচি। কারণ পড়াশুনো যে এত শীগগির  
ছাড়তে হবে একথা কোনো দিনই ভাবতে পারি নি।

ভয়ানক উত্তেজিত হ'য়ে বিশ্ময়কম্পিত কণ্ঠে  
বল্লম—কী! আপনি কলেজ যাবেন না? না,না,  
সে হবে না, কিছুতেই হ'তে পারে না। আমার জ্ঞান  
আপনি এত বড় শাস্তিকে যদি বরণ ক'রে নেন—তা  
হ'লে আজীবন আমার আর অহুতাশের সীমা  
থাকবে না।

ও শুধু হাসলে। বল্লম—আমার সঙ্গর স্থির।  
নইলে পড়াশুনোতে অমনোযোগ বা অনিচ্ছা আমার  
কোনো দিনই নেই। আপনি একথা মাকেও জিজ্ঞাসা  
করতে পারেন।

—তা হ'লে যাবেন না কলেজে?

—না।

—মিথ্যা দুর্নামকে ভয় ক'রে আপনি এগি ক'রে  
আপনার আত্মবিসর্জন দেবেন?...এত  
আপনি—এত দুর্বল?

—দুর্নাম মিথ্যাও খারাপ। কিন্তু এ দুর্নাম ত'  
আমারই নয়, আপনার নামেও তারা যে মিথ্যা কলঙ্ক  
দেয়।

আপনার নামের সঙ্গে আমার নামটি জড়িয়ে  
যায়, তা' বুঝি আপনি চান না—ভারী বুঝি ঘৃণা হয়?

ওর ঘর্ষাস্ত মুখখানি এক নিমেষেই আরক্ত হ'য়ে  
ওঠে। লজ্জানত চোখ দু'টা তুলে মোলারেম সুরে  
বল্লম—মানুষকে ঘৃণা করবার মতো শক্তি আজও সঞ্চয়  
ক'রে উঠতে পারি নি।

সাহস পেয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগে ব'লে ফেললুম—  
তা হ'লে বুঝি লজ্জা হয় খুব? আচ্ছা মারা দেবী,  
যদি আমরা তাঁদের মন-গড়া সঙ্কলকেই একান্ত সত্য,

পরিণত করতে পারি, তা হ'লে ত' কেউ আর আমাদের বিজ্ঞপ করতে সাহস করে না। আগের মতো নিঃশব্দেই ত' তাহ'লে আপন'র পড়াগুলো চলতে পারে।

একটা দুর্নিবার লজ্জায় সমস্ত মুখখানি ওর রক্ত গোলাপের মতোই লাল হ'য়ে উঠেছিল। মুখট. নীচু ক'রেই বল্লেন—না, কণ্ঠে যাওয়া আর কিছুতেই হ'তে পারে না।

—কলেজে না হয় না ই গেলেন আমার গ্রহণ করতেও কি সম্মতি নেই আপন'র?

সঙ্গে সঙ্গে একটু যেন বিশ্বয়ের সুরে ও বল্লেন—আমি কি জানি তার, বা রে! আপনি ওসব কথা বরং মার কাছে—

পূর্ণ যৌবনের উদ্দাম রক্তস্রোত আমার দেহের শিরায় শিরায় তখন উছলে উঠ'ছে। হঠাৎ ওর নিটোল কোমল একখানি হাত থপ্ ক'রে চেপে ধ'রে উচ্ছ্বসিত সুরে বল্লম—কিন্তু একথা আমি আপন'র মুখ থেকেই শুনতে চাই। আমার গ্রহণ করতে আপন'র সম্পূর্ণ সম্মতি আছে,—বলুন?

সবলে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে ও শুধু মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালে। তারপর একটা দুর্দমনীয় নিবিড় লজ্জাকে কিছুতেই আর গোপন করতে না পেরে দ্রুতবেগে ঘর থেকে ছুটে বেড়িয়ে গেল।

\* \* \* \*

বিচিত্র কার্যদায় অপরূপ ভঙ্গীতে নিভা অর্গ্যানের সঙ্গে কবি নজ্জুলের একটা গজল সুরের গান ধরে ছিল।

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে  
দিসনে আজই দোল।

আজো ফুল-কলিদের ঘুম টুটেনি  
তজ্রাতে বিলোল ॥

আজো হায় রিক্ত-শাখায় উত্তরী বার—  
রুচ্ছে নিশিদিন।

আসেনি দখনে হাওয়া গজল গাওয়া  
মোমাছি বিভোল ॥

হঠাৎ পাশের ঘরে একসঙ্গে অনেকগুলো গলার আওয়াজ শুনে নিভা খানিকক্ষণ অর্গ্যানটা থামিয়ে চূপ ক'রে কান পেতে রইল।

সে শুনলে তার বাপ কাকে যেন বলছেন—সে একশবার, তার আর কথা। ঐ রকম তেজী মেধাবী ছেলেই ত' বাংলায় দরকার এখন। শুধু এম-এ তে ফাষ্ট ক্লাস পেয়েচে ব'লেই বলচিনে, সুশাস্ত্র কথার ভেতরেই আমি ওর অদ্ভুত শক্তি, অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাই।

নিভা আশ্চর্য হ'য়ে শুনলে তার মেজদা নিশ্চল উত্তর দিচ্ছে,—তা ছাড়া আমরা ত' সর্বক্ষণ সুশাস্ত্রকে দেখছি। ওর প্রকৃতিও ভারী কোমল খুব, অমায়িক।

মা বল্লেন—আর দেখতেও ঠিক কার্টিকের মতো। কি দৌম্য চেহারা! আমার কিন্তু ওকে ভারী ভালো লাগে।

বাবা বল্লেন—পাভ হিসেবে সুশাস্ত্র যে খুবই কামনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে কথা হচ্ছে নিভা যদি ওকে দরিত্র ব'লে—

মা বল্লেন—ওদের পরস্পরের মধ্যে গভীর প্রীতি আছে ব'লেই ত' আমার বিশ্বাস। আমার ত' মনে হয় সুশাস্ত্রকে ও নিশ্চয়ই ভালোবাসে।

বাবা বল্লেন—শোনো নিম্ন—তুমি তা' হলে এ প্রস্তাবটা স্পষ্টই সুশাস্ত্রর কাছে উত্থাপন করতে পারো, যদি দেখো—

মেজদা বল্লেন—কিন্তু তার আগে নিভারও ত' একটা মত নেওয়া দরকার। এখন আর সে ছোটটি নয়; তা'রও ত' একটা স্বাধীন মত আছে।

মা বল্লেন—সে ত' ঠিকই। তা' আমি এখনই ডেকে আনছি নিভিকে।

মেজদা বল্লেন—তা হলে আমাকে নীচে যেতে হয়। আমি থাকলে সে একটা কথাও বলতে পারবে না।

একটা তচ্ছিন্নভর। বিরক্তিতে নিভার সমস্ত অন্তরটা শুধু একটা মুহূর্তের জন্য অতিভূত হয়ে

উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই ব্যাপারটাকে অত্যন্ত সামান্য  
বিবেচনায় একেবারে গা বাড়ী দিয়ে ফেলে সে আবার  
গাইতে শুরু করলে—

ফান্সনের মুকুল জাগা ঢুকল ভাঙ্গা

পুষ্পে ফুলে বাণ।

কুঁড়ির গুঁড়পুটে লুটবে হাসি

ফুটবে গালে টোল ॥

বাগিচায় বুলবুলি তুই—

ঘরে ঢুকেই মা বলেন— একটা কথা শুনে যা  
নিতি, বাবু ডাকচেন।

এত শীগির সজীত চর্চাটা বন্ধ করতে নিভা  
আজ মোটেই রাজী ছিল না। কারণ ‘বুলবুলি’ গানটি  
সে সবে মাত্র কালকেই শিখেছিল, আর তার মিঠে  
সুরটাও তার ভারী পছন্দসই হ’য়েছিল।

তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিনা বাধ্যব্যয়েই সে অগর্গান  
বন্ধ ক’রে মার অমুগমন করলে—কারণ তুচ্ছ হ’লেও  
ঐ ব্যাপারটা সম্বন্ধে তার কোতূহলও হ’য়েছিল  
যথেষ্ট।

মিঃ বোস বলেন—বুঝলে নেতি, সূশাস্ত্রের সঙ্গে  
তোমার বিয়ের একটা সম্বন্ধ ঠিক করছি আমরা,—  
তোমার আপত্তি নেই ত’।

উচ্চাভিলাষী দর্পিতা নিভা বাপের এই আকস্মিক  
অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে ঋণিকক্ষণ স্তব্ধ বিষ্ময়ে একেবারে  
নিষ্পন্দ নির্বাক হ’য়ে রইল। সে অবাক হ’য়ে  
ভাবলে—শেষকালে বাবাও এমন অসংগত অর্থহীন  
কথা বলতে শুরু করলেন! সূশাস্ত্রকে তিনি জামাই  
ক’রে ঘরে আনতে চান—কেন, পাত্র কি দেশে  
এমনই ছলভ হ’য়ে পড়েছে? না হয় মানলুম খুব  
রূপবান সে, খুব সুন্দর—বেশ ত’ পাঁচু গয়লা আর  
গোবিন্দ সোফারও ত’ আর কম সুন্দর নয়, তাই  
বলে—

ঘণায় বিরক্তিতে নিভার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল।  
তবু বাপের মুখের উপর একটা কর্কশ কটু উত্তর  
দিতেও সহসা তার কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকছিল।

লজ্জাজড়িত মূহু কণ্ঠে সে শুধু বলে—আমার  
আপত্তিতে ত’ আর কিছু বাবে আসবে না, বাবা!  
তোমরাই যখন বিবেচনা ক’রে—

বাধা দিয়ে মিঃ বোস বলেন—আমরা সকলেই  
একমত। কেবল তোমার একটা কথা উপরেই  
বিবাহ হওয়া না হওয়াটা নির্ভর করছে।

এই নিষ্করন কথাগুলো নিভার মনে আরও একটু  
বিরক্তির সঞ্চার করলে বটে, কিন্তু বাপের কাছে এই  
নিজের বিয়ের সম্বন্ধেই এমন ক’রে কথা বলতে সে  
যেন আজ সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়ের মতোই  
লজ্জায় দ্বিধায় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হ’য়ে পড়ল।

সে বলে—আমার কোনো মত নেই। আমি  
কিছু জানিনে।

মিঃ বোস ভাবলেন যে তাঁর মেয়ে হয় ত’ লজ্জা  
করেই একটা স্পষ্ট উত্তর দিতে পারছে না। পত্নীর  
দিকে একটা অর্থপূর্ণ কটাক্ষপাত ক’রে তিনি একটু  
প্রসন্ন হ’য়েই বলেন— তা হ’লে একটা দিন স্থির ক’রে  
ফেলা যাক—কি বলো? ... এই মাসের মধ্যেই যাতে—

নিভা এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সোফার  
ওপরে অত্যন্ত হতাশার ভঙ্গীতে আছড়ে পড়ে, ছড়িয়ে  
পড়া চুল আর লুটিয়ে পড়া আঁচলে মুখ চেপে অস্পষ্ট  
করণ কণ্ঠে বলে—আমার বিয়ের জ্ঞাত কা’রও মাথা  
ব্যথা করতে হবে না। আমি চিরকুমারীই থাকব—  
সেই ভালো আমি কা’রও—তারপর সে কি ফুঁপিয়ে  
ফুঁপিয়ে কাঁদে। ....

মিঃ বোস ও তাঁর পত্নী অনেক বুঝিয়ে তাঁদের  
সমস্ত কথা প্রত্যাহার ক’রে নিয়ে সেদিন তাঁদের  
সর্বাপেক্ষা আদরিণী কন্যাকে শাস্ত ক’রেছিলেন বটে  
—কিন্তু অনেক মিনতি অনেক সাধ্য-সাধনা ক’রেও  
সে বেলা অভিমানিনী নিভাকে আহ্বানের একটা  
কণাও মুখে দেওয়াতে পারেন নি।

\* \* \*

টিং — টিং — টিং ... ..

রিসিভারটা কাণে নিয়ে নিভার বোদি বলে—

হালো, কাকে চান আপনি ?

কে বৌদি ? ... আমি লতিকা। নিভাকে একটু ডেকে দিতে পারো ?

খুব পারি। তবে দরকারটাও অবশ্য আমার জেনে নিতে হবে।

দরকার বিশেষ কিছুই নয়। কাজ কর্ম না থাকলে ফোন্ ক'রে তোমাদের বিরক্ত করতে আনার ভারী মজা লাগে। নিভা এখন কি করছে ভাই ?

আমার 'তাঁর' সঙ্গে তেতলার ঘরে বিলিয়ার্ড খেলচে।

কার সঙ্গে বুঝলুম না। তোমার 'তাঁর' সঙ্গে মানে ?

ইস্! কচি খুকী আর কি! ... ছধ খাবে ?

ভাল কথা, বৌদি, সুশাস্ত বাবু তোমাদের ওখানে এর মধ্যে গেছলেন কোনো দিন ?

পরশু এসেছিলেন, কেন, বল ত ?

এমনি জিজ্ঞেস করলুম। নিভা বুঝি ঐ ব্যাপারের পর আর কথাও বলে না তাঁর সঙ্গে ?

অতটা লক্ষ্য করিনি। তবে ঠাকুর কি আজকাল কেমন যেন হঠাৎ একটু উদাসীন গভীর হ'য়ে পড়েছে ব'লে মনে হয়। যে সুশাস্ত বাবুর কথা উঠলে আগে তার বিরক্তির সীমা থাকত না, আজকাল তাঁরই প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠে—অপর কেউ তাঁর কথা ব'লে উন্মুখ আগ্রহে কাণ পেতে থাকে।

আশ্চর্য্য! তুমি বলচ কি বৌদি ?

এক বর্ণও মিথ্যা বলচিনে ভাই। ওর এই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে প্রথমটা আমরাও ভারী আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছলুম—কিন্তু পরে বুঝলুম ও বোধ হয় এতদিনে ওর ভুল বুঝতে পেরেচে। সুশাস্ত বাবুর দারিদ্র্যকেই ও বোধ হয় আজ সম্মান করতে শিখেচে। ...

খুব অদ্ভুত ত! তা' সে যাক্, তুমি একবার ত'কে ডেকে দ্যাও বৌদি। তার পরিবর্তনটুকু প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝতে ভারী কৌতূহল হচ্ছে আমার।

বৌদির সঙ্গে আর ছুটে ছুটে ঘরে ঢুকে

ফোন্টা হাতে নিয়েই নিভা বলে—কি গে! স্বর্ণলতিকা! ... না না লতি—লতি পটোল লতি আমার! হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে—সূর্য্য আজ কোন্ দিকে—

বাধা দিয়ে লতিকা বলে—তোর কাব্য পরে শুনব। এখন বল দিকিন্ হঠাৎ এমন ডুমুর ফুল হ'য়ে উঠল কেন? আজ তিন দিন কলেজ বাসনি, ব্যাপার কি ?

রোজই যে কলেজে যেতে হবে তার ত কোনো মানে নেই। কেন আমার বিরহ বুঝি খুব তোর অসহ হ'য়ে উঠেছিল ?

আবদারের ভঙ্গীতে লতিকা বলে—তবু ভাগ্যি আমার, তুই ধরতে পেরেচিস্। এমন দরদী বন্ধু কি আর সকলের ভাগ্যে জোটে? সে যাক্, একটা খুব ভালো খবর আছে। বোধ হয় শুনচিস্ ?

না, কি খবর ভাই? খুব উৎসুক হ'য়ে নিভা জিজ্ঞাসা করলে।

লতিকা বলে—সুশাস্ত সেন এবার ভারতীয় সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় একেবারে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। বাবার ও বাঙালীর আজ কি গৌরবের দিন!

একটা অনির্বচনীয় গর্ভ ও আনন্দের দীপ্তি নিভার সমস্ত মুখখানিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। অবাক হ'য়ে সে ভাবলে—সুশাস্ত বাবু আই সি-এস্? সত্যিই ত এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য অধিক সম্মান বাঙালীর ছেলের আর কি হ'তে পারে? আজ তিনি সমস্ত বাংলার—

নিভা আর ভাবতে পারলে না। কথায় পুষ্টকের বাণ ডাকিয়ে সে বলে—ওঁর সমস্ত পরিশ্রম আজ সার্থক হ'য়েচে, এর চেয়ে তৃপ্তি আর নেই।

লতিকা বলে—মায়ার সঙ্গে আজ সকালে অনেক সরস রঙীন গল্প করলুম। শুনলে সুখী হবি নিশ্চয়ই মায়ার সঙ্গে সুশাস্ত বাবুর এই ২৭শে আষাঢ়ই বিয়ে হবে। কথাবার্তা কাল একেবারেই পাকাপাকি হ'য়ে

গেছে! সব দিক্ দিয়েই বেশ মানাবে কিন্তু।  
একেবারে মণি-কাঞ্চন যোগ।

অকস্মাৎ সমস্ত পৃথিবীটা যদি ভুমিসাৎ হ'য়ে যেত,  
তা হ'লেও বোধ হয় নিভা অতখানি আশ্চর্য্য হ'ত না।  
অবশ্য কল্পিত হাতে কোনও রকমে ফোনটা ধ'রে  
রেখে সে উদ্‌গ্রীব উচ্চকিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—  
সুশান্ত বাবু মাঝাকে বিয়ে করবে—তুই ঠিক জানিস্  
লতিকা?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ—কেন তোমার আবার—

না—না দূর! কি যে বলিস্ তার ঠিক নেই।

উত্তরের প্রতীক্ষাও না ক'রে নিভা টেলিফোনটি  
টেবিলের ওপর রেখে একলা ঘরে অত্যন্ত বিষন্ন মনে  
চুপটি ক'রে ব'সে রইল। মাঝার ভবিষ্যৎ সুখ  
দোভাগ্যের কথা ভেবে সে এক হৃদয় ও আর স্বস্তি  
পাচ্ছিল না। আই, সি, এন্স এর ভাবী পত্নী এই  
ধনী বিজ্ঞানী মাঝাকে আর কি আগের মতো সে অবজ্ঞা  
উপেক্ষা করতে পারবে? ক্রোধে হিংসায় নিজার  
অভিমানী অন্তর ভয়ানক রোধে গর্জন ক'রে উঠল।  
জোড় ক'রে সে ভাবলে—না—না মাঝা কিছুতেই  
সুশান্তর যোগ্য নয়, তার মতো সুপুরুষ বিদ্বান স্বামী  
লাভ করা মাঝার পক্ষে কোনো রকমেই যুক্তিযুক্ত  
হ'তে পারে না।

হঠাৎ সুশান্তর চেহারাটা তার চোখের সামনে  
ভেসে উঠল। সুঠাম বলিষ্ঠ গঠন—কি নির্ভীক  
স্বন্দর সে চেহারা! ঐ উচ্ছ্বসিত অফুরন্ত সৌন্দর্যের  
পানে চেয়ে যুগ যুগান্তর ধরেও বোধ হয় স্বপ্নের আশা  
মেটে না। ...

নিজের মূর্খতার কথা ভেবে নিভা অনেকক্ষণ স্তব্ধ  
হ'য়ে ব'সে রইল। তার মস্তিষ্কে ভেঙে ব'য়ে পড়ল—  
একটা হাহাকার ভরা দীর্ঘ শ্বাস। অন্তরের বেদনাকে  
কিছুতেই সংযত করতে না পেরে অবশেষে সে অধোর  
নয়নে কাঁদতে লাগল—খুব নিঃশব্দে।

এক বছর পর। ...

খুব সম্ভ্রান্ত বংশে ধনী ঘরের ছেলের সঙ্গেই  
নিভার বিয়ে হ'য়েচে কিন্তু নিভা সুখী হ'তে পারে  
নি। বিবাহের প্রথম কয়েক মাস স্বামীর প্রেমের  
উল্লাস ও ব'গ্রতার মধ্যে সে কিছুই টের পায় নি বটে,  
কিন্তু তারপর তাঁর স্বরূপ চিন্তে নিভার একটুও দেরী  
হয় নি।

সমস্ত রকম সাধ আত্মলাদ পিপাসা মিটিয়ে নিয়ে  
জীবন নারীত্বকে পিষে চূর্ণ ক'রেও যে মোহাম্মদ পুরুষ  
পরিভূষণ হয় না, বিভিন্ন দলের মধু আশ্বাদন করবার  
একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তখনও যে তার বুকে জেগে  
থাকে, একথা নিজের স্বামীকে দিয়েই নিভা এই  
প্রথম বৃত্তে পারলে। ... স্বামীর জ্ঞাত সারারাত্রি  
অপেক্ষা ক'রেও তাঁর দেখা না পেয়ে, একেবারে  
নিঃসঙ্গ অবস্থায় কত বিনীত রজনীই যে তাকে  
কাটাতে হয়েছে, তার আর সংখ্যা নেই।

এমনি ক'রেই দিন যায় ...

\* \* \*

শ্রাবণ পূর্ণিমার রাত্রি। দিলদরদী খুশ মেজাজী  
চাঁদ সেদিন যেন একটু বেশী রকম উদার হ'য়েই তার  
বুকের সব আলোটুকুই একেবারে পৃথিবীর বুকে উজ্জার  
ক'রে ঢেলে দিয়েছিল। প্রেমময়ী জ্যোৎস্নার এই  
নয়নকান্তি দেখে অত্যন্ত অকবি অসাড় প্রাণও বোধ  
হয় চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুমবার ব'র্থ চেঁচা ক'রে নিভা  
কেবলই বিছানায় এপাশ ওপাশ করছিল। কিন্তু  
ঘুমহীনতার ঘুমের ভাব ক'রে পড়ে থাকার মতো  
অস্বস্তি বৃদ্ধি আর নেই। ... কিছুতেই ঘুমতে না  
পেরে শেষকালে সে অস্থির বিরক্ত হ'য়ে উঠে বসলে।

চাঁদের আলো খোলা জানুলা দিয়ে তার বিছানার  
ওপর যেন ছুঁঁয়া আবেগে কাঁপিয়ে প'ড়েছিল। সুইচ  
না টিপে জোছনার আলোতেই সে ঘড়ির দিকে চেয়ে  
দেখলে ছটো বাজতে তখনও আর দশ মিনিট বাকী।  
স্বামীর বাড়ী আসা সম্বন্ধে আজও হাল ছেড়ে দিয়ে নে  
অশান্ত পায়ে ঘরের মধ্যে খানিক পায়চারী করলে।

তারপর কি মনে ক'রে হঠাৎ বাস্তু খুলে শশাস্ত  
ও নিজার সম্প্রতি তোলা একখানি ফটো বার ক'রে  
জান্নার ধারে মেঝের ওপরে গিয়ে বসলে। ...অপলক  
হির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ সে সেই সুখী দম্পতীর পানে  
চোরে রইল। ... ..

.....মায়ার এই সুখ পোভাগ্যের কথা ভেবে  
অনেক দিন পর আবার সে ভারী অধৈর্য্য অস্থির হ'য়ে  
উঠল। শশাস্তর পাশে তার ঐ প্রসন্ন দৃষ্টি আর  
অনাবিল হাসিটুকু একটা মৃত্যুশয্যা শাপিত ছুরির মতোই  
অতি কঠোর ভাবে তার বুক বিধ্বস্ত লাগল।

.....একদম কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হ'য়েই সে  
তখন একটা পেন্সিল দিয়ে মায়ার ছবিটা অঁচড়ে  
অঁচড়ে একদম বিস্তী বিকৃত ক'রে দিলে।

তারপর নিবিড় অমরাগ ভরে শশাস্তর ছবিটা খুব  
কাছে আনতেই সে তা'র মধ্যে মায়ার চেহারাটাও  
যেন খুব স্পষ্ট ক'রেই দেখতে পেলে।..... বিরক্তিতে  
বিভ্রাণে একদম উদ্ভ্রান্তের মতোই ছবিখানিকে  
টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে, হতাশ হ'য়ে নিভা  
বিছানায় লুটয়ে পড়ল। তারপর—

ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক যেমন একটা সর্কগ্রাসী বুড়ুকা  
নিষে খাওয়ার পাত্রটার পানে ঝুঁকে পড়ে, ঠিক তেমনি  
ভাবে এই সজোস্ত্র-যৌবনা প্রেমবিক্রিতা নারী, তা'র  
বাগ্র ব্যাকুল বাহু মেলে একটা বালিশকে জোরে বুক  
অঁকড়ে ধ'রে নিঃসাড়ে বিছানায় পড়ে রইল—  
অনেকক্ষণ, বাকী সমস্ত রাতটুকু।

## দশের পূজা

### পূজারিগণ।

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ১। শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়।    | ৬। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সরকার বি, এ।          |
| ২। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।        | ৭। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।                  |
| ৩। শ্রীসত্যচন্দ্র সেনগুপ্ত।       | ৮। শ্রীহিমালয়মোহন চট্টোপাধ্যায়।           |
| ৪। শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি, এল। | ৯। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।                   |
| ৫। শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ এম্. এ।     | ১০। শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্. এ, ডি, এল্ |

### সপ্তম পূজা।

#### অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বিমল বোঁকের মাথায় পথে বাহির হইয়া পড়িল।  
প্রতিমাকে সে যে অনেকদিন হইতেই ভালবাসিতে  
আরম্ভ করিয়াছিল, সে ভালবাগা ছিল তাহার হৃদয়ের  
নিভৃত গোপনপুত্রে, সেখানে প্রেমের দেবতা যে  
আকাজক্য বানী বাজাইতেছিলেন, সে সুরে তাহার

চিত্ত অনেকদিন হইতেই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—  
কিন্তু কোন দিন তাহা আত্মপ্রকাশ করে নাই।

সে হৃদয়ের এই পরিবর্তনটা নিজে অনেকদিন  
হইতেই বুঝিতে পারিয়া প্রথমটায় সংযমের চেষ্টাও যে  
না করিয়াছিল তাহা নয়। কিন্তু পারে নাই,—পারে



নাই বলিয়া কোনদিন অজ্ঞানের প্রশ্রয়ও সে দেয় নাই। তবে তাহার মনটা হইয়া গিয়াছিল অতিমাত্রায় উদাসী ও চঞ্চল। কলেজের পাঠ্যপুঁথির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সেইখানে প্রতিমার মুখখানি ফুটিয়া উঠিত, অক্ষপাঞ্জের জটিল মীমাংসার দিকে মন না বাইয়া হঠাৎ তাহার শেলি ও রবীন্দ্রনাথ এবং বিশেষ করিয়া শ্লেমিক কবি বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রতি আকর্ষণটা একটু বেশীমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল—প্রতিমাকে পাইবার মত আশা তাহার মনে অনেক সময় হ্রাশা বলিয়াই মনে হইয়াছে। ডাঃ বোসের মত সমাজে পদস্থ ও গণ্যমান্য ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করিবার মতো হ্রাশাকাজ্জা সদাগর আফিসের কেরানীর ছেলের পক্ষে যে অসম্ভব এ কথাটাও অনেক সময়ই ভাবিয়াছে, কিন্তু কুতুমসায়ক অলক্ষ্যে থাকিয়া কখন কাহার জুদয়ে যে শর-সন্ধান করেন তাহা বোঝা বড় কঠিন।

বিমল পথে বাহির হইয়া পড়িল। মাহুষ হঠাৎ উদ্বেজনার বশে যেমন করিয়া কোন না কোন একটা অস্বাভাবিক কাজ করিয়া ফেলে, এ কাজটাও ঠিক সেই রকম।—প্রতিমার কণ্ঠে কিছুকাল আগে যে সুরের আলো ভুবন ছাইয়া ফেলিয়াছিল, সে সুর বিমলের উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠের ‘আমি তোমায় সত্যি ভালবাসি’ এই মধুর কোমল সন্ধ্যাষণেও ধ্বনিত হইল না।—হইতে পারে না—কেননা সে বিলাত ফেরত পরিবারের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিলেও জয়ন্তী দেবীর শিক্ষার গুণে শৈশব হইতেই আপনাকে সংযত ও আত্ম-মর্যাদা জ্ঞানে দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। ঐ ছোট মেয়েটির বৃকে এক দিকে যেমন প্রীতির শত-দলটি চল চল করিত, তেমন অল্প দিকে সাহস, তেজ ও নারীত্বের গর্জনা বেশ জাঁকিয়াই বসিয়াছিল। বিমলের তরুণ স্তম্ভর দেহের অটুট স্বাস্থ্য ও রূপ তাহার মনের মধ্যে কোনও ছাপ বসাইয়া দেয় নাই একথা বলা চলে না, কেননা প্রণয়, প্রেম, ভালবাসা এ সকল বড় বড় কথা উপজ্ঞানের পাতায় পড়িলেও বাস্তব জীবনে ব্যাপারটা যে কি সে বিষয়ে তার কোনও

ধারণা ছিল না। কাজেই সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে পাগলের মতো বিমলের দুই হাতে তাকে জড়াইয়া ধরা ব্যাপারটা প্রতিমার দেহ ও মনে দাক্ষণ লজ্জা ও অপমানের জ্বালা দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিসের, কেন এ অপমান?—অসহায় নারীকে আপনার হাতের কাছে পাইয়া যে পুরুষ অপমান করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করে না—তেমন কাপুরুষকে পশুর সংজ্ঞার উপরে আর যে কোন সংজ্ঞার অভিহিত করিতে ইচ্ছা হয় না—তাই সে ক্রোধে ও অপমানে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—যান, এতুনি চলে যান আপনি।—একথা বলিতে তাহার এতটুকু শঙ্কা, লজ্জা বা ভয় হয় নাই।

বিমল শাকুলার রোডের দিক্‌টা ধরিয়া শিয়ালদহের মোড়ে আসিয়া হারিসন রোডটার ওখানে ট্রাম ধরিবার চেষ্টা করিল। ট্রাম আসিতেছে এমন সময় পকেটে হাত দিয়া দেখিল মাত্র চারটি পয়সা আছে, কাজেই ট্রামে না উঠিয়া এবং বিশেষ করিয়া, এই অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে পথ চলা অপেক্ষা মোড়ের ছোট চায়ের দোকানটতে ঢুকিয়া পড়িল।

সে সময়ে চায়ের দোকানে মাত্র চার পাঁচটা প্রাণী বসিয়া জটলা করিতেছিল। কোণের কয়লার চুল্লীটার কয়লাগুলো জলিয়া জলিয়া রক্ত চক্ষে চাহিতেছিল। চায়ের জলের ক্যাটলিটা তাহার উপর চড়ান ছিল। বিমল দোকানে ঢুকিতেই একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—“আহা! বড় ভিজছে যে! তাড়াতাড়ি জামা কাপড়গুলো ছেড়ে ফেল! অসুখ করবে যে।” তারপর দোকানের কর্তাকে সোধোন করিয়া বলিলেন—“ওহে কানাইলাল, একখানা শুকনো কাপড় দেও না, তাই, আমার গাধের রূপারখানা দেবো এখন, বেচারি বড় ভিজছে।” কানাইলাল নিমেষ মধ্যে ভদ্রলোকটির আদেশ পালন করিল। বিমল প্রথমটায় একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষটার শ্রোত ভদ্রলোকের উপদেশ গ্রহণ করিল। দোকানের চাকরটি বিমলের কাপড়, চাদর ও জামা উত্তুনের পাশে

কেলিয়া দিল। বিমল এইবার বেশ আশ্রয় বোধ করিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির আদেশে অতি শীঘ্র এক পেয়ালা গরম চাও আসিল। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া তাহার প্রাণে নূতন শক্তির সঞ্চায় হইল। বাহিরে তেমনি অবিশ্রান্ত ধারে বৃষ্টির ধারা বরিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে কড়্ কড়্ করিয়া বজ্র ডাকিতেছে—শুম্ শুম্ করিয়া মেঘ ডাকিতেছে। বিমলের মনের উত্তেজনা এখন অনেকটা হ্রাস পাইলেও এই প্রতিজ্ঞাটা তাহার মনে দৃঢ় করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল যে সে আর এ জীবনে ভাস্কর বহুর বাড়ীতে ফিরিবে না—সেখানে সে আর তাহার এ মুখ দেখাইবে না! কোন্ মুখে সে প্রতিমার কাছে গিয়া দাঁড়াইবে? তারপর কথাটা যদি কোন রকমে তাহার পিতা ও মাতার কাণে যাইয়া পৌঁছে—তবে তাঁহারা কি মনে করিবেন? কলিকাতা থাকিলে কোন না কোন দিন যদি ডাঃ বহুর পরিবারের লোক-জনদের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে—তবে তাহার অবস্থাটা যে অতি লজ্জাজনক হইয়া উঠিবে। বিমলকে এইবার সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হইতে দেখিয়া প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন—বড় ভিজছে, বাবা, তোমার বড় কষ্ট হয়েছিল, কেন এ বাদলার বেকুলে বলত? নেহাৎ দায়ে না পড়লে কি কেউ এমন সময় বেরয়?

বিমল কহিল—‘অমনি বেরিয়েছিলাম।’

‘এমনি! আশ্চর্য্য বটে। তোমার নামটি কি বলত?’

‘আজ্ঞে, বিমলকান্ত রায়।’

‘পড়াশুনা কিছুর?’

‘হাঁ, বি, এ ক্লাসে পড়ি, তবে আর পড়বো না।’

‘কেন?—বলতে যদি কোন বাধা না থাকে তা হলে বল।’

প্রথম হইতেই এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির সম্মুখে সম্ভাষণে বিমল মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, তাই নিঃসঙ্কোচে অনেক কথা না বলিয়াও প্রকৃত সত্যটা বলিয়া গেল। একটা মোটা রকমের বর্মা চুপ্ত ধরাইয়া ভাবিতে

ভাবিতে ভদ্রলোকটি কহিলেন—তাইত হে, এ বয়সে পড়াশুনাটা ছেড়ে দিলে কি ভাল হবে? কথা কয়টি অতি ধীরে ধীরে কহিলেন।—পাশের বেঞ্চখানিতে আরও তিনটি লোক বসিয়া চা পান শেষ করিয়া তামাক টানিতেছিল। তাহাদের কেহই যে ভদ্রলোক নয় তাহা বেশ বোঝা যাইতেছিল। পরিধানে নোংরা কাপড়, ছেঁড়া জামা, শত তালি দেওয়া জুতা, সকলেরই মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কেহ সিগারেট কেহবা দোকানের চাকরের ডাবা ছকাটা টানিতে টানিতে থিয়েটার, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি নানা কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিল,—তাহাদের কাছে বিমলের ও এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কথাবার্তা তেমন ভাল লাগিতেছিল না। তাহারা যে মাঝে মাঝে এমন ভাব ভঙ্গী ও হুই একটা অশ্লীল রসিকতা করিতেছিল তাহাতে সে ভদ্রলোকটি বিরক্ত হইয়া কহিলেন—‘দেখ বিমল, এই বাদলা যে হু’এক ঘণ্টার মধ্যে ধরবে তা ত মনে হয় না। যদি তোমার কোন বাধা না থাকে তাহলে আমার সঙ্গে চল। একটা টেক্সি নেওয়া যাক।—বিমল এইরূপ অসম্ভাবিতরূপে একজন হিটলারী ব্যক্তিকে লাভ করিয়া হৃদয় অনেকটা হাল্কা বোধ করিল। কিন্তু মনে মনে আবার এইরূপ আশঙ্কা হইল যে এই লোকটা যদি কোন বদমায়েস হয় তাহা হইলে হয়ত বা তাহাকে নানারূপে বিপন্ন করিতে পারে। আবার তখনি মন হইতে সেই বিপদের ও শঙ্কার ভাবটা দূর হইয়া গেল। না, না, এমন সুন্দর সৌম্যমুষ্টি, এমন করুণায় ছল ছল চোখ দুটির মধ্যে কোনরূপ অত্যায়ে গোপন করিয়া চলা কোন মতেই সম্ভব নয়।

টিক্ সেই সময়ে জলে ভরা পথের জল ছিটাইয়া ছল্ ছল্ শব্দ করিতে করিতে একখানা টেক্সি সেই পথ দিয়া শিয়ালদহের দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল,—ভদ্রলোকটি ঐ গাড়ীখানা ডাকিয়া তাহাতে বিমলকে লইয়া উঠিলেন। টেক্সিওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল—‘কাঁহা যানে হোগা, হজুর?’ ভদ্রলোকটি পকেট

হইতে একটা চুকট বাহির করিয়া নিপুণ হস্তে ধরাইয়া বলিলেন,—“বালিগঞ্জে।” গাড়ী ছুটিয়া চলিল। বিমল বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া চুপ্ করিয়া গাড়ীর মধ্যে বসিয়া রহিল।

( ২ )

প্রতিমা বিদ্যাবিশিষ্টার মত বেগে আপনার শুইবার ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিমল ঘরের বাহির হইয়া গেল—সেই দারুণ অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যেও সে চলিয়া গেল তাহাতে তাহার মনে এতটুকু আঘাত লাগিল না। তাহার কাছে বিমলের এই আচরণটা কেবল নিম্ননীয় নয় অত্যন্ত অপমানজনক মনে হইল। সে ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তখনও মেঘে সারা আকাশ আচ্ছন্ন। বম্ বম্ বম্ বম্ করিয়া বর্ষণ চলিয়াছে। সে তাহাকে সমুদয় চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার হাত হইতে মুক্ত করিয়া যখন স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইল, তখন মনে হইল—সে যে মনে মনে বিমলকে ভালবাসে, সে কথা ত একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। তবে সে ভালবাসা বা অনুরাগ তখনও ভাল করিয়া বুঝিবার বয়স তাহার হয় নাই। আর ভালবাসিলেই কি কাহারও এমন কোন অধিকার আছে যে প্রেমাস্পদকে সে অপমান করিতে পারে?—কোন সাহসে কোন হীন ঘৃণ্য প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সে এমন করিয়া তাহার অপমান করিল? এ আঘাত এ অপমান সে কোন মতেই মন হইতে দূর করিতে পারিল না। এ অপরাধের মার্জনা নেই—নেই। বিমলের প্রতি তাহার যে প্রীতির একটা আকর্ষণ নিবিড় ভাবে জীবন্ত হইয়া উঠিতেছিল,—সে পণ করিল

—ঝড়ের বেগে গাছ উপড়াইয়া যেমন শিকড় শুদ্ধ বাহির হইয়া পড়ে পৃথিবীর বুকে আর তাহার কোন যোগ থাকে না, বিমলের সম্বন্ধে সমুদয় স্মৃতি তেমনি কিয়া সে ক্ষণ হইতে উপড়াইয়া ফেলিবে। তাহার এই সাধনা সফল হউক—মনে মনে বিধাতার কাছে সেই প্রার্থনা জানাইল।

মেঘের আড়াল দিয়া কখন বেলা পড়িয়া গেল। কখন মেঘে ঢাকা আকাশের অন্ধকারকে আরও নিবিড়তর করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নামিয়া পড়িল, সেদিকে তাহার কোন লক্ষ্য পড়িল না। রেখা একটা ঘরে সেলাই লইয়া বসিয়াছিল,—লেখা তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যখন সে আগিয়া উঠিয়া জননীকে অতিরিক্ত মাত্রায় বিরক্ত করিয়া তুলিল—তখন ধীরে ধীরে রেখা লেখাকে বুকে করিয়া আসিয়া প্রতিমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। রেখা ধীরে ধীরে ডাকিল—প্রতিমা। প্রতিমা প্রথমটার শুনিতাই পায় নাই। রেখা ছ’তিন বার আহ্বান করিবার পর প্রতিমা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল—কে, দিদি?

হাঁ, বোন—একটু লেখাকে ধর। ওকে যে সামলাতে পারি না। ছটুমেয়ে আমাকে একেবারেই কাজ করতে দিচ্ছে না। প্রতিমা রেখার কোল হইতে লেখাকে টানিয়া লইয়া অজস্র চুখনধারায় আচ্ছন্ন করিয়া দিতে লাগিল। দাসী আসিয়া আলো জালিয়া দিল। বিছাতালোকে কক্ষটি ঝলমল করিতে লাগিল।





( পূর্বপত্রের শেখাংশ )

কি করে নিষ্ঠুর হত্যা করেছি জান ? রাত্রিতে টেলিফোনের ( Telephone ) তার হাতে লুইস্‌গান অথবা মেশিন গান ধরে মাটির নীচে গর্ভে বসে কোয়ার্টারে পাহারা দিতে হয়। কম্পাউন্ডের চারিদিকে তার দিয়ে ঘেরাও করা। সে সব তারের সঙ্গে ফোনের যোগ আছে। অতর্কিতে যে কোনো জানোয়ার বা যে কোনো জীব তারের উপর এসে পড়লে তার আর রক্ষা নেই। ফোনে দিক্ বলে দেবে—আর অম্নি গুলী চালাতে হবে। কারো বাঁচবার উপায় নেই। কোনো দয়া মায়া নেই—এ নিষ্ঠুর বৃকে কোমলতার প্রশ্রয় নেই।

হয়ত কোনো দূরদেশাগত পথিক বছরদিন পর তার প্রিয় সন্তানদের জন্তে, বহু কষ্টোজ্জিত অর্থে হয়ত খেলনা নিয়ে যাচ্ছিলো,—প্রিয়তমা পত্নীর জন্তে তার কোনো প্রিয়বস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিলো—বেশী করে ভালোবাসা উল্লস করে নেবে বলে—বৃদ্ধা মা'র জন্তে হয়ত একখানা বস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিলো—মায়ের শুভাশীষ প্রার্থনা করবে বলে কত বাগ্নি হয়ে ছুটে চলেছিলো সে। অন্ধকারে পথ ভুলে তারের উপর এসে পড়েছে—অম্নি গুলী খেয়ে মরেছে। তার সব আশা নিমেষে চিরতরে মিটে গেলো! আবার কেহ হয়ত রাস্তার দূরত্ব কমানোর জন্তে তারের বেড়া পার হ'তে যাচ্ছে—অম্নি মরেছে। এ যে কাদের আত্মনা হয়ত তারা জানে না, কিন্তু তা'হলে কি হয়—এলেই মরতে হবে।

এমনি রকম কত হত্যা করেছি কি বলব ? কত অনাধার একমাত্র পুত্রের আশ্রয় নিয়েছি—কত

তরুণীর প্রিয়তমকে তার তরুণ-হৃদয় থেকে চির-বিদায় করেছি—কত শিশুকে তাদের পিতার অনাবিল স্নেহ থেকে চির-বঞ্চিত করেছি—কত বলব ?

উঃ—সব চেয়ে একটি কথাই ভীষণ ভাবে আমাকে আঘাত করছে। সে কি নিষ্ঠুরের কাজই না আমি করেছি ?—এই রকমই এক দিন ডিউটি করছিলাম। হঠাৎ পূর্ব কোণের তার বেজে উঠল। অমনি ফায়ার করলাম—সঙ্গে সঙ্গে একটা অম্পষ্ট চীৎকার শুনলাম। পরদিন সকালে দেখলাম ওই ওপাড়ার এক হোটেলওয়ালার ছেলে ওষুধের শিশি হাতে। আমি তাকে চিন্তুম তার বাবার যে আজ ক'দিন থেকে ভয়ানক অসুস্থ, তা'ও জানতুম। ক'ল তাড়াতাড়ি ছুটে যেতে তার এই সর্বনাশ হলো।

অনেকক্ষণ ভেবে ঠিক করলাম তার বাবাকে এ খবর আমার দিতেই হবে। তাই গেলুম। উহ্ বৃক ভেঙে যাচ্ছে—যেইমাত্র এ নিষ্করণ কাহিনী বর্ণনা করলাম সেই মুহূর্তেই সে, সেই আঘাতে হার্টফেল করল। সে দিন এ পাষণ্ড বৃক চিরেও একটা দীর্ঘ তপ্তাশ ঠেলে উঠেছিলো—নয়নের কোণে ছ-ফোঁটা অশ্রু জমেছিলো।

হয়ত এ শোচনীয় মৃত্যু দেখেও আমার বৃক কঁপে উঠেনি। কঁপেছিলো ন্যাথির অবজ্ঞাভরা দৃষ্টি দেখে। আমি ভাবছিলাম কি প্রত্যাশকারী না আজ করলাম। তাঁর প্রিয় ভাইটিকে জন্মের মতো তাঁর কাছ থেকে চির বিদায় করেছি। তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারিনি, তাই, আবার তাঁকে অসহায় করে তাঁর

পিতাকে ও পথে পাঠিয়েছি। সবই মনে পরে—কি যত্নে ন্যাথি আমাকে ক্ষুধার আহার দিতো আর কত রকমে আমাকে আনন্দ দিতে চেষ্টা করত। যেদিন রেশন (Ration) আমাদের কম পড়ত সেদিন ন্যাথিইতো আমার এ ক্ষুধার আহার যোগাত। সে যে আমার ভাইয়ের মতো ভালোবাস্ত, বন্ধুর মতো সাথে সাথে থাকত! আজ কি সাশ্বনা দেবো তাকে? কি সঞ্চল আছে আমার?

কিন্তু আমিই বা কি করব? দোষ আমার থাকলেও নেই। আমি যে ছকুমের দাস। যা আমাকে করতে বলবে তা যে আমাকে করতেই হবে। টু শব্দটি করবার যো নেই তা'হলে যে আমাকেই গুলী খেয়ে মরতে হবে? আমার সাশ্বনা আমি কর্তব্য করতে গিয়েই তাদের হত্যা করেছি।

রাণী আমার!!! আজ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের বা পেছনের কথা কোনো দিন আমাদের ভেতর আলোচনা হয়নি, হতে পারেনি। কারণ, তার অধিকার তুমি দাওনি। সেজন্তে তোমাকে মোটেই দোষ দিচ্ছি।

কিন্তু আমার বরাবরই কি রকম একটা বিচ্ছেদের চিন্তা মনের কোণে কাঁটার মত খচ্ খচ্ করছে। আমার মনে হচ্ছে,—আমাদের মিলন সুদূরপর্যন্ত। আমাদের দেখাশুনা আলাপ পরিচয় সব শেষের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাই বোধ হয় আমি কার ঐ সাবধান বাণী শুনি—তোমাদের এই শেষ, এই শেষ!!!

সত্যি, আমারও মনে হচ্ছে যে, তোমাকে পাশে পাবার ভাগ্য আমার হবে না কোন দিন। আমি ঠিক দেখছি আমার যে বোটার ঘায়ে মৃত্যু হবে আশ্রানীর বাক্স থানায় তা' জমা হয়ে আছে। হয়ত আমার গার্ডের মত দশাই হবে আমার। ওই কবলের নীচে ওই অম্মনি করে শুয়ে থাকব। কেউ মাটি দেবার থাকবে না বা পোড়াতে যাবে না। তাই ভাল, আমার তাই ভাল! তোমাকে হারাবার চেয়ে আমার মৃত্যুই ভাল।

কিন্তু যখন ভগবানের অভাবনীর দানের কথা

ভাবি, তখন বিশ্বের নির্বাক হয়ে যাই। তুমি এ কথা কোনো দিনই হয়ত মনে কর না কিন্তু এতে আমি সন্তুষ্ট না হ'য়ে পারছি না। তুমি যে কোনো দিন আমার দরদ করবে তা' ছিল আমার আশার অতীত—আমার প্রাণের চেয়েও অনেক বেশী। আর যুদ্ধের মধ্যে যে প্রেমের আমল পড়বে এই টুকুই যে অভাবনীয়?

কতদিন আমি এর জন্তে অপেক্ষা করেছি তা' তুমি জান। তারপর হতাশ হয়েই এখানে এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছি। এখানেই আমি আমার জীবনের সমস্ত স্নেহ মমতার বিসর্জন দিয়েছি। তারপর শেষ মুহূর্তে ঐ আশ্রয়ের ছক্কারের মাঝেই আমি তোমাকে পেয়েছি—আমি ধন্ত হয়েছি।

এত সব আশা করা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। মুখের নানা কলনায় ও মতলবে একেবারে বিভোর। এই করব, এই হবে, হাতের মুঠোয় সব রাখব! হাঃ! হাঃ!! হাঃ!!! দেখেছ কি পাগলামী আমার? তুমি হয়ত হেসেই খুন হচ্ছে! আমি নিজেও যে না হেসে থাকতে পারছি না আমার কাণ্ড দেখে?

থাক, আমি স্থির করেছি, তোমার সবকিছু কোনো আশাই ছদয়ে পোষণ করবো না, তা' হলে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে অন্ততঃ যতদিন যুদ্ধ থাকবে। আমার জীবনে তোমার এই ক্ষণিকের আবির্ভাবই যথেষ্ট। এর বেশী আমি চাই না, চাইলেও হয়ত পাব না—তাই চাইবও না।

তবে, আর একবার যদি চিরকালের মতো তোমাকে একটু দেখতে পেতুম, মনে মনে তোমাকে আমার পূজা জানাতে পারতুম আমার সাহস, শক্তি, আরো বেড়ে যেত! ঝগ করো না লক্ষ্মী! যত কিছুই ভাবি না কেন, যত কিছুই লিখি না কেন, —তোমাকে ছাড়া আমি মোটেই নই।

আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমার প্রেমে পড়ে, তোমার ভালোবেসে, কত মধুর, কত গৌরবান্বিত

হয়েছি জীবনে। যদি আজই এই জীবনকে বিদায়  
সম্ভাষণ দিতে পারতুম, তবে কত শান্তিই না জানি  
পেতুম ! বিদায়ের ক্ষণে তুমি যেমন হাত ছিনিয়ে,  
মাথা নেড়ে, দোড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়েছিলে—  
ওই রকম করে, জীবন থেকে বিদায় নিতে, আমারও  
সাধ হয়।

আমি আর পারছি না। শরীরটা বড় অবসন্ন  
হয়ে পড়ছে। অত্যাচারও তো আর কম করছেন ?  
আজ তবে বিদায় ! আমার আশীর্বাদ,  
ভালবাসা এবং চুখন জেনো। ভগবান তোমার মঙ্গল  
করুন। ইতি

—শান্তি চৌধুরী

## ব্রহ্মচারী

( )

জ্যোৎস্নালোকিত নিস্তক রাত্রি ! অদূরে ঋশান  
ভূমি, পাশেই ঋশান-কালিকার মন্দির—ব্রহ্মচারী স্থির  
নেত্র—একাসনে মন্দিরাভ্যন্তরে সমাসীন। হঠাৎ  
সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইল, কি একটা অশ্রুট শব্দের  
অনুসরণ করিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন, সর্বোচ্চ  
সোপানে দণ্ডায়মান সন্ন্যাসী শেষ সোপানের এক  
সীমান্তে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন একটা মনুষ্য মূর্তি  
আপন মনে কি বিড় বিড় করিয়া বলিতেছে। ধীরে  
ধীরে তিনি সোপান অতিক্রম করিয়া নিকটে আসিয়া  
দেখিলেন একটা পাগলিনী স্ত্রী মূর্তি—তার রূক্ষ কেশ,  
ছিন্ন মলিন বসন, উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি।

“কে তুমি পাগলিনী, কি চাও ? এ গভীর  
নিস্তক ঋশানভূমিতে তোমার কি প্রয়োজন ?”  
উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া পাগলিনী বলিল,  
“আমি ডোমের মেয়ে, আমার নিত্য যে এই যায়গায়ই  
খেলাঘর, ওগো ! তোমরা কি তা জাননা ? ঐ  
রাক্ষসী বেটাই তো আমার ঘরছাড়া করলে ! ঠাকুর,  
দয়া করে একবার মন্দিরে ঢুকতে দেবে ? দেখেবো  
তো সে পাগলী পেটের সাথে একবার বোকা পড়া  
করে।” এই বলিয়াই সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল।

ব্রহ্মচারী প্রমাদ গণিলেন, তাহার সাধন এখনও তত  
উর্দ্ধগামী হয় নাই, অসদৃশ ডোমের মেয়ে মন্দিরে  
ঢুকে মন্দির রূপবিভ্র করিবে ইহা অসম্ভব। তিনি  
দৌড়িয়া সিঁড়ি বাহিতে লাগিলেন, গুরু গভীর গর্জনে  
পাগলিনীকে ধমক দিলেন। পাগলিনী থমকিয়া  
দাঁড়াইল। ব্রহ্মচারী মন্দিরের দরজা রুদ্ধ করিয়া  
দিলেন।

অনেকক্ষণ কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।  
বহুদূরে করুণ গানের ছই পদ ব্রহ্মচারীর কানে  
ভাসিয়া আসিতে লাগিল। পাগলটা চলিয়া গিয়াছে  
ভাবিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। প্রকৃতির  
দৃশ্যে তাঁহার প্রাণ মুগ্ধ হইয়া গেল ; ফুটফুটে জ্যোৎস্নার  
আলোতে পৃথিবী হাসিতেছে, সম্মুখের মাঠ খানাতো  
যেন জ্যোৎস্নার চাদর বিছাইয়া দিয়াছে, অদূরে  
চিতাগুলি সব নির্ঝরিত-মৃদুমন্দ বাতাস তাহার শরীর  
মনকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল ; তিনি পাগলিনীর কথাই  
ভাবিতে লাগিলেন—কাজটা ভাল হল কি ? মায়ের  
মন্দিরে ঐ অস্পৃশ্য ডোম ঢুকিবে ইহা কি ঠিক ?  
আবার মন বলিল, জগজ্জননীর সন্তান তো সকলেই।  
তবে এ ভেদাভেদ কেন ? কেউ মন্দিরে ঢুকতে পার,

কেউ বা পায় না কেন ? যুগযুগান্ত কেন এ নিয়ম চলে আসছে ? হঠাৎ আবার সেই গানের শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল । তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন,—

“নিখিল জগত সুন্দর সব পুণকিত তব দরশে  
অলস অঙ্গ শিহরে তব কোমল কর পরশে ।”

আবার এলোমেলো ভাবে অল্প গানের কয়েক লাইন শোনা যাইতে লাগিল—“নহে এ যোগ্য অর্থ দিতে মা বনের ফুল, গন্ধবিহীন, অন্ধ স্নেহ তো বোঝে না ভুল ।” সন্ন্যাসী মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু মন ঠিক করিতে পারিলেন না । পরদিন সকালবেলায় ব্রহ্মচারী দেখিলেন পাগলিনী ঘান করিয়া এক ঝুড়ি ফুল নিয়া মন্দির প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে । বড় করুণ ভাবে সে বলিতে লাগিল—“ঠাকুর, আমার একটাবার মন্দিরে ঢুকতে দিলে না ? আচ্ছা না দাও, এই ফুলগুলি আমার পায়ে দিও ।” এই বলিয়া ফুল রাখিয়া চলিয়া গেল । ব্রহ্মচারী অস্পৃশ্য জাতির ফুল গ্রহণ করিতে ঘৃণা বোধ করিলেন । ফুল সেই যারগায়ই ঘৃণার বস্তু হইয়া পড়িয়া রহিল ।..... সন্ন্যাসী মায়ের মন্দিরে গিয়া ধ্যানস্থ হওয়ার চেষ্টা

করিলেন, কিন্তু কই মন যে স্থির হইতেছে না, কি ঘেন চাক্ষুণ্য ভিতরে উপস্থিত । পুনরায় নেত্র মুদিত করিলেন, মানস নয়নে ভাসিয়া উঠিল পাগলিনীর মুখ, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া প্রতিমার দিকে চাহিয়া দেখিতেই চমকাইয়া উঠিলেন । প্রতিমার মুখে পাগলিনীর ছায়া !!

“একি আজ দেখছি, মা, মা, আজ তোর একি ছলনা অধম সন্তানের প্রতি”—প্রতিমার পদতলে ব্রহ্মচারী লুটাইয়া পড়িলেন । মন্দিরের ভিতরে প্রতিধ্বনির মত শব্দ হইতে লাগিল, সন্ন্যাসী শুনিতে পাইলেন—“ওরে মূঢ় ! তুই বৃথাই পূজা করিস তোর সাধনা, ভজনা, সব ব্যর্থ । যত দিন তোর হৃদয়ের অস্পৃশ্যতার বীজ উৎপাটিত না হবে, যত দিন তুই বিশ্বের সমস্ত মানবকে এক মায়ের সন্তান বলে ভাবতে না পারবি ততদিন আমার পূজা আর করিস না । আমার পুত্রার অধিকারী তুই এখনও হোস্ নি—যে দিন বিশ্বপ্রেমে হৃদয়কে বিলিয়ে দিতে পারবি সেই দিন আবার আসিস । আমিই সব, আমাতেই জগৎ ।”

শ্রীমতী.....





## কলির পয়গম্বর ( আলোচনা )

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সরকার, বি, এ, সাহিত্য-ভারতী  
হিন্দু জাতটা যেন একটা বেওয়ারিস মাল—  
'সোতের সেউলি'র মতো ভেসে চলেছে, আর যে যেমনে  
পারে তাকে ঠেঙ্গাতে কসুর করে না। সম্প্রতি এক  
নতুন পয়গম্বরের আবির্ভাব দেখছি, এবার বুঝি হিন্দু  
আর টেকে না।

মুসলমানদের মুখে শুনি এবং ছ'একখানা পুঁথি-  
পুস্তকেও দেখতে পাই, মহম্মদ শেষ পয়গম্বর। কিন্তু  
অকস্মাৎ প্রাচ্যে—এমন কি খাস বাঙ্গালায় আবার  
নতুন পয়গম্বরের আবির্ভাব দেখে মনে হয় কবি  
সত্যই বলেছেন,—

“There are more things in heaven  
and earth, Horatio,

Than are dreamt of in your Philo-  
sophy.”

নবাবিভূত পয়গম্বরের নামাকরণ হ'য়েছে মম্বাধনাথ  
সরকার। সম্প্রতি তিনি গত ভাদ্রের “সওগাতে”  
'মিলন-সম্রাট' নামক প্রবন্ধে যে অদ্ভুত হাদিশ প্রচার  
করেছেন তাতে হিন্দু মুসলমানের মিলন হ'য়ে যাবে  
নিশ্চয়। কিন্তু এই revelations তিনি কোন্ পাহাড়ে  
গিয়ে লাভ করেছেন তা প্রকাশ করেননি। তাঁর  
হাদিশ দেখে স্বয়ং পয়গম্বর মহম্মদ বোধ হয় বেহেস্ত  
থেকে বলছেন, “যে লাজ পেরেছি আজ কইতে লাজ

পায়।” এ হাদিশ নিতান্ত তথ্যপূর্ণ ও original  
এবং আমরা একবারো স্বীকার করি ইহা বাঙ্গালার  
হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে জগন্ময়  
প্রচারিত হ'লে সমস্ত জগতের বেশ উপকার হয়।

লেখকের মতগুলি উদ্ধৃত করবার পূর্বে আমাদের  
একটি সংশয়ের মীমাংসা করে নেওয়া উচিত। তিনি  
বলেন, “মুসলমান সমাজেও আবদুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,  
দীনমুহম্মদ মুখার্জি, দীনমুহম্মদ গাঙ্গুলি প্রভৃতি কিছুত  
কিমাকার নাম বেশ চলে যাচ্ছে।” লেখক সেরূপ  
'কিছুত কিমাকার' নয় ত? এক রকম কীট আছে  
তার নাম “বহুরূপা”। বহুরূপার প্রধান লক্ষণ এই  
যে উহা ইচ্ছানুসারে অনারাসে আপন বর্ণ পরিবর্তিত  
করতে পারে। এজন্ত ইহার স্বাভাবিক বর্ণ কি ইহা  
বলা হুঙ্কর। বর্তমান বহুরূপার বর্ণ নির্ণয়ের ভাবটা  
বর্ণাভিজ্ঞের উপর অর্পণ করেই নিশ্চিত হলাম। এখন  
লেখকের মতামতের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

লেখক আবিষ্কার করেছেন—হিন্দু মুসলমানের  
মনকষাকষির ছুইটা কারণ—গো কোর্কানী ও  
মন্দিরের সামনে গান বাজনা।”

ছুই মণ্ডরের কারণ সম্বন্ধে বলেন, “আমার সাধারণ  
বুদ্ধিতে এই মনে হয় যে, গান বাজনার হট্টগোলে  
আবার জন্ম দেখা দেয় কিরূপে?”

এবিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে হিন্দুর উপর তার



দেওয়াই উচিত ছিল লেখকের। কারণ, সেটা হিন্দুই ভাল জানে, অহিন্দুর তাতে অধিকার নেই। হিন্দু ভিন্ন—হিন্দুর ধ্যান, ধারণা, সাধনা ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন জাতের তা বুঝবার শক্তি নেই। তা বুঝতে হ'লে হিন্দুর প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দৃষ্টি চাই। তখন সে দেখবে এই চারদিকে অনন্ত বিধে অনন্ত প্রকৃতি অনন্ত বাহু বিস্তার ক'রে সেই মহিমময় অনন্তময় পুরুষের মুক্তি প্রকট করছে। কুপমণ্ডুক অনন্ত বিধের সংবাদ কি রাখে? “হিন্দুর মনের জায় সমগ্রগ্রাহী, সমগ্রব্যাপী মন পৃথিবীতে আর নাই। জগতে যাহা কিছু আছে হিন্দুর মনে সকলই আছে। জগতে যেমন অভিন্ন অবিচ্ছিন্ন অপূর্ণভাবে একে অপরের সহিত এবং সকলে একের সহিত গ্রথিত আছে হিন্দুর মনে তেমনই গ্রথিত আছে। হিন্দুর মন জগতের ছাচে ঢালা (Cosmically Constituted) মন। এমন বিরাট মন কি আছে?” ক্ষুদ্র যে সে বিরাটের, অনন্তের ধারণা কর্কে কিসে?

লেখক কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, “আমি নিজেকে সাধকও নই, দার্শনিকও নই”। আমরা বলি তবে এ অনধিকার চর্চা কেন? ‘Fools rush in where angels fear to tread’ এই সরল সত্যের প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য নয়?

তার পর “এত দিন ত খোলকরতাল বাজিয়ে, এত লোক নাম সংকীর্তন কচ্ছে, কই, কেউতো ভগবানকে পেতে শোনা যায় নি!” কেন? বধির মাকি! শুনেছি হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী কানে তুলো দিয়ে রাখতেন, পাছে সব বুদ্ধি বেরিয়ে যায়। লেখকের তেমন কোন ‘বাহু’ নাই ত! ঐশ্বর্যচৈতন্য দেব নিকীর্ণ লাভ করেছিলেন। খোলকরতাল বাজিয়ে, মুসলমান বৈষ্ণব ঠাকুর হরিদাস খোলকরতালের শুণ্ণাহে নিশ্চয়ই দোজকে যান নি। গোড়পতি হোসেন শাহ তার সাক্ষী। আর এ যুগে ঐশ্বর্যামকুঞ্চ পরমহংস দেবের কথাটা শ্রবণ করলে ভাল হয়। লেখক হয়তঃ মনে কর্কেন তিনি বুজুক। তা হ'লে প্রমাণ দিয়ে দিই শুধু—

“During the last century the finest fruit of British intellectual culture was probably to be found in Robert Browning and John Ruskin. Yet they were mere gropers in the dark compared with the uncultured and illiterate Ramkrishna of Bengal, who knowing nothing of what we term learning, spake as no other man of his age spoke and revealed God to weary mortals.”—Mr. William Digby's *Prosperous India*, Chap II—P. 99.

আর কত বলবো, মহাভারত ত লিখতে বসিনি। তারপর “পাটুয়াখালি সত্যাগ্রহে হিন্দু জেদ্ দেখাচ্ছে।” জেদ্টা কি জা লেখক প্রকাশ ক'রে বলেন নি, বোধ হয় তাতে শোল বেধে যায়। বাক্ There are sermons in stones. লেখকের কথায় সেটা আছে। কারণ, তাঁহার মতে “গান বাজনা মন্থকীর দাঙ্গাহাঙ্গামা অনেকটা আধুনিক” হ'লেও অন্ততঃ “ডিপ্লোমেসির” খাতিরে হিন্দুর চুপ থাকাই ভাল। তার কারণ বোধ হয় “হিন্দু, হিন্দু ব'লে।” অবশ্য এ কথাটা স্বীকার্য, তাও ডিপ্লোমেসিরই খাতিরে, যদি লেখককে হিন্দু বলে ধরে নেওয়া যায়। তবে কথাটা ঘরাণা বটে, বাজারে ঢাক বাজিয়ে ইহা চালান যেতে পারে না।

তবু জিজ্ঞাস্তা, মুসলমানের এত ধর্মপ্রীতি আজ হঠাৎ কোথায় উঠলো কেন? তারা রোজ পাঁচবার ‘আজান’ দিয়ে হিন্দুর বিশ্রাম ও শান্তিভঙ্গ করবে, আর হিন্দু সকালে, সন্ধ্যায় দুবার মাত্র গান বাজনা করলে তাদের মাথা গরম হয় কেন? এটা একদোষ-দর্শিতা নয় কি? বরং আমরা বলি জাত ভুলে যাও। যায় যায় কর্তব্য ক'রে যাও, কাজ করলেই ত কাজ। সকলেই মনে কর আমরাত্মা স্বাভাবিকী—বাকালীর ভাল মন্দ হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পাবে।

সুতরাং 'Give and Take' নীতির অনুসরণ উভয় পক্ষে হিতকর। হিন্দুও 'বাকনা' চলুক, মুসলমানেরও 'আকান' চলুক। ধর্ম সকলেরই এক—ধর্মধর্মী যে সে হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক কারও নিস্তার নেই। যুক্তির বলেছিলেন, 'আমরা পটপটাস্তর শত ভাই; চল আমরাও সেরূপ বলি, 'আমরা আট কোটি বাঙ্গালী।'

তার পর 'গো-কোকাণী'। লেখক বলেন, "মুসলমান ধর্ম হিন্দু ধর্মকে নাড়া দিয়েছে সত্য, কিন্তু সে কেবল ছ' একটা এমন দুর্বল জায়গায়, যা আগে থাকতেই হিন্দুধর্মের সংস্কার ক'রে রাখা উচিত ছিল।" সাধু, মিত্র, সাধু! সংস্কারটা বোধ হয় এবার পরগম্বর সেয়ে ফেলবেন।

তারপর, "দেব মন্দির ও গুরু এই দুইটাই অবাস্তর জিনিষ।" অবশ্য খুব সম্ভব বাদে মসজিদ ও গির্জা।

গুরুটা যেন অবাস্তর হ'ল মন্থবাবুর খাতিরে, কেননা 'যট্টম যদ্ রোচতে' কিন্তু দেবমন্দির ত জগৎ ভরষেই আছে, তবে নামে একটু তফাৎ—মন্দির, মসজিদ ও গির্জা। মন্থবাবু 'Eat, drink and be merry'র শিক্ষা বোধ হয়। যাক, তবু ভাল, কলির জীব ক'রে না হ'ক দেখে শুনে মানুষ হোক।

"এই কল কারখানার যুগে গুরু, মহিষ, কি ঘোড়ার আর বিশেষ দরকার হ'বে না।" আবিষ্কারের মতন আবিষ্কার। মন্থবাবুর মতে এখন সকলেই হাত পা গুটিয়ে ব'সে থাক, খাবারগুলো কলে টপাটপ, মুখের ভিতর ঢুকে পড়বে আর কি! যুক্তির মহোৎসব দেখছি!

"সুতরাং এমন দিন আসবে, যখন এসব জানোয়ারকে সখ ক'রে চিড়িয়াখানায় রাখতে হবে, কিম্বা ইচ্ছা ক'রে মেরে ফেলতে হ'বে (যেমন আমরা মশা মাছি মেরে ফেলি) না হয় কোন সাধুস্বামীরাজের পিঞ্জরা পোলে কি বন জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে, আর না হয় হত্যা ক'রে উদরপূর্তি কর্তে হবে। আমার মনে হয়, শেযোক্ত উপায়ই ভাল; কারণ যেন-তেন প্রকারেণ উদরপূর্তি আমাদের কর্তেই হবে; আর

জিনিষ অথবা নষ্ট করার চেয়ে ভোগ করা ভাল।" বাঁচালে বাবা! এতদিনে যদি মশা মাছির একটা হিরে হয়, আর বাড়ীর চার ধারে কত সব অপদার্থ জমে থাকে—যদি নষ্ট না হ'রে ভোগে লেগে যায় তবে কতক কতক জীবের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকার হবে বটে। পরোপকারের সত্য বিতুতি:—হিন্দু এরূপ স্বার্থত্যাগ করতে রাজি।

মন্থবাবুর উদরাগ্নি যেমন প্রবল দেখা যায় 'যেন তেন প্রকারেণ উদরপূর্তি করতেই হ'বে' সাধু সাবধান! খাট পালঙ্ক নোকা ষ্টিমার কিছুই বাদ যাবে না এবার। সর্বভুক্ত মন্থবাবু একেবারে মেতে গেছেন দেখছি।

পণ্ডিত মহাশয়ের যুক্তিটা বেশ original. পণ্ডিতটা বোধ হয় লেখক স্বয়ং। কারণ এরূপ যুক্তি তাঁহার প্রবন্ধে হুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে। সব সময় যুক্তিতে চলে না! Equity overrules law একথাটা স্মরণ রাখা উচিত। তিনি বলেন, "ছাগ মহিষ প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে গরুর প্রতি এই যে পক্ষপাতিত্ব, এ হিন্দুদের খেয়ালপ্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

হিন্দু এত সঙ্গীর্ণ নয়। সমস্ত ও মৈত্রী তাহারই জিনিষ, অস্তের নাই। বিশ্বের যত কিছু আছে, মানুষ বল, পক্ষী বল, সরীসৃপ বল, গাছ বল, লতা বল, প্রস্তর বল, মৃত্তিকা বল, সকলই সেই এক ব্রহ্ম পদার্থে নির্মিত এবং সেই এক ব্রহ্মের রূপ মাত্র। অতএব তাহার নিকট শুধু সকল মানুষই যে সমান তাহা নয়; জগতে যত কিছু আছে, সবই মানুষের সমান ও প্রীতির পাত্র। প্রহ্লাদ দৈত্য শিশুগণকে উপদেশ দিতেছেন:—

দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্ষ সরীসৃগঃ।

রূপমেতদনন্তত বিকোভিন্নমিব স্থিতম্ ॥

এতদ্বিজ্ঞানতা সর্বং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্।

ঐষ্ট্যমাস্বাবদ্বিসুখতোহয়ং বিশ্বরূপধ্বক্ ॥

(বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ—১২অ, ৪৭—৪৮)

দেবতা, মনুষ্য পশু পক্ষী বৃক্ষ ও সরীসৃপ ইহারা অনন্তদেবেরই স্বরূপ, কেবল স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছে মাত্র। যিনি এই সমুদয় বিষয় জ্ঞাত আছেন, তিনি স্বাবর-জঙ্গমাঙ্ক বিখকে আত্মবৎ দেখেন, কারণ, বিমুখই বিখরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

সজীব নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অমুরাগ, ইহা আর্ধ্যধর্মের সর্বোচ্চ আসন। তবে স্থল বিশেষে ব্যক্তির দৃষ্ট হয় বটে, তাহা দ্বারা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনানুসারে মত্ত মাংসাদি গ্রহণীয়—সেজন্য অত্যাচার ভ্রাসঙ্গত নহে। এখানে প্রধান কথা হইতেছে সংযমের। কবুতরের মাংসের যুগ রোগীর পথ্য, সেজন্য একখালা ভেড়ার মাংস উক্ষ্য নহে। এখানেই খাদ্যবিচার। সর্বভুক মহাশয় কি বলেন ?

লেখক আরো বলেন, “মুসলমান সাধারণতঃ যে সকল গরু কোরবানী দেয়, তা এমন গরু যা দিবে বিশেষ কোন কায পাওয়া যায় না।” অর্থাৎ অচল বা রুগ্ন বা আসন্নমৃত্যু গো-কোরবানীই প্রশস্ত। কি নৃশংসতা! কি কৃতঘ্নতা! “হৃদ্যবতী গাভী বা ভাল বলদ তারা প্রায়ই হত্যা করে না।” হিন্দু রুগ্ন, পঙ্গু বা অসহায় জীব হত্যা করা নৃশংসতা মনে করেন। ভিন্নরুচিহি লোকঃ।

“হিন্দুধর্ম সুপ্রাচীন, এ একেবারে সনাতন ধর্ম কি না, তাই অনেক আবর্জনা জঞ্জাল এর ঘাড়ে এসে চেপেছে। অথচ হাত ছ’থানা জরাগ্রস্ত হ’য়ে পঙ্গু। আশা করি, সমসাময়িক অস্ত্রাস্ত্র সমাজ এ অতি বুদ্ধ সমাজকে সাহায্য কর্তে কার্পণ্য কর্কেন না।”

মন্মথবাবুর জরাগ্রস্ত পিতৃপিতামহের কি দশা হয়েছে বা হ’বে কে জানে—তারাত ত আবর্জনা জঞ্জাল। আমরা জানি প্রাচীন সন্মানের পাত্র—প্রাচীন স্থির, দীর্ঘ, গভীর—যুবকের ত্রায় দৃষ্ট নহে। আপদকালে বৃদ্ধেরই উপদেশ নিতে হয় :—

বৃদ্ধস্ত বচনং গ্রাহং আপৎকালেহ্যপস্থিতে।

বাঙ্গালীর আজ ঘোর দুর্দিন, তাই বলি বাঙ্গালী

হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম খৃষ্টান, সকলে এই সুপ্রাচীন হিন্দুধর্মের স্থগীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ কর, (ধর্ম ত্যাগ কর্তে বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, ইহার সুগ্রহণ ক’রে চল) দুর্দিনের মেঘ কেটে যাবে। সর্বত্র সমরশী হও, সর্বভূতে দয়া কর, সকলকে ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ কর। মন্মথবাবুরও হতাশ হইবার কারণ নাই, মাহুয যত অপদার্থ হো’ক না কেন হিন্দু তাহাকে ক্ষমা কর্তে জানে, আপন ব’লে বুক টেনে নেয়।

লেখক অবশেষে নিখিল ভারতের একতা সাধনের একটা অকাটা যুক্তির উদ্ভাবন করেছেন, তা এই :—

“মোটামুটি ভারতে তিনটা ধর্ম চলিত—হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান। সমগ্র ভারতবাসী যদি ছ’এক শতাব্দী ধ’রে মুসলমান হ’য়ে রইত, তবে এই ঐক্য-সাধন হ’ত ব’লে মনে হয়।” মন্মথবাবু বোধ হয় ইতিমধ্যেই pioneer হ’য়ে গেছেন—নিজের স্মাজ থাকলে আর অপরকে স্মাজ কাটুতে পরামর্শ দিবেন কেন ?

মন্মথ বাবু তাঁহার প্রবন্ধে পিতৃদত্ত নামটার বেশ সার্থকতা করেছেন। মনঃ মথ্যতি ইতি মন্মথ অর্থাৎ মনকে পীড়ণ করে যে। তাই কামদেবের (cupid) এক নাম মন্মথ। মন্মথকে ধ্বংস করেছিলেন মহাশেব তাঁহার তৃতীয় নেত্রবলি দ্বারা—সে সত্যযুগে। আবার কলিতে মন্মথের পুনরাভির্ভাব—“মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী”।

বড় ছঃখেই মন্মথবাবুর প্রবন্ধের অপ্রিয় সমালোচনা কর্তে হ’ল। গাছ বড় ছঃখে বললে কাঠুরেকে, “ভাই, তুমি এত নির্দয় কেন ?” কাঠুরে বললে, “আমার দোষ দাঁও বুধা। তোমার জাত দিয়েই ত কুঠারের হাতল তৈরী। হাতল না হ’লে ত আর গাছ কাটা যায় না।” তখন মর্ম্মাহত গাছ বললে, “তা হ’লে আমার মরাই ভাল। সেরূপ আমরাও বলি, “হিন্দু হয়ে যদি হিন্দুর হিন্দুধর্ম নাশ কর্তে চায়, তা হ’লে সে হিন্দুর নিঃশেষে লোণ পাওয়াই বাঞ্ছনীয়।



**ভারতে বাঙ্গালী—১৯০৭ খৃষ্টাব্দে**  
ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনীতির স্বর্গগত গোঁধলে মহোদয়  
বলিয়াছিলেন,—

The Bengalees are in many respects  
the most remarkable people in all India....  
In almost all the walks of life, open  
to Indians, the Bengalees are among the  
most distinguished, some of the greatest  
social and religious reformers of recent  
times have come from their ranks.  
Of orators, journalists, politicians,  
Bengal possesses some of the most  
brilliant.

অর্থাৎ বহু বিষয়ে বাঙ্গালী জাতি ভারতে  
গণনীয়। ভারতবাসীর সম্মুখে যতগুলি কর্মপথ  
মুক্ত রহিয়াছে তাহার সকল পথেই বাঙ্গালী বিশেষ  
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বর্তমান যুগে যে করজন  
সমাজ সংস্কারক ও ধর্মবেত্তা দেখিতে পাওয়া যায়,  
তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালী। বক্তা,  
সংবাদ পত্রপরিচালক ও রাজনীতিকদিগের মধ্যেও  
কয়েকজন বাঙ্গালী উজ্জল রহিয়াছেন।

কিন্তু এই গত বিংশ বর্ষ মধ্যে বাঙ্গালীর সে  
উত্তম, সে চোটা কোথায় লুপ্ত হইয়াছে কে জানে?  
কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি,  
বাণিজ্য, প্রশিক্ষণ, ব্যাংকিং প্রভৃতি সকল বিষয়ে

সম্প্রতি বাঙ্গালীর স্থান নিম্নে। নারীশিক্ষা বিষয়ে  
ভারতের অন্য কোন কোন প্রদেশ বাংলাকে  
পশ্চাতে ফেলিয়া চলিতেছে। বাঙ্গালার কলকারখানা  
বাণিজ্য প্রভৃতি প্রায় সমস্তই বাঙ্গালীর হস্তগত।  
কেরানীগিরি ও শিক্ষকতার বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি  
ছিল। অধুনা তাহাতেও ভাঙ্গন ধরিয়াছে। ঘোট  
কথা, বাঙ্গালী কোন কোন কার্যক্ষেত্রে হইতে  
হটিয়া আসিতেছে অথবা অন্তরা তাহাদিগকে পশ্চাতে  
ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। ইহা অবশ্য হিংসা বা  
ঘেবের কথা নয়। সকল সম্প্রদায় উন্নত হউক,  
তাহাতে ভারতের লাভ—আমাদের লাভ, লোকসান  
কিছুই নাই। তবে আমরা চাই বাঙ্গালী ভারতের  
অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীন নিকৃষ্ট থাকিবে  
না ও হইবে না। সকলেরই আকাঙ্ক্ষা উচ্চ থাকি  
কর্তব্য নিজের দেশের কেহ অধিকারচ্যুত বা  
অক্ষম না হয়। যেভাবেও সোভিয়েটের সহিত  
আমরাও বলিব,—The Bengali has a glo-  
rious future before him, a future in  
which, if we mistake not, he will  
conspicuously shine as the leader of  
public opinion, and of intellectual and  
social progress among all the varied  
nationalities of the Indian Empire.

বিবাহের ন্যূনতম বয়স—কাঠি-  
ওয়ারের দেশীরাষ্ট্র রাজকোটের হিন্দু নরপতি

সম্প্রতি এই আদেশ জারি করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে পুরুষেরা ১৯ এবং নারীগণ ১৫ বৎসরের পূর্বে বিবাহ করিতে পারিবে না। এই নিয়ম দেশের সর্বত্র প্রচলিত হইলে দেশবাসীর মঙ্গল হইবে। আমাদের দেশে বালাবিবাহে সমাজের নানা দিক্ দিয়া নানা অনিষ্ট হইতেছে। এ প্রথা বিদূরিত না হইলে সমাজের হিত নাই।

**কটনরাজ্য প্রাচুর্ভাব**—বঙ্গের সর্বত্রই কলেরার প্রাচুর্ভাব দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জেও ইহার আক্রমণ সহরবাসিগণের জন্মে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি উহার সঙ্গে লড়াই করিতেছেন সত্য, কিন্তু ফল বিশেষে দেখা যাইতেছে না। অনেকে বলিতেছেন, প্রতিষেধক টিকা লইলে ওলাউঠা হইবে না। সেমন্ত অনেকেই টিকা লইতেছেন। আমাদের মনে হয় কোনপ্রকার প্রতিষেধক পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন কাপড় ও শয্যা, শুকন ও আলোবাতাসযুক্ত বাসগৃহ, বিশুদ্ধ ও যথেষ্ট খাদ্য ও জল প্রভৃতির স্থান পূরণ বা অটাবদূর করিতে পারেনা। মূলতঃ এ সকলের অভাবই দেশে নানা পীড়ার প্রাচুর্ভাবের কারণ। আমাদের মনে হয় যেখানে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা নাই সেখানে বাহ্যিক আড়ম্বরে লোক রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। নারায়ণ-গঞ্জ ক্ষুদ্র সহর হইলেও ইহার বার্ষিক আয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা। কিন্তু সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের তত মনোযোগ দেখিতে পাইতেছি না। এই সহরের স্থানে স্থানে যে সমুদয় গর্ত, বাহারা সহরের ঐশ্বর্য্যার্থ দখল করিয়া আছে ইহাদের কচুরিপানা পচিয়া এবং জল দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া প্রতিনিয়তই স্থানীয় জলবায়ু দূষিত করিয়া সাধারণের স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতেছে। এগুলির সুব্যবস্থা না হইলে বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে কিংবা হাঁসপাতাল স্থাপনে রোগের হাত হইতে কাহারও পরিজ্ঞাপ নাই। সোজা কথায় বলিতে গেলে, মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যপ্রণালী

সাধারণের পক্ষে বড়ই দুঃসহ রাস্তায় আলো (অবশ্য চত্বালোক ভিন্ন) কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না, অবশ্য দুই একটা নির্দোষিত স্থান বাহিরে—রাস্তায় জল নাই, ফলে নারায়ণগঞ্জের মত স্বাস্থ্যবাসেও ক্ষয়কাশ স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। পানীয় জল কলেই সরবারহ করা হয় বটে, কিন্তু জল নিত্যন্ত অপ্রচুর এবং সময় সময় উপযুক্তরূপ পরিষ্কার জল পাওয়া যায় না। মোট কথা, স্বাস্থ্যবাস আজকাল কর্তাদের গুণে প্রেতনিবাস ভিন্ন আর কি বলিব? মেঘের নির্দোষনের পূর্বে প্রার্থীগণের মধ্যে যে রকম উত্তম, উৎসাহ ও কার্য্যতৎপরতা দেখা যায়, নির্দোষনেষে তাহাদের আর পাতা পাওয়া যায় না। বাল্যলীর দুর্ভাগ্য বই কি!

**বাল্যলীর ঠন্ডিক শক্তির**—বাল্যলীর মধ্যে শক্তিশালী কৃত্তী পুরুষের অভাব কোন কালে ছিল না, এখনও নাই। আমাদেরই শ্রামাকান্ত, পরেশনাথ, ভীম ভবানী, গোবর, ফণীন্দ্রকৃষ্ণ, রাজেন, মহেন্দ্রনাথ, ননীলাল, বলাই প্রভৃতি শক্তি সাধনার উজ্জল দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি এলাহাবাদের রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বোম্বাইয়ের নিকটস্থ সমুদ্রে ৩০ মাইল সন্সরণ করিয়াছিলেন। সময় ১২ ঘণ্টা ২০ মিনিট। বাঁশরী মুখোপাধ্যায় দ্রুত হাটার দ্রুত বিখ্যাত। তিনি প্রথমতঃ লক্ষ্মোয়ে ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ২১ সেকেন্ডে ২৮ মাইল, দ্বিতীয়তঃ, বারানসীতে ৬ ঘণ্টা ৫৯ মিনিটে ৪৫ মাইল, তৃতীয়তঃ, ২ ঘণ্টা ১৭ মিনিট ১৮ সেকেন্ডে ১৫ মাইল এবং চতুর্থতঃ, ৫ ঘণ্টায় ৪০ মাইল পথ হাটিয়া অতিক্রম করেন। মোহন বাগানের এম্. দত্ত সমগ্র ভারতীয় দ্রুত হাটার প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। বর্ধমান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ৭২ মাইল হাটিতে তাঁহার ১৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ১৩ সেকেন্ড লাগিয়াছিল।

বাল্যলী এখনও সে শক্তি হারায় নাই। সাধনা করিলে সে আবার সামর্থ্যলাভে সমর্থ হইবে। শক্তি-সাধনা ব্যতীত বাল্যলীর কল্যাণ নাই। চিরকালই

সে শক্তির উপাসক। ‘শক্তিমানের জয়’এ কথা ভুলিলে তাঁহার চলিবে না।

**নারায়ণগঞ্জ হিন্দু সভা**—আজ প্রায় চারি বৎসর হইতে চলিল নারায়ণগঞ্জে একটি “হিন্দু সভা” স্থাপিত হইয়াছে; কর্তৃকর্তা শ্রীযুক্ত শ্রীমাত্রা প্রসন্ন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত সত্যীচন্দ্র রায়। নরপিশাচ দ্বারা লাহিতা ও সমাজ-পরিত্যক্ত। অনানুপঞ্চাশতী মহিলা ও মঙ্গলময়ের কুপার ও মহাহুভবগণের সহায়ত্বভূতিতে উদ্বার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু হুঃখের বিষয় এখানে কোন “অবলা আশ্রম” নাই। আমাদের বিশ্বাস নারায়ণগঞ্জ সহরের উপর দিয়া প্রতিবৎসর নানাধিক দুইশত নিগৃহীতা স্ত্রীলোক অপসারিতা হয়, যাতায়াতের সুবিধায়ই পলায়নেরও সুবিধা হয়। রেল ও স্ট্রামার স্টেশনের নিকটে একটি “অবলা আশ্রম” স্থাপনের চেষ্টা করা নারায়ণগঞ্জ সহবাসী ও এই এলাকাবাসী একান্ত কর্তব্য বসিয়া অগ্রসর হইলে আমাদের বিশ্বাস বর্তমান মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ-গণ এই বিষয়ে সাহায্য করিতে পশ্চাত্তাপ হইবেন না। আমরা আশা করি তাঁহারা একটা অবলা আশ্রমের অভাব দূর করিয়া সর্বসাধারণের ধন্যবাদার্থ হইবেন। নারায়ণগঞ্জে পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনে মিউনিসিপ্যালিটির প্রচেষ্টা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। ইহার সাধনা সফল হউক।

**বিলাতভ্রম্ম মান্দার ইণ্ডিয়ান নিম্ফা**—“কমনওয়েল্‌থ অব ইণ্ডিয়া”লীগের উদ্ভাগে একটি বিরাট জন সভার “মান্দার ইণ্ডিয়ান” ভারতীয় দিগের সংসার জীবন-যাত্রাপ্রণালী সম্বন্ধে বহু মিথ্যা উক্তি ও নানা-প্রকার অশিক্ষার বিবরণ আছে বলিয়া পার্লামেন্টের সদস্য মিঃ এলেন উইলকিন্সন বলেন “মান্দার ইণ্ডিয়ান” স্বাধীনতা দান করিয়া ব্রিটিশরাজ খুবই অজ্ঞান করিয়াছেন; ভারতীয় সদস্যবিহীন কমিশন নিযুক্ত ব্যাপার নিয়া ব্রিটিশদের সর্বতোভাবে সহায়ত্বভূতি আকাজ্জক সুবিধার জন্য এইরূপ বই বিলাতে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।” সভানেত্রী লেডি এমিলি

বুটিন্স্‌ বলেন—“এইরূপ পুস্তক অপেক্ষা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে কৃতিকারক আর কিছুই হইতে পারে না।” পার্লামেন্টের সদস্য লেডি সিথিয়া মোসলে কর্ণেল ওয়েজ্‌উড্‌ও এইরূপ পুস্তকের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। ওয়েজ্‌উড্‌ বলেন—“বর্তমান ভারতে শুধু শিক্ষা প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন; রয়াল কমিশন শুধু শাসন-পরিবর্তন বিষয় নিয়া আলোচনা না করিয়া তৎসঙ্গে শিক্ষাপ্রচারের ও আলোচনা করিবেন।” সভার দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে “বর্তমান ভারতে শিক্ষা ও নীতির অভাবের জন্য ব্রিটিশ সরকার সর্বতোভাবে দায়ী।”

**স্বাস্থ্য-রক্ষক স্বাস্থ্যহানি**—শ্রীহরিপদ গুহ প্রণীত “সাহিত্য-স্বাস্থ্যরক্ষা” (স্বাস্থ্য-রক্ষকের স্বাস্থ্যহানি) পুস্তিকাখানা পাঠ করিয়া বস্তুতঃই আশ্বাসিত হইলাম। সুপ্রসিদ্ধ লেখক রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিংহ বাহাদুর “সাহিত্য-স্বাস্থ্যরক্ষা” লিখিয়া অনেক লেখককেই কশাঘাত করিয়াছেন—এমন কি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র প্রভৃতিকেও “সাহিত্য স্বাস্থ্যরক্ষার” উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু স্বাস্থ্য-রক্ষকের স্বাস্থ্যহানি বিষয়ে আলোচনা করিয়া হরিপদবাবু যে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি শুধু প্রত্যাশিত যতীনবাবুর উপরে কোন ব্যক্তিগত বিষেব নাই বলিয়া নিবেদিত হইয়াছে এমনত নহে, আমাদের ধারণা, হরিপদবাবু আশা করেন কোন লেখকের লেখাই যেন সুধী-সমাজে পুণ্ডিগন্ধবৃত্ত জঘন্য বলিয়া প্রতীত না হয়। আমরা হরিপদবাবুর এই সংসাহসকে ধন্যবাদ দিতেছি। নবীন সাহিত্যিকদের এই স্পর্ধা না থাকিলেও বাহাদের কলমে “সোনা ফলে” তাহাই যদি সময়ে “রাবিন্” বমন করে তার চেয়ে অধিক আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? তবে কিনা বরষের সঙ্গে সঙ্গে যদি কাহারো লেখার স্বাস্থ্যহানি ঘটে সে ক্ষেত্রে নির্ণয় তরুণ সাহিত্যিকদিগের নিকট স্বীকার করা অজ্ঞান বলিয়া মনে করি না এবং তাহাতে সম্মানের হানি

না ইইয়া বরং গোরব ও সরলতাই প্রকাশ পায়। হরিপদবাবুকেও আমাদের অনুরোধ তিনি সাহিত্য স্বাস্থ্যরক্ষকের স্বাস্থ্যহানি দেখিবার পূর্বে যেন অনুসন্ধান করিয়া নেন যে Whether he has arrived at that time of life when suspicion recommends itself to us in the form of wisdom. কিন্তু যদিও পুরাণে মহাত্মা মন্ত্রস্তের এই শ্লোকটি লিখা আছে :—

“গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্ধ্যাকার্যমজানতঃ।

উৎপথপ্রতিপন্নস্ত পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥”

( অর্থাৎ কার্ধ্যাকার্যের অনভিজ্ঞ, উৎপথে প্রধাবিত, গর্ভপটীত গুরুকেও পরিত্যাগ করা বিধেয়, তাহা মানিয়া চলা দেশ, কাল, পাত্রবিশেষে সম্ভবপর না হইলে Beauty and folly often go together এই সত্যবাক্য স্মরণ রাখিতে ক্ষতি কি ! )

শিষ্টাঙ্গভি—বাঙ্গালা সরকারের ত্রীযুক্ত পি,সি, বসু মহাশয় ঢাকার শাঁককাটা যেদিনটা দেখাইতেছেন। ইঞ্জিনিয়ার ত্রীযুক্ত এম্, সি, মিত্র মহাশয়ও যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। স্থানীয় শাখারীরা কয়েকটা যন্ত্র লইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। ইহা আনন্দের

কথাই বটে কারণ দেশীয় শিল্পের যত উন্নতি হয় ততই দেশের মঙ্গল। বসু মহাশয় নাকি সাবান প্রস্তুত এবং ঝিহুকের বোতাম প্রস্তুত কাজের সুবিধার জন্ত যন্ত্র উদ্ভাবন করিবেন। তাঁহার এবম্বিধ উৎসাহ দেশের পক্ষে কল্যাণকর। নারায়ণগঞ্জের এলাকায় অনেক স্থানেই ঝিহুকের বোতাম প্রস্তুত করার সাড়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয় গত ২ বৎসর যাবৎ এই ব্যবসায়টি বড়ই দ্রবস্থাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

মরুভূমির হৃদে শ্রমিণিতির প্রচেষ্টা—আফ্রিকার সাহারার মরুভূমিটি হৃদে পরিণত করায় চেষ্টায় তত্রত্য সরকার ব্যয়ের তালিকা ও বিবিধ বিষয় স্থির করার পরামর্শ করিতেছেন, ঈশাকেইত বলে “টাকার নোকা পাহাড়ে চলে”। আর আমাদের দেশে বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে সামান্ত কচুরি পানা ধ্বংস করার জল্পনা কেবল চব্বিতেছে, আর এদিকে কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি অলিগলির লোকক্ষয়ের চেষ্টায় তৃপ্ত না ইইয়া এখন সহরে বহরে উকি দিয়াছে।

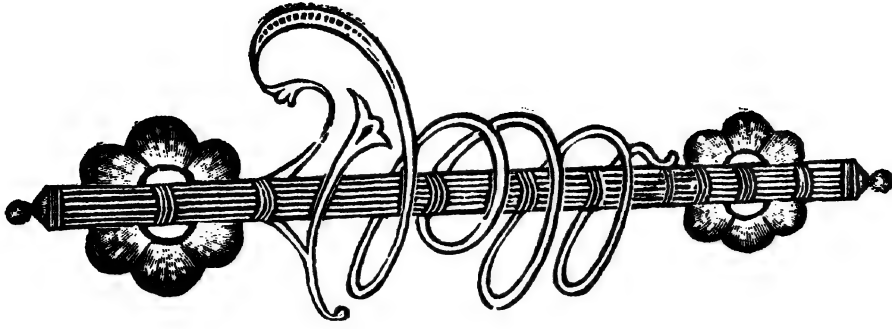








ମାମୀ ସୁନ୍ଦରୀ



## সচিত্র মাসিক পত্র

১৯৩৪ বর্ষ ]

পৌষ, ১৩৩৪

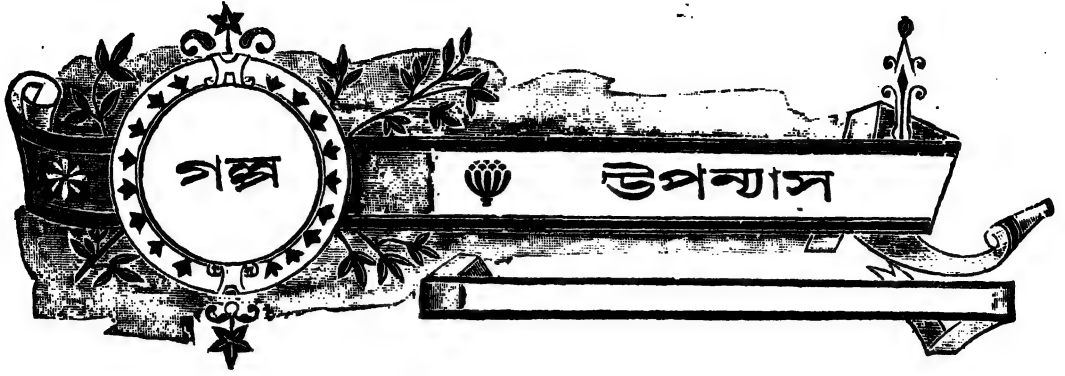
৪র্থ [ সংখ্যা

### রজনী গন্ধার প্রতি

( মালাই পাস্তম্ )

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ফুল তুমি নহ, রজনীগন্ধা, তুমি যে রূপসী রমনী !  
স্নিগ্ধ গন্ধে বুকে জাগে মোর একি বিহ্বল বাসনা !  
সবেগে শোণিত ছুটিয়া কাঁপায় শিরা উপশিরা ধমনী !  
পাগল হইয়া বনে বনে ধাই পূরাতে প্রাণের কামনা !  
স্নিগ্ধ গন্ধে বুকে জাগে মোর একি বিহ্বল বাসনা !  
জীবন মিশায়ে দিতে চাই তব অমল ধবল জীবনে !  
পাগল হইয়া বনে বনে ধাই পূরাতে প্রাণের কামনা !  
ফুরায়ে যেতেছে জীবন আমার জাগ্রত দিবা-স্বপনে !  
জীবন মিশায়ে দিতে চাই তব অমল ধবল জীবনে !  
হাতে লয়ে ফিরি দিবসে তোমায়, রাতে রাখি বুকে চাপিয়া !  
ফুরায়ে যেতেছে জীবন আমার জাগ্রত দিবা-স্বপনে !  
গভীর পুলকে আঁখি ঝরে মোর, থেকে থেকে উঠি কাঁপিয়া !  
হাতে লয়ে ফিরি দিবসে তোমায়, রাতে রাখি বুকে চাপিয়া !  
রূপ-পিপাসায় ঘোঁরন ব্যর্থ, পারি না এ-ব্যথা বোঝাতে !  
গভীর পুলকে আঁখি ঝরে মোর, থেকে থেকে উঠি কাঁপিয়া !  
মরণ-অস্ত্রে তুমি হয়ে আমি মিশে যেম রই তোমাতে !



## নিশীথের আলো

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

প্রভুল ছিলেন শরতের যথার্থ বন্ধু। তিনি শরতের সহিত একত্রে আই, এ, পর্যাঙ্ক পড়িয়াছিলেন, তাহার পর শরৎ পড়া ছাড়িয়া দেন, কুসঙ্গে মিশেন, নিজের দেবচরিত্র দূষিত করিয়া ফেলেন। প্রভুল বি, এ, এবং ল'পাশ করিয়া মফঃস্বলে কোন সহরে প্র্যাকটিস করিতে গেলেন।

কলিকাতায় যতদিন তিনি ছিলেন শরৎকে সংপথে ফিরাইবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন; উপদেশ দিয়াছেন, তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু শরৎ কিছুতেই সংপথে আর ফিরিতে পারেন নাই। একদিন শরৎ তাঁহাকে অপমানজনক কি একটা কথা বলায় তিনি যেই চলিয়া গিয়াছেন আর আসেন নাই। তাঁহার কথা শরৎ ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কোন দিন এই অকৃত্রিম বন্ধুর সং উপদেশ মনে করিয়া মনকে অনর্থক কষ্ট দিতে তিনি রাজি হন নাই।

আজ যখন রেজেষ্ট্রীতে একখানা পত্র তাঁহার নামে আসিয়াছিল, তিনি সে খানা উন্টাইয়া দেখিলেন, সেখানা বাঁকিপুর হইতে আসিতেছে।

বাঁকিপুরে তাঁহার কে আছে তাহাই তিনি মনে করিবার চেষ্টা করিলেন। মনে করিতে না পারিয়া পত্রের কভার ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

প্রথমই নীচে নামের দিকে তাকাইলেন, সেবা নাম যে কখনও শুনিয়াছেন তাহা মনে হইল না।

পত্রে লেখা ছিল—

মাত্ত বরষু,

আপনার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ আলাপ না থাকলেও আপনি আমার পরিচিত। আপনার নাম আমি আমার বিয়ের পর হ'তে শুনে আসছি, আপনিও আমার স্বামী আপনার বন্ধু প্রভুল মিত্রের কাছে আমার নাম শুনেছেন সন্দেহ নাই।

আজ নিতান্ত দায়ে পড়ে আপনাকে পত্র দিচ্ছি, এ বিপদে আপনি বই আমার উদ্ধারকর্তা আর কেউ নেই। আমার এমন কোন আত্মীয় নেই যে এই বিপদে আমার রক্ষা করতে আসবে।

স্বামীর মুখে একদিন শুনেছি আপনি তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বন্ধু বলতে যে শ্রেণীর জীব বুঝায়, তাঁর কথা শুনে আমি আপনাকে তা মনে করতে পারি নি। যে বন্ধু বন্ধুর জন্তে প্রাণ দিতে এগিয়ে যায় আপনি একদিন আমার স্বামীর সেই বন্ধু ছিলেন। সেই সাহসে আমি আজ আপনাকে পত্র দিচ্ছি।

আমার স্বামী,—আপনার বাণ্যবন্ধু এখানে ওকালতি করতেন, বোধ হয় আপনি শুনেছেন। এখানে তাঁর বেশ পশার ও হয়েছিল, একটা কারণে তাঁর অত্যন্ত মান এতিপত্তি, পশার সব মাটি হ'য়ে গেল; একটা কথায় তিনি আজ মাহুয়ের চোখে একেবারে অধম হ'য়েছেন।

কথাটা পরিষ্কার করে না বললে আপনি বুঝতে পারবেন না, কিন্তু সে কথা বলতে গেলে লজ্জার আমার মাথা ঝুইয়ে পড়ে, লিখতে আমার লেখনী নিশ্চল হয়ে আসছে। কিন্তু তবু আমার সে কথা আপনাকে জানাতেই হবে, কারণ আমার আজ কেউ নেই যার 'পরে আমি ভর দিয়ে একটু দাঁড়াবার জন্তে অন্ততঃ পক্ষে চেষ্টাও করতে পারি।

এখানকার লেডী ডাক্তার মিস গাঙ্গুলী আমার এই সর্বনাশের মূল। সে দেখেছে তার দেশকে-তার মোহময় রূপে ও কথায় আকৃষ্ট করে যে সব যুবককে সে টেনে নিয়েছে, সর্বস্বহারী করেছে, আমার স্বামী তাদেরই মধ্যে একজন। আমার স্বামী কাজ ছেড়ে দিলেন, ঘরের পয়সা বার করে দেশের সেবায় নিয়োজিত করলেন, অথচ আমার একটি কথা জানালেন না।

হঠাৎ বে দিন আমি জানতে পারলুম, সে দিন আমার চোখে জগৎ অন্ধকার হয়ে গেল, আমি জানতে পারলুম—আমার স্বামী সব হারিয়েছেন, আমার স্বামীর কিছু নেই।

জগতে আমার গৌরবের বস্তু ছিলেন তিনি, কিন্তু আমি আজ সে গৌরব হারিয়েছি। আজ তিনি সাধারণের চোখেও হয়, তাঁর দেশভক্ত দলের কাছে হয়, তারা তাঁকে অধঃপতনের শেষ ধাপে পৌছতে দেখে ঝুণা করে তাড়িয়ে দিয়েছে। ছিন্নির এই সব-হারার আছে শুধু পুত্র, কন্যা ও স্ত্রী, কিন্তু জানি নে কেন সকল আক্রোশ আমাদের 'পরেই পড়েছে। নিজের : নির্ধ্যাতন সহিতে পারি,—হতভাগা ছেলে মেরেকে নির্ধ্যাতন করা যে সহিতে পারি নে, মায়ের বুক ফেটে যায়।

কিন্তু এজন্তেও আমি আজ আপনাকে চাই নে, চাই আমার স্বামীকে রক্ষা করতে। আমার স্বামী মরিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছেন। মিস গাঙ্গুলীর

আশায় হতাশ হয়ে তিনি নিজকে নিজে নষ্ট করে ফেলছেন। চাই তাঁকে রক্ষা করবার জন্তে আপনাকে। পথে তাঁর বার হওয়ার ঘো নেই, নিজের থেকে সত্ৰম, প্রতিপত্তি সব হারিয়েছেন। বলতে লজ্জা করে—দলের গচ্ছিত অর্থ, মকেলের গচ্ছিত অর্থ সবই তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন।

আমার ভয় হচ্ছে—হয় তো তিনি আত্মহত্যা করবেন—কারণ এ রকম অবস্থায় সেটা খুবই স্বাভাবিক। বন্ধুকে রক্ষা করতে,—একটি নারী এবং দুটি শিশুকে বাঁচাতে—রক্ষাকর্তারূপে আপনাকেই আজ আহ্বান করছি,—আপনি আসুন। আমার স্বামীকে বাঁচান, আমাদের বাঁচান। আজ আপনার পথ পানে চেয়ে রইলুম, বিলম্ব করবেন না।

নিঃ

সেবা মিত্র।

পত্রখানা পাঠান্তে শরৎ যেন অগাধ জলে পড়িয়া গেলেন। আজ অনেক কালের পরে চকিতে তাঁহার মনে বন্ধু প্রতুলের মুখখানা জাগিয়া উঠিল। হায় রে, কি মানুষ ছিল সে, তাহারই কিনা এই সাংঘাতিক অধঃপতন? দরিদ্রের সম্ভান প্রতুল শুধু এই সংচরিত্রের জন্যই আদর্শ-স্বরূপ ছিল, এবং ধনী কন্যা সেবা স্বৈচ্ছায় তাহাকে পতিত্ব বরণ করিয়া লইয়াছিল।

শরতের মনে পড়িলে প্রতুলের সেই তেজঃপূর্ণ দীপ্ত আকৃতি, তাহার সেই উদ্দীপনাময় কথাগুলি। সেই প্রতুল—যাহার সংচরিত্রের বর্ণে ঠেকিয়া শত সহস্র সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে অনেক দূরে ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে, এতকাল যে ধাপে ধাপে উপরেই উঠিতেছিল, কেমন করিয়া সে অধঃপতনের এত নিম্ন স্তরে পড়িয়া গেল? মিস গাঙ্গুলীর এমন কি মোহ আছে—যাহাতে প্রতুল কিছুতেই নিজকে সংযত রাখিতে পারিল না, সাধারণ পতনের মতই সে আশুপে বাঁপাইয়া পড়িল?

শরৎ নিজে অধঃপতনের সোজা পথ বাহিয়া

চলিয়াছেন, কিন্তু তাহাই বলিয়া তিনি চান না তাঁহার দৃষ্টান্ত লইয়া আর কেহ চলুক। আজ প্রভুলের শোচনীয় অধঃপতনে তাঁহার অন্তরে বড় বেদনা বাজিল।

কিন্তু কে এই মিস্ গান্ধুলী ?

এই অপরিচিতা অনিন্দ্য সুন্দরীর কথা মনে করিতে করিতে তাঁহার অন্তরের বড় গোপনে অবস্থিত একখানা বড় সুন্দর মুখ মনের উপর আগিয়া উঠিল। সে একদিন মিস্ গান্ধুলী নামেই পরিচিতা ছিল, সেও ডাক্তারী পড়িত।

সেই মুখখানা—বাস্তবিকই কি সুন্দর ছিল! তাঁহার তরুণ হৃদয় একেবারেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সংসার ভুলিয়া শরৎ সেই তরুণীটিকে ভালবাসিয়াছিলেন। তখন মনে হয় নাই—সেই তরুণী ও তাঁহার মাঝখানে কতখানি দূর আগিয়া আছে।

সে ভালবাসা চোখের নয়। যে ভালবাসা মুহূর্তে উদয় হইয়া মুহূর্তেই বিলীন হইয়া যায় না, বরং হৃদ্যাপ্য জানিয়াই হৃদয়ের স্তর কাটিয়া কাটিয়া অন্ততরম স্থানে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া যায়, ইহা সেই ভালবাসা। অন্ততরম স্থল হইতে যে প্রেমধারা প্রবাহিত হইয়াছিল শরৎ তাহাতে তাঁহার প্রিয়তমাকে স্নাত করাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

শরৎ যে বাড়ীতে থাকিতেন, ঠিক তাহার সম্মুখে থাকিত তাহার। সংসারে ছিল সেই তরুণী, তাহার মা এবং একটি দাসী।

এমন একদিন যাইত না, যে দিন শরৎ সেই প্রার্থিত মুখখানি না দেখিতে পাইতেন। সেয়েটি নিজের ঘরে বসিয়া আপন মনে নিজের পড়া তৈয়ারী করিত, বেলা দশটার কলেক্ চলিয়া যাইত, বৈকালে শ্রান্তভাবে কিরিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িত। সন্ধ্যার পরে আবার পড়িতে ককালঙলা নাড়াচাড়া করিত, তাহার

খটখট শব্দ এ পাশে শরতের কাণে বড় স্পষ্ট হইয়াই বাজিত।

অন্তর যেখানে নিয়ত আকর্ষণ করে সেখানে পরিচয় হইতে বেশীক্ষণ বিলম্ব হয় না। কোন একটা অছিলায় শরৎ অনায়াসে এই পরিবারে প্রবিষ্ট হইতে পারিল।

সম্ভ্রান্ত জমিদার-পুত্র শিক্ষিত ও রূপবান এই যুবকটিকে ইভার মা বেশ আন্তরিকতার সহিতই গ্রহণ করিলেন। শরৎ যখন বিবাহের প্রস্তাব করিলেন তখন ইভার মা জানাইলেন শরৎকে ব্রাহ্মধর্ম লইয়া তবে ইভাকে বিবাহ করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম লইলে শরতের পিতা নিশ্চয়ই শরৎকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতেন, যাহাতে তাহা না হয়,—অর্থাৎ শরৎকে যেমন করিয়াই হোক পিতার বিশাল সম্পত্তি হস্তগত করিয়া তবে ইহাকে বিবাহ করিতে হইবে।

দারুণ ঘৃণায় শরতের সারা অন্তরটা অকস্মাৎ পূর্ণ হইয়া উঠিল, উন্মুখ চিত্ত অকস্মাৎ একেবারে ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া গেল। এই মুহূর্তটিতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মূল্য ইহাদের কাছে তত বেশী নয়, সম্পত্তির মূল্য যত বেশী। ইহারা ইহাদের লাভ-সাময় দৃষ্টিপাতে দেখিয়াছে শুধু তাঁহার বিশাল সম্পত্তি, তাঁহাকে নহে। হৃদয়ের মূল্য যাহারা বুঝে না তাহাদের সমস্তে থাকিতে শরতের সমস্ত অন্তর দেহ শিহরিয়া উঠিল, তিনি ইহাদের সংস্রব ত্যাগ করিলেন।

তিনি কিরিয়া দাঁড়াইলেন,—চলিলেন কিন্তু আর এক পথে। যে পথ বহিয়া এতদিন তিনি চলিয়াছেন, সে পথ তাঁহার সম্মুখে বিস্তৃত ছিল, কিন্তু সহসা এই ধাক্কাটা খাইয়া সে পথের উপর তাঁহার দারুণ বিতৃষ্ণা চাপিয়া গিয়াছিল, তিনি তাই বক্র পথ ধরিলেন। এ পথে একবার পা দিলে ক্রত ধামিয়া না যাইবার সম্ভাবনাই বেশী এ চিন্তা মনে আগিলেও তিনি জোর করিয়া সে চিন্তা তাড়াইয়া দিলেন।

পুত্রের এই নিদারুণ অধঃপতনের কারণ জানিতে স্নেহময় পিতার বিলম্ব হইল না। তিনি তৃত্যের হাতে

দিয়া বহুতে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন, তাহাতে ইভার মাকে অমরোধ করিলেন—তিনি তাঁহার কথাই রাখিবেন। পুত্রের পানে চাহিয়া তিনি পুত্রকে পর্যন্ত ত্যাগ করিবেন, সকল সম্পত্তি এখনই পুত্রের নামে লিখিয়া দিতেছেন; ইভার সহিত শরতের বিবাহ দেওয়া হোক।

ইভার মা উত্তর দিলেন,—তাঁহার কন্ডার জন্ত সংপাত্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে। অসচ্ছরিত শরতের সহিত তিনি কন্ডার বিবাহ দিতে সম্মত নহেন, এ জন্ত শরতের পিতা যেন তাহাকে মার্জনা করেন।

ইহার কয়েক দিন পরেই তাহার সন্মুখের সে বাসা ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল, দারুণ ঘৃণায় শরৎ তাহাদের গম্য স্থানের খোঁজটা পর্যন্ত লগ্নার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। কিছু কাল পরে এম. বি. পাসের লিষ্টএ মিস্ ইভা গান্ধীর নামটা জলজলে হইয়া চোখের সন্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। সে দিনে শরতের সমস্ত অন্তরখানা কি এক অননুভূত বেদনার পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, মাসের পর মাস মত্ত পানেও সে বেদনা জুড়াইতে চাহে নাই।

সে বেদনা আর জুড়াইয়া যায় নাই। উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াও শরৎ সফলকাম হইতে পারেন নাই। অত্মমনস্ক হইবার জন্ত সকল আয়োজন তাঁহার যেন ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছিল। জীবনে আর কোনও নারীকে ভালবাসা দূরে থাক, তাহাদের পানে চাহিতে পর্যন্ত তিনি উদাসীন। আজ তাঁহার কঠিন প্রস্তরসম অন্তরটার পানে তাকাইয়া লোকে আশ্চর্য হইয়া যায়, কেহ ডাকিতে পারে নাই—এই অন্তরই এক দিন বড় কোমল ছিল, একটা নিদারুণ আঘাত-স্পর্শে এ অন্তর বজ্রাপেক্ষা কঠিন হইয়া গিয়াছে বলিলেও হয়। নিজেকে তিনি আর আটকাইয়া রাখিতে পারেন নাই, রাশছারা। উন্মত্ত অশ্বের মত তাঁহার মন ছুটতেছিল, তাহাকে তিনি নিমেষের তরেও ঠেকাইতে চেষ্টা করেন নাই।

আজ এই মিস গান্ধী নামটা চোখের উপর

জাগিয়া উঠিতেই তিনি মনোগতির বিপরীত দিক হইতে আবার একটা প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া একমুহূর্তের জন্ত স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

এ কে? এই কি ইভা,—সেই ইভা?

না, ইভা নয়। ইভা দেশের কর্ম্মসংসদ গঠন করিবে, তাহাদের নেত্রী হইবে, ইহা হইতে পারে না। দেশের কাজে নামিতে গেলে যে ত্যাগের প্রয়োজন, যে শক্তির আবশ্যক, তাহা কি ইভার আছে? বিলাসিনী ইভা, তাহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলাইয়া যে কেহ বুঝিতে পারিবে এ নারী জীবন্ত লাগসা। তাহার মধ্যে নমনীয়তা নাই, আছে গর্ভের ক্ষীতি। রূপের গর্ভে সে আত্মহারা, হুনিয়ার কাহাকেও সে গ্রাহ্য করে না।

আর যদি ইভা এই কৃত্রিম বেশই গ্রহণ করিয়া থাকে, নামের মধ্যে তাহার আসল মূর্তিটিকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া যদি সে বাহিরে সম্পূর্ণ ছদ্মবেশই ধরিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মূলে কি আছে বুঝিতে হইবে? কতকগুলি লোককে রূপে মুগ্ধ করিয়া পতঙ্গের মত আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের সর্বস্ব লইয়া খেলা করিয়া অবশেষে প্রতুলের মত নিঃসম্বল অবস্থায় দল হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া—

শরতের কাণ মুখ দিয়া আশ্রণ ছুটতে লাগিল। তিনি উত্তেজিত ভাবে আপনা আগনিই বলিয়া উঠিলেন,—“না না, এ কখনই ইভা নয়,—ইভা এ রকম কাজ করতে কখনই পারে না। ভগবান বার বাইরের দিকটা অত সূক্ষ্ম করেছেন, তার ভেতরটা মাকাল ফলের মত অসার বস্তু দিয়ে কখনই পূর্ণ করেন নি,—কখনও না, কখনও না -

ইভা অর্থ ভালবাসে, তাহার বিলাস তৃপ্তির জন্তই তাহার প্রচুর অর্থের আবশ্যক, কিন্তু সেই অর্থের জন্ত সে যে নারী হইয়া এমন ছলনাময় ব্যবহার করিবে, ইহা মনে করাও যেন অসম্ভব। ইহা ভাবিতে শরতের বুকে আশ্রণ জ্বলিয়া উঠে।

না, এ কখনই ইভা নয়—ইহা ভাবিতেও বড়

আশাতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। শরৎ মানস চক্ষে দেখিতে পাইলেন, ইভা বড় ঘরের বধূ হইয়াছে, সে যেমন চায় তেমন স্বামীই সে পাইয়াছে। হায় রে, শরতের বুকভরা ভালবাসা যদি সে অমুভব করিত, অতি অকিঞ্চিৎকর অর্থের পানে তাকাইয়া যদি সে এই মানুষটার অন্তরের পানে একবার তাকাইত—এতদিন শরতের এ শূন্য গৃহ যে পূর্ণ হইয়া যাইত, আজ যে ইভাই এখানে একচ্ছত্রী রাণী হইতে পারিত। কোথায় গেল সে দিন—যে দিন এই পৃথিবী ছিল কি সুন্দর! ইহার কিছুই সে দিন এমন বার্থ ভাবে ফিরিতে পাইত না, ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ পর্য্যন্ত উপভোগ করিয়া লওয়া যাইত। সে দিন মনে পড়িত না হাসি গান, খেলা সবই মিথ্যা, নীল আকাশে, চাঁদের অসীম আলো, ফুলের সুবাস, আর পাখীর গান সবই অনর্থক, —ইহার কোন মূল্য নাই। আজ চোখের সম্মুখ হইতে সে মোহময় পর্দাটা সরিয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে পৃথিবীর বুকে মানুষের মন মুক্ত করিবার এ সব বুধাই আরোজন, বুধা খেলা মাত্র। চোখের পাতা ছুটি ক্রমেই ভারি হইয়া উঠিতেছিল,—হা অতীত, যে দিন লইয়া গেলে, পিছনে কেন তাহার দাগটি রাখিয়া গিয়াছ? আজ যদি সে দিনের স্মৃতি কোন রূপে মিলাইয়া দেওয়া যাইত,—আঃ, শরৎ যে তাহা হইলে যথার্থ সুখী হইতে পারিতেন।

হুই হাতে বেদনা-দীর্ঘ বুকটা চাপিয়া ধরিয়া শরৎ উদার ছুটি নয়নের দৃষ্টি কোন অসীমের পানে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন।

( ৭ )

সাধ্বী সতীর অন্তরের আকুল আহ্বান উচ্ছ্বল-প্রকৃতি শরৎকে অবিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল। প্রভুলের জন্ত যে ব্যস্ততাটুকু তিনি অমুভব করিয়াছিলেন তাহা কেবল এই নারীটির জন্তই।

শরৎ আজ রাত্রের মেলেই রওনা হইবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন, অকস্মাত একটা চিন্তা আগিয়া উঠিল মানিক,— তাহাকে কোথায় কাহার কাছে দিয়া যাইবেন?

সেই হুর্কল কীণকার বালকটির কথা মনে করিতে শরতের হৃদয় স্বেচ্ছা হইয়া উঠিল। হায়রে জগৎ, এই বিশাল জগতে এই কীণকার শিশুটির স্থান নাই, তাহাকে কেহই নিজেদের মধ্যে এতটুকু স্থান দিয়া রাখিতে চায় না, সকলেই তাহাকে বড় দূরে রাখিয়া চলে, দৈব ক্রমে কাছে গেলে ও দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

অভাগা শিশু সে মাত্র, ছয় বৎসর বয়স তাহার, জাতিবিচার, উচ্চ নীচ জ্ঞান তাহার অন্তরে এখনও জাগিয়া উঠিতে পারে নাই। অপর বালকেরা যখন খেলা করে সে তখন ভাবিতে পারে না, তাহাদের সহিত খেলার অধিকার তাহার নাই। সে যে সকলের মাঝে বাস করিয়াও সকল হইতে বঞ্চিত এ খবরটা এখনও তাহার কানে পৌঁছায় নাই। সে জানে পৃথিবীর বুকে তাহাণ্ডাও যেমন সেও তেমন; তাহার বাহা ভোগ করিতে পারে সেও তাহা ভোগের দাবী করিতে পারে। সে শিশু জানে না—পৃথিবীর লোকই সংস্কারের জাল গাঁথিয়া তাহার চারিদিকে জড়াইয়া দিয়াছে। এ জালের ভিতর হইতে সে বাহির টাকে দেখিয়াই যাইবে মাত্র, কিছুই স্পর্শ করিতে পাইবে না।

এই অপোগণ্ড ছেলেটি লইয়া শরতের হইয়াছে মহামুস্কিম। ইহাকে স্পর্শ করিতে কেহ চাহে না, পাছে স্পর্শ করিয়া ফেলে এই ভয়ে লোকে দূরে দূরে থাকে। কর্মচারী, দাসদাসী সকলেরই সমান স্পৃষ্টা-স্পৃষ্ট বিচার। শরৎ যখন উদার ভাবে এই সম্বন্ধে হুই একটা কথা বলিতে গেলেন তখন ছোট বড় সকলেরই মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল। কেহ কেহ যেন স্বগতভাবে অথচ শরৎকে বেশ ভালরূপেই শুনাইয়া বলিল, “তা বলে চাকরি করতে এসে জাত তো খোয়ানো যায় না, বাপু। কি আর করিব, অদৃষ্টে না থাকিলে চাকরী নাই থাকিবে, তা বলে জাত খোয়ানো পারব না।”

শরৎ একেবারে শুক হইয়া গেলেন; আর একটা

কথাও কাহাকে না বলিয়া তিনি নিজেই দুর্কিষহ বোঝার মত এই ছেলেটাকে বকে তুলিয়া লইলেন। এ ভার আর কেহ বহিতে রাজি হইল না যে শক্তির অভাবে, সে শক্তি তাঁহার প্রচুর রূপেই ছিল।

এতদিন এ বোঝা অবলীলাক্রমে তিনি বহন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার সামান্য একবারের জ্ঞাতও পদাঙ্কন হয় নাই। চলার বিরাম হয় নাই, আজ হঠাৎ তিনি খামিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন, তাঁহার মনে পড়িয়া গেল স্বেচ্ছায় যাহাকে তিনি আশ্রয় দিতে একটা অঙ্গুলিই মাত্র প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন, প্রকৃতির নিয়মে সে সেই ততটুকু অবস্থায় থাকিয়া ততটুকু পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। ধীরে ধীরে তাঁহার অলক্ষ্যে সে কবে বড় হইয়া গিয়াছে, ক্ষুদ্র অঙ্গুলি ছাড়িয়া তাঁহার সমস্ত দেহটাকে কবে কেমন করিয়া বেঠেন করিয়া ধরিয়াছে। আজ এ বোঝা তিনি নামাইবেন কেমন করিয়া, এ বাঁধন আলগা করিবেন কিরূপে? আজ তাঁহাকে বাহির হইতে হইবে, এমন আকস্মিক দমকা ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া পড়াই তো তাঁহার চির-অভ্যাস। আজ মনে পড়িল সীমাহীন ধারণাও আজ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, ইচ্ছামত ছুটিয়া বেড়ানোর দাবী আর করিবার যো নাই।

ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনি পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথের উপর পড়িতেই সামনা সামনি একজনের সহিত দেখা হইয়া গেল, তাঁহার নাম বিজ্ঞান তর্কালঙ্কার।

তর্ক কচকি নামটাই বেশীর ভাগ গ্রামে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। অনভিজ্ঞ গ্রাম্যনারীবৃন্দ লজ্জা শব্দটা এত বড় পণ্ডিতের নামের সঙ্গে যোগ করিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে বিভ্রালঙ্কার আজ বিভ্রা কচকি নামে গ্রামে বিখ্যাত।

“হরিবোল, হরিবোল, শুভমন্ত—শুভমন্ত; বেঁচে থাক বাবাজি, আমার যত মাথার চুল তত বছর

তোমার পরমায়ু থাক, বাঁপ পিতা মোর ভিটেতে সন্ধ্যা প্রদীপটা জলুক বাবা। দেশের দেশের এমনি করেই সেবা করে বাও, দেশের লোকে তোমার দমায় বেঁচে থাকুক। তারপর বাবাজি,—যাওয়া হচ্ছে কোথায়?”

গম্ভব্য পথে বাধা পাইয়া শরৎ দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণের উপর আন্তরিক প্রীতি-শ্রদ্ধা না থাকিলেও একটা প্রণাম করিয়া ফেলিয়া শুধু হাসিয়া উত্তর দিলেন, “কোথাও না, এই এখানেই একটু বেড়য়েছিলুম।”

তর্কালঙ্কার মহাশয় অল্প আশীর্ব্বাদ দ্বারা শরতের মাথায় ঢালিয়া দিয়া স্নেহ গদগদকণ্ঠে বলিলেন, “তা বেড়াবে না আর? তোমার দেশ,—তোমার মাটি, তোমারই সব,—তুমি বেড়াবে না, তাও কি হতে পারে?”

আবার একটু হাসিয়া শরৎ বলিলেন, “আমারই সব?”

তর্কালঙ্কার মহাশয় গম্ভীর মুখে বলিলেন, “তা নয় তো কি বাবা? ছোট মায়ের কথা বলবে,—কিন্তু নিঃসন্তান বিধবা স্ত্রীলোক, কিছুর, পরেই তাঁর দাবী শেষ পর্যন্ত টিকিতে পারবেনা। তোমার কাকার মৃত্যুর পরে তোমার অল্পপহিতিতে এতদিন যে তিনি এই বিশাল জমিদারী ভোগ করতে পেরেছেন এই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট পাওয়া হয়েছে। বিধবার কিসেই বা দরকার বাবা? একবেলা দুইটা আতপ চালের ভাত খাবে, দু’খানা মোটা খান পরবে—ব্যস, ফুরিয়ে গেল। তোমার বিধব সম্পত্তি, তুমিই জন্ম জন্ম ভোগ কর বাবা, আমরা রাম-রাজ্যে বাস করে বাচি।”

শরৎ মুখ ফিরাইয়া হাসিলেন মাত্র।

তর্কালঙ্কার মহাশয় সে প্রসঙ্গ ফিরাইয়া বলিলেন, “তারপর বাবাজি, বিয়ে খাওয়া করবে না, এমন করেই দিনগুলো কাটিয়ে দেবে?”

শরৎ হাসিমুখে বলিলেন, “আর ও বালাইয়ের দরকার কি তর্কালঙ্কার মহাশয়,—এ বেশ আছি।”



বিস্ফারিত চোখে তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন, “বাণাই! ওসব কথা মনেও এনো না বাবাজি। গৃহিণী ঘরের লক্ষ্মী, গৃহিণী হীন হয়,—জানো বাবাজি, একেবারে অরণ্য-সেও আবার কি রকম অরণ্য জানো, যে অরণ্যে বুনো জন্তুগুলো ইস্তক বাস করতে পারে না, ঠিক সেই রকম। গৃহিণীহীন ঘরে লক্ষ্মী কখনও বাস করতে পারে না—এ কথা জানো বাবাজি?”

শরৎ বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “আপনার কথাগুলো ঠিক অন্তরের সঙ্গে মেনে নিতে তো পারছি নে তর্কালঙ্কার মহাশয়। গৃহিণী থেকেই বা লাভ কি বলুন না দেখি! কেবল একটা না একটা অশান্তি লেগে আছেই। তার আবদার পুরাতে দিন কেটে যায়, তার রাগ ভাঙাতে মাথাটাকে মাটিতে পাতে হয়, তারপর কতকগুলো ছেলে পুলে হ’লে—তাদের অন্নপ্রাশন, পৈতে, বিয়ে, সব তাতেই কি খরচটাই না পড়ে—হিসাব কল্পন।”

তর্কালঙ্কার মহাশয় মাথা ছুলাইয়া বলিলেন, “সেটা ঘটে বাবা আমাদের ঘরে। এটা আনতে ওটা নেই, ওটা আনতে এটা নেই; ভাত আনতে হুন ফুরায়, ছুন আনতে ভাত ফুরায়,—এ অবস্থা আমাদেরই ঘরে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের ঘরের এ সব নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে গেলেও তোমার ঘরে তো হবে না বাবাজি। তোমার অভাবটা কিসের ভাব দেখি,—কত বড় জমিদারী তোমার, কত টাকা আয়,—”

বাধা দিয়া শরৎ বলিল, “আরটাকেই ধরেছেন তর্কালঙ্কার মহাশয়,—ব্যরটাকে ধরেন নি তো!”

তর্কালঙ্কার মহাশয় মুকবিবরানা হাসি হাসিয়া বলিলেন, “সব ধরেছি বাবা, তোমার ঘরের কথা আমার কাছে কিছু অজানা নাই। তুমি চিরকাল বিদেশে আছ, আমার চেন না,—কিন্তু তোমার বাবা চিনতেন। তিনি নিজে সমজদার জহুরী ছিলেন, কোনটা কাঁচ, কোনটা অহরত তা তিনি যেমন বুঝতেন এমন আর কেউ যে বুঝেন না এই তো তারি ছুৎ। আমি

তার ডান হাত ছিলুম, আমার না জিজ্ঞাসা করে তিনি একটা কাজও করতেন না। ওই সেবারে তোমাদের মহালে আলম-ভাকার প্রজারা খাজনা দেবে না বলে যখন লাঠি ধরে দাঁড়িয়েছিল, তোমার বাপ তখন ভেবেই সারা,—কি করে কি হবে কিছু ঠিক করতে পারছিলেন না। শ্রীনাথ বাবু ছিলেন তোমাদের নায়েব, তিনি এসে পরামর্শ দিলেন, পুলিশে খবর দাও—সব গোল মিটে যাবে। আমি বললুম, “কি! পুলিশে খবর দেব,—কেন জমিদারের তেমন ক্ষমতা কি নাই? দিন আমার প্রকাণ্ড জোয়ান লাঠিওয়াল, আমি এই প্রকাণ্ড লাঠিওয়াল নিয়ে সব বেটাদের জব্ব করে দেব, খাজনা দেবার পথ তারা পাবে না। তোমার বাবা তো কেঁদেই ভাসাল, বললেন,—না সেটি হবে না। যে রকম মানুষ তিনি—টাককে বেশী বলাই নিশ্চয়োজ্ঞ মনে করে আর কিছু না বলে চুপি চুপি আমার প্রকাণ্ড লাঠিওয়াল নিয়ে গিয়ে পড়লুম সেখানে। সে বেটাদের কি সাহস আছে, না শক্তি আছে? লাঠিওয়াল নিয়ে গিয়ে দাড়াতেই তো তারা হাতের লাঠি ফেলে দিলে; তারপর তাদের কন্নটাকে ধর পাকাড়,—মার ধর করতেই—বাস, যার কাছে যত পাওনা খাজনা ছিল সব তো দিলই, তা ছাড়া—বাড়ী পিছু ছুই টাকা ধরে দিলে। তাই তো বলি বাবা, সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই, সব গেছে। আজিকে সেই দোদীও প্রতাপশালী বিজাপতি তা আর বলব কাকে? তোমার বাবা যে আমার কি ভালবাসতেন—তা যদি আজ তিনি থাকতেন তবেই দেখতে পারতে, জানতে পারতে।”

একটা বড় গস্তীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বড় ককণ চোখে তিনি শরতের পানে তাকাইলেন।

অতি কষ্টে হাসি গোপন করিয়া শরৎ বলিলেন, “হ্যাঁ, আমি সে সবই শুনেছি। শ্রীনাথ বাবু এ সব কথা আমার বলেছেন।”

বিজ্ঞান তর্কালঙ্কারের কোটরে প্রবিষ্ট চোখ দুইটি উজ্জল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, “তাই তো

বাবাজি, আমিও তো তাই বলি,—তুমি দেশে এসেই সকলের খোঁজই বিশেষ করে নিয়েছ, শুণ কি লুকিয়ে থাকতে পারে? আশুণ যেমন ছাই ঢাকা থাকে না মানুষের দোষ শুণও তেমনি ঢাকা থাকতে পারে না। তবে নাকি—পাড়া গাঁওলো বড় খারাপ, এখানকার লোকগুলো প্রায়ই বড় হিংস্রটে, পরশ্রীকাতর হয়ে থাকে, কারও ভাল এরা বড় একটা সহিতে পারে না।

শরৎ মাথা কাত করিয়া বলিলেন, “সে কথা সত্যই, কিন্তু এরকম ব্যাপারটা শুধু পাড়াগায়েই ঘটে না তর্কালঙ্কার মশাই,—সহরে যারা বিলক্ষণ শিক্ষিত তাঁদের মধ্যেও এই পরস্পর ঈর্ষাভাবটা জেগে আছে বলেই আমি জানি। কদাচিৎ দুই একজনের মধ্যে এর ব্যতিক্রম ঘটলেও ঘটতে পারে, তারা সংসারের অনেক গুণেরে তা জানবেন!”

তর্কালঙ্কার মহাশয় চট করিয়া কথাটা মানিয়া লইলেন—“তা হতে পারে, কিন্তু কেনো বাবাজি, পাড়াগায়ের লোকদের মধ্যে এ ভাবটা বড় বেশী। এই যে আমি একদিন লোকের কত উপকারই করেছি তা কি কেউ আজ বলবে? আমি যে এত করেছি, এখানকার লোকদের কথা চাপা দিয়ে তোমার কানে আমার কুৎসাই তুলে দেবে। তুমি যে বাবাজি, এমন ভাল লোক, তোমার নামে কত কুৎসাই না লোকে করে। আমরা শুণ বুঝি বাবাজি, শুণের আদর আমরা করতে জানি, মন্দটাই ধরে রাখতে চাই নে। সে যাই হোক বাবাজি, একটা বিয়ে করে ফেল। আমার দাদার ছেলে তুমি, দাদার বংশটা রাখতে হবে তোমার। দাদা আমার কত দিন আমার বলেছেন,—“বিস্তেধন, ছেলোটো রইল, ওকে দেখ, দেখে শুনে সং বংশের একটি মেয়ে আমার ধরে এনো, বংশটা যেন থাকে। তুমি ইচ্ছে করে বংশটা—”

তাঁহার চোখ দুইটি জলভারে যেন নমিত হইয়া

পড়িল, এই নির্ভুল! মিথ্যা কথাগুলো শরতের গারে যেন বাণ বিঁধাইয়া দিতেছিল, তিনি তথাপি বেশ শান্ত সুরেই বলিলেন, “না, তা কি হতে পারে যে একেবারেই বিয়ে করব না, তবে কি জানেন,—কেউ কেউ নিজে দেখে শুনে বিয়ে করলেও আমি তার পক্ষপাতী নই। আপনারা সব প্রাচীন মানুষ মাথার পুরে রয়েছেন, দেখে শুনে একটি সুপাত্রী ঠিক করে বিয়েটা দিয়ে দিন।”

“আচ্ছা, তাই বল বাবা, তাই হোক। তোমার স্মৃতি হোক, আমার দাদার খালি ঘরটা আবার পুরে উঠুক। তোমার প্রথম সন্তান হলেই আমি চণ্ডী তলায় গিয়ে মা চণ্ডীর কাছে দোয়া পাঁচ আনার কাঁচাগোলা দিয়ে আসব।”

মা চণ্ডী এই ব্রাহ্মণের প্রদত্ত সোয়া পাঁচ আনার কাঁচাগোলা খাইবার জন্ত যে কতদূর ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন তাহাই ভাবিয়া শরতের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, “আপনি নিজে থেকেই বা তা দিতে যাবেন কেন? আমিই চণ্ডীর পূজার জন্তে পাঁচটা টাকা দিয়ে দেব আপনার সেই আলাদা পূজার জন্তে যৎসামান্য দক্ষিণা একবারে নিয়ে যাবেন। শ্রীনাথ বাবুকে আমি বলে দেব। এখন আপনি গেলেই তিনি টাকা দেবেন! আর একটা কথা, চণ্ডীপূজার জন্ত আপনার বাৎসরিক চব্বিশ টাকা ধরা আছে, সেটা ডবল করে দেওয়া গেল, অর্থাৎ দুই টাকা করে মাসে দেওয়া হ’ত, সেটা চার টাকা করে এই মাস হ’তে পাবেন।”

কথা কয়টি শেষ করিয়া আলীকাদ লইবার অপেক্ষা না করিয়া শরৎ ক্রতপদে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ আনন্দ বিষয়ে হী করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

## ভিত্ গাঁথতে ফাঁকি দেওয়া

শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র

সব ছেঁড়া ছেঁড়া চাটাই আর দরমার বেড়া।  
গোলপাতা, খড়, রাস্তা থেকে কুড়োনো এক ফালি  
টিন, একটুকুরো দরমা এই রকম অনেকগুলো জিনিষ  
মিলিয়ে সেই সব ঘরের চাল, ছাউনী।.....একটা নয়,  
ছোটো নয়।

সারি সারি চ'লেছেই। বেশ লম্বা বস্তী।

গলি পথ..., পিচের তো নয়ই, কাকর, বালিরও  
নয়।

মাটির—আপনি তৈরী পথ।...

ঝুটিতে কাদা হয়, রোদে তেতে যার...

গ্যাসের আলো নেই গলিতে।...অন্ধকারেই চলা-  
কেরা ক'রতে হয়!

তা'ও রাস্তার কোন সীমা নেই।

কোথাও চওড়া—কোথাও সরু।...কোন জায়গায়  
হঠাৎ মাঝখানে এক জমের বাড়ী উঠে গেছে, উঠানের  
উপর দিয়ে পথ।

আবার কোথাও—কার ছুরে পড়া ভাঙ্গা কুঁড়ের  
সীমানা রাস্তার অনেকটা গ্রাস ক'রে ফেলেচে—নতুন  
দেওয়াল তোলার সময়ে।

কাজেই তার ধারির উপর দিয়েই চ'লতে হয়।...

এই গলিতে যারা থাকে—তারা সব রকমের।

এই যেমন—মুটে, মজুর, কেরানী, ভিথিরী, বদমাইস  
বেস্তা, ইত্যর এই সব।

তাদের ব্রাহ্মণও আছে আবার।

খুব নাকি নিষ্ঠাবান তিনি!

যথা—মদ খান, বেস্তার হাতে খান, নিশা যাপন  
করেন আবার আফিক; গায়ত্রীও জপেন, লোকের  
ঘটী পূজা করেন, যখন তখন নারায়ণকে ডেকে  
“মমস্তুত্যং” করেন।

দ্রুংখও করেন।—

সব অশিক্ষিত, মুর্থ। বড় ছুঁতগ্য তাই এখানে  
এসে পড়েচেন। নইলে তাঁর কি ইচ্ছে যে থাকেন?

বস্তীর লোকগুলো অশিক্ষিত, মুর্থ যাই-ই হোক  
না কেন, তাঁরা কিন্তু তাঁকে ভক্তি করে।...রোজ  
রাত্তির দশটার পর সকলেই কাজ থেকে ফিরে যখন  
রাধানাথের পী'ড়ের এসে জমে, তখন সংসার খরচ,  
গিন্নীর নাক নাড়া, রাজা পঞ্চম জর্জ, ক্যাথারিন  
মেয়ো, পিলচার থেকে আরম্ভ ক'রে মহাত্মা গান্ধী,  
হিন্দু মুসলমানের ঝগড়া, শিক্ষিত অশিক্ষিত, প্রেম,  
রক্ত, গল্প, গান, হল্লা সব রকমই চলে।...যে যতটুকু  
জানে সাদৃশ্যে ব'লে যায়। যে আরও একটু জানে  
তর্ক করে। যে জানে না নীরবে শোনে, আর  
অবাক হয়।

Village School master এর শ্রোতাদের  
মতই বোধ হয়।

They gazed.....the wonder grew

One small head could carry all he  
knew.

এমনি ভাবেই যাচ্ছিল।

হঠাৎ ঘুরে গেল একদিন, এই একঘেয়ে  
যাওয়া।.....

নতুন ক'রে দেশে বস্তা এসেচে।

জাতিকে জাগানো চাই, সজ্জকে জাগানো চাই,  
তরুণকে শক্তিশালী করা চাই।.....

তরুণই এর নেতা।

জাগ তরুণ, জাগাও তরুণ.....।

..... একদিন একদল লোক এসে গেল সেই  
পল্লীটার ভেতর।

কেউ—যারা কখনও কোনো দিন আসে নি। ও  
পাথর ওই বড় রাস্তার উপর থেকেই কাজ সেয়ে  
যেত, একদিন কিন্তু এল—চরকা দিয়ে গেল। স্মৃতি  
কাটি, পয়সা পাবে।...অনেককে দিলে, অনেকে  
নিলে। অনেকে হাসলেও আবার।

তবুও রাখলে—খাঁক।

পারুল ব'ললে, রেখে দে লো চারীর মা একটা।  
আখেরে কাজ দেবে।

তার পানে রাজা দাঁতগুলো বের ক'রে চারীর মা  
ব'ললে, ওলো এখন থেকেই লাগবে দেখিস্। এমনিই  
তো কতদিন ঘর খালি যায়। ঘর যেদিন খালি থাকে  
সেদিনটাও যদি কাটা যায়, পরের দিনের বাজার  
খরচাও পাওয়া যাবে।

ঠিকই তো.....। তাদের তো আর এমন  
পূঁজী নেই যে ভেঙ্গে থাকে। বা সেরকম পায়ও না।

এই জোর রাস্তিতে ছোটো টাকা।

তা মাসে আর ক'দিন?

এমনি চার আনা থেকে আরম্ভ ক'রেই বড়  
নিতি চলে।.....

.....শুধু এইই নয়, আরও হ'ল।

শিক্ষা চাই যে।.....

নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হ'য়ে গেল। মাইনে  
লাগবে না। তরুণ কর্ম্মী-সংঘ সব ঠিক মত ব্যবস্থা  
ক'রে দিয়ে ভট্টাচার্য্য মশাইকে এর ভার দিলে।.....  
বিদ্যালয় চালানো, লোকের স্মৃতি নিয়ে গিয়ে তাদের  
অফিসে জমা দিয়ে আসা, দরকারে খবর পাঠানো  
প্রভৃতি। ভট্টাচার্য্য মশাই শিখা নাড়িয়ে বলেন, সব  
ঠিক ক'রবেন, কোন চিন্তা নেই—এই অশিক্ষিত-  
গুলোকে মানুষ ক'রতে তো তিনি চানই।

—মদের দোকানটা।

—নিশ্চয়, ওটাও ওঠাবে।

তার চ'লে গেলে বলেন, হ্যাঃ ক'রবি তো সবই।  
জানা আছে আমার। মদের দোকান ওঠাবে! ওরে  
গাধারা, ছোট লোক গুলো যে মদ না খেলে মরে

যাবে। মদ না পেলে তাদের কাজের ছাইও হবে  
না।.....মনের বল পাবে কোথ থেকে?

একদিন এক মেথর এলো তার ছেলেকে স্কুলে  
ভর্তি করাতে।

কি সর্কনাশ—মেথর!

রাম, রাম—হরিবোল, হরি...।

ছোঁয়া—ছুঁয়ী উঠিয়ে দিতে হবে জানি।

না ওঠালে অমূল্য সমাজ জাগবেও না।

তাই ব'লে এত শীগগির।...তাতে ম্যাথর।

অসহনীয় যে গো!

কেউ রাজী হয় না, এগোতে পারে না, পিছিয়ে  
যায়। মেথর বেচারি চ'লে গেল—মুখখানা চুন  
ক'রে। হা ভগবান! কী অভিশপ্ত জীবনই দিয়েছ!  
স্কুল কিন্তু চ'লচে বেশ।

তরুণ কর্ম্মী সম্বৎ কাজ খুব চালাচ্ছে।

তরুণ নইলে কি কেউ এত খাটতে পারে?

দেশ বুঝি এবার সত্যিই উদ্ধার হয়।

হ'ত এতদিনে, কিন্তু ঐ অমূল্য, অস্পৃশ্যগুলো  
যে জাগে না।

আরও ওরা চ'লে যায়—ভিন্ন ধর্মে।

এত ক'রে চেষ্টানো হচ্ছে—জাগো, জাগো, জাগো  
আচঙাল—হিন্দু মুসলমান। জাগো ভাই সব। তবুও  
তো জাগে না।

চৈতন্য কি ওদের হবে না?

বক্তৃতায় কি কাজ হয়?

চেতনা আসে কি করে?

কে বোঝায় বল?

ম্যাথর, চাঁড়াল, ডোমগুলো যায়—সবাই প'ড়চে-  
দেখতে পার। তাদের ছেলেরাই মুখ হ'য়ে রইল।  
ঈশ্বর! ঈশ্বর! কত পাপ ক'রেছিলুম—এমন স্বর্ণিত,  
হেয় জীবন দিলে! মুক্তি কি নেই? হ-তোর  
অদৃষ্ট!—

.....আজকাল এক পাত্রী এসে লোকচার  
দেয়—টোমরা আমার কাছে এস, বীণা টোমাদের

সৃষ্টির জন্ত প্রাণ ডিরাছেন। সেই সৃষ্টি লাভ  
করিবার সিক্রেট আমি তোমাদের বলিব। যীশু  
তোমাদের জন্ত ক্রশে বিদ্ধ হইয়াছেন। তোমরা তাঁহার  
অপূর্ব মহিমার কথা শুনিতে আইস।

কত রকম ছবির বই দেয়, পড়ে দেখতে। জানিনা  
বললে হাত ধরে কাছে ডেকে আনে, কেমন বুঝিয়ে  
দেয়।...কই এরা তো এমন করেনা।.....

আরও কিছুদিন পরে—

যখন সাহেব তাদের কুটীরে পর্যন্ত আসতে আরম্ভ  
ক'রলে। শোনাতে লাগলে—যীশু করুণাময়।  
তিনি ঈশ্বরের পুত্র, তোমাদের নিমিষ্ট ঈশ্বরের নিকট  
ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, তোমরা আলোক পাইতে  
চাহ তো আইস।

তারা একদিন ঠিক ক'রলে, যীশুর ধর্মই নেবে।  
এমন ঘৃণ্য হ'য়ে আর থাকা চলেনা।.....

পারেনা।.....

-:~:-

## রূপের মোহ

শ্রীমদ্রজিৎ দাশগুপ্ত

একা যেতে যেতে পথের মাঝারে দেখিলাম অবিকল  
পান্নার মতো ফুটে আছে ফুল মুক্তার মতো ফল।  
দেখিয়া হ'লেম বড়ই মুগ্ধ সাধ হ'লো তুলে আনি,  
গৃহে লয়ে গিয়ে দিব সাজাইয়ে প্রিয়ার কবরী খানি  
বাড়াইনু হাত, একি উৎপাৎ। হইলো অগ্নি-বৃষ্টি।  
যাতনা বিষম, একি এ কুসুম, অদ্ভুত ছাড়া-সৃষ্টি।  
যতো কিছু করি যাতনা কমে না, আরো বাড়ে জ্বালা তা'তে ;  
ছুটিয়া চলিনু গৃহ অভিমুখে কতোকিছু মাধি হাতে।  
বলিলাম—প্রিয়ে, তোমারি জন্মে হ'য়েছি আজিকে খুন,  
শুনিয়া গৃহিণী আসি তাড়াতাড়ি হাতে লেপি' দিলা চূণ।  
আমি কহিলাম—আরে রাম রাম' একেতো জ্বালায় মরি,  
তাতে দাও চূণ, বাইবে এখনি প্রাণ-পাখী পরিহারি।  
লজ্জিতা প্রিয়া হাত বুলাইয়া দেয় বারে বারে ফু,  
সে ভীষণ জ্বালা কিছুতে থামে না, আমি করি-আহা উ।  
কতো কি করিনু কিছু নাহি হ'লো যাতনায় বুক কাটে ;  
অনাহারে পড়ি' করি' গড়াগড়ি সারা দ্বিবারান্তি কাটে।

গৃহিণী আমার শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করে,  
 মনে হ'লো হায় ! এ জগতে সবে রূপেরি লাগিয়া মরে !  
 অজানা রূপের কুহকে পড়িয়া মিটাতে প্রাণের তৃষা,  
 কত জনা হায় ! ও রূপ-সাগরে পড়িয়া হারায় দিশা !  
 অলি যায় ছুটে কুসুমের রূপে, প্রজাপতি ধায় উড়ি' ।  
 দহন-দাহের দাহন না মানি', পতঙ্গ মরে পুড়ি ।  
 রবি হেরি মেলে পদ্মিনী অঁখি, শশীকে কুমুদী যাঁচে ;  
 মেঘের ডাকেতে সুপ্ত ময়ূরী পেশম খুলিয়া নাচে ।  
 জ্যোছনার রূপে চকোর চকোরী চিংকারি' করে দিলি,  
 এরূপ জগৎ রূপেরি নেশায় ঘুরিতেছে দিবানিশি ।  
 রূপ-ফাঁদ পাতি ব'সে আছো কে গো, ও গো ও প্রিয়তম !  
 অরূপ-রতন ব'সে আছো তুমি ক্ষুধিত লুতার সম ।

## যাবনা, যাবনা ঘরে

শ্রীশচীন সেনরায়

গান-পাগলা নিতাই,—যেখানে গান, বাজনা,  
 যাত্রা, নাটক, সেখানে যেন না গেলেই নয় ।

যার যা খুসী তাই ডাকে । কেউ বলে নিতুই,  
 কেউ বলে নিত্যা, কেউ বলে নিতা, কেউ আবার শুধু  
 গোপা । এই ভাবে কত কি । যেন শত নাম-  
 ওয়ালা কেঁটাকুর আর কি ।

আসল নাম নিত্যগোপাল,—কেউ ডাকে না  
 ও নামে । ও কিন্তু চটে না, সব ডাকেই উত্তর করে  
 সানন্দে ।

নীচের ক্লাসের ছেলেদের মহলে ওর বড্ড ডাক  
 আছে, ওরা 'ফুটবল' খেলাতে ওকেই রেকারী-গিরি  
 কর্তৃক পছন্দ করে, ও-ও মাঠে যার যোজ । ও হয়ত

বড় বেশী আনন্দ পায় ছেলেদের সাথেই খেলা দিতে ।  
 সন্ধ্যা হলে খেলা ভাঙ্গবার ছইগেল দেয় ।

পরে অনেক সময় পর্যন্ত খালের পারে, বাঁশ  
 বনের ধারে বসে বাঁশী বাজায়, গান গায় । চণ্ডা  
 বুকটার উপর আবার তালও ঠোকে—তেড়ে, কাটা,  
 গদি, গি-না-খা ।

ওর ক্লাশের ছেলেরাও ওকে খুব পছন্দ করে,  
 ভালবাসে ; বিশেষতঃ 'লিডার' বণ্টায় । ওকে মধ্যে  
 রেখে সকলেই তখন গোল হয়ে বসে, ফরমাস করে—  
 গা ন-রে নিতুই, ঐ নতুন গানটা ।

ও ও চট করে বুঝতে পারে কোন্ গানটা,—গান,  
 "কি গুণ বল, কি গুণ জান, হরি হে তোমার বাঁদেশর

১° আর টেবিলটার উপর তাল চুঁকতে থাকে কাহারবা—তাকা-নাকা-তাকা-ছম।—

—এই, নিতুই, আজ মজাদার গান হবে নবাব বাড়ী। কলকাতা থেকে খুব ওস্তাদ তরুণ গায়িকা। যা না? শুনে আসবি?

—সত্যি-বলচিস্তো? না—

—সত্যিই।

—যাব তবে নিশ্চয়। তুই যাবি?

—না।

সময় হুরিয়ে যায়। ক্লাস বসবার ঘন্টা বাজে। এই ঘন্টা খুব সুখেই কাটে, কারণ মাষ্টারটা বড্ড মাই-ডিম্মার গোছের লোক কিনা। কাউকেই কিছু বলে না।—

গানের গীটিকিরির ও মুচ্ছনার রেশ ভেসে ভেসে আসে। ছুট বাতাস তা নিজেই উপভোগ করতে চায়। পারে না। পথ চলা-পথিকরাও একটু আধটু ভাগ পায়, ধমকে দাঁড়ায়।

গেটের সামনে বড় ‘লন্’, নিত্যগোপাল হতাশ ভাবে বসে। অস্পষ্ট গীতের সুর যাও একটু আসে-শোনে আর ভাবে, এত কষ্ট করে এতটা পথ হেটে এসেছে। আর সারা-দিন-বাপি গা-ফোটান বৃষ্টির ফোঁটা মাথায় করেছে। পরে আবার একি বিপদ! বাইরের লোকের নাকি শুনতে যাওয়া নিষেধ!

তবু ভিতরে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিশাল দেহ-ওরাল ভোজপুরীদের মস্ত খাঙ্কা কি আর সামলান যায়? কীণ-জীবী ভাত-থেকো বাঙ্গালী তো ..

মনে প্রচণ্ড ব্যথা পায়। একমনে বসে থাকে। গানের কীণ রেশটুক—যাও একটু দূর থেকে আসে, —উৎকর্ষ হয়ে শোনে। ভাবে, এমন মিঠা প্রাণ-হরা গান আর শুনে কি? নিশ্চয় কতই না জানি

আনন্দ পেতো—সারে গিয়ে তার গান শুনতে পারলে।

কি মংলব ইচ্ছ করলে ভেতরে ঢোকা যায় ভাবে।

কিরে, নিতুই না তুই? এখানে?

পেছনে ফিরে লোকটাকে দেখে, একটু পরেই চিনে ফেলে, বলে,—আরে তুই যে! এত বুক টান করে যে? জানা-শুনা আছে বুঝি?

—কি মনে করিস?

—না। মনে আর কি করবো। তবে আমার ব্যাটারি কি বর্জিত যাব?

—আয় না?

হরিশের দম্মাট মনে থাকে হয়ত অনেক দিন।—  
হরিশ কিন্তু ঝেড়ে চাকরীটা বাগিয়েছে,—হউক না ওর সেই খার্ডক্লাস পরীক্ষা বিস্তে। পরস্রা কামাচ্ছে তো! শুনা গেল খোদ কর্তার নাকি প্রাইভেট সেক্রেটারী। তাইতো এই জোড়!

নিত্যগোপাল কোণে চুপটা করে বসে আছে। কোন দিকেই যেন লক্ষ্য নেই—একেবারে যেন বেহুশ। বাইজীর গানেই যেন ওকে একদম জেস্ত কবর দিয়ে ফেলে।

বাইজীও যেন ওকেই লক্ষ্য করেছে। বারে বারেই ওর দিকে তাকায়, চোখে চোখে রাখে। হয়ত সহানুভূতির তত্ত্বীতে মৃত মৃদু আঘাত কচ্ছে। অবাক হয়ে যায় ওর অসীম মনোযোগিতা দেখে। ভাবে এমন অভিনব শ্রোতা তো সে আর দেখে নি! হয়তো লোকটা নিজেও শুণী। তা নইলে কী এমন হয়? ভারী কোতূহল হয় ওর সাথে কথা বলতে।

নাচ গান কান্ড হয়—

নিত্যকে বাইজী ডেকে পাঠায়—

সে কিন্তু আসতে অস্বীকার করলে,—ভয় পায় বুঝি, পাড়া-গাঁর ছেলে তো!

পরে বাইজীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমাকে?

—হ্যাঁ।

—কেন? বলুন তো।

—আপনিও কিন্তু নিশ্চয়ই গাইতে পারেন, না?

—গাইতে বেশী পারিনা, তবে শুনতে খুব পারি আর ভালওবাসি খুব। আঃ! যা গাইলেন এমন আর শুনবো কিনা জানি না। কষ্ট-টা সার্থক হ'ল বা'হোক!

—আপনারা গুলী, মহান, তাই সকলকেই বড় করে দেখেন। আচ্ছা সময় হলে মাঝে মাঝে যাবেন। এই দিন আমার ঠিকানা।

—বোধ হয় যেতে পারবো না। আমি যে পড়ি।

—তাই বলে কি যেতেও মানা! নাচি, গাই, তা বলে কী এত বেরা!

এরকম একটা অপ্রাসঙ্গিক খোঁচাতে যেন নিতুই টব্‌গা লেগে গেল।

পরে সজ্জিত সম্বন্ধেই অনেক কথা হল। নিত্যও কিছু বললে, বাইজীও তার কথা বলে গেল। অনেকক্ষণ।

ওর সাথে কথা করে নিত্যগোপাল যেন একটা অনাস্বাদিত তৃপ্তি পেলো; এমন তৃপ্তি যেমন নাকি দারুণ তৃষ্ণার এক গ্রাস ঠাণ্ডা জল লাগে,—যেমন নাকি লুই ওঠা গ্রীষ্মে এক পশলা বৃষ্টি লাগে,—যেমন নাকি এক টানা আঁধারের মাঝে আলোক লাগে।

বেশ ঝড় ঝড়ে রৌদ্রো দিন—

হঠাৎ চঞ্চল মেঘগুলি কোথেকে আসে যেন, অন্তহীন আকাশের বিরাট বুকখানার উপর চেপে বসে। আকাশভীষণ ভার সহিতে না পেরে খালি কান্দে। ধরণীর ঝাঁকু হওয়া প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

খেলতে এসেছে যে ছেলেগুলো ওরাও ভারী জব্ব হয়—

ওরা হুড় হুড় করে চলে যায় কাছেই একটা ছাড়া বাড়ীর ভেতর। তার মধ্যে একটা টেন্ডার হোঁড়া

হুইসেলটা খালি বাজাতে থাকে;—বড্ড কর্কশ শব্দ! তখন অতদূর থেকেই সব মিলে ডাকতে থাকে, নিতুই দা, নিতুইদা।

ওদের গগন ভেদী ডাক শুনতে পার, তবু চুপ করে থাকে। একটা ডাকেরও সাড়া দেয় না।

জন কয়েক মাতব্বর গোছের ছেলে জুটে নিতুর বাড়ীতে উপস্থিত হয় ওকে ডেকে আনতে। তবুও আসে না। ওরা সব মুখ পাংশু করে ফিরে। বড্ড হুঃখ হয় ওদের। কেই বা আজকের মেচ্ খেলাটা কন্ডাষ্ট করবে!

খেলোরারের সঙ্গে পুরো দস্তর সজ্জিত হয়ে এসে অমির বলে, চুপচাপ বসে আছ যে? মানে? অগ্র পাটা আসেনি বুঝি?

জট্ট উত্তর করে, আর এলে কি, না এলেই কি? রেফারী কে থাকবে?

—কেন, নিতুইদা?

—ও আসবে না। তবে তুই গেলে যদি আসে। যাবি?

যায়।

ধূর্ত ভবেশটা বলে—কেন? ওর ডাকেতে কি মধু মেশান? ওর কথায়ই আসবে যে!

—চেহারে খামাকে ভাল করে আবার জন্ম নিতে পার্কে? তা যদি—যাক ও সব কিছু বুঝবে না তুমি।

অমির নিতুইকে করেদীর মত পাক্‌ড়াও করে আনে। মাচ্‌খোলা চলতে থাকে। অমিরের কাউল হেণ্ডবল বড় বেশী দেখে না। কোন দিনই না। ওর যেন সাত খুন মাপ। ঐ জন্তু অগোচরে অমিরকে নাকি ওরা সবাই কেপায়। ওর স্তন্যর কর্সা মুখটা লাল হয়ে যায়। কান ছ'টোও।—

আধাটা পূর্ণিমা রাত।—

বৃষ্টি ঘোরা চাঁদের বড় হুঃখ। আর কতদিনই বা পরাধীন হয়ে চলবে মেঘের নিকট! ওর গা তরা



রূপালী যৌবন নিয়ে একটু অধীন ভাবে হাসলে কিছা চলাকেরা কল্লের অমনি অত্যাচারী মেঘ এসে শাসায়। কিছুক্ষণ হয়ত অন্ধকারে মুখখানা বেজার করে থাকে। এম্মি ঝগড়া করতে করতেই কাটে ওদের সাড়া রাত—যেন ঝগড়াতে শান্তি আর মুখরা বধুর ঝগড়া আর কি।

অমিয়দের বড় দীবা। পুর পারে একটা মস্ত বড় বুড়ো ঠেঁতুল গাছ। ওর আশে পাশে আরও ৪৫ টা ছেলে নিয়ে সংসার পেতেছে। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। ওর তলে বসে,—নিত্যগোপাল, অমিয়, আর অমিয়র ছোট বোন বুঁই, বারো, তের বছরের মেয়ে। নিতুই বাঁশী বাজাচ্ছে—আর তা থেকে বেরুচ্ছে কত করুণ, বিরহ আনা গুর।

সহসা বাঁশী বন্ধ করে দিয়ে বলে—কাল চলে যাবরে কল্‌কাতা।

—এরই মধ্যে ছুটি ফুরিয়ে গেল? মোটে তো থাকলে আড়াই মাস। বুঁই জিজ্ঞেস করে।

অমিয় বলে—তুই কি বুঝবি? নিতুইদা আবার আসবার সময় আমার জন্ম একটা কালো চশমা আর একটা ফাউনটেন পেন আনবে। বুঝলে? মনে থাকবে তো?

বুঁই ও বলে—তবে আমার জন্মও একটা চুলের ক্লিপ আর কাঁটা। আনবে তো?

—হাঁ, তোর জন্ম আনবো না তো কার জন্ম আনবো? বলে। ওর গোলাপী গালটাতে আস্তে একটা চিমটি কাটে।

—নিতুইদা, তুমি চলে গেলে আমাদের খেলাও আর হয় না। অমিয় মুখটা একটু রান করে বলে।

—আমার যাওয়াটা তবে তোর প্রাণেও বাজবে? —বুঝতে পার না? বলেই অমিয় মুখটা পেছন দিকে ফিরিয়ে নেয়, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

—মাচ্ছা, চল উঠি।

—মনে করে ছ'একবার খোঁজ খবর নিও কিন্তু। অমিয় চলতে চলতেই বলে। একটা যেন তপ্ত বাস বেরিয়ে আসে।

—হাঁ, তোরাও উত্তর দিস। নিত্য বলে।

অস্তরটা বার বার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে যেন—

চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে,—দীবার পার বেয়ে যাওয়া পথটার ত্রুটি। যতদূর পর্যন্ত ওদের যাওয়া মিলিয়ে না যায়।

পরে শুধু একটি প্রকাশ দীর্ঘ নিশ্বাস। তারপর হয়ত ঝড়ে অশ্রুও।—

মনের এ তুমুল বিহ্বলতা একটু কাটে, বাড়ীর দিকে যায়, আর বাঁশীতে গানটা বাজায়—

‘বাহির ডেকেছে মোরে পাগল করে’।

সরু গলিটা—

বড় বিচ্ছিন্ন রকম শ্রান্তিতে ও নোংরা। ছোঃ! ঘেমা করে ও পথে হাঁটতে, যেমন ঘেমা করে, মুখ খুবড়ে যাওয়া, চামড়া-মূলে-পড়া বুড়ো বী দালীদের হাতে জলও খেতে। ও-পথে সন্ধ্যার সময় লোকের আমদানী ঢেড় বেগী।

নিত্যগোপাল চলে যাচ্ছিল একমনে হয়তো পথের পরিমাণ কিছু কমিয়ে নেবে বলে।

হঠাৎ একটা সাইকেল ওর গায়ে এসে পড়লো ঘাস করে, তরুণই সাইকেলওয়ালার ওকে গাল দিয়ে বলে—শালা, চোখ কাণ ছ'টোই কি নেই? এতগুলি ‘বেল’—তাও বুঝি কাণে যায় না? গেঁড়ে কাহাকার!

পড় পড় হয়েও একেবারে মাটিতে পড়ে নি; পাখীর ডানার মতন করে ওর হাত দুটো খুড়িয়ে খুড়িয়ে বাতাস টেনে সামলিয়ে নেয়।

পরে বলে—মুখ খিরসী কর কেন? সাইকেল তো আমার গা'র উপর চালিয়েছ! তার উপর আবার বুঝি গাছ চালাকী আর পাঁকামো না করলে চলে মা? সরে পড়।

নিত্যগোপালগে আর সাইকেলওয়ালগে ছোট্ট এক পশলা ঝগড়া হলো। রাত্তার লোকগুলো জড় হয়ে ওদের ছুঁজনাকে বিয়ে ধরে। তীক্ষ্ণ মধ্য হতে

একটা গুঁথী নিতাইর সাথে এসে জিজ্ঞেস করে—  
আপকো নাম?

নাম বলো।

পরে গুঁথী ওকে অমুরোধ করলে সাথে যেতে।  
আজুলের ডগা দিয়ে একটা বাড়ী দেখালো ওখানে  
নাকি কে ওকে ডাক্তে।

অবাক-মেশান কোতুল বেকার রকম বাড়ে।  
কারণ চেনা নেই, জানা নেই কেই বা আবার ডাক্তে  
পারে! তাই হরত একবার হলেও দেখে আসবার  
আকাঙ্ক্ষা হয়!

যায়।—

গুঁথী-দর্শিত বাড়ীটার মধ্যে ঢুকলো। ঢুকতেই  
একটা বিরাট ঘন অন্ধকার অনুভব করে। সিঁড়িগুলি  
ছুঁর্গম, আবার সরু সরু ও। কেন জানি অমূলক ভয়  
আসে। হঠাৎ থমকেও দাঁড়ায়, ভাবেও, আবার  
চলে।

ভারী কিট্কাট ঘরখানা সাজান, সুরুচির বিশেষ  
পরিচয় দেয়। মেজ্ঞেতে কার্পেট পাতা, ভাল ভাল  
দামী গদী-আটা চেয়ার, দেয়ালে টাঙ্কানো প্রসিদ্ধ  
শিল্পীর চিত্র অনেক প্রকার। নিত্য ভেতরে ঢুকেই  
দেখতে পেল এক যুগতীর তৃপ্তি আনা এক জোড়া  
মধুর হাসি।

—চিন্তে পারলেন? বোধ হচ্ছে না—

নির্ঝাক, নিস্তরু হয়ে চেয়েই রইল ফ্যান ফ্যানিয়ে।  
চোখের পাতাও কিন্তু পড়ে না। হঠাতো একটা  
একটা করে পুরাণ স্মৃতি টানতে লেগেছে। পরিস্কার  
চেনা মুখ অথচ যেন কেমন একটা ভাব, ‘কোথায়  
দেখেছি’। পরে হঠাৎ স্বরটা একটু বড় হয়ে উঠল,  
বলো—ওহোঃ! বাইজোভ! তুকা না?—

মুখ একটু বাঁকিয়ে, মাথা নেড়ে জু কুচকে, বলো,  
এত অগ্নে? তবুও বাহোক—চিন্তে পারলেন যে!

কেন চিনবে না? তোমাকে কী আর ভুলি?

—এই তবে প্রশ্নটা একটু—

—বাক! কোথায় আছেন? কেমন আছেন?  
একবারেই প্রশ্নের পুঞ্জীভূত কথাগুলি যেন নিঃড়িয়ে

দিতে চায়। উত্তরে নিত্যও বলে—ভাল আছি,  
কাছেই থাকি।

—কি করেন? শুধোয়।

—পরীক্ষার পটল তুলছি বার তিন-চার। এখনও  
তাই খালি ঘসুটি।

একটা কোচে ছুজনেই একত্র বসল। এক খালা  
খাবার ও এক গ্লাস জল চাকর দিয়ে গেল। নিত্য  
খেতে আপত্তি করে, বলো—একা আমি খাব না।

তুকা ঠাট্টার সুরে বলে, দোসর আবার কে হবে?

—কেন তুমি? তুমি আমার সাথে থাকবে—তা না  
হলে থাকো না। থাক সব পড়ে।

আর আপত্তি করে না।—

পরে নিশ্চিন্তে অশেষ আলাপ চলে। বেশী উচ্চ  
সুরে না—এক রকম ফিস্-ফিস্ করেই কিন্তু।  
হউক না নিজেরই বাড়ী—তবুও তো—তা কি আর  
শব্দ করে কেউ বলে?

রাত ঘনিয়ে আসে। নিত্যগোপাল উঠে পড়ে  
যাবার জন্ত।—যাবার বেলা সব সময়ই একটু আধটু  
করণ লাগে;—নিকটেই হউক আর অনেক দূরেই  
হউক! বিশেষ করে কোমল প্রাণগুলোকে কিন্তু  
বড় নেতিয়ে, মুসড়ে দেয়।

তুকার চোখের কোনে অশ্রু,—তাই কি?—  
অশ্রু তো না যেন কচি-ছল্লার-ডগা-ভেজা নিশির  
শিশির আর কি।

ভীড়—প্রচণ্ড ভীড়!

মোটর বাসে আর ট্রামে; কেরাণীর দলে আর  
উকিল, মোক্তারের দলে। কে কার আগে হেঁপ  
নেবে—কে কার আগে উঠবে—তা’তে সবাই ব্যস্ত।  
কোন একটা ‘বাস’ হ’তে ভয়ানক ঝাঁজালো একখানা  
গলা অনবরতই টেঁচাতে লেগেছে, কালীবাট,  
আলীপুর, ধরমতলা। এমনতর গলার স্বর—  
সকলেরই কানে প্রবেশ কর্ণে। নিতুই-ও  
উঠে! ঐ বাসের মধ্যেই।

ভেল-কুঠে পড়া খাঁকীর কোট পেন্ট পরা একটা লোক টিকিট বেচে। নিত্যগোপালের দিকে গিয়ে একটু দূর থেকে বলে—বাবু টিকিট।

ও-ও হঠাৎ ফিরে চায়, দেখেই বলে—আরে ? তুই যে! এমন অস্থিতির স্বর শুনে ভেবেছিলাম প্রথমটা তোকে একটা পত্র লিখিবে। যে হরিশ, তোর-ও গগার জুরিদার এখানে একটা মোটর বাসে কাজ করে। এমন চাকরী ছেড়ে দিয়ে এখানে কণ্ডাক্টরী!

হরিশ উত্তর করে, বগড়া করে চলে এসেছি।

—কেন ?

—আর বলিস নে, ভাই, মাল একটু টেনে টুনে বাইকীদের সাথে একটু ইয়ারকী করেছিলুম বলেই যেটা-ছুড়ী অনেক দোষ বানিয়ে নাগিশ করলে। তক্ষণই চাকরী থেকে বরখাস্ত দিলে।

মোটর বাস চলতে থাকে; অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। আংকা থেমে যায়।

হাতে এক গাঁদা বই নিয়ে এক যোড়শী বাসে উঠলো। নিত্যগোপালের গা ঘেসেই বসে পড়লো। কলেক্টে যাচ্ছে। ওর খাতার উপর নাম লেখা রয়েছে কুমারী চামেলী দেবী, খার্ডইয়ার ক্লাশ। নিত্য পড়লো।

বাসে ষ্টার্ট দেওয়া মাত্রই একটা মস্ত ধাক্কা লাগে। চামেলীর গায়ে আর নিত্যগোপালের গায়ে ঠেস লাগলো। মেরেটা বলে—আমি বড়ই দুঃখিতা, মাপ করুন।

বাস আবার চলতে থাকে—বেদম চলতি।—নিত্যগোপাল হঠাৎ উঠে পড়েই অধীরভাবে বলে—হরিশ, থামা—থামা। আঃ! কদরূর চলে এলি; হাটতে হবে যে অনেকটা।

নাংবে খপাস করে, চিন্তা করে, সান্নের গলিটা ধরে গেলেই কি সোজা হবে? চললো ঐ খোঁস-ওঠা গলি দিয়েই। গলিটাকে ভারী ভ্রিন্নমান দেখার। সারেই ছোট্ট খাট রকমের একটা আবার ভীড়ও। ও শোনে গুলিষ্ট গানের সুর, উকি দিয়ে দেখে মস্ত পাগড়ী মাথার এক ব্যাটাতে আর একটা কাঁচা

ছুড়িতে। ব্যাটা হারমনিয়ম বাজাচ্ছে আর মোটা গলায় গানটা ধরে দিচ্ছে; ছুড়িটা গান গায় আর পরসা কুড়ায়। পরসা কুড়িয়ে কুড়িয়ে হাতের ছোট্ট মুঠো অল্পেতেই ভরে ওঠে।

বাঃ! লোকটা যে ওর বিশেষ পরিচিত। হতভাগা, নিশেটা তবে আই, এ অবধি পড়ে শেষে এই কচ্ছে, নিতাই ভাবে।

কাছে গেল ওদের। ছুড়িটা এসে ও-র কাঁচা ধরে বলে—রাজাবাবু, একঠো রূপেয়া মাদ্দতা। একঠোছে কমতি নেহি হোগা।

ও কিছু বলে না—নিশির ছেড়া পাঞ্জাবীটার কোনা ধরে টেনে বলে—কিরে, চিন লি?

ব্যাটা বলে, খুব।

—এখন বুঝি এই করছিস? কেন আর কিছু জুটলো না? নিতাই জিজ্ঞাসা করলো।

—না ভাই বেশ আছে; ছুড়িটা রোজগার কচ্ছে মন্দ না। এই হুঁটো বছর কড়াত টেনে টেনে শরীরটা একেবারে বেজুত হয়ে গেল; ছেড়ে দিলুম ও কাজ। পরে আর পেট চলে না দেখে জুটিয়ে নিলুম একটা ছাদ পেটাবার কাজ; নূতন দালান তৈরী হচ্ছিল। সে করে করে ভাই পায়ে চুপে খেয়ে দিলে, যা হয়ে গেল। সেটাও ছেড়ে দেবো মনে করে বাড়ী ফিরছিলাম; দেখলাম হাওড়াপুলের ধারে একটা ড্রেনের মধ্যে পড়ে এ ছুড়িটা পিত্তশূল বেদনায় কাৎরাচ্ছে। বড়ই দয়া হলো। নিয়ে এলুম ওকে বাড়ী। চিকিৎসা-পত্তর করে সাড়ালুম। তখন ভাবলুম নেহাৎ একটা ফান্টু-ই বুঝি আবার কাঁধে চাপলো! না,—পরে একদিন শুনি চমৎকার গাইতেও জানে। হাতে যা ছিল তা দিয়ে কিনলুম এই হারমনিয়মটা আর তুঘির জম্ম একটা সাড়ী। পরে হুঁজনে মিলে বায় হলেন রাস্তার গান গাইতে। লজ্জার ধার: কিছু খারিনে, লকোচেরও তোয়াকা রাখিনে। হুঁটো পরসা পাই, হুঁজনে মিলে,—ঘরে, বাইরেই উপার্জন করি,—শান্তিতে খাই-ই। আচ্ছা,

ভাই একবার দা। ধরে যাবি আমার বাড়ী?—ঐ মানিকতলা পেরিয়ে ছোট্ট খোলার বাড়ীখানা, বুঝলি?

নিত্য অবাক চোখে চেয়ে হাঁ করে নিশের ছোট্ট ইতিহাসটা যেন গিলছিল। মাথা নেড়ে সায় দিল যাবে, পরে চলে তৃষ্ণার কাছে। সারা-পথ কেবল ভাবলে, নিশার কথা;—এক রকম মন্দ ফিকির করে নি। কার কখন কি মতি গতি হয় কে বলতে পারে?

তৃষ্ণা আজ এত শীগ্গীরই যে শুয়ে আছে? চিং হয়ে পা দুটো শুটিয়ে শুয়ে আছে; মাঝে মাঝে পা দুটো মুহু মুহু দোঁয়ারও। হাতে ধরে বুকটার উপর স্থাপন করেছে ওটা কী? বই না? হাঁ,—তাই তো, হয়তো উপভাস—ও আবার উপভাসও পড়ে! বইয়ের ছায়াটা ওর মুখে এসে পড়েছে। নিখাদে ওর নরম বুকটা মুহু মুহু ফুলে ফুলে উঠছেও। দেখাচ্ছে বেশ মন্দ না!

নিত্য এগুতে থাকে,—যেন হাটি হাটি পা-পা করে। ভাবে হঠাৎ গিয়ে চমকিয়ে দেবে। পা টিপে টিপে সায়ে গেল। ধরে ফেলে তৃষ্ণার বইতে নিবিষ্ট থাকা চোখ, পরে গলার সুর একটু বিকৃতি করে বললে—বল তো কে?

কর্কশভাবে উত্তর করে,—নাও, ছাড়! নিরস ইয়ারকী ভালবাসি না।

নিত্য বলে, তবে রসাগ করে দি। বলেই হয়ত মুখের কাছে মুখ নেয়, তৃষ্ণা তক্ষণই রেগে ওঠে, বলে, তোমাকে না সেদিন বলেছি আমাকে তুমি ছুঁতে পার্বে না; তবু তুমি যে—

উত্তর করে,—আচ্ছা, যখন পছন্দ করোনা তখন আর আসণে না তোমার বাড়ী। আস্তে আস্তে সজল ছিল চোখে তৃষ্ণার দিকে চেয়ে চেয়ে বলে।

বড় বিষাদ লাগে।

তৃষ্ণা আর শ্রাণকে শক্ত করে রাখতে পারে না, সে বিষাদ পূর্ণ চাওনিতে যেন সব কঠিনতা, ক্লান্ততা ওর জল করে দিলো। ঘূর্ণী বায়ুর মত ছুটে ওকে

ধরে, বলে, যেওনা, যেওনা, ওগো, আমাকে কাঁদালে তোমার কি লাভ হবে? তুমি তো বুঝেও বুঝলে না কেন বারণ করেছিলাম। আর বলবো না, কখন বারণ কর্শো না, তোমার যা খুসি কর। আমিও যে আর পারিনে।

ধরাসু করে পড়ে যায় নিত্যর পায়ের তলায়; কাঁদতে থাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

যুগতী নারীর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নাতে বিষম দাগা দেয়। কাঁরো মনই না টলে থাকতে পারে না ও কান্না দেখলে।

নিতাই দীর্ঘ বাহুর মাঝে নিয়ে জড়িয়ে থাকে শক্ত করে, তৃষ্ণাও ঢলে পড়ে। হুঁজুনেই মনে করে, এ বন্ধন ছিন্ন বর্ধে পারে কারও সাধ্য নেই!—আবেশের চোটে গোঁধ আপনা থেকেই বুজে আসে। পরে হুর্ভিক্ষের খাওয়ার মতনই—

নিশি বসুর বাড়ী,—

মানিকতলায় ছোট্ট একটা গুঁপুটা-খাওয়া নোংড়া বেচারী গলীতে অবস্থিত। ভাঙ্গা মেটে প্লাসে-ছাউনী দেওয়া ঘরের ছাদ, বেড়া গোল পাতা আর বনের খড় দিয়ে ছাওয়া। পেছনদিকের অন্ধক জায়গা আর উলু পোকায় ধরা। কোঠা দুটো—একটাতে রান্না করে আরেকটাতে শোয়। আবার একটা ছোট্ট খোঁপও আছে, অন্ধকার—যেন অন্ধকূপ আর কি! অনেক ভিষিক্ত ওখানে রাখে,—ওদের দিনের কজীর উপায় হারমনিয়মটা, তিন চারটা কেরোসিন কাঠের কুড়ি তাঁক, সবগুলি ভর্তি মাসিক পত্রিকা, ইংরাজী-বাংলা অনেকগুলো উপভাস, নাটক আর কত কি;—চণ্ডিদাস, রামপ্রসাদ, মিরাবাই আরও অনেক গ্রন্থাবলী বন্ধিন, মাইকেল, দাস্তে, সেক্সপিয়ার, শেলী ইত্যাদি।

দিনের বড়া আলো ক্রীণ হয়ে গেছে। সন্ধ্যাও ঘনিরে এল। ঘোর ঘোর দেখাচ্ছে।—

নিশে পা দুটো ছড়িয়ে বসে আছে; সারো সাত,

আটটা হিন্দি, বাংলা, ইংরাজী ব'য়ের গান, আর মেটে পাত্রে মধ্য কতকগুলি ময়দার আঁটা; তার মধ্যে হাত দুবিয় দুবিয় আঁটা নিচ্ছে। পোকা-থেকে ছেড়া বইগুলি জুড়ছে। আবার এদিকে রান্নাঘরের কোণে বসে ভূষি রাতের রসদের যোগাড় কচ্ছে, শুন্ শুন্ করে গান গাইতে পরে হঠাৎ ও বল্ল—ওগো ঐ নতুন গানটা বের করে সুরটা ঠিক করো না গো! পুরাণ ভাল লাগে না।

বিজ্ঞপের সুরে নিশি উত্তর দেয়, পুরাণ আর ভাল লাগে না?

সরলভাবেই ও-ও বল্ল, রোজ রোজ কি পুরাণ ভাল লাগে?

নিশে বলে,—আবার কা'কে জুটিয়েছ এর মধ্যে? নতুন বাবু-টাবু বুঝি? না?—

একটু রাগত কঠিন সুরে বল্ল—যাও, সব সময়ই তোমার কেবল ইয়াকী! এমন করলে কিন্তু আজ রাখবো না; কাল গানও গাইতে যাব না। গাল ছটো ফুলিয়ে বসে থাকে। চুপটা করে। ও রকম ঠাট্টাতে বড্ড বেশী ব্যথা দেয় বুঝি। ছ'চোখে এক পশলা অশ্রুও ঝড়লো। সরল-মতি মেয়ে মানুষ কিনা, একটুতেই কঁদে ফেলে।

নিত্যগোপাল ঘরে ঢুকেও ঢুকলো না। থম্কে দাঁড়ায়।

ভূষিও ব্যস্ত ভাবে তাড়াতাড়ি কাপড়ের আঁচল দিয়েই কোন রকমে উল্লা মাথাটাতে ঘোমটার মতন করে দেয়।

পরে নিশে দেখলো নিতুইকে, বল্ল—আয় না ঘরের ভেতর? লজ্জা কেন? বোস্ এসে ভেতরে—

পরে ভূষির দিকে চেয়ে বল্ল,—আরে, কিরে ভূষি, তুইও যে মস্ত এক ঘোমটা টেনে মুখ বন্ধ করে দিলে! এত কিসের লজ্জা? সে দিন তো গাইতে গাইতে নিতুর পঞ্জাবীর পকেটে পরসার জন্ত হাত চালিয়ে দে'ছিলি!

নিতাই বলে, কিরে এ আবার কি কচ্ছিল?

—এই কলোজে পড়বার সময় কতকগুলি বই

কেনেছিলাম। তা প্রায় সবই পোকার খরছে। সবগুলো জুড়িয়ে রাখলাম। মাঝে মাঝে একটু আধটু দেখি কিনা।

— বাঃ! ভাল ভাল লেখকের বইয়ের কালেক্শন যে রে!

—হাঁ, ভাই ছিল এককালে বই কেন্‌বার খুব হবি। যাক্, তবু তোর সাথে দেখা হ'লো, প্রাণটাতে খুব আনন্দও পেলাম।

ভূষি ঘোমটা-টা টেনে আরো বড় করে দিয়ে, অতিশয় সজ্জিত হয়ে, বিনীত ভাবে এক ডালা মুড়ি নিত্যগোপালের সামনে এনে দিল। বাবার সময় হয়ত ঐ ঘোমটার তলে থেকেই চোখটা বিক্ষারিত করে দেখেও নিল একবার।

খায়, আর ভেবে ভেবে আশ্চর্য হয়ে যায়। বড়ই চমৎকার দৃশ্য তো! উচু শ্রেণীতে আর নীচ শ্রেণীতে, শিক্ষিত বাঙ্গালীতে আর অশিক্ষিতা হিন্দুস্থানীতে, মধুময় ভাব! হউক না নিচ, হউক না অশিক্ষিতা হিন্দুস্থানী,—তবু তো অম্লগতা, কাঁচা বয়স, যৌবন উৎলিয়ে ওঠা মাধুর্য্য এবং রোজগারেও!

মনের মিল।—

ওখান থেকে বিদায় নিয়ে, এবার আর ট্রামে করে না, পায়ে হেঁটেই যাচ্ছিল দোহুলা চিহ্নে, ভাবলে, আজ আর যাবে না তৃষ্ণার বাড়ী অথচ না গেলেও যেন কেমন কেমন লাগে!

না যেয়ে পারে না।

অভ্যাস আর প্রাণের টান—তা কি আর কম কড়া নেশা! মদ, আফিং, গৈজা, গিদ্ধির চেয়েও হয়ত আরও ভরানক বেশী মাতাল করে তোলে।

বাড়ীর দরজায় গিয়ে আন্তে আন্তে কড়া নেড়ে নেড়ে ঢোকবার মতলব জানাল।

বুঝতে পেরে তৃষ্ণা নিজেই আসে দরজা খুলে দিতে, বলে,—এমন সময়? এদিন কোথায়—

—কে আমি—না দেখেই যে প্রত্নবাণ?

—তা কি আর বুঝতে বাকী থাকে?

দরজা খুলে গেল। একেবারে সপাসপ তৃষ্ণা যে কোঠার শোর সে কোঠার ঢুকে পড়ে, হাত পা ছেড়ে দিয়ে সটান শুয়ে পড়লো। রুমাল দিয়ে কপালের একটু ঘাম শুঁকলো। পরে কাঁৎ হয়ে বসে, একটু জল খাব।

তৃষ্ণা জিজ্ঞেস করে—আজ বুঝি টেঁ। টেঁ করে একচোট খুব ঘোরা হয়েছে, না?

—হাঁ, এক বছর সনির্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা কর্তে।

খুব সুখে আছে ওরা যেন ছুটি কোকিল; গান গায়, উপার্জন করে ছ'জনেই। বছর হারমনিয়ম টেপে আর আশ্রিতা গান গায়, ভিক্টোর পরমা কুড়ায়। বেশ ওদের উপায় কর্তার কিকির, কি বল?—আমারও ইচ্ছা করে আমি আর তু—

—খুব সুন্দর গায় বুঝি,—না?

—হাঁ, খুব সুন্দর গায়। তা ব'লে তোমার মত ওস্তাদ না।

—আচ্ছা গো, বেশী ঠেকার দেখাতে হবে না।

নাও, এই লেমনেডটুকু খাও তো।

একটানে সবটা মেরে দিয়ে নিতাই হঠাৎ বলে—

ওঃ! বড্ড ঘুম পাচ্ছে। একটু ঘুমোবো এখানে? না থাক তোমার আবার অনুবিধে হবে।

একটু অভিমানের সুরে বলে—আ-হাঃ, হাঃ!

এত বেশী বেশী ভালবাসি না। ঘুমাও তো নিশ্চিন্তে একটু। ফ্যান খুলে দি'।

ঘুমের জন্ত বেশী চেষ্টাও কর্তে হয় না, এসে পড়ে ধাক্কা করে।

তৃষ্ণা আজ জীবনটাকে বড়ই ধন্ত মনে করছে;—ওর বৃত্তস্থ প্রাণ! যে চাইতো সেবা কর্তে, চাইতো প্রীতি মিশান প্রেম—অকৃত্রিম ভালবাসা, ঘর সংসার, হয় তো পুত্র-কন্যার আধ আধ মা ডাক।

চায় তো হুনিয়ার সন্ধান; লাভ করে ক'জন?—

তৃষ্ণা বসে আছে ওর শিরের এক পার্শ্বে, ভাবতে থাকে, কত আকাশ, পাতাল। হঠাৎ মনে পড়ে ওর

প্রাণ-বিকল জীবনটার কথা! বড় পঁচা—পুতি গন্ধময়!

হঠাৎ কেন জানি নিতাইর পকেটের দিকে নজর পড়ল। দেখতে পেল একটা পত্র। অতি সস্তর্পণে টেনে বের করল। চুপি চুপি পড়তে লেগেছে তক্ষণই।

মেয়েলি স্বভাব; কোন চিঠিপত্র দেখলেই পড়বার আকুল তৃষ্ণা! তা কি আর তৃষ্ণার বেলা ব্যতিক্রম হতে পারে?—

পত্র পড়ে। মা লিখেছেন অনেক কাকুতি মিনতি করে, নানা প্রকার উপদেশ দিয়ে চরিত্র সংশোধন কর্তার জন্ত, কি ছিল তার চরিত্র আগে আর এখন—এখন একটা ছুটি বার বনিতার প্রচোচনার ওর নাকি স্বভাব একেবারে উজ্জ্বল হয়েছে। আরও লিখেছে, কত শত শত লোকের সংসার ওরা ভঙ্গ হচ্ছে, কত লোকেকে পথে বসাচ্ছে, কত সাক্ষী ত্রীকে স্বামী স্ত্রী হ'তে বঞ্চিত হচ্ছে, কত বিধবার এক মাত্র অকলের নিধিকেও চু'সে খাচ্ছে!

মন বড় ভয়ানক ব্যকুলিত হয়ে উঠলো।

অস্থির দৃষ্টি অন্তহীন আকাশের প্রতি তাকিয়ে কয়েকটা তারা কক্ষচ্যুত হয়ে উধাও হচ্ছে, দেখতে পেল। দূরে একটা পাশিরা করণ সুরে ডাকল।

নিজের জীবনের উপর একটা তেঁতো ঘেঁরা আসলো। পালা শেষ করে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল তক্ষণই;—আর বেশী দূর না। আরও কয়েক দিন এরকম একটা সাংবাদিক কথা ভেবেছে!

তুমুল ঝড় তুফানের আলোড়ন এল ওর হৃদয়ে। আর বেঁচে থেক কি লাভ?—

ওর কেবলই মনে হচ্ছে বেঁচে থেক কি লাভ। পরে নিজের মনে মনে নিজেকেই বোঝাচ্ছে, যদি বাঁচিই তবে, একবার হলও, চোখের দেখা না দেখে থাকি কি ভাবে?—ওঁরে আমার প্রাণটাকে দখল করেছে! পরে মত্ত বড় একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে,—

ওঃ! এ দেহটাকে নিয়ে তো কত জন কত ভাবে খেলা করেছে। এ প্রাণটা কাঁইকে দিতে তো সহ হয় নি,—তা তো নিজের কাছেই লুকিয়ে রেখে কৃত্রিমতা খাটা কতজনকে বঞ্চিত করেছে—কত লোককে উদ্ধার করেছে! আর মরতে হলোও তো আত্ম হত্যা ছাড়া হবে না?—তাও যে আবার ভয়ানক পাপ!

তুমুল সংগ্রাম কর্তে কর্তে, হঠাৎ সিদ্ধান্ত করল, জীবনে কত পাপ-ই তো করলাম,—না হয় শেষ কালেও আর একটা করলুমইবা! তবু তো মনে তৃপ্তি হবে যে প্রাণের দেবতার মঙ্গলের জন্তই করেছে।

তাড়াতাড়ি খুঁট করে আলমারী খুলে একটা ভরা বোতল বের করে আনলো। তাবলে, খাওয়া বাক পুরা একটা বোতলই আর একটা ভয়ানক দ্রব্যের অল্পপান দিয়ে।

আধা আধি খেলো, আর যদিও পারে না তবুও মরিয়া হয়ে খেতেই লেগেছে সব টুকুন সাবার কর্তে।

পরে হুঁহাত জোড় করে কপালে স্পর্শ করে ভগবানের উদ্দেশ্যেই হয় তো প্রণাম জানায়, ভগবান! আমার দেবতার মঙ্গল করো। ঠুঁকে স্নেহেই রেখো, পার তো আমার কথাও ভুলিয়ে দিও।

রাত বাড়তে থাকে,—বড় নিরুশ, নিশুতি! দূরে একটা লক্ষ্মীছাড়া পেঁচা পরিজাণে ডাকতেই লেগেছে নিম্-নিম্-নিম্। ঘেঁয়ো কুকুরটা বাইরে কান্ডে লেগেছে অনর্থক। ঘরের মধ্যে মন্ত এক জোড়া টিক্‌টিকি কি ভেবে টিক্-টিক্ করে উঠলো। তৃষ্ণা উঠতে বাচ্ছে, পাটা একটা কাঠে বাড়ি খেলো। প্রথম মনে করলো, অমঙ্গলের চিহ্ন কি? পরেই বলে—দূর, কিছুনা, নিছক, সব বাজে।

ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে হেটে নিত্যর কাছে গেল, আবার বসলোও ওর অতি নিকটেই তদ্বয় হয়ে।

ছিন্ন মেঘ—চাঁদ বলপ্রয়োগ করে উকি মারে, বামিনী হাসে, হিংস্রটে মেঘের হিংসা আরও বাড়ে।

ধীরে ধীরে অতি সম্বর্ণনে নিতাইর নিম্নিত দেহের উপর এলিয়ে পড়ল। আন্তে আন্তে ওর মিষ্ট হাত দিয়ে ওর গণ্ডদেশে বুলাতে থাকলো, নিজের গাল

আন্তে করে ও মুখের উপর লাগিয়ে রাখলে, বসলোও পরে হঠাৎ স্থির ওঠের উপরে প্রচুর আবেগে ছোট্ট একটি চুম্বন।

নড়ে চড়ে ওঠে —

তৃষ্ণা বলে, আহাঃ! তোমার ঘুম ভেঙ্গে দিলাম। পরে আন্তে আন্তে কপালের উপর মুহু মুহু খাবড়াতে থাকে, মাথার চুলগুলো আন্তে আন্তে টানে—মার ছেলে ঘুম পাতানর মতন করে কিন্তু।

কোমল হাতের পরশে ওর সাড়া দেহে যেন দোলা খেলে যায়। পারে না আর চুপ করে থাকতে। হুঁ হাত দিয়ে নাগ-পাশের মত জড়ায়, বলে—আমার পাওনা আমি পুরিয়ে নিলুম।

লজ্জায় ওর চোখ বুজে এল। ওকথা ঘুরিয়ে নেবার জন্ত বলে,—আমি কি খেয়েছি বল তো—

নিতাই শুধায়, নেশা করেছে।

—আর কি?

—জানিনা। কি, তুমি বল তো?

—আরও একটা সাংঘাতিক জিনিষ,—মরবার জন্তে।

অধীর হয়ে ও বলে, কি? মরবার জন্তে? কেন এমনটা করলে? আর আমাকে কেন তবে পথের ভিখারী বানাতে?

—তুমি তো জান সব—আরো এক কথা—এমন ছি-ছি আনা জীবন যে বওয়া বিষম! আমার ক্ষমা করো, ভুলে যেও লক্ষ্মীটি। শেষ সময় একটা কথ রাখবে? ..

অবস্থাটা দেখে নিতাই একেবারে হাউ হাউ করেই কেঁদে ফেলেন। কঁাদ কঁাদ সুরে বলে, বল, কি কথা? রাখবো। ওঃ! তুমি যে আমার কি করলে তা আর তোমাকে কে জানায়?—

—এই নাও কাগজটা, ধর। সব দেখে শুনে নিও, পর্যবেক্ষণা করো। আর যদি ভোগ কর্তে ঘেমা করে, তবে না হয় গরীব ছঃখীকেই সব বিলিয়ে দিও। কেমন? একটু পা'র খুলো দাও, মাথায় করি।...

ভোর প্রায় হয়ে এল, দূর থেকে মুরগী কর্কশ ডাক ডাকে, দোয়েল করুণ শীস দেয়। নিতাইও বুক কাটা কান্না কাঁদলে।

লুপ্ত—

জীবন—মকর মরীচিকা সব।

## বিরহ

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ

১

আধ জাগরণে নিরখি নয়নে  
 প্রিয়তম তুমি এসেছ,  
 ঘুমে অচেতনে হেরেছি স্বপনে  
 ওগো প্রিয় পাশে বসেছ ।  
 আমার বিরহ-বিধুর হৃদয়  
 পরশি শীতল করেছ,  
 ছ'বাহু বাড়ায়ে প্রেমালিঙ্গনে  
 আমার এ তনু বেঁধেছ ।  
 সে পরশ স্মরি চমকিয়া চাই  
 কোথা তুমি, কই তুমি গো  
 নিমেষে টুটিল তন্দ্রার ঘোর  
 একেলা জাগিয়া রহি গো ।

২

প্রভাতের পাখী জাগেনি তখন  
 গাহেনি প্রভাতী গান,  
 গগনে তখনো শুক তারকাটি  
 জ্বলিছে অপরি-স্নান ।  
 ঝড়েনি শেফালী ধরণী চুমিয়া  
 আপনা করিয়া দান  
 প্রভাতের মৃদুসমীর পরশে  
 আকুল করিল প্রাণ ।  
 মনে হল ওগো প্রিয়তম তুমি  
 কানে কানে মোরে কহিছ  
 কখন বামিনী নিয়েছে বিদায়  
 এখনো শয়নে রয়েছে ।



( ৩ )

জেগে দেখো প্রিয়া তোমারি লাগিয়া  
 প্রবাস হইতে এসেছি  
 গভীর আঁধার হইতে আসিয়া  
 প্রাণের আলোকে হেরেছি ।  
 এমন করিয়া আশা নিরাশায়  
 কাটাই দীর্ঘ বেলা  
 আপনার মনে কুড়ায়ে শেফালী  
 গাঁথি বসে কত মালা ।  
 কত দিনে প্রিয় এ বিরহ ব্যথা  
 মিলনের মাঝে মিলায়ে  
 কবে প্রিয়তম 'পরবাস' ত্যজি  
 আপন আবাসে আসিবে ।

## বেলার শেষে আমার আশে যখন তুমি তখন আমি সূদূর সাগর পারে

শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী

মুখুয্যেদের ছোট বোয়ের সহিত চক্রবর্তীদের সেজ  
 বৌ সই পাতাইয়াছিল । কিন্তু ইহাদের ভিতরে  
 সম্ভাব ছিল না । একজন ছিল চরিত্রহীনা মাতাশের  
 জ্বী, আর একজন ছিল, স্বামীর ভালবাসার  
 অধিকারিনী, সংসারের মধ্যে একজন । মুখুয্যেদের  
 ছোট বৌই ছিল সৌভাগ্যবতী এবং চক্রবর্তীদের সেজ  
 বৌ অচলাই ছিল, দুর্ভাগিনী ।

একদিন মুখ বুঝাইয়া মমোরমা অচলাকে বলিল,  
 "বাই বল তাই সই, তোর স্বামী কিন্তু তাই তোকে

মোটেই ভালবাসে না । এ যোঁটা সে প্রায়ই অচলাকে  
 ধিত, আকণ্ঠ দিল, কিন্তু অচলা তাহাতে হুঃখ  
 করিল না । একটু হাসিয়া বলিল, "সে কথা তো  
 আজ নতুন নয় সই, পুরাণ হ'য়ে গেছে যে ।"

একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া মমোরমা বলিল,  
 তবুও তোর মনে হুঃখ হয় না অচলা ?

"না, আর হুঃখ হবারও তো কথা নয় । তিনি  
 তাঁর নিজের ইচ্ছার বা খুদি তাই করছেন, তাতে  
 বাধা দেবার আমি কে সই ।" মমোরমা যেমন সময়

সময় তাহাকে খোঁচা দিতেও ছাড়িত না, তাহার উপরে রাগ করিতেও ছাড়িত না, তেমনি তাহার ছুঁথে যে ছুঁথিতা না হইত তাহাও নহে। এক কথা যে কত বড় নিরাশায় মাহুস বলিতে পারে, তাহা তাহার অবিস্মৃত ছিল না। মুহূর্ত্তে তাহার মুখের ব্যঙ্গের হাসি মিলাইয়া গেল। সে সক্রোধে অচলায় পৃষ্ঠে একটি কিল বসাইয়া দিয়া বলিল “তুই মর।”

হাসিয়া অচলা বলিল,—“মাইরি সহ। ওইটিই একমাত্র আমার সাধ আছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন শীগ্গির শীগ্গির মরতে পারি।”

\* \* \*

অচলার স্বামী অবনী ছিল এম এ পাশ।

কিন্তু চূড়ান্ত মাতাল ও অসংচরিত।

আর মনোরমার স্বামী ছিল ম্যাট্রিক ফেল। কিন্তু তাহার চরিত্র অতুলনীয়। উভয়েই এক বয়সী এবং এক সময়ে বন্ধুও ছিল, কিন্তু অবনীর চরিত্র অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হওয়া পর্য্যন্ত নলিন তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল। স্বপ্নভরে বলিয়াছিল,—

—“তোমাকে এখন আমি ঘৃণা করি অবনী। আমার স্নমুখ থেকে ষাও। তুমি মাতাল, চরিত্রহীন! ষাও, তোমার মুখ দেখাও আমি পাগল মনে করি।”

অবনী হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, “কৃতি নাই। আমি তোমার স্নমুখে আসতেও চাইনে নলিন।”

যখন একদিন রাত্রে মনোরমা অচলার জ্ঞাত অবনীকে একটু অমুরোধ করিল তখন নলিন স্বপ্নভরে উত্তর দিয়াছিল,—

—“ওই নরপিশাচটার কথা আমার কাছে আর করে না, মনো। আমি ওটাকে ঘৃণা করি।” মনোরমা বলিল, “কিন্তু ও হতভাগির কষ্ট দেখেও তো তোমার এই কষ্ট স্বীকার করা উচিত।

নলিন উত্তর দিল “আজ্ঞা, কাল তাকে বলব এখন।”—

\* \* \*

পরদিন অবনী আসিয়া ডাকিল “অচলা—”

অচলা বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত স্বামীর মুখে ডাক শুনিতে পার নাই। স্বামীর দেখাই যে পাইত না। অবনী যদিই বা এক আধবার আসিত, তাহা হইলে সে সমস্তটুকু বাহিরে কাটাইয়াই চলিয়া বাইত।

সৌভাগ্য মনে করিয়া অচলার সারা দেহে একটা পুলক শিহরণ বহিয়া গেল। সে মাথার কাপড়টা কপালের উপর পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া দরজার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

অবনীর ঠোঁটের উপরে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—“বলি কালিন্দী ঠাকুর! সুখ্যোদের নলিনের সঙ্গে তোমার কি এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শুনতে দোষ আছে নাকি? যদি না থাকে বিবেচনা কর, তা হ'লে চট্ট ক'রে ব'লে ফেলতো লক্ষ্মীটি।”

অবনীর ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণ করিয়া অচলা লজ্জায় মরমে মরিয়া গেল। অভিমানে, ছুঁথে, তাহার উভয় চক্ষু পুরিয়া অশ্রু উৎপলিয়া উঠিল। সে বাম হস্তে অশ্রু মোচন করিয়া অকম্পিত স্বরে বলিল,—“সে আমার সহরের স্বামী ছাড়া আর কেউ নয়। তাকে চিনিও না।”

অবনী উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, “বাঃ বেশ, বেশ। তা হ'লে দেখছি তুমি ঐ রূপেও মাহুস ভূলাতে পার। বাঃ! তা কর। আমি আর আসব না। চল্লুম।”

—সে নী করিয়া চলিয়া গেল। একটা উত্তর শুনিবারও প্রতীক্ষা করিল না। অচলা স্বামীর এই কঠোর বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া স্বামুর ভ্রাতৃ দাঁড়াইয়া রহিল। এক কোঁটা জলও তাহার চোখ হইতে পড়িল না।

বাথার বাধী মনোরমা লোক লাগাইয়া খবর লইল অবনী সেই সহরেই বীণা খেমটাওয়ালীর বাড়ী পড়িয়া আছে। মনোরমা অচলাকে ডাকিয়া বলিল—“শুনলি একবার আকেশ্যনা?”—

অচলা বলিল “তার কি দোষ আছে সহ! আমিই

বে কুরগা।” রাগ করিয়া মনো বলিল, “হলিই বা।  
ঈ—স। হাজার হোক বিয়ের জী তো বটে।”

অচলা উত্তর করিল না। মনো কিছুক্ষণ কি  
ভাবিয়া অচলাকে আপনার উত্তর বাহর মধ্যে বেঠন  
করিয়া বলিল, “আর, আজ তোকে চুল বেঁধে,  
সাজিয়ে দিই।—”

হাসিয়া অচলা বলিল—“না ভাই, ভাল লাগেনা”—  
মনো তাহা শুনিয়া না। সে অচলার চুল বাঁধিয়া,  
টিপ পরাইয়া ও একখানি গোলাপী রংয়ের শাড়ী ও  
ব্লাউজ পরাইয়া দিল,—পরে একজনকে বীণা খেমটা-  
ওয়ারীরা বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া বলিল, “বলগে, যা’  
বাড়ীতে একজনের বড় অস্থখ, মারা যাচ্ছে। শীগ্গির  
আসতে। আর তুই তাকে যেমন করে হোক ধরে  
আনিবি।—এই বাড়ীতে নিরে আসবি।—”

লোকটি চলিয়া গেল।

অবনীকে এ বাড়ীতে আনিয়া একটি কক্ষে  
বসাইয়া রাখাইয়া মনোরমা ছোর করিয়া অচলাকে  
সেই কক্ষে পাঠাইয়া দিল।

চমকিয়া উঠিয়া অবনী প্রশ্ন করিল “একি  
কালিন্দি, তুমি এখানে বে। আমি মনে ক’রেছিলাম  
তুমিই বুঝি মরণাপন্ন। ভারী আনন্দই হ’য়েছিল।  
কিন্তু তুমি ম’লেনা কেন?”

মনোরমার শিক্ষাক্রমে অচলা অবনীর পদতলে  
বসিয়া পড়িয়া বলিল—“সেটা নিজের ইচ্ছাধীন হ’লে,  
তোমার আদেশের আগেই হাসতে হাসতে প্রাণ  
দিতুম। তোমার বলতেও হতোনা।”

অবনী হাসিয়া বলিল,—“বাঃ তোমার বক্তৃতা  
ক’রবার ক্ষমতা আছে দেখছি। যাই হোক কালিন্দি  
ঠাক্কণ, উঠলুম। তোমার ও মুখখানা দেখতে  
আর আমার ভাল লাগছে না।” সে উঠিয়া দাঁড়াইল।  
অচলা হঠাৎ তাহার ছুইখানি পা জড়াইয়া ধরিয়া  
কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল—“আমার কেলে কোথায়  
যাবে তুমি, আমাকেও নিরে চল,—নইলে আমি

আত্মহত্যা করব।”

—“বেশ, তাই কর।”

একটা ঝাড়া দিবা মাত্র অচলা ঘরের এক কোণে  
গিয়া পড়িল। দেয়ালে লাগিয়া তাহার মাথার  
খানিকটা কাটিয়া গেল। —“উঃ”—বলিয়া সে দুই  
হাতে মাথাটাকে চাপিয়া ধরিল।

আর তাহার স্বামী অবনী দ্রুত পদে সে কক্ষ  
ত্যাগ করিল। পত্নীর প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না।

\* \* \* \*

অচলা অত্যন্ত অস্থখে পড়িল। অনেক ডাক্তার  
দেখান হইল। ডাক্তার জবাব দিয়া গেল।

মনোরমা স্নান মুখে ডাকিল—“সই”—

অচলা শয্যায় শায়িত ছিল, চোক মেলিয়া ক্ষীণ-  
স্বরে উত্তর দিল—“কেন ভাই”—

—“তোমার বাপের বাড়ীরও কি কেউ নেই?”

—“সবাই আছে।”

—“তবে তাদের টেলিগ্রাফ করে দেই।”

কাতর স্বরে অচলা বলিল—“না সই। ভাল  
লাগেনা। যে ক টা’দিন আছি, শান্তিতে কাটিয়ে  
যাই। আর মানুষের মুখ দেখতে ভাল লগছে না।  
শুধু তুই আমার কাছে থাক, ভাই। আর কেউ  
যেন এ ঘরে না আসে।”

একটু নীরবে থাকিয়া মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল,—  
“অবনীকে দেখবি সই?”

দৃঢ় স্বরে অচলা উত্তর দিল—“না”।

\* \* \*

অচলার চিতা নিভিয়া গেল।—

তাহারই চিতার পার্শ্বে আকুল হইয়া কঁাদিতে-  
ছিল মনোরমা। এমন সময়ে অবনীকে লইয়া নগিন  
সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। অবনীর সম্মুখে  
মনোরমা কখনও বাহির হয় নাই। আজ সে এই  
নর পিশাচটার প্রতি বৃণা ভরে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া  
লইল।

নগিন অবনীর মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত

করিয়। বলিল,—“এ কার চিতা বুঝতে পেরেছ” ?—

অবনী বলিল—“না” —

—“নাঃ! ওরে, হতভাগা, আজও তুই বুঝতে পারলি না কি অমূল্য রত্ন তুই হেলার হারালি ?”

অবনী বিরক্ত হইল—বলিল—“এ কার চিতা ?—”

—“অচলা,—তোমার কালিন্দীর—”

“অচলা”—কি বলছো, তুমি কি পাগল হ’য়েছো নলিন,—” নলিন স্বগা ভরে উত্তর দিল,—“পাগলও মাতাল, চরিত্রহীনের চেয়ে ঢের উচুতে।”

অবনী বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। নলিন আর দাঁড়াইল না। স্বগায় অপর দিকে, মনোরমার হাত ধরিয়া চলিয়া গেল।

বাইবার পূর্বে মনোরমা একখানি খামে মোড়া পত্র অবনীর নিকট ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গেল।

অবনী সেইখানা কুড়াইয়া লইয়া খাম হইতে পত্রখানি টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিল।—

তাহাতে লেখা ছিল,—

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করিলাম। কালিন্দী বলিয়া, অচলা বলিয়া আর কেহ তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে না। কামনা করি, স্নেহে থেক।  
প্রণতা—কালিন্দী—

পত্রখানা হাতে লইয়া অবনী সেই স্থানে প্রস্তর মূর্তির আশে দাঁড়াইয়া রহিল.....চিতার শেষ অগ্নিকণা টুকুও তখন নিভিয়া গিয়াছিল।

## সৈনিকের চিঠি

( জ )

মিলিটারী হাসপাতাল  
প্যারী।

২১শে সেপ্টেম্বর।

প্রিয়তমা, মানসী আমার !!!

তোমার চিঠি আজও এলনা। তুমি আমার লেখনা কেন ? আমি ভাবছিলুম--আজ ছুপুরে নিশ্চয় তোমার চিঠি পাব--কিন্তু দূরাশা ! আমি দিন গুণছি, দিন গুণে দেখেছি--কাল তোমার চিঠি আসা উচিত ছিল। কালতো পাইনি, তাই ভেবেছিলুম, আজ নিশ্চয়ই আসবে। যাক্ ও রকম তো কতদিনই যাচ্ছে ? আজ নতুন তো কিছু নয় !

আমার নাসটি খুব ভালো ষে, নামটি ও তার তেমনি স্মরণ। তাহার নাম আমি আরো তোমার লিখেছি। রেণীর নাম কি তোমার মনে আছে ?

এইই সেই রেণী। বাড়ী তার এখানেই। বেশ শিক্ষিতা। দেশের জন্তে ওর বা’ টান্—আমি আশ্চর্য্য হয়ে বাই। মেয়েদের এত মনের জোড়—এত সাহস ? তা’ না হলে কি আর ছেলেরাও এমন হয় ? আমার যখন মনে হয়, আমাদের দেশের মেয়েদের কথা তখনই মনে মনে বিশেষ লজ্জিত হই। আমাদের দেশের মেয়েতো দূরের কথা ছেলেদেরও তো এর অর্ধেক নেই। তা’ নইলে কি আর আমাদের এত অধঃপতন হয় ? সত্যি, আমি বুঝে উঠতে পারছি না এত পার্থক্য কেন ?

রেণী প্রায় সমরই আমার কাছে থাকে। আমাকে আমার বৃদ্ধের ইতিহাস বলতে বলে।—আমি যখন বলতে থাকি, তখন সে কত ব্যগ্র হয়ে শুনে আর যেখানে আমার বীরস্বের কিছু দেখে,—সেখানে কত

বাহবা দেয়, আনন্দে অধীর হয়ে আমার গা বেঁবে বসে।  
আমার যুদ্ধের ইতিহাস সে যেমন আগ্রহে শুনছে—  
তুমি হরত এত আগ্রহে শুনতে চাইতে না। তার  
কারণ, আমরা এর মূল্য বুঝি না।—

বাস্তবিক, ফরাসী জাতিটার দিকে যতই তাকাচ্ছি  
—ততই এদের উপর আমার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বেড়ে  
যাচ্ছে। এরা কাজকে গ্রহণ করে গভীর মুখে নয়—  
হাসি দিয়ে। জীবন—ভারী পাথরের মত এদের বুক  
চেপে বসে না—হাওয়ার মত হালকা পা ফেলে এদের  
সামনে এসে দাঁড়ায়। তারাও লঘু হাতে একে তুলে  
নেয়—মিথু হাতে শেষ করে একে নামিয়ে রাখে।  
এরা রক্তে—রাঙা-মাটির উপর দিয়ে, হাসির হাওয়া  
ছড়িয়ে চলে যায়—তাতে এদের লঘু নৃত্যের তাল ভঙ্গ  
হবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। শুধু তাই নয়—  
ছনিয়াতে যা' কিছু প্রধান—সব এই ফরাসীদের  
মুঠোর মধ্যে। ধন, দৌলত, শিল্প, সাহিত্য—  
ফরাসীরাই জগতে সব দিচ্ছে।

তার চার ভাই—বিরের কিছুদিন পরেই যুদ্ধে  
নেবেছিল এবং সেই-ই শেষ বিদায় তাদের। তারা  
যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। সত্যি, এখানে বাঁচাটাই  
অস্বাভাবিক—মরাটাই স্বাভাবিক। আমি যে মরতে  
মরতে বঁচে যাচ্ছি—ভগবান জানেন এর মধ্যে তাঁর  
কোন গুণেচ্ছা লুকানো রয়েছে! হাঁ—তার ভাইদের  
মৃত্যুর পরই ওরা রেড্ ক্রসএ যোগ দিয়েছে। কি  
ঐশ্বর্য ওদের। জীবনের যত কিছু আশা, সার্থকতা  
সব নিঃশেষ হয়ে গেছে—তবু মুখটি বুজে পরের ভার  
হাসি হাসি মুখে তুলে নিচ্ছে।

আর যদি তোমরা হতে—তবে কেঁদে কেঁদে চোখ  
মুগিয়ে দিতে, আর যদি সে লাশটা একবার কাছে পেতে,  
তবে তার মাথাটা বুক ধরে কি কান্নাই না কাঁদতে!

আমার বড্ড হাসি পায়—যখন এ সব ভাবি।

তারা বলে কি জান?—মৃত্যু বা' নিছক সত্যি—  
একটা স্বাভাবিক জিনিষ, তা' নিয়ে আবার কান্নাকাট  
কেন? এত বড় একটা সত্য তারা উপলব্ধি করতে

পেরেছে বলেই এমনি ক'রে জীবনানুভূতি দিতে পারে!

আজ আমি এই অসুস্থ অবস্থায়ও উত্তেজিত হয়ে  
উঠছি—তার কারণ। আমার যে কি একটা বিপুল  
আনন্দ বুক ছাপিয়ে উঠছে—তা' এই পেন্‌টার কি  
করে লিখে জানাব? বুক চিড়ে দেখালেও তা' সম্পূর্ণ  
দেখানো হবে না।

সে আমার বলছে— আমি তোমার খুব শীগগীর  
সুস্থ করে তুলব। তারপর আমিই তোমার রণ সাজে  
সাজিয়ে বিশ্বাস জানাব। তোমাকে এবার জর  
পতাকা উড়িয়ে ফিরে আসতে হবে। আমার দেশকে  
বাঁচাতে হবে—তোমার বাঁচাতেই হবে। তার চোখ  
আমার মাঝে কি দেখে নিলো—কে জানে?

আমি এ পবিত্র-বেদনা-মাথানো আদেশের কি  
জবাব দেবো? আমি সুস্থ হয়ে উঠব কি-না কে জানে?  
আমি মনে মনে একবার ভবিষ্যৎটা কল্পনা করে নিলাম।

সে আবার বলে উঠল—কি ভাবছ তুমি? তুমি  
পারবে—আমি জানি। আমার এই প্রচুর বিশ্বাস  
থেকেই তোমাকে ওকথা বলছি। ভগবান তোমার  
বর্ষের মতো রক্ষা করবেন।

তাই হবে দেবী—তাই হবে। আমি এবার  
ভীষণ ভাবে কাঁপিয়ে পড়ব—আগুন জ্বালাব—শত্রু  
নিঃশেষ করব, ধ্বংস করব। তোমার এত স্নেহের  
প্রতিদান আমার দিতেই যে হবে—রেনী? বাইরের  
দিকে একবার তাকালুম—দেখলুম চারিদিকে সব  
কেমন যেন নতুন হয়ে দেখা দিয়েছে। সব যেন  
একটা নতুন আশার বাগি নিয়ে সমুপস্থিত হয়েছে।  
চারিদিকে যেন আলোর ভেসে যাবার জোগাড়।

এই সময় দূরে মিলিটারী ব্যাণ্ড বেজে উঠল।  
আহ্—কি মধুর!!!

পরের দিন।

২২শে সেপ্টেম্বর।

আজ আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে।  
পূর্ণিমা বলেই বোধ হয় এমন হয়েছে। রেনী হারার  
মত আমার কাছে রয়েছে। ডাক্তার সাহেবের হুকুম

আমাকে যেন এতটুকু অসুবিধা ভোগ করতে না হয়।  
দিব্যা আরামে আছি, তবে যা' কষ্ট বাধা, বেদনায়।

একে আমার একার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এ জীবনের বিনিময়ে আমার তো কোনো লাভের আশা নেই—ওদের অন্তেই আমার এ প্রয়াস এবং তা' ব্যর্থও হয়নি। সেই অন্তেই বোধ হয় বিশেষ করুণা করছিল।

উঃ! আমার তো মনেই ছিল না যে এতক্ষণে তুমি রেগে হরত আশ্রয় হয়েছে, হিংসায় জলে গুড়ে মরচ। না—গো, না তোমার আশ্রয় হবার বা হিংসায় জলে মরবার কোনো কারণই নেই। আমি যত প্রশংসাই তার করি না কেন, যত ভাগই বাসিনা কেন—পাশে তুলে নেবার সাধ বা আশা মোটেই নেই। এইজন্তে তুমি অনর্থক ব্যস্ত হয়ে না। বুঝলে?—

এইমাত্র ডাক্তার সাহেব ও কমান্ডিং অফিসার এসেছিলেন। তাঁরা বলে গেলেন—আমার এ বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ—আমাকে বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে। আচ্ছা আর যদি ভালো হয়ে না-ও উঠি, তবু কি আমার পুরস্কার দেওয়া হবে? আর তখন দিলেই বা কে দেখতে আসবে? গোরের উপর মণি মাণিক্য দিলেও আমার তো আর কিছু এলো গেলো না বা আমি দেখতে আসব না কি দিয়ে আমাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে?

রেণী এসে জানাল—আর পাঁচ দিন বাদেই না-কি আমাকে আবার যুদ্ধে নাওতে হবে।

অন্ত সময় হলে বলতুম, এ তাদের অবিচার! আমাকে এ অসুস্থ অবস্থায় চাণান দেওয়া কেন? আর কি-ইবা হবে এই অক্ষম দেহটার? কিন্তু আজ তা' আর মনে হল না।—

আনন্দ হল এই ভেবে যে—আমার একটা কদর আছে—এদের কাছে। আমাদের মূল্য এরা বুঝেছে। আমাদের ভীত বলে যে এতদিন একটা অপবাদ ছিল—আজ তা' পৃথিবীর ইতিহাস থেকে মুছে গেলো। ইতিহাসের আজ এক নতুন পাতা খুলে গেলো। তা' ছাড়া রেণীর ব্যাকুল অমুরোধ কি করেই বা উপেক্ষা করব?

আমি বললুম—বেশ! তাই যাবো।

হাঁ, তোমাকে যেতেই হবে—বন্ধু! তুমি যে আমাদের কত বড় সম্পদ—তা' আমরা জানি। তাই না তোমায় এ অবস্থাতেও আমরা পাঠাতে বাধ্য ছিলাম।—

বিদেশিনী!!! তুমি আমাকে বুঝলে, তুমি আমাকে চিন্লে—কিন্তু তোমারই মতো নিটোল সৌন্দর্যশালিনী—আমার চির-পরিচিত মানসী প্রিয়াই যে আমার চিন্লে না—বুঝে না! আমার অবহেলায় তাড়িয়ে দিলো।

তাই না আজ আমি এখানে—এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে। জীবন দিয়ে প্রতিশোধ নিতে—পাষাণে বুক বেঁধে সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে—সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে—এই হৃদয় ফ্রান্সে এসে উপস্থিত হয়েছি।



## অসমাপ্তি

এখনো ভাঙেনি ঘুমের ঘোর  
 লভিকা বিভানে লুকানো ভোর ;  
 আঁধার জড়তা মুহুর্তে মুহুর্তে  
 গোধূলি বসায় মেলা ।  
 কেমনে গেল রে বেলা ?

এই না ফুটিল কুন্ডলের কলি ?  
 সবে না শুক্লি জুটিল অলি ?  
 কুড়ায়ে গাঁধিতে সাধের মালাটি  
 বরা দলে ভরে তলা ।  
 একটু করিনি হেলা ॥

এই না ডাকিল তটিনীতে বান ?  
 দুকূল ডুবিল ভরি কাণে কাণ ;  
 জ্যোছনা লহরী স্রোতে না ভাসিতে  
 অমনি ধামিল ভেলা ।  
 ফুরায়ে গেল রে খেলা ॥



## সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে-ভরা

## বসন্তের এই সঙ্গীতে ?

শ্রীপ্রণব রায়

ভূষণবাবু শহরের খ্যাতনামা ডাক্তার।  
 ধন, মান, যশের অন্ত নাই—  
 ‘ডাকের’ ব্যস্ততায় নিখাস ফেলিবার অবকাশ  
 পান না!.....

ভূষণ বাবুর ছটা কন্যা।  
 —কেতকী আর করবী।  
 কেতকী বড়, করবী ছোট।  
 ছদ্মনেই অপরাধ স্ত্রী.....  
 কনক-চাঁপার মত স্নেহের রঙ.....  
 মুখ-চোখ বেন তুলি দিয়া অঁকা.....  
 নিটোল স্বাস্থ্য-স্বন্দর দেহ বিকশিত যৌবনের  
 সুবাস চল-চল।

উভয়েই বেথুন স্কুলে সুশিক্ষিত।  
 বিশ শতাব্দীর সভ্য প্রধার অভ্যস্ত।  
 স্তত্রাং পাত্রী হিসাবে উভয়েই চর্চিত।  
 বিলাত কেরং তরুণ মহলে একটা সাড়া পড়িয়া  
 গিয়াছিল—

কেতকী করবীর রূপের এবং গানের উচ্ছ্বিত  
 প্রশংসা সকলেরি মুখে।  
 পাঁচ ডিনারের নিমন্ত্রণ ২১ লাগিয়াই ছিল।  
 ভূষণবাবু কেতকীর বিবাহ দিয়াছিলেন ধনীর  
 ঘরেই।

ছেলেটা বিলাত প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার—  
 যথেষ্ট পশার.....  
 ধনৈর্ধাও প্রচুর.....  
 সূর্য্যবান্ আস্বাবে ভরা সুউচ্চ সৌধ, বেয়ারা,  
 খানসামা, ‘মিনার্ভা কার’.....  
 কেতকীর কিছুই অভাব নাই।  
 অভাব শুধু মনের স্থখের।

এত বিলাস ঐশ্বর্যের মাঝে থাকিয়াও কেতকীর  
 অন্তরে তৃপ্তি নাই!

কুল শয্যার রাত্রেই সে স্বামীর মুখে মদের গন্ধ  
 পাইয়াছিল.....

শুধু তাই নয়.....  
 স্বামীর জামার পকেটে একদিন কোন এক  
 বাইজীর গ্রেম পত্র দেখা গিয়াছিল.....

—সে দিন কেতকীর তরুণ হৃদয়ের আশা-মঞ্জরী  
 না ফুটিতেই করিয়া পড়িল। তার আকুল অশ্রু.....

ব্যাকুল মিনতি.....  
 সব ব্যর্থ হইয়া গেল।

স্বামী বলিলেন, শাড়ী গয়না দিবেচি, আর কি  
 চাই?.....পুরুষ মানুষ আমি, একটু ফুর্টি কোরব  
 না? সারাক্ষণ দ্বীর আঁচল ধরে বসে থাকতে হবে!  
 .....ছো:.....

শাড়ী, অলঙ্কার.....  
 ব্যস্, নারীর আর কিছুই দাবী করিবার নাই!  
 কেতকীর ইচ্ছা হইল মুখ ফুটিয়া বলে, ওগো,  
 শাড়ী গয়নাই নারীর সর্ব্বস্ব নয়.....নারীরও প্রাণ  
 আছে.....

কিন্তু কিছুই বলিল না।  
 তাব মুখে রহিল হাসি—  
 আর বৃক রহিল অন্তল অশ্রু-সাগর।.....  
 কিন্তু কন্যার মুখের বেদনা করুণ হাসিটুকু পিতার  
 মেহ-দৃষ্টির অন্তরালে গোপন রহিল না।

ভূষণবাবু সব বুঝিলেন—  
 বন্ধ হইতে একটা তপ্ত দীর্ঘবাস বাহির হইয়া  
 আসিল।.....



এইবার করবীর পালা—

কিন্তু আর ধনী নয়।

ভূষণ বাবুর আর ধনী জামাতা করিবার অভিলাষ ছিল না।

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, গরীবের ধরেই করবীর বিবাহ দিবেন।

ছেলেটা দরিদ্র হোক ক্ষতি নাই.....

কিন্তু চরিত্রটা তার যেন অকলঙ্ক হয়।

করবীর পাণি-প্রার্থী ধনী যুবকের দল হতাশ হইল—

পাত্র জুটিল—কমলেশ।

কমলেশ বেশ নম্র, ধীর.....

প্রামবর্ষ হইলেও মুখে বেশ একটা স্নিগ্ধ-ভ্রী আছে.....

স্বস্থ, স্বগঠিত দেহ.....

সর্বোপরি চরিত্রটা তার একেবারে শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক.....

অতি বড় শত্রুও তার চরিত্রের দোষ দিতে পারে না।

শুধু একমাত্র খুঁত—বড় গরীব!

তা হোক।

এম, এ পাশটা দিলেই, বছর খানেক পরে একটা প্রোকেসরি জুটাইয়া লইতে পারিবে—

ভূষণবাবু, কমলেশকেই নির্বাচিত করিলেন.....

শরতের এক আলোকোজ্জ্বল সন্ধ্যায়—কমলেশ করবীর শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল।.....

বিধাতা বোধ করি অলক্ষ্যে হাসিলেন।—

বিবাহের পর করবী প্রথম খুশুরবাড়ী গেল।...

সঙ্গীর্ণ একটা গলিয় মধ্যে বহু পুরাতন একখানা বাড়ী,—

যেন অরাজক প্রাচীন বৃদ্ধ।

দেয়াল হইতে চুপ বালি খসিয়া পড়িয়াছে.....

শ্রাওলা-ধরা ইটে নোলা ধরিয়াছে.....

ঘরগুলি যেমন অন্ধকার, তেমনি স্নাত স্নাতে ..

খুশুরবাড়ী দেখিয়া করবীর নাসিকা কুঞ্চিত হইল।

এখানে মানুষ থাকে!

গোটাছুই তক্তাপোষ, ছিন্ন বিছানা, আর হাঁড়ি-কুঁড়ি, বাসন পত্র.....

আসবাব বলিতে তো এই!

না আছে একখানা সোফা, না আছে একটা ড্রে সিং-টেবিল.....

আজন্ম-বিলাস-লালিতা করবীর চোখে তারি বিস্তীর্ণ ঠেকিল।

সে বসিবেই বা কোথায়.....

প্রসাধন সারিবেই বা কোন ঘরে!

এই দুর্গন্ধময়, নোংরা বাড়ীতে—

করবীর বুক ভরিয়া কান্না আসিল।

পিতা জানিয়া-শুনিয়া তাকে বনবাসে পাঠাইলেন।.....

বধু-বরণ করিয়া তুলিলেন—কমলেশের বিধবা মা।

শুভ্র শুচি বেশা.....

স্নিত সহাস মুখখানি.....

করুণা কোমল দুটি নয়ন.....

হুনিয়ায় কমলেশের আপন বলিতে ওই মা।

কত কষ্ট স্বীকার করিয়া মা তাকে মানুষ করিয়াছেন!

ভাবিলেও শ্রদ্ধা ভক্তিতে কমলেশের মাথা নত হইয়া আসে।

সেই কমলেশের বৌ.....

সুন্দরী কিশোরী.....

মার আনন্দ রাধিবার ঠাই নাই।

এতদিনে সাধ পূর্ণ হইল—

পুত্র-বধুই ইন্দু-মুখ দেখিয়া চোখ জুড়াইলেন।

স্বর্গগত স্বামীর মুখখানি মনে পড়িল.....

কত আশা ছিল তাঁর.....

নীরব ব্যথার বিধবার আঁখিপল্লব সজল হইয়া উঠিল।

কিন্তু শুভ-কাণ্ডে চোখের জল ফেলিতে  
নাই যে !

ক্রান্ত হাতে তিনি অঞ্চল প্রান্তে ছ'ফোঁটা অশ্রু  
ঝুছিয়া ফেলিলেন ।

ফুল শস্যার রাত্রি ।.....

বাহিরে শরতের জ্যোৎস্না ।

কমলেশ ঘরে আসিল ।

ফুল, ফুল, শুধু ফুল—

মৃদু পুষ্প-গন্ধ কমলেশের মনে মোহের আবেশ  
আনিয়া দিল ।

ফুল-বিছানো শস্যায় নিদ্রিতা করবী.....

যেন শুভ্র একটা শতদল.....

করবী শিখিল.....

অঞ্চল স্থলিত...

ল্যাম্পের আলো তার বৃন্ত মুখখানি দীপ্ত করিয়া  
তুলিয়াছে.....

কমলেশ দেখিল, করবীর মুখখানি বড় সুন্দর !

এমন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি... ..

পুষ্পিত-যৌবনা পুষ্প-ভূষিতা প্রিয়া...

কমলেশের তরুণ মন মাতাল হইয়া উঠিল ।

মৃদু স্বরে ডাকিল, করবী.....

করবীর নিদ্রা ভাঙ্গিল না ।

তার ফুল রক্তাধর ছ'খানি কমলেশকে আকর্ষণ  
করিল.....

কমলেশ সহসা নত হইয়া প্রথম প্রণয়-চূষন অঙ্কিত  
করিয়া দিল—

করবীর ঘুম টুটিয়া গেল ।

মৃদু কমলেশ আবার তার গোলাপী কপোলে অধর  
পরশ দিল.....

করবী ক্রান্তে সরিয়া গেল.....

মুখে লজ্জার রক্তিমতা.....

বিষ্মল স্বরে কমলেশ বলিল, আজকে রাতে কি  
ঘুমোতে হয়, করবী ?

করবীর মুখে বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল—

এ কি অউদ্রতা !

কমলেশের প্রচল্ল মুখখানা নিমেষে শুকাইয়া  
উঠিল ।

করবী কি তবে স্থবী হয় নাই !

জ্ঞান স্বরে শুধাইল, আমাকে পেয়ে কি তুমি স্থবী  
হও নি ?...বল, করবী, বল...গরীব ব'লে আমার ঘৃণা  
কর না তুমি ?

করবী ভাবিল, ভালো জালা !

বিরক্ত কণ্ঠে বলিল, জানি নে...এখন ঘুমোতে  
দিন্ আমায়.....

এই কি নব-বধুর প্রথম সম্ভাষণ ?

কমলেশের বুকে তীব্র ব্যথার কাঁটা বিঁধিল ।

অভিমানাহত কণ্ঠে বলিল, বেশ, তোমায় আর  
বিরক্ত করব না করবী—

করবী পাশ ফিরিয়া শুইল ।

কমলেশের মনে হইল, দরিদ্রের ঘরে এ ফুল  
মানায় না !

ধনীর সুরম্য প্রাসাদেই শোভা পায় ।

একটা বেদনা-তপ্ত দীর্ঘশ্বাস তার বুক ফাটিয়া  
বাহির হইয়া আসিল ।

জান্‌লার ধারে গিয়া সে স্তব্ধ হইয়া বসিল ।

বাহিরে তেমনি শারদ-জ্যোৎস্না.....

ঘরে ফুলের সৌরভ.....

কিন্তু সব বিফল !

পুত্রের রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত মুখখানি দেখিয়া মা  
শুধাইলেন, শরীর কি ভালো নেই, বাবা কমল ?

কমলেশ ম্লান হাসিল—

বলিল, বড় লোকের মেয়ে আনা তোমার ভুল  
হোয়েছিল মা...আমাদের গরীবের ঘরে ও মানায় না...  
মা সবই বুঝিলেন ।

স্নেহ-মিশ্র স্বরে বলিলেন, না রে না, বোমা আমার  
লক্ষ্মী !..ছেলে মানুষ, তাই এখন স্বামীর ঘর চেনে  
নি, বড় হোলেই চিনবে...

করবী বাপের বাড়ী যাইবার জন্ত অস্থির—

এ নোংরা বাড়ীতে সে টিকিতে পারিবে না ।  
 চিরকাল সে বিলাসের কোলে লালিতা...  
 দারিদ্র্যের এ রক্ষা মুক্তি সহিতে পারিবে কেন ?  
 আজন্ম পরিচিত একটা গৃহের জন্ত তাই তার মন  
 উতলা—

মা স্নেহের হাসি হাসেন ।  
 বলেন, ছেলে মানুষ .. বাপ-মায়ের জন্তে মন কেমন  
 কোরচে .....

জানলার ধারে করবী বসিয়াছিল ।  
 হাতে একখানি নব-প্রকাশিত উপগ্রাস.....  
 বোধ করি বিবাহের উপহার-প্রদত্ত.....  
 অবগুণ্ঠনটা শিখিল .....

শুভ্র ললাটে সিঁহের রক্ত-বিন্দু... ..  
 কমলেশ ঘরে আসিল ।  
 তার মুখ চোখে পলক পড়িল না—  
 সহসা করবীর একখানি কর-কমল ধরিল...  
 বলিল, কবে কিরবে করবী ?... বাড়ী গিয়ে চিঠি  
 লিখবে তো আমার ?  
 কর্তৃক তার তৃষ্ণা-বাকুল !  
 করবী হাত ছাড়াইয়া লইল—  
 মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছায়া...  
 বলিল, কবে কিরবে বোলতে পারি নে... এ রকম  
 নোংরা বাড়ীতে থাকা তো আমার অভ্যাস নেই ..  
 বেদনার আঘাতে মুখ কমলেশের মোহ টুটিয়া  
 গেল—  
 দরিদ্রের প্রতি এত দৃষ্টি !  
 যে-কালে মুখে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া  
 গেল ।.....

পিতার বিলাস-সৌধে আসিয়া করবী হাঁপ ছাড়িয়া  
 বাঁচিল—  
 মুক্ত আলো বাতাস..... সখীদের হাসি-গল্প...  
 এরি মাঝে সে তার আনন্দ-চঞ্চল প্রাণটিকে  
 মেলিয়া দিল ।

এ সব ছাড়িয়া সেই সর্কার গলিতে.....  
 অন্ধকার নোংরা বাড়ীতে অহরহ বন্দী হইয়া  
 থাকা.....  
 অসম্ভব !  
 মানুষ তো আর খাঁচার পাখী নয় !  
 নিশ্চিন্ত মুখে করবীর দিন কাটে—

ভূষণ বাবুর মুখ কিন্তু গভীর ।  
 কন্যার এই আচরণে তিনি ব্যথিত ।  
 হা'রে মুড় মেয়ে..... রক্ত চিমিলি মা.....  
 তুচ্ছ বিলাস-লীলায় মতিয়া রহিল ! ..  
 কিন্তু মুখে কিছুই বলেন না ।  
 রহিয়া রহিয়া করবীর মন উদাস হইয়া যায়...  
 সখীরা আসে ।  
 গল্প করে ।  
 হাসি পরিহাসে ঘর মুখর করিয়া তোলে ।  
 কিন্তু মাঝে মাঝে করবী কেমন অশ্রুমনক হইয়া  
 পড়ে—  
 সখীরা গান গাহিতে বলে ।  
 করবী আনমনে গাহে—  
 —‘বিলাস কোরেচ যারে নয়ন-জলে,  
 এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে—’  
 বিরহ-করণ সুর !  
 কোতুক-হাসিতে সখীদের গোধ উজ্জল হইয়া উঠে ।  
 বলে, বিরহিণীর মন উতলা হোয়েচে—  
 করবী গান বন্ধ করিয়া দেয় ।  
 মনটা বিরক্ত হইয়া ওঠে অকারণে ।  
 কখনো চুপ করিয়া বসিয়া থাকে.....  
 একেলা.....  
 স্তব্ধভাবে.....  
 বসন্ত আসে ।  
 নীলাকাশে সোণার আলো ।  
 মুকুল ফোটে ।  
 সুদিত কলিকা পাণ্ডি মেলিয়া চায় ।

বাতাস গন্ধ-মদির।

ধরণীর বৃকে সবুজের শোভা।

শুধু শাখা জব-কিশলয়ে ভরা।

চারিদিকে যে উৎসবের সমারোহ—

করবীর মনে কি এক আবেশের মোহ ঘনাইয়া আসে।

বসন্তের অলস বেলায় সে উদাস মনে বসিয়া থাকে—

হাঁওয়ার দোলায় পল্লব-মর্ম্মর শোনা যায়.....

যেন কাহার মৃদু প্রশ্ন-গুঞ্জন.....

করবীর মনে গড়ে প্রেম স্নিগ্ধ ছটা আঁখি.....

কুল শয্যার রাজে একটা গোপন চূষন.....

সারা দেহ তার শিহরিয়া উঠে।

- মলয় পরশে ফুলের মত।

বসন্তের জ্যোৎস্না-রাজে করবীর চোখে ঘুম আসে না—

মনে হয়, যদি কেহ পাশে থাকিত!

ছটা কোমল-বাস্তুর আলিঙ্গন.....

একটা অতর্কিত চূষন.....

এরি জন্ত তার তরুণ হৃদয় ভূষিত।

দূরে কুহু ডাকে—

করবীর যৌবন-জাগ্রত বৃকের তুষা ব্যাকুল হইয়া ওঠে।

সেদিন স্নলতা আসিয়াছিল।

স্নলতা করবীর সহ-পাঠিনী ছিল।

সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে।

স্নলতা সারাক্ষণ তাহাদের নব-বিবাহিত জীবনের গল্প করিল.. ..

তাহাদের স্নেহের বর-কন্নার ইতিহাস.....

স্বামীর অনাবিল প্রেম-সোহাগ.....

শুধু এই সব কথা।

স্বামী তার কেরাণী।

কি শু স্নলতার মনে কোনো ক্ষোভ নাই—

দরিদ্র হইলেও তাহাদের শান্তি-নীড়টা বড় সুখের।

করবী দেখিল, স্নলতার মুখে তৃপ্তির আভা.....

নিজকে বড় রিক্ত বোধ হইল।

বুঝিল, তার নারী জীবনে মস্ত একটা অভাব, একটা অভূষিত রহিয়াছে।

করবীর হিংসা হইল—

স্নলতা কি সুখী!

সহসা সে উঠিয়া চলিয়া গেল—

বলিল, বড় মাথা ধরেচে ভাই—

অকারণে তার আঁখি অশ্রু-সজ্জল হইয়া উঠিল।...

মা বলেন, এইবার বৌমা'কে আনতে পাঠাই কমল?

কমলেশ বলে, কি দরকার মা?.....বেশ আছি আমরা মায়ে পোয়ে.....

মা সন্তানের গোপন অভিমান-বেদনা বোঝেন।

বলেন, সে না হয় ছেলেমা'র, অবুঝ.....তুইও

কি অবুঝ হবি রে?

কমলেশ জবাব দেয় না।

ভূষণবাবু সেদিন গৃহীকে বলিলেন, শুনলুহ, কমলেশের নাক অস্থ.....

পাশের ঘরে ছিল করবী

কথাটা সে শুনিল—

সহসা তার বৃকে যেন একটা কাঁটা বিঁধিল।

এ কি উদ্বেগ, ব্যাকুলতা তার মনে!

ইচ্ছা হইল, মুখ ফুটিয়া শুধায়, কি অস্থ?.....

কেমন আছেন তিনি?

তার বৃকে জাগিয়া উঠিল এক মমতাময়ী নারী—

অর্থের অহঙ্কার.....

ঐশ্বর্যের গর্ক

সবি পরাজয় স্বীকার করিল।

সে বুঝিল, অর্থই নারী জীবনের সর্বস্ব নয়।

লজ্জা-সঙ্কোচ জয় করিয়া করবী বলিল, মা আমি

যাব।

মা বলিলেন, রোগের বাড়ী .....সেখানে গিয়ে  
কাজ নেই.....

করবীর রুদ্ধ অশ্রু মানা মানিল না—

বলিল, তবু আমি যাব—

ভূষণবাবু সম্মুখে কঙ্কার মাথায় হাত রাখিলেন।

বলিলেন, বেশ তো মা... চল আমিই তোমায়  
রেখে আসব.....

শয্যার উপর কমলেশ বসিয়াছিল—।

মুখখানি রোগ-মান... ..

চোখের তারায় বিষাদের ছায়া.....

করবী ধীরে ঘরে আসিল।

বজ্রা-কুষ্ঠা-রক্ত অপরূপা ত্রী—

ধীরে কমলেশের পায়ে একটা প্রণাম করিল—

যেন শ্রদ্ধা-নতা পূজারিণী।

অমৃতপ্ত কণ্ঠে বলিল, কমা চাইতে এসেছি আমি  
.....আজ বুকেচি, এ বাড়ীই আমার তীর্থ.....

কমলেশ দেখিল, করবীর চোখে অশ্রু!

পাণ্ডুর মুখখানি তার আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিল।

শীর্ণ বাহু-পাশে করবীকে বন্দী করিল।

বলিল, করবী, আজই আমাদের সত্যিকারের  
মিলন-রজনী—

বাহিরে বসন্ত পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্না.....

দূরে একটা পোষা কোকিল ডাকিতেছিল.....

কুহু কুহু ...

## উপহার

শ্রীমতী যোগমায়া দেবী

স্বামিন্

৩

গিয়েছ স্বরগ পুরে,  
কোথা গো সে কত দূরে,  
অজানা সে কোন্ দেশে করিতেছ বাস ?  
পশিতে কি পারে তথা,  
বিষাদ বিরহ গাঁথা,—  
বেদনার অশ্রুজল দুঃখের নিশাস ?

২

পরপারে জীবনের,  
গেছ চলে ; দুঃজনের  
মাঝে, আজি অন্তরাল সৃজিয়া অপার  
নিয়ে গেছ সুখ আশা,  
প্রেম প্রীতি ভালবাসা—  
রাখিয়া গিয়েছ শুধু চির অশ্রুধার ॥

হৃদয়ের ভাঙ্গা ঘরে,  
বিষাদ বরষা ঝরে  
শোক বায়ু ছ ছ করে সদা করে খেলা,  
গণিতেছি কতদিন,  
একাকিনী সাথী হীন,  
জানিনা ফুরাবে কবে জীবনের বেলা

৪

মর্ষ্য বিদ্ধ শোক-বাণে,  
যে ক্ষত আহত প্রাণে,  
উৎসবে রোমন রূপে এ প্রীতি আমার,  
লহ নাথ একবার,  
দীর্ণ হৃদি বেদনার,  
অশ্রুজল বিন্দুমাখা প্রেম উপহার ॥



আত্মোন্নতি ও সমাজ সেবাই ধর্ম। শিক্ষা ও ধর্মের একত্র সমাবেশ হইলেই মনিকাঞ্চন যোগ হয়, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা এবং তাহাতেই মানব-জীবনের সার্থকতা।

ধর্ম বলিতে কোন দেবতাবিশেষে বিশ্বাস বা অ বিশ্বাস বুঝায় না। ইহাতে প্রাণহীন আচারের হৃদয়হীন পীড়ন নাই, উচ্ছৃঙ্খলতার ইঙ্গিত নাই, ব্যক্তিগত ঈর্ষা নাই, সমাজগত রেযারেসি নাই; আছে জগতের হিতার্থে স্বাধীন চিন্তা ও সম্মিলিত চেষ্টা, হৃৎখীর হৃৎখমোচনের আগ্রাণ যত্ন, নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া জগতের উপচিকীর্ষা। ইহাতে ভেদ নাই, আছে মিলন, আছে সাম্য; ঈর্ষা নাই আছে ভালবাসা, আছে প্রেম; ইহাতে ঘৃণা নাই, আছে ভক্তি; ইহাতে ভাগ নাই, আছে সম্মেলন, আছে আত্মদান। সকলকে আপনাত করিয়া লইবার চেষ্টাই পরম ধর্ম, চরম শিক্ষা।

যেখানে প্রকৃত শিক্ষা ও ধর্ম, সেখানে শৌর্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। শিক্ষিত ও ধার্মিক ব্যক্তির প্রাণে ভয় বা দুর্বলতার লেশমাত্রও নাই। তিনি সংসারের আপদ বিপদে ভীত হন না, তিনি জানেন উহা জীবনের নিত্য সহচর। তিনি কাপুরুষের মত বিপদ ঝড়োইয়া চলিতে ইচ্ছা করেন না, তিনি বীরের

মত আত্মবলে বাধা বিঘ্ন, হৃৎখ দৈন্ত অতিক্রম করিয়া স্বীয় গন্তব্য স্থানে উপনীত হন। তিনি মনের বলে বিশ্ববিজয়ী হন। তিনি নিয়ত সুখের আশা করিয়া অবিরত হৃৎখের ফাঁদে অবরুদ্ধ হন না। তাঁহার প্রার্থনা—

“দেও লক্ষ হৃৎখ শোক,  
লক্ষ লাক্ষ ভয়,  
দেও দৈন্ত প্রতিদিন  
নব বিঘ্ন-দয়;  
তুচ্ছ ব’লে সবে আমি  
করিব জ্ঞান,  
শুধু চাই প্রাণ।”

এই প্রাণ শিক্ষা ও ধর্মের সম্মিলিত ফল।

ভারতের শিক্ষানীতি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ আত্মার উৎকর্ষ সাধনকে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা দেহ, মন বা হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনে পশ্চাদ্গত হন নাই। ভারতীয় বীরের আদর্শ কি? প্রকৃত বীর কে? “যিনি শুধু দৈহিক বলে বলীমান, অথবা যিনি শুধু ধনুর্বিজ্ঞান বা অস্ত্রশস্ত্র চালনার পারদর্শী? না, প্রকৃত বীর তীক্ষ্ণবীক্ষণ হইবেন; তিনি নীতিপরায়ণ ও শাস্ত্রজ্ঞানী হইবেন, সর্বোপরি

তিনি ধর্মপ্রাণ ও জৈশ্বরপরায়ণ হইবেন। এইরূপে দেহ, মন, জ্ঞান ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনই হিন্দুশিক্ষার চরম আদর্শ।’

এই শিক্ষার ফলে প্রাচীন ভারত উন্নতির চরমে উঠিয়াছিল—শত শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ ও শত শত প্রকার বীরনীতির বিপর্যয় সহিয়াও আজও বাঁচিয়া আছে, নিজ অবিনাশী বীৰ্য্য ও জীবন হইয়া পূর্ণত হইতেও দৃঢ়তর ভাবে এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মা যেমন অনাদি, অনন্ত ও অমৃত-স্বরূপ, আমাদের এই ভারত-ভূমির জীবনও তদ্রূপ। আর আমরা এই দেশের সন্তান।

তাই সমগ্রজাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। আজ কাল যে শিক্ষা দেশে চলিয়াছে, সে শিক্ষায় মানুষ তৈয়ার হয় না—তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক। “বালক স্কুলে গেল। সে প্রথম শিখিল—তাহার বাপ একটা মূর্থ, দ্বিতীয়তঃ পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়তঃ প্রাচীন আৰ্য্যগণ সব ভণ্ড, আর চতুর্থতঃ শাস্ত্র সব মিথ্যা। ঘোল বৎসর হইবার পূর্বেই সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন ‘না’ এর সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়।...মাথায় কতক গুলা ভাব ঢুকাইয়া সারা জীবন হজম হইল না—অসম্বন্ধ ভাবে মাথায় ঘুরিতে লাগিল—ইহাকে শিক্ষা বলে না। আমাদের কাছে বিভিন্ন ভাবসমূহকে এমনতর ভাবে আনার করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, নাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, চরিত্র গঠিত হয়।’

আমরা বৃথা উদ্ধার পথে খাবিত হইতেছি, ঐ যে উজ্জল তারকা আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত—সে দিকে জ্রক্ষেপ নাই। হুজুমানের জ্ঞান সমুদ্র পার হইতে চাই, অথচ এক পোয়া পথ হাটিবার ক্ষমতা নাই। বৃথা আঁফালনে কাজ হইবে না। চাই কাজ। মানুষ হইতে পারিলে সকলই পাওয়া যাইবে—অভাব,

অভিযোগ কিছুই লাগিবে না। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন আমাদেরকে সেই আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন, “মানুষ হও, রামচন্দ্র! অমনি দেখবে ও সব বাকি আপনা আপনি গড়্ গড়িয়ে আসছে।”

জীবনের আদর্শ কর “জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি ভগবানে।” প্রথম পূজা বিরাতের পূজা—তোমার সম্মুখে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের পূজা—ইহাদের পূজা করিতে হইবে। এই সব মানুষ—ইহারাই তোমার জৈশ্বর, আর তোমার স্বদেশ-বাগিগণই তোমার প্রথম উপাস্ত। পরম্পরের প্রতি ঘেঁষ হিংসা পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পরে বিবাদ না করিয়া প্রথমে এই স্বদেশবাগিগণের পূজা করিতে হইবে।

Give the devil his due—সকলকেই তাহার নিজ প্রাপ্য দিতে হইবে। একচেটিয়া অধিকারের দিন চলিয়া গিয়াছে। সকল জাতিকেই ধীরে ধীরে উঠিতে হইবে, ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর জাতিকে নীচু করিতে হইবে না—উহাদের ভয় নাই। নিম্ন জাতিকে উন্নত করিতে হইবে। এখন “প্রত্যেক অভিজাত জাতির কর্তব্য নিজের সমাধি নিজের খনন করা; আর যত শীঘ্র তাঁহারা এ কার্য করেন, ততই তাঁহাদের মঙ্গল। যত বিলম্ব করিবে উহা তত পঁচিবে আর উহার মৃত্যু তত ভয়ানক হইবে। এই কারণ ব্রাহ্মণ জাতির কর্তব্য ভারতের অস্তিত্ব সকলের উদ্ধারের চেষ্টা। তিনি যদি ইহা করেন এবং যত দিন ইহা করেন, ততদিনই তিনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু তিনি যদি কেবল টাকার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না।”

সংহতিই শক্তির মূল। শক্তি লাভ করিতে হইলে সকল ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্র সম্মেলন করিতে হইবে। ঋগ্বেদ সংহিতা বলেন,—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবা মনাসি জানতাং।

দেবা ভাগং বধা পূর্বে ইত্যাদি। ১০:১২:১২

তোমরা সকলে সর্বাঙ্গকরণ বিশিষ্ট হও, কারণ পূর্বকালে দেবগণ একমনাঃ হইয়াই তাঁহাদের ভাগ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আমরা পরমুখাপেক্ষী হইয়া উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। কোন নূতন বিষয়ের আবিষ্কারে ত প্রচেষ্টা নাই ই, অথচ আমাদের উদাসীনতা ও নিশ্চেষ্টতার দরুণ আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক অত্যা-  
গুলির পূরণ করাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। একদিন বঙ্গের পল্লীগুণির দিকে তাকাইলে চক্ষু জুড়াইত। সেদিন মাহুঘের “চিন্ত প্রবাহ বাঙলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল—  
এখন সেই বাঙলার পল্লী-কোড় হইতে বাঙালীর চিন্তাধারা বিকশিত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়—সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জলাশয়গুলি দূষিত—পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধ ঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত—সেখানে উৎসবের আনন্দ-ধ্বনি উঠে না।”

আমরা আজকাল

“ঘর কৈলু বাহির, বাহির কৈলু ঘর,  
পর কৈলু আপন, আপন কৈলু পর।”

একজ্ঞ সোঁতের নৌলির মত ভাসিয়াই চলিয়াছি। আমাদের নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস নাই—আমরা ভুলিয়া গিয়াছি সেই ঋষিবাক্য—কুরু পৌরুষমাত্ম-  
শক্ত্যা। আমরা বিস্মৃত হইয়াছি—বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে, অতি বৃহৎ উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ব্যবস্থা স্থাপনের প্রতিভা ভারতবর্ষ কোন দিন ত্যাগ করে নাই, যাহা কিছু ঘরের এবং যাহা কিছু অভ্যাগত, সমস্তকে একত্র করিয়া লইয়া পুনর্বার ভারতবর্ষ সমাজকে নূতনভাবে গঠিত করিয়া তুলে।

দেশের একনিষ্ঠ সেবক চিত্তরঞ্জন একদিন বলিয়াছিলেন, “আমার মতে, জাতীয়তা অর্থে পাশ্চাত্য

দর্শন হইতে ধার করা একটা রাজনীতিক ধারণা মাত্র নহে। আমার মতে প্রত্যেক জাতি উন্নতি-  
শীল। তাহাকে অগ্রসর হইতেই হইবে; কারণ, অগ্রসর হওয়া ভিন্ন তাহার আর অন্য উপায় নাই। ভগবানের বিশ্বরাজ্যে মানবজীবনে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। প্রত্যেক জাতি সেইরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ বহুজীবনের একটি সত্ত্ব। জীবনের অতিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জাতিকেই বিস্তৃতি লাভ করিতে হইবে। আমি নিজে যে জাতির অন্তর্ভুক্ত, সে জাতিকে কাজে কাজেই অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা কেবল তাহার বিস্তৃতির সাহায্য করিব। আমি নিরপেক্ষতাকে এবং ধর্মকে যেরূপ শ্রদ্ধা করি, জাতীয়তার এই নীতিকেও আমি তদ্রূপ শ্রদ্ধা করি, দেশের কাজ করা, জাতির কাজ করা মহুঘত্বের সাধনা। মহুঘত্বের সাধনা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করা।”

বাঙ্গালার মাসিক সাহিত্যগুলি আজকাল বেশ ব্যবসায়ের দিকে ঝোক দিয়াছে। সাহিত্যের ভাবগুলি ফুটাইয়া তোলার জন্য যতখানি প্রয়োজন, তার চেয়ে অত্যাধিক কল্পনা সাহিত্যের মধ্যে সত্যসত্যই আঘাত করে। শিক্ষা ও ব্যবসায় এক কথা নয়। যতদিন বাঙ্গালা সাহিত্য দীন বাঙ্গালীর মর্ম্ম স্পর্শ করিতে না পারে ততদিন আমরা উহাকে সাহিত্যের বিকাশ না বলিরা বিলাস বলিব। সমাজ নিরা, মানবজীবন নিরা যে ছিনিমিনি খেলিতে পারে সে সমাজের হিতকারী ত নয়ই—তাহাকে ষাতক বলিলেও অত্যাধিক হয় না। মনকে ভালর মধ্য দিয়া ঢালাইলে সমাজের যতটা উপকার হয়, ভালকে মনের ভিতর দিয়া পরিচালিত করিলে উহা কলঙ্কিত হইবে, সন্দেহ নাই। সোনা অগ্নিদগ্ধ হইলে নির্মল হয়, ভস্মাবলেপিত হইলে উহার রং ধিবর্ণ হইবে বৈ কি? আজকাল পতিতার প্রতি কোন কোন লেখকের একটা অপকল্প শ্রদ্ধা দেখিতে পাই। পতিতার প্রতি করুণা প্রদর্শন করিতে গিয়া কেহ কেহ একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়েন, তাহাও



দেখিতে পাই। অবশ্য জীবে দয়া ও শ্রদ্ধা সদস্ত-  
করণেরই পরিচায়ক বটে। কিন্তু অধুনা সাহিত্যে যে  
প্রকারে করুণার স্রোত অবাধগতিতে বহিতেছে, না  
জানি উহা কোন্ দিন স্বর্গচ্যুত গঙ্গাপ্রবাহের ত্রায়  
সমাজ-ঐরাবতকে ভাসাইয়া বইয়া যায়। 'সর্বমত্যস্ত  
গর্হিতম্' কথাটা আমাদের মতে সাহিত্যেও খাটে  
বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষা ত Direct ও Indirect  
ভেদে দুই প্রকারই হইতে পারে। যেমন, কোন  
পিতা শিশুকে বলিতেছেন, 'সদা সত্য কথা বলিবে',  
পক্ষান্তরে, আর একজন বলিতেছেন, 'কখনও মিথ্যা  
কথা বলও না।' কোন্টা ভাল? আমাদের মতে  
প্রথমটা। কারণ, উহাতে 'সত্যের' অর্থ প্রকাশ  
করিলেই যথেষ্ট, 'মিথ্যার' দিকে মোটে মাড়াইলই  
না। 'মিথ্যা' বুঝাইতে যাইয়া পরোক্ষে তাহাকে সে  
বিষয়ে কতকটা অগ্রসর করিয়া দেওয়া হয়। অতএব,  
প্রথমটা Direct এবং দ্বিতীয়টা Indirect শিক্ষা  
বলিয়াই আমাদের ধারণা। আমাদের শাস্ত্র বলিতে-  
ছেন, 'মাতৃবৎ পরদারেষু'—পরস্ত্রীকে মায়ের মত শ্রদ্ধা  
করিবে। মায়ের নামে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই,  
এমন কি তেমন দাস্তিকেরও হৃদয়ে সাময়িক একটা  
শ্রদ্ধা ও বিনতির ভাব আময়ন করে—ইহাতে মনের  
কলুষ দূরীভূত হইয়া মানুষকে স্বতঃই নির্মল পথে  
টানিয়া নেয়। পক্ষান্তরে বাইবেলে দেখিতে পাই,—  
"Whosoever looketh on a woman to lust  
after her hath committed adultery with  
her already in his heart"—Mathew 5-28.  
অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে,  
সে মনে মনে সেই স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছে  
এইরূপ বৃত্তিতে হইবে। এখানে উপদেষ্টাকে প্রথমতঃ  
'ব্যভিচার' কি তাহা শিক্ষার্থীকে বুঝাইতে হইবে।  
ব্যভিচার বৃত্তিতে গিয়া শিক্ষার্থীর ইষ্ট কি অনিষ্ট হইবে  
তাহা স্বধীজন বৃত্তিতে পারেন। গল্পে আছে, বুড়ী  
রাজপুত্রকে বলেছিল—বাপু, উত্তর দিকে যাইও না,  
বিপদ ঘটতে পারে। অমনি রাজপুত্রের মনে ছর্ব্বীর  
কৌতূহল হইল সে উত্তর দিকে যাইবেই। মাল্লয়ের

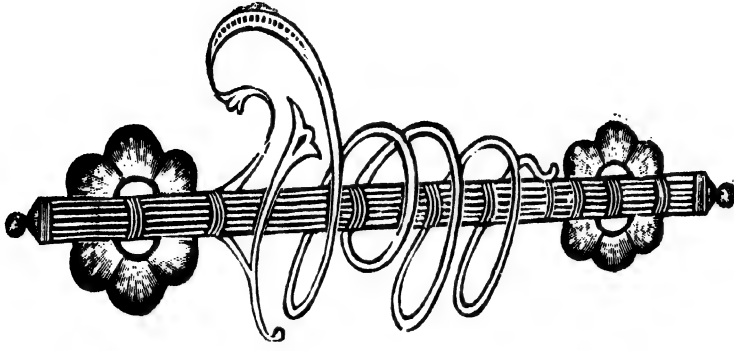
মন ত! যে দিকে বাধা পায় উহা সাধারণতঃ—সে  
দিকেই ছুটতে থাকে। তাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ  
অনুরোধ, লেখকগণ দৃষ্টি রাখিবেন, বাহাতে কাটা  
উঠাইতে গিয়া পা-টাকেই কাটিয়া না ফেলেন। ছর্ব্বল,  
শ্রীহীন বঙ্গসমাজ আপনাদের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া  
আছে, একবার উহার মুখের দিকে চাহিয়া লেখনী  
সংযত করিতে চেষ্টা করুন।

মাসিক সাহিত্যের আর একটা প্রতিকৃতি  
আমাদের হৃদয়ে সর্বদাই ফুটিয়া উঠে। ওটা আর  
কিছুই নয়—উহার গাফিলতি বা পূর্ব-কথিত ব্যসায়-  
বৃদ্ধি। ছ'চারজন নামকরা লেখকের উপস্থান হইলেই  
উহা ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আকারে মাস মাস প্রকাশিত  
হয় এবং পাঠকের পৈর্য্য হরণ করে—অনেক সময় দেখা  
যায় উহা হুমানেন ল্যাজের মত বর্দ্ধিত হইতে হইতে  
যোজনব্যাপী দাঁড় হয় এবং দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত  
চলিতে থাকে। গ্রাহক সংরক্ষণের ইহা একটা উপায়  
নয় ত! যদি তাই হয় তবে উহা যত শীঘ্র সম্ভব  
পরিত্যজ্য। পরোক্ষে হউক, প্রত্যক্ষে হউক প্রতারণা  
—প্রতারণাই, উহার যে কোন নামই দাও না কেন।  
দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ভারতবর্ষ'ই ধরা যাউক। উহার 'দিক্-  
শূল' অনেকের 'রুদশূল' উপস্থিত করিয়াছে। শরৎ  
বাবুর 'শেষ প্রশ্ন' সোদনকার হইলেও কোথায় ইহার  
শেষ হইবে কে জানে? নরেন বাবু 'খেলার পুতুল'  
লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আশা করি যথা-  
সম্ভব সমস্ত পুতুলখেলা শেষ করিয়া তিনি গুরুতর  
মায়ের সেবায় প্রতী হইবেন। চারুবাবুর 'ধোকার  
টাটার' ধোকার পড়িয়া অনেকেরই চোখে বিষম ধোকা  
লাগিতেছে। আমরা বলি, চারুবাবু হাড়াতাড়ি টাটা  
ছাড়িয়া মন্দির গঠনে লাগিয়া পড়ুন। বাঙ্গালী ভট্টগ্রহের  
আলায় অমনি অস্থির, তায় আবার নরেশ বাবু তাহার  
ঘাড়ে আর এক নবীন 'ভট্টগ্রহ' চাপাইয়াছেন।  
'বোঝার উপর শাঁকের আঁটি' কেন? বাঙ্গালীর  
গ্রহের ফের কবে দূর হইবে? যত সম্বর হয় ততই  
বাঙ্গালীর মঙ্গল।





ଆନନ୍ଦିତା



তৃতীয় বর্ষ ]

মাঘ—১৩৩৪

[ পঞ্চম সংখ্যা

## লাঙ্গলের জন্ম ।

( ইংরাজী কবিতাবলম্বনে )

শ্রীমতী সরসীবালা বসু

ধরণী তখন লভেছে জন্ম সূর্য্য কুক্ষি হ'তে,  
আদিম মানব—প্রকৃতির শিশু নূতন বিস্ময়েতে—  
দেখে চাহি চাহি চারি পাশে ঘেরা ঘন রহস্য-জাল,  
জ্ঞানরশ্মির নবীন বিভার তখনো রাত্রিকাল ।  
ছিল একজন নিপুণ শিল্পী সবল সুদৃঢ় কায়,  
ভাবে নিতি নিতি নব কর্মের কি করিবে সচুপায়,  
লৌহ তখন ধরার বক্ষে নূতন আবিষ্কার,  
ভাবে সে কর্মী লৌহে সে দিবে গঠন দিব্যাকার !  
জলে দাউ দাউ আগুনের শিখা—লোহা লাল অঙ্গার,  
পেশল দুহাতে হাতুড়ী ঝাঁকড়ি হানে সে বারম্বার—  
আনন্দে তার মুখে ফোটে বাণী—জয়—শিল্পের জয়,  
তরবারি আর বর্ষা গড়িব—ধরণীর বিস্ময় ॥

তারপর—

নূতন অস্ত্র ফলকে বুঝি বা বিদ্যুৎ চমকায়,  
সূর্য্য কিরণে করে ঝকমক—আঁখি বুঝি বলসায় ;

দলে দলে আসে মুগ্ধ মানব লয়ে কত উপহার,  
মণি মুক্তা ও হীরা জহরৎ আরণ্য-সম্ভার ॥  
বিনিময়ে লয় তরবার আর বর্ষা সে খরসান,  
আনন্দে সব করে কলরব—মুখরিত জয় গান ;  
জয় জয় জয় লৌহের জয় জয় শিল্পীর জয়,  
কীর্তি তাহার চির ভাস্কর অমৃত, অক্ষয় ॥

তারপর—

কেটে যায় দিন—শিল্পীর মনে ক্রমে আসে অবসাদ,  
শক্তির পণে কিনিল কিবা সে একি ঘোর পরমাদ,  
অস্ত্রের বলে একি হানাহানি, একি এ অত্যাচার,  
রক্তে ধরণী রাঙা হয়ে ওঠে—মায়া দয়া নাই আর,  
মানবের মনে ছিল কোন পশু নিজিত গুহালীম,  
রক্তপিয়াসে জেগে ওঠে অই নির্দম স্নেহহীন ;  
শিল্পী টুবাণ করে হায় হায়—একি এ কর্মফল,  
নিয়তি তাহারে কোন পথে নিতে নিলে কোন রসাতল ॥

তারপর—

সহসা একদা শিল্পীর চোখে জাগে উৎসাহ জ্বালা  
পেশল দু' বাহু উর্ধ্বে বাড়ায়ে কহে—অস্ত্রশালা  
নয় নিষ্ফল—নয় নিষ্ফল মোর জীবনের শ্রম,  
ধেয়ানে ধরেছি যে ধন—সবারে দেবো সেই অমুপম ॥  
ধরণীর বুক লিখিব যে লেখা যুগে যুগে অক্ষয়,  
সবুজ সরস শোভায় ক্ষেত্র হয়ে রবে শোভাময় ॥

তারপর—

শিল্পীর পণ হোলো সার্থক—সার্থক শ্রম তার,  
তাহারি ধেয়ানে সেই প্রথম লাজল আবিস্কার,

রক্ত পিপাসা ভুলে সব জন এলো সেথা দলে দলে,  
শিল্পীর গড়া নূতন যন্ত্র লয়ে যায় কুতূহলে ॥  
ভেদ ভাব ভুলি শেখে এক সাথে কৃষি শিক্ষার পাঠ,  
কঠিন মাটির বুক চিরি চলে—লয়ে লাজল ঠাট;  
ধরণী উহাতে নহে কো ক্ষুধ—উর্বরা হয়ে ওঠে,  
নিত্য নূতন শস্য শ্যামলে রস-মঞ্জরী ফোটে;  
তরবারি আর বর্ষা রহিল আত্মরক্ষা তরে,  
শিল্পীর জয় গাহে নরনারী অকামুদ্র স্বরে ॥

## লজ্জাবতী ।

শ্রীমুরজিৎ দাশগুপ্ত

[ কথা-চিত্র ]

ওই যে একটি লতা সংকোচে একধারে স'রে আছে,  
ওকে কেউ দেখেও দেখে না। ও কারো পরশ সহিতে পারে  
না। বাতাস একটু জোরে বইলে, আতঙ্কে চোক বোজে।  
কাণ্ডের আঙণ হাওয়া আঁমের মঞ্জরীর সুবাস মেখে আসে,  
সবাই তাকে আঁমের আঁকড়ে ধরে; ওর কাছে যেতেই ও  
মিলিয়ে যায়। ব্যাঙের গানে, চাতকের চীৎকারে, মাছরাঙ্গার  
কান্নায়, দারুণ নিদ্রাব-শেষে বাদল আসে, সবাই তাঁকে বুক  
পেতে নেয়; ও একেবারে নেতিয়ে পড়ে।

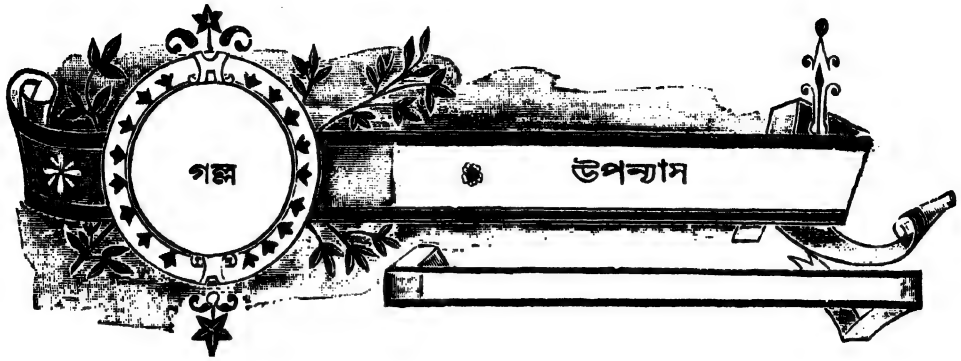
ও তবে কা'কে চায়?

আমি জানি—জানি, ওর মনের কথা জানি; ও বা'কে

চাঁদ তা'কে পায় না। আমি দেখেছি দুপুর দিনে সারা সংসার  
যখন নিরুন্ম, পাখীরা পাতায় কোলে লুকিয়ে, ও তখন পা  
ছড়িয়ে ব'সে সারা গা এলিয়ে দিয়ে দেখে—দেখি তো,  
আয়োজনের কি কিছু কম আছে! তবে সে আসে না  
কেনো?

নিশীথে যখন চাঁদ ওঠে, তারা কোটে, ও তখন নত-মুখে  
নীরব-চোখে কাঁদে, কেবল কাঁদে। আমি দেখেছি প্রভাত  
বেলায় ওর সারা মুখ অঙ্গ-মাথা। ও এমন কোন কোমলকে  
চায়, বা'র পরশের স্পর্শ নেই?

ওগো অপরশ, তুমি কবে আসবে?



## নিশীথের আলো।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

স্কুল হইতে বাসায় ফিরিয়াই প্রগতি বিষয়ে দেখিল শরৎ  
বারাণ্ডার একখানা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর কুঁকিয়া  
পড়িয়া একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা উন্টাইতেছেন।

প্রগতির পায়ের শব্দ পাইয়াই তিনি চোখ ফিরাইলেন,  
পত্রিকাখানা সরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া হাসি  
মুখে বলিলেন, “আপনার আসবার অনেক আগেই আমি  
এসে বসে আছি। আমি ভেবেছিলুম আপনি এতক্ষণ বাসায়  
এসেছেন।”

শরতের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সামান্য নগণ্য একটি টিচার  
সে, শরৎ যে তাহাকে এতটা সম্রদ্ব সম্মান দেখান ইহাতে  
প্রগতি অত্যন্ত কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি সে  
প্রতিনমস্কারটা সাড়িয়া লইয়া বিনীতভাবে বলিল, “হ্যাঁ, আজ  
বাংলার ফিরতে সত্যি আমার বড্ড দেরী হয়ে গেছে। সাড়ে  
তিনটের সময় স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে, এখন সাড়ে পাঁচটা  
বেজেছে দেখছি।”

শরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্কুলে কোন কাজ ছিল কি?”

কুণ্ঠিতা হইয়া প্রগতি বলিল, “স্কুলে আমি ছিলাম না।  
স্কুলের একটি মেরের বড্ড অস্থখ করেছে শুনে তাকে দেখতে  
তাদের বাড়ীতে গিয়েছিলুম, সেখানেই এতক্ষণ দেরী হ’ল।”

শরৎ বলিলেন, “কি অস্থখ?”

প্রগতি উত্তর দিল, “জ্বর আর তার সঙ্গে সর্দিও বেশ  
আছে। তারা ভারি গরীব, এমন অবস্থা নয় যে ডাক্তার এনে  
চিকিৎসা করায়। দিন গেলে খেতে পায় না,—

ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া শরৎ বলিলেন, “খেতে পায় না?”

প্রগতি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তাই বই কি?”

শরৎ বলিলেন, “তাদের নামটা জানতে পারি কি?”

প্রগতি বলিল, “মেরেটির বাপের নাম হরিসাধন ঘোষ।”

শরৎ অন্তমনস্কভাবে বলিলেন, “হরি ঘোষ? তাঁকে  
আমি চিনি। আমার কাছে তিনি দু’তিন দিন গিয়েছিলেন,  
কিন্তু তাঁর মুখে একটি কথাও শুনতে পাই নি। সম্ভব  
তিনি কিছু সাহায্য চাইবার প্রত্যাশাতেই গিয়েছিলেন, কিন্তু  
আমি নিজে তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নি, কেউ  
কোন কথা আমায় জানায়ও নি। আপনার মুখে এখন  
শুনে বরুছি কতখানি আশা নিয়ে তিনি আমার কাছে  
যেতেন, বলতে না পেরে কতখানি ব্যর্থতা নিয়ে প্রত্যাহ  
ফিরিতেন।”

প্রগতি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তিনি ভারী  
গরীব, তাঁকে সাহায্য করলে বাস্তবিকই একটা বখাৰ্জ কাজ  
হয়। আমি গিয়ে তাঁর ছোট মেরেটির মুখে চুপি চুপি  
শুনতে পেলুম, আজ তাঁরা মোটেই খেতে পান নি। এমন

নাকি তাদের প্রায়ই হয়ে থাকে। পাশে অনেক ভদ্র-লোকেরই বাড়ী আছে, তাঁরা এই হুঃস্থদের দিকে চাইতে একেবারেই উদাসীন। সামনে একটি অভুক্ত পরিবার রেখে তাঁরা যে কি করে খেতে পারেন, আমি তাই ভাবি।”

শরৎ একটু হাসিয়া বলিলেন, “কিন্তু এই রকমই তো আবহমানকাল পর্যন্ত ঘটে আসছে, মিস বোস। কেউ বা পেট ভরে খেয়েও কত আহার্য পথের কুকুর ডেকে খাওয়াচ্ছে, কেউ বা একমুঠো খাবার জন্তে হাহাঙ্কার করে ফিরছে। এ যে ভগবানের দত্ত দান, স্তরতাৎ এর কিছুতেই পরিবর্তন হতে পারে না। সামনে দেখতেও পাচ্ছেন তাই তো।”

প্রণতি ঘুণার সুরে বলিল, “ভগবানের দান বলবেন না, এ কথা বললে ভগবানের অবমাননা করা হয়। বলুন—মানুষের হৃদয়ের নিকট বৃত্তি এটা। মানুষ ইচ্ছে করলে দেবতা হতে পারে, আবার ইচ্ছে করলে সন্ন্যাসীও হতে পারে। কিন্তু হুনিয়ার বিশেষ এই যে—দেবতা হতে পারে খুব কম লোকে, কারণ তাতে একটু বেশী রকম স্বার্থশূভতার দরকার, তাতে নিজের দিকে লোকসানের ভাগটাই বেশী থাকে, কাজেই লাভ যে দিকে মানুষ সেই দিকেই যায়। আচ্ছা, বহুন একটু, আমি আসছি।”

ক্ষিপ্ৰপদে সে বারাণ্ডা ঘুরিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। মুখ্য বিম্বরে শরৎ তাহার গমনপথের পানে চাহিয়া তাহার কথাই ভাবিতে লাগিলেন।

মেয়েটির স্বভাব সত্যই বড় সুন্দর। অসঙ্কোচে নিজের মতটা—যাহা সে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিতে একটুও দ্বিধা রাখে না,—তা ইহাতে যাহার যাহা খুসী সে তাহাই ভাবুক। ইহার মনটা বেশ সরল, সতেজ, কোথাও একটু কৃত্তিত ভাব নাই, যেখানে তাহার কোনও কথা ঠেকিয়া যাইতে পারে। শরৎ অনেক মেয়ে দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন শাস্ত, নম্র অথচ নিজের সত্যমত প্রচারে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মেয়ে আর একটিও তাঁহার চোখে পড়ে নাই। নিজের আত্মমর্যাদা অটুট রাখিয়া সে এখন সকলেরই সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে, কোনও সঙ্কীর্ণতার জ্ঞান তাহাকে ঠেকিয়া যাইতে হয় না।

একটু বাদেই প্রণতি ফিরিয়া আসিল। স্কুলের কাপড়

জামা ছাড়িয়া ফেলিয়া সে যত সম্ভব পারিয়াছে চলিয়া আসিয়াছে। একখান চেরার টানিয়া লইয়া একটু তফাতে বসিয়া সে বলিল, ‘কিন্তু—আপনি হঠাৎ এখানে এমন সময়ে এসেছেন কেন তা জিজ্ঞাসা করতে আমি একেবারেই ভুলে গেছি।’

শরৎ গম্ভীরমুখে বলিলেন, “আপনি যদি জিজ্ঞাসা করতে একেবারেই ভুলে যেতেন তাও আমার বলতেই হত, কারণ গরজটা আমারই। জানেন তো বার গরজ বেশী, আগ্রহও তার অনেক বেশী। গরজ বড় বালাই, মিস বোস,—বার নেই, সে বেঁচেছে।”

তাঁহার কথাবলার ধরণ দেখিয়া প্রণতির হাসি আসিতে-ছিল; সে হাসি দমন করিয়া ফেলিয়া সে বলিল, “আপনার কি গরজ তাই বলুন। আমার মত সামান্য একটা টিচারের কাছে আপনাকে গরজের বালাই বয়ে নিয়ে আসতে হয় এইটেই ভারি আশ্চর্য বলে আমার কাছে ঠেকছে।”

শরৎ খানিক ইঁা করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, “দেখুন, ওই অতিরিক্ত বিনয়যুক্ত কথাগুলো আপনাকে ছাড়তে হবে। আপনি সামান্য টিচার, আর আমি মহামাত্র জমিদার, এ কথাগুলো এ রকম জারগার প্রযোজ্য হতে পারে না। আমি বলছি,—যখন জমি জমা নিয়ে কোনও দরকার পড়বে তখন আপনি আমার মহামাত্র জমিদার মনে করে আমার দরবারে যাবেন, অল্প সময়ে সামান্য মানুষ হিসাবেই দেখবেন। আমিও জানি আর আপনিও জানেন, প্রজ্ঞা হিসাবে আপনাকে কখনই আমার সামনে যেতে হবে না।”

এবার প্রণতি স্পষ্টই হাসিয়া ফেলিল। শরৎ একটু হাসিয়া বলিলেন, “হাসছেন যে, - ?”

প্রণতি বলিল, “আপনার কথা শুনে।”

শরৎ বলিলেন, “না, সত্যই আমি যা বলছি তা ঠিক। বেশ জানবেন মিস বোস, সংসারের স্নেহভাজন যদি কোথাও প্রকৃত স্নেহের আশ্রয় পায়, সে জায়গা আর সে ছাড়তে পারে না। তার চাওয়ার চেয়েও অনেক অসঙ্গত দাবী সে করে বসে থাকে—বিনি কখনও তাকে একটু স্নেহ দেখিয়ে-ছেন তিনি বিরক্ত হয়ে ওঠেন; শেষে বাধ্য হয়ে তাঁকে

বলতে হয়—ছেড়ে দাও, নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। এই দেখুন না আপনি আমার একটু ভাল কথা বলেছেন আমি ভাবছি আমি বুঝি আকাশের চাঁদখানাকেই হাত পেতে নিতে পেরেছি, আর অমন সঙ্গে সঙ্গে একটা আরজি পেশ করতেও এসেছি। আপনি এতে বিরক্ত হবেন নিশ্চয়ই—”

বাধা দিয়া শশবাস্তে প্রণতি বলিয়া উঠিল, “বিরক্ত হব অমন কথা বলবেন না। আমি আপনার সব কথা শুনব— যদি আপনি মুখ ফুটে বলতে পারেন।”

কথাটা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল। ছিঃ, কাহাকে কি বলিতেছে তাহার ঠিক নাই; তাহার কথা শুলা যেন সকল দূরত্ব ঘুচাইতে চাহিতেছে।

শরৎ তাহার কুণ্ঠিত ভাবটা অতি সহজে ধরিতে পারিলেন। স্বভাবতঃ শাস্ত্র মুখে তিনি বলিলেন, “কথাটা যা বলেছেন তাতে সন্দেহের কোন হেতু নেই, কিন্তু তাই বলে আপনার অনর্থক লাল হয়ে উঠবার হেতু থাকতে পারে বলেও মনে হয় না মিস বোস। আপনি তো জানেনই আমি কতটা সঙ্কোচে, কুণ্ঠায় নিজেকে গুটিয়ে রাখি, অনেক কথা বলতে গিয়ে বলতে পারিনে, সে শুভো আমার মুখে এসে ফিরে যায়। কিন্তু আজ সে রকম হবে না মিস বোস, কথা আমার ফুটিয়ে তুলতেই হবে, যেহেতু সঙ্কোচ লজ্জা অশ্রু সময় দরকারে এলোও এ সময়ে অপকারই সাধন করবে। আমি বড় বিপদগ্রস্ত, আমার সে বিপদ হতে উদ্ধার করতে আপনি বই আর কেউ নেই। মাগিককে দেখেছেন তো?”

সেই শিশুটির কথা প্রণতির মনেই ছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার দীপ্তিহীন করুণ মুখখানা সে অন্তরচ্যুত করিতে পারে নাই। সে উত্তর দিল, “দেখোছি বই কি।”

শরৎ বলিলেন, “তার তার আপনাকে যদি আমি দিতে চাই, নিতে পারবেন কি?”

প্রণতি এক মুহূর্ত্ত নীরব রহিল। একবার ভাবিয়া লইল এই শিশুটিকে লইয়া শরৎকে কতখানি বিব্রত হইয়া উঠিতে হয়, সকল কাজের মধ্যে সেই শিশুটির চিন্তা মনে জাগিয়া থাকে।

সে রাজি হইয়া গেল, বলিল, “আমি তাকে নিতে রাজি

আছি কিন্তু আপনি যে তাকে এখন এমনভাবে বিলিয়ে দিচ্ছেন, কোথাও যাবেন কি?”

অশ্রুমনস্কভাবে শরৎ উত্তর দিলেন, “হাঁ, আমার উপস্থিত কিছু দিনের জন্তে পশ্চিমে যেতে হচ্ছে। বেশী দিনের জন্তে নয়, মাস খানেকের জন্তে ছেলেটিকে আপনার হাতে দিয়ে যাব, এই মাসখানেক আপনাকে একে দেখতেই হবে। আমি যে এ বোঝা মাথায় করে নিয়ে যাব তার গো নেই। ছেলেটা যেমন ছুটী তেমনি নোংরা। নিজের বাড়ীতেই তাকে আমি শাসন করে রাখতে পারিনে, বিদেশে পড়ের কাছে নিয়ে যাব কি করে? আজই সকালে এমন কাণ্ড করে বসেছে যা শুনলে আপনি পর্যাস্ত হাসবেন। আপনাকে তাই আজ হতে বলে রাখছি, সে কিন্তু কোন কথাই বলবে না। পেটের ব্যারামেই সে ছেলেটা গেল, আর লোভও আছে তার তেমনি। খেতে দিন বা না দিন সে চুরি করে খাবেই, - তা আপনার ঘরে যা থাক না কেন। আর রাত ছপুরে তার ধাক্কা সামলাতে আমার চাকরগুলোর প্রাণান্ত হয়ে যায়।”

প্রণতি বলিল, “আমার বাপুয়া আছে, ছ’জনে আমরা তাকে দেখব। আপনি যা বলছেন তা বথার্থই বটে। দেখুন ছোট বেলা হ’তে মায়ের স্নেহ না পেলে ছেলেপুলেরা এমনি হয়ে যায়, তারা সংসারের সকল শোভার আকর হয়েও অসীম দুঃখের হেতু হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষে কতদূর যত্ন করতে পারে, কতটা আর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারে? আপনাদের কাজ বাইরে, ছেলেপুলে কেমন করে মানুষ করতে হয় আপনারা তার কি জানবেন? তারা কতটা খেতে পারে সে আন্দাজ না রেখে কতকটা গিলিয়ে দেন; যখন ক্ষিধে না থাকে, চোখের লোভে পড়ে তারা তখনও গিলে যায়, তারই ফলে অজীর্ণ, উদরায়মে ভোগে। আপনাকে আমি এরজন্তে অপরাধি করছি নে, আপনি যা করেছেন তা খুবই হয়েছে, অনেকে এ রকম পারেন না। আপনি তাকে আমার কাছে রেখে যান, মাসখানেক বাদে ফিরে তাকে দেখবেন অশ্রু ভাবে। চুরি করে খাবার কথা বলেছেন, সেটাও এই কারণেই হয়। রোগে ভুগে ভুগে বড় মানুষেরই লোভ হয়, তারাও না পেলে চুরি করে খেতে ভোলে না, ও তো ছেলে



মাহুয। আপনি ওষুধের বন্দোবস্ত করে দিয়ে যাবেন, আমি তার আর সব ভার নেব।”

শরৎ কৃতজ্ঞনেত্র তাহার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিলেন, “আপনি আমাকে বাঁচালেন। এই অস্পৃশ্য ছেলেটার তার ছনিয়ার আর কেউ নিতে চায় না, এতে আমি যে কি পর্যন্ত কষ্ট পাই তা আর কি বলব। এখন দেখছি ছনিয়ার আপনার মত লোকও আছে যে ঠঃস্থকে অস্পৃশ্য ভেদেও গ্রহণ করতে সক্ষম হইয়াছে।”

প্রণতি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল, কি বলিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। তাহার কুণ্ঠিত লজ্জিত মুখখানার পানে তাকাইয়া শরৎ বলিলেন, “আপনার প্রশংসা করছি বলে আপনি বড় লজ্জিত হইয়া উঠছেন। আপনাকে লজ্জা দেওয়া আমার ইচ্ছে নয়। বাধ্য হয়ে আপনার প্রকৃত গুণটা আমার মুখ দিয়ে বার করতে হ’ল, সেজন্য মাপ করবেন। আমি কাল ভোরেই রওনা হব, আজই তাহলে মাণিককে পাঠিয়ে দেব গিয়ে। আমি হিরণ্ময় বাবুকে বলে যাব, তিনি প্রত্যহ সকালে—যখন আপনি বাড়ী থাকবেন তখন এসে মাণিককে দেখে ওষুধ দিয়ে যাবেন। আর তার থাকার জন্তে কিছু খরচ এনেছি; জানি—এতে আপনাকে আরও বেশী রকম লজ্জা দেওয়া হবে,—তবু কি জানেন,—আমি—”

তিনি নোটের তাড়া পকেট হইতে বাহির করিতেই প্রণতি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—“না না; মাপ করবেন, আমি তার জন্তে এক পরসাদও নেব না। ও টাকা আপনি কিরিয়ে নিয়ে যান, আমার দরকার নেই।”

শরৎ বলিলেন, “আপনি নিতে চাইবেন না তা আমি জানি মিস বোস। কিন্তু আমারও তো কর্তব্য আছে একটা। আপনি স্থূল হতে অতি সামান্যই বেতন পান, এতে কোনক্রমে আপনার চলে মাত্র, এই ছেলেটাকে খাওয়াবেন কোথা হতে?”

প্রণতি বলিল, “সে বতই কম বেতন হোক না, তবু আমি ওই ছেলেটির জন্য টাকা নিতে পারব না। মনে করুন, তার বাপ যদি আপনার কাছে ছেলেটিকে না দিয়ে আমারই কাছে আনত, আমাকেই তো তাকে নিতে হতো।

আমার যদি একটি ভাই কি বোন থাকত, আমার কি তাকে এনে পুষতে হতো না? আপনাকে কি তার জন্তে আমার নুতন খরচ দিতে হতো? এও মনে করুন তেমনি। মনে করুন, এ আমার সেই ছোট ভাই, আমার কাছে সে থাকবে তার জন্তে আপনার কিছু দেওয়ার কথা মুখে আনাই অজায়।”

নোটের তাড়াটা হাতে লইয়া একান্ত নিরুপায় ভাবে শরৎ বলিলেন, “তবে এ গুলো দিয়ে কি করব এখন?”

প্রণতি বিস্মিত হইয়া বলিল, “টাকা রাখবার জায়গা পাচ্ছেন না, বড় সাংঘাতিক কথা তো হবে।”

শরৎ হাসিলেন, পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “সাংঘাতিক কথাই বটে। মাতালের হাতে টাকা বেশীক্ষণ থাকে না, সেটা বোধ হয় আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। দেখুন, আমি নিজে মাতাল সেই জন্তেই মাতালকে আন্তরিক ঘৃণা করি। পথে এই টাকা নিয়ে যেতে যেতেই সমতান এসে মাথায় চাপবে, তারপর—তারপর দেখব আমার হাতে একটা আখলাও নেই, রিক্ত হাতেই বাড়ী ফিরে গেছি।”

প্রণতি একটু ভাবিয়া বলিল, “তবে এক কাজ করুন না কেন? যখন এমন অবস্থা আপনার, তখন এ টাকাটা সেই অভুক্ত পরিবারকেই দিয়ে যান না। তারা খেয়ে বাঁচবে, ভগবানও আপনার মঙ্গল করবেন।”

হাসিয়া শরৎ বলিলেন, “শেষের কথাটা ছেড়ে দিন, ভগবান আমার বা মঙ্গল করছেন তা আমি পদে পদে দেখতে পাচ্ছি। আমি কোন দিনই নিজকে বিশ্বাস করিনি, নিজের ভার সম্পূর্ণরূপে ভগবানের ‘পরে ফেলে দিয়েছিলুম, তিনি বড় বিশ্বাসী মত কাজ করেছেন, একে একে আমার সবই কেড়ে নিয়েছেন। আমার এমন জায়গায় এনে ফেলেছেন সেখানকার কথা মনে হলে আমিই ঘৃণার সঙ্কুচিত হয়ে উঠি। ভগবানের মঙ্গলের কথা আর বলবেন না মিস বোস, তিনি অশেষ কল্যাণময়—তাই আজ আমি সৌভাগ্যের তুলে উঠেও একেবারে নীচে গড়িয়ে পড়েছি। আজ আমার কি এমনই অবস্থা হতো মিস বোস,—আমিও যে আজ একটা মাহুয, কতখানি উপরে উঠতে পারতুম, লোকে আমার কাছ হতে তাকে পাওয়ার আশাই করেছে।

আমি যে আজ স্থগিত, অপসারণ, এর জন্তে দায়ী কে বলুন দেখি!”

প্রণতি শান্ত কণ্ঠে বলিল, “দায়ী আপনি নিজে। ভগবান আপনার সামনে সরল পথ বিস্তৃত করে রেখেছেন, কিন্তু আপনি সে পথে না গিয়ে যে পথটা বাঁকা, বিপদসঙ্কুল সেই পথে চলেছেন। এতে দোষ কার,—আপনার না ভগবানের বলুন দেখি? আপনি সব বুঝেও ভগবানের ‘পরে’ দোষ চাপাচ্ছেন এইটাই তারি কষ্টের কথা। ভগবান আপনাকে দেন নি কি, তাই বলুন দেখি? আপনার জ্ঞান দিয়েছেন যাতে ভাল মন্দ বিচার করতে পারেন, বুদ্ধি দিয়েছেন—বিবেচনা করতে পারেন, চোখ, কান, কথা বলার শক্তি, নাক সব দিয়েছেন যাতে আপনি নিজে সব দেখতে পান, শুনে পান, কথা বলে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন? আপনাকে অটুট স্বাস্থ্য দিয়েছেন, আপনাকে কোন অঙ্গহীন করেনি, সব থাকতেও আপনি যদি সন্যাসবাহার না করতে পারেন, সে দোষ কার তাই বলুন দেখি! আপনি দরিদ্রের ঘরে জন্মান নি, ধনীর ঘরে জন্মেছেন, খনের সন্যাসবাহার করবার জন্তেই নয় কি? এ রকম ভাবে নষ্ট করবার জন্তে কখনই নয়, কিন্তু আপনি নিজের দোষে নিজে অধঃপাতে যাচ্ছেন যে। এর জন্তে দোষ দিন নিজেকে, ভগবানকে দোষ দেবেন না। মানুষের আয়ু অবশ্য সীমাবদ্ধ, কিন্তু সে যদি দুর্জয় করে তার নিজের দেহকে চিরকল্প করে কেলে সে দোষ কারও নয়, নিজের।”

শরৎ টেবিলের উপর দুই কলসী রাখিয়া দুই করতলের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন।

প্রণতি বলিতে লাগিল, “আপনি বতটা হতাশ হয়ে পড়েছেন এতটা হতাশ হয়ে পড়বার কোন কারণ নেই, কেন না, যদি ভাল হওয়ার ইচ্ছা করেন, এখনও চের সময় আছে ভাল হতে পারেন। কত লোক প্রথমে আপনার মত থাকে, তারাই এত ভাল হয় যে লোকে তাদের পায়ের খুলো নিয়ে মাথার দেয়।”

শরৎ মুখ তুলিলেন, ক্লিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, “এত ভাল আমি হতে চাই নে, মিস বোস, কতকটা হতে পারলে ধিষ্ট। আপনি আমার উপকারী বন্ধুর মত কথা বলছেন,

যদি ভাল হতে পারি তবে আপনার উপদেশই হতে পারব। যদি ভাল নাও হতে পারি, আপনার কথা আমি জীবনে ভুলব না, কারণ সংসারে এলে আপনার কাছে ছাড়া ভাল হওয়ার উপদেশ আর কারও কাছে পাইনি। বাক, ছেড়ে দিন ওসব কথা, একটা কথার অনেক কথা এলে পড়েছে। টাকা আপনার কাছে রইল, আপনি তাদের পাঠিয়ে দেবেন।”

প্রণতি বলিল, “আমি আপনার এ অন্তর আশ্রয়ের প্রস্তর দিতে পারব না। আপনার নাম করে আমি যদি তাদের টাকা দিতে চাই, সহজেই লোকে একটা কথা বলে বসবে; আশা করছি সে কথা আমাকে আপনি শুনে দেবেন না।”

শরৎ যেন অকস্মাৎ সচেতন হইয়া উঠিলেন, তন্তু ভাবে নোট লইয়া পটে রাখিতে রাখিতে বলিলেন, “ঠিক কথাই বলেছেন, আমার এ কথা মোটেই মনে হয়নি। আচ্ছা, আমিই নিয়ে যাচ্ছি, যাওয়ার পথে তাদের দিয়ে যাব এখন। বাড়ীতে আর এ টাকা নিয়ে যাব না সে কথা ঠিক।”

তিনি উঠিলেন।

প্রণতিও উঠিল। তাঁহার পিছনে চলিতে চলিতে বলিল, “তাই দিয়ে যাবেন। আর বাড়ী গিয়েই ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেবেন, ভুলে যাবেন না যেন।”

“ভুলব?” শরৎ ফিরিয়া ঈড়াইলেন, হঠাৎ প্রণতির একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবেগক্লান্ত কণ্ঠে বলিলেন, “কখনই ভুলব না মিস বোস, আপনার এ দয়ার কথা আমি জীবনে ভুলব না।”

প্রণতি কম্পিত হাতখানা টানিয়া লইবার পূর্বে শরৎ সেই স্নান হাতখানা গুঁটে স্পর্শ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, প্রণতি চকিতে অনেকটা পিছনে সরিয়া গেল।

কৃতজ্ঞ শরৎ বলিলেন, “আবার একমাস পরে কিরে এলে দেখা হবে, একমাসের মত বিদায় নিলুম।”

হাসিয়া তাহার পর বলিল, “এলে দেখব এই দুর্দান্ত ছেলেটাকে কেমন করে বশে আনতে পেরেছেন। আপনার পরিচয় এইবারই বিশেষ রকম পাওয়া যাবে।”

মিস বোস হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি তাহার মুখে ফুটিল না।

শরৎ চলিয়া গেলেন।

প্রগতি ফিরিয়া আসিয়া একথানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। হাতের বেথানে শরৎ ওষ্ঠের স্পর্শ দিয়াছিলেন সেখানটা যেন জলিয়া বাইতেছিল। প্রগতি পলকহীন নেত্রে হাতের পানে তাকাইয়া রহিল।

হৃদয়ে তাহার যে তৃফান উঠিয়াছিল বাহিরে তাহার লেশমাত্র প্রকাশ পায় নাই।

সন্ধ্যার সময়ে মণিক আসিয়া পঁহছিল। বাপুয়া মহানন্দে তাহার এই ক্ষুদ্র বস্তুটাকে গ্রহণ করিল; তাহার উৎসাহ দেখে কে? কিন্তু প্রগতি যতটা আনন্দ পাইবে ভাবিয়াছিল, ততটা আনন্দ কিছুতেই লাভ করিতে পারিল না, তাহার হৃদয় যেন গুরুভারে অবসর হইয়া রহিল।

( ৯ )

শরৎ চলিয়া বাইবার কয়েকদিন পরে ইন্দুরাণীর ভাই মণীশ আসিয়া উপস্থিত হইল।

সে ইন্দুর চেরে কয়েক বৎসরের ছোট হইলেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল বেশী। ইন্দু জানিত তাহার ভাইয়ের মত বুদ্ধি জ্ঞান আর কাহারও নাই।

ছেলেটা পাতলা ছিপছিপে ধরণের কবি প্রকৃতির লোক। বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, পরীক্ষা দিয়া পাস করিতে পারে নাই, সেটা অতিরিক্ত কাব্য-প্রিয়তার জন্ত। কোন কাজেই মাথা স্থির রাখিতে পারে না, এক কাজ করিতে আর একটা ভাবে, কাজেই হাতের কাজ মধ্য পথে থামিয়া যায়। কয়েকখানা মাসিক পত্রিকার ইতিমধ্যে তাহার প্রকাশিত কয়েকটা কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সে বন্ধুসমাজে কবি আখ্যা লাভ করিয়াছিল।

এখানে আসিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, ভাবিয়াছিল নিশ্চিন্তভাবে এবার সে কাব্যালোচনা করিতে পারিবে, কোন দিককার গুণগোলের মধ্যে তাহাকে পড়িতে হইবে না। নিৰ্ব্বাণ্টে সে ছুইটা খাইবে আর দিনরাত লিখিবে।

কিন্তু এখানে আসিয়া দিদির মুখে যাহা শুনিল তাহাতেই তাহার হৃদয়ের আশা মিলাইয়া গেল। সে খানিক গুম হইয়া বসিয়া রহিল। সে চিরদিন দারিদ্র্যে দিন বাপন করিয়াছে, ভাবিয়াছিল দিদির কাছে আসিয়া একটু বাবুয়ানা করিবে;

হু'পাঁচজন বন্ধুকে আনিয়া নিজের প্রভুত্ব দেখাইবে। এখন দেখিল তাহার প্রভুত্ব সাজিবে না, একজন আছে যে বাধা দিবে।

অভিমান, দুঃখে চোখের জল মুছিয়া ইন্দু বলিল, “বুঝেছিস মণি, সে আমাদেরই গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে চায়না, খুব নীচু হয়ে এসে ক্রমে ক্রমে উচু হয়ে উঠেছে, এখন অবাধ প্রভুত্ব করে নিচ্ছে। আমি জমিদার, সম্পত্তিতে আমারও ছয় আনা অংশ আছে, কিন্তু সে নাকি ইচ্ছা করলে আমার এ দাবী অগ্রাহ্য করতে পারে, হয় তো এমন সব প্রমাণ এনে ফেলবে যাতে আমার এ সম্পত্তির কিছুতেই দাবী থাকবে না। বল দেখি, তাই কি হতে পারে, সত্যিই কি তাই ও করতে পারে?”

শুধু হাসিয়া মণি বলিল, “এও কি একটা কথা হতে পারে দিদি? কে তোমার এই সব কথা বলে ভয় দেখিয়েছে দেখছি। তুমি আলাদা সে আলাদা তোমার আমার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি তাই বল দেখি।”

ইন্দু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “বলাতো সহজ ভাই, কিন্তু আমার মনে হয় সে সব করতে পারে। কে সে? এই প্রশ্নের এমন একটা উত্তর পাওয়া যায়, যার পরে আর কোন কথা বলতে পারা যায় না।”

মণীশ বলিল, “কি সে উত্তর?”

ইন্দু বলিল, “ব্যথার্থ: সেই সব বিষয়ের উত্তরাধিকারী, আমার এতে কোন অধিকার নেই কারণ আমি সন্তানহীন বিধবা। যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন এই ছয় আনা বিষয় ভোগ করতে পারব তার পর সবই তার।”

মণীশ বলিল, “তাইতেই তুমি ভয় পাচ্ছে?”

ইন্দু বলিল, “ভয় পাইনি, তবে একটু ভাবনা হয় বটে।”

মণীশ অবহেলার সহিত বলিল, “যেয়ে কিনা তাই জল্পেতেই ভেঙ্গে পড়। বেশকথা, যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে সম্পত্তি তোমার; এখন তুমিতো ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পার।”

ইন্দু বলিল, “তা হওয়ার দো নেই। সন্তানহীন বিধবার অভিভাবকরূপে দাঁড়িয়েছে সে,—সে জানিয়েছে আমি হয় তো বা তা করে সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলব সেইজন্য

সে অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে আমার পানে চেয়ে আছে তার মতামুসারে না চললে সে নাকি তার সম্পত্তি হতে আমার বঞ্চিত করবে, সে অধিকার তার আছে। শুনেছি নাকি আমার স্বামীর এ সম্পত্তিতে কিছুমাত্র অধিকার ছিল না, শরতের বাপ দয়া করে জীবন সৰ্ত্তে তাঁকে এই ছয় আনা বিষয় ভোগ করতে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সবই শেষ হয়ে যেত, শরৎ দয়া করে আমার জীবন সৰ্ত্ত দিয়েছে অর্থাৎ এর এতটুকু কিঞ্চিৎ অপব্যয় করতে পারব না, যখন যা করতে হবে তার অমুযতি নিয়ে করতে হবে, অথচ আমি ছয় আনি জমীদার গ্রামে প্রসিদ্ধ থাকব। আমি বেঁচে থাকতে অবিবাহিত বা নিঃসন্তান অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয় তবে আমি দশজনকে ডেকে আমার সম্পত্তি যা খুসি তাই করতে পারি। যত দিন সে বর্তমান থাকবে ততদিন কিছু করবার অধিকার আমার নেই।”

মণিশ খানিকটা গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া তাহার পর বলিল, “সবই তো পাকা বন্দোবস্ত হয়ে রয়েছে, তবে আমার টেলিগ্রাম করে আনার দরকার কি ছিল? আমি ভেবেছিলুম না জানি কি ভয়ানক কাণ্ডই বেধে গেছে, সেই জন্তে ছুটে এসেছি।”

রাগ করিয়া ইন্দু বলিল, “পাকা বন্দোবস্ত কিসের? এত কাল আমি সম্পত্তির মালিক হয়ে ভোগ করে এসেছি আজ ওর কথাতে আমি এত সহজে এমন ভাবে এর সৰ্ত্ত ছেড়ে দেব, এই কথাতে রাজি হয়ে যাব?”

মণিশ হতাশ ভাবে বলিল, “তা আমি কি করব?”

ইন্দু বলিল, “শোন কথা একবার, - বলে আমি কি করব? তুই যে পুরুষ মানুষ যে, তুই যা পারবি, আমি কি আর তাই পারব, নইলে তোরে আনারই বা আমার কি দরকার ছিল?”

মণিশ বলিল, “এখন আমার কি করতে হবে তাই আগে বল তো, তারপর যা ভাববার, করবার তা আমি ভেবে করব এখন।”

ইন্দু বলিল, “শরতের ম্যানেজার আছেন শ্রীনাথ কর, অবশ্য তিনি আমার লম্ব পদামর্শ দিলেও আমি তাঁতে বিশ্বাস

করতে পারিনি,—পারবও না। যে নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে মুনিবকে বিপদগ্রস্ত করতে পেছনে হটে না, আমার সহায়হীনা দেখে এর পর আমারও তো সর্বনাশ করবে। সে নাকি বড় চালাক তাই আমার দিয়ে শরতের সর্বনাশ করিয়ে শেষকালে আমার সর্বনাশ করতে চায়। এরকম প্রকৃতির লোককে আমি কিছুতেই পছন্দ করিনে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্তে এরা সবই করতে পারে, অসাধ্য কিছু ছিনিয়ায় নেই। তবু লোকটাকে হাতে রাখতে হবে, কেন না আমার অনেক কিছু প্রমাণ এরই হাতে; আগে শরৎকে জব্ব করে তারপর একে জব্ব করতে বেশীক্ষণ লাগবে না। তুই বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, সব বুঝিস, সব বুঝে কাজ করতে পারবি এ আশা আমার আছে, সেই জন্তেই তোকে এনেছি।”

মণীশ মাথা চুলকাইয়া বলিল, “কিন্তু তুমি তো জানো দিদি, আমি বেশী গুণগোল পছন্দ করিনে, একটু নির্জনতা পছন্দ করি। যাই হোক, তোমার কাজটা শেষ করে দিলে আমার কিন্তু সেই নির্জনতাটুকু দিতে হবে। তোমার কিছু ভাবতে হবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক, জীবন পণ করে তোমার কাজ শেষ করে দেব তুমি আগে একটা কাজ করো; একখানা দরখাস্ত লিখে ফেল, সেই দরখাস্তখানা আমি দাখিল করে দেব, যাতে শরৎকে জব্ব করতে পারি তার চেষ্টা করব। তোমায় মেয়ে মানুষ পেয়েছে, বেশ চোখ রাঙিয়ে শাসন ক’রে নিচ্ছে, এখন আর সহজে তা করতে হচ্ছে না।”

উৎসাহিত ভাবে ইন্দু বলিল, “তাই কর ভাই, ওকে একটু ভাল রকম করে জানাতে হবে—কথায় কথায় চোখ রাঙাণীর ধার আমি ধারি নে। হলই বা সে দশ আনি আমি ছয় আনি। সে আমার কে, কোন অধিকারে সে আমার অভিভাবক হতে চায়?”

মণীশ বলিল, “বোসো, এই তো সবে এলুম, দুদিন বেতে দাও, চাল চলনটা আগে বুঝে নেই। কাউকে জব্ব করার ইচ্ছে যদি হয়, জব্ব করতে বড় বেশীক্ষণ দেবী হয় না তা জানো? যতদূর শুনেছি তাতে জেনেছি শরতের অন্তরঙ্গ বন্ধু এখানে কেউ নেই, সকলেই তাহাকে অন্ন বিস্তার বিষেবের চোখে দেখছে। দেখবে নাই বা কেন?

যারা কর্মচারী তারা মনে ভাবে মনিব দূরে থাক, তা হলে তাদের এই সুবিধা হয় যে নিজেদের ইচ্ছামত তারা জিনিষ লুটতে পারে। শরৎ এখানে আসার যাদের অল্পবিস্তর স্বার্থহানি হয়েছে তারাই তার উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে। রাগ কোর না দিদি, আমি তোমার কথা বলছি নে, তুমি যেন ভেব না, আমি তোমায় উদ্দেশ্য করে এসব কথা বলছি। জগৎটাই যে স্বার্থ-ভরা তাই যার স্বার্থে আঘাত পড়ে সেই বিরক্ত হয়, রাগ করে। এইসব স্বার্থ পর লোকদের দিয়েই অনেক কাজ পাব, তা তুমি দেখে নিয়ো। যে আশুপ জালাব সে আশুপে ইন্ধন যোগাবে এরাই। যেমন করেই হোক, শরৎকে আগে এখান হতে সরাতে হবে, তারপর আস্তে আস্তে সব দিক গেঁথে ফেলতে হবে। শরৎ এখানে থাকতে বিশেষ কিছু কাজ যে হবে তা বোধ হয় না।”

ইন্দু বলিল, “সে কথা সত্যি, এমন ভীকু দৃষ্টি লোক খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়, চারদিকে চোক রয়েছে, কারও কিছু করবার যো নেই। ভারি সতর্ক লোক, যে কাজ করে তা কাঁচা নয়।”

মনীশ বলিল, “তুমি বলছ বাড়ী নেই, কোথায় গেল?”

ইন্দু নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, “কে জানে, আমরা কি কোন কথা শুনেতে দেয়, আমি যে গুর শত্রু। একটা বাষাঙ্গি, মা টাড়া—কার ছেলে রেখেছিল কাছে, যাওয়ার আগের দিন আমরা সেই ছোঁড়াটাকে দিতে এসে ছিলাম। মাগো, আমি সেই বাগদী ছোঁড়াকে নেব, মনে করলেও গায়ে কাঁটা দেয়।”

মনীশ বলিল, “তারপর সে ছোঁড়ার কি হ’ল, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে বুঝি?”

ইন্দু বলিল, “না, কোথায় কার কাছে রেখে গেছে কে জানে? ঝির কাছে খবর পেলুম, এখানকার মেয়ে স্কুলের টিচার নাকি তাকে নিয়েছে। তা হতে পারে, ওরা জাতে খুঁটান, যা করে তা মানিয়ে যায়, তা বলে আমাদের কি মানায়? আমার পূজার্চনা আছে, সন্ধ্যাহিক আছে, ও ছোঁড়ার ছায়া মাড়ালে যে আমাদের স্বান করতে হয়।”

যুগায় ইন্দু বার কত শিহরিয়া উঠিল।

“আর শরতের কথা বলবি? তার কি জাত জন্ম কিছু আছে? খুঁটানদেরও সমাজ আছে, ধর্ম আছে, এর তা কিছু নেই। ভগবানের কথা বললে কাণে হাত চাপা দেয়, সে নামটা কাণে গেলেও তার যেন মহাপাপ হবে। ওর আবার জাত জন্ম, ওর তো সবই গেছে। ছিঃ ছিঃ, যেম্না ধরালে, বাপ পিতামহের নাম ডুবালে। জমীদার লোক কিনা, সবাই তবু খোসামোদ করে, নইলে টেঁকা দায় হতো। যদি অস্ত্র কেউ হতো, এতদিন একঘরে হয়ে থাকতে হতো।”

মনীশ চুপ করিয়া রহিল। কারণ এ বিষয়ে দিদির সহিত তাহার মতের মিল হইবে না ইহা জানিত সত্য কথা। সে ছিল কতকটা সেই প্রকৃতির যাহারা জাতি ও ধর্মকে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে না, অসৌম্যের মধ্যে যাহারা নিজেদের বিস্তার করিয়া দিতে চায়।

ভাইকে সব শুনাইয়া, সব বুঝাইয়া ইন্দু কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। এখন হইতে আর তাহাকে সতর্ক ভাবে থাকিতে হইবে না ইহাই তাহার বড় আনন্দের বিষয়।

( ক্রমশঃ )

## উপেক্ষিতা ।

শ্রীনীহারকুমারী দেবী

তরী যায়	ধীর বায়	যমুনায় বাহিয়ে,	সহে তাই	দেখ রাই	কারো কথা না মানে !
ঢেউগুলি	মাথা তুলি	খোঁজে কারে চাহিয়ে ?	বিরহিণী	উন্মাদিনী	ধৈর্য্যখানি টুটিয়া,
কালো জলে	নভঃতলে	ছায়াসম ভাসিয়া,	গিয়েছিল	বুঝি কিলো	মথুরায় ছুটিয়া ?
তরী চলে,	কোন ছলে	বায়ু বহে শ্বাসিয়া !	একবার	দুঃখভার	প্রিয়-পদে রাখিতে,
কেগো ধনি	রূপখানি	তরীখানি মাঝেতে ?	একবারে	সে নিঠুরে	নিজ চোখে দেখিতে !
বিরহিণী	কি রমণী	বিষাদিনী সাজেতে ?	কালিন্দীর	কালো নীর	আজো মনে পড়ে কি ?
অতি মিঠি	প্রেমদিটি	আঁখি দুটি ভরিয়া ;	তীরে তার	সে বিহার	আজিও সে স্মরে কি ?
কার তরে	হেন করে	ঝরে তাহে দরিয়া ?	হায় নারী	রীতি তারি	বুঝেও কি বুঝে না ?
ওলো এই	কিলো সেই	সোহাগিনী রাধিকা ?	সে যে আজ	কর্ম্মরাজ !	গত প্রেম কুঞ্জনা
বৃন্দাবন	সে মোহন	শ্যাম-প্রাণ-অধিকা ?	মনে তার	হয় আর	কভু স্থান পাবে কি ?
সে নিঠুর	যবে দূর	মথুরায় চলিয়া	বৃন্দাবন	দুঃস্বপন	ভিন্ন কিছু ভাবে কি ?
গেল তদ্	গত যত	গোপী-চিত ছলিয়া,	মথুরায়	তাই হায়	রাধিকায় সে নিঠুর
রাধিকার	দুঃখ ভার	সে কি আর বুঝে না ?	চিনিল না ;	বুঝিল না	হেলা তার কতদূর
রমণীর	নব নীর	হৃদি আর খোঁজে না ?	ভেদিল যে,	বধিল যে,	অসহায়া অবলা !
পরে বর্ষ	রাখে ধর্ম্ম	ধর্ম্ম আর নাহি চায়,	হের তাই	বহে রাই	চোখে নদী তরলা !
সখিগণে	জনে জনে	বলে তাই রাধিকায় !	মূর্ত্তিমতী	দুঃখ যেন	তরী পরে বসিয়া !
কত আর	দুঃখভার	স্বকুমার পরাণে	দুনিবার	অশ্রুধারে	যায় কবি ভাসিয়া

## পাপের ফল ।

শ্রীচিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমাকাশের লোহিত আভা তখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে মিলাইয়া যায় নাই। উৎসবাস্ত্রে উৎসব গৃহের দীপ যেমন একটা একটা করিয়া নিবাইয়া দেওয়া হয়, তরল অন্ধকার রাশি তেমনি করিয়া একটা একটা আলোকরেখা মুছিয়া দিতেছিল। বাহিরের বাগান হইতে হাসনাহানা ও লেভেণ্ডার চাপার

তীব্র গন্ধ যেন বাতাসটাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মাধুরী, জানালার ধারে বসিয়া একটা হারমোনিয়ামের চাবি টিপিতেছিল ; হঠাৎ আকুল কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—

ভোরের বেলা বকুল তলা ঘাট না সেই হতে

তুমি দাঁড়িয়ে থাক পথে ।

কি যে তুমি চাও বিদেশী, এসো কোথা হতে

কেন দাঁড়িয়ে থাক পথে !

দৃষ্টি তোমার মিষ্টি লাগে, ভুলে যাই যে স্মৃতিটাকে

আমি কাজ ফেলেও পাকে পাকে আসি গৃহ হ'তে

তুমি কও না কথা, মনের ব্যথা জানাও নয়নেতে

কেন দাঁড়িয়ে থাক পথে ?

বিকেল হলে এলো চুলে বসি যবে আয়না খুলে

তখন তুমি আপন ভুলে চাহ পিছন হতে

আমার মুখের পাশে, তোমার মুখটা হাসে

লাজ চাই যে গো মরিতে

কেন দাঁড়িয়ে থাক পথে ?

মাধুরী এমন তন্ময় হইয়া গান গাহিতেছিল যে, তার পিছনে যে তার স্বামী ইন্দ্রনাথ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তা সে বুঝতেই পারে নাই। ইন্দ্রনাথ মিনতির সুরে বলিল, “আর একবার গাও মাধুরী। এই একটা মাত্র গানের বাঁধনে আমি তোমার কাছে চিরদিনের জ্ঞা বাঁধা পড়েছি; সে বাঁধন আরো বেশী করে এঁটে দাও।”

লজ্জা-নন্দ কণ্ঠে মাধুরী বলিল, “অমন চোরের মতন দাঁড়িয়ে আছ কেন ? আমার লজ্জা করেনা বুঝি !”

ইন্দ্র। লজ্জা করে বলই তো সাড়া দি' নাই। আমার কাছে বসে গাইলে তোমার সুরে কি এ আকুলতা থাকত ? আচ্ছা, তিন মাস আগেকার কথা কিছু মনে পড়ে মাধুরী ?

মাধুরী। সে আর মনে পড়ে না—তোমার কীষ্টিকাহিনী ?

ইন্দ্র। তুমি রোজ বিকেলে ছাতে বসে পড়া কর্তে, আর আমিও রোজই ঠিক সেই সময়টাতে বই নিয়ে ছাতে উঠতাম, আর তোমার চাঁদমুখখানা অতৃপ্ত চোখে চেয়ে দেখতাম, বইয়ের আড়াল থেকে।

মাধুরী। আচ্ছা, তা যেন দেখতে; কিন্তু ভদ্রলোকের মেরেকে চিঠি ছুঁড়ে মেরেছিলে কোন সাহসে ? আর এত কথা লিখলেই বা কি করে ?

ইন্দ্র। আমার ঘাড়ে একটা ভূত চেপেছিল তখন; সেই আমাকে দিয়ে লেখালে সব। সত্যি মাধুরী, তখন যেন আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলেম। রোজ একবার করে

তোমায় না দেখলে থাকতে পারতুম না কিছুতেই। মনে হতো তুমি বুঝি অমৃত হয়ে পড়েছ, আরো কত কি।

মাধুরী। মাগো! যেদিন তুমি ছাত থেকে চিঠি ছুঁড়ে মারলে, আর তা আমার খোলা বইয়ের উপর এসে পড়লো, তা মনে কর্তে এখনো আমার গারে কাঁটা দিয়ে উঠে। যদি কেউ দেখতেই পেতো তা হলে কি মনে কর্তো, বলত ? প্রথম ভাবলুম, না পড়েই ছুঁড়ে ফেলে দি। তারপর মনে হলো যদি কেউ তুলে পড়ে ? তখন নিজের ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করে ল্যাম্প জ্বাললুম, চিঠি পুড়ে ফেলে দিতে। শেষে কি মনে করে চিঠিটা পড়েই ফেললুম। তখন ভারী হুঃখ হলো।

ইন্দ্র। এই মনে করে যে, একটা হতভাগা তোমার জন্ত একবারে উন্মাদ হয়ে গেছে, না ?

মাধুরী। কতকটা তাই বটে। রোজ রোজ তোমার দেখতে দেখতে চিঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার করুণ মুখের ছবিটা যেন আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো। পত্রখানা চার পাঁচবার পড়লুম। তারপর বা মনে এলো একটা উত্তর লিখে আমিও ছুঁড়ে মারলুম। কি হুঃসাহসের কাজই করেছিলেম সেদিন। মনে হ'তে বুকা কেঁপে উঠে। তোমার গারে ছুঁড়ে মার্তে—

ইন্দ্র। এসে আমার পায়ে পড়লো। কিন্তু পা থেকে তুলে তা আমি আমার কণ্ঠের হার করেছি। তার প্রত্যেকটা অক্ষর আমি ইষ্টমন্দের মত জপ করে থাকি।

মাধুরী। সে তোমার অমুগ্রহ। অজ্ঞে হ'লে আমার কি মনে কর্তো বলতে পারিনে। ঘরে গিয়ে সেদিন ক কারাটাই কেঁদেছিলেম।

ইন্দ্র। আর আমি দোর বন্ধ করে খেই খেই করে কি নাচটাই নেচেছিলেম।

মাধুরী। তা আমি বিশ্বাস করি। তুমি যখন দুইহাতে চোখ চেপে আমার ভয়ে বসে পড়লে, তখন বই মুখে দিয়ে আমিও খুব হেসেছিলেম—সে পরের দিন। কিন্তু, আমি যে ছয়দৃষ্ট নিয়ে জন্মেছি, সেই কথা মনে করে সনাই ভয় হয়। তুমি কি চিরদিন আমার এগ্নি ভালবাসবে ? কখনো পারে ঠেলবে না ?

কথাগুলি বলিতে বলিতে মাধুরীর কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল; অশ্রুজলে গাঙুল প্লাবিত হইতেছিল। ইল্জনাপ, ছই হাতে অশ্রুস্রাত স্নন্দর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুপন করিল। শেষে নিবিড় বাহুবেষ্টনে মাধুরীকে জড়াইয়া ধরিল।

যখন স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পূর্ণস্বতির রোমন্থন ও ভাবের আদান প্রদান চলিতেছিল, সেই সময়ে বাহিরে দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। মাধুরী, ধীরে ধীরে আপনাকে স্বামীর বাহু-পাশ হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া বাহিরে যেখানে খণ্ডখণ্ড মেঘ জমাট বাঁধিয়া ক্রমে বড় হইতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া রহিল। ইল্জনাপ, দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

বাহির হইতে পুরুষ কণ্ঠ কে বলিল, “ইল্জ, তুমি যে অবশেষে একটা বেষ্টার মেরেকে বিয়ে করে চৌদ্দ পুরুষের জলপিণ্ড লোপ করবে, তাতো আমি স্বপ্নেও ভাবিনি কখনো! তুমি এই মুহূর্তে পত্নী-ত্যাগ কর, নইলে আমার সমস্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করে তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করব।”

ইল্জনাপ, পিতার স্বর চিনিতে পারিল। কিন্তু সংসার-ত্যাগী বৃদ্ধ কালীধাস ত্যাগ করিয়া হঠাৎ কেন এখানে আসিলেন তা বুঝিতে পারিল না। সে ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে বলিল “বাবা, আপনি ভুল শুনে থাকবেন। মাধুরী বেষ্টাকতা নয়। রাম বাবুর গৃহে তাঁর কণ্ঠাতুল্য স্নেহে প্রতিপালিতা হয়েছে।”

বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, “রাম বাবুর কথায় বিশ্বাস করাই যে তুমি একাজ করছ, তা আমি শুনেছি। নিজে সব জানলে না কেন? হুঁপাতা ইংরেজী পড়ে তোমরা এমন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাও যে জাতিবিচার করাটা আবশ্যকই মনে কর না। তা ছাড়া, আগেকার কালে প্রেক্ষান্তভাবে সমাজের বিরুদ্ধে এমন অত্যাচার করতে কেউ সাহসীই হতো না।

ইল্জনাপ বলিল, “বাবা, ঘরে আসুন। আমি সব বলছি আপনাকে। বাহুদেবপুরের রামতত্ত্ব মুখোপাধ্যায়কে আপনিও চিন্তেন বোধ হয়। মাধুরী তাঁরই কণ্ঠা, আমি নিজে কেনেছি। এর মায়ের নাম ছিল সরস্বতী দেবী।”

বলিয়াই ইল্জনাপ, বৃদ্ধকে নমস্কার করিতে দ্বার খুলিয়া বাহিরে যাইতেই দেখিল যে, বৃদ্ধ বেতস পত্রের দ্বার খর খর করিয়া কাঁপিতেছেন। কোনওরূপে দেয়াল ধরিয়া অক্ষটস্বরে কি বলিলেন, কিছুই বোঝা গেল না। ইল্জনাপ বিস্মিত হইয়া বলিল “বাবা, আপনার কি অসুখ করেছে?” সে তাঁহাকে প্রায় কোলে করিয়া ঘরে আনিয়া একখানা চেয়ারে বসাইয়া দিল। মাধুরী তখনও বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। যেন পিতাপুত্রের কথোপকথন কিছুই তাহার কাণে যায় নাই; যেন সে এ জগৎ হইতে বহুদূরে বসিয়া কি এক মহাধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন “মাধুরী, মাধুরী!—কই এনাম ত আমার স্মরণ হয় না। এর কি শৈশবে অগ্র নাম ছিল?”

ইল্জনাপ বলিল “ছিল। এর নাম ছিল লক্ষ্মী।” পুত্রের কথা শেষ হইতেই বৃদ্ধ বলিলেন “বাবা ইল্জ, তোমাদের বিয়ে কি হয়ে গেছে?”

ইল্জনাপ বলিল “হাঁ তিনমাস আগে।”

বৃদ্ধ বলিলেন “কি সর্বনাশই হয়েছে তা হলে। আর তোমারই বা দোষ দি’ কেন? তরুণ বয়সের চাকল্যো বিধবা সরস্বতী আর আমি যে পাপ করে ছিলাম, তারই ফল এই লক্ষ্মী বা মাধুরী। এ যে তোর বৈমাত্রেয় ভগ্নী হয় রে, ইল্জ। এখন উপায়?”

এই ভীষণ কথা শুনিয়া ইল্জনাপ ও মাধুরী, বজ্রাহতের দ্বার স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহাদের দুখ দিয়া একটা বাক্যও নির্গত হইল না।

বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া বলিলেন, “ইল্জ, পিতা, মাতাই পুত্র কণ্ঠারূপে নিজেদের পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করে থাকে। এ পাপ থেকে ত্রাণ পাবার অস্ত্র কালীতে পালিয়েছিলাম। কিন্তু পাপ ত আমার ছাড়লে না! দ্বাধ্ বিধাতার দণ্ড কি অসোষ। কি ভীষণ! এ বয়সে থেকে তুবাগলে মৃত্যুও যে আমার পক্ষে শ্লাঘ্য ছিল।”

বলিতে বলিতে তিনি অচৈতন্য হইয়া চেয়ার হইতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। ইল্জনাপও মাধুরী যেন একতরুণ স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে গেল।



রাম বাবু এতক্ষণ বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিলেন এবং পিতাপুত্রের কথোপকথনও শুনিয়াছিলেন। এখন ঘরে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রনাথকে সন্ধান করিয়া বলিলেন “ইন্দ্রনাথ, তোমার পিতা ভুল করেছেন। মাধুরী সরস্বতী দেবীর কন্যা বটে, কিন্তু তোমার পিতার ঔরষজাতা কন্যা নয়। মাধুরীর জন্মের পরে সরস্বতী দেবী বিধবা হন এবং মাধুরীকে কাশীধামে পরিত্যাগ করে তোমার পিতার সঙ্গে এলাহাবাদে চলে যান। কাশীবাসিনী হরিমতী মাধুরীকে প্রতিপালন

করেছিল; তার কাছেই আমি সব শুনেছি। সরস্বতীর দ্বিতীয় কন্যার নাম লক্ষ্মী ছিল; সে শৈশবেই মারা গিয়াছে। হরিমতী, মাধুরীকেও লক্ষ্মী বলিয়াই ডাকিত। তাই এ গোলমাল হয়েছে। মাধুরী সত্য সত্যই তোমার বৈমাত্রেয় ভগ্নী নয়।

উদাসভাবে ইন্দ্রনাথ বলিল “সে একই কথা;—মাধুরীর মা যে আমার বিমাতা এর ত সন্দেহ নেই? এখন থেকে আমরা পরস্পর ভাই বোনই থাকব। হায়, তিন মাস আগে যদি এসংবাদ জানা যেতো!”

## নয়নের জল।

শ্রীশচীন সেন রায়

জায়গাটা মনের মত।

গ্রাম নয়। কিন্তু গ্রামের অনেকটা ভাব লাগে। অনতিদূরে একটা মস্ত বড় নদী, ওটা থেকে ছোট্ট একটা খাল জয়েছে; খালটা একে-বেকে চলেছে ঐ জায়গাটার সারা বুক ভেদ করে। নদীর জল খালে এসে পড়ে বারমাস; তাই বৃষ্টি ওটাকে রোগা হতে দেখা যায় না, ছুটপুটই থাকে সব সময়। মনে হয় ওটা যেন খালটার-মা।

সুন্দর ঠাণ্ডা বাতাস বয়। মনে খুলিও আনে।

মাস খানেক ব্যবৎ এখানে আছি,—দীর্ঘ অবসরের পরে। কাজের খুব ভীড়। হয়ত তাই সারা জীবন-জোড়া ছুথের ভাবনা আসে না। ব্যথাও দেয় না।

ঝুঙ, ঝুঙ করে তালে তালে শব্দ করে রাণার ডাক নিয়ে আসে। শব্দটা ভারী অলস অথচ নিরুদ্ভ। আমিও শুনতে পাই; কান হুঁটোও খাঁড়া হ'য়ে যায়, বন্দুকের আওয়াজে ভয় খাওয়া খরগোসের মতন।

মস্ত, মস্ত ‘ক্যান্ডাসের’ পাঁচ, সাতটা ব্যাগ তার মাথার পেরে। রাণার ব্যাগগুলির ভাড় যেন আর বেশীক্ষণ বহিতে পারে না। ধূপ-ধাপ করে ফেলে দেয়।

না কলে কি করবে? কতক্ষণ আর বহিতে পারে?—

তবুও ধমকে দি'। রা' করে না। মাথা গোঁজে থাকে।

অন্ত একটা ডাকঘরে—ডাক পৌছে দিতে বার হয়ে যায়।

ডাক বাছুরী কর্তে বসে যায়। পিয়ন তিন তিনটে; একটাকে সিল দিতে বলি, একটাকে সাজিয়ে রাখতে বলি। আর একটাকে আফিসের কাজে বড় বেশী পাই না। ও ব্যাটা ব্যস্ত থাকে বড় বাবুর পাকা চুল বাঁছতে, ঠুঁর ছালাদের আদর কর্তে আর বড় বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের গিল্লির ফুট-ফরমাস করে মন যোগাতে। পিয়ন ব্যাটা তো ভারী ধূর্ত। আসল পর্দাতেই ধরেছে বটে!

—বাবু, দোঠো পোষ্টকার্ড, আওর ছুটো মণি অর্ডার-ফারম। বাইরে থেকে ডাকতে থাকে, অনেকবার।

পোষ্ট-মাষ্টার তো না, যেন লাট্-সাহেব। দেখতে পাচ্ছে আমাকে ডাক স্ট কর্তে, তবুও আমাকেই বলে কিনা—দেওনা হে অসীত, ও কি চায়?

দেই। পরে ভাবি আচ্ছা কাণ্ডজ্ঞান তো! মেজাজটা গরম হ'য়ে যায়। কিছু বলতেও পারিনে—হজম করে ফেলি মনেরটা মনেই।

পাকা পাচীল ঘেরা আফিস ঘর। ছনের ছাউনী দেওয়া ছাদ। হুঁটা কোঠা তিনটে টেবিল, আমাদের অস্ত্র হুঁটা, আর একটাতে থাকে টেলিগ্রাফের টরে টকার কল। হুঁটা চেয়ার।

সকাল হতে তামান্ আকাশটা গুমট করে আছে; ছোট্ট ছেলেপিলেদের টোবা টোবা গাল হুঁটা রাগ করে ফুলিয়ে বসে থাকার মতন কিন্তু। অবস্থাটা কতকটা চোখের জল—‘প’র ‘প’র’ ভাব। তাই কি বীড় বীড় করে

ইলশে-গুড়ি বাড়চে। কাছের বস্তীর ছোট্ট ছেলেমেয়ে গুলোর বা ক্ষুষ্টি! ওরে, বাবা! ধিং ধিং করে লাফায় আর জোরে জোরে সুর করে—একদল বলে—

‘এতটুকু পানী

আর একদল বলে—গাগড় খানি।’

কাজের বা চোট! ঘাড় তোলবারও যে ফুরসৎ নেই। মাষ্টার বাবু তো টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঠিক লাড্ডু-খানার মত চেয়ারে বসে থাকেন। ইচ্ছে হয়তো কিছু লিখলেন, তা না হয় তো নাই।

একটা ছোট্ট মেয়ে ভিজতে ভিজতে আসচে। এদিকেই তো। আফিস ঘরের বাবাণ্ডায় এসে দাঁড়ায়। ভিজা গাটা মুছতে থাকে। ভারী সুন্দর ফুট-ফুটে মেঠেটা তো! আপেলের মত চক্চকে রঙ্গীন ছ’টা গাল। শিখ শাস্ত চোখ ছ’টা। স্নেহ, মায়ামমতা-ভরা চেহারা। কিন্তু বড্ড চঞ্চল ও অস্থির। ছোট্ট মেয়ে কিনা, তাই।

টরে টক্কা টরে টক্কা—শব্দ। তার এসেছে, ধরি। কাগজের উপর লিখে ফেলি।

মাষ্টার বাবু, পোষ্টকার্ড দিন্। একটা দিলেই হ’বে। মেয়েটা ডাক্তে থাকে, বাইরের ছোট্ট খোঁপেতে হাত বাড়িয়ে দেয়, দেবী দেখে পরসার গায় পরসা ঠুঁকে বারে বারে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে।

হাতের কাজ টাঁজ সব ফেলে রেখে ওকে দেই। ওর মমতা-ভেজা ডাক যে উপেক্ষা কর্তে পার্শ্বম না।

অসীম সাধ করে পরিচয় জানতে।

—খুকী, তোমার নাম? জিগ্গেস করি।

—লেখা। ও উত্তর করে।

—বাড়ী কদর?।

—ঐ। অকুলের ডগা দিয়ে বাড়ীটা দেখায়। বুঝলাম অতি নিকটেই।

—মার অগ্নি বুঝি পোষ্টকার্ড নিচ্ছ?

—মা নেই। জল-ছল-ছল চোখ ছ’টো বুজে বলে।

পরিচয়টাকে এর বেশী দূর এগিয়ে যেতে সাহস পাই না।

ইচ্ছা থাকলেও চেপে যাই।

ওর সেদিনের মিষ্টি কথাগুলো অহরহ কানের মধ্যে

বাজতে থাকে। হৃদয়ের তন্ত্রীগুলিতেও ঝং ঝং করে ঝঙ্কার দিতে থাকে। সাথে সাথে জাগিয়ে তোলে,—আর একটা ঠিক এমন তর মুগের কথা—এত কচি না, পূর্ণ যৌবন ভরা;—যার অভাবে আমার চক্চকে জীবনটা এমন হতচ্ছড়া, এমন লম্বাছাড়া এবং এমন বার্থ হয়েছে। চেহারার এমন বেমানাম মিল ও ভগবানের রাজ্যে আছে! দেখে মনে হয় যেন তুমারই ছোট্ট কালে তোলা একখানা ফটো।—

মন বড় দোলে। যত বেশী ভাবি তত আরও বেশী দোলে। এ দোল খাওয়া মন থামাতে পারি না।

মেয়েটা একবার না একবার এদিকে আসে, রোজ। তাই আমার সাথেও দেখা হয়। কাগজ-টাগজ সব ফেলে খুয়ে চলি ছুটে ওর সাথে কথা-বার্তা বলতে। তা’তে কী ভাল লাগে—না হুঃখই পাই?—বুঝতে পারি না।

তবুও তো।—

মাঘ পূর্ণিমা।

ভরপুর চাঁদনির রূপালী আলো। পৃথিবীর সাড়া গা বেয়ে বেয়ে পুলক উৎলে পড়ে।

লেখাকে কোলের মধ্যে রাখি, অনেকক্ষণ বসে থাকি হুজনাতে থালের পাকা বাঁধানো ঘাটিলার উপর। এখন আর পরের মত করে না। যতদিন যায়, যাতায়াতও বাড়বে, তত খাঁতিরটাও গাঢ় হয়। সংসারেরই নিয়ম!

ওকে চেপে ধরে বসি, কপাল, গাল চুমোয় চুমোয় ভরে দি’।—খাঁক হওয়া প্রাণটা জুড়িয়ে যায় বোধ হয়।

কাকা বাবু, গাটা শোঁক কেন? লেখা বলে। এখন কাকাবাবু বলেই ডাকে। কি জানি, ওর দিদিমা বলে দিয়েছেন বুঝি।

—ভাল লাগে তাই। শুধোই।

—কেন? আমি কি গোলাপ ফুল? লেখা বলে।

ভাবি—গোলাপ হয়তো ও বড্ড ভালবাসে; তাই গোলাপের কথাই বলে

—হ্যাঁ, তুই তাই। উত্তর করি।

হা, হা, হা করে হেসে উঠে। চৈচিয়ে চৈচিয়ে বলতে থাকে—আরে আমি বলে গোলাপফুল, আমি বলে গোলাপ ফুল, কাকাবাবু বলে। ধাই, ধাই করে নাচতেও থাকে কিন্তু; আরও অনেক কিছু।—ছোট মেয়ে তো;—সরম করে না।

চটকলের কুলীগুলো ঝুঁঁ বেধে আসে; এরা আমার বড় উৎসাহ করে। কেউ চায় ছোটো টিকেট; কেউ চায় চারটে পোষ্টকার্ড, কেউ আবার আসে মনি-অর্ডার পাঠাতে। এম্মি করে আরও কত কি। আৎকামনে পড়ে লেখার আঁকুল অল্পতোষ আমার সাথে আজ বিকেলে কাঁচা রাস্তা ধরে বেড়াবে।

ছুটে চলি। অনেকে অনেক কথা শুনায়। কান তো পাতিই না;—তোয়াকাত করি না।

আঁকুল হয়ে পাগলের মত যাই। কেন যে যাই তা তারা কী বুঝবে?—

দেখতে পাই, লেখা দাঁড়িয়ে আছে ওদের দরজায়। আমার জন্তই তো!

আমাকে ও দেখে। দৌড়িয়ে আসে কাছে। যেন মেঘের রাণী। ঝাকড়া চুলের গোছা-টা উদ্দাম হয়ে ফুঁ ফুঁ করে হাওয়ার উড়ে। স্নানর লাগে দেখতে। তক্ষন তক্ষনই ওকে সাপ্টে ধরে বসে পরি,—সবুজ ঘাসের উপর। হাওয়ার দোহুল খাওয়া অব্যাহা চুলগুলোর মধ্যে হাত ঢালিয়ে দি'; বুলিয়ে বুলিয়ে ঠিক ঠাক-কর্ত্তে থাকি।

—কাকাবাবু, বেড়াতে যাবে না? বড় যে বসলে? লেখা জিজ্ঞেস করে।

—চ'। বলি।

লেখার হাত শক্ত করে ধরে বেড়াতে থাকি, এ প্রস্ন সে প্রস্ন করে করে আমার ব্যস্ত করে তোলে। তথাপি কিন্তু বিরক্ত হই না।

—কাকাবাবু, একদিন না বলছ, আমার কল্‌কাতা দেখাবে? কবে? লেখা জিজ্ঞেস করে।

—জুড্‌ফ্রাংডের ছুটিতে। বলি।

—আর ক'দিন বাকী?

—দিন পনার।

—তুমি খালি আজ না কাল, কাল না পরন্তু এম্মি করে ফাকী দিচ্ছ। সত্যি বল তখন নিয়ে যাবে?

—হাঁ রে, নোঁব, নোঁব।

নাম-করা যা, যা আছে—ওকে দেখিয়ে দেই; পণ্ডশালা যাহুঘর, ইডেনগর্ডেন, পরেশনাথের মন্দির—আরও অনেক।

ট্রামে করে আস্চি। হঠাৎ বিকাশের সাথে দেখা। আমার প্রথমটা চিন্তেই পারলে না। বার বার আমার দিকে তাকাত্তে থাকে। আমিও কিছু বলি না।

এই-রে, বাটী করলে! চিনে ফেলো। বলে, কিরে, তুই অসিত না?

উত্তর করি;—ঠিক ধরেছি। কোট ফেরতা বুঝি?

—হাঁ।

—ভারী দরার শরীর তো-রে তোর!

—কি রকম?

—এতগুলো ছাড়পোকা পোষচিস্ এই গাউনটার মধ্যে।

—লস্কীর চিক্।

ঠুং করে বটী বাজে, ট্রামটাও দাঁড়িয়ে পড়ে।

—আচ্ছা, তবে আসি রে, কেমন?

—যা। বলি।

আমরাও যাই বায়স্কোপ দেখতে।—

পিক্‌চার প্যালেস, না-তো, যেন ঠাকুরমার মুখে শুনা পরীর দেশ। রূপের ঝলসা ছোটো সন্ধ্যার সময়, টুঙ করে বটী বাজে, বায়স্কোপের পর্দা উঠে, যে বার জায়গায় বসে ছবি দেখতে থাকে। তাতে ছিল এক সুন্দরী তরুণী; সাথে এক ধনী যুবকের প্রেয়। অবলা, অবুঝ তরুণী; বোঝে না, চিন্তাও করে না; ধনী যুবকের মিলনের প্রথম অর্থ্য প্রাণে বরণ করে নিলে।

তার পরে অনেক দিন চলে যায়। যুবকের ক্ষতাব-গুজ্‌ উচ্ছ্বল চরিত্র বার হ'রে পড়ে। যার যা ক্ষতাব-গুজ্‌

আর কতদিন লুকিয়ে, চুকিয়ে রাখতে পারে? তাঁর জীর দিকে বড় একটা তাকায় না। মন সদাই উড়ো, উড়ো। নিত্য নূতন ফুলের মধুর আশ্বাস পেতেই যুবকের প্রাণ ব্যস্ত। সে কী বুঝে সাধনী জীর কদর! সে যে কামের পূজাতে মসৃণ! তারপর ইন্টারভেল।—

দপ করে সবগুলি আলো জলে উঠে। লেখা তার সিট ছেড়ে উঠে আসে।

—কিরে, কেন ওঠে এলি? জিজ্ঞেস করি।

—ডর লাগে যে। বলে।

—কেন?

—ঐ দেখ! কত মোটা! আস্তে আস্তে বলে, ঈশারা করে কিন্তু।

সত্যি তো কী মোটা ঐ ব্যক্তিটার চেহারা, ঠিক যেন পাশ্প করা ফুটবলটা আর কি।—

ছবির মারিকার দুঃখের করুণ কথা মনের মধ্যে মূর্ত হ'য়ে ওঠে। এ বেদনা ও বিষন্নতা যদি সত্যি সত্যিই ঘটে তাও আবার মনে পুবে রাখা কী কম বিষম! সাথে সাথে এসে আমার মনে ধাক্কা দেয় নিজের বিফল জীবনটা—জীবনটাতেও কী ভাবেই না বিফলতা, ব্যর্থতা ভরাট হয়েছে! এ অজ্ঞ দায়ী কী রূপই?

কখন যে ইন্টারভেল শেষ হ'লো, আবার কখন যে ছবি দেখান শুরু হল—খাল থাকে না। পুঞ্জ পুঞ্জ চিন্তার রাশি, তা'তেই কি? আৎকা ভেঙ্গে যায় চিন্তার চমক তখন, যখন লেখা হাতে ধরে একটা ঝাকুনী দেয়। পরে বলে—কি কর? দেখচো না? কি সুন্দর!

ছবি দেখতে থাকি। তরুণীর সকল দুঃখের প্রদীপ একটু একটু করে, দাউ দাউ করে জলে উঠে। তরুণীর দিকে কেউ চায় না। ভিলে ভিলে দৃষ্টি হয়,—তবু না। আমার পরাণ কিঃ না কেঁদে পারলে না। প্রচুর সহিবার কর্মতা কিন্তু ওর। স্বামীর এত পৈশাচিক অত্যাচার কেমন কর্মতা কিন্তু ওর। স্বামীর এত পৈশাচিক অত্যাচার কেমন ভাবে সয়ে যাচ্ছে—যেন অত্যাচারে আর ওতে খুব মিতালী। মেনে-মাহুয তো, তাই পারেও বোধ হয়।

সারের অরচেন্দ্রা হ'তে বেহালা ও পিয়ানোর দুঃখ ভেঙা ছুর বাজতে থাকে। ভিজিয়ে দেয় আমার মন-প্রাণ।

ওঃ এত করুণ—এত প্রাণ কাঁটান!—যেন আমারই বিয়হী আত্মার খোঁজ এরাও পেয়েছে।—

শেষ খণ্ডেতে দেখি—পূর্ণিমার ফর্শা তরল জোছনা; ধরণীর বিপুল বপুটাকে পর্যন্ত ভিজিয়ে দে'ছে। নিশ্চয় রাত। সেই ধনী যুবক টলতে টলতে বাড়ী আসে। বাড়ীর দরজায় বার কতক ধাক্কা দেয়। বনাত্ন করে খুলে যায়। দেখি, স্নান-বসনা স্নান তন্নু সেই তরুণী। ঝড়ে-পড়া বাসি শিউলির মতন মুখখানি তার।

মাতালটা স্ত্রীকে অশ্রাব্য গাল-মন্দ দেয়, মদের খোঁকে আরও—আরও কত কী—নিঃসহায় নারী ওদের উপর অত্যাচার তা কি বড় বেশী সাবাসী! এতভাবে ওকে পীড়ন করছে তা'তেও কিন্তু খুসী না। শেষে কী একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপারে তার সঙ্গী স্ত্রীকে সন্দেহ করে, পরে হুটো পিস্তলের গুলির শব্দে;—একটাতেই একেবারে কা'বার; তার উপর আবার আরও একটা কেন?

সাথে সাথে,—ওঃ, চলো, চলো যাই এখান হ'তে। লেখা বলতে থাকে। আমার হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে আসে—ভেতর থেকে একদম বাইরে। একটা টেক্সী ডেকে হ'জনে দেই সটান চম্পট ট্রেনের দিকে। আসতে আসতে লেখাকে জিজ্ঞেস করি—কিরে অমন করে চেচিয়ে উঠেছিলি কেন হঠাৎ?—যার জন্ত বড় কষ্ট হচ্ছিল।

শুনছি, বাবাও নাকি মাকে একটা বাড়ি দিয়ে—আর বলতে পারলে না, আবার একেবারে কেঁদে ফেলে।...

জীলোকটার দুঃখটা বড় বাজে। এরকম অত্যাচার যে কত চলচে তার খবর কে-ই বা রাখে? আবার ভাবিও—এজ্ঞ দায়ী কে? কর্ম-ফল না অজ্ঞ কেউ?

ভোর অনেকণ হয়ে গ্যাছে। জানালায় কাঁক দিয়ে ভোরের রোদ আসে। তা চোখে লাগে। ঘুমও তখনই ভেঙ্গে যায়। ধরফড়িয়ে বিছনা থেকে উঠে পড়ি। টুইলের সার্টটা কাঁধে ফেলি, গায়েও পরি-না, চটী পায় কটু কটু কর্তে কর্তে চলি আফিসে।

আগের দিনের অমিয়ে-রাখা কাজগুলো সব কর্তে থাকি।

—তোমার তো-হে সোনারপুরে রিলিফ কর্তে যাওয়ার আদেশ এসেছে। মষ্টার বাবু বলে।

—এর-ই মধ্যে? এত শীগগীর এখান হ'তে আমার বদলী? ভিজ্জেন্স করি। এর বেশী কিছু বলি না। মনটা যেন দারুণ আই-চাই কর্তে থাকে, বার বার খালি হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে ও ওঠে। হু'চোক দিয়ে কান্না বেরুতে চায়। দেই দমন করে—অতি কষ্টে। পুরুষ-মাহুষ যে, কেঁদে কেঁদে লোকেই বা কী বলবে?

—আরে মন খারাপ কর্ছো কেন? ছেড়ে যাবে বলে? তা দিন তো আর বেশী না; মোটে একটা মাস। বলে। বুঝি, স্মরণটাতে যেন ঠাট্টা মিশান আছে।

—কী? একমাস! তবু যে—ভুখোই।

—তবু কি হে! এ জায়গা তো আর বাড়ী না বা খন্তর বাড়ীও না; তবে আর কষ্ট কেন? আরে কি বলচি, ওদিকে যে একদম বর্জিত।

ভাগ্যিস বুড়ো, তার উপর আবার উপর-ওয়ারালা; তা নৈলে কবে মারতাম খাবুড়া। ব্যাটা বলে কিনা—ছাড়তে কেন কষ্ট হয়?

ওরা সব কি বুঝবে? কেন?

সাদা গা-টা জোড়া কত মস্ত একটা ডগ্-ডগে যা। কেটে যাওয়ার ঘা না—গোপন-ব্যথার।

নতুন যারগা, সোনারপুর।

মনটা বড্ড নিরালা; যেন সব সময়েই 'কি নাই কি নাই' করে। তাই হয়তো সবই নিরালা, নির্বাসিত লাগে; মনের সাথে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ কুটুস্থিতা যে।

অল্প লোকের রিলিফ করা ভরানক বাক্মারী। কত দিনের কেসে রাখা কাজ,—আমিই করি। পরের কাজ কর্তে কার না বিরক্তি লাগে! ব্যাটা-ছেলের চৌদ্ধ-পুরুষ উদ্ধার করে দেই অকথা, অশ্রাব্য গাল দিয়ে।

এর উপর আরও এক উৎপাত: গোটা কতক গার-পড়ে-কথা-কওরা-বন্ধুর মত জুঁটে বার। সময় নেই, গময় নেই,—আছেই 'ভোগাবনের' দল আমার পিছে। এটা

নাকি ও ব্যাটাদের একটা ধারা চলে আসতে। ছোঃ! ঘেরা করে ওদের অনবরত সজ। তবু তো মিশি; নৈলে ওদের যা চিটুকারীর চোট!—

বসে আছি চুপ-চাপ। কেমনতর একটা আশঙ্কা ও বিহ্বলতার প্রাণটা পুরিত হয়ে পড়ে যেন। ভাবি, কখন 'তার' পাঠিয়েছি লেখাদের সংবাদ আনতে, এখন পর্যন্তও তার জবাব আসে না যে। প্রায় হুঁমাস হ'তে চলো,—সংবাদ পাই নি। একটা নির্দারুণ ছর্ভাবনা মনেতে খাঁই-খাঁই করে কেন?

উত্তর আসে। জানতে পারলাম লেখার নাকি ভরানক ব্যারাম। ট্রেণ ধরতে ছুটে চলি।

মনটা বড্ড খারাপ লাগে। দিন কয়েকের আলাপে পরিচিত একটা ছোট্ট মেয়ে! ওর জন্ত কেন এত বেশী দরদ লাগে? কেন ওর চিন্তাই যেন আমাকে পেয়ে বসেছে? কেন মিছে ক্ষমতায় টেনে নিয়ে যার আমার সব মন-প্রাণ? কেন'র উত্তর কে দেবে?...!

শীতকাল। রাত আট-টা।

শীতের ষোলাটে কুরাসা ও কুরা রাক্তি,—এ হু'জনের গলাগলি ভাবে এক বিরাট অন্ধকার জমেছে। কুরাসা-ধোরা আঁধার—বড় ঘুর-ঘুটি, বড় গভীর।

খালের গা-বেশা, আকা বাঁকা সরু রাস্তা,—তা ধরে চলি বড়ো হাওয়ার মত; দিশা থাকে না।

সপাসপ টুকে বাই ও বেখানে আছে। একটা বিরাট বিশ্বাস আসে, স্তম্ভিত হয়ে বাই। একি! এত পরিবর্তন! হু'দিনের ব্যারামে!

বড় মাস হয়ে গেছে মুখখানা ওর; যেন রোদে শুকো বড়ো বকুল।

—এসেছ কাঁকাবার? বলে।

—হ্যাঁ। স্বরটা আটকে আসে। ক্রমশঃ দিয়ে শুকো কচি মুখখানা ওর মুহুরে দি।

রাত ক্রমেই বাড়তে লেগেছে। অন্ধকার নিত্যকতাও; মনে লাগে যেন শোকাভা বিহীন টাঙ্গা কাঁকাবার মতো।

জাদিরায় কত বড় লাম গাছটা, তা থেকে পুরাণ পাতা  
রক্ত পড়ে টুপ-টুপ। রোঁরো কুকুরগুলো সে থেকে খেউ  
খেউ করে ওঠে। ওদের কেরামতি ঐ পাতার সাথেই ;  
এর বেশী দূর না।

পুরো একটা রাত কাটে,—হয়তো আধখানা বেলাও—  
রোঁদের আঁচ আসে, গা পোড়া রোঁদ না কিন্তু—  
প্রভাতী রোঁদ—ঠাণ্ডা, মিঠা।

ঐ জায় গাছটার উপর একটা পাতি কাক আর ছোটো  
দাঁড় কাক বসে। গাছের ডালে ঠোট বসে, আর বাঁড়ি  
মারে। অনবরত ডাকতেই লেগেছে,—ভীষণ অপেরা ডাক,  
তুষা পাওয়ার মত এত শুক ডাক, বিমর্ষ ভরা ডাক, বিরক্তি  
আনা ডাক ; টিল ছুঁড়ে ক্ষেদিয়ে দি' ; আবারও আসে  
বেহারার মত।...

আজ বেশী খারাপ দেখাচ্ছে ওকে। চোখ মুখ যেন  
সাদা ফাঁকাসে হ'রে গেছে, নিখুঁত নাকটাও যেন একটু  
বেকে গেছে। প্রলাপ তো লেগেই আছে! বেশী অস্থিরত  
যেন একটু ক্ষীণ হয়েছে। তবে কি পূর্ব লক্ষণ—? কিসের  
পূর্ব লক্ষণ—ওটুকুন আর মনে করতেই যেন কণ্ঠ চেপে ধরে।

—কাকাবাবু, আমার মাকে তুমি দেখবে? হঠাৎ কেন  
আনি এ প্রশ্ন বলে উঠে।

—না, ঘুমো তো একটু, কাল তো সারা রাত জেগেই  
ছিল।

—মার একটা কটো আছে। দেখবে? আমি রোজ  
রোজ দেখি—অনেকক্ষণ।

বিপুল কুঠা হয় দেখতে ; যদি বা সেই হয়—তবু বলি—  
না কথা কসনে, ঘুমো।

একবারে ভরানক অব্যাহত হ'রে যায় ; বিজ্রোহ-ভরা  
স্বরে বলে, ছ'দিন যাবৎ যে দেখি না। ঐ দেবরাজের মধ্যে  
আছে ; আন। আনবে না? তুমি না পার—দিদিমাকে  
বল না।

গরে নিজেরও শীঘ্র পদক্ষেপ।

এর পর আর না এনে কি পারা যায়?

কি অসীম যত্নে সিন্ধুর থলের ভিতর রক্ষিত ; যেন  
মাণিক রতন সাত রাজার ধন।

পেয়ে কত ভূপ্তি, কত শাস্তি! আর মা, মা বলে কতবার  
যে ডাক! এক একবার মাথায় ঠোঁকে, এক একবার  
হয়তো বুক চেপে ধরে। কটো—তাতেই চুমার 'পর চুমা  
দিয়ে ভিজিয়ে দিতে থাকে। যেন তাজা সন্তোর মা ওটা  
ওর। যেন বহুদিন পরে ওর হারান মাকে ফিরে পেয়েছে।  
এমনি গভীর মমতা ওর।

—কাকাবাবু, দেখ কেমনতর করে চেয়ে আছে মা  
আমার দিকে ; না?

আচ্ছা অব্যাহত চোখ দেখে ফেলে।

বুকের ভিতরটায় যেন একটা বড় রকম উত্তরোল বইতে  
থাকে। বিশ্বাস হয় না বোধ হয়, আরও ভাল করে দৃষ্টি  
দিয়ে দেখি ; এঘে বাস্তবিকই ওরই চেহারা।—দীর্ঘ দিবস  
ধরে আমার মনে প্রাণে সবখানে গেঁথে রেখেছি! এও  
কী বিলম্ব হ'তে পারে? তা'হলে তো নিজের অন্তিমটাও  
সম্পূর্ণ বিলম্ব-পূর্ণ! তবুও জিগেন্স করি, তবে তুই ওর-ই?  
বল, বল শীগগীর করে?—

ফাল, ফাল করে তাকিয়ে থাকে ; বোধ করি, আমার  
এমনতর ব্যকুলতা দেখে।

বলে, হ্যাঁ, আমার মা-রই তো ছবি এটা! চেন মাকে?

শুনে কেবল একটা ছুঁখ ভরাট হাহাকার করা শুক্লো  
দীর্ঘশ্বাস ; তার পরক্ষণেই চোখে ও মনে ভেসে ওঠে তুষার  
বিবাহ রাত্রির মুখখানা,—মুখখানা কত বিষাদপূর্ণ কত  
সজল, কত ককণ ছিল!...

স্মৃতিকারকের নামের উপর একটা বিবেচ্য ভাব আসে।  
ধীকার দিতে থাকি,—শেষ সময়ে কেন পরিচয়টা ষটিয়ে  
দিলো! আগে দিলেই বা কী ক্ষতি ছিল? না, আমাদের  
নিজে হাসিয়ে কাঁদিয়ে ছিনিমিনি খেলতে বড় ভাল লাগে  
ওর!—

বিকার অন্ধ হয়েছে;—বোরস্তর প্রলাপ-মিশান বিকার।  
দেখে আনি কেমনতর হয়ে পড়ি।

ও হঠাৎ ফেঁচিয়ে বলে ওঠে, কাকাবাবু, কাকাবাবু ; ঐ

দেখ মা আমাদের নিতে এসেছে। যাবে তুমি? তবে  
জীগর্গীর করে এস।

মাথাটা জোর করে তুলতে চেষ্টা করে; পারে না।  
তারপর খাঁটের কোনার দিকে চেয়ে থাকে বিক্ষারিত চোখে।  
বলে—মা, আস্চি। একটু দাঁড়াও। আর ফাঁকী দিয়ে  
যেও না; তবে আমি খুব কান্দবো। তোমার সাথে কথা  
বলবো না।

খানিক পরে আবার বলে, কী? তবে তোমরা কেউ  
আসবে না? কিরে পারুল, তুইও যাবি না? মা, ওঁরা  
বলে কেউ যাবে না। আমি কিন্তু আর তোমাকে ছেড়ে  
থাকবো না। বুঝলে? মা, একটু দেরী কর না; কাকাবাবু  
আর পারুলের সাথে দু'টা কথা বলে আসচি। থাঙ্ক, বলবো  
না। দেরী হয়ে যাবে, শেষে যদি আবার কেলে চলে যাও।

হাত, পা, শরীর সব শিথিল হয়ে পড়তে। ঘামও বইতে  
লেগেছে প্রচুর পরিমাণে। হয়ত আর বেশী বাকী নেই।

লেখা শেষবার বলে, কি কাকাবাবু, কান্দচো কেন  
তোমরা? মার কাছে যাব বলে? আমি তো তোমাকে  
আর দিদিমাকে সাধলাম; তোমরা তো কেউ যাবে না।  
আচ্ছা তবে যাই। ঐ আবার ডাক্চে; হয়তো দেরী মেখে  
কতই রেগে থাক্বে। যাই—

—লেখা, লেখা, লেখা! চৈচিয়ে চৈচিয়ে ডাকি। অবাব  
আসে না; আসে খালি প্রতিধ্বনির কীণ শব্দ।

আমিও সংজ্ঞা হারাই।

পরকালের টান বে পর্যন্ত না আসে সে পর্যন্ত চালিয়ে  
দিতে থাকি ছন্ন-ছাড়া—হতভাগা জীবনটার গস্তিকরা দিন  
গুলি—শোকাক্তর বিরাট ভার ব'য়ে। কতকটা হয়তো  
গুরুভার বোঝাই করা ছ্যাকড়া গাড়ীর চাম-ওঠা, হাড়-জীড়-  
জীড়ে ঘোড়ার ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলার মত।

## রূপ-পূজারী

শ্রীহরিপদ গুহ

( ১ )

রূপ নগরের রূপসী সে

বোসের বাড়ীর ওই ছুঁড়ি ;—

চলতে পথে নয়না হেনে

করলে আমার মন চুরি।

কাননে ফুল তুলতে এসে,

ছলিয়ে ঝাঁচল, মুচকে হেসে,—

বুকের ব্যথা যায় সে কয়ে

ডাগর ছুটা চোখ দিয়ে ;—

রোজই ভোরে এমনি করে

যায় সে আমার মন নিয়ে।

( ২ )

বুকে তাহার তীজ্র-দাহন

আলোর-কমল ফুটফুটে ;—

মানস-মধুপ ওই দুটীতে

উদাস হয়ে যায় ছুটে !

কত যে যাত্র জানে সে বালা,

গাঁথিয়া নিতি শিউলী মালা,

গলেতে মোর পরিয়ে দিয়ে

চপল চোখে রয় চেয়ে।

ধরতে গেলেই পলায় ছুটে—

এমনি দুহুটু সেই মেয়ে।

( ৩ )

ফাগমাখা তার গাল দুটীতে  
আঙ্গুর-রসে তুলতুলে ;—  
হাসতে গেলেই চৌল খেয়ে যায়  
ওইতে আমার মন ভুলে ।  
যদি তার ওই বাছ-হার,  
কণ্ঠেতে মোর দেয় উপহার,  
দুঃখ সকল ভুলে গিয়ে  
রচব হেথায় স্বর্গপুরী ।  
মনটী আমার করলে চুরি  
একটুখানি কঁচকে ছুড়ি !

( ৪ )

চিস্ত-চকোর উঠছে নেচে  
তাহার মধু-পরশ আশে ;—  
কাজল-কাল নয়ন দুটী  
সদাই আমার চোখে ভাসে ।  
তারি একটী চুমার তরে,  
হতাশ-পরাণ গুমরে মরে,  
বিভোল-চিস্ত হলো আজি  
চরণে তার বন্দী গো !  
হায়, রূপসী নিঠুর বালা,—  
জ্ঞানে সে কত ফন্দি গো !

## সৈনিকের চিঠি

প্যারি কেম্প—ফ্রান্স ।

২৬শে সেপ্টেম্বর ।

মেঘলা রাত ।

ঠিকানা দেখেই বুঝতে পারছ আবার কেম্পে ফিরে এসেছি। কাল পরশু লাগাত আমি যাচ্ছি আবার রণক্ষেত্রে। এবার যদি আর না ফিরি তবে কেমন হয় রাণী ? বেশ হয়—না ? তুমি সমস্ত ভাবনা চিন্তার হাত থেকে, এ ছন্নছাড়ার আলাতন থেকে রেহাই পাও—না ? দেখেছ তামাসা ? আমি এত হিংস্র হই যে তোমাকে একটু আনন্দ পেতে দিতে যেন আমার কত বাজে ; আমার ভারী সাধ হয় আমাকে বত ব্যথা দিয়েছ, তুমিও তেমনি করে ব্যথা পেয়ে বুঝবে যে কত দুঃখে মরতে চেয়েছিলাম ।

একি—আবার বিগল হবে ?

কারার এলার্ম ! আশুগ ! আশুগ !!

কাল কারার এলার্ম পড়ল তাই আর লিখতে পারিনি । এখন কালকের খবরটাই দিচ্ছি প্রথমে ।

বিগলের ডাকেই বুঝেছিলুম আশুগ লেগেছে ; সব লাইন করে দাঁড়াল । এই-ই নিয়ম কি না ? এমন সময় পেছন থেকে এসে আলো আমাদের সামনে পড়ল । তখনো কোন হুকুম হয়নি । আমরা নাড়ারে রইলুম—আর নিরীহ লোকগুলির কথা ভাবতে লাগলুম । হ হ করে বাড়ীর পর বাড়ী উজার হয়ে যাচ্ছে, অথচ একটু সাহায্য কাউকে করতে পারছি না । হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত নড়বার যো নেই । অত্যাচার কালই মার্শাল ল'তে গুলির হুকুম হবে । এদের দূরবস্তার কথা ভাবছি, এমন সময় Renault ( রেনো ) বলে একজন নায়ক ফাইল থেকে বেড়িয়ে চীৎকার করে বলে উঠল—প্রাণের আশা ছেড়ে কেউ কি এ অসময়ে এদের সাহায্য করতে পার না ? সাহস থাকে তো চল এসো । এই বলে সে উকি বেগে চলে গেলো ।

কিছুক্ষণ বাদে আমাদেরও এগিরে বাবার হুকুম হ'ল । অতি কষ্টে সেই ভীষণ আশুগ নিবানো হল । কিন্তু রেনোকে এন্ডলেন্স করে আনতে হয়েছে । তার গাটা অনেক পুড়ে গিয়েছে ।



তাকে জিজ্ঞেস করে বা' গুনলাম তা'ও লিখছি নইলে  
আবার কত অসন্তুষ্ট না জানি হলে ?

‘আমি ছুটে ওখানে যখন পৌঁছেছি, তখন গুনলুম, একটি  
রমণী চীৎকার করছেন, ওগো আমার শিশুপুত্র ঐ ঘরে যে  
পড়ে আছে। তাকে বাঁচাও, কেউ ! ওগো তাকে বাঁচাও।  
কেউ তার ডাকে সারা দিলো না। তার বুক ফাটা আর্তনাদ  
কারো প্রাণে আছড়িয়ে পরলো কি-না জানিনে, কিন্তু আমি  
চুপ করে থাকতে পারলুম না। ছুটে আগুনের ভিতরে ঢুকে  
পড়লুম। ঘরে ঢুকে খোঁজার সব অন্ধকার দেখলুম,  
এ ঘর ওঘর ছুটছুটি করে খোঁজ করলুম—পেলায় না।  
তারপর উত্তর কোনে একটা অশ্রুত কান্না শুনে পেলাম  
ছুটে উপরে উঠে গেলাম এবং ছেলেকে মেঝে পড়ে আছে  
দেখলুম। বুক জড়িয়ে নিয়ে নীচে নেবে এলুম, কিন্তু  
তখন চারিদিকেই আগুন তার বিখ্যাতী জিহ্বা বাড়ায়ে  
গিলতে আসছিলো। উন্মাদের মত দিশেহারা হয়ে ছুটলুম।  
তারপর আর কিছু মনে নেই ! উঃ কি আলা !—

ভাই, আমার কি হকুম হয়েছে ? যাক্ গে ছাই ! ওসব  
ভয় আমি করিনে, তা'হলে কি আর বেড়িয়ে যেতুম ? মরতে  
তো হতই, যখন সৈনিকদলে যোগ দিয়েছি। যে মরণ দু-দিন  
পেছনে হত, তা না হয় আজ হবে। এতে ভাববার কি  
আছে ? তবে ভাই আমার মরণের বেলায় এ শ্রাবনা যে,  
অনাধার বৃকে তার নয়ন সর্লক্ষকে কিরিয়ে দিতে পেরেছি।  
আঃ কি তৃপ্তি !!! মাগো—

মিথ্যা ভেবোনা, রেপো ! কুমি কি এত অজ্ঞার করেছ যে  
তোমার গুলি খেয়ে মরতে হবে ? তোমার বীরত্বের কি  
তুলনা হয় ভাই ? নিশ্চয়ই তোমার কোন শাস্তি হবে না।

না না মিঃ রয়, তুমি ভুলে যাচ্ছ—এ মিলিটারী আইন।  
হুনিয়ার সমস্ত কিছুতে একটু পক্ষপাতিত্ব দোষ থাকতে পারে,  
কিন্তু এখানে তা নেই ! মার্শাল 'ল ভরানক জিনিষ। কোন  
ওজর আপত্তি নেই। আইনের ধারার মধ্যে পরলেই, বাস্ !

এই মাত্র আর্দালী এসে জানাল যে, কমেণ্ডিং অফিসার  
আমাকে যেতে হকুম করেছেন। কাত্তেই উঠি এখন।  
বিকেল বেলা চিঠিটা শেষ করে ডাকে দিতেই হবে আজ।

মণি—শুনে আশ্চর্য্য হবে রেগেণকে সৈন্তদল থেকে বিদায়  
করে দেওয়া হয়েছে। তাকে গুলি করা হত, কিন্তু তাকে  
একটু কল্লণা করে তার প্রতি এ মহাহতুতি দেখানো হলো।  
সে ভালো হয়ে উঠলেই তাকে চলে যেতে হবে।

হাঁ, বলতে ভুলে গেছি যে কমান্ডিং অফিসার আমাকে  
সকালে হকুম করেছেন পাঁচটার সময় আমাকে ক্লিওনবার্গের  
উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে। রেবী আমার জন্ত কেম্পে  
অপেক্ষা করছে। সে আজ আমাকে ব্যালিয়ে রেবে বলেছে।

প্রিয়তম আমার ! জামি জানিনা, এবার কি নিয়ে  
কির্ব। হয় শাস্তি—চিরশাস্তি, নয় গোরব, চির গোরব।  
তুমিই তার সমাধান করো—কোনটা আমার জীবনে থাপ্  
থাবে।

জাজ কেন জানিনা—দীপশিখা যেমন বাতাসে হঠাৎ  
কোঁপে কোঁপে উঠে, আমার হৃদয়টাও আজ তেমনি করে  
কোঁপে কোঁপে উঠছে। আমাকে কে যেন বলছে, বিদায় !  
বন্ধু ! বিদায় !! কোন্ প্রিয়জনের হারিয়ে যাওয়া ব্যথার  
কান্না এ ?

যাক্, যাবার বেলায় আর অনর্থক মন খারাপ করবনা—  
কষ্ট করবনা। যা অদৃষ্টে আছে, তাই হবে। লক্ষীটি  
আমার ! কেন চিঠি লিখ না ? জবাব দেবেতো ? জারি  
দিন শুণ্। তুমি চিঠি দিও। দিয়ো !! দিয়ো !!! ওগো,  
আমার ব্যথা একটু বৃকে অহতব করতে চেষ্টা করো।

তবে আজ আসি। আমার আশীর্বাদ, ভালোবাসা এবং  
চুখন জেনো। ইতি—

( ক্রমশঃ )

—শান্তিচৌধুরী।

## স্মৃতি-রেখা

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গোধূলী সঙ্কারণ সেই অস্পষ্ট সঁঝের আধারে  
 ভুমি আর আমি যবে বসেছিলাম বালুকা-বেলায় ;  
 দিবাকর অন্তমিত—ঘন-কৃষ্ণ-মসীর আকারে  
 অলক্ষ্যে কে আসে ধেয়ে—চরাচর নীরবে ডুবায় !  
 তরঙ্গের উলঙ্গ কটীতে সঙ্কারণী ধূসর অঞ্চল  
 ধীরে ধীরে পরাইয়া সন্তর্পনে ওই যায় চলে,—  
 দিগন্তের সিঁধুপরে আচম্বিতে খুলিয়া অর্গল  
 কে আসিল চূপে চূপে ? অন্ধকার নিশিথিনী কোলে !  
 সীমাহীন সিঁধুপরি, গগন-চুম্বিত শৈল-শিরে,  
 উদয়াস্ত দুই-তটে সবিতার স্বর্ণ রেখা ধরি' ;  
 পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র উঠে আসে ধীরে অতি ধীরে—  
 কি যেন সঙ্গীতে ভরা ধরাখানি মরি মরি মরি !  
 উলসি' বিলসি' ওঠে কুলে কুলে ভরা সিঁধু জল,  
 প্রসারিয়া স্ফীত-বক্ষ মেঘে-মেঘে করে কাণাকাণি ;  
 পার্শ্বে থাকি 'তারকারা' ম্লান চোখে চায় ছলছল—  
 তারাই আমার মত এজগতে ব্যথা-ভরা-প্রাণি ।  
 মনে হ'লে সেইদিন—আজও বুকে ব্যথা জাগে মোর,  
 শিরায় শিরায় মোর শিহরণ পলকে কাঁপায় !  
 ফুল-চাঁদোয়ার-তলে বসেছিলে স্মিত-মুখে ভোর  
 সারা তবু তরঙ্গিয়া রূপাশ্রিত-বিজুলী-আভায় !  
 \* \* \* \* \*  
 আজ তুমি কাছে নাই—একাকী বসিয়া বেলাভূমে,  
 কত না অতীত স্মৃতি অনিবার বুকে জাগে হায় !  
 জ্যোৎস্নার অজস্র-ধারা আসি মোর-সারা অঙ্গ চূমে' ;  
 তারকা-খচিত শুভ্র-সীমাহীন নীল নভো-গায়  
 রহি' রহি' কে সাস্বনা দেয় আজি মোরে,—  
 কেশ-বিন্দু-অশ্রু-রাশি আছাড়িয়া পড়ে বার বার,  
 অধিগত অধিগত উঠে,—অবিরাম সক্রিয় স্বরে  
 কি কথা কহিতে চায়, আমি জানি, জানে সে আমার ।

## রবিকরে বারিধারা

শ্রীবৈষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপের জ্যোতিতে কানন আলোকিত করে যুবা তপস্বী তার জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা নিয়ে থাকত। বহিঃগতের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই ছিল না; সে যেন সৃষ্টিছাড়া। এমনই করে দিন যায়। একদিন প্রাতে এক ধনী লোকের সঙ্গে নগরের প্রধানা গণিকা মণিমঞ্জুষা সেই কাননে বন-ভোজন করতে এল। ধ্যান-নিরত তপস্বীকে দেখে সে একেবারে বিস্ময় বিমুগ্ধ। অনেকক্ষণ চিত্তার্ণবিতের দ্বার দাঁড়িয়ে থেকে গণিকা মনে মনে ভাবতে লাগল,—এমন সুন্দর পুরুষ এতদিন ত তার নজরে পড়ে নি; এত তেজস্বী ত কই কারও সঙ্গে সে দেখে নি! এ কে! কে এ! অপরূহ গৃহে কেশবীর সময় মঞ্জুষা দেখলে, তখনও তপস্বীর ধ্যান ভঙ্গ হয় নি। সে একটু করে পথ চলে, আর বারবার তার দিকে ক্রিয়ে চায়। তারপর যখন সে তপস্বীকে একেবারেই দেখতে পেলে না, তখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস তার বুক ঠেলে উঠে বাইরের বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

\* \* \*

মঞ্জুষার আর কিছুই ভাল লাগছিল না। তার এই সুদীর্ঘ পতিতা-জীবনে আজ কেমন বেঁধে গিয়ে ছিল। গণিকা কেবলই ভাবছিল,—সে এতদিন শুধু স্বপ্নের মধ্য দিয়েই নিজের দিনগুলো অতিবাহিত করে এসেছে, সত্যের সন্ধান পায় নি।

ব্যর্থতার বেদনার তার বুক মুচড়ে চোখের কোণে অশ্রুর বাণ ছুটে চলেছিল। অতীতের বৃক্ষ-প্রাণ স্মৃতির অম্পট ছায়াটা এতদিন সে জোর করেই দূরে সরিয়ে রেখেছিল, আজ আর তা পারলে না।—রূপণের গচ্ছিত স্বপ্নের মত একটীর পর একটিকে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে করতে তার বর্তমানটা ক্রমে তিস্ততায় ভরে উঠল। বিদ্রোহীর মত কেবলই সে নিজকে নিজেই লালিত করে তুলতে লাগল।

\* \* \*

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আবার সে সেই বনানীর মধ্যে এসে দাঁড়াল। তখনও সন্ন্যাসীর ধ্যান ভাঙে নাই। পূর্ব-দিনের মত তার গভীর প্রশান্ত মূর্তি বনভূমি জ্যোতির্গত করে তুলেছিল। মঞ্জুষার দৃষ্টিতে আর পলক পড়ে না; যন্ত্রমুগ্ধা হরিণীর মত সে অবশ অশ্রু দেহে তপস্বীর অনতিদূরে মাটির উপর ধীরে ধীরে বসে পড়ল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোন্ ফাঁকে নিত্য-নৈমিত্তিকের পালা শেষ করে চলেছিল, সেটা হুঁসই ছিল না; পাখীদের কুলার ক্রিয়ে আসার কল-রবে হঠাৎ তার চমক ভেঙ্গে গেল।

তপস্বীর নয়ন উন্মিলিত হয়ে এল। তিনি বিস্মিতকণ্ঠে বললেন—“এ কি! কে তুমি! এখানে তোমার কী প্রয়োজন?”

মঞ্জুষা বাকহীন! তার দৃষ্টি ভাবোজ্জ্বল!—“চুপ করে রইলে যে? এই নির্জন বনে আমার কাছে তোমার মত সুন্দরীর কি আবশ্যক, তা ত বুঝতে পারছি না!”

“সুন্দরী” কথাটা মঞ্জুষার বুক গিয়ে তীরের মত বিঁধল। সে ধীরকণ্ঠে বললে—“নির্জনে অনিষ্টের আশঙ্কা আমার নেই; আমি পতিতা! কাল বনভোজনে এসে মনকে হারিয়ে ফেলে গেছলুম; আজ তাকে ফিরিয়ে নেবার খোঁজে এসেছি।”

“এ কি হেঁয়ালী! কিছুই বুঝলুম না।”

“না বোঝাই সম্ভব। মানুষ ভোলানই বার স্বভাব, সে আজ নিজকে ভুলতে এসেছে; আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু উপায় কি! আমি যে কোনমতেই আপনাকে ধরে রাখতে পারছি না; অসম্ভবের নেশা আমাকে পাগল করে তুলেছে। সন্ন্যাসী তুমিই আমার সর্বনাশ করেছ!”

“আমি!”

“হ্যাঁ তুমি! এত রূপ কোথায় পেলে? বা আজ রূপোপজীবীর অন্তরেও রূপের সাধ জাগিয়ে তুলেছে। আলোয়ার আলোর যে সবার পথ হারিয়ে এসেছে, সে আজ পথের সন্ধান কোঁদে কোঁদে বুঝে!”

তপস্বী মুখ বিকৃতি করে বললেন—“উম্মাদিনী!”

‘উম্মাদিনী! তা হবে; কিন্তু.....’

“এর মধ্যে কোন ‘কিন্তু’ নেই রমণী। যাও, ফিরে যাও! আর এখানে এস না।”

এই বলে সে ধীরে ধীরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

\* \* \*

দীর্ঘ দিন পরের কথা। বসন্ত তখন আকাশে বাতাসে মদিরায় মাদকতা ছড়িয়ে দিয়েছিল। মধুপদল নগরের সর্বশ্রেষ্ঠা বারাগণা মণিমঞ্জুরার অভাব অনুভব করে মনে মনে ক্ষম্বে মন্থছিল। আর মঞ্জুরা? সে তখন জীবনের সর্বাঙ্গেক্ষা বড় প্রলোভনটার উম্মাদনায় একাকী বনের মধ্যে! তপস্বী সেই যে সে স্থান ত্যাগ করে গিয়েছিল, আর ফেরে নি। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন তার সেই বেদীটার উপর উপুড় হয়ে পড়ে মঞ্জুরা নিজেকে শেষ পথের পথিক করে তুলছিল।

পূর্ণিমার রাত্রি। ধ্যান-স্তিমিত নোত্র মঞ্জুরা শূন্য পানে তাকিয়ে কার আরাধনায় নিমগ্ন ছিল। একি! কার কণ্ঠস্বর! তার সর্বাঙ্গ একবার ধর ধর করে কেঁপে উঠল। নিশিদিন বে স্নেহের আলাপনে তার হৃদয়-তন্ত্রী কক্কত, সেই রাগ কি স্তম্ভি ধরে সামনে এসে দাঁড়াল।

তার দেহ তখন সোজা হতে পারছিল না; তবু অতি কষ্টে সে উঠে বসল।

বিস্মিত তপস্বী প্রশ্ন করলে—“এখনও তুমি এখানে পড়ে রয়েছ?”

মঞ্জুরা একটু হাসলে; তারপর মৃদুভাবে বললে—“কোথায় যাব? আমার সত্যকার আশ্রয় যে এখানেই গড়ে উঠেছে!”

কণিকের উত্তেজনায় সে উঠে বসেছিল; আর পারুলে না; ধীরে ধীরে বেদীর উপর শুয়ে পড়ল। এক ঝলক রক্ত তার মুখ দিয়ে উঠে বুক ভাসিয়ে দিতে লাগল। সে প্রাণপণ বলে চেষ্টা করে বলতে লাগল—“এ জীবনটা শুধু অভিনয়েই কেটে গেল! আশীর্বাদ কর, পরজন্মে যেন সত্য হয়! ওঃ! আজ যেন সারা পৃথিবীর খুম আমার চোখে আসছে! আর ত কিছুই দেখতে পারছি না! বিদায়! তপস্বী.....”

অর্দ্ধপথেই সে স্বর চিরদিনের মত কক্ক হয়ে গেল।

সন্ধ্যাসী একবার সেই মরণাহতার দিকে চেয়ে হাসলে; তারপর বনবীথির অন্তরালে ধীরে-ধীরে আপনাকে মিলিয়ে দিলে।

## নারী-সমস্যা

### শ্রীরবীন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী

বর্তমান জগতে নারীর স্থান কোথায় তাহা নিরাবহ তর্ক, বহু বাধামূলক, বহু লেখালেখি চলিতেছে। অধুনা তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষাগর্ভিত সমাজ সংস্কারকগণ পাশ্চাত্যের অনুকরণে নারীগণকে পুরুষের সমান অধিকার প্রদানে কৃতসংকল্প। আমাদের সমাজে নারীগণের দাসীত্বের দৃষ্টিতে তাহাদের সুনিত্যার ব্যাঘাত হয়। সমাজটাকে বেগুয়াশি মাল পাইয়া তাহার। বাহা ইচ্ছা করিতেছেন। মহামানবের মহাশক্তি মনু প্রভৃতি স্থললিত বাক্যচ্ছটার

মহুর আত্মপ্রাক্তের ব্যবস্থা করিতেও ছাড়েন নাই। মনুর উক্তি :—

“পিতা রক্ষতি কোমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে

রক্ষতি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যং অর্হতি।” এর বহু

প্রতিবাদ হইয়াছে; এমন কি মনুকে স্বার্থপর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিতেও তাঁহার। কুস্তিত হন নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমাত্রী সংস্কারকগণ ইংরাজী পড়িয়া পরামুর্করণে এতদূর সিদ্ধহস্ত হইয়াছেন, যে বিচারবিহীন

ভাবে পাশ্চাত্য রীতিনীতি প্রচলিত করিয়া সমাজরূপ বিরাট প্রাণদের ভিত্তি প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছেন। হিন্দুর সনাতন বিশিষ্টতাইটুকু আজ মৃতপ্রায়। এই বৈশিষ্ট্যটুকু হিন্দু সমাজের অতুল সম্পত্তি। শক বা হুনের আক্রমণে তাহা নষ্ট হয় নাই; মঙ্গোলিয়া বিজেতৃগণের গর্ক যে বৈশিষ্ট্যের নিকট মণ্ডক নত করিয়াছিল; মাসিডোনিয়া আলেক-জাণ্ডারের সমক্ষে যে শক্তি লইয়া গর্বোন্নত শিরে দণ্ডায়মান হইয়াছিল;—চেঙ্গিজ বা তৈমুরের বিজয়াভিযানে বাহা দলিত হয় নাই;—সর্বোপরি দীর্ঘ সাতশত বৎসরের মুসলমান শাসনে ও অত্যাচারে যে বৈশিষ্ট্য নিষ্কিয় হয় নাই, তাহা আজ ধূলায় লুপ্তিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে বৈশিষ্ট্যের সমুজ্জল জ্যোতিতে শক, হুণ ও গ্রীক প্রভৃতি বিজেতৃগণের শিক্ষা সভ্যতা নিম্নত হইয়া পড়িয়াছিল;—এবং পরিণামে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হিন্দু সভ্যতার গৌরব প্রভায় বিসর্জন দিয়া নিজদিগকে ধ্বংস মনে করিয়াছিল—সে টুকু এই মহু প্রভৃতি আর্ধ্য ঋষিগণের বহু গবেষণা সঙ্কুত সামাজিক শৃঙ্খলা। পৃথিবীর অস্ত্র কোন দেশ বাহা পারে নাই ভারত তাহা পারিয়াছে। সেই গ্রীস নাই, রোম নাই; কিন্তু ভারত এখনো আছে।

যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কণহায়া বিহয়ন্ততার অপূর্ণ লীলার মুখ মন,—কঙ্কনটি সংস্কারকগণ মহুর ‘ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি’ উক্তিভে বিরাগ প্রকাশ করেন—তাহাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে চিন্তাশীল পাশ্চাত্য মনীষিগণের মধ্যেও কেহ কেহ নারীজাতির সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন—তাহাদের সহিত তুলনা করিলে মহুর উক্তি মিন্দাহ’নহে। Spencer বলেন—“Woman is only a man paralysed and anested in her evolution”;—Velpeau বলেন—“Women are degenerate beings of a primitive masculinity”;—আধুনিক শিক্ষিত সমাজ তো এই সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে বিশেষ সম্মানের চক্রে দেখেন—এই সকল উক্তিভে তাঁহাদের কি বলিবার আছে? বাইবেলে উল্লেখ আছে—“Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord”—Ephesians. V. 22. ;—“The

head of the woman is the man”—Corinthian XI. 3.—মহু যদি স্বার্থপর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হন—তবে উপরোক্ত লেখকগণ কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইবেন? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তো নারীকে paralysed,—degenerate বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। হিন্দুগণ তো নারীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী,—সহধর্মিণী আখ্যা দিয়াছেন—বিবাহ ব্যতীত পুরুষ অপূর্ণ ঘোষণা করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র তো নারীকে স্বামীর সহিত ধর্ম্মাচরণের অবাধ অধিকার দিয়াছেন—কিন্তু পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্র নারীর ধর্ম্মাচরণের বিরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন শুধু—বাইবেল বলেন—“Let your woman keep silence in the churches”—I Corinthian XIV-34. কি চমৎকার ব্যবস্থা! ধর্ম্মমন্দিরে নারীর কোন অধিকার নাই।

পুরুষের প্রকৃতি ধ্বংসপ্রবণ, আর নারী-প্রকৃতি গঠনময়ী। মানব সভ্যতার আদিযুগে সমাজে কোন বাঁধন ছিল না। নারী ও পুরুষ একত্রে কস্মক্সে প্রতিযোগিতা করিত। বিবাহের প্রথা সমাজে তখনও প্রচলিত হয় নাই। একই নারী বিভিন্ন পুরুষের অঙ্গশায়িনী হইয়া স্ত্রীর কার্য নিষ্পন্ন করিত। সে ছিল স্বেচ্ছাচার—তন্ময় যুগ—যথেষ্টাচারের পূর্ণ প্রকটন। সন্তান তখন মায়ের নামে পরিচিত হইত। যেমন মাতা মহু হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহার সন্তান মানব নামে অভিহিত হইয়াছে। তেমন মাতা দিতি হইতে দৈত্য ও মাতা অদিতি হইতে অমরগণ উৎপন্ন হইয়াছে। অতি প্রাচীন যুগের এক শুভ মুহূর্ত্তে বিবাহ প্রথার সৃষ্টি হয়, নচেৎ সৃষ্টিক্রিয়া রক্ষা হয় না। পরিণয় প্রথার পূর্বেও সন্তান মায়ের নামে পরিচিত হইত। উক্ত বিবাহ প্রথার প্রচলনের পরে সমাজ যখন ধ্বংসশীলতার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া গঠনশীল হইয়া উঠে তখন গঠনশীলতার প্রভাবে সমাজে নারীর সংখ্যা পুরুষের অল্পপাতে বেশী হয়। তখন বহু নারী এক পতিকে বরণ করিত। তখনো কিন্তু সমাজে মাতৃপরিচরে পরিচিত হওয়ার প্রথা ছিল। তাই অতি প্রাচীনযুগে বিবাহ প্রথার প্রচলনের পরেও দক্ষ-প্রজাপতির দিতি, অদিতি, মহু প্রমুখ জন্মদশ কল্পা পিতা কশ্যপের সঙ্গে পরিণীতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের নিজ

নিজ পরিচয়ে পরিচয় লাভ করে। তাই বৈজ্ঞানিক Dr. Ward বলেন—“For long generation women exercised rule over man and matriarchy was the apparently natural order of things.”—

আদি যুগের সেই স্বেচ্ছাচার প্রচলিত থাকিলে পৃথিবীর লোকসংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইত কিনা সন্দেহ। সেই যুগে ধ্বংসপ্রবণ পুরুষজাতির সংস্পর্শে আসিয়া নারীই অনেকটা পুরুষভাবাপন্ন হইয়া উঠে। গঠনশীলতা সৃষ্টাবস্থায় থাকিয়া ধ্বংসপ্রবণতা তাহাদের মধ্যে বিশেষ কার্য্যকরী ছিল। তাই, আদিযুগে পুরুষের সংখ্যাধিক্য ছিল। কারণ ধ্বংসপ্রবণতা যেখানে অধিক সে স্থানে পুরুষ অধিক জন্মে এবং যেখানে গঠনশীলতার প্রভাব অধিক সেখানে মেয়ে অধিক জন্মে। আদিযুগে ছ’একটা চিন্তাশীল ব্যক্তি এই ধ্বংসপ্রবণতা লক্ষ্য করিয়া বিবাহের প্রচলনে সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান করেন। বিবাহের স্পর্শে ধীরে ধীরে নারীর সৃষ্ট প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়া উঠে, —স্নেহ, দয়া, প্রেম, কোমলতা প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হইয়া নারী পূর্ণতা লাভ করে।

পুরুষের বৃত্তিচয় বহিমুখী—নারীর বৃত্তিচয় অন্তর্মুখী। পুরুষ প্রাণপাত পরিশ্রমে সরঞ্জাম যোগাড় করিবে—নারী প্রতিমা গঠন করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। পুরুষ চঞ্চলচিত্ত প্রকৃত বাহক—নারী দক্ষ শিল্পী। নারী ভবিষ্যত সমাজের জন্মদাত্রী। জী-স্বাধীনতার ভীষণ আন্দোলনের দিনেও আমরা দেখিতেছি যে প্রায় প্রত্যেক গৃহেই নারীই সংসারে সম্পূর্ণ কর্ত্রী। পুরুষ শুধু অর্থোপার্জন করিয়াই খালাস। তবে ছ’একটা নারী যে লাহিতা না হয় তাহা নয়, কিন্তু তাই বলিয়া অনেক ব্রিটিশ ভ্রমণকারী যেমন লিখিয়াছেন যে, “এদেশে (লাহোরে) এক একটা জীলোক বোধ হয় একসঙ্গে বহু পুত্র প্রসব করে। এদেশে জীলোকের সংখ্যা অতি কম। পুরুষের অল্পপাতে শতকরা ৪৫ জন ইত্যাদি” উক্তির স্তায় সমগ্র সমাজকে দৌরী করিলে হাত্তাপদ হইতে হইবে।

তবে মনুষ্য উক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য—স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার প্রবাহে নারী আত্মবিস্তৃত হইয়া আবার Catabolic (ধ্বংসশীল) না হয়। সমাজে

আবার মহামারী প্রবেশ না করে। সাংসারিক কাজকর্ম নারী ও পুরুষ যদি বিভাগ করিয়া না নিয়া কার্য্য করিতে থাকে তবে অচিরেই সাংসারিক সুখশান্তি সমাদি প্রাপ্ত হইয়া “বথারগ্যাম্ তথা গৃহম্” বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করে।

পুরুষ স্বার্থপর—নারী পরার্থপর। পুরুষ ব্যক্তিগত সুখ চায়, নারী পরের সুখের জন্ত প্রাণ বিসর্জন দিতে সন্মত। পুরুষ চঞ্চল, তরল আমোদ প্রিয়—নারী স্থিরা, ধীরা, গভীরা। পুরুষ উদাম, উচ্ছৃঙ্খল,—আর নারী তাহার পশ্চাতে রাশ ধরিয়া শৃঙ্খলার পথে পরিচালিত করিতেছে। পুরুষ শক্তির ক্ষুদ্র কণিকামাত্র—নারী শক্তির আধার। পুরুষ কঠোর, নারী কোমল। হিন্দু আদি যুগেই এই সকল তত্ত্ব জানিত বলিয়া নারীকে পুরুষের নিয়ামক করিয়া গৃহলক্ষ্মীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নহিলে, নারীও বাহিরের কঠোর আবহাওয়ার স্পর্শে স্বেচ্ছাচারে প্রমত্ত হইয়া পৃথিবীতে বোর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিত।

নারী আধার বা ক্ষেত্র—পুরুষ আধেয়। যদি স্বাধীনত বনাম স্বেচ্ছাচারে বিপরীত গুণ সম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সংঘর্ষে সেই আধার বা ক্ষেত্র দূষিত হইয়া উঠে তাহা হইলে সমাজের স্থান কোথায়? সমাজ রক্ষায় নারীর দায়িত্ব পুরুষের চেয়ে অনেক অধিক। ঐ দায়িত্ব পরার্থপর নারী একদিন স্বেচ্ছায় মাথা পাতিয়া নিষাছিল।

অধুনা আমাদের দেশে সংস্কারকগণ ও অতি শিক্ষিতাগণ স্বাধীনতার জন্ত পাশ্চাত্যাত্মকরণে বোর কোলাহলে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করিতেছেন। পরার্থপরতা বিসর্জন দিয়া স্বার্থপরতার বোড়োড়ো খেলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভারতের মূলমন্ত্র ত্যাগকে বিসর্জন দিয়া বিলাসবাসনার তীব্র মদিরা পানে তাহারা বিহ্বল। পোষাক পরিচ্ছদে অজস্র মূড়া জলের মত ব্যয় হইতেছে। যেখানে সংঘের অভাব, ধ্বংস সেখানে অনিবার্য্য। মোহাচ্ছন্ন বাঙ্গালী আজ গৃহ ও সমাজকে বিধ্বস্ত করিয়া দ্রুত মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে। ম্যালেরিয়ার অস্থিমজ্জা চর্কণে দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব নৃত্যে বাংলার বক্ষের পঞ্জর এক একখানা খসিয়া পড়িতেছে—দারিদ্র্যের নাগপাশে ঐ জাতিটা আজ দৃঢ়বদ্ধ। আমাদের

সমাজ এখন আশা-উত্তম-আনন্দ-উৎসাহের অস্থিগঞ্জ বিশিষ্ট মহাশয়ান। বাংলার এখন “ঘোরানাবী মহারোজী আশানালয়বাসিনী” ধ্বংসমুর্তি তাওব নৃত্য বেড়াইতেছেন। বাংলা আজ মৃত্যুপথের পথিক। ঐ জন্ত দারী কে? অন্ধের মত বালাবিবাহের ঘাঁড়ে দোষ চাপান বৃথা, শুধু একটা মিথ্যার দ্বারা আর একটা বিরাট ভ্রান্তিকে আবৃত করার চেষ্টা মাত্র। সংঘের অভাব ও দারিদ্র্যই অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ; একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কখনও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। নহিলে বাঙ্গালী কখনও এমন উপেক্ষিত জীবন বাপন করে নাই। মহাভারতে দেখিতেছি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাঙ্গালী বীরগণ কোরব পক্ষে থাকিয়া অসীম বীরত্ব ও আলোকসামান্য পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া-ছিল। বাংলার সাম্রাজ্যসমূহ একসময়ে বারাগসী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বাংলার রাজপুত্র এক সময়ে সপ্তশত মাত্র বঙ্গ সম্রাটের সহায়তায় দ্বন্দ্বের বারিধি পারের সুদূর সিংহলে সগর্বে বিজয়বৈজয়ন্তী প্রোথিত করিয়াছিলেন। বাংলার বণিক অকুতোভয়ে তরঙ্গ-ভঙ্গ প্রেক্ষিত সাগরবন্ধ ভেদ করিয়া সিংহল, বাবা, সুমাত্রা, শ্রাম, চীন, জাপান প্রভৃতি সুদূর দেশে বাণিজ্য করিতে যাঠতেন। বাংলার রাজা গণেশ, সীতারাম, মুকুন্দরাম, চাঁদরায়, কেদাররায়, প্রতাপাদিত্য, কেশবাণী প্রভৃতি বীর পুত্রগণের বীরত্ব গাথা ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। অষ্ট শতাব্দী পূর্বেও বাঙ্গালীর বাহুতে বলের অভাব ছিল না। আর আজ বাঙ্গালী দুর্বল, ভীক, বলীবর্দ বলিয়া সমগ্র পৃথিবীর নিকট উপহাস্যাম্পদ। শস্ত-শ্রামলা বাংলার শস্ত-সম্ভার বিদেশীয় শাসনে প্রচুর পরিমাণে দেশান্তরে রপ্তানি হইতেছে। খাদ্যের অভাবে বাঙ্গালী দিন দিন জীর্ণ-জীর্ণ হইতেছে; তরুণি আমরা পাইতেছি বিদেশীয় শাসক হইতে প্রচুর পরিমাণে বিলাসের সামগ্রী। বিলাসিতা দারিদ্র্য আরও বাড়াইয়া দিতেছে। গৃহলক্ষ্মীগণের বিলাসিতার উপকরণ যোগাইতে গৃহস্থ আজ কতর হইবার উপক্রম হইয়াছে। সমাজের সর্বত্র ধ্বংসপ্রবণতা কাজ করিতেছে। বরপণে কস্তুর পিতার বাস্তবিতা পর্যন্ত বিক্রয় হইতেছে। এই ধ্বংসপ্রবণতা আরো কিছুদিন কার্যকরী থাকিলে কি অবস্থা

দাঁড়াইবে সংস্কারকগণ তাহা ভাবিবান্ অবকাশ কখনো পাইবেন কি? - না মরীচিকার পশ্চাতে অন্ধের মত শুধু ঘুড়িয়া বেড়াইবেন।

মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী আজ গৃহলক্ষ্মীদিগকে বিলাসের বিনোদিনী তৈয়ার করিয়াছে,—ঘোল আনা পূর্ণ হইতে আর বাকী নাই। উচ্চশিক্ষার নামে নারী চরিত্রে অসংযমের ভাব রুদ্র-মূর্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতীয় নারী সমাজ এখন সীতা, সাবিত্রীর আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া হাবোভাবে, বাক্যালাপে, ব্যবহারে, গোবাক পরিচ্ছদে, চালচলনে ইয়ুরোপীয় ললনাকুলের পদাঙ্ক অচুসরণে প্রযুক্ত হইয়াছেন। হোটেলের থানা না হইলে মুখরোচক হয় না। অনেকে নাকি ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলায়ও মত্ত। নারীর এই ভাব লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত Sir Almroth Wright বলেন “The women are insolvent; they do not pay their way; they should be grateful if they do not starve; still more if they live in ease and luxury; grateful to man who ‘‘makes all the money.’’—Catabolic tendency যে নারী চরিত্রের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে।

শিক্ষা নারীর উপায় হইতে পারে, কিন্তু চরিত্র হইতেছে প্রধান লক্ষ্য। কি কাজ এই সংযমহীন শিক্ষার? বিজ্ঞাত বিনয় দিতে পারে নাই, অহং ভাব বর্ধিত করিয়াছে মাত্র। লালসার অগ্নিকুণ্ডে হুতাহুতি দেয় যে শিক্ষায়, “গুণং কৃৎস্নং দ্ব্যতং পিবেৎ” যে শিক্ষায়, তাহাকে ত্যাগ করা চলে না কি? নারী অশিক্ষিতা থাকুক ইহা আমাদের ইচ্ছা নহে, কিন্তু তাহার যেন ভারতীয় আদর্শ বিসর্জন দিয়া বিদেশীয় আদর্শ গঠিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের মনে রাখা উচিত যে গার্গী, খনা, লীলাবতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীই তাহাদের আদর্শ পাশ্চাত্য ললনাকুল নহে। প্রাচীন ভারতে নারী-শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। তাহা মহাভারতে যৌগদি-চরিত্র পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। তারপরে বৌদ্ধযুগেও নারীশিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। বাংসায়নের কামশাস্ত্রে তাহার বিশদ বর্ণনা আছে। উক্ত কামশাস্ত্রসূত্রে নারীগণকে চৌশটি কলায় শিক্ষিত হইতে হইত।

বিলাসের শ্রোতে সমাজ এখন হাবুডুবু খাইতেছে। আমাদের দেশে শিক্ষিতাগণ নিত্য নূতন পোষাক ও fashion আমদানী করিয়া শিক্ষিতা অশিক্ষিতা সকল নারীর মনেই এক ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। আয়ের পথ নাই কিন্তু ব্যয় শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। বিলাতী শিক্ষার হলাহল পানে সমাজ এখন অস্থির—তাহার মজ্জার মজ্জার বিষের তীব্র ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ব্রিটিশ বণিকের জাতি, তাহারা চার কামধেনুর মত ভারতকে দোহন করিতে, তাই এই সংঘর্ষবিহীন শিক্ষা। তাহারা জানে নারী চরিত্র অলঙ্কার ও পোষাক পরিচ্ছদ প্রিয়;—তাই আমাদের দেশে নিত্য নূতন এত fashion-এর আমদানী—নহিলে তাহাদের পণ্যক্রয় কাটে না। বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতিতে লেখাপড়ার চেয়ে কাপড় কাঁচান এবং বেশভূষার পারিপাট্য বেশী মনযোগ সহকারে শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য ললমাকুল এখন দীর্ঘ কেশপাশ বহন করিতে চান না; তাহারা পুরুষের মত করিয়া চুল কাটান। সে চাকল্যের চেউ আমাদের দেশেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। India Britanised হইবার বেশী দেরী নাই। ঐ কথা তথাকথিত সংস্কারকগণ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? শিক্ষিতাগণ দিন দিন বিলাসের দাসী হইয়া পড়িতেছেন। জী স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র সাম্যবাদের অগ্রদূত আমেরিকার নাগীসম্বন্ধে William Thomas কি বলেন শুুন “The American woman of the better classes has superior rights and no duties yet she is worrying herself to death; not over specific troubles, but because he has lost her connection with reality. Many women, more energetic and more intelligent than their husbands and brothers, have no more serious occupations than to play the house cat, without ornament”—এ কি অবস্থা—অতি শিক্ষার এ'ক পরিণাম? বিলাস ছাড়া ইহার কিছুই জানেনা। মার্কিন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে মেয়েদের পরিচ্ছদের দেনা শোধ করিতে গৃহস্থ ক্ষতুর হইতেছে। ঐ সব দেশে হাজার হাজার

লোক দেনার দারে আদালতে উপস্থিত হয়। এই সব অবস্থার কারণ কি?—বিলাসিতা নয় কি?

নারী সমাজের কেন্দ্রাঙ্গ (centripetal) শক্তি। এই যুগে ইয়ুরোপের সমাজে বহিমুখীনতার প্রভাব এত বেগী যে কেন্দ্রাঙ্গ শক্তি সমাজ গঠনে এক প্রকার অসমর্থ। ইয়ুরোপ শিক্ষার, দীক্ষার, সভ্যতার অগতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে; কিন্তু সভ্যতার উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জীবন যাত্রা কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে। অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের জীবনযুদ্ধে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত—তাই পুরুষ সহজে বিবাহ করিয়া ভার বৃদ্ধি করিতে অনিচ্ছুক;—কারণ সে নিজেই অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করে। কত কুমারী মনোমত পাত্রের অপেক্ষায় চিরজীবন অবিবাহিতা থাকে; কাহারও বা স্বামী কার্যোপলক্ষে বিদেশে—সাবালক পুত্র জীবন যুদ্ধে পর হইয়া দাঁড়ায়। স্নেহ, প্রেম, কোমলতা বাহা নারী হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার পূর্ণ সাফল্য তাহারা পান না। তাই য়ুরোপ নারী সমাজে এই বিদ্রোহের ডাব।

শান্তির আসল দিকটা যখন তাহাদের সম্মুখে রুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়—তাহারা প্রাণের তৃষ্ণার শান্তির জন্ত নরুলের দিকে বুকিয়া পড়ে। টেবিল, চেয়ার, কোচ, কেন্দ্রাঙ্গ পোষাক পরিচ্ছদে বিলাসে ভোগে তাহারা শূন্য মনটা পূর্ণ করিয়া নিতে চায়। ইয়ুরোপে চিরকুমারীর হৃদয়নিহিত স্নেহের বাস্তবের পথে বাধা পাইয়া অবাস্তবের পথে নিফল ব্যস্ত হয়। ইহাতে তাহাদের নারী প্রকৃতির চরিতার্থতা হইয়া না,—পরন্তু, নিজেদেরও প্রকৃত পরিভূষণ হইতে পারে না। স্ত্রের পথে বাধা পাইয়া পাশ্চাত্য নারীকুল এখন বন্ধনহীন, প্রেমহীন, নীরস কঠোর স্বাধীন হইয়াছে। ইয়ুরোপ তাহার কবির উপদেশ ভুলিয়া সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছে। পাশ্চাত্য কবি Tennyson বলেন—

“Man for the field, woman for the hearth,  
Man with the sword-with the needle she,  
Man with the head, she with the heart,  
Man to command, woman to obey,  
All else confusion.”



পাশ্চাত্য সমাজে কবির বাণী সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যাত্মকরণে নারীর এই প্রকার মরুভূমির মত স্বাধীনতা ভারত সমাজের কল্যাণ কি পরিমাণে সাধন করিবে তাহা সহজেই বোধগম্য। তাই মজুর “ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যং অর্হতি”র ব্যবস্থা। পুরুষের ঘাঁড়ে যদি বোঝা না চাপে তবে সে সহজেই দায়ীত্বহীন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া দাঁড়ায়। উক্ত ব্যবস্থা নিজের জন্ত নয়, সমাজের জন্ত। নারী কেন্দ্রা-গুণ শক্তিবাহী সমাজকে পরিপোষণ করিবে—পুরুষ তাহাকে প্রতিপালন করিবে। উক্ত ব্যবস্থার উভয়েই দায়ীত্ব বদ্ধ—সমাজও শৃঙ্খলাবদ্ধ।

ইউরোপের তুলনায় আমাদের সমাজে নারী অশিক্ষিতা, একথা অস্বীকার করা চলে না;—কিন্তু শিক্ষার যে তাহা-দিগকে আপনাতাবিনী করিয়া তুলিয়াছে,—জীবনযুদ্ধে ক্রমা-গত ক্ষতবিক্ত হইয়া তাহারা যে স্বার্থপর হইয়াছে।

শিক্ষার তাহাদিগকে সংযম শিখাইতে পারে নাই। আবার আমাদের সমাজে নারী প্রকৃতির স্বার্থকতা পতি পিতা, ভ্রাতা ও পুত্র লইয়া। রোহ, দয়া, প্রেম কোমলতার চরিতার্থতার নারীপ্রকৃতির পূর্ণ স্বার্থকতা। কোচ, কেদরা, কার্পেট, টেনিস-লন, বলনাচ প্রভৃতি আমাদের সমাজে না থাকিলেও নারী জীবন ব্যর্থ হইতেছে মনে করা একটা বিরাট ভ্রান্তি। ইউরোপের মত আবাস্তবের পথে শুক্কনয়ে কুকুর বা বিড়াল পোষিয়া জীবপ্রেম আমাদের নারী শিখেনা বটে। তাহারা পায় বাস্তবের পথে স্নেহ, শাস্তি, ভূষ্টি। আমাদের নারী ভালবাসিয়া এবং ভালবাসা পাইয়া প্রাণের তৃষ্ণার শাস্তি পায়। অত্যাচারী পতি বা অত্যাচারী পুরুষ যে আমাদের সমাজে নাই, একথা বলা চলেনা বটে;—কিন্তু ইউরোপেও ঐরূপ পুরুষ বা পতির অভাব নাই।

স্নেহ প্রেতীরস—পূর্ণ হৃদয় লইয়া গঠন শীলতা আমাদের নারী সমাজের বৈশিষ্ট্য। অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাব ভরস ঐ বৈশিষ্ট্যটুকু দিনের পর দিন ক্ষুণ্ণ করিতেছে। মরুভূমির মত মহা শুষ্কতা ও শূন্যতা, আবাস্তবের পথে স্নেহের তৃষ্ণা—অসংযমের প্রাবল্য আমাদের নারী সমাজের মজ্জার মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। শিক্ষার নারীর anabolic tendency বিন দিন নষ্ট হইতেছে। পুরুষ সর্ব সমাজেই কিঞ্চিদধীক অসংযমী? কেন্দ্রাঙ্গুণ শক্তি অসংযমের স্রোতে নিজের বৈশিষ্ট্য ভাসাইয়া দিয়া বহিস্থা পুরুষের শক্তিকে অন্তর্মুখী করিতে অসমর্থ। শিক্ষার সঙ্গে সংযমের যোগ চাই,—নহিলে সে শিক্ষা কল্যাণকরী হইবে না। পরার্থপরতা, গঠনশীলতা নারীচরিত্রের প্রধান লক্ষ্য শিক্ষার নারী বাহাতে লক্ষ্যহার্য না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে আমাদের সমাজ, ধন, জন, বিবাহ ব্যক্তিগত স্নেহের জন্ত নয়। আর নারী জাতির আদর্শ সীতা, সুবিজী, দময়ন্তী।

শিক্ষার বাহাতে নারী অসংযমী না হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে; কারণ নারীই ভবিষ্যত সমাজের আশ্রয়-স্থল,—শিক্ষারিত্রী। নারী যদি উচ্চাদর্শে নিজ চরিত্র গঠন করিতে না পারে তবে সমাজও ধীরে ধীরে অধঃপতনের নিয়ন্তরে নামিয়া যাইবে। Ibsen বলেন—“Nearly all men who go to ruin early have had untruthful mothers”—এ কথা অতি খাঁটি। তাই সমাজে আজ এই আবস্থা। তাই বলি নারী!—আজ তোমরা দাঁড়াও,—বিলাসের ফাঁস হইতে নিজদিগকে মুক্ত কর,—সংযমের মধ্য দিয়া শিক্ষার পথে অগ্রসর হও। নহিলে কে ভাবিষ্যত সমাজকে গঠন করিবে?



## রাজা গণেশ

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সরকার বি, এ, সাহিত্য-ভারতী

আমরা দেখিরাছি, কেবল মাত্র হিন্দু রাজত্ববর্গই ক্ষাত্রাধর্ম ও রাজনীতি প্রতিপালন জন্য আততায়ীর বিরুদ্ধে অত্যাধিকার করিতেন। হিন্দু প্রজার সে বিষয়ে সহানুভূতি ছিল না; তাহারা নিজ নিজ ধন প্রাণ রক্ষা করিবার জন্যই ব্যস্ত থাকিত এবং তাহা রক্ষা পাইলেই কৃতার্থ হইত। রাজার পরিবর্তনে হিন্দুপ্রজা কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া অভিনব রাজার বশতা স্বীকার করিত। বাদশাহ্ বাবরও তাঁহার আশ্রয়িত্তে একধার সমর্থন করিয়া বলেন, বাঙ্গালীরা শুধু রাজ-সিংহাসনের উপরেই প্রজ্ঞাবান, সেই সিংহাসনে যিনিই উপবিষ্ট হউন না কেন, তাহাতে তাহাদের কিছু আসিয়া যায় না। \*

পাঠান শাসন কালের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে একধার সত্যতা কতকটা উপলব্ধি করা যায়। দুষ্টান্ত স্বরূপ বলা বাহিষে পারে যে, যে মুলতান গিয়াসুদ্দিন পিতৃহত্যার মহাপাপে কলঙ্কিত হইয়া রাজমুকুট শিরে ধারণ করিলেন, তিনি ইতিহাসে ভ্রান্তনিষ্ঠ ও প্রজাবৎসল নরপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাহা হোক, কখন কখন দেখা যায় যে সেকালেও রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগে বুদ্ধিমান শক্তিশালী ভূস্বামী বাহুবলে বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিয়া নরপতিরূপে রাজ্যশাসন করিয়াছেন। এই রাজপরিবর্তনের সহিত বঙ্গের জন-সাধারণের বেশ সহানুভূতি ছিল। রাজা গণেশের কাহিনী ইহারই একটি উদাহরণ।

রাজা গণেশ ভাতুরিয়ার পরাক্রান্ত অমিরার ছিলেন। ভাতুরিয়া পরগণার অধিকাংশ এখন রাজসাহী জিলার অন্তর্গত।

রাজা গণেশ ছিলেন মুলতান গিয়াসুদ্দীনের আমলে, রাজসভার একজন প্রধান আমীর। রাজসভার তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, স্বরাজ্যে তাঁহার সেনাবল ছিল। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয়কেই সমক্ষে দেখিতেন। রাজা গণেশের বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন নরসিংহ নাড়িয়াল ওঝা,—

“যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত।

সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আর ওঝার বংশজাত ॥

যেই নরসিংহ যশ ধোবে ত্রিভুবন।

সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ ॥

যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।

গোড়িয়া বাদশাহে মারি গোড়ে হৈলা রাজা ॥”

—ঈশান নাগর বিরচিত “অখ্যেত প্রকাশ”।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের দেহান্তর হইয়াছে, সে দুই শত বৎসরের কথা। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালার স্বাধীনতা-রবি চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। তারপর বঙ্গের রাষ্ট্রগগনে যে এক ভীষণ উজ্জ্বল রেখাপাত করিল তাহা দিন দিন বর্দ্ধিতায়তন হইয়া অত্যাচার, উৎপীড়ন, সামাজিক সঙ্কীর্ণ-তাবির দ্বারা বাঙ্গালার আকাশ বাতাস তীব্র পুঁতিগন্ধময় করিয়া তুলিল। যখন ধনী, দরিদ্র সকলের ঘরে ঘরে একটা হতাশার উৎকট উচ্ছ্বাস প্রকটিত হইল, তখন দক্ষিণ বঙ্গের গগনকোণে একটা অম্পষ্ট আলো দেখা দিল। প্রজা-সাধারণের ক্ষুর হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। তাহারা সকলে সমবেত হইয়া রাজা গণেশের শরণাগত হইল। গণেশ তাঁহার মঙ্গল হস্তে সকলকে আশীর্বাদ করিলেন।

\* Tuzak-i-Babari: Elliot,—Vol. IV. P. 360,—The people of Bengal say, “We are faithful to the throne, whoever fills the throne we are obedient and true to it.”

গণেশ নারায়ণ নির্ভীক বীর পুরুষ ছিলেন। কাপুরুষ-জানোচিত বিশ্বাসঘাতকতা বা রাজদ্রোহিতা কাহাকে বলেম তিনি জানিতেন না। তিনি সুলতানের দরবারে উপস্থিত হইয়া প্রজার দুঃখ নিবেদন করিলেন। তখন গিরাঙ্গদিনের পুত্র সৈকউদ্দীন বন্ধের সুলতান। তিনি রাজা গণেশকে বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার মন্ত্রণা গ্রহণ করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বল ও চিররুগ্ন। তাঁহার গোষ্ঠ্যপুত্র ও বঙ্গ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আলিহ শা তৎস্থানীয় হইয়া সমুদয় রাজকাৰ্য্য পরিচালনা করিতেন। আলিম শা উদ্ধৃত যুবক, অসংযত ও অপরিণামদর্শী। তাঁহার প্রগেচনার ও অনেকটা স্বীয় দৌর্বল্যহেতু সুলতান রাজ্য গণেশ নারায়ণের উপদেশ উপেক্ষা করিলে গণেশ বলিলেন “প্রজার প্রতি দয়া হ’ল না, সুলতান! দরিদ্র প্রজাদের কল্যাণ করুন, হিন্দুকে মিত্র ভাবে গ্রহণ করুন, পাঠান রাজ্য অচুট থাক্বে। ভেবে দেখুন, জাহাপনা, প্রজার সন্তোষে রাজার শক্তি,—প্রজার অসন্তোষে রাজার দুর্বলতা! অত্যাচারে রাজ শক্তির অপচয় হয়, প্রজার বাহতে শক্তি সঞ্চয় হয়।”

সুলতান বাক্যগ্রহণ করিলেন না। আলিম শা বলিলেন, “গণেশ, তুমি পাঠানের শত্রু, পাঠানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে জাগাইতেছ, হিন্দুকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া পাঠান রাজ্য উচ্ছেদের চেষ্টা করিতেছ।”

রাগে ও ঘৃণায় গণেশ নারায়ণের চকু কাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, “আলিম শা, সে মিথ্যা কথা, গণেশ নারায়ণ এত সঙ্গী নর, সে মিথ্যা কাহাকে বলে জানে না। গণেশ রাজ্য চায় না, চায় শুধু শান্তি। হিন্দুকে আশ্রয়, সে তোমার গোলাম হ’য়ে থাক্বে, পীড়ন কর, সে অস্ত্র ধরে দাঁড়াবে। সে জানে, আজ যদি বাঙ্গালী স্বাধীন হয়, কাল আবার পরাধীন হ’বে—কারণ, ঐক্যহীন, স্বার্থান্ধ বাঙ্গালী দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা কর্তে পারবে না। বাঙ্গালী ক্রীপুত্র ও ধর্মের অস্ত্র গ্রাণ দিতে পারে, কিন্তু দেশের অস্ত্র এক ফাঁটা অস্ত্র বিসর্জন কর্তে চায় না। যখন বৈধর্ম্য-ম্রাত হয়, তখন অস্ত্র ধ’রে দাঁড়ায় যেমন পিপড়েটাও মাড়ালে কিরে কামড়ে ধরে।”

আলিম শা গণেশের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দুঃখে ও ক্ষোভে গণেশ নারায়ণ দরবার কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

হিন্দুর উপরে অত্যাচার দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। ধনীর ধন, মানীর মান, সতীর সতীত্ব অপহৃত হইতে লাগিল। একদিন দৈবক্রমে গণেশ নারায়ণ স্বয়ং দেখিতে পাইলেন ইন্ডিয়ের দাস আলিম কর্তৃপক্ষ সৈনিক সহ একটা যুবতী হিন্দু রমণীর সতীত্ব নাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছে। তখন সন্ধ্যাকাল। পুতসলিলা কালিনী ধরবেগে প্রবাহিত হইতেছে। রাজা গণেশ অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া একাকী আলিম শা ও সৈনিকগণকে তরবারি সঞ্চালনে পরাভূত করিয়া রমণীর উদ্ধার সাধন করিলেন। রাগে আলিম শায় চক্ষুর্ধ্ব হইতে অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল! গণেশ সেদিকে ক্রক্ষেপ না করিয়া রমণীকে সহ রাজধানী অভিমুখে প্রেস্থান করিলেন।

পরদিন সুলতানের দরবারে গণেশ নারায়ণের তলব হইল। গণেশ নারায়ণ গজারোহণ যাত্রা করিলেন। সঙ্গে শত শরীররক্ষী চলিল।

সুলতান সৈকউদ্দীন দরবার গৃহে উচ্চ সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। দরবার গৃহ লোকে লোকারণ্য। সিংহাসন পার্শ্বে আলিম শা। গণেশ নারায়ণ আসিয়া বিচারপ্রার্থীর স্থানে দাঁড়াইলেন। তাহা দেখিয়া আলিম শা চীৎকার করিয়া বলিলেন, “গণেশ নারায়ণ, বিচারপ্রার্থীর স্থান পরিত্যাগ করিয়া অপরাধীর স্থান গ্রহণ কর।”

গণেশ নড়িলেন না। আলিম শা পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, “গণেশ নারায়ণ, অপরাধীর স্থান গ্রহণ কর।”

গণেশ নারায়ণ। আমার অপরাধ কি?

আলিম শা। রাজবিরোধ।

গণেশ। রাজবিরোধী আমি, না, তুমি। তুমিই পাঠান মরণতির স্তন্যম ধ্বংস করিতেছ।

আ। তোমার অপরাধ গুরুতর,—তুমি রাজলৈক্য মিহত করিয়াছ।

স। আমার অভিযোক্তা কে?

আ। আমি।

গ। তবে তুমি আগে বিচার-প্রার্থীর স্থান গ্রহণ কর।

আলিম শা নিরুত্তর।

সুলতান এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—“গণেশনারায়ণ, তুমি রাজবিদ্বেষী?”

গণেশ। কার্যতঃ নয়।

সুলতান। তুমি রাজসৈন্ত নিহত করিয়াছ?

গণেশ। করিয়াছি।

সুলতান। কেন?

গণেশ। আত্মরক্ষার নিমিত্ত।

সুলতান। বিনা কারণে রাজসৈন্ত তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিল?

গণেশ। আলিমশার আদেশে তাহারা আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

সুলতান। আলিম শা অকারণ কেন এরূপ আদেশ দিবে?

গণেশ। সেই কথা বলিতেই আমি অভিযোক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছি। নামিয়া এস, আলিম শা—অপরোধী আসন গ্রহণ কর।

গণেশ নারায়ণের নির্ভীকতা দেখিয়া সভাসদগণের বিস্ময়ের নীমা রহিল না। সুলতান অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা গণেশকে অমাত্য পদে বরণ করিলেন। এরূপে বিবাদের মীমাংসা হইল।

রাজা গণেশনারায়ণ সম্বন্ধে এরূপ বহু উপাখ্যান আছে। সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, ইতিহাস সম্মান করে যে রাজা গণেশ দেশহিতে, লোকহিতে স্বীয় জীবনের মাত্রাকে উপেক্ষা করিতেন। তিনি পাঠান-গণকে নির্জীত রাখিতেন এবং তদ্বীর প্রজাগণ সুখে শান্তিতে বাস করিত।

জুরহদর আলিম শা গণেশের অপমান ভুলিলেন না। দশ বৎসর রাজত্বের পর সুলতান সৈকউদ্দীন পরলোক গমন করিলে আলিম শা সিংহাসনে উপবেশন করিয়া গণেশ নারায়ণকে সমুচিত শিকা দিবার নিমিত্ত নানা কৌশলজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন।

গণেশনারায়ণ সেজন্ত প্রস্তুত ছিলেন। তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, আলিমশার আমলে হিন্দুর ধনমান কিছুই নিরাপদ হইবে না। হিন্দুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত হিন্দুকেই অস্ত্রধারণ করিতে হইবে। সুতরাং রাজা গণেশ সীতোলরাজের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। সীতোলরাজ ভাছুরী চক্রবর্তী গণেশের সাহায্যার্থ রামাশ্রমার অধীনে দশ সহস্র সৈন্ত প্রেরণ করিলেন।

রামাশ্রমা ছিল সে কালের প্রসিদ্ধ দম্ভ। রাজ-সাহীর বিখ্যাত চলনবিল তাহাদের লীলাক্ষেত্র ছিল। ইহাদের প্রতিপত্তি এতাদৃশ ছিল যে সীতোলরাজ ও ভাছুরী চক্র ইহাদের বীরত্বকারে কম্পবান হইত, এমন কি পাঠানরাজও ইহাদিগকে শাসনাবধীনে আনিতে সমর্থ হন মাই।

রাজা গণেশ উপযুক্ত সৈন্তবল সংগ্রহ করিয়া পাঠানরাজপুত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শুনিয়া আলিম শা আদেশ দিলেন, “প্রত্যেক হিন্দু-গৃহ হইতে এক একজন বলিষ্ঠ যুবক ধরিয়া আন।”

আদেশ গণেশ নারায়ণের কর্ণগোচর হইল। তাঁহারই ইচ্ছিতে হিন্দুগণ দলে দলে আসিয়া কারাগৃহ পূর্ণ করিতে লাগিল।

এদিকে গণেশ ভাছুরী ও বর্দ্ধনকোট হইতে সৈন্ত লইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বঙ্গের অত্যাচারিত ভারাক্রান্ত প্রজাগণ আসিয়া তাঁহার সাহায্য করিল। যে লাঠি ধরিতে জানে তাহার হাতে লাঠি, যে তরবারি ধরিতে জানে তাহার হাতে খড়্গ, যে ধনুকে গুণ দিতে জানে তাহার হাতে তীর ধনুক, যে কিছুই জানে না তাহার হাতে শুধু বশী। এরূপে প্রায় ত্রিশ হাজার বাঙ্গালীকে সজ্জিত করিয়া গণেশ সুলতানের প্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কিছু শিক্ষিত সৈন্তও ছিল। তাহার সাহায্যে এক সহস্রের অধিক হইবে না। সৈন্তেরা বলিষ্ঠ, কার্য-কুশলী ও শিক্ষিত। গণেশ স্বয়ং তাহাদের শিক্ষাদাতা।

তিনি বলিয়াছিলেন এই সৈন্ততুল্য পঞ্চাশ হাজার সেনা থাকিলে সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করা যাইতে পারে। রাজা গণেশ এই মুষ্টিমেয় সৈন্তের সাহায্যে বন্দী বাঙ্গালীদের মুক্ত করিলেন।

বাঙ্গালী তখনও নির্ভীক হয় নাই, তখনও বাঙ্গালীর ভুজ্জে অভুলনীর শক্তি। বাঙ্গালীর অসাধ্য কিছুই ছিল না। শিল্পে, কারুকাৰ্য্যে, হলাকর্ষণে, গৃহনিৰ্ম্মাণে, রণক্ষেত্রে, নৌগঠনে, বাণিজ্যে, মল্লযুদ্ধে বাঙ্গালী একদিন অভুলনীর ছিল। বাঙ্গালী ধর্ম্ম হারাইয়া একে একে সব হারাইল। বাঙ্গালী তখন বিশ্বাসঘাতক, রাজদ্রোহী ছিল না। দেবতাজ্ঞানে রাজাকে পূজা করিত—এখন বাঙ্গালী দেবদে মনুষ্যদে জলাঞ্জলি দিয়াছে। এখন তাহার বাহুতে সে শক্তি, হৃদয়ে সে অধাবসার, সমাজে সে ঐক্য কই? সে স্বার্থত্যাগী, পরহিতৈষী, সে বীরকুলগৌরব বাঙ্গালী কোথায় গেল? আর কি জন্মিবে না?

পাঠান বাঙ্গালীদের দেখিয়াছে, তাহাদের বীর্য্যও দেখিয়াছে। বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে যা খাইয়া পাঠান বা মোগল আর সেদিকে ঘেঁসে নাই। তারপর নৈদিন সীতারাম রায়, প্রতাপাদিত্য মোগলকে যে শিক্ষা দিলেন, তাহা ইতিহাস ভুলিলেও বাঙ্গালী কখনও ভুলিবে না।

ইতিহাস, বাঙ্গালীর কলঙ্কের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে, কিন্তু বীর্য্যগাথা লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছে। বাঙ্গালী রাজা কিরূপে অলমাত্র সৈন্ত লইয়া লক্ষ সৈন্তের অধিপতি জোনপুরের সুলতান ইব্রাহিম-ই-সরকৌকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, ইতিহাস সে কথা লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছে। আবার কিরূপে তিনি রাজ্যভ্রষ্ট, বিভারিত আরাকানের মগরাজা মেংসু-মেয়ানকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, \* ইতিহাস সে কথা লিপিবদ্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। ইতিহাস এমনই অনেক কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

আমরা আজ ইতিহাস হারাইয়া ভাবিতেছি, বাঙ্গালীর ভুজ্জে কোন কালে বুদ্ধি শক্তি ছিল না।

শক্তি যে ছিল তাহা প্রতিপন্ন করিতে রাজা গণেশ অগ্রসর হইলেন। অশিক্ষিত, অজ্ঞবিহীন বাঙ্গালী সেনা লইয়া তিনি দুর্ধর্ষবেগে পাঠান নরপতির প্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। অচিরে ফটক ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাঙ্গালীরা ‘জয় পাটলা দেবীর জয়’, ‘জয় রাজা গণেশ নারায়ণের জয়’ বলিতে বলিতে বাধাযুক্ত নদী-প্রবাহের স্থায় প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিল। পাঠানের সহিত বাঙ্গালীর তুমুল যুদ্ধ হইল। আলিম শা নিহত হইলেন। বিজয়লক্ষ্মী রাজা গণেশের অঙ্কশয় করিলেন। পাঠান সিংহাসন উৎখলিত জাহ্নবীগর্ভে ডুবিয়া গেল।

মেঘ কাটা গেল, বাঙ্গালার আকাশে নবীন সূর্য্য সমুদিত হইল। জাহ্নবী আবার কলকল নাদে বেদ-গান করিতে লাগিল—বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায় শাখায় পাখীগণ আবার মঙ্গলিক স্তোত্র গাহিয়া উঠিল, বিক্যাচল পুনরায় সমুদ্রত মস্তক তুলিয়া সাহস্বারে চাহিয়া দেখিল। ছইশত বর্ষ পরে আবার বাঙ্গালার নীলাকাশ তলে বাঙ্গালীর নবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল—বাঙ্গালার মাঠে ঘাটে আধ্যাত্মিক-গাথা আবার মুখরিত হইয়া উঠিল। “মহারাত্রি শিবাজী এবং পঞ্জাবের রণজিৎ শির্স আর কোন হিন্দু রাজা” এরূপ সমুখ সমরে মুসলমান ভূপতিকে নিহত করিয়া স্বাধীন হিন্দু রাজ্য সংস্থাপিত করিতে পারেন নাই।

হিন্দুর ঘরে ঘরে জয় জয়কার উঠিল, আবার বাঙ্গালার মঙ্গল শব্দ বাজিয়া উঠিল, ধূপধূনার গন্ধে দেবায়তনগুলি সজীব হইয়া উঠিল। যজ্ঞের ধূমে দেশ পবিত্র হইল, আবার সামের মধুর ধ্বনি জাহ্নবী সলিলে ভাসিয়া চলিল। হিন্দু বছদিন পর পুনরায় নবজীবন লাভ করিয়া ধরনীতলে বীরপদভরে দণ্ডায়মান হইল।

\* ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানরাজ মেংসুমেয়ান পলাইয়া আশিয়া গৌড়েশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন জোনপুর রাজের সঙ্গে গণেশের বিবাদ চলিতেছিল। গৌড়রাজের সেনার সাহায্যে আরাকান-রাজ স্বরাজ্যের উদ্ধার করেন ও আপনাকে গৌড়েশ্বরের সামন্ত বলিয়া স্বীকার করেন।”

## উষা

### শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত তত্ত্বনিধি

১ম অঙ্ক

৮ম গর্ভাক

গোলাপী বাইজির দ্বিতল বাসভবনের সম্মুখস্থ  
বারেন্দ্রায় বাইজি তরকা হেলানে বসিয়া তামাক  
টানিতেছে—দাসীরা সন্ধ্যাবাতি ধূপধূনাদি দিতে ব্যস্ত।

কাল—সন্ধ্যা

(গোলাপী বাইজি, কুসুম, ওস্তাদজি, নরেন্দ্রায়,  
দয়াময় সোম, হীরা ও কাহ্ন)

ওস্তাদজির প্রবেশ।

গোলাপী—আইয়ে ওস্তাদ জি! ও হীরা! হীরা!

হীরা—(নেপথ্যে)—যাচ্ছি মা।

গোলাপী—কি কচ্ছিস্?

হীরা—এই যে দীপ ধরাচ্ছি—ধূপ-ধূনোর জোগাড়  
কচ্ছি।

গোলাপী—ও সব এখন রেখে দে। ওস্তাদজি  
এসেছেন—তার বসুবার জন্ত একটা কুর্চি নিয়ে আর।

হীরা—ও মা! এ কি রকম কথা! সন্ধ্যা যে  
বয়ে গেল। বাতি জালবো কখন? কাহ্নকে  
বলুন না।

কাহ্ন—(নেপথ্যে) আর বোলতে হবে না। এই  
আমি নিয়ে আস্টি মা।

(কুর্চিলহ কাহ্নর প্রবেশ)

গোলাপী—বৈঠিরে ওস্তাদজি। মেহেরবাণি  
করূকে উহা গান্ বৈঠিরে।

ওস্তাদজি—(বসিতে বসিতে) কেয়া বেটা।  
তোমরা তবিরং আচ্ছা হার?

গোলাপী—নেহি ওস্তাদজি। ছরোজ্ সে মেরা  
তবিরং আচ্ছা নেহি হার। মেজাজ বি ঠিক নেহি।

ওস্তাদজি—কাহ্নে?

গোলাপী—ছরোজ্ রাতকো জেরা বোখার মালুম  
হোতা। আউর খানা পিনা কুচ্ নেহি আচ্ছা  
লাগতা। ইস্ওয়ান্তে মেজাজ বি মোরা বিগার  
গারা।

ওস্তাদ খোদাকা মেহেরবাণিসে সব্ ছুট্ জাগা।  
বেটা! সব্ ছুট্ জাগা। তবিরং জরুর আচ্ছা বান্  
জাগা।

গোলাপী—বহত্ বহত্ সলাম ওস্তাদজি! খোদাকা  
মেহেরবাণিসে হুনিয়ামে আপ্কা মেহেরবাণি হাম্  
জান্তি মান্তা।

ওস্তাদজি—তোমরা লারকি কাহ্ন?

গোলাপী—কলেজকা একঠো ছুকরীকা সাখ্  
আলম্‌মে বাত্‌চিং করুণে রাহা। আচ্ছা হাম্‌ উনুকা  
বোলাতা। মা! কুসুম! কুসুম!

কুসুম—(নেপথ্যে) যাচ্ছি মা!

গোলাপী—বসে—বসে—কি গল্প কচ্ছিস্?  
কতক্ষণ হলো ওস্তাদজি এসেছেন! তিনি ফিরে  
যাবেন্ না কি?

কুসুম—(নেপথ্যে) না ফিরে যাবেন কেন?  
এই যাচ্ছি।

গোলাপী—পাশের কোঠা হতে হারমোনিয়মটে  
নিয়ে এসো। হীরা! ও হীরা! এক ছিলিম্  
তামাক দিয়ো যা। আর আমার জন্ত এক গেলাস্  
জল নিয়ে আর। বড্ড তৃষ্ণা পেয়েছে।

(হারমোনিয়ম্‌সহ কুসুমের প্রবেশ)

কুসুম। আদাব্ ওস্তাদজি!

ওস্তাদ—বৈঠো। আভি কোন্‌ গানা কসুরং  
করতা?

কুমুম—আভি একঠো মন্ বাজলা গান। কসরৎ করতা থা।

(এক ছিগিম্ তামাক ও জলের গেলাস সহ হীরার প্রবেশ)

গোলাপী—(জল পান করিতে করিতে) বড্ড তৃষ্ণা পেয়েছিল। প্রাণটা বেন ঝাৎ ঝাৎ কচ্ছে। আবার বুঝি জর আসে!

কুমুম—ওস্তাদজি! থোরা ষড়ি বৈঠিয়ে। হাম্ জলদি যুম্কে আতা। মা! ও মেয়েটা আমাদের প্রধান শিক্ষয়িত্রী বোনঝি। ও আর আমি এক এক ক্লাশেই পড়ি। ওকে আমি বিদায় করে দিয়ে আসি।

গোলাপী—শীগীর এসো। ওস্তাদজি বসে রলেন।

কুমুম—যাবো আর আসবো। হদ্দ চার পাঁচ মিনিট গোণ হতে পারে। (প্রস্থান)

ওস্তাদ—দেখো তোমরা বেটীক। আওয়ার বহুত মিঠা।

গোলাপী—ঐ মিঠা আওয়ার শুনকে কৈ রূপেরা দেগা ওস্তাদজি? কোয়েলা বহুত মিঠি বোলতা—এসি-ওরাস্তে কৈ উন্কে। রূপেরা দেতা নেহি।

ওস্তাদ—নাহি মেনেসে কেয়া হরজ্?

গোলাপী—খানা-পিনা চলগা কেইসে?

ওস্তাদ—উই মুকিলকি বাত হার বোশাক।

গোলাপী—আচ্ছা—আচ্ছা—গানা—শিখ্‌নাই পরেগা।

ওস্তাদ—দেখো বেটী! গানা—বেচনেক। চিজ্ নেহি হার। গারেগী দিলসে—যো শুনেগা—উহ মশগুল হো জায়েগা।

গোলাপী—গানা বেচনা সুরুৎ বেচনা তো হাম লোক্‌কা পেশাই হার।

ওস্তাদ—সমাজলিয়া বেটী—সমাজলিয়া। তোমরা লারকীকো বেরসা মিঠি আওয়ার—চেহারা বি উস্কা বহুত খাপ্‌সুরুৎ হার। যো উনিকা গানা শুনেগা আউর সুরুৎ দেখেগা ওহি রূপেরা দেগা।

গোলাপী—(স্বগত) সব সত্য ওস্তাদজি। সব সত্য। যে আমার মেরেকে দেখবে—যে ওর দুটো গান শুনেবে সেই ওকে ভালবাসবে। মনঃপ্রাণ সপে দিয়ে আত্মহারা হয়ে ওকে ভালবাসবে। কিন্তু অহো! চীর নির্মল—চীর উজ্জল—চীর পবিত্র শান্ত শীত চন্দ্রিকা যেমন মসীলিষ্ঠ কাচ মধ্যে নিপতিত হ'লে কৃষ্ণ প্রতিবিম্ব প্রদান করে—এও তেমি। এই ভালবাসাও ঠিক সেইরূপ একটা কল্মিত কলঙ্কিত ঘোর কৃষ্ণ প্রতিবিম্ব! এই সুর-সম্ভব সৌন্দর্য, কিম্বদী-সম্ভব সুমধুর কণ্ঠস্বর যদি পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়রূপ নির্মল ফটিকস্তম্ভে প্রতিফলিত হ'ত তা হলে সে কত দীপ্তিময় শাস্তিময় ভালবাসার প্রতিচ্ছায়া প্রদান কর্তো তাহা করনারও অতীত! স্বপ্নেরও অগোচর! কিন্তু তা হবার বো নেই। আমরা বেড়া! সমাজের ঘৃণ্য গণিকা! আমাদের কৃষ্ণ, আমাদের গুণ দান প্রতিদানের জিনিষ নয়—শুধু কেনা-বেচার জিনিষ! অহো কি বিড়ম্বনা! কি দুঃখ! আমরা বেড়া! তাই রূপ বেচে খেতে হবে। নারীর রূপ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান, ইন্দ্রধনুর মত সর্ববর্ণ-বিশিষ্ট—নভোমণ্ডলের মত মানব-হৃদয়ে সর্বব্যাপী! নারীর রূপ জগতে অতুলনীয়! সমগ্র বিশ্বসৌন্দর্য এই রূপে লীন হয়ে যায়—শব্দ সঙ্গীতে বেজে উঠে—ভাষা ছন্দ গেয়ে উঠে—জ্ঞান-বিজ্ঞান অজ্ঞান উন্মাদে পর্যবসিত হয়। হার! আমরা জঘন্য বেড়া, তাই রূপ বেচে বসেছি। ঐ বালিকা আমার মেয়ে। কিন্তু আমি ওর গর্ভধারিণী না নই। হৃদ্বিক্ষেপের বছর এক নিঃশব্দ ভক্ত পরিবারের মেরেকে আমি টাকা দিয়ে কিনে রেখেছি আমার মত বেড়াবৃত্তি কর্তে—আমার মত রূপ বেচেতে। একে যদি গৃহস্থের মেয়ের মত সুপাত্র্য কর্তে পার্জুম—তা হলে কত সুখের হতো! আঃ! মাথাটা ঘুরে। আর বসে থাকতে পারছি নে। যাই একটুকু শুয়ে থাকিগে। ওস্তাদজি! হামারা তবিরৎ আচ্ছা নেহি। আভি বাকে শুৎ রহেঙ্গে। হুম্ করিয়ে।

( হীরার প্রবেশ )

হীরা—মা ! বাহিরে ছুটা বাবু দাঁড়িয়ে আছে ।  
ভিতরে আসতে চায় ।

গোলাপী—কেন ? জিজ্ঞাসা করি কি ?

হীরা—ওরা আরও একদিন এসেছিল । কোন্  
কমিদারের ছেলে ।

গোলাপী—ওঃ চিনেছি । ওরা কুসুমের গান  
শুনতে চায় বুঝি । আচ্ছা আসতে বল গে বা ।

ওস্তাদ—ঠিক্ বেটা, ঠিক । আভি হামারাবি  
ইরাদ হুয়া । গেয়া রোজ উন্লোক পাচ রুপেরা  
দে গিয়া ।

( নরেশ্বরর ও দয়াময় সোমের প্রবেশ )

গোলাপী—আম্বন আম্বন । হীরা ! তুই শীগ্গীর  
যা ঐ ছোট সত্তরঞ্চ খানা এনে পেতে দে ।

( হীরার প্রস্থান )

গোলাপী—আপনারা না আর একদিন  
এসে ছিলেন ?

দয়াময়—হাঁ ।

গোলাপী—গান শুনতে চান বুঝি ?

দয়াময়—হাঁ, বটে । ছুটা একটা গান শুনতে  
পাব কি ?

( হীরার প্রবেশ ও সত্তরঞ্চ পাতিয়া দেওয়া । )

গোলাপী—ওখানে বসুন । মা কুসুম, তাড়াতাড়ি  
হারমোনিয়মটে নিয়ে এস । ওস্তাদজি ! বাবুরানা  
মাং । আপুকে বি ছ এক রুপেরা মিল য়ায়েগা ।

( হারমোনিয়ম সহ কুসুমের প্রবেশ ও উপবেশন )

ওস্তাদ--করমাইয়ে বাবুলোক । করমাইয়ে ।

গোলাপী—ছোরদিজে ওস্তাদজি ! মা কুসুম !

তুমি যে ছুটো বাজলা গান অভ্যাস কচ্চো সে ছুটোই  
গেয়ে শুনাও না ।

কুসুম—আচ্ছা গাচ্ছি ।

( গান )

ভাল বাসতে ভালবাসি, তাই তোমায় ভালবাসি ।  
অদর্শনে কেঁদে মরি দেখলে মুখে ফুটে হাসি ॥

কি যেন মাধুরি রূপেতে মাথিয়ে,  
চাহনিতে কি মোহিনী লুকায়ে,  
এলে যদি বঁধু ! যেওনা চলিয়ে

চরণে দলে এ দাসী ॥

যা কিছু ছিল মোর সকলি বিলায়ে

আমি গিয়াছি তোমাতে হারাইয়ে

বধ না হে বধু বালিকা হেলায়ে

দিয়ে গলে প্রেম ফাঁসি ॥

তোমারই স্বপনে বাপি নিশিদিন

দিওনা দিওনা ভাঙ্গিয়ে স্বপন,

(তুমি) নয়নের তারা, তৃষিভের ধারা

আমি হে প্রেম-পিয়াসী ॥





জগতে নিত্যই বাণ বিলম্ব, যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে। ইহার শান্তি কিরূপে হয় এ বিষয়ে বহু মনীষী অতি প্রাচীন কাল হইতেই মাথা ঘামাইতেছেন। অনেকেই অনেক কথা বলেন, কিন্তু জগতে আজিও শান্তি স্থাপিত হয় নাই এবং হইবে কিনা তাহা ভবিষ্যই জানে।

পাশ্চাত্য দেশ জড়বাদের বিলাসভূমি। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান নিতাই নব আবিষ্কার দ্বারা জড় জগতে একটা অপূর্ণ ঘোহের সৃষ্টি করিয়াছে। 'Greatest happiness of the greatest number' বাহাদের উক্তি তাহার একরূপ কৌতুক পরিম্পর্ষে কতখানি সুখ লাভ করিতে বা দিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা বিশ্বাসী অনবগত নহে। Machine Gun, Torpedo boat প্রভৃতি মাহুব-মারি কলগুলিই কি শান্ত স্থাপনের পরিচায়ক! এদিকে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করিবার জন্ত অনেকেরই রাজিতে স্থানদ্বার ব্যাধাত হয় কিন্তু মানবজাতির ধ্বংসের কল নির্মাণ করিতে কেহই নিরস্ত নহে। বাহা হোক 'ভালর ঝুটাও ভাল।' অনবরত সন্ন্যাস চিন্তা করিতে করিতে সন্ন্যাসী হওয়া অস্বাভাবিক নহে। যখন 'ধূরা' উঠিয়াছে, দেখা বাড়ুক কেথোকার জল কোথায় গড়ায়।

এইহু, জি, ওয়েল্‌স্ ইংলণ্ডের জটনৈক চিন্তাশীল লেখক। তিনি সম্প্রতি জগতে শান্তি আনয়নের একটা উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ওয়েল্‌স্ বলেন, বিশ্ব-

প্রীতি ও বিশ্বশান্তি স্থাপন করিতে হইলে উৎকট স্বদেশ প্রীতি ও স্বজাতি প্রেম হৃদয়ে পোষণ করিলে চলিবে না। League of Nations ( জাতি সন্ধ্য ) Disarmament Conference ( নিরস্ত্রীকরণ সভা ) এবং Universal Arbitration ( জগতের সকল জাতির পরস্পর বিবাদ সালিশী নিষ্পত্তি )—এ সকল কাণে শুনার ভাল বটে কিন্তু মূলতঃ প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ জাতির প্রতি অত্যধিক অহুয়াগী। সুতরাং কেহ প্রাণের সহিত উক্ত সভা সমূহের কার্যকারিতার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। ওয়েল্‌স্ আরো বলেন, বর্তমান কালে প্রত্যেক দেশে যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা আছে, তাহাই যুদ্ধের মূল হেতু এবং স্বদেশ প্রীতিই ইহার ইন্ধন। "সুতরাং দেশ প্রীতিকে অসংযত করিতে না পারিলে এবং দেশ সকলের সীমারেখা মুছিয়া কেলিয়া বিশ্ব-রাষ্ট্র ( World state ) গড়িতে না পারিলে, পৃথিবী হইতে যুদ্ধ বিগ্রহের তিরোধানের আশা বিড়ম্বনা মাত্র।...মাহুব যতদিন স্বদেশাভিমানের দিক হইতে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক প্রতিযোগিতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিবে, ততদিন যুদ্ধ অনিবার্য।" ওয়েল্‌স্ সাহেবের মতে বিশ্ব-রাষ্ট্র সর্ব দেশ ও সর্ব-জাতির রাজনীতি ও অর্থ নীতির কর্তৃত্ব করিলে জগতে শান্তি স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা।

শাদা মেখে জল দেয় না, শাদা কথাও কখনও কাজ হয় না। যেখানে স্বার্থ সেখানেই প্রতিযোগিতা,

এবং যেখানে প্রতিযোগিতা সেখানেই বুদ্ধ বিগ্রহ, বাদ  
বিসংবাদ। অগতের বত কাটাকাটি, মারামারি তাহার  
মূল ত স্বার্থই। স্বার্থ থাকিবে ‘বাবুজি দিবাকরো’  
কাজে কাজেই বুদ্ধাদিও থাকিবেই। মূলতঃ গালভরা  
কথার কোন কাজ হয় না, পেটভরা ক্ষুধারও সকল  
সময় আহার মিলে না। বতদিন মাছ খাব স্বার্থ ভুলিয়া  
বিশ্বজনীন প্রেমে বন্ধ না হইবে ততদিন মাছ খাব মরিবেই  
বুদ্ধ করিয়া। সে প্রেমের রাজ্য স্থাপন করিতে  
একটা বিপুল অধ্যবসার, অলৌকিক প্রতিভা, নির্ঝাঁপ  
উৎসাহ ও বিপুল মনোবীর্য প্রয়োজন। সেই মনোবীর্য,  
সেই প্রতিভা, সেই অধ্যবসার একদিন ভারতের হিন্দুর  
ছিল। ‘সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা’র মহিমামর বাণী এক  
দিন তাঁহারাই বজ্রনিষ্ঠাধরে বিধে প্রচার করিয়াছিলেন।  
তাই ‘সত্য যুগের’ অপূর্ণ সাম্যনীতিবিষয়ক  
পরিকল্পনা তাঁহাদেরই সম্ভব হইয়াছিল।

তাঁহার জানিতেন—আত্মজয় করিয়া তবে বিশ্বজয়  
করিতে হয়। বিশ্বজয় করা যার—পাশব বল দ্বারা  
নহে, maxim gun বা torepedo boat দ্বারা নহে,  
—কেবল বিশ্বগ্রাসী স্বপ্নের প্রীতিপ্রবাহ দ্বারা  
প্রীতি বা প্রেম বিশ্ববিজয়ী, ইহা ত্যাগেরই নামান্তর।  
সেই ত্যাগের, সেই প্রেমের উপর যে দিন বিশ্ব-রাষ্ট্রের  
ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে (?) সে দিন  
ধরাতলে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা হইবে, সে দিন পৃথিবীর  
অভিধান হইতে ‘অশান্তির’ চির নির্মোহন হইবে।

এই বৈচিত্র্যপূর্ণ অগতে কিছুই অসম্ভব নর।  
কারণ, মানুষের ভিতর দিয়াই দেবতার প্রকাশ হয়,—  
মানুষের ভিতর দিয়াই কুটরা উঠে বিশ্বের অনন্ত  
শক্তি। কালের মহাযাত্রার পথে বিশ্বমানব যে উদ্ধার,  
যে চুটরা চলিয়াছে, সে একটা আদর্শের আশায়  
একটা ভাবের প্রেরণার, একটা মুক্তির সন্ধানে।

পৃথিবীর বিধা-প্রধানী গতির মত মানুষের  
জীবনেও দুইটা গতি—একটার কেন্দ্র নিজের ব্যক্তিতে  
অপরটির কেন্দ্র এক কলিত মানব ব্রহ্মাণ্ডের  
অন্তরালে। মানবব্যক্তিতে যে ‘সত্য’ নিহিত আছে,

তাহাতে আর বিশ্ব মানবের অহরে যে নিত্য ‘সত্য’  
বিরাজমান, তাহাতে মৌলিক কোন পার্থক্য নাই।  
বাস্তবিক বিশ্বের বাহ্য সম্পদ, তাহা বিশ্ববাসীর  
আত্মব্যক্তিতেই তাহার অস্তিত্ব বিকাশ করিয়া থাকে  
—The true universal finds its own  
manifestation in the individual.

এই ব্যক্তিত্ব অহুসারেই আমাদের উপনিষদের  
‘ব্রহ্মস্ব’—তত্ত্বমসি,—সত্যম্, শিবম্, অমৃতম্। ‘সত্য’  
নিজেই সত্য, তাতে আবার শক্তি মঙ্গলের অভিন্নতা।  
“এই অভিন্নতা বোধেই মানবে মানবে মিলন সৃষ্টি,  
আর প্রেমে সেই মিলনের সম্ভবতা। প্রেমেই  
অপরের সঙ্গে নিকট সংস্পর্শ, প্রেমেই ‘একের পক্ষে  
‘সমস্তের’ মণ্ডলীতে প্রবেশাধিকার, প্রেমেই বিশ্ব  
আত্মার দ্বার উন্মোচন করে।”

এই প্রেমকে মূল মন্ত্র করিয়াই ভারতের আৰ্য্য  
স্ববিগণ একদিন ভারতে ‘সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার’  
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এ ‘সাম্য-মৈত্রী  
স্বাধীনতা’ করাসীর নরশোণিত-প্রাণী সেই ‘সাম্য মৈত্রী  
স্বাধীনতা’ নয়। ইহাতে শত্রু মিত্র ভেদজ্ঞান নাই—  
ইহার ধারণা, ‘তুমি আমি সকলেই সন্তানস্বামীর  
তোমা হইতে আমার কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই।”  
এই সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার সংজ্ঞা একদিন দৈত্যকুমার  
পরম বৈষ্ণব প্রহ্লাদের মুখে শুনিয়াছিলাম,—

সর্বভূতাত্মকে তাত জগদ্বাশে জগদ্বাশে।

পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ ॥

ত্ব্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।

বতন্ততোহয়ং মিত্রঃ মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ ॥

অর্থাৎ হে পিতঃ, জগদ্বাশ জগদ্বাশ পরমাত্মা  
গোবিন্দ যখন সর্বভূতের অন্তরাশ্মিরূপে বিরাজ  
করিতেছেন, তখন মিত্র আর শত্রু, এরূপ কথা  
কেন? ভগবান্ বিষ্ণু তোমাতে আছেন, আবার  
আছেন, অন্তরঃ আছেন। সুতরাং ইনি মিত্র, তিনি  
শত্রু, এরূপ ভেদজ্ঞান থাকিবে কেন?”

এইরূপ সায়াসাধনা ধায়াই মৈত্রীর রাজ্য, শ্রীতির সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সর্বত্র সকলেই স্বাধীনতা লাভ করে, কেহ কাহাকে অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারে না। তখন সকলেই সকলকে এক বিশ্বব্যাপী পরমাশ্রম সহিত অভিন্ন ভাবে দর্শন করে। এইরূপে সাম্য হইতে স্বাধীনতার বিকাশ হয়। ইহাতে সঙ্গীর্ণতার লেশ নাই,—ইহা আমার ভারত উহা আমার ইংলণ্ড, ঐ আমার ফ্রান্স এরূপ সঙ্গীর্ণ দারিদ্র্য উহাতে সম্পূর্ণ অসম্ভব। 'Patriotism সেই সঙ্গীর্ণ নীতিবদ্ধ ধারণার ফল। Patriotism এর মূলে স্বার্থপরতা ও পরহিংসা।' সুতরাং ওয়েল্‌স সাহেবের সঙ্গে আমারও বলিব "তুচ্ছ এই স্বদেশ প্রীতি, তুচ্ছ এই ব্যক্তিগত, সমাজগত স্বার্থ। এ সকল হীন স্বার্থ দ্বন্দ্ব ভুলিয়া বিশ্বপ্রেমে মাতিয়া উঠ জীব জগতে সকলেই ভাই ভাই, উহাতে হিংসার, ঘোরেঘির স্থান নাই, আছে পরস্পর মিলন, ত্যাগ, প্রেম, প্রীতি।"

ঢাকা বিজয়পুরের অন্তর্গত বেহরগাঁ গ্রামে "দি বেহরগাঁ রাজমোহন লাইব্রেরী" বহু প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থে পূর্ণ। নারায়ণগঞ্জে ইহার একটা শাখা বর্তমান থাকিয়া বহু জনের জ্ঞানপিপাসার পান্থি করিতেছে। পরলোকগত রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র ও পৌত্রগণের উৎসাহেই সর্বসাধারণের সুবিধার্থে এই লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা হয়। সে আজ অষ্টাবিংশ বর্ষের কথা। সম্মতি ঐ লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশন হইয়া নিয়াছে। সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত ত্রীব্রজ দেবীদাস চুড়াশিবি। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার স্বভাব-স্বলভ অশ্লীলিত ও মধুর ভাষার শিক্ষার উপকারিতা এবং শিক্ষা বিষয়ে লাইব্রেরীর উপযোগিতা বুঝাইয়া দিয়া উপস্থিত জনসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাব প্রদত্ত। বৈদেশিক হিতরত সন্তান

নাই। সহরের বিভিন্ন অংশে এবং প্রতি পরগণা এইরূপে শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করিলে বস্তুতঃ দেশের মহত্বপূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই।

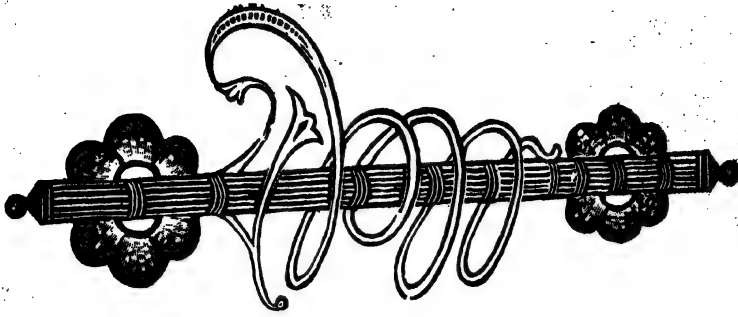
তরুণদের লইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা মনোবৃত্ত রাধা-বানী কাণ্ড চগিতোছে। তরুণ সাহিত্যিকেরা নাকি সাহিত্যের মধ্যে নানা প্রকার আবর্জনা ঢুকাইতেছেন এবং অনেক ভেজাল মিশাইতেছেন। তরুণদের দোষের মধ্যে দোষ এই যে তাঁহারা কাহিল বঙ্গভাষাকে গল্প, কবিতা ও উপন্যাসের মধ্য দিয়া নানা-প্রকার সুন্দর সুন্দর প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহার করিয়া ভাষাটাকে পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই মহা পাপের জন্ত কোন কোন পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়দের ঘেন্না ভাবনার চোটে ঘুমই আসে না। বিশেষরূপে ব্যাকুলিত হইয়া পড়িতেছেন 'শনিবারের চিঠি।' পূর্বে তিনি কিছুকাল প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে দেখা দিতেন তারপর এমন ঘুমই দিলেন ঘেন্না অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষে তরুণের বাড়াবাড়ি দেখিয়া কে যেন তাহার ঘুম ভাঙাইয়া দিলেন, 'জাগ, জাগ, তরুণের এবার হবে বাঙালী মাং।' বড়ই গাভ্র শুল হইল। এখন মাসিক রূপে বাহির হইয়া সাহিত্য সমালোচনার মুগ্ধ পরিয়া কতকগুলি ব্যক্তিগত কুৎসা-রটনা করিয়া জন কতক লোককে জব্দ করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু জ্বোতের জল যখন আদে তখন সমুদ্রের শত শত বাঁধ ভাঙিয়াই চলে।

লেডী ড্রামণ্ড হে নারী আর এক মার্কিন মহিলা যেরো বিবি পদ্মাকাসরণ করিয়া ভারতের সুখসা প্রচারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। মার্কিন জাতীয় পরহিতব্রত প্রাণেশ্বরী বটে। পরমিন্দা বিজ্ঞানজ্ঞ হইলেও কুদ্র ক্রমের পরিচরক—Mockeries are the fumes of little hearts.





‘বিদেশিনী’



## সচিত্র মাসিক পত্র

তৃতীয়বর্ষ ]

ফাল্গুন, ১৩৩৪

[ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

### ব্যথার কথা

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

জন্ম আমার মাইরে জানা, মরণও ঠিক তথৈব চ ;  
মাঝখানে এই জীবন নিয়ে করছি কেবল খচমচ ।  
যেই দিকে চাই দেখছি অসীম দুখের পাথার করছে ধুধু ।  
বুড়ুদের মতন তাতে কনিকের পুথ মিলায় শুধু ।

রত্নীন্ আশার মায়ার মোহে বাড়ছে তবু প্রাণের তৃষা ।  
হাওড়ে মরি, পাই না নাগাল, এবে জমাট আঁখার-নিশা ।  
আঁকড়ে ধরে বলছি থাকে, 'এই যে আলো। এই যে আলো ।'  
চ্যাচার এরা, "এসব ছাড়ো ! নয় এ ভালো, নয় এ ভালো ।"

আমার বিজন রাত্তা চলার সঙ্গী স্নাতাত্ পাই না খুঁজি ।  
পেতাম যদি প্রাণের মৌলর, দিতাম পাড়ি সোজানুজি ।  
গাছের বেতাল কবুল করব, উত্তরে বেতান সখন গিরি ।  
স্বপ্নানুভব মনে হলে হলে হলে না হলে 'হাইকি' ।

হায় ! তথাপি এদের মাঝে থাকতে তিলেক চায় না হিয়া ।  
 কথায় বারা তুষ্ট রেখে মারতে চাছে গরল দিয়া ।  
 ‘সত্যতা’টা খুব চিনেছি, খুব চিনেছি ‘মানবতা’ ।  
 খান্নাবাজির আদর বেশী, পাচ্ছে যুগা সরলতা ।

হে ভগবান্, জুড়াও জ্বালা ! বাজিরা হোলো পাঁজর ক্রমে ।  
 ইজিতে আজ পস্থা বাতাও । মাতাও যদি, রই না ভ্রমে ।  
 ঘোর অসহায়, কোথায় উপায় ! ফুরায় আয়ু, কাঁদছি একা !  
 শান্তি-সুখার মিটাও পিয়াস, বিজলি-আলোয় দাওহে দেখা !

তাতেই আমার মলিন হিয়ায় উঠবে ফুটে’ প্রেমের আলো ।  
 অস্তরে মোর তলিয়ে যাবো ; সেই যে আলো জ্বালো, জ্বালো !  
 তোমার কাছে ঢের চেয়েছি, এখন তা’তে দুঃখ জাগে !  
 এবার প্রভু চাই নে কিছুই, দাঁড়াও একটু আঁখির আগে !

## নিশীথের আলো

### শ্রী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

শরৎ যখন বাঁকিপুরে গিয়া পৌছাইলেন, তখন  
 বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিলেও রোজের তেজ বিলীন  
 হয় নাই ।

ঠেগনে একখানা গাড়ী লইয়া তিনি প্রতুল মিত্রের  
 বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন ।

প্রায় মাইল খানেক বাইরা গাড়ী থামিল, “এই  
 বাড়ী বাবু,”—কৌচম্যান হাঁকিল ।

গাড়ীর উপর হইতে শরতের স্তূত্য রথুনাথ নামিয়া  
 পড়িয়া শরতের ব্যাগ নামাইয়া লইল, শরৎ গাড়ী  
 হইতে নামিলেন ।

বাড়ীটি বাহির হইতে দেখিতে বড় সুন্দর । সম্মুখে

সবুজ তৃণাবৃত খানিকটা জায়গা, তারের পর তার  
 দিয়া ঘেরা ফুলবাগান, সাময়িক নানা ফুলে শোভিত,  
 ইহারই মধ্য স্থলে লাল বর্ণের বাড়ীখানি ।

ফুলবাগানের মধ্যে করুণী শিশু খেলা করিতেছিল ।  
 গেটের কাছে শরৎকে দেখিয়া তাহার আশ্চর্য্য হইয়া  
 খেলা বন্ধ করিয়া তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিল ।  
 শরৎ ইহাদের মধ্যে বড়টীকে লক্ষ্য করিয়া মিষ্ট স্বরে  
 ডাকিলেন, “এদিকে এসো তো থোকা, একটা কথা  
 বলি শোন ।”

বিনা আপত্তিতে ছেলেটা তাঁহার কাছে সরিয়া  
 আসিল । শরৎ বুঝিলেন ছেলেটা বেশ অমায়িক ।

তিনি তাহার পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া স্নেহপূর্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই বাড়ীটাই কি প্রতুল বাবুর বাড়ী, খোকা?”

বাগক মাথা দুলাইয়া উত্তর করিল, “হ্যাঁ। আমরা খোকা বল্লেই কেন, আমার নাম জ্যোতিষ্ময়, আমার সকলে জ্যোতি বলে ডাকে, আপনি ও আমার জ্যোতি বলে ডাকবেন।”

শরৎ মুহু হাসিয়া তাহাতেই রাগি হইলেন, বলিলেন, “আচ্ছা, তিনি কি বাড়ী আছেন?”

জ্যোতি বলিল, “তিনি কে,—আমার বাবা? না, তিনি বাড়ী নেই। আপনি বুঝি জানেন না, বাবা আজ এক মাস হ’ল মফস্বলে চলে গেছেন? মা বলেছেন, আজকালই তিনি আসবেন। আপনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বুঝি?”

ছেলেটির মিষ্ট কথায় শরৎ তাহার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, বলিলেন, “তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসি নি বাবা, তোমাদের দেখতে এসেছি।”

জ্যোতি বিস্মিতনেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল, “আমাদের সঙ্গে দেখা করতে? ও,—আপনি বুঝি কলকাতা হ’তে আসছেন?”

শরৎ বলিলেন, “হ্যাঁ,—”

“তা হলে মা আপনার কথাই বলছিলেন। চলুন ভেতরে,—এখুনি যেতে হবে—”

আর সে ভদ্রতার ধারধারিল না, নিতান্ত আপনার লোকের মতই সে শরতের হাতখানা চাপিয়া ধরিল। ছোট বয়েসী বিন্ময়বিস্ফারিত চোখে শরতের পানে তাকাইয়া আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, ছেলেটা তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, “এই মিনি, দৌড়ে গিয়ে মাকে বলে আর, আমাদের কাকাবাবু এসেছেন।”

দাদার ধাক্কা সচেতন হইয়া বয়েসী বাড়ীর মধ্যে মাকে খবর দিতে ছুটিল।

শরৎকে বারান্দার একটা গদি আঁটা বেঞ্চে

বসাইয়া জ্যোতি গম্ভীরমুখে বলিল, “মিনিটা কি বোকা দেখেছেন? দেখছে আপনাকে আমি টেনে আচ্ছি,—জানছে আপনি আমাদের কাকাবাবু না হয়ে যায় না, তবু হাঁ করে চেয়ে রয়েছে। বড় ছেলেমানুষ কিন’, তাই ওর মোটে বুদ্ধি নেই, না কাকাবাবু? আগে আমার মত হোক, তার পরে বুদ্ধি হবে।”

তিনি আসিবার আগেই যে ইহাদের নিকটে এত পরিচিত হইয়া গিয়াছেন, তাহা শরৎ মোটেই জানিতেন না। ছেলেটির সরল ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত খুসি হইয়া উঠিলেন; আধবন্টার মধ্যে সে তাঁহাকে বশীভূত করিয়া ফেলিল।

রঘুনাথকে আপ্যায়িত করিতেও সে ভুলিল না। শরতের সহিত আলাপ করিয়া সে রঘুনাথের সহিত আলাপ করিয়া লইল। তাহার পরিচয় লইতে গিয়া সে যখন শুনিল সে অনেক কাল শরতের নিকটে আছে, তাহার কাকা ও পিতাকে সে এতটুকু বয়সে দেখিয়াছে, তখন সে বিস্ময়ে হুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, “ইস, তবে তো তোমার বয়স অনেক হয়েছে। তোমায় কি বলে ডাকবে বল দেখি, নাম ধরে তো ডাকা যায় না।”

রঘুনাথ হাসি মুখে বলিল, “নাম ধরে ডাকবে কেন খোকাবাবু, আমার তুমি দাদা বলে ডেকো, আমি ও তোমায় দাদা বলে ডাকব,—কেমন?”

মিনতি দাদার পাশে দাঁড়াইয়া আশ্চর্যভাবে ইহাদের দেখিতেছিল ও কথা শুনিতেছিল, কোন কথা সে বলিতে পারে নাই। তাহার দিকে তাকাইয়া রঘুনাথ বলিল, “আর তুমি খুকি, তুমিও আজ হতে আমার দাদা বল্বে, আমি তোমায় দিদি বল্বে, রাজি আছ তো?”

মিনতি একটু হাসিয়া সম্মতি জানাইয়া দাদার পিছনে মুখ লুকাইল। হাসিয়া বোনটির এলোচুল গুলা এলাইয়া দিয়া জ্যোতি বলিল, “মিনি মোটে কথা বলতে পারে না দাদা, কেবল চুপু করিতে জানে।



মার কাছে পড়তে বসলেই ওর জলতেষ্ঠা পায়, মনে হয়—বাইরে গেট খোলা আছে, গরু এসে গাছপালা বুঝি খেয়ে গেল। ঝি চাকর কেউ নেই কিনা, ওর তাই বড্ড মজা হয়েছে, সে রকম করে আর পড়তে হয় না। মা সব কাজ কর্ম সেয়ে ছপুর বেলাটা মাত্র ছুটি পান, সে সময় প্রায়ই মিনি কোথায় পালায় ঠিক নেই, যদিও বাড়ী থাকে—অমনি হাজার কাজ মনে পড়ে।

শরৎ আহার করিতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের কি চাকর কেউ নেই?”

জ্যোতির প্রকৃত মুখখানা নিমেষ অন্ধকার হইয়া গেল। শুককণ্ঠে সে বলিল, “মা বলেন—যারা গরীব তাদের ঝি চাকর রাখতে নেই। এই বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে, মা বলেছেন,—তারা ওমাসে এসে এই বাড়ীতে থাকবে, আমাদের এই মাসেই উঠে যেতে হবে।”

তাহার কণ্ঠের অত্যন্ত ক্লেশভাবে শরতের কাণে বাজিল। এই ছেলে ও মেয়েটার মুখের পানে তাকাইয়া তিনি ইহাদের জননীর নিতান্ত অসহায় মুখখানা অন্তরে কল্পনা করিয়া লইলেন। হায়! হত-ভাগ্য প্রতুল, এমন দেবশিশু যাহার গৃহে সে এমন পাষণ্ড হইল কি করিয়া, কেমন করিয়া সব ভাসাইয়া সে চলিয়া গেল, ইহাদের এমন অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে কি তাহার হৃদয় কঁাদে নাই?

কিন্তু না, তাহারও বুঝি আর উপায় ছিল না, তাই সে এই মুক্তি খুঁজিয়া লইয়াছে। মোহে পড়িয়া তাহার মত অনেকেই নিজের সর্কনাশ করিয়া থাকে, তাহাদের অন্তরও আঘাতে আঘাতে শক্ত হইয়া উঠে, কাহারও স্তব্ধ হস্ত বোধ করিতে এ শ্রেণীর লোক স্বভাবতঃই উদাস হইয়া থাকে।

উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়া শরৎ বলিলেন, “তোমার মায়ের আর মোটে ছাড়ে নি?”

প্রায় কীদ কীদ হইয়া মেয়েটা বলিল, “না, কাকা-বাবু, মোটেই ছাড়ে নি।”

শরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই নিয়ে সব কাজ করতে হয়?”

মিনতি মাথা নত করিয়া বলিল, “তা নইলে আর কে করবে? দাদা একদিন তরকারী কুটতে আঙ্গুল এমন করে কেটেছিল যে মা আর কোনদিন তরকারী কুটতে দেন না। আমি একদিন কড়া উলটে ফেলে পা পুড়িয়ে ফেলেছিলুম। তখন বাবা এখানে ছিলেন; বাবা তার উপরে আমার এমন ঝরে মারলেন যে কি বলব। মার তখন বড্ড অর এসেছিল, শুয়ে পড়ে আর উঠতে পারছিলেন না। আমি পুড়ে গিয়ে চোঁচিয়ে উঠতেই তিনি তবু ছুটে আসছিলেন, বাবা আমার অমন করে মারছেন দেখে মা কি রকম হয়ে গিয়ে মাথা ঘুরে সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তা আমি কি ইচ্ছে করে পা পুড়িয়েছিলুম, কাকাবাবু? দেখুন না—কতখানি যে পুড়ে গিয়েছিল—?”

তাহার হাটুর কাছে পোড়ার দাগ দেখিয়া শরৎ শিরিরা উঠিলেন।

হৃৎকথার কথা বলিতে বলিতে শপ্তমবর্ষীয়া বালিকা মিনতির চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল বরিয়া পড়িতেছিল। সে ছই হাত উন্টাইয়া সেই জল মুছিতে মুছিতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, “বাবা আগে খুব ভাল-বাসতেন, মা যদি আমাদের বক্ত, বাবা মাকে বক্তেন; সেই বাবা শেষকালে এমন মারতেন আমাদের আর দাদাকে, তা আর কি বলব? মা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন, কোনদিন ধরতে আসতেন না। একদিন ধরতে এলে বাবা তাঁকে গালাগালি দিয়েছিলেন, সেই জুতো দিয়ে মাকে পর্যন্ত মেরেছিলেন—

আত্মবিস্মৃত শরৎ বলিলেন, “তোমার মাকে পর্যন্ত মারত সে,—কদম্বহীন—পিশাচ,—”

মিনতি বলিল, “উঃ, সে কি মার,—মা অত মার খেয়ে একটা কথাও বলতেন না, এক কোঁটা চোখের জলও ফেলতেন না, বাবা চলে গেলে খুব

কাঁদতেন। আমার আর কি কর্তব্য, দুজনে চুপ করে মার ছই পাশে বসে কাঁদতুম। মা বলতেন—যদি আমরা না থাকতুম তবে তিনি গলায় দড়ি দিয়ে মরতেন। শুনে দাদা খুব কঁাদত।

শরৎ একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন, ইহাতে তাঁহার সুন্দর মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল মাত্র।

তিনি বলিলেন, “তুমি কাঁদতে না, মা?”

মিনতি বলিল, “বা রে, মা কাঁদগে বুঝি কান্না আসে না? আপনার মা ছিল কাকাবাবু?”

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস দমন করিয়া শরৎ বলিলেন, “ছিল বই কি!”

মিনতি জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার বাবা যখন মদ খেয়ে এসে আপনার মাকে মারতেন, আপনার মা যখন কাঁদতেন তখন আপনি কাঁদতেন না, কাকাবাবু?”

শরৎ বলিলেন, “আমার বাবা কোন দিন মদ খান নি, মিছ, আমার মায়ের গায়ের কোনদিন হাত তোলেন নি, কাজেই আমার মাকে কোনদিন কাঁদতে দেখি নি।”

মিনতি খানিক নীরব হইয়া রহিল, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি মদ খান, কাকাবাবু?”

তাঁহার প্রশ্নে শরৎ খতমত খাইয়া গেলেন, উত্তর দিতে পারিলেন না।

মিনতি বলিল, “মদ খেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়, মা বলেন—তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না, মাতাল হয়ে যায়। দেখুন কাকাবাবু, আপনি যেন কিছুতেই মদ খাবেন না; মদ খেলে আপনি যে আমাদের এমন ভাল কাকাবাবু, তা আর থাকবেন না, অল্প রকম হয়ে যাবেন। বাপরে, মদ খেলে মানুষগুলো কি ভরানক হয়ে যায়, দেখলে গর লাগে। আমি ওই জন্তেই তো বাবার কাছে যেতুম না।”

তাঁহার কথাগুলো শরতের অন্তর কাটিয়া বসিতেছিল। ক্ষুদ্র একটা শিশু, মাতাকে সেও কি

স্বপ্ন করে! আজ সে জানিতেছে শরৎ সচরিত্র, কিন্তু পরে যখন জানিবে শরৎও মাতাল, তখন তাঁহার মনের কি অবস্থা হইবে তাহা ভাবিয়া শরৎ নীরব হইয়া গেলেন।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শরৎ বলিলেন, “কোথায় যাবে তোমরা?”

তের্মন করণ কর্তে বালক উত্তর দিল, “কি জানি, কিছু বলেন নি তো, শুধু আমাদের যে চলে যেতে হবে এই কথাই বলেছেন। সে দিন জন্মের মা বেড়াতে এসেছিলেন; মা কাঁদছিলেন আর বলছিলেন কে,—আঃ, মিনি, চিমাটি কাটুছিল কেনরে?”

মিনি ক্রুদ্ধ কর্তে বলিল, “আমি মার কাছে গিয়ে বলে দিচ্ছি তুমি এমনি করে সব কথা বলে দিচ্ছো। মনে নেই—মা কি বলে দিয়েছে?”

বিকৃত মুখে জ্যোতি বলিল, “ইস, বললি তো ভারি বয়ে গেল, আমিও বলতে জানি,—আমি বলব আমি কিছু বলি নি।”

সে এ কথা বলিল বটে কিন্তু সে কথা আর তুলিল না। ক্ষুদ্র একটা বালকের এই সাবধানতা দেখিয়া শরৎ বিস্মিত হইয়া গেলেন।

প্রথমটা মনের কোঁকে সে যে সব কথা বলিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিল চকিতে মনে পড়িয়া গেল অল্প কাহাকেও সে সব কথা বলা অজ্ঞার।

শরৎ তাঁহার সে ভাব লক্ষ্য করিয়া শাস্তকর্তে বলিলেন, “দে বাবা, তোমার কোন কথাই আমার বলতে হবে না। তোমাদের কোথাও যেতে হবে না, আমি যখন এসেছি আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে যাবে। তোমরা বোধ হয় জানো না আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি, আজ দিনটা থেকে কাল পরন্তু নিয়ে যাব।”

একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িয়া জ্যোতি বলিল, “আপনার বাড়ীতে আমাদের নিয়ে যাবেন, কাকাবাবু?”

শরৎ তাঁহার বিস্ময় দেখিয়া একটু হাসিয়া

বলিলেন, “হা, তোমাদের না নিয়ে গেলে আমি আর থাকতে পারছি নে। আমার বাড়ীতে কোন ছেলে পুলে নেই অথচ ছেলেপুলেদের আমি বড় ভালবাসি।”

“কেন, আপনার ছেলে নেই?”

শরৎ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না—।”

একটু ভাষিয়া জ্যোতি বলিল, “না, আমাদের আপনার সঙ্গে যাওয়া হতে পারে না।”

তাহার গম্ভীর মুখখানার পানে চাহিয়া শরতের হাসি আসিতেছিল, সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, “কেন?”

একটু উত্তেজিত ভাবে জ্যোতি বলিল, “বাঃ, আমরা যাব আর আমার মা বুঝি একলা এখানে পড়ে থাকবেন? এই তো বাবা চলে গেছেন, মা আমাদের ছইজনকে কোলে নিয়ে বলেন,—“তোদের নিয়েই আমি বেঁচে আছি, নইলে কবে মরে যেতুম।” আমরা গেলে মা বুঝি বাঁচবেন? সেবার রামরশ্মি যেমন করে গলার দড়ি দিয়ে মরেছে মাও তেমনি করে মরে যাবেন।”

কল্পনার কেমন একটা ছবি মনে করিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল।

শরৎ বামহস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া শাস্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন, “দুর্ বোকা ছেলে, আমি বুঝি তোমার মাকে একা এখানে রেখে তোমাদের দুটা ভাইবোনকে সেখানে নিয়ে যেতে এসেছি? আমি তোমাদের সকলকে নিয়ে যাব, তোমার মাকে পরিত্যাগ।”

আনন্দ-পূর্ণ কণ্ঠে জ্যোতি বলিয়া উঠিল, “মাকে পরিত্যাগ।”

শরৎ উত্তর দিলেন, “হাঁ।”

“হো হো, তবে আমি মাকে বলে আসি। মা আজ সকালেও কত ভাবছিলেন—”

শরতের আলিঙ্গন হইতে নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া সে লাকাইতে লাকাইতে বাহির হইয়া গেল।

আচমন সমাপ্তে শরৎ আসিয়া বসিলেন। মিনতি পান আনিয়া দিল, এতক্ষণে তাহার মনের ভুল ধারণা দূর হইয়া গিয়াছিল। প্রথমে সে ইহাদের কি ভাবিয়াছিল তাহা সে জানে, এখন সে বুঝিয়াছে শরৎ তাহার সত্যকারের কাকাবাবু, কাজেই সে ঘনিষ্ঠভাবে নিকটে আসিয়াছিল।

যখন ধীরে ধীরে সে বলিল, “জানেন কাকাবাবু, দাদাভাই কি ছষ্ট—মাকে গিয়ে কি সব বলেছে যে খুব কাঁদছে। একে আজ ছয় সাতদিন জ্বর, জ্বর মোটে ছাড়ছে না, তার ওপরে কেঁদে আরও মাথায় যন্ত্রণা ধরেছে।”

(১১)

অভাগিনী সেবার কথা মনে করিয়া শরৎ যথার্থই অস্তরে বড় বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। হস্তভাগ্য প্রভুকে, সে না উচ্চ শিক্ষিত, তাহার শিক্ষাধীন জ্ঞান সে এমন করিয়াই নষ্ট করিয়া ফেলিল, এই সত্যী সাধবী স্ত্রীর মর্যাদা সে রাখিতে পারিল না, নিজের মনুষ্যত্বের সম্মান সে রাখিতে পারিল না, একটা মোহে পড়িয়া সব হারায়া ফেলিল?

শরতের মনে পড়ে নব পরিণীতা সেবার কথা। কি শাস্ত তাহার মুখখানি, আজও সেবার কথা। ভাবিতে গেলে সেই নব পরিণীতা বধূটির কথাই মনে পড়ে, মাতৃমুর্তিতে তিনি সেবাকে দেখিতে পান নাই, তাই সে মূর্তি মনে ভাসে না। যখন পুতুলের বিবাহ হয় তখন তাঁহার ছইজন আই এ পড়িতে ছিলেন। এই নব বধূটিকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি কতই না বিজ্ঞপ করিতেন। দেবরূপে সেবাকেও কতদিন কতরূপে উতাক্ত করিয়াছেন।

ধনীর একমাত্র আদরিণী কন্যা সেবা ছঃখ কি তাহা সে জানিত না, সংসারে আসিয়া যে কাজ করিয়া তবে খাইতে হয় তাহা সে জানিত না। তাহার পিতা বিবাহ দিয়া মারা যান, তাঁহার সম্পত্তিও ত কম ছিল না, সে সবই প্রভুল পাইয়াছিল। ছইদিনে কি করিয়া সে সেই প্রচুর সম্পত্তি উড়াইয়া দিল, ইহা

যথার্থই ভাবিবার কথা বটে। আজ সেই সেবাকে নিজের হাতে সব করিতে হইতেছে, ব্যারামকেও উপেক্ষা করিয়া পুত্র কন্ডার আহার ভৈরবী করিতে হইতেছে। প্রতুল অপমানে মুখ দেখাইতে না পারিয়া পাপের দংশনে জলিতে জলিতে কোথায় গিয়াছে কে জানে—তাঁহার সন্ধান ইহারা কেহই জানে না। সেই প্রতুল—তাহার আজ এই পরিণাম ভাবিতে শরৎ কোনও মতে দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার সময়টাতে শরৎ পড়ার ঘরে বসিয়াছিলেন, রঘুনাথ সহর বেড়াইতে গিয়াছিলেন। জ্যোতি কাকাবাবুকে নিজের পড়ার বহর দেখাইবার জ্ঞাত একরাশি বই লইয়া বসিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতে ছিল, মিনতি একটা ছোট টুলে বসিয়া বিস্ময়িত চোখে তাহার পানে চাহিয়া ভাবিতে ছিল দাদা এত বই পড়িল কি করিয়া! নিজের না পড়ার জ্ঞাত এই মুহূর্তটাতে সে বাস্তবিক লজ্জিত হইয়া উঠিতেছিল।

“মিহু”

“ওই মা আসছেন” বলিয়াই মিনতি সোজা হইয়া উঠিল। শরৎ পা ছুঁথানা জানালার উপর তুলিয়া দিয়া সকোতুকে জ্যোতির পড়া শুনিতে শুনিতে সিগারেট টানিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি অর্দ্ধদণ্ড সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া পা নামাইয়া বসিলেন।

দরজার উপর দাঁড়াইয়া একটা রমণী।

একবার মাত্র সে মুখের পানে চাহিয়া শরৎ আর চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। তিনি যে কিশোরী সেবাকে একদিন দেখিয়াছিলেন, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যে অটুট সৌন্দর্য্যে যে তখন বলমল করিতেছিল, এই কি সেই সেবা? এ যে শোকের মুক্তি, একেবারে পাণ্ডুর সৌন্দর্য্য, ইহার দিকে তাকাইয়া হৃদয় বেদনাপূর্ণ হইয়া যায়। হুঃ কষ্ট রোগের যন্ত্রণা সেবার মুখ খানার উপর নিজেদের ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। সে দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। শরৎ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—“বন্ধন, দাঁড়াইবেন না, পড়ে যাবেন।”

আজ সেবার মুখে অবগুষ্ঠন ছিল না, অবগুষ্ঠন দিব্য আশ্চর্য্যতাও আজ তাহার ছিল না। রমণী যতদিন না নিজেকে মাতৃভাবে ধারণা করিতে পারে, ততদিনই তাহার অবগুষ্ঠনের আশ্চর্য্যতা থাকে, না হইলে আর তাহার কোন দ্বিধা, লজ্জা সকোচের প্রয়োজন হয় না। শরৎ চাহিয়া দেখিলেন সে মুখ বড় মলিন। ভবিষ্যত ভাবনা সে মুখের উপর অঙ্ককার মাখাইয়া দিয়াছে।

সেবার পা ছুঁথানা কাঁপিতেছিল, সে বলিয়া পড়িল। শরৎ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, “আপনার আস্বার কি দরকার ছিল বৌদি, আমার একবার বললেই—”

সেবা মলিন হাসিল, বলিল “এইটুকু আমি বেশ আসতে পারি, ঠাকুরপো, আমার কিছু কষ্টই হোত না যদি না পায়ে হাঁচটে খেতুম।”

শরৎ তাহার পায়ে পানে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন “ইস তাইতো, অনেকটা কেটে গেছে, রক্ত পড়ছে যে—। মিহু, তোমার মায়ের পাটা আগে বেঁধে দাও তো মা।”

মিনতি একটু ছেঁড়া নেকড়া আনিয়া আঙ্গুলটা বাঁধিয়া দিল। সেবা আবার একটু হাসিয়া বলিল— “ওতে আমার কিছুই হোত না ঠাকুরপো ওতে আমি দৃকপাতও করিনে। বুকে যে অহোরাত্র ভীষণ আঘাত পাচ্ছে, দৈহিক এ সামান্য আঘাত তার আর কতটুকু অনিষ্ট করতে পারে?”

শরৎ কল্পনেন্দ্রে এই হতভাগিনী নারীর পানে চাহিলেন। কথাটা যথার্থ সত্য। আঘাতে আঘাতে সেবার বুক একেবারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দৈহিক এমন কি বেদনা আছে ঘাং তাহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারে। সেবার মুখ চোখই তাহার স্বরূপ পরিচয় দিতেছে, মুখে বলা আর নিস্ত্রয়োজ্ঞন।

শরৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “আমি জ্যোতি মিহুর কাছে আগেই সব শুনতে পেরেছি বউদি, আর কোন কথা হিজালা করে আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনে। আমি আপনাদের আমার বাঁকী

নিরে যাব। সেখানে যেতে আপনার কোন আপত্তি হবে কি?”

সেবা দীনেন্দ্রে শরতের পানে চাহিল, তাহার চোখছুটি ব্যথার অশ্রুতে ভিজিয়া উঠিল; রুদ্ধকণ্ঠে সেবা বলিল—“আপনি আমাকে নিয়ে গিয়ে আবার ভারী বিব্রত হয়ে পড়বেন।”

“বিব্রত”—শরৎ হাসিলেন “সত্যি বলছি বউদি, যদি তা ভেবে থাকেন, তাহলে বড় ভুল করেছেন। আপনি জানেন না আমি জগতে একেবারে নিঃসঙ্গ, একাকী আমি, তাই এমন সঙ্গের প্রার্থনা করছি। কারণ এ রকম একঘেরে ভাবে জীবন যাপন করা হুঃসহ হয়ে উঠেছে। আপনার এই ছুটি ছেলে মেয়ে, এদের সঙ্গ আমার এখন প্রাণনীয়, এই সামান্য হু তিন ঘণ্টার এরা আমার এমন ভাবে আকৃষ্ট করেছে যে আমার মনে হচ্ছে যে এদের ছাড়লে আমার এর পরের দিনগুলো কাটানো দায় হয়ে উঠবে। অকূল সমুদ্রে যে ভাসছে বৌদি, সে যদি একথানা তক্তা পায় আর কিছুতেই সে তা ছাড়তে পারে না। আমার চির অন্ধকারাবৃত জীবনে যে আলোটা হঠাৎ জলে উঠেছে, এ আলো যাতে চিরস্থায়ী হয়, তা আমার কর্তব্য হবে। অন্ধকার খনিতে যদি একবার আলো পড়ে, তারপর সে আলো যদি নিতে যায় তার অন্ধকারের গাঢ়তা আরও বেশী হয়ে উঠে। এখন এই ছেলেমেয়ে দুটিকে ফেলে চলে যাওয়া তা আর আমার দ্বারা হবে না। আর শুনি নাকি এ বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে।”

শরতের এলোমেলো কথা শুনিতে শুনিতে সেবার মুখখানি প্রকৃত হইয়া উঠিতেছিল, এই শেষ কথাটা তাহার মুখ আবার অন্ধকার হইয়া উঠিল; সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস কেলিয়া বলিল—“সে কথা সত্যি।”

তাহার মুখখানি অবনত হইয়া পড়িল।

শরৎ একটু হাসির চেষ্টা করিয়া বলিলেন—“বাক, যা গ্যাছে তার সঙ্গ আক্ষেপ করা বুঝা। আপনি আমার অনেক আগে জানিয়ে বুদ্ধির কাজ করেছেন বউদি, কিন্তু তবু আমি আর আগে আসতে পারতুম—নানা গোলমালে আসতে পারিনি। আমার

বাড়ীকে নিজের বাড়ী বলেই মনে করবেন। আমি সত্যিই জ্যোতি মিল্লুর কাকাবাবু, আপনার ভাই। আমার বাড়ী যেতে আপনার কোনও আপত্তি করবার কারণ নেই।”

সেবা তাহার সজল চোখ দুটা শরতের মুখের উপর রাখিয়া ক্লিষ্টকণ্ঠে বলিল, “আপনার এ করুণাকে ধন্যবাদ। আমি আপনার সঙ্গে যাব, কারণ না যাওয়া ব্যতীত আমার আর উপায় নাই। এই হেলে মেয়ে দুটা যদি না থাকত তবে কি করতুম বলতে পারিনি, এখন কিন্তু এদের সঙ্গে আমার মাথা নোয়াতেই হবে। কিন্তু তিনি যদি আপনার বন্ধু কোন দিন ফিরে আসেন? মনের কষ্টে তিনি কোথায় চলে গ্যাছেন, লজ্জায় মুখ আর তুলতে পারেন নি আমার সঙ্গে, এই ছেলে মেয়ে দুটির সঙ্গে পর্যন্ত আর একটা কথা বলেন নি, কোথায় চলে গেছেন, আবার তো তিনি ফিরতে পারেন।”

শরৎ বলিলেন, “সে ভাবনা আপনার কর্তব্য হবে না, আমি সে সব ঠিক করে রেখে দিয়ে যাব। প্রতুল এখানে এলে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আপনি এখন ভাল হয়ে নিন তো, আপনাকে নিয়ে যেতে পারলে হয়। জ্যোতি, তোমার মাকে নিয়ে যাও, কাল সকালেই আমি ডাক্তারের বন্দোবস্ত করব। যান বউদি, আপনি গিয়ে শুয়ে থাকুন। যখন দরকার হবে আমার ডেকে পাঠাবেন, আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না।”

জ্যোতি মায়ের হাতে ধরিয়া বলিল—“ওঠ।”

কম্পিত পদে সেবা চলিয়া গেল।

শরৎ আবার একটা সিগারেট ধরাইয়া টানিতে টানিতে এই মেয়েটির অসাধারণ স্বামীভক্তির কথা ভাবিতে লাগিলেন। এত যে নিষ্ঠুর স্বামী, তবু সেই স্বামীর একটা নিম্নার কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। স্বামীর কথা উঠিতেই তাহার মুখখানা কি নৈরাশ্রে ভরিয়া উঠিল, তাহার হৃদয়ের বেদন! সবটাই ফুটিয়া উঠিল সেই বড় বড় দুটা চোখে।

নিষ্ঠুর প্রতুল—



## প্রেম আগমনে

( শ্রীনিরঞ্জন সেন বি, এ, )

আমিতো বুঝিনি আগে  
হেন বিষ জ্বালা লুকাইয়া রয়

অমন কাণ্ডয়া রাগে !

ও প্রেম আমি তো বুঝিনি কখন  
ভিতর বাহিরে প্রভেদ এমন

কুসুম-পেলব তার আবরণ

পরশে শরীর দহে ।

উপরে এমন মধুর কলস

অন্তরে বিষ রহে ।

যখন প্রথমে আসি

দাঁড়াল সম্মুখে বন্ধিম ঠামে

মুখে মুছ মুছ হাসি !

তখনো সন্ধ্য বেদনা পরাগে

উপেক্ষার শর সে যদি রে হানে

উতলা পরাগ প্রবোধ না মানে

এত যে বুঝাই তারে ।

‘কমলি’কে আমি ছাড়িতে যে চাই

‘কমলি’ তো নাহি ছাড়ে !

৩

লভিলাম তারে যবে,

ভাবিলাম তবে দগধ এ হিয়া—

বুঝিবা শীতল হবে !

তৃপ্তি খুঁজিয়া যত না বেড়াই

তৃপ্তিরে আমি তত যে হারাই

যত পাই তত আরো পেতে চাই

মনে জেগে উঠে ভয় !

আমার নিধিরে হৃদয়ে হেরিয়া

বিধির যদি না সয় !





শ্রীশ্রবোধ রায় বি, এ

প্রাণটা বিধিরে ছিল, কান হুঁটোও।

বল্লম—ভাল লাগচে না। কোম কথা এখন  
গুনতে পারব না।

ব্যথিত অপমানিত হ'য়ে ঘাড় নীচু ক'রে চুপ  
ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, কথা বলে না।

কি করব উপায় নাই। আমার এ বজ্রাহত  
নিষ্করণ হৃদয়ে আর এতটুকু মনতা সমবেদনা জামাবাস  
কোমলতা নেই যা দিয়ে আমি পৃথিবীর কাউকে  
কিছুমাত্র আশ্বস্ত পরিতৃপ্ত করতে পারি। এই স্বার্থপর,  
পিশাচ হীন মানুষের সঙ্গ আর ভাল লাগে না।  
একমাত্র নিজেকে আঘাত দিয়েই আমি একটা  
অনির্বচনীয় আনন্দ একটা অপরিণীত তৃপ্তি পাই।

অপমান ভুলে আবার বলে—একবার চেষ্টা করেই  
দেখ না, নীরেশ বাবু ত তোমার ছেলেবেলাকার বন্ধু!  
এমন অসময়ে পাঁচটি টাকা ধার চাইলে কি আর  
দেবেন না? খুঁকীটার যে আজও জর ছাড়ল না  
শেষটার যদি কিছু বাড়াবাড়ী হয়। যদি শেষে—

ওর অস্থির আকুলতা দেখে হাসি পায়। হুঁটা  
চোখে কি অপূর্ণ দরদ, কি অনন্ত ভালবাসা!

ভুলেই গেছলুম ও খুঁকীর মা। হয় ত'তাই  
হাসতে পেরেছিলুম। ঐ একরত্তি মাংস পিণ্ডের  
ওপর ওর কী আকর্ষণ! পৃথিবীর সব মা-ই বুঝি  
ঐ এক রকম।

শ্রুতাবটা বুঝি আর শুধুরানো যায় না।

পরক্ষণেই আবার তিক্ত কটু কঠে বল্লম—পারব  
না, যাও। লালিত বৃত্তস্থ ভিখারীর মতো আর  
কারণ কাছে হাত পাততে পারব না। প্রাণঘার  
তবুও না। আমি আমার দারিদ্র্যের অসম্মান ক'রে  
আর আত্মমর্যাদার জলাঞ্জলি দিতে পারব না,  
কিছুতেই না।

ও কিন্তু ঠাণ্ডা মেজাজেই কথা বলে। মিনতি  
ভরা সুরে নম্র কঠে বলে—ওঠ লক্ষ্মীটি ভারী অবস্থা  
তুমি। মা না রাগ করো না ছি! তুমিও যদি এমন  
ক'রে মিস্টেট হ'য়ে চুপচাপ হাল ছেড়ে দিয়ে বসে  
থাকো, তা হ'লে আমি একা কোন্ দিক সামলাই  
বল ত?

মিষ্টি কথার আর মন ভেঙ্গে না। ইম্পাতের  
মত কঠিন শব্দ হয়ে গেছে। কাণের কাছে  
সর্বস্বত্ব এই ঘ্যানঘ্যানানি এমন অসহ বিরক্ত মনে  
হয়।

বল্লম—আমায় কি তুমি এক দণ্ডও সৌম্য  
দেবেন না? এ কি যন্ত্রণা বল ত? দিন রাত  
এমন ভাবে উত্তাপ করে তুললে আমার এখানে  
বাস ক'রই দায় হবে দেখছি।

আবার কিন্তু মোলোয়েম সুরে নয়। আমার  
সুরে সুর মিলিয়ে বিরক্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বলে—বেশ ত  
না খেয়েই আজ আকসে বেও তা'হলে। চাল নেই,  
ডাল নেই, এক কথা স্নান ত'বও যদি হাঁড়ি হাত্রে

পাওয়া যায়! এক কোঁদা ছুখের জন্ত মেরেটা এত দিন ধরে কি কান্নাটাই না কেঁদেছে! সাধনা দেব কি, ওর সুখের দিকে চাইতেই—

সন্তানের হুখে মার প্রাণটাও বুঝি হঠাৎ কেঁদে উঠে। ধরা গলার অভ্যমানের ভঙ্গিতে বিনিয়ে বিনিয়ে বলে—আমার আর কি! ভারী ত গোড়া পেটের জন্ত ভাবনা আমার! যা' ইচ্ছে কর তুমি! আমার এত দায় কিসের? রোজ রোজ পরের বাড়ীতে নির্জঙ্ঘর মতো ভিক্ষা করতে থাকে—কেন কিসের জন্ত?

হুখীর সংসারে এই সব কথাগুলো একটুও যেমানান খাপছাড়া শোনায় না। কিন্তু মাথার আজ কেন জানি খুন চেপে গেল।

রাগে হুখে সর্কাক্স রি রি ক'রে উঠল। আজকে উপোস ক'রে আফিসে যাবো ব'লে নয়, ত্রী পুত্র নিয়ে আরও কতদিন এমনই উপোস করে থাকতে হবে তাই ভেবে। বুক ফুলিয়ে একদম কুখে উঠলুম। এমন এক একটা মুহূর্ত আসে যখন মাহুয়ের ক্ষুধিহীন নিষ্ঠুরতার আর সীমা থাকে না।

ভুরু কুঁচকে কর্কশ কণ্ঠে বল্লুম—কী! এই ত' পরশু দিন চাল আনলুম! এরই মধ্যে সে গুলো সাবাড় করেচ? ... এমন অভাবের সংসারেও হু'টা উড়ুধরে বে-হিসাবী মেরে মাহুয ত' আর দেখিনে! এমন অভাবের সংসারেও হু'টা বেলা পেট পুরে না খেলেই নয়? ... হু': আশ্চর্য।

কথাগুলোর নিদারুণ তীক্ষ্ণতা নিজেই অস্বস্তি ব করলুম। নারীর খাওয়া লব্ধে তা'কে খোঁটা দেওয়া যে তা'র কত বড় অপমান, তা'ও আমার অজানা নয়। ..... কিন্তু ষিটু ষিটু না ক'রেও যে পারিনে! অভাব আর অভ্যাচারের পেষণে মাহুযের প্রকৃতি যে কতদূর বীভৎস লব্ধ হ'তে পারে, আমি তা'র একটা জীবন্ত মন্বা।

পাতলা হুহুহু করে চোঁট হু'টা কাগিরে আবার কি বলতে চেয়েছিল। ..... আবার বলবে? সুখ

খানি শুকিয়ে একেবারে ফ্যাকাশে পাংশু হ'য়ে উঠল। সব পোঁতা চারা গাছটি প্রখর রৌদ্রের তাপে যেমন বলসে ম্লান হয়ে পড়ি—তেমনই।

চাকুরী যে আজ তিন দিন হ'ল খুইয়েছি—তা' ও জানে না। যদি বলি এখন, হয় ত' খুকীর মতো চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠবে। থাক—না বলাই ভালো। অনর্থক ওর হুখের মাত্রাকে আর বাড়াই কেন? জানতে ত' পারবেই একদিন। ..... কিন্তু ওকে কাঁদাতেও যে ভালো লাগে!

\* \* \* \* \*

আকাশকে আজ ভারী কাছে পেতে ইচ্ছে করে। আমার এই পঙ্খ-বন্দী জীবনের অপার রিক্ততার সঙ্গে উদার আকাশের বন্ধন হীনতার বিনিময় করতে চাই... ..

নিজেকে ভারী নিঃসঙ্গ অসহায় মনে হয়। মাহুযের হাসি-কান্নার যে বিচিত্র বিপুল ধারা আমার চারপাশ দিয়ে ব'য়ে চলেচে, তা' থেকে আমি লেন বিচ্ছিন্ন। এই প্রাণ চঞ্চল পৃথিবীর প্রশস্ত বৃকের মাঝখানে আমার যেন এতটুকুও ঠাই নেই, কিন্তু তা'র জন্ত হুখও নেই। একান্ত মরিয়া হ'য়েই যে ফুরতে হবে। নইলে যে বাঁচা হয় না। এই নিষ্করণ কঠোর জীবন-সংগ্রামই ত' চলেচে সংসারে। ... ..

পৃথিবীর কাছে নিজেকে এমন অনাদৃত উপেক্ষিত জেনে আনন্দও হয় কিন্তু।

মাত্র আর হু'টা টাকা লম্বল। তবু হু'টা দিনও ত' খেতে পাবো। তারপর কি হয় সে কথা নাই বা ভাবলুম এখন। কি লাভ? অদৃষ্টে যা' আছে সে ত' আর খণ্ডন করতে পারব না। ... ..

আশ্চর্য! এত হুখের মধ্যেও সাধনা কিন্তু হাসতে ভোলে নি। কি অসাধারণ দৃঢ়তা, কি অলৌকিক সহিষ্ণুতা! ..... দৈন্ত ওকে আজও পরাজয় স্বীকার করাতে পারে না। ... ..

টিনের প্যাটুরা থেকে শেব লম্বল হু'টা টাকা বার ক'রে ও সহজ জুরেই বলে,—“এই দিয়েই এখন চলুক ত', তারপর দেখা যাবে।”



ছ'টা গোথে সে কি নির্ভরতা!.....টিনের প্যাটিয়ার টাকা নেই বটে, কিন্তু ওর বুকের সিন্দুক যেন ভরাট হ'য়েই আছে।

কিন্তু সন্দেহ হয় এত সাহস এতখানি উৎসাহ ও পায় কোথায়? পাশের বাড়ীর ঐ স্ত্রেন ওকে সাহায্য ক'রে না ত? আমার সঙ্গে ত' গায়ে প'ড়ে আলাপ জমিয়েচে। হঠাৎ তা'র এরকম অসুস্থ বা অসুস্থ প্রকাশের বাড়াবাড়িটা কেমন যেন অদ্ভুত অস্বাভাবিক মনে হয়। সব দিক্ বজায় রেখে একটু সতর্ক হ'য়ে চলবার জন্য আমার সঙ্গে পরিচয় রাখা যে দরকার তা' ও জানে। জান্বে না-ই বা কেন, এ অভিজ্ঞতা আজকেই ত' প্রথম নয় আর। নিঃস্ব কেরাণীর স্ত্রী, স্ততরাং স্তগত হওয়াই স্বাভাবিক, এই হয় ত' তার ধারণা।

সাহসনা কিন্তু অনেকদিনই ঐ ছেলেটির আপত্তিকর কুৎসিৎ চাহনি ও ভঙ্গীর বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েচে। .....মোটাই আশ্চর্য্য হই নি। আশ্চর্য্য হতুম ছেলেটি যদি ওর রূপের অভাবকে অমাত্র ক'রে থাকতে পারত, তা হ'লেই।

কথা বলে না কি? কি আর অসম্ভব এমন? আমার অসাক্ষাতে বলতেও পারে। যে চাপা মেয়ে, ওর পেটের কথা বার করা আমার সাধ্য নয়। অবশ্য তাদের এভাবে গোপনে সাক্ষাৎ করার মধ্যে আমি কোনই অপরাধ দেখি নে। .. মেয়ে পুরুষে ছ'টা কথা বললেই, মহাভারতটা একেবারে অস্পৃশ্য অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যাবে, এমন অস্ত্রার ধারণা নীতিবিন্দু ভণ্ড পাণ্ডাদের থাক্,—আমার নেই।.....দরকার কি বাজে চিন্তায় আমার মাথাব্যথা করবার! স্ত্রেন যদি সত্যিই ওকে কোনোদিন এতটুকু সাহায্য ক'রে থাকে, কিম্বা ভবিষ্যতে কর্বে ব'লেও আশ্বাস দিয়ে থাকে, তাহ'লে তা'র এ সঙ্কল্পতার, উদার মহানুভবতার আমার কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত নয় কি? ... বিনে ক'রে বৌটিকে ত' চিরঃধিনী করলুম, কত লাজনা কত অপমানই না সহিতে হ'ল তাকে? আমি

হ'য়ে তা'র গ্রাসাচ্ছাদনের ভার নিতে পারি নে, এর চেয়ে মর্মান্তিক দুঃখ আর কি হ'তে পারে? সজ্জায় ঘুরায় আমার মস্ততে ইচ্ছে হয়। তাই তা'বি স্ত্রেন যে আমাদের অসুস্থ করে, তাই কি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়? তার এ অসুস্থতার অন্তরালে কোনো গুঢ় গোপন অভিসন্ধি আছে কি না, তা' নিয়ে বিচার করা শোভা পায় না।

কতি কি? আমি ত' হাঁক ছেড়ে বাঁচি তা' হলে। এতদিন যা হোক্ ক'রে সাব্বনাকে বাঁচিয়ে রাখলুম—আজ থেকে সেই না হয় আমার ভরণ পোষণের ভার নিচ্।—একটু হিংসেও হয়। এক এক সময় মনে হয়, স্ত্রেনের মতো যদি অবহাপন্ন, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হতুম—প্রাণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো মিটিয়ে নিয়ে সাব্বনাকে বানীর হালে রাখতুম।

\* \* \* \*

চার গণ্ডা পরসী নিয়ে বেরিয়েছি। কালকের জন্য আর একটা আধলাও বাঁকী নেই। দেখছি খুব হিসেব ক'রেই চলতে হবে। ছ'টা বেলা ত' চালানো চাই। খুকীর হুধটুকুর জন্য আজ না হয় আর একটা বার ভুলসী গয়লার কাছে খোসামুদীই করব..... তা' দেবে বোধ হয়। দয়া ত' ঐ নীচ জাতের-ই—যা'রা ইতর—ছোটলোক।

পথ ভুল করি নি ত? শরীরটা কেমন যেন নিরুন্ন নিস্তেজ হ'য়ে পড়'চে। পথ চলার জীবনে এই বৃষ্টি প্রথম ক্লাস্তি অসুস্থত্ব কর্চি। কাছেই একটা পার্কে ঢুকে একটা ঠাণ্ডা জায়গা বেছে নিয়ে ব'সে পড়'লুম।.....প্রায় সমবয়সী কতকগুলো চঞ্চল ছেলে মেয়ের দল খুব কলরব ক'রে খেলা কর্চিল।..... বাংলা মায়ের বস্ত্র পালিত সব মেয়ের দুলাল!.....

মেরেটিকে ঠাস্ ক'রে এক চড় ক'সে দিয়ে ছেলেটা অত্যন্ত গভীর হ'য়ে বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলে—“কেমন এবার কি হয়? তোকে ওদের দাগ খেলতে না মানা ক'রে ছিলুম আমি।”

খুঁসি কাসিয়ে দাঁত মুখ ঝিচিয়ে সে কি তিরস্কার করবার ভঙ্গী! শুধু একটা চড়েও তুট্ট নয়, একটা ল্যাং মারবারও বুঝি ইচ্ছে ছিল।

মেয়েটির ফুলের মতো তুলতুলে গালে পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। রক্ত যেন উপচে পড়তে চায়। হুঁটী চোখ ছলছলিয়ে ওঠে, তবু কান্দে না।..... না কাঁদাটাই বুঝি বাহাহুরী, কাঁদলে যেন পরাজয় স্বীকার করা হয়।

দলের বড় মেয়েটি এগিয়ে এসে ওর গালে হাত বুলিয়ে দেয়। আলগোছে খুব আলত চাপ দিয়ে।... সুখের ওপর থেকে কোঁকড়া চুলের গুচ্ছগুলো সরিয়ে দিয়ে সমবেদনার স্বরে বলে—ইস্! মাগো! কি ক'রে মেরেচে ছাখু ভাই! তারপর ছেলেটির দিকে কটমট ক'রে তাকান,। মারতে সাহস না পেয়ে শুধু বলে,— দস্তি ছেলে, ষ্টুপিড কোথাকার! চল না বাড়ীতে, তোমার বাবাকে ব'লে একবার দেখাচ্ছি মজাটা!

ছেলেটি ঠোঁট উন্টিয়ে হুঁহাত চিতিয়ে কলা দেখায়। মেয়েটি তবু মারতে ওঠে না। বছর খানিক আগে হ'লে কি কর্তৃত্ব বলা যায় না। মারামারি করবার মতো এখন যে আর ওর বয়স নেই, সে কথা ও স্থির জানে। হয় ত' সেজন্ত একটু আফশোষও করে। মনে মনে হয় ত' বলে কিছু দিন আগে হ'লে একবার দেখে নিতুম।

ছেলেটির স্পর্শ এবং ঔদ্ধত্যকে নির্কিঁচারে ক্ষমা ক'রে আবার সে মেয়েটিকে আদর করে। নিবিড় স্নেহে বুকে টেনে নিয়ে গালে হাত বুলিয়ে দেয়।..... সমব্যথী বন্ধু নয় যেন সেবাময়ী মা।

এবার কিন্তু এক নিমেষে মেয়েটির সব দৃঢ়তাই ভেঙ্গে যায়। আদর পেয়ে আস্তে, নয় হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কাঁদে।

সাত বছরের ঐ আল্লাদী, চকল মেয়েটিকে কেন জানি দেখেই ভালো লাগতে। আমার খুঁকীর সঙ্গে হয় ত' কোথাও সাদৃশ্য আছে। হুঁটুটে রঙ মুখ চোখ সবই সুন্দর। হাট্টিবার ভঙ্গীটি পর্যন্ত।

হ'লে এক জন অসামান্য সুন্দরী যে হবে, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।.....বেগুনী রঙের ঐ বেগুনটা নিয়ে কেমন অবাধে ঐ রোগা কালো ছেলেটির সঙ্গে খেলা কর্তে। সর্কাসে ধলা মাথা ঐ নোংরা ভাংটা ছেলেটির সঙ্গে খেলা কর্তে তা'র ময়লা কাঁধে হাত দিয়ে চলতে ফিরতে ওর একটুও বাধে না। নিজের রূপ সম্বন্ধেও একদম উদাসীন হ'য়ে আছে, যৌবন যে আসবেই একদিন, তা' কি ও জানে?

ভাব্চি বসন্তের বিজয়দুস্মৃতি বাজিয়ে বিপুল সমারোহে যেদিন মেয়েটির যৌবন আসবে—ওর দেহের শিরায় শিরায় পূর্ণ যৌবনের উদ্দাম রক্তস্রোত অকস্মাৎ যেদিন আপ'নিই উছলে উঠবে, মনে থাকবে তখন তার এই নিঃস্ব কাঙ্গাল ছেলেটির কথা? তেমনি নিঃসঙ্কোচে ওর নোংরা গায়ে হাত দিতে, হাত কাঁপবে না তার?

\* \* \* \*

মজাজ শুধু থামারই রুক্ষ নয় রোদেরও।.....

ঘেন্নি চড়া, তেলি গ্রন্থর! তেতে আগুন হ'য়ে উঠেচে রাস্তা। বিদ্রোহ নয়, সর্কাতালী বুভুক্ষা!...

মনেই ছিল না যে বাজার কর্তে বেরিয়েচি। সাতনার বেদনাবিধুর মলিন মুখ খানি মনে পড়তে। উষ্মগব্যাকুল চিন্তে হয় ত' সে এককণ আমাংই প্রতীক্ষা কর্তে।

সিকিটা হাতের মুঠোতেই বন্দী হ'য়ে আছে। পকেটে রাখতে সাহস হয় না। সিকি ত' নয় যেন কি অমূল্য সম্পদ! খুঁকীটিকেও কোনোদিন এত যত্ন ক'রে আঁকড়ে রাখিনি!.....

কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রি। থেকে থেকে অন্ধকারের বুক ভেঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ব'রে পড়তে।

বৈশাখের এই নিস্তব্ধ নিবিড় অন্ধকার রাত্রিতে একান্ত নিভৃত সঙ্গোপনে নিজের জীবন কাহিনী লিপ্তে সাধ হয়। আমার এই অশ্রুসজ্জল জীবন কাহিনীগুলো এবার আর মনের মধ্যে নয় ছাপার হরফে রেখে যেতে চাই। আমার এই ব্যাখ্যার

কাহিনী বইয়ের আকারে প্রকাশিত করবার জন্ত আফিসের বড় বাবুও একদিন পরামর্শ দিয়েছিলেন। ঠাট্টা করে নিশ্চয়ই।

আলোটা দপ্‌দপ্‌ করে জলছিল। ঐ উজ্জল উজ্জত দীপ্তিটুকু সংসারে দীনতাকেই যেন বিশেষ ভাবে ব্যঙ্গ করে।।.....পলুতেটা নামিয়ে দিতে করুণ চোখে চায়, একটা মর্ষভাঙ্গা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে।... শুধু একটা ম্লান অস্পষ্ট নীল রেখা, কম্পমান মুখুর্। অনন্ত পথ যাত্রীর শেষ মুহূর্তের যেন একটা সক্রুণ মিনতি, একটা স্তম্ভিত অভিবাধন।

ছ'টা ঘণ্টা ঠায় ব'সে থেকে মাত্র একটা পাতা সারা হয়। লেখা আসে না। আর কি-ই বা আছে লিখবার? নিজের ওপরেই রাগ হয়। কেন এই অকাজের কাজ করতে যাওয়া? এতক্ষণে ছ'টা পরসার হয় ত' তেল নষ্ট হ'ল।..... এক মোচড় দিয়ে তক্ষুনি আলোটা নিহিয়ে দিলুম।... চিম্নির ভেতর আলো শিখাটি একবার কৈপেই রঙ হারা বীভৎস হ'য়ে ওঠে। তা ছাড়া কি? এই দৈন্ত পীড়িত সংসার মিথ্যা আড়ম্বর শোভা পায় কখনো?

নিস্তব্ধ রাত্রি। সমস্ত শরীরে অন্ধকারের বেদনা ভ'রে নিয়ে উৎসুক হ'য়ে বাইরের পানে চেয়ে আছি। নিশ্চয় জ্যোতিঃগৌন কি কুৎসিত বিজ্ঞি ঐ আকাশ।

কাছেই ক'রে মুহু অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে সচকিত হ'য়ে উঠলুম। খুব সন্তর্পণে উঠতে চাইলেও ভাঙ্গা বেতের চেয়ারটা কল্পনাস্বরে কঁকিয়ে উঠল। তারপর খুব ধীরে ধীরে সেই কণ্ঠস্বরে অল্পসরণ ক'রে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বিন্মিত হ'য়ে শুনলুম...

কিন্তু আমি যে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসি সাধনা! সর্কক্ষণ আজ যার জন্ত এমন উত্থুখ আকাজকার অধীর হ'য়ে উঠেছি, সে তুমি—তুমি। আমার এ উবেলিত প্রেমকে প্রত্যাখ্যান ক'রে আমার অপমান কোরো না সাধনা, তোমার ছ'টা পারে পড়ছি। আজ যদি একটীবার বুঝতে—

.....মাফ করবেন স্মৃথেন বাবু, আপনি অনর্থক নিজেকে উত্তেজিত পরিশ্রান্ত ক'রে তুলছেন। এই ধরণের গভীর কবিত্বপূর্ণ উচ্চাঙ্গের বক্তৃতার রস করতে পারি এমন অসাধারণ রসগ্রহণশক্তি, অগম সাহসিকতা আমার নেই। আপনি হয় ত' অসহ্য হবেন, কিন্তু এই সব নীচ বর্ণিত কথা শোনার জন্ত এখানে আর এক মুহূর্তও দাড়িয়ে থাকতে আমার আর এতটুকুও প্রগতি নেই।.....কি বল? আপনাকে, আপনি মোহাক্ক—কাপুরুষ! বিবাহিতা হিন্দু নারীর পক্ষে কোনো পর পুরুষের মুখ থেকে এমন অভদ্র অশ্রীতিকর কথা শোনা যে কি ভয়ঙ্কর পাপ, তা' আপনি ধারণাও করতে পারেন না।

.....এই বুদ্ধি প্রতিদান? তোমার গরীব অকর্মণ্য স্বামীই তোমার মাণার মণি হ'য়ে থাকবে আর আমি—এতদিন ধ'রে স্নেহাঙ্গি বাড়ীর সকলের অগোচরে এই যে অকাতরে সাহায্য করলুম তোমার, প্রাণ ঢেলে ভালবাসলুম, তার কি কোনই মূল্য নেই? কিছুই না? এতটুকু কৃতজ্ঞতা একত্রিত অল্পগ্রহও কি আশা করতে পারিনে আমি?

.....আমি জানতুম না স্মৃথেন বাবু। আপনি সাহায্য করতেন জানলে সে সাহায্য গ্রহণ করতে স্বীকৃত হতুম না। ভিক্ষার জন্ত আমি আপনার মার কাছেই হাত পেতেছিলুম, আপনার কাছে নয়। আপনার কৃপার প্রত্যাশী হ'তে আমি স্বর্ণা বোধ করি।

কথাগুলো যেন বেহুতো বেখাপ্পা শোনার। সাধনার এই অসামান্য দৃঢ়তার আমি একটুও স্মৃথী হ'তে পারিনে। ওর সংযম, ওর আত্মনির্ভরতাকে আমার উপহাস করতে ইচ্ছে হয়। তিথারী কেরানীর দ্বী, তার আবার সত্যিষের অহঙ্কার।

বিনি পরসার ত' নয় আর! উপহূত মূল্য দিয়েই ত' স্মৃথেন ওর দেহখানিকে কিনে নিতে চায়, তবু কেন যে অনিচ্ছা বুদ্ধি না। কি লাভ এই

আশ্ববন্ধনায়? .....এই স্বার্থপর ছলনাময় সংসারে নিজকে রক্ষিত নীড়িত ক'রে রাখার চাইতে মূৰ্খতা আর কি হ'তে পারে? বৃত্তকু প্রাণকে পরিতৃপ্ত করবার জ্ঞান ছিনিয়ে নেবার আকাঙ্ক্ষাই যেখানে প্রবল হাওয়ার উচিত, সেখানে কি অবাচিত অমুগ্রহকে উপেক্ষা করা চলে? এই দুঃখের সংসারে ওর এই সংঘমের আতিশয্যকে নেহাৎ খাপছাড়া মনে হয়।

অন্তরের আশ্রয়টাও আবার দপ্ ক'রে জলে ওঠে। ইচ্ছে ক'রে ছুটে গিয়ে স্নেহের টুটি টিপে দিই শেষ ক'রে অপমান ধাক্কা করলে সে যে আমারই ছাঁচিলী প্রেমময়ী পত্নী!

.....কিন্তু শক্তি থাকলেই কি সব সময়ে সাহস করা চলে? বড়লোকের বিরুদ্ধে কান্দালের এ অভিমান শোভা পাবে কেন?

\* \* \* \*

ফাল্গুনের অলস অপরাহ্নে একটি খেলালী যুগ্মবাহু হঠাৎ চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। সব খোঁয়ামো গাছের শাখায় মৃত্যু মন্দির জাগে। হ্রস্ব হাওয়ার দোলায় ভাঙ্গা জানালাটি কি উগ্র আনন্দেই না নৃত্য শুরু ক'রেচে? বিকৃত পঙ্খ হ'য়েও এতটুকু উৎসাহ কমে মি, নাচবার কি অপরূপ ভঙ্গী।

সজোরে সশব্দে জানালাটি টেনে বন্ধ ক'রে দিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসি। গলসওয়ার্দির একখানি সস্ত প্রকাশিত নহলে মনোযোগ দেবার বৃথা চেষ্টা ক'রে শেষে সেখানি এক রকম ছুঁড়েই ফেলে দিই। ভালো লাগে না। বিরক্ত হ'য়ে অন্ধকার ঘরে ক্রমাগত পায়চারী ক'রে বেড়াই। এই ক্ষুদ্রহীন নিকর পৃথিবীর কাছে অনবরত লাঞ্ছনা পেয়ে মনটা ভারী বিভ্রূত হ'য়ে উঠেছে। আমি যে নিতান্ত অনাবশ্যক শুধু একটা আবর্জনার মতোই এখানে প'ড়ে আছি, সে কথা পৃথিবী ত' আমার কতবারই জানিয়ে দিয়েচে।

আমার এই অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ জীবনের নিরর্থকতাকে মাটি যেন বিজ্রপ করে বইতে চায় না।.....

চাকরীর সন্ধানে আজও গিয়েছিলুম, হতাশ হ'য়ে ফিরে এসেছি। নিষ্ফলতা আর আমার একটুও আঘাত দিতে পারে না। দুঃখ আমার বৈধািক্যের পরম সহিষ্ণু ক'রে তুণ্ডে।

জুতো জোড়ার দ্রববস্থা দেখে কষ্ট হয়। এই ক'দিনে ওরা হু'টতে মিলে কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না ক'রেচে।.....রৌদ্র তপ্ত গলিত পিষের রাস্তায় বুক পুড়িয়ে ক্ষইয়ে ফেলেচে, একটা কথাও বলে নি। শ্রীংসেতে মেজের ওপর নিতান্ত অসহায়ের মতো বেদনাগভীর দৃষ্টি মেলে কি করুণ চোখেই চাইছে। যেন বলতে চায়, এবার তোমার ছেঁড়া পাশ্প দিয়ে কাজ চালিয়ে নাও—আমরা আর পারি নে।

আমার কলজেশানিও বোধ হয় এতদিনে অনেকখানি ক্ষয়েছে। জীবনী শক্তি যে ক্ষুরিয়ে এসেচে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই মেই। একটা হ্রারোগ্য ভয়ানক ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'য়ে পড়ি যদি বেশ হয়। না—না, আমি বাঁচতে চাই। আমার এই রিক্ততা অপার ব্যর্থতার মধ্যোই আমলকে বরণ ক'রে নিয়ে আমি সম্পূর্ণ নীরোগ নিরাময় হ'য়ে থাকতে চাই। নইলে মৃত্যুপিপাসু হ'য়ে সর্বক্ষণ মরণের প্রতীক্ষায় থাকে। উঃ সে কল্পনাভীত! তা'র চাইতে ভীষণ শাস্তি বৃষ্টি আর নেই।

মনের পুঁথির একটা কথা কিন্তু আজ সহজ হ'য়ে এসেচে। নিজকে যেন আবিষ্কার করতে পেরেছি আজ।.....শুধু সাধনার জ্ঞানই বাঁচবার ইচ্ছে যে প্রবল হ'য়ে উঠেছে আমার, একথা মনে ভেবে একটু অপরিণীম তৃপ্তি পাই কিন্তু।

এরই মধ্যে কখন সাধনা এসে যে পেছনে দাড়িয়েচে, টেরও পাই নি। কাঁঠের ওপর একখানি হাত খুব আলগা ভাবে রেখে ভৎসনর সুরে দিষ্টি হেসে বলে—দ্রব্য নিশ্চিত হ'য়ে ত' বসে আছে, যত ভাবনা ছাই আমার বৃষ্টি? নাঃ—তোমাকে নিয়ে দেখছি—ওগো মশাই আর কত দিন এমনি অভ্যস্ত হ'য়ে থাকতে হবে শুনি? আশ্চর্য্য ছেলে বা হোক!

ওর স্বচ্ছ হৃদী চোখে ভরস্ব সন্ধ্যার বেদনা টগমল করে। নির্নিমেব দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছি, আছি যেন কতদিন দেখিনি। আজ ওকে ভিরস্বার করতে ভুলে যাই। সহজ সুরেই বলি—কেন সুরেনের মা? আর বুঝি সাহায্য করবেন না তিনি?

.....না। চির জীবন সাহায্য করবার প্রত্যাশা তিনি ত' কোনো প্রতিশ্রুতি দেন নি আমাদের।

কথাটার একটু খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা ছিল হয় ত' কিন্তু তা' গ্রাহ্য না ক'রেই বলুম—দেখ, তুমি যদি নিজেকে গিয়ে সুরেনকে একটু গোপনে বুঝিয়ে বলতে পারো, তা হলে সে নিশ্চয়ই সম্মত হবে। তোমার অজরোধ প্রাণান্তেও সে যে অবহেলা করতে পারবে না, এ ভরসা আমার যথেষ্ট আছে।

এই ধরনের কথার প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই কোনো নারীর কাছেই হুক্কোথ্য থাকে না। ভুরু দুটি কুঁচকে, অভিমানের ভঙ্গিতে চোখ দুটি ভাগর করে বলে—আ—হা, ভারী কথা শিখেছেন! অমন করে কথা বললে আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না বল্টি।

বিরক্তি ও অস্থিরতার মধ্যেও ওর চোখে মুখে একটা শান্ত গান্ধীধোর আভাস ফুটে ওঠে।..... লজ্জারক্ত সেই সুরেন মুখ খানির পানে আবার অনিমেষে চেয়ে থাকি।

অনেকদিন পর হঠাৎ আজ অকারণ ওকে একটু আদর করতে ইচ্ছে করে। উচ্ছ্বসিত আবেগকে যথাসম্ভব সংযত ক'রে কোমল স্বরে বলি—তুমি কি সুরেনের সান্না? তোমার এই ঠাণ্ডা রূপ, স্নিগ্ধ চাউনি মিষ্টি হাসি—

...আচ্ছা গো আচ্ছা, আর দরদ দেখিয়ে কাজ নেই। কথার ঘোড় কিরিয়ে নিয়ে তেমনই নম্র কণ্ঠে নিঃশব্দে বলি—কেরানীর স্ত্রী হওয়া কি তোমার সাজে সাজ? তোমার সৌন্দর্য চার আঙ্গুল

স্বাচ্ছন্দ্য। আমি গরীব, ইচ্ছে থাকলেও কি সে অভাব পূরণ করতে পারি?...তাই ভাবি আজও সুরেন যদি তোমার জীবন সঙ্গিনী করতে পারে, ঐশ্বর্য ও বিলাসের উচ্চ সিংহাসনে বসে তোমার যথেষ্ট সমাদর করে সে, তোমার সৌন্দর্যের যথোচিত সম্মান করতে পারে। তুমি জানো না সান্না, সুরেন তোমার কি গভীর ভাবে ভালোবাসে!

...আঃ জ্বালাতন! তবুও আসবে না তুমি? ব'লেই বাণবিদ্ধা ভীতা হরিণীর মতো যেন নেহাৎ অনন্তোপায় হ'য়েই দেওয়ালের গায়ে মুখ চেপে পিছন কিরে দাঁড়ায়।...অঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে খানিকক্ষণ পরেই নিঃশব্দে অজোরে কাঁদে—ফুঁপিয়ে নয় কিন্তু।

আজ কিন্তু ওর কান্নার আমারও মর্শ্ব ডুকরে ওঠে। এ কি নির্ভর খেলা সুর করতে! এ কি সর্ব্বশেষে খেলা? অনাহারে ছঃশিচ্ছার যা'র দেহ মন ভেঙ্গে পড়েচে—তা'কে ব্যথা দিতেও মন সরে? এত বড় পাষণ আমি! নিজেকে নির্মল ভাবে আঘাত দিতে ইচ্ছে হয়। যা'কে একটি দিনও ভালোবেসে দরদ দেখাতে পারিনি, তা'কেই কাঁদাতে চাই—এ কি অমানুষিকতা!

অভিমান ভাঙানো একটু কঠিন হবে বুঝতে পার্টি। কঠিন সমবেদনার ভ'রে মোলায়েম সুরে বলুম—ভারী অবুঝ তুমি! এই সামান্য বিজ্ঞ টুকুও বুঝতে পারো না? সত্য তুমি এমন ব্যথা পাবে জানলে - ব'লেই এগিয়ে গিয়ে সম্মুখে ওর কাঁধে হাত দিই।

দারুণ বিরক্তির সঙ্গে হাতখানি ছুড়ে ফেলে দিয়ে তেমনই দেওয়ালে মুখ ঝুঁকিয়ে পড়ে থাকে একবার তাকায়ও না কিরে।...ব্যথাভিমানে লাজিতা নারী একটু আদরের কাঙাল হবেই ত!

একটুও অবিচলিত নিকংসাহ না হ'য়ে একরকম জোর করেই ওকে নিবিড় ভাবে বুকে টেনে নিই। সুরে বলি—হিঃ রাগ করো না

আজকের দিনে কি চোখের জল কেলতে হয় ?  
আজ যে সোল পূর্ণিমা !

অগোছাল এলোমেলো চুলের গুচ্ছগুলো দুই হাতে  
মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে ওর কারাভরা  
চোখের পাড়ায় একটা চুমু দিই।...ওর অভিমান  
ভাঙতে আর কিছুই দরকার হয় না।

কি এক ঘন আবেশের মধ্যে এতক্ষণ ও চোখ  
বুজই ছিল। হঠাৎ চোখ মেলে মুখে একটু সলজ্জ  
হাসি এনে দ্বিধা চোখ দু'টা আমার মুখের ওপর তুলেই  
নামিয়ে নিলে।... এক পশ্চাৎ বৃষ্টির পর এক ছিল্কে  
রোদ। জলভরা মেঘের বুকে বিজলীলেখার

মতোই অপরূপ !...সর্বদা থেকে খুসী যেন উছলে  
ওঠে ওর ! কে বলবে এই একটু আগেই কাঁদছিল !

বুকের ওপরেই মাথা রেখে শুধু চোখ দু'টো তুলে  
যল্ল—কেন বললে ও কথা ? বাধা দিতে বুঝি  
ভারী ভালো লাগে, না ? কেন ? আমি তোমার কি  
করেচি শুনি, তাই যে রোজ রোজ —

বেশনার অভিমানে কথাগুলো অস্পষ্ট ভারী হ'য়ে  
ওঠে। পলকহীন দৃষ্টি মেলে আবার লক্ষ্য করি।  
ওর দীর্ঘ দিনের উপোসী চোখ দু'টা আবেশের কান্না  
ভরা মেঘের মতো বিষন্ন স্মিয়মান। গভীর রাত্রির  
ছর্যোগ অভিমায়ে ও যেন একটা নীড়হারী পাখী !

(ক্রমশঃ)

## মায়াজাল

[ শ্রীহরিপদগুহ ]

হিতেশ স্নকেশকে ডাকিয়া বলিল—চ' একবার  
'মাবীপূর্ণিমা' মেলা থেকে ঘুরে আসি !"

সে অনেক আপত্তি করিয়াও বন্ধুর হাত হইতে  
পরিজ্ঞাপ পাইল না ; অগত্যা মেলায় যাইবার জন্ত  
প্রস্তুত হইতে লাগিল।

স্নকেশ আর হিতেশ দুই বন্ধু। একত্রে  
এবেশিকা পাশ করিয়া স্নকেশ বাড়ীতে থাকিয়া আগা  
জমি দেখে, আর হিতেশ কলিকাতার থাকিয়া আই এ  
পড়ে। উপর্যু পরি দুই-দুইবার কেল হইয়াও সে কিন্তু  
বৈধ্য হারায় নাই। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র সে,  
কাজেই অর্থের অভাব তাহার কোন দিনই হয় নাই ;  
আর সেই অর্থের সম্যবহার করিতেও সে পশ্চাদপদ  
হয় নাই। তাহাদের কলেজেরই কে এক জন  
অধ্যাপক খিয়েটার করিয়া কলিকাতাবাসীদেরকে  
মাতাইয়া তুলিয়াছেন ; অতএব তাহার সেখানে

নিয়মিত যাওয়া চাই ; কেন না, তিনি তো তাহারই  
ভূতপূর্ব প্রফেসর ! হিতেশকে উৎসাহ দিবার জন্ত  
হ'একজন কন্ঠ বন্ধুও জুটিয়াছিল। পরের পরসার  
ক্ষুষ্টি করিতে কেই বা চাড়ে ! সে লোকের কাছে  
বুক ফুটাইয়া গর্ব করিয়া বলিত যে, কলেজে  
পড়াইবার সময় এই অধ্যাপক তাহাকে কত ভাল  
বাসিতেন ! এমন কি তিনি এখনও তাহাকে তাঁহার  
দলে লুপিয়া নিতে চান ইত্যাদি। ইদানীং তাহার  
মতিগতিরও কিছু পরিবর্তন ঘটয়াছিল। সে আর  
এখন খিয়েটার দেখিবার জন্ত তত ব্যস্ত ছিল না ;  
বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অভিনেত্রীদের বাটী যাইয়া গান  
শুনিয়া ক্ষুষ্টি করিয়া আসিত। বন্ধুরদল তাহাকে  
'কুমার' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিল ; সে বড়ই খুসী,  
মনে ভাবে—'রাজকুমারই হয় তো !

সাক্ষীগোপ করিয়া দুই বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল।

প্রতি বৎসরই মাঘ মাসের প্রথম পূর্ণিমা তিথিতে এই মেলা বসে। বিভিন্ন গ্রাম হইতে কাতারে কাতারে নরনারী আসিধা এখানে সমবেত হয়; নর অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই অধিক। যাবতীয় দ্রব্য সম্ভারই তখন এখানে পাওয়া যায়।

দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেলা পরিদর্শন করিল। হিতেশ কত বড় একটা আশা লইয়াই না মেলার আসিয়াছিল; কিন্তু সাজগোজ বিহীন, রূপহীন নীচ জাতীয়া পল্লীরমণীদের দেখিয়া আর এক মুহূর্তও তাহার সেখানে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। ঘুগার তাহার দেহ মন বিঘিয়া উঠিল।

মেলার অনতিদূরেই হাটের পাশে রূপোপ জীবিনীদের বস্তি। আজ তাহাদেরও একটা উৎসবের দিন; যদি বা কাহারো ভাগ্যে ছ—একটা ভাল শিকার জুটিয়া যায়! ভাল বেশ-ভূষা করিয়া অঙ্গ-ভঙ্গীসহকারে তাহার পথের পাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছে; পথিকের দর্শন মিলিলে চলচোথের চটুগ নয়নবাণ হানিয়া তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

দলের একটিকে দেখিয়া হিতেশ বলিয়া উঠিল—  
“বাঃ! খাসা আমদানী হে! ছুঁড়িটা তো দেখতে বেশ! চল একবার ঘুরে আসি!”

সুকেশ লজ্জার ঘুগার লাল হইয়া কহিল—“সে কী, তুমি যাবে সমাজের আবর্জনা এই পতিতাদের কাছে? এত নীচ প্রবৃত্তি তোমার!”

হিতেশ হাসিয়া বলিল—“একে তো আর বিয়ে করতে যাচ্ছি না হে! স্বর্গের দেবতারাই যখন উর্ধ্বশী, মেনকা, রম্ভা ইত্যাদিকে নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করতেন, তখন সেই তাদেরই বংশধরকে নিয়ে আমরাও না হয় একটু স্তুতি করলাম—তাতে ক্ষতিটা কী?”

সুকেশ রাগিয়া বলিল—“তোমার যা খুসী হয় কর, আমি চললাম।” বলিয়া ধানিকটা পথ অগ্রসর হইয়া গেল।

হিতেশ আগাইয়া গিয়া তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—“নে, আর লতীপনা দেখাস্ নি।” তারপর তাহাকে প্রায় এক প্রকার জোর করিয়াই টানিয়া লইয়া চলিল।

ছোট্ট ঘরটিতে আসিয়া দুই বন্ধু বসিল। সুকেশ ক্রোধে একেবারে ফাটিয়া পড়িতেছিল; দাঁত দিয়া ঠোঁটটাকে চাপিয়া ধরিয়া নিঃস্রাবের মত একপাশে বসিয়া রহিল।

হিতেশ হাসিয়া বলিল—“তোমার নামটা কি ভাই?”

সে বিনীত-কণ্ঠে বলিল—“উজ্জ্বলা।”

“বাঃ, খাসা নাম। জ্যোৎস্না হলে আরও ভাল হতো।” বলিয়াই সে আপন মনে হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেছিল। একটু পরে সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“আচ্ছা উজ্জ্বলা, গান-টান্ কিছু গাইতে পার তুমি?”

সে মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, সে অভ্যাস তাহার নাই। তারপর মেজাজে বসিয়া পান সাজিতে লাগিল; সাজা হইলে ডিবাটা হিতেশের দিকে আগাইয়া দিল। হিতেশ হাসিয়া কহিল—“দুর্দে প্রাপটাও দিলে না কি?”

উজ্জ্বলা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

হিতেশ সুকেশের দিকে ডিবাটা আগাইয়া দিয়া বলিল—“নাও না হে, জাতি যাবে না।”

সুকেশ তাহার দিকে কটমটু করিয়া চাহিল।

উজ্জ্বলা হিতেশকে প্রণাম করিল—“আপনাদের বাড়ী কোথা বাবু?”

হিতেশ কহিল—“এই সামনেই,—সুন্দরগাঁয়।”

উজ্জ্বলা হাসিতে লাগিল। তারপর হাসিতে হাসিতেই জিজ্ঞাসা করিল—“সেখানকার সবই বুঝি খুব সুন্দর?”

হিতেশ সোলাসে বলিয়া উঠিল “ত্রেভো, জিনিয়স! মাইরি, তুমি যদি কলকাতা থাকতে—”

উজ্জ্বলা তাহাকে বাধা দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—



“সুন্দরগায় অতুল বাবুকে চেনেন? মিস্ত্রি।”

হিতেশ স্নেহের মুখের দিকে চাহিল। স্নেহের ‘চিনি’ বলিয়া উজ্জলার মুখের দিকে চাহিয়াই তাড়াতাড়ি চক্কু নামাইয়া লইল।

হিতেশ বলিল—“আমি তো আর বেশ বড় একটা থাকি না, তাই কাউকে চিনিটিনিও না। হ্যাঁ, তারপর অতুল বাবুর কথা কি বলছিলে?”

উজ্জলা কেমন একটু অগ্ৰসর হইয়া পড়িয়াছিল। হিতেশের প্রশ্নটা কাণে যাইতেই বলিল—“না অমনিই বলছিলাম। তিনিও মাঝে মাঝে আমার কাছে আসতেন কি না। অনেকদিন তাঁর খবর পাইনি, তাই।”

স্নেহ গর্জিয়া উঠিল; বলিল—“অসম্ভব। তাঁর নামে মিথ্যা অপবাদ দিও না। চিরশত্রুও তাঁকে এ অপবাদ দিতে পারবে না। তাঁর নামে মিছে কথা বললে জিভ খসে পড়বে। তিনি যখন বর্মায় ছিলেন, তাঁর বউটা একটা ছোঁড়ার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। বাড়ী এসে যখন তিনি একথা শুনেন, কিছুতেই বিশেষ কর্তে পারলেন না। তাঁর বিশ্বাস—হয় তো জলে ডুবে-টুবে মরেছে। সেই থেকে তিনি বেথা পর্য্যন্ত করলেন না। সেই অসত্য বউটার ফটো নিয়েই থাকেন রাতদিন।”

উজ্জলার চক্কু হইতে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

হিতেশ স্নেহকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—“থাক, সে সব বাস্তব কথার আমাদের কাজ কি। ‘অয়েল ইজ অউন মেশিন’ (Oil your own machine.)। ক্ষুণ্ণি করো ভায়া! লাইফ ইজ লঙ এণ্ড আর্ট ইজ ফ্লোইং’ (Life is long & Art is flowing.)। তারপর উজ্জলার দিকে ফিরিয়া কহিল—“মাইরি প্রাণ, তুমি চলো আমার সঙ্গে কলকাতা, সোপা দিবে তোমার গা মুড়ে ফেলবে।”

উজ্জলার মুখে বাক্য নাই; সে নিঃশব্দের মত দাঁড়াইয়া হিতেশের দিকে সজল-চক্ষে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। তারপর হিতেশই সর্বপ্রথম নীরবতা ভঙ্গ করিয়া উঠিয়া গিয়া উজ্জলার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—“এস, লক্ষ্মীটি, পাশে বসে হেসে হুটো কথা কও।”

সে হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া ধরা-গলায় কহিল—মাপ করবেন; হঠাৎ আমার শরীরটা কেমন খারাপ হয়ে গেছে। আপনারা যদি ইচ্ছে করেন তো পাশের ঘরে যেতে পারেন।”

স্নেহ উঠিয়া দাঁড়াইল।

হিতেশ বিশ্বলের মত কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কণ্ঠে কহিল—“বেশার মুখে হঠাৎ এ হরিনাম! বাঃ বাঃ! মাইরি, তুমি যদি প্লে কর্তে……”

দপ্ করিয়া উজ্জলার চোখ দুইটা জলিয়া উঠিল। পরে একটু সমীহ হইয়া অঙ্গুলী নির্দেশে দ্বার দেখাইয়া বলিল—“যান, বাইরে যান আপনারা। আমার বিরক্ত করবেন না।”

অপমানে হিতেশের কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। তাহার দিকে কটমট করিয়া কহিল—“এত দেমাক! আচ্ছা দেখা যাবে।” তারপর বন্ধুর হাত ধরিয়া হন হন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

\* \* \* \*

শরতের প্রভাত। কালীর দশাখন্ডেখ বাটে বসিয়া একব্যক্তি আত্মিক করিতেছিল; সহসা তাহার সম্মুখে একটা ছায়া পড়ায় সে পশ্চাদ্গতিকে ফিরিয়া দেখিল—একটা রমণী তাহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি চক্কু ফিরাইয়া লইল।

তাহাকে দেখিয়া রমণীর আর আর আশা মিটে না। সে একটা সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িয়া ঠায় চাহিয়া রহিল ওই আত্মিকরত লোকটার দিকে।

রমণী আমাদের পূর্ব-কথিত উজ্জলা। যেদিন হিতেশের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছিল, যেদিন সে তাহার প্রতি স্বামীর ভালবাসা, অগাধ বিশ্বাসের কথা শুনিয়া, সেইদিন হইতেই তাহার মতির পরিবর্তন



ঘটিয়াছে। সেই পাপ-ব্যবসার ত্যাগ করিয়া বাহা কিছু ছিল বিক্রয় করিয়া সে কাশী চলিয়া আসে। এখানে অতি দীন ভাবে থাকিয়া দেবতা দর্শন, ধর্ম্মাণোচনা ও বাকী সময়টুকু স্বামীর চিন্তা করিয়াই কাটাইয়া দেয়। পাপের লালসার, মুহুর্ত্তের উত্তেজনায় সে বাহা করিয়া বসিয়াছে, সেই অধঃপতনের পরিণাম তুহানলের দাহন ও শত বৃশ্চিকের দংশন তাহার আরম্ভ হইয়াছে।

আর এই উপবিষ্ট লোকটাই তাহার স্বামী — অতুলচন্দ্র মিত্র। কয়েক দিন হয় এখানে তীর্থ-দর্শনে আসিয়াছে।

আহ্নিক শেষ হইলে, সে উঠিয়া সূর্য্য নমস্কারপূর্ব্বক সোপান বাহিয়া উঠিতে লাগিল। সহসা রমণীর প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়ার সে চমকিত হইয়া থামিয়া পড়িল; নিজের চক্ষুকে তাহার বিশ্বাস হইল না। সে পলক-হীন দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল।

নবাগত এক দল যাত্রী তাহাদের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। সে কেমন তন্দ্রা হইয়া পড়িয়াছিল; ভাল করিয়া দেখিবার অল্প সময় দিকে অগ্রসর হইয়া গেল, কিন্তু সেখানে কাহাকেও সে দেখিতে পাইল না। এ কী ধাঁধা! কিছুতেই তাহার অবিশ্বাস হয় না; সেই মুখ, সেই চোখ, কপালের উপর সেই কাল দাগ। তাহার ভুল হইতেই পারে না। সে তাহাকে অনেক অলসন্ধান করিল; কিন্তু কোথাও আর তাহার দেখা পাইল না। হারানিধি কিরিয়া পাইয়াও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া সে কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িল।

\* \* \*

শেষ রাত্রিতে একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। অতুলচন্দ্রের চক্ষে নিদ্রা নাই; কয়দিন হইতেই পত্নীর স্মৃতি নুতনরূপে তাহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। প্রাতঃস্নান করিবার মানসে গাম্ভাটা কাঁধে কেলিয়া ‘ঐর্জ্জ্বা’ নাম স্বরণপূর্ব্বক সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িল।

তখনও একটু একটু অন্ধকার আছে। অতুলচন্দ্র নদীতটে পাচচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। অদূরে সোপানাবলীর উপর দৃষ্টি পড়ায় সে দেখিল—একজন রমণী ও যুবকের সাথে কি লইয়া বচসা চলিয়াছে; যুবক মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল।

রমণী কাতর-কণ্ঠে কহিল—“তোমার পারে পড়ি, আমাকে যেতে দাও। বল্লম তো তোমাকে, সে পাপ, ব্যবসায় আমি অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। যে কটাদিন আছি, যেন স্বামীর চিন্তা করেই যেতে পারি;—মোহাই তোমায়, আমাকে বিরক্ত না করে আর কোথাও যাও।”

যুবক ব্যঙ্গ-স্বরে জোর গলায় কহিল,—“বেস্তার আবাক্রম অত সতীপনা কিসের? অত সাধবীই যদি হবি, তবে আর এ দেহ বেচা ব্যবসায় কর্ত্তে গিয়েছিলি কেন, হারামজাদী?” বস্ত্রী তাহাকে সম্মোরে ঠেলিয়া দিল। সে টাল সামালাইতে না পারিয়া পিছল সিঁড়ি হইতে বেগে পতিত হইল।

যুবক আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত হিতেশ, আর রমণী উজ্জ্বলা। হিতেশ একজন বিধবার সর্ব্বনাশ করিয়া পাপ চাকিতে কয়েকদিন হয় তাহাকে লইয়া কাশী আসিয়াছে। একদিন উজ্জ্বলাকে দেখিতে পাইয়া তাহার পাপ-বাসনা জাগিয়া উঠে। সে গোপন অলসন্ধান জানে যে উজ্জ্বলা শেষ রাত্রে জানে যায়, তাই আজ তার এ অভিযান।

এতক্ষণ অতুলের দৃষ্টি ইহাদেরই উপর ছিল। অস্পষ্ট তাহাদের দুই-একটা কথাও তাহার কর্ণে আসিয়াছিল। সহসা রমণীকে পতিতা হইতে দেখিয়া সে ছুটিয়া ঘটনাঙ্কল যায়। হঠাৎ এ অবতন ঘটায় হিতেশ ও কেমন মুস্ফোইয়া পড়িয়াছিল।

অতুল উজ্জ্বলাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। কৰ্দমাঙ্গ পিছলসিঁড়ি হইতে পতিত হওয়ার তাহার মস্তক কাটিয়া গিয়া স্থানট। রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে; দাক্ষণ আঘাতে চৈতন্ত লোপ পাইয়াছে।

সে গারম্ভার খানিকটা ছিঁড়িয়া কেলিয়া তাহার

ক্ষতস্থানে ভাল করিয়া পটি বাধিয়া দিল; তারপর অঞ্জলি ভরিয়া জল আনিয়া তাহার চোখে-মুখে বাপুটা মারিল। একটু পরেই সে চোখ মেলিয়া অতুলকে দেখিয়াই উঠিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু না পারিয়া করুণ আর্ন্তনাদের সহিত “না গো” বলিয়া পুনরায় চকু মুদ্রিত করিল।

হিতেশ অতুলকে বিজ্ঞপ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—“হ্যাঁ মশাই, মাগীটা আপনার কেউ হয় নাকি?”

অতুল তিস্ত-কণ্ঠে জবাব দিল—“হ্যাঁ, হয় আমার স্ত্রী।”

হিতেশ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া কহিল—“কি রকম? তার মানে? বাজারের—”

অতুল বাধা দিয়া কহিল—“হ্যাঁ। আমি সব জানি।”

“ওঃ আপনার নামই বুঝি অতুল বাবু? একে নিয়ে আবার কোন্ মুখে গাঁরে ফিরে যাবেন? সেখানে কি আপনাদের স্থান হবে?” বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

অতুল বলিল—“গাঁয়ে বাবার হয়তো আমার আর দরকার হবে না। বিখ্যেখর যখন তাঁর চরণে স্থান দিয়াছেন, তখন আর সে ভাবনা আমার নেই।”

হিতেশ মুখ বিকৃত করিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল, “বাঃ বাঃ এইতো চাই, সাবাস্। একে স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে তোমার একটু লজ্জাও হলো না।” তারপর ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

অতুল উজ্জ্বলাকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—“তুমি আমার কাঁধে তর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে এস। নিকটেই বাসা, বেশী কষ্ট হবে না; বেলা হলেই লোক জমে যাবে।”

উজ্জ্বলা কোন প্রতিবাদ কহিল না; তাহার কাঁধে তর দিয়া ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিল।

\* \* \*

বা শুধাইয়া গিয়াছে। উজ্জ্বলা এখান হইতে বাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অতুল তাহাকে থাকিবার জন্ত অনুরোধ জানায়, কাতরচক্ষে মুখের দিকে চায়।

উজ্জ্বলা বলিল—“আমি যে পতিতা।” আরও কি বলিতে যাইতেছিল; বাধা দিয়া অতুল কহিল—“আমি সে সব কথা আর শুন্তে চাইনে। পূর্বে যেমন ছিলে, এখনও তেমনই থাক্বে।”

সে কহিল—“না গো না। এজন্যে আমাদের আর দেহের মিলন হতে পারে না।”

অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া অতুল কহিল—বেশ, না হলো, চাইনা দেহের মিলন। তবু আমার কাছটাতে থাক; তোমাকে ছেড়ে আমি একা থাকতে পারবনা।

সে তাহার পারের কাছে বসিয়া ছল ছল চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হয় তো হু-এক ফোঁটা তপ্ত-অশ্রুও গড়াইয়া পড়িল তাহার চরণে।





## অভিশাপ ।

( ত্রিচিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায় )

মলয়ের মুগ্ধশাসে বিকশিত কুম্ভের প্রায়  
যেদিন জন্মিলে তুমি ঋষিদের তপোবনচ্ছায়,  
প্রথম প্রেমের রাজ্যে প্রবেশিলে পাগলিনী-পার।  
সলজ্জ-শঙ্কিতপদে, একেবারে হয়ে আত্মহার,

বঙ্কল-বসন শ্লথ, আকুলকুন্তলা,—

ওগো শকুন্তলা ।

করতল-লগ্ন-শীর্ষ, নিম্নলিত যুগল নয়ান  
যুগল তারকা যথা গোধুলীর মেঘেতে শয়ান ;  
তুমি কি দেখিতেছিলে প্রণয়ের প্রথম স্বপন ?—  
দুঃস্বপ্নের স্পর্শ, প্রীতির নূতন সস্তাষণ ?

বেতসে বিসিনী-শয্যা নিভাস্ত নিরালা,

ওগো শকুন্তলা ?

তুমি কি ভাবিতেছিলে প্রাসাদের স্বর্ণ-সিংহাসন  
কোন শুভক্ষেণে তব পরশিবে রাজীব চরণ ?  
মহিবীর দিব্যবেশে বরবপু হবে আবরিত,

পুষ্পিতা ব্রততী সম আপনার গৌরবে নমিত,  
ভুলেছিলে কণাশ্রম একান্ত বিহবলা,  
ওগো শকুন্তলা ?

বাহিরে যে মেঘমস্ত্রে বিদারিত করি নভস্তল  
উঠিল প্রলয় শব্দ, অতিতীক্ষ্ণ, অব্যর্থ, অটল—  
“অতিথিরে অবহেলি ভাব যারে একাগ্র মানসে,  
সে তোমাতে পাশরি মিলনের প্রথম দিবসে,

ভুলিবে সে তবদন্ত গুপ্ত বরমালা,

অগ্নি শকুন্তলা ।”

তুমি কি শোননি! হায় অভিশাপ—দারুণ দুর্ভাষা,  
সাহস্কারে উচ্চারিল ক্রোধোন্মত্ত তপস্বী দুর্ভাষা !  
ভীম-কাস্তি মূর্তি দুই বাহিরে ও অন্তর মাঝারে  
তোমাতে যে ডুবাইল বিরহের অকুল পাথারে,

তুমি কি বোঝ না তাহা মোহমুগ্ধালা

ওগো শকুন্তলা ?





## শান্তি চৌধুরী

শ্রদ্ধতমা মাননী আমার !

তোমার সেই প্রথম চিঠির পর আর কোনও চিঠি এতদিনের মধ্যে একখানাও পেলুম না। তোমার কাছ থেকে চিঠি পাবার আশা করবার অধিকারও কি নেই আমার ? আর থাকলেই বা কি তোমার তাতে কি আসে যায় ?—নয় ? তুমি কি আমার খোঁজ নেওয়া আবশ্যিক মনে কর ? আমার খবর জানতে ইচ্ছা কর ? আমার তো তা' মনে হয় না। যদি তাই হত, তবে এত অনুরোধ করেও তোমার সাড়া পাচ্ছি নে কেন ? হাঁ বুঝেছি—তোমার কাছে তো আমি একজন পথিক, আমাদের দেখা পথের—বিলীনও পথেই। তাই কি ? তুমি কি আমাকে একজন পথিক ঠাণ্ডারিয়েছ ? না, না তুমি আমাকে কখনই পথিক ভাবতে পার না ; তুমি গুরুকমটি যে নও তা আমি বেশ জানি। তবে লক্ষ্যমি ! লজ্জা করেই কি লিখছি না ? কিসের লজ্জা এ লজ্জা ? প্রাণের কথা জানাবে এই তো ? এতে লজ্জার কি থাকতে পারে ? না, তুমি একে অস্তায় মনে কর ? কেন ? প্রাণটি হালকা করা এতই কি অস্তায় ? আমি তো কোন দোষের মনে করতে পারি না ? তাই তো তোমাকে বিদায়ের দিন সমস্ত জানিয়ে এসেছি। তোমাকে জানিয়ে এসে ভালো করিনি কি ! আমারতো মনে হয় খুব ভালো করেছে। তোমাকে জানিয়েছি, আমার বুক

হালকা করেছে, তুমিও আশাকে বুকে দেখবার অবসর পেয়েছ। বাস্তবিক আমি যে কত উতলা থাকি তুমি তা মোটেই বুঝতে চাও না। আমার যে কত কষ্ট হয় তুমি তা জানতেও চাও না। আমার কি ভাবে যে দিন যায় বেলা কাটে রাত্রি শেষ হয়, তুমি তা ভাবতেও চাও না। এত নির্ভর তুমি।

আচ্ছা মনি তুমি ! কি আমার অভাব প্রাণে বোধ কর ! আমার তো বিশ্বাস হয় না ! যদি তাই হত তবে তুমিও ঠিক আমারই মত উন্মাদ হয়ে উঠতে। আমি যে বোল আনা রকমে তোমার বাথা প্রাণে অনুভব করে থাকি এবার যখন চিঠি লিখবে তখন আমাকে এ কথাটারও জবাব দিও। আমি বড় ব্যগ্র হয়ে আছি এই খবরটুকু জানতে। আজ আমি যদি জানতে পারতুম যে আমার জন্তে একটি তরুণী ভেবে ভেবে সাড়া হচ্ছে, তবে জীবনে অনেকটা শান্তি পেতুম।

দেখেছ তামাসা ! আমি তোমাকে বোল আনা রকমে পেয়েছি, অথচ কি সব পাগলামী করছি। আমি তোমার ভালোবাসা পেয়ে কত গর্ব অনুভব করছি। কতজন্যের ভাগ্যে এ স্বর্গ সুখ ঘটে ? কিন্তু তোমার কথা ভেবে আমার বড় কষ্ট হয়। এখন হয়ত তুমি কত অন্তঃপাতি হচ্ছে আমাকে অবহেলা করে তখন ভাঙিয়ে দিয়েছিলে বলে। আমি খেঁদ দেখছি তোমার চোখ দুটো বেজার ফুলে গেছে

কৈঁদে কৈঁদে। থেকে থেকে বুক চাপড়াচ্ছ আমাকে 'নয়ন জলে' বিদায় করেছ বলে। এই সব কি সত্যি মনি ?

আচ্ছা—যদি ওরকম একটা কিছু হয় যে—

সে জন ফিরেনা আর যে গেছে চলে

বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে.....

তবে তুমি কি করবে ? ইস, কত ব্যাধার লুটিয়ে পড়বে। ভাবতেও গা কাঁটা দেয়।

আমি প্রাণ থেকে গুচ্ছা বলচিনে জেনো, অভিমান করেও নয়। আর আমি যে ফিরব না তার ওতো স্থিরতা নেই। তবে মরলেও মরতে পারি, কারণ যে মরণের তটে বাসা বেঁধেছে তার বাসা যে কখন উড়ে যাবে, তার কি কোন ঠিক আছে ? তাই বলছিলুম কি, যদি আমার এই বিদায়ই শেষ হয় তবে তুমি কি কর, এইটুকু জানতেই আমার ভারী সাধ হচ্ছে।

একটা কথা মনে হলে আমি বড় আশ্চর্য্য হয়ে যাই,—হবার কথাও। কথাটা বিশেষ কিছু নয়, তুমিও তা জান—ভালো করেই জান। তোমার বিরহে ধ্বন বুক ছাপিয়ে কান্না আসে, বেদনার বুক মুহুঁহু কৈঁপে উঠে, তখন বিপরীত দিক থেকে একটা তীব্র আনন্দ এসে মনটাকে ধুয়ে মুছে দিয়ে যায়, সেইটা হচ্ছে 'বিরহের আনন্দ'। এই ব্যথা একমাত্র বিরহীরাই বুঝতে পারে, তা' প্রকাশ করতে আর কেউ কখনও পারে না। পৃথিবীতে যত রকম আনন্দ আছে, এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী আনন্দময়, আর এর স্মৃতিটাই সবচেয়ে বেশী সুখকর। তাইগো তাই-ই, এতগুলো দিন বিরহে কেটে যাওয়ার পরও তোমার না হারিয়ে বরং বড় করে পেয়েছি।

আচ্ছা মনি ! তোমাকে যে এভাবে বিরক্ত করে থাকি এতে তুমি আমাকে কি ভাব ? নিশ্চয়ই একটা আহাম্মক বা বন্ধ পাগল। নয় ? আমিও তাই ভাবি এবং নিজের উপর ভরাসক বিরক্ত হয়ে পড়ি। কেন জান তোমার সঙ্গে তো আমার সুখের

আলাপ ভিন্ন অন্য কোনও সম্পর্ক নাই, এত সামান্য পরিচয়ে তোমার উপর এত জুলুম করছি কেন ? আমার কি অধিকার ?

দাঁড়াও, একবার পড়ে দেখি কি লিখেছি। তোমাকে এতসব যা লিখেছি তা মোটেই সৈনিকের উপযুক্ত হয়নি। এই যে আমার হৃদয়ের হুর্দলতা এইটাই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু।

বুঝতে পারছনা ? এই নির্ভরতার মাঝে কোমলতার প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত ? এতে কর্তব্যে অবহেলা আসে না কি ? বা হয় না কি ? তুমি নিশ্চয়ই সব বুঝতে পার আমি ভাবতে অবাক হয়ে যাই। তুমি আমাকে এভাবে যা দিয়ে দিয়ে তৈরী করছ শুধু এই জ্ঞেই যে, নইলে আমি ভারী কর্তব্য অবহেলাকারী হয়ে দাঁড়াব, তার ফলও হয়ত ভয়ানক হয়ে দাঁড়াবে।

আচ্ছা মনি ! কি করে তুমি এতদূর থেকে আমার অন্তরের কথা টের পাও ? আমি অবাক হয়ে যাই তোমার শক্তির পরিচয় পেয়ে। ঐ যাঃ—আমি ভুলেই গিয়েছি যে তুমি আমার খুব ভালোবাস, আমার ভাল পথের রাস্তা ধুলায় তোমার পারের চিহ্ন এঁকেছ। তোমার আমার অন্তরের টান আছে বলেই সব চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠে, এতেই বুঝা যায় তুমি আমার কত ভালোবাস !

হাঁ কি বলছিলুম ? হুর্দলতাকে দূর করতে না পারলে যে জীবনে শান্তি মোটেই পাব না, একটা হাহাকার—একটা উদ্ভাদনার মাঝে সারাটা জীবন ব্যয়ে বেড়াতে হবে, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমি যে সে তার বইতে পারবনা, তাহা যে আমার অসহনীয় তাও বুঝতে পারছি। কাজেই আমাকে রীতিমত শক্ত হতে হবে। নিজেকে আর অত হুর্দল হতে দেবো না, হুর্দল বলতে দেখোনা।

যদি আমার সে সুযোগ কোনদিনই খটে, আমাকে পাশে তুলে নেবার যত গৌরব্য আমার হয়, যদি কোনদিন এ অভাবনীয় সুখের অধিকারী হই, তবে

সমস্ত কঠোরতাকে বিসর্জন দিয়ে তোমার চরণেই লুটিয়ে পড়ব সেইদিন।

কি করে আমি দুর্ভাগ্যের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারব জান ? যদি নিজেকে কোনদিন ভুলতে পারি, নিজের দেহকে ভুলতে পারি, নিজের দুঃখ বেদনা নিজের যা কিছু সব যদি দূর করতে পারি, এই জীবন-মৃত্যুর খেলা যে আদর্শের জন্তে যুদ্ধে যোগ দেওয়া, এইটাকেই যদি সবচেয়ে বড় করে দেখতে পারি, তবেই আমি মুক্তি পেতে পারব।

তোমার আর বেশী করে ভাবব না আমি, তাহলে ঠিক ল্যাভার্নের মতন আমাকে মরতে হবে। কল্পনাকে যত্ন দিতে গিয়ে, দুর্ভাগ্যতাকে আশ্রয় করতে গিয়ে শেষে তাকে কাপুরুষ বনতে হয়েছিল—যদিও শেষে তার জীবন দিয়ে সে সে দুর্ভাগ্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল। ওরকম তাদেরই অদৃষ্ট হয় যারা ভালোবাসার পড়ে যুদ্ধে আসে। ভালোবাস্তে বাসতে তারা এমন এক স্থানে এসে উপস্থিত হয়, যখন সে বাধা বহন করার মতন ধৈর্য্য আর তাদের থাকে না। তারা যত ভালোই থাকুন মনে, যত সুস্থই থাকুন দেখে, তারা বেশ বুঝতে পারে যে তাদের একটা সময় আসছে, যার হাত থেকে রক্ষা পাবার মতন ক্ষমতা তাদের মোটেই নেই। তাদের ভেঙ্গে পড়তেই হবে। তারা তাদের দেহ মন ভেঙ্গে যাবার ভয়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং মরার আগেই মরে। তাদের সেই অবস্থা সকলের মনে সন্দেহ এনে দেয়। সন্দেহান হয়ে তাদের সমস্ত ভাব দেখে তারা তাদের চোখী দিতে বাধ্য হয়—বলাতো যার না কখন কি করে বসে !

ল্যাভার্নের কথা বলছি। সে ছিল আমার দলের একজন নায়ক। সে টেলিগ্রাফের কাজেও বিশেষ পারদর্শী ছিল, তাছাড়া সে তার অপরিণীত সাহসিকতার জন্তে প্রসিদ্ধ ছিল। যখন খুব গোলা বৃষ্টি হত, আর আমাদের তারগুলো ছিল ভিন্ন হয়ে যেত, তখনই আমাদের ল্যাভার্নের আবশ্যক হত। সে সেই গোলা

বৃষ্টির মাঝে ছুটে গিয়ে সমস্ত ঠিক করে ফিরে আসত। তাকে আমি এত ভালোবাসতুম যে কোনদিন আমি তাকে আমার কাছছাড়া করিনি। আমি যুদ্ধ যখন নাবতুম, ল্যাভার্ন ছিল তখন আমার প্রধান সহচর। আমি তাকে আমার সাহচর্য্যে না পেলে কখনই এত সম্মান পেতুম না। আমার যুদ্ধে জয়লাভ তার জন্তেই, তাকে যদি না পেতুম তবে আজ আমি আর সর্দার হতে পারতুম না।

যাক, তার জীবনের সমস্ত ইতিহাস আমি জানতে পেরেছি। সে আমার খুব ভালোবাস্তো বলে কোন কিছু আমাকে গোপন করত না। আমিও তাকে আমার সব বলেছি। তার মানসীর সাথে তার বিদায়ের পালা শেষ হয়েছিল ঠিক আমারই মত অপমানিত হয়ে। যে দিন যুদ্ধে এলো সেইদিনই তার মানসীকে প্রেম জানিয়ে উপেক্ষা অপমান আর অবহেলা পেয়ে খুব মর্মান্বিত হয় এবং যুদ্ধে চলে আসে।

প্রথম তার আর জেসমিনের খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতনা, কিন্তু ল্যাভার্ন প্রেম জানাবার আগেই ‘এলেন’ বলে একটা উচ্চশিক্ষিত এবং ধর্মীর সঙ্গে জেসমিনের বন্ধুতা হয় এবং তাদের বিয়ের প্রস্তাবও হয়। ল্যাভার্ন কিন্তু তবু হাল ছাড়েনি। সে দেখত, তাকে আর তেমন করে তারা আদর করে না বা ভাবেনা, বরং তার আগমনে জেসমিন যেন একটু বিরক্তই হয়, সে কাছে এসে বসলে অবসর নেই বলে চলে যায়, তবু সে তার কাছে যেত। তার খুব বিশ্বাস ছিল জেসমিনকে সে পাবে। এলেন জেসমিন যেখান যেত, ল্যাভার্নও তাদের অনুসরণ করত। সে পালিয়ে পালিয়ে তাদের কাজে চোখ রাখত, মাঝে মাঝে সামনেও এসে পড়ত। যেন কোন কাজে এসেছিল, হঠাৎ তাদের দেখা এইরকম ভাব দেখিয়ে সরে পড়ত। সে বলেছে, একটা দিনের জন্তেও সে কোথাও নড়েনি জেসমিনকে ফেলে। ছাত্রের মতন তাকে অনুসরণ করত।

একদিন এলেন ও জেসমিন বোট্টে সমুদ্রে বেড়াতে

যায়। ল্যাভার্ণও তাদের পিছু পিছু আরেকটা বোটে যায়। তারা যখন অনেক দূর এসেছে, তখন হঠাৎ চারিদিক আঁধার করে তুমুল ঝড় আরম্ভ হল। প্রাণপণে এলেন তীর্থাভিমুখে যেতে চাইল, কিন্তু পারল না। একটা প্রচণ্ড ঢেউ তাদের বোট উল্টিয়ে দিলো। এলেনকে দেখল তীরের দিকে জেসমিনকে অতল জলধির মাঝে ফেলেই সাঁতারে চলেছে। জেসমিনকে দেখতে পেল না। কতকক্ষণ দেখলে, সে ভেসে উঠেছে। এক একবার বিশ ত্রিশ হাত উচুতে উঠছে আবার কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে। সে ঝাঁপ দিল এবং ভগবানের আশীর্বাদে তাকে নিয়ে তীরে এসে পৌঁছল। তখন জেসমিনের জ্ঞান ছিল না। তাকে তীরে পৌঁছে দিয়েই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

জ্ঞান হলে জানুল যে তাহার এক বন্ধুই তাহাকে সমুদ্রের কিনার থেকে কুড়িয়ে এনেছে। সে জেসমিন বা এলেনকে দেখে নাই।

ল্যাভার্ণ ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠল। একদিন সে জেসমিনকে জানাল যে সেইদিন, সেই তাকে বাঁচিয়েছে; সে কিন্তু তা মোটেই বিশ্বাস করল না। এলেন তাকে বলেছে এবং তার মা বাবাকেও জানিয়েছে যে সেই জেসমিনকে বাঁচিয়েছে। অন্ধবিশ্বাসে যদিও এতে তার কোনো দোষ নাই, কারণ সে যেমন তীরে পৌঁছে তখন সে অজ্ঞানই ছিল; দ্বিতীয়তঃ ভালবাসা লোককে যে অন্ধ করে, জেসমিন ল্যাভার্ণকে গালাগাল করে তাড়িয়ে দেয়, এলেনও তাকে খুব অপমান করে।

জেসমিন মিথ্যার আচ্ছন্ন হল, সে মিথ্যাকেই আঁকড়ে ধরল। যাকে খুব ভালবাসা দেখাতো, আপনাত্মক জন মনে করত, সেই তাকে ফেলে প্রাণ ভরে পালিয়েছিল, আর যাকে সে এতটুকু করুণা করে না, কেবল অবজ্ঞা করে এসেছে, ঘৃণা করে এসেছে, সেই বাঁচাল। তার জীবন সে যে এই সমুদ্রে কাপিয়ে পড়ে নিজেকে বিপন্ন করে তাকে বাঁচাল, তার পুরস্কার সে পেল অপমান আর একবৃক বেদনা। শুধু এই বেদনাতেই তার শেষ নাই, ঠাণ্ডা লেগে তার ডাবল

নিমোনিয়া হয়। ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু ভগবানের অমুগ্রহে সে বেঁচে উঠে।

জেসমিনের অবজ্ঞা তাকে খুব ব্যথিত করল। হওয়ার কথাও। ভালবাসার জন যদি অপমান করে, তবে তা যে কত ভীষণ হয়ে বৃকে বাজে যায়। কোনদিন বৃকে ক্ষুভব করেছে তারাই জানে। সেও সে বা খেয়ে মূরে পড়ে এবং সেইদিনই বৃকের বেদনা চেপে রাখতে এখানে—এই বৃদ্ধ ক্ষেত্রে চল আসে।

বৃদ্ধের প্রথম থেকেই সে সাহসিকতায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। সে মৃত্যুকে মোটেই ভয় করত না। সে বলত ভয় জয় না করলে 'সৈনিক' হওয়া যায় না। ছ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে কত কাজ করে গেছে। এর মধ্যে আর এতটুকু অনিষ্ট হয়নি, যদিও অনেক বার আশুনের মাঝে ছুটে গিয়েছে।

কিন্তু তারপর থেকেই সে যেন কেমন কেমন হয়ে গেলো। মাঝে মাঝে দেখতুম, যদি কখনও গালাবৃষ্টির মধ্যে যাবার কথা হত, তখনই নিজ হাতে গুলি খেয়ে আহত হয়ে হাঁসপাতালে চলে যেত।

প্রথম প্রথম আমার কেমন ঠেকত কিন্তু পরে সব বুঝতে পারলুম। সেই দিন থেকেই তাকে কড়া পাহাড়ায় রাখতে লাগলুম। সে সবই বুঝতে পারল। এর পরই দেখতুম সে পালাবার সুযোগ খুঁজছে। সহজে কি তা পারা যায়? যখন ভয়ানক বৃদ্ধ বাঁধত, তখন তাকে আমার সামনে ধামিয়ে রাখতুম। এক একটা কামানের শব্দ শুনে সে কঁপে উঠত। তাকে ছেড়ে দেওয়াই ছিল আমার উচিত, কিন্তু শেষে আমাকে অনেক বেগ পেতে হবে, কারণ তারমত সাহসী পুরুষ আর কেউ আমার দলে ছিল না, তাই তাকে ছাড়লুম না।

একদিন সে মামজাদা বীর বলে সম্মানিত হয়ে এসেছে, আর আজ কাপুরুষ বলে সকলের কাছেই ঘৃণ্য হয়েছে। অল্প কেউ জানত না কেন যে এরকমটি হয়েছে। সে বুঝতে পারল যে সকলেই

তাকে বেশ করুণার চোখে দেখছে। এইটা তার সহ্য হলনা। এই ঘা তার বুকে ভীষণ ভাবে বাজল। আবার সে তার দুর্নাম ঘুচাবার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

সেদিন 'হিঙেন বার্গে' ভ্রমণক যুদ্ধ হচ্ছিল। সে এসে আমার জানাল যে সে সেখানে যেতে চায়। আমিও আপত্তি করলুম না। আমি বেশ বুঝতে পারলুম যে, সে ভীষণ উত্তেজিত হয়েই ওখানে যেতে চাচ্ছে। যদি যেতে না পারে তবে আত্মহত্যাও করতে পারে। তা ছাড়া এই জায়গাটা জয় যে করতেই হবে আমাকে। 'রেবী' এই জায়গার কথাই বলেছিল আমাকে। তাকে এ অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়ে আমার খুব আনন্দ হল। তবুপি আমার মনে হল যে এবার আমার জয় নিশ্চিত।

তাকে পাঠালুম, কিন্তু নিজেও বসে থাকতে পারলুম না। তার পেছনে পেছনে আমিও সেখানে গেলুম। দেখলুম, শত্রুদের সামনের ট্রেঞ্চ বসে সে অবিরাম 'মেসিনগান' ছুড়ছে। আমি তার পাশে 'টেলিস্কোপ' হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম আর তাকে হুকুম করছিলাম কোন্ কোন্ দিকে গুলী ছুড়তে হবে।

উঃ! কি যুদ্ধটাই না সে সেদিন করেছে। একটিবারের জন্তও টু শব্দটি করেনি বা থামেনি। অবিশ্রাম চালিয়ে চালিয়ে 'মেসিনগান' বন্ধ হয়ে গেলো। তখন 'রাইফেল' হাতে কোমর পর্যাস্ত গর্তে ডুবিয়ে রেখে গুলী ছুড়তে লাগল। তারপর হঠাৎ একটা কামানের আগুন তার কাণ ছুটো বধির আর চোখ দুটো অন্ধ করে দিলো। একটু অস্পষ্ট শব্দ করে বীর ধরাশায়ী হল। আজ তার কাপুরুষ নাম যুগল।

আমি তার ভুলুপ্তিত দেহটা কোন রকমে ট্রেঞ্চে নিয়ে এলুম। তারপর সৈন্তের জন্ত 'ফোন' করে একাই কামান দাগছিলাম। সাহায্যকারীদলও এল। তারপর ভীষণ লড়াইর পর সে স্থানটা অধিকার করলুম।

তাই বলছিলাম কি, নিজের প্রতি করুণা দেখানোর সময় বিশেষভাবে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। নইলে ওরকম কাপুরুষ বনে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে। ছিঃ! এর চেয়ে মরণও ভালো!

পরদিন নব-অধিকৃত স্থানটি দেখবার খুব সাধ হল। ভয়ে ভয়ে এদিক্ সেদিক্ তাকিয়ে তাকিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম—বলাতো যায় না কোন্ দিক্ থেকে গুলী এসে এপিঠ ওপিঠ করে দেয়? হামাগুড়ি মেরে একটা সুরঙ্গ-পথে মাটির নীচে চুকলুম।

বাপুরে! কি অন্ধকার, আর কি বিজী গন্ধ! নাড়ী সব উন্টিয়ে বেড়িয়ে আসতে চায়। সামনে এগুতে গিয়ে মানুষের মৃত দেহের উপর এসে পড়লুম। এক একবার ইচ্ছা হচ্ছিল ফিরে যাই—কিন্তু আবার ইচ্ছা হচ্ছিল, শত্রুদের গর্তগুলো একবার দেখে যাই

মানুষের দেহের উপর দিয়েই চলেছি। কতটুকু এসে আর পথ দেখতে পেলুম না। পকেট থেকে বিজলী বাতির বাটারী দিয়ে চারিদিক্ চেয়ে সুরঙ্গের আরেকটা মুখ দেখবার চেষ্টা করলুম। অল্পসন্ধানে পথটা দেখতে পেলুম এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলাম। ভয় হচ্ছিল—যদি কেউ বেঁচে থেকে থাকে আর আমাকে দেখতে পায়, তবে হয় মৃত্যু নয় বন্দী হতে হবে। বন্দী হওয়ার চেয়ে মরণ তবু শ্রেয়ঃ।

চলতে চলতে একটা dug out পেলুম। তার দিঁড়িও ছিল নীচে নেমে যাবার। ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেলুম।

ওয়ে বাপুরে! পড়বি তো পড় একেবারে বাঘের গুহার। দেখলুম কয়েকজন শত্রু সৈন্ত বসে বসে বিষমভাবে কি পরামর্শ করছে। কেউ এলিয়ে শুয়ে পড়েছে, কেউ গালে হাত দিয়ে বসে আছে আর কেউ বালুর বস্তার উপর বসে বসে বুট দিয়ে মাটা খুঁড়ছে। আমারতো অন্তরাভ্রা কেঁপেই অস্থির। মাগো! এই বুঝি দেখে ফেলে! এই বুঝি এসে ধরে ফেলে! এই বুঝি গুলী ছুড়ে। কাঁপতে কাঁপতে পড়তে পড়তে



কোনো রকমেতো উপরে চলে এলুম। আমাকে তারা দেখতে পারনি; খুব চিন্তাশ্রিত ছিল বলেই বোধ হয়।

উপরে এসেই semaphore signal এ আমার সৈন্তদের জানালুম যে এখানে কয়েকজন সৈন্ত এখনো বেঁচে রয়েছে। শীগগীর এসো, এদের বন্দী করতে হবে।

তারা এলো এবং ছোট রকমের একটা যুদ্ধ হল। দু'জন শত্রু হস্তে বন্দী হল, আর তিনজন মরে বাঁচল।

একজন বন্দী যেন বুদ্ধ ছিল। তাঁর শাস্ত্ররাজি বুক পর্য্যন্ত নেমেছে, চুলগুলো বেশ বড় বড় এবং কোকড়া কোকড়া—পিঠ পর্য্যন্ত নেমেছে। দেখলে মনে হয় যেন কবি। দেশমাতার জন্তে, রাজার আহ্বানে তাঁর শাস্ত্রিগুণ জীবন নিয়ে এই আগুনের মাঝে ছুটে এসেছেন। তাঁর সারা দেহে আঘাতের চিহ্ন। কি সহিষ্ণু!

আবার তাঁর শরীরটাও ঝাঁড়ের নতো। দেখলে ভয় হয়। কিন্তু অদৃষ্ট দোষে তাঁকে বন্দী হতে হল। এমন কত বর্জ্যই না পেতে হবে তাঁকে!

তাঁর জন্তে একটু কষ্ট হল। আমি তাঁকে দিয়ে কোনো কাজ করতে দিলাম না। আমার কাছেই তাঁর স্থান দিলাম।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম কি করে তিনি এ বড়ো বয়সে এত কষ্ট সহ্যেছেন, শাস্ত্রির আসন ছেড়ে, কি করে এই ধুমকুণ্ডলীর মাঝে, আগুনের মাঝে নেমে এলেন?

তিনি জবাব দিলেন—সকলে যেমনি করে সহ্য করে আমিও তেমনি করে সঙ্গে থাকি! আশ্চর্য্য হচ্ছে! আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই—অন্ততঃ আমরাতো এতে আশ্চর্য্য হতে পারি না! হাঁ—তোমাদের পক্ষে তা বিশ্বাস্যকর বটেই তো! তোমরা যে ভীকৃ কপুরুষ! অল্প ভায়েই তোমরা সুইয়ে পড়। অপৰ্য্যাপ্ত আহার আর পানীয় পেয়েও তোমাদের সাহস এতটুকু নেই। যে দেশ পরাধীন, যারা দাস খত দিতে গোরব বোধ

করে, তাদের সাহস কতটুকু হতে পারে? আমরা শুনেছি, তোমরা এত নীচ যে, মা বোনের অত্যাচারেও তোমাদের বুক বাজে না। তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পার—কিন্তু কোনো ঐতীকার করতে পারনা, করনা। করবেই বা কি করে? যারা বিদেশীর মুখাপেক্ষী, বাদের দেশে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের কোনো উপায় নেই, যারা কেনোদিন সৈনিক বিভাগে যোগ দেওয়ার ক্ষুদ্রতা পায়না, বাদের রাজা বিদেশী—তাদের সাহস কি পরিস্ফুট হতে পারে? সর্বদাই যে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়!

তোমরা যদি দেশমাতার আহ্বান শুনে পেতে, মনুষ্যত্ব যদি তোমাদের থাকত—তবে তোমাদের দেশের বৃদ্ধেরাও আমাদের মতন যুদ্ধে নাচতে পারতেন, সাহস পেতেন, শক্তি পেতেন। তোমরা কোনোকালে বিপদের মুখে যাও না, কারণ তোমরা ভয়পাও, সামনে পড়লেও পিছিয়ে পড়, কারণ তোমাদের সে শক্তি বা সাহস নেই যে তার মুখে দাঁড়াতে পার! কিন্তু আমাদের ছোটকালেই সে সবের মাঝে যেতে হয়। পিতামাতা সম্ভ্রমদের ছোট বেলায় তৈরী করতে চেষ্টা করেন। তাই বলে ভেবোনা তোমাদের তাদের কম স্নেহ করেন? আমরা আচম্ভিত মৃত্যু সম্ভাবনার দাঁড়িয়ে থাকি, কারণ আমরা যে দেশের রাজার হাতে, পিতামাতার হাতে তৈরী হয়েছি। তাদের সুশিক্ষার ফলে আমরা সহিষ্ণু হয়েছি, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী হয়েছি, আর তাঁদেরই সুশিক্ষার ফলে আমরা বিপদকে বিপদ বলে ভাবতে পারি না—মরণকে ভয় করি না।

এইতো তোমাদের হাতে বন্দী হয়েছি, তোমরা আমাদের দ্বারা কত কাজ করিয়ে নেবে—কত বই আমাদের দিবে, কত অত্যাচার করবে, নির্ভরতার মতন ব্যবহার করবে, সে সব জেনেও আমাদের এতটুকু ভয় হচ্ছেনা। কেন জান? আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে, ভয় ভয় করা। ভয় ভয় করাই হচ্ছে মহৎ জীবনের ভিত্তি। বাল্যকালে এই

সত্যটুকু উপলব্ধি করবার সুযোগ পাইনি—পেরেও  
হুঁকিন। তখন মনে কর্তুম কি জান ? মনে  
কর্তুম যে ভংকে চিরকালের মতো জয় করব।

তা কি হয় ? তা কখনও হয় না। সব সময়ে  
বুঝতে চেয়েছি যে প্রত্যেকবারেই নতুন করে ভয়কে  
দমন করতে হয়। আমাদের খেজর কি বলতেন  
জান ? তিনি বলতেন—ছোটকাল থেকেই ভয়কে  
জয় করবার চেষ্টা করা উচিত। যারা তা করেনা  
তারা জীবনে উপহাসাস্পদ হয়। ইহা বড়ই সজ্জার  
বিষয়। যে ভয় পায়, সে সজ্জিত হবার সুযোগ পায় না।  
কিন্তু শেষ সময় তিনি বুঝেছিলেন, ভয় পায় সকলেই,  
কিন্তু প্রকৃত মানুষ সেই, যে ভয়কে জয় করে এবং  
অগ্রাহ্য করে, একেবারে মন থেকে দূর করে দেয়।

এইমাত্র আদালী এসে বলে গেলো যে দু-ঘণ্টার  
মধ্যেই বন্দীদের এবং আহত ব্যক্তিগণকে নিয়ে প্যারী  
রওনা হতে হবে—সার্জেন্ট জেনারেল খবর পাঠিয়েছেন।

ওগো আমি যে বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। তোমার  
কাছে না গেলে যে আর চাফা হয়ে উঠব না। কবে  
যে সে সুযোগ ঘটবে কে জানে ?

তবে আজ আসি। আমার আশীর্বাদ, ভাগ্যবাসী  
এবং চুষন জেনো। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।  
ইতি

ক্রমণঃ—

## শ্রীকৃষ্ণ-বন্দনা

### শ্রীবিনয় ভূষণসেনগুপ্ত

( ১ )

বন্দিতোমায় রাখাল-বন্ধু বৃন্দাবনের বিপিন-চারী,  
ধরার জীব ভরাতে এলে হরি, গোপের ঘরে দয়া করি।  
দয়ার তুমি শিরোমণি, বিরোধ শুধুই শঠের সনে,  
সহজ ঠাকুর সহজ ভাবে, প্রেম বিলালে বৃন্দাবনে।

( ২ )

এলে, সুখা হয়ে সাধুর তরে, ওগো, যত্নরূপী দুঃকৃভের,  
কংস তোমার রোষে ধ্বংস, হলে জীবন-রূপী অগভের।  
তুচ্ছ করতে বিপদ যত শিখালে নেচে সাপের মাথায়,  
গিরি-গোবর্ধন ধরলে হাসি বিন্দু-কাতর হলেনা ভায়।


( ৩ )

ধনীর চেয়ে ভক্ত দুঃখীর রাখ তুমি শত অমুরোধ,  
 দুর্ঘোষনের অন্ন ছাড়ি, খেলে অন্নহীনের ঘরের খুদ ।  
 ছল'ত তুমি দেবগণের মূনিগণ হায়, না পায় ধ্যানের,  
 হ'য়ে সেই অচিন্ত্য, কি আনন্দ দেখু চরাও বৃন্দাবনে ।

( ৪ )

ছাড়ি' বৈকুণ্ঠের রাজ্য-সম্পদ রাখালগণের হ'লে রাজা,  
 তোমার কার্য হ'ল ভক্ত সনে কদমতলায় বাঁশী-বাজা ।  
 বিশ্ব মানব পাগল করা-মূর্তি তোমার ভুবন-মোহন,  
 মনসিজদর্প-হারী, তোমার পদে কাম বিচেতন ।

( ৫ )

 আপন বলে তোমায় শুধু আপন হ'তে অধিক জড়াই,  
 হোকনা প্রাণে বেদনা ঘোর তার তরে মোর দুঃখ নাই ।  
 তুচ্ছ করি মান-অপমান, সবার চেয়ে সেরা চাওয়া,  
 সকল ধর্ম্য পরিহরি, তোমার পদে শরণ লওয়া ।

( ৬ )

তোমার অস্ত বল হে অনন্ত কে পায় ভাবি অন্তর্ধামি ।  
 নিরন্তর মোর থেকে প্রাণে, এর বেশী হুখ চাইনা আমি ।  
 অন্তর করি পাপ অস্তরের বাঁজাও বাঁশী প্রাণের হরি,  
 বন্দি তোমায় রাখাল-বন্ধু, বৃন্দাবনের বিপিনচারী ।

## সমাজের জীবন

### শ্রীরবীন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী

জগতের বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিকতার মধ্যদিয়া যে জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা একদিনে বা দশ বিশ বৎসরে হয় নাই, শত শত বৎসরের ঘাত-প্রতিঘাতে, শত শত বৎসরের পরিবর্তনের মধ্যে পারিপার্শ্বিক জাতিগুলির চিন্তা ও ভাবধারার আদানপ্রদানে প্রত্যেক জাতিরই সামাজিক জীবন গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। একে অন্তরে প্রতি সহানুভূতি নিয়া প্রত্যেক জাতিই ভাবের আদানপ্রদানে নিজের সমাজকে পুষ্ট করিয়াছে। অতি প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ বাণিজ্য-জগতে একচ্ছত্র সম্রাট ছিল। ভারতবর্ষ হইতে যুগে যুগে বহু উপনিবেশ জগতের বিভিন্ন অংশে স্থাপিত হইয়াছে; আবার যুগে যুগে বহু জনপ্রাণন ভারতের বক্ষে আসিয়া নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়া হিন্দুর জাতীয় জীবনের বিশাল ছায়ায় মিশিয়া গিয়াছে।

এই যে আদান প্রদান, তাহা আৰ্য্যজাতির অভ্যুদয়ের পূর্বেও যে ছিল না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয় মধ্যএশিয়া নিবাসী আৰ্য্যসমূহের পরিচিত কতকগুলি বিশিষ্ট মানুষের মধ্যে। কালক্রমে তাহারা জগতের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়েন। উন্নত সভ্যতা নিয়া তাহারা জগতের যে প্রদেশেই গিয়াছেন; ওখায়ই আদিম অধিবাসী অসভ্য বর্ষরদিগের সহিত শক্তির পরীক্ষার ধীরে ধীরে ঐ সমস্ত প্রদেশে নিজেদের প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। আৰ্য্যগণ ভারতে এবং জগতের অন্যান্য প্রদেশে যে সমস্ত আদিম নিবাসিগণের সহিত যুদ্ধাদি করিয়া দেশ জয় করিয়াছেন, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আচার ব্যবহার, ভাষা এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্রে এত সাদৃশ্য আছে যে অধুনা আমাদিগকে বিশ্বাস-বিষ্ট হইতে হয়। ঐতিহাসিক টেলর সাহেব বলেন :-

“These tribes are now generally classed as Turanian, and belong to a very large section of one of the most ancient people on the Earth, who inhabited India, the Eastern and part of the Pacific Islands, and Australia. They have been also termed as Negritos, because of certain points of similarity with the Negroes of Africa.....A striking instance of this agreement is afforded in “boomerang,” which was first met within Australasia, and was supposed to be peculiar to its inhabitants; but the wild tribes of Southern India possess exactly the same weapon and use it in the same manner. So also the science of language when applied to all the tongues of this wildly spread people, finds agreement in construction in roots of words, in idioms and phrases, and often in the very words themselves.”

দ্রাবিড়গণ দাক্ষিণাত্যের এক প্রবল প্রতিপত্তিশালী জাতি। প্রাচীন যুগেও এই জাতি অসভ্য বর্ষর ছিল বহিয়া মনে হয় না। তাহাদের সভ্যতা আৰ্য্য সভ্যতা হইতে কোন অংশে নূন ছিল না, অথচ এই দ্রাবিড়গণও সেই অনাৰ্য্যজাতি বাহাদিগকে কৃষ্ণকার অসভ্য বর্ষর বলিয়া আৰ্য্যগণ ঘৃণা করিতেন। দ্রাবিড়গণ পূর্বোক্ত বিখ্যাত বিশাল অনাৰ্য্যভাষার বংশধর। দ্রাবিড় ভাষার সহিত অন্যান্য অনাৰ্য্যভাষার সাদৃশ্য আছে, ইতিহাস তাহাই বলে — “These Dravidian languages are found by philologists to be akin to the Turanian or Sythian of remote times”—Mannual of Indian History, Page 40—প্রাগৈতিহাসিক যুগে তৎকাল

অতীতের কোন সুদূর মুহূর্তে যে দ্রাবিড়গণ ভারতে প্রবেশকরতঃ কোন পথে তাহারা ভারতঅক্রমণ করে, তাহার সঠিক ইতিহাস নাই। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক বশেন যে অতি প্রাচীন যুগে তাহারা ভারত জয় করে—“it may be assumed therefrom that a Turanian or Seythian race became settled in the Southern portions of India after an invasion or invasions, by a more southern route than the Aryans”—দ্রাবিড়গণ জগতের সভ্যতাভাণ্ডারে যত উপাদান যোগাইয়াছে অনেক সভ্য জাতিই তাহা পারে নাই। ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য একপ্রকার তাহাদের হাতেই ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে তাহারা উত্তাল তরঙ্গান্বলিত সমুদ্রবক্ষ অকুতোভয়ে অতিক্রমকরতঃ প্রাচ্য এবং পশ্চাতের সুদূর দেশসমূহ বাণিজ্যের যোগস্বত্রে ভাবের আদানপ্রদানের মধ্য দিয়া বিশাল বিশ্বের বিভিন্ন মানবশাখার উন্নতির যেমন সহায়ক হইয়াছিল তেমননি নিজেদেরও সামাজিক জীবনে এমন একটা গৌরবময় অঙ্কের অভিনয় করিয়াছিল বাহা অধুনা নব নব বিশ্বের জগত প্রাবল্য করিতেছে। দ্রাবিড় সভ্যতা-সমূহ অক্ষর কীর্ত্তিতত্ত্ব সমূহ আজও দাক্ষিণাত্যে বিজয় গহনে পার্শ্বত্যাগ কাহারে দণ্ডায়মান থাকিয়া দ্রাবিড় সভ্যতার গৌরবময়ী কাহিনী জগতে উজ্জ্বলিত করিতেছে। দ্রাবিড় সভ্যতা একসময়ে আৰ্য্য সভ্যতার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। দ্রাবিড় বংশসমূহ রাবণ আৰ্য্য অবোধ্যারাজ হইতে সভ্যতা হিসাবে কোন অংশে হীন ছিলেন না। তাহারই মৃত্যু সময় সুসভ্য রামচন্দ্র তাহার পার্শ্বে বসিয়া রাজনীতির পাঠ নিয়াছিলেন।

ধরিজীর সর্বত্রই আৰ্য্যগণ অনাৰ্য্যগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের দেশসমূহ অধিকার করিয়াছেন। এই সমস্ত অনাৰ্য্য শৌণ্ডীর্ঘ্য বা পরাক্রমে তথাকথিত আৰ্য্যসম্রাট্য হইতে কোন অংশে খাটো ছিল

বদ্বিয়া বোধ হয় না। বরং তাহাদের স্বাধীনতার স্মৃতি, তাহাদের স্বসমাজের প্রতি স্বাভাবিক প্রেম, তাহাদের চরিত্র এমন ভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছে যে তাহারা আৰ্য্যগণাবন দ্বারা যুগে যুগে বিজিত, নিৰ্জিত লাহিত হইলেও, প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই সরলতা সেই স্বজাতি প্রেম তুলিয়া এখনও আৰ্য্য সমাজে সম্পূর্ণ রূপে মিশিয়া বাইতে পারে নাই। বিশ্বব্যাপী এই যে বিরাট অনাৰ্য্যজনসমূহ, তাহারা সহস্র বৎসরেও আৰ্য্যগণের উন্নত সভ্যতানুমোদিত উৎকৃষ্টতর যুদ্ধপ্রণালীর সম্মুখে নতশির হয় নাই। প্রতিপদে তাহারা আৰ্য্যগণকে বাধা দিয়াছে—উভয়পক্ষে বহু রক্তপাত হইয়াছে। অনেকবার তাহারা পরাজিত হইয়াছে—আবার বহুবার আৰ্য্যবিক্রম তাহাদের শৌৰ্য্যের নিকট নতশির হইতে বাধ্য হইয়াছে। অতি প্রাচীন যুগে রোমের সাম্রাজ্যগর্ভ এক সময়ে বর্ক্সরগণের পদতলে নিম্নেপিত হইয়াছিল এবং বহুবর্ষ পর্যন্ত রোমের আৰ্য্য সভ্যতা অনাৰ্য্য সভ্যতার পদদণ্ডে করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারা এমন ভাবে পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, তাহাদের মধ্যে কোনপ্রকার সামাজিক শৃঙ্খলা ছিলনা বলিলে সত্যের অপমান হয়। আৰ্য্য শিক্ষাসভ্যতার নিকট অনাৰ্য্য শিক্ষা সভ্যতা ও ধর্ম বিশ্বাস নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও একথা অতি খাঁটা যে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় আইনকানুন ছিল। এখনও ভারতের কোল, ভীল সাওতাল, গাডো, খাসিয়া প্রভৃতি অসভ্যজাতির মধ্যে কিয়দংশে সামাজিক শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও অসভ্যগণ সর্বদাই কতকগুলি নিয়মের বশবর্তী হইয়া হইয়া একজন প্রধানের অধীনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। আৰ্য্যগণের চক্ষে এই সমস্ত আইন কানুন যতই উপহাস্যান্দ হউক না কেন, ঐ কথা অতি খাঁটা যে বিংশ শতাব্দীর আৰ্য্য সভ্যতা গৌরবের বোর কোলাহলের মধ্যেও এই সমস্ত প্রাচীন জাতি তাহাদের প্রাচীন আইনকানুনের কিছু মাত্র পরিবর্তন

করে নাই, বর্তমান শিক্ষা সভ্যতার ইন্দ্রজালে তাহাদের বস্ত্রশাণ আকৃষ্ট হয় নাই, বর্তমান সভ্যতার গোরবময় দীপ্তিতে তাহাদের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়া তাহারা মরীচিকার পশ্চাতে উদ্ভাস্ত হইয়া ছুটে নাই।

মানব-সভ্যতার আদিযুগে কোনপ্রকার সমাজ-বন্ধন ছিল না। মানবসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে মানব যথেষ্টভাবে বিচরণ করিত। জীপুরুষের সম্মিলন শুধু ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতেই আবদ্ধ ছিল। একই স্ত্রী বহুপুরুষের পত্নীরূপে ব্যবহৃত হইত। ইচ্ছামত যৌনসম্মিলন, ইচ্ছামত আহার বিহারই ছিল সেই যুগের মানুষের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য।

পুরাণানুগারে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে মানসী সৃষ্টি আরম্ভ করেন; কিন্তু বহুকালগত হইলেও মানসী প্রজাবৃদ্ধি হয় না দেখিয়া প্রজাপতি মৈথুনধর্ম্মে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষী হইলেন। তথা উক্তক প্রকৃপুরাণে—

“যদাশ্চ মানসী বিপ্রা ন ব্যবধতি বৈ প্রজা।

তদা সন্ধিস্তা ধর্ম্মাত্মা প্রজাহেতোঃ প্রজাপতিঃ

স মৈথুনেন ধর্ম্মেন সিস্কুবিবিধাঃ প্রজাঃ ॥”

৩য় অধ্যায়—

তখন এই মৈথুনধর্ম্মটা কোনপ্রকার নিয়মানুবর্ত্তিতায় আবদ্ধ ছিল না। আশুসুখই ছিল সেই যুগে প্রত্যেক প্রাণীর উদ্দেশ্য। মৈথুনধর্ম্মে প্রজাবৃদ্ধি স্ফটিকরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত কোনপ্রকার সামাজিক বন্ধন না থাকিতে সংসারে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হইল। সেই অবস্থায় সম্ভব মায়ের নামে পরিচিত হইত। অবাধ যৌনসম্মিলনের বিষয় ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। তখন এই সমস্ত অত্যাচারের বিষয় প্রতিক্রিয়া হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কতকগুলি নিয়ম ধীরে ধীরে ধীরে প্রচলিত হইল, মৈথুন ধর্ম্মটাকে নিয়মে আবদ্ধ করা

হইল, ইচ্ছামত যৌনসংসর্গকে নিরোধ করা হইল। তখনই প্রকৃতপক্ষে সমাজের সৃষ্টি; কিন্তু সমাজ ছিল তখন সমাজ্যাত শিশু।

নিয়মানুবর্ত্তিতায় আবদ্ধ যৌনসম্মিলন হইতে বিভিন্ন বংশধারায় সৃষ্টি হইল। তখন সেই আদি উচ্ছৃঙ্খলতার যুগ ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল। অল্পকালমধ্যেই প্রত্যেক বংশ নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে শিখিল। এইভাবে এক একটা বংশ ধীরে ধীরে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বৃদ্ধিত হইতে লাগিল। তখনও কিন্তু মানবসমাজ আত্মপর ভেদাভেদে আবদ্ধ ছিল। তাই একবংশ অশ্রু পার্শ্ববর্ত্তী বংশের সঙ্গে সর্বদাই শত্রুতায় লিপ্ত থাকিত; এই শত্রুতা হইতে যুদ্ধাদি পর্য্যন্ত হইত। পুরাণে দেখিতে পাই বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র-বংশীয়গণের মধ্যে ঘোরতর শত্রুতা বহুকাল অধ্যস্ত সমভাবে চলিয়াছিল। সেই রেখারেখি হিংসারেষের যুগে এক বংশ অপরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য স্ববংশীয় একজনকে প্রধান করিয়া তাহার অধীনে সর্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত। এইভাবে সর্বদা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকিতে তৎকালীন সমাজে ক্ষাত্রশক্তির বিকাশ স্ফটিকরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

এইরূপে এক একটা গোত্র বা বংশ যখন নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া উঠে তখন কতকগুলি গোত্র বা বংশসমষ্টি একাত্রত হইয়া গ্রামের সৃষ্টি করে। যখন এক একটা গ্রাম কোন বিশেষ নিয়মানুবর্ত্তিতায় স্ফটিকরূপে কার্য্য নির্বাহ করিতে শিখিল, তখন কতকগুলি গ্রামসমষ্টি ‘বিশ্’ আখ্যায় অভিহিত হইত। এই বিশের উপরে যে কর্ত্ত্ব করিত, ঋষেদে তাহাকে বিশপতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বিশ সমষ্টিকে ‘জন’ বলা হইত এবং জনের উপরে যিনি প্রাধাত্য করিতেন, ‘তিনি’ ‘রাজন্’ আখ্যায় অভিহিত হইতেন। পূর্বে ঋষ্যাগণ একজনকে বিশপতি নিযুক্ত করিয়া তাহার অধীনে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন। অভিযান সময়ে রাজত্বগণ একজন পরাক্রমশালী মহাবীরকে বিশপতি নিযুক্ত করিতেন। এই প্রধানকে জাখ্যা

ভাষায় বিশ্ণুপতি, বেন্দ পারসীক বেশপৈতে, লিখোনীও উইকপতি, এবং কুষ ভাষায় বিষ্ণুপতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বিশ্ণুপতি শব্দটির বিভিন্ন ভাষায় উচ্চারণের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় যে ইহারা এক আৰ্য্যবংশসমূহ।

সভ্য আৰ্য্যগণ যখন জগতের বিভিন্ন প্রদেশে ভীমবেগে রাজ্যবিস্তার করিতেছিলেন, তখন অনাৰ্য্যগণ প্রাণপণে তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিল; কিন্তু আৰ্য্যগণের উন্নত সভ্যতার নিকট, অশুশ্রুততার নিকট অনাৰ্য্যগণ প্রতিপদে পরাজিত হইয়া সরিয়া পড়িতে লাগিল। আৰ্য্যগণ ভারতাক্রমণ করেন নানাবিধ উন্নত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। তাঁহারা শিরে শিরস্ত্রাণ, শরীরে বর্ম ধারণকরতঃ রথে আরোহণপূর্বক যুদ্ধ করিতেন। পৃষ্ঠদেশে তাঁহারা শরপূর্ণ তীর এবং হস্তে খড়্গ ধারণ করিতেন। ভারতাক্রমণের সময় বীরেন্দ্রকেশরী সূদাস ছিলেন আৰ্য্যগণের বিশ্ণুপতি। সূদাস ইরানদেশের দেবদাস রাজার পুত্র এবং দেববান্ রাজার পৌত্র। সভ্যতামোদিত উন্নততর অস্ত্রশস্ত্রে সুশোভিত অশুশ্রুত যোদ্ধগণ সমভিব্যাহারে বীরপুঙ্গব সূদাস অদীনপরাক্রমে এবং অলোকসামান্য বীরত্বে দুরারোহ হিমালয়ের পার্বত্য অনাৰ্য্যগণকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া শেতরাবরী, শর্শাবতী, বিয়সী, কুভা, অসিন্ধী, শতদ্রু প্রভৃতি নদী অতিক্রম করতঃ পঞ্চনদপ্রান্তে আৰ্য্যের বিজয়বার্তা কণ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন। বহু যুদ্ধের পর সূদাস ধীরে ধীরে পঞ্চনদ জয় করেন। সূদাসের ভারতজয়ের ইতিহাস ঋগ্বেদ বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন যুদ্ধে ৩০ হইতে ৫০ হাজার কৃষ্ণকায় অনাৰ্য্য হত হইয়াছে। সূদাসের সময়ে ভারতের নানাপ্রদেশে আৰ্য্য সামন্তরাজগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সূদাসের সাম্রাজ্য মগধদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে। আৰ্য্যপ্ৰাবনের সময় ভারতীয় অনাৰ্য্য সম্ভ্রদায় বনে জঙ্গলে পশুর মত জীবন যাপন

করিত তাহা নহে; পশু তাহারাও ক্রিষ্ণ পরিমানে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছিল। ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডল, ৮৮মঃ উল্লেখ আছে যে—“শত শত হর্ষেস্ত পাষাণনির্মিত পুরীর অধীশ্বর দাসরাজ কুলিতরের পুত্র শাশ্বর সূদাস কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।” আৰ্য্যগণ ভারতজয়ের পর ভারতের আদিম অধিবাসিগণকে দাস বলিয়া অভিহিত করিতেন। শত শত পাষাণনির্মিত পুরীর যিনি অধীশ্বর তাহাকে নিতান্ত অসভ্য বর্বর বলিলে ঠিক হয় না। তবে আৰ্য্যসম্ভ্রদায় সভ্যতাহিসাবে অনাৰ্য্যগণ হইতে অনেকটা উন্নত ছিলেন সন্দেহ নাই এবং তাহাদের সামাজিক জীবন তাহাদিগকে আরও উন্নত করিয়াছিল তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। একটা বিরাট সাম্রাজ্য শাসনের ক্ষমতা হয় তো আৰ্য্যবর্ষের আদিম অধিবাসিগণের ছিল না। কিন্তু আৰ্য্য সূদাসের সেই ক্ষমতা ছিল। অনাৰ্য্যগণের যদি সে ক্ষমতা, ততটা একতাবন্ধন, ততটা সামাজিক সংগঠন থাকিত, তাহা হইলে আৰ্য্যগণ তাহাদের উন্নততর সভ্যতা সত্ত্বেও এত সহজে ভারতে প্রবেশ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

ধীরে ধীরে, দিনের পর দিনে আৰ্য্যগণ অনাৰ্য্যগণকে পরাজিত, বিপর্য্যস্ত করিয়া দেশের পর দেশ হস্তগত করিতে লাগিলেন; কিন্তু শত শত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও অনাৰ্য্যগণ বংশশোণিতের বিনিময়ে আৰ্য্যসম্ভ্রদায়কে সর্বদা সম্মুখ রাখিয়াছিল। আৰ্য্যগণ নির্বিবাদে ধর্ম্যকর্ম ও যজ্ঞাদি করিতে পারিতেন না। যজ্ঞাদির সময় তাহাদিগকে সর্বদা যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হইত। অনাৰ্য্যগণের এই পুনঃ পুনঃ আক্রমণ এবং উৎপীড়নের ইচ্ছা আৰ্য্যসম্ভ্রদায়কে সূদৃঢ় একতাবন্ধনে বদ্ধ করিল। এই সময় সমস্ত অবস্থাবিপৰ্য্যয়ে আৰ্য্যসমাজ নূনতভাবে গড়িয়া উঠিল। জাতিভেদের প্রথম সূত্রপাত হয় ভারতে আৰ্য্যাবস্থানের পূর্বে হইতেই। প্রাচীন পারসীকগণের মধ্যে অথর্কান অর্থে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, ক্রত অর্থে যুদ্ধশীল রাজ

এবং বিশ্ অর্থে সাধারণ প্রজা বুঝাইত। অনেকের মতে আৰ্য্যগণ পারসীকগণের সহিত একত্রাবস্থানের সময় হইতেই জাতিভেদের সৃষ্টি হয়। পূর্বে প্রত্যেক যুদ্ধেই মন্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া ইন্দ্রকে আহ্বান করতঃ তাঁহার দ্বারা জয়দান করিতেন। সময় সময় তাহারা যুদ্ধাদিও করিতেন। ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রবিদ, জ্যোতির্বিদ, তপস্বী ও বীর ছিলেন। বহুকণল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ সংগ্রামশীল বীর ছিলেন।

পারসীকগণের সহিত একত্রাবস্থানের কালে আৰ্য্যগণের ধর্ম বিশ্বাস একই ছিল; কিন্তু কালক্রমে ধর্মবিশ্বাসে মতবৈধ উপস্থিত হইলে আৰ্য্য সম্প্রদায় জাতি পারসীকগণকে পরিত্যাগ করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন এবং অসিবলে রাজ্য স্থাপন করিলেন। ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আৰ্য্য সমাজও নতুন প্রাণের সন্ধান পাওয়া যাইতে লাগিল। পারসীকগণের মত আৰ্য্যগণও পুরাকালে অগ্নিহোত্র করিতেন—ইহা তাদের নিত্য কর্তব্য ছিল। কলির প্রারম্ভে আদিত্য পুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা অগ্নিহোত্র নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। যথা—

“অগ্নিহোত্রহবন্তাশ্চ লেহোলীঢ়া পরিগ্রহঃ

এতানি লোক গুপ্তার্থাং কলেরাদৌ মহাস্বভিঃ

নিবর্ত্তিতানি কশ্মানি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ ॥”

আৰ্য্যগণ শীতপ্রধান দেশে ছিলেন। শীতের প্রাণাস্ত-কর কুহেলিকার মধ্যে অগ্নি জীবনদায়ক সন্দেশ নাই। শীতপ্রধান দেশে স্বভাবতঃ উত্তাপ বৃদ্ধির জন্ত প্রত্যেক গৃহেই অগ্নি রক্ষা করা হয়। সেই সময়ই সম্ভবতঃ অগ্নিকে শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষাকর্তা বলিয়া দেবতার সম্মানে উক্ত অগ্নিহোত্রের প্রচলন হইয়া থাকিবে। তারপরে আৰ্য্যগণ ভারতে অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে গৃহে অগ্নি রক্ষা করার বিশেষ প্রয়োজন নাই দেখিয়া অগ্নিহোত্র ত্যাগ করিয়াছেন। তবে আৰ্য্যগণ ভারত জয়ের পর এই বিশাল দেশের প্রকাণ্ড মহীকূহ সমাচ্ছাদিত বনভূমি দর্শনে বুহৎভাবে অগ্নিহোত্র করিবার জন্ত উৎসুক হন;

অগ্নিহোত্রের ক্ষুদ্র অগ্নি ক্রীড়া হইতেই বিরাট ভাবে-যজ্ঞের প্রবর্তন করেন। বিরাটভাবে যজ্ঞের জন্ত যেমন বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পুরোহিত দরকার হইত, তেমনি তাঁহাদের রক্ষার জন্ত অঙ্গশস্ত্রে সুসজ্জিত বহুসংখ্যক যোদ্ধাপুরুষের দরকার হইত। নচেৎ যজ্ঞার্থী ব্রাহ্মণগণকে যদি আবার যজ্ঞস্থল রক্ষার জন্ত সজ্জিত থাকিতে হইত তাহা হইলে যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ তৎকালে সামাজিক কল্যাণসাধনে আরক্ত হইতেন। এই সময় হইতেই ধীরে ধীরে বর্ণাশ্রম ধর্ম বিভাগে পরিণত হইতে আরম্ভ করিল।

অনেকে বলেন বৈদিক সময়ে বর্ণভেদ ছিল না। বেদে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের উল্লেখ নাই। একথা ঠিক নহে। ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। ঋগ্বেদের বহুস্থলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ বলিতেছেন:—

“ব্রাহ্মণাসঃ পিতরঃ সোমাসঃ।

শিবো নো দ্যাবা পৃথিবী অনেহসা ॥” ৬ম, ৭৫ হু, ১০ ঋক “হে ব্রাহ্মণগণ, পিতৃগণ, সোম্যগণ তোমরা এবং পাপরহিতা দ্যাবা পৃথিবী আমাদের মঙ্গল কর হও।” সপ্তম মন্তল, ১০৩ হু, ১ ঋক, বলিতেছেন—

সংবৎসরং শশ্বানা ব্রাহ্মণাঃ রতচারিণঃ।

বাচং পর্জন্তুজিহ্বিতাং প্রমংস্পকা অবাদিভূঃ ॥”

“সংবৎসর ব্রতচারী ব্রাহ্মণদিগের তায় মণ্ডুকগণ পর্জন্তের প্রীতিকর বাক্ উচ্চারণ করেন।” পুনরায় ৪ম, ৪২ হু, ১ম ঋক বলিতেছেন—

“মম হিতা রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়শ্চ।

বিশ্বা যো বিশ্বো অমৃত্য যথানঃ ॥”

“আমি ক্ষত্রিয় ও সমস্ত বিশ্বের অধিপতি। আমার রাজ্য বিবিধ। সমস্ত অমরগণ আমার।” এই সমস্ত ঋক্ হইতে পাষ্ট্রেই প্রতীয়মান হয় যে বৈদিক সময়ও বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচলিত ছিল। আৰ্য্যদের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য এবং কৃষিকর্ম যাহারা করিতেন তাহারা বৈশ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।



ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজ আখ্যায় অভিহিত। হইলেন। উপনয়ন, ও অঙ্গিরাস প্রবর্তিত অগ্নিহোত্রাদি ঠাঁহাদের সাধারণ সংস্কার। সৃষ্টির প্রারম্ভে বর্ণবভাগ বা জাতিভেদ অবশ্য ছিল না। তখন সকলেই সমান পদবীতে সমাজে বিচরণ করিতেন। পরে কৰ্ম্মানুসারে বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাভারত তাহাই বলেন—

“ন বিশেষোহস্তিবর্ণানাং সৰ্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।

ব্রহ্মণা পূৰ্ব্বসৃষ্টংহি কৰ্ম্মভি বর্ণতাং গতম্ ॥

কামভোগপ্রিয়স্তীক্কাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।

তাক্ত স্বধৰ্ম্মাঃ রক্তাঙ্গান্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥

গোভো বৃত্তিং সমাহার পীতা কৃষ্যুপজীবিনঃ।

স্বধৰ্ম্মান্নানুষ্ঠিত্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্বতাং গতাঃ ॥

হিংসানৃত্যপ্রিয়ালুকা সৰ্ব্বকৰ্ম্মোপজীবিনঃ।

কৃষাঃ শৌচপরিভ্রষ্টান্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥

ইতীত্যেতঃ কৰ্ম্মভিযাস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ ॥”

শান্তিপর্ক ১৮৮ অধ্যায় ॥

কৰ্ম্মানুসারে অতি প্রাচীন যুগেই এই বর্ণবিভাগ সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। কামভোগপ্রিয়, তীক্ষ্ণ, ক্রোধী এবং সাহসিক কার্যে তৎপর, রক্তাঙ্গ দ্বিজগণ ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ, কৃষিকৰ্ম্মে নিরত দ্বিজগণ বৈশ্য এবং হিংসা, অসত্যপ্রিয় লুক, কৃষ্ণকায়, শৌচপরিত্রস্ত অনাচারী দ্বিজগণ শূদ্র আখ্যায় অভিহিত হইত। সৰ্ব্বোপরি শুভ্র-সত্যগুণসম্পন্ন যাহারা, ঠাঁহার ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। আৰ্য্যগণের মধ্যে প্রথমতঃ শূদ্র বলিয়া কোন বর্ণভেদ ছিল না। ঠাঁহাদের ভারতে অবস্থানের ফলে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আবহাওয়ার গুণে যাহারা কৃষ্ণকায় অনাৰ্য্যদিগের সহিত সংমিশ্রণে অশুচিকার্য্যে রত, লোভী এবং অসত্যবাদী হইয়া পড়িলেন, তাহারাই শূদ্র নামে খ্যাত হইয়াছে এবং বিজিত অনাৰ্য্যদিগের মধ্যে যাহারা আৰ্য্যদের অধীনতা স্বীকার করিয়া ঠাঁহাদের সংগ্রবে রহিয়া গেল, তাহার আৰ্য্যসভ্যতার মহিমময় দীপ্তির সম্মুখে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়া আৰ্য্যের ধৰ্ম্মবিধানে

বিশ্বাদী হইয়া শূদ্র নামে সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। আর যাহারা স্বাধীনতা বিসর্জনে দাসত্ববরণ স্থগ্য মনে করিয়া দূরে সরিয়া রহিল ভারতের নানাভানে তাহার ভীল, কোল, সাঁওতাল, নাগা গাড়ে, খাসিয়া, আবার প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত হইয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই শিশু সভ্যতা আকৃড়াইয়া আজও জগতে জীবিত আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—“বর্ণাশ্রম ভাষ্যতীয় সভ্যতার তাঁত।” বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্মই যে ভারতীয় সভ্যতার একমাত্র সগায়ক তাহা অস্বীকার করা যায় না। বর্ণাশ্রমানুযায়ী কৰ্ম্মবিভাগ প্রচলিত না থাকিলে যে প্রাচীন সভ্যতা গৌরবে গৌরবান্বিত আমরা জগতের বক্ষে সভা বলিয়া গৰ্ব্ব করি, তাহার উপায় ছিল না। প্রাচীন ভারতে দেখিতেছি সত্য ত্যাগের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি জটাতীরধারী ব্রাহ্মণ জগতের সমস্ত ভোগ-বিলাস, সুখসম্পদ পদদলিত করিয়া বিধের সমগ্র দারিদ্র্য সাদরে মাথায় তুলিয়া নিয়া নিৰ্জ্জনে লোক চকুর অন্তরালে বিশ্ববাসির হিতের জন্ত প্রাণপাত করিয়াছেন। আমাদের মানসনেত্রের দ্বারে ভাসিয়া বেড়ায় ব্রাহ্মণ দহিচীর মহিমোজ্জ্বল মূর্ত্তি, যিনি “জগদ্ধিতার” অগ্নান বদনে, অকুতোভয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে আমরা পাই ব্যাস, বাল্মীকী, গোতম; কপিল, কণাদ, যাজ্ঞবল্ক্য; মহু, পরাশর, বশিষ্ঠ নিবিড় অটবী বিভাগে আজন্ম সাধনা-সলিল-সিঞ্চে যে সমস্ত অতুল রত্নাবলী সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সমস্ত আজিও দেশে বিদেশে

অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া হিন্দুধৰ্ম্মের বিজয়চন্দ্ৰভি কঙ্ককণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে। নহিলে আজ আমাদের কি আছে? ভারতের ক্ষাত্রশক্তি নীকীপিত, ক্ষত্রিয়ের বাহুবলের গৰ্ব্ব ধূলায় লুপ্তিত, মৃত। বৈশ্যের বাণিজ্যপিপাসা আজ অসম্ভব অতীত স্বপ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভারতের গৌরবের দিনের চিহ্ন আজ আর কি আছে?

বর্ণাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদ-বেদান্ত-প্রসবিনী,

ভক্তিস্বৈর-জন্মস্থানরূপিনী, পুণ্যপুঞ্জময়ী ভারতীয় সভ্যতা। একদিন স্বীয় বিভিন্ন দিকগুলি আলোকিত করিয়া জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল। বর্তমান ভারত তো প্রাচীন ভারতের আত্মবিশ্বস্ত কঙ্কালমাত্র। অতি প্রাচীন যুগে ভারতীয় আদর্শে সমগ্র জগতের সমাজ সংগঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতার সম্মোহিনী মন্ত্র নিয়া যুগে যুগে বহু জনপ্রাচীন পৃথিবীর অন্তান্ত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারে তদ্বৈশিষ্ট্যগণকে আলোকের সন্ধান দিয়াছিল। মিশরের সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার ছায়া মাত্র। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্ধকারে ভারতীয়-গণই মিশরে বাইরা উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা বিস্তার করেন। ঐতিহাসিক Pocock সাহেব তাঁহার “Indian in Greece” নামক পুস্তকে বলেন—“An Egyptian is made to remark that he heard from his father that the Indians were wisest of men and that the Egyptians, a colony of the Indians, preserved the wisdom and usages of their fathers and acknowledged their ancient origin.—মিশরের পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ক্রগন্স্ বে বলেন—“অরগাভীত সময়ে একদল ভারতবাসী নীলনদের উপকূলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।”

মিশরীয় সমাজে জাতিভেদের মধ্যে আমরা ভারতীয় প্রভাব দেখিতে পাই। ঐতিহাসিক টেলর বলেন—“মিশর দেশেও ভারতবর্ষের মত জাতিভেদ ছিল। পুরোহিত এবং যোদ্ধাগণ সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানভাজন ছিলেন। তাহাদের নীচে কৃষক, বণিক, নাবিক, শিল্পী ও সর্বনিম্নে মেঘপালকগণ স্থান পাইত। পুরোহিতগণের মধ্যেই আবার বিচারক, ভবিষ্যদ্বক্তা ও চিকিৎসক ছিল। রাজা ও রাজপরিবার যোদ্ধাজাতির অন্তর্গত ছিল। সমুদ্র ব্যবসায় বাণিজ্য বংশাধিকারিক ছিল। আত্মার পুনর্জন্মবাদ মিশরে প্রচলিত ছিল; ইহা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতেই আনীত হইয়াছিল। মিশরবাসীরা গাভীর পূজা করিত,

তাহারা পৌত্তলিক ছিল, তাহাদের দেবমন্দির ছিল।” প্রাচীন মিশরের হুইট নারী দেবীমূর্তি ভারতীয় কালী-মূর্তিরই প্রতিবিম্ব মাত্র। মিশরের পুরোহিত সম্প্রদায় ভারতীয় প্রথাতে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন এবং অধুনাও আবিসিনিয়াবাসিগণ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সময় প্রাচীন সংস্কারকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যথা—Another survival of the Hindu influence seems to be mateb or blue silk neck cord, the badge of baptism, in modern Abyssinian christianity, which suggests, more than one Arab custom, the Zenner or sacred cord of the Brahmin priest”—Ibid. P. 139.—অতিপ্রাচীন যুগে ভারতীয় প্রভাব যুরোপের বিভিন্ন প্রদেশে, এমন কি বৃটেনেও সামাজিক জীবনের উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক Godfrey Higgins বলেন—“ভারতবাসী ব্রিটনে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং বৃটনের Druidsগণ হিন্দু পুরোহিত সম্প্রদায়।”

ভারত এবং জগতের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অতি পুরাকাল হইতে যে বনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল তাহার আরও বহু প্রমাণ আছে এবং আরও দিন দিন আবিস্কৃত হইয়া বিশ্ববাসির নিকট এক অদ্বীত রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতেছে। ভারত এবং অন্তান্ত দেশের মধ্যে আচার ব্যবহার, ভাষা এবং ধর্ম বিশ্বাসের সামঞ্জস্য দেখিয়া যনে হয় যে একই সামাজিক প্রভাব বিভিন্ন সমাজের গঠনে সফলতা করিয়াছিল। এই যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের যোগসূত্র, ইহা বাণিজ্য এবং উপনিবেশের সাহায্যে সেই যুগেই সফল হইয়াছিল। প্রাচ্যের সামাজিক প্রভাবে পাশ্চাত্য সমাজ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কালেই এবং ভারতীয় সমাজের প্রভাব আমরা মিশরে, গ্রীসে, রোমে এবং ইয়ুরোপের অন্তান্ত প্রদেশের সমাজ এবং ধর্মের উপর দেখিতে পাই। তাহার আলোচনা বারম্বার করিবার ইচ্ছা রহিল।

## ‘যদি এই মালাখানি পরাতেগলে’

শ্রীহাসিরাশি দেবী

তিন জন অর্থাৎ প্রভাতের মাষ্টার অসীম, প্রভাত ও তাহার তিন বৎসরের বড় দিদিটি লহরীতে যখন বিজয়ার দিন সিঁড়ির মধ্যে সান্ধ্য হইয়া গেল, তখন দিদিটি লজ্জার লাল হইয়া গিয়া ভাবিল,—‘প্রভাতটার কি আর আশ্রয় বলবারও অবসর হয়নি’, এবং মাষ্টার মুখ নত করিয়া ভাবিল,—‘জল আপোনাকে’,—এবং শ্রীমান প্রভাত চন্দ্র উভয়ের নত মুখ দেখিয়া ভাবিল “বেশ মজা।” সুতরাং সে উভয় হস্ত একত্রিত করিয়া একটা শব্দ করিয়া বলিয়া উঠিল—“বাঃ! বাঃ!”

লহরী একবার জ্বর কটাক্ষে এই কম আক্কেল ভ্রাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষত পদে সে স্থান ত্যাগ করিল এবং তরুণ মাষ্টারটি চকিতে মুখ তুলিয়া একবার সেই গমনরতা তরুণী মূর্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, চকিতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া ছাত্রটির প্রতি চমকিয়া তিরস্কারের স্বরে বলিল—

‘দেখ, প্রভাত, যা বলবে বা করবে তা একটু ভেবে করো।’ প্রভাত মাষ্টারের তিরস্কারে এতটুকু হইয়া গিয়া বলিল,—“কেন মাষ্টার মশাই, দেখুন বাংলায় যে আমার দিদি খুব সুন্দর দেখতে; বলুন তো, সত্যি খুব সুন্দর দেখতে না; হ্যাঁ মাষ্টার মশাই।”

মাষ্টার মশাই কি বলিয়া যে এই অব্যবহৃত ছাত্রটিকে বুঝাইবে ভাবিয়া পাইল না। সুতরাং সে নীরবে সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল। মাষ্টার মশাইয়ের তরফ হইতে আর কোনও জবাব আসিল না দেখিয়া ছাত্রটি মনঃক্লান্ত হইয়া অসীমের হাত ধরিয়া নীরবে উপরে উঠিতে লাগিল।

জননীর ঘরের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রভাত ডাকিল “মা, মাষ্টার মশাই তোমার বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছেন বাইরে এস।”

জননী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তাহাকে প্রণাম করিলে তিনি আলীকর্ষিত করিলেন—“রাজেশ্বর হ’য়ে স্বখে বেঁচে থাক বাবা!” বারান্দায় এক খানা আসন পাতিয়া দিয়া বলিলেন—‘বস বাবা।’ অসীম বসিল। জননী কক্ষ মধ্যস্থ কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“জল খাবারের থালাটা আর এক গ্লাস জল নিয়ে এস তো, লহরী! কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া জল খাবার আনিতে বলা হইল সে আসিল না, উচ্চৈঃস্বরে বলিল—‘আমার পায়ের আঙ্গুলটা কাঁচে লেগে কেটে গেছে মা, ঊঠতে পাচ্ছি না বড় রক্ত পড়ছে। তুমি নিয়ে যাও।’

“ভালো বিপদ, কোথায় কেটে এলি বাছা” বলিতে বসিতে জননী উঠিয়া গেলেন এবং একটু পরেই এক হস্তে খাবার ভরা রেকাবী ও অপর হস্তে জলের গ্লাস লইয়া পুনরায় প্রবেশ করিয়া, অসীমের সম্মুখে রাখিয়া স্নেহময় স্বরে বলিলেন,—“আজ বছরের ভাল দিন বাবা, মায়ের কাছে এসেছো তোমার আমি শুধু মুখে তো যেতে দেব না, বাবা।

অসীম কথা কহিতে পারিত না। অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির সে ছিল। তাহার হইয়া প্রভাত বলিল, “মাষ্টার মশায় তো বেশী খেতে পারেন না মা।”

মাতা বলিলেন, “যা পারো, তাই খাও বাবা। জ্বরগতি ক’রে খেলে আবার পেটে হজম তো না হ’তেও পারে।” কক্ষ মধ্য হইতে চাপা হাসির একটা অস্ফুট শব্দ ভাসিয়া আসিয়া অসীমের সুগোর মুখে মুহূর্তের জন্য আবারের ছাপ গরিয়া দিল।

ইহার পরে জননীর আদেশে অসীমকে জোর অহুরোধ করিয়া প্রভাত প্রায়ই উপরে লইয়া আসিত এবং প্রভাতের জননীর, এবং আর কাহারও হাতের তৈয়ারী খাবারের রেকাবী ও কয়েকটা সাজা পান আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইত এবং তাহাকে

তাহা বিনা আশঙ্কিত উদরসাৎ করিতেও হইত। ইদানীং আর সজ্জা করিত না। সেদিন প্রভাতের জননী প্রভাত ও তাহার দিদিকে রাখিয়া লালবাজারে বোনের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলেন। মাষ্টার এখনও জানিত না।

অল্প দিনের মত সেই দিনও প্রভাত অসীমকে টানিতে টানিতে উপরে উঠাইতে ছিল। বারান্দায় বসিয়া রাখিয়া প্রভাত কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, “ও দিদি খাবার দাও, মাষ্টার মশাইকে নিয়ে এসেছি।” কিছুক্ষণ পরে সে একহাতে জলের মাশ ও অল্প হাতে পানের ডিবা এবং তাহারই পশ্চাতে লহরী একখানা রেকাবী ভরিয়া খাবার আনিয়া অসীমের সম্মুখে রাখিল।

মুহূর্ত্তে অসীম বলিল, “আমি তো এত খেতে পারবন, লহরী!”

“লহরী” এই নাম অসীমের মুখে উচ্চারিত হইতে শুনিয়া লহরী একবার চোখ তুলিয়া অসীমের মুখের প্রতি চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল, বলিল, “যা পারেন তাই খান। বেগী খেতেতো আপনাকে অনুৰোধ কর্ছিনা।”

অসীম আর কোনও কথা বলিল না, আহায়ে বসিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে তাহার পায়ে যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহারই একটু মুখে ফেলিয়া দিয়া লহরী উঠিয়া দাঁড়াইল।

যেদিন কথা উঠিল অসীম নাকি সাগর পারে বিভাজন করিতে যাইবে সেই দিন যেমন আশ্চর্য্য হইলেন প্রভাতের জননী তাহার চেয়েও আর একজন আশ্চর্য্য হইয়া, জানালার ফাঁক দিয়া অসীমের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

প্রভাতের জননী বলিলেন—“তবে সত্যিই আমাদের ছোড়া চলে ববা।”

অসীম হাসিয়া বলিল—“আপনাদের ছেড়ে ওই কথাটা বলবেন না মা! সত্যিই আমি অনেক লোকের সঙ্গে মিশেছি, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে যেমন ভাবে মিশেছি এমন ভাবে আমি বোধ হয় আর কোথাও মিশতে পারিনি।

জননী বলিলেন—“আলীকাদ করি বাবা, স্বস্থ শরীরে কাজ শিখে পড়ে দেশের ছেলে দেশে ফিরে এস।” অসীম প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। উপর হইতে নামিবার সময় সে যেন কাহাকে দেখিবার আশার একবার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিল কিন্তু

যাহাকে দেখিবার আশা সে করিয়াছিল তাহার দেখা মিলিল না।

মুদৌর্ষ পাঁচ বৎসর পরে অসীম দেশে ফিরিল। অনেক ঘোঁড়ের পরে প্রভাতের দেখা পাওয়া গেল। সে জানাইল তাহার মাতা তিন বৎসর পূর্বে মারা গিয়াছেন আর দিদি লহরীর সহিত একটি সিভিলিয়ানের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

অসীমের চতুর্দিক যেন একবার কম্পিত হইয়া সে তাড়াতাড়ি আপনাকে সংবত করিয়া লইয়া বলিল—“আমায় একবার লহরী কে দেখাতে পার তাই।” তাহার কণ্ঠস্বরে যেন ছুঁয়ার রক্ততা বাজিয়া উঠিল। একটু ভাবিয়া প্রভাত বলিল “আপ্ন সন্ধ্যার সময় আমি আসব আপনাকে নিয়ে যেতে, ঠিক থাকবেন।

অসীম বলিল—“আচ্ছা।”

একটু কক্ষে অসীমকে বসাইয়া রাখিয়া প্রভাত আসিয়া ডাকিল—“দিদি, ও ঘরে যাও তো একবার টেবিলের পরে আমার ইয়ে খানা ভুলে রেখে এসেছি নিয়ে এস।

লহরী চলিয়া গেল। দ্বারের পর্দা সরাইবার শব্দে অসীম চমকিয়া মুখ তুলিল। তাহার উভয় চক্ষে রক্তবর্ণ ও কপালের শিরাগুলি সব ফুলিয়া উঠিয়াছিল।

সম্মুখে কাল সর্প দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে লহরীও সেইরূপ চমকিত হইয়া উঠিল। ডাকিল “মাষ্টার মশাই।”

শুষ্ক স্বরে অসীম উত্তর দিল,—“কেন লহরী? —”

—“আমার স্নেহের সংসার দেখতে এসেছেন? —”

—“হাঁ। —”

লহরী আর কিছু বলিতে পারিল না। কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানেই চেতনা হারাইয়া লুটাইয়া পড়িল, আর চেয়ারের উপরে হাতের থায় বসিয়া রহিল অসীম। বাহিরে তখন কে গাহিতেছিল,—

সে দিনও তো মধু নিশি,

প্রাণে গিয়েছিল মিশ

মুকুলিত দশ দিশি

কুহুম দলে,—

ছ’টি সোহাগের বাণী

হ’ত যদি কাণাকাণি,

যদি ওই মালাখানি

পরাতে গলে।

এখন কিরাবে তারে—

কিলের ছলে।



পৃথিবীর নানাদেশে কত বাস্তবতার চলিতেছে, কত প্রকার অনীতি চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু মেঝো বিবির চক্ষে ঠেকিল অভাগী ভারত। নিজের দেশের কথাটা তিনি ভাবিয়া দেখেন না, নিজের ঘরের দোষটা দূর করিবার চেষ্টা নাই, চালুনি হইয়া হুঁচের দোষটাই কেবল দেখেন। তাঁহার নিজের দেশে ২৫ বৎসর পূর্বে প্রতি ১৭টা বিবাহে একটা করিয়া বিবাহ বন্ধন-ছেদের মামলা হইত। এখন তাহা সত্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি লাভ করিয়া প্রতি ৭টা একটা করিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত ৫০ বৎসরে ঐ দেশে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৯টা বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা হইয়াছে। আমেরিকায় যে সকল বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করিবার আদালত আছে, উহাদের বিচারকগণ বিচার শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। দোষ কি? সভা দেশ ত! দেবতার বেলা লীলাখেলা!

নারায়ণগঞ্জবাসীর গানের একটা বাতিক আছে। বৎসরের এ সময় এখানে যেন যাত্রা গানের একটা epidemic লাগে। চারিদিকে হৈ হৈ, যুবকগণের তরল স্বরে একটা অপূর্ণ আমোদের উদ্ভেজন। হুগুধের বিষয় অভিাবকগণও এ বিষয়ে উদাসীন। অবশ্য গান মাত্রই অগ্রাহ্য নয় তবে স্থান, কাল ও পাত্রবিশেষে উহার ভাল মন্দ বিবেচিত হয়। ছেলেদের অশ্লীল ব্যবহার, সিগারেটের ধূঁয়ার আসন্ন গরম করিবার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মধ্যে মধ্যে অনাবশ্যক বীভৎস চীৎকার এবং কখন কখন সামান্য বিষয় নিয়া মারামারি প্রভৃতি নিশ্চয়ই সভ্যতা ও শিষ্টাচারের পরিচায়ক নহে। গানের উজ্জ্বলগণও এবিষয়ে একটু বিবেচনা করিলে দেশের বহুঅর্থ অনাবশ্যক ব্যয় হইতে বাঁচিয়া যায়, অর্থাৎ দেশের মেরুদণ্ড এবং ভবিষ্যতের শ্রাণস্বরূপ বালকগণের মাথা খাওয়া হয় না। আমাদের মতে আমোদ যদি করাই অভিমত হয় তবে তাহা অস্ত্র শীলতর ও ভক্ততর

উপায়েও করা যাইতে পারে। আমরা দেশের অস্ত্র কাঁদি, কিন্তু কাজের বেগার চটুবা; কেবল হৈ হৈ করিলেই দেশের কাজ হয় না, তজ্জন কার্যকারণে সকলের সতর্ক দৃষ্টি চাই। রামায়ণ অমৃতের খনি, উহাতে শিক্ষার যথেষ্ট আছে। সেকালের সেই অমৃতময় রামায়ণ গাথা কই? দাশরথির পাঁচালী আর এখন আমাদের কর্ণকুহরে স্খাবর্ষণ করে না। অভিনয়্যর শৌর্যবীর্ঘের অভিনয়ে যুবকের স্বপ্নের বীরত্বের উদ্ভেজন। আগে না, কিন্তু উত্তরার প্রেমের কাহিনী তাহার মর্মে অলঙ্কিতে একটা স্থায়ী উন্মাদনার সৃষ্টি করে। লোক শিক্ষা এখন কল্পনার রাজ্যে বিসর্জিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাধীন্যাসক্তি ও নীর্কাসিত। ছেলেরা অভিাবকের আর আজ্ঞাধীন নহে, তাহার স্বচ্ছন্দ দিগ্ভ্রমণ করিয়া কুৎসিত অভিজ্ঞতাই অর্জন করিয়া থাকে। কোন সংকক্ষে আহ্বান করিলে অতি অল্প যুবকই মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ কুৎসিত আমোদে বা ক্ষণস্থায়ী স্খলন যাত্রাপানাদিতে আমন্ত্রণের প্রয়োজন বোধ করে না। দেশবাসী এখনও সাবধান না হইলে উচ্ছ্রাল সমাজের নিত্য ভাঙনার তিষ্ঠান তার হইবে। ছেলের শিক্ষার ভার অভিাবকের নিজ হাতে না লইলে আর উপার নাই, পাজি পুথি কিনিয়া দিয়া ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই সে মালুম হইবে না। মালুম সজীব পদার্থ, ইহা পুতুল নহে যে কলে ফেলিয়া দিলে আপনাআপনি গড়িয়া উঠিবে। জীবনের অধিকাংশ কাল বাহাতে তাহার বৃথা ক্ষেপণ না করে এবং অসৎ নীতি অবলম্বনপূর্বক নিজের ও দেশের সর্বনাশ করিতে উদ্ভূত না হয় তাহা নিয়ে অভিাবকগণ সতত সতর্ক থাকিবেন। নিজের ছেলে পড়ের তত্ত্বাবধানে নষ্ট হইলে সে দোষ অস্ত্রের নয়, নিজের। নিজের বৈবরিক ব্যাপারে অমজ্জিতাই সর্বনাশের কারণ। অপরের স্বন্ধে দোষ আরোপণ করিয়া সকল সময় নিজকে ঠাটস দায় না।





# বান্ধা

সচিত্র মাসিক পত্র

তৃতীয় বর্ষ ]

চৈত্র—১৩৩৪।

[ সপ্তম সংখ্যা

রক্ত ফাগুয়া

শ্রীহেম সেন।

দখিণ হাওয়া বইত যবে প্রাণে,  
অমৃত হাতে বেজে উঠ'ত বীণ,  
আনন তাদের রেগে উঠ'ত রাগে,  
মুক্তি খেলার গরম রক্ত ফাগে,  
আঁখি তাদের জ্বল'ত রাত্রি দিন।

বন্ধ অসি দুল'ত কটি তটে  
প্রতিহিংসার দারুণ পিপাসায়।  
উঠ'ত সেথা মুক্তি সেনার গান  
গগনভেদী উঠ'ত জয়নিশান,  
মুক্তি কামী জুট'ত সে খেলায় ॥

বাজ'ত ভেরী গভীর গুরুনাদে  
ডাক্ত সবে—এস স্বরা করি,  
আজকে হোরী খেলবো শেষের দিনে,  
প্রতিদ্বন্দী সবাই যাবে চিনে,  
মুক্তি খেলায় শক্ত আর্থনারী।





## নিশীথের আলো।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

( ১২ )

উপযুক্ত চিকিৎসায় সেবা সুস্থ হইয়া উঠিলেন। শরৎ এই কয়দিনেই সেবার সহিত পরিচিত হইয়া গেলেন। বুদ্ধিমতী সেবা বুঝিল শরৎ যথার্থই বড় সরল, যথার্থ হৃদয়বান। অলঙ্কারে শরৎ বউদি কথা ছাড়িয়া দিদি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। সেবা তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। পরস্পরের দূরত্ব ঘুচিয়া গেল।

যাত্রার আয়োজন করিতে করিতে শরৎ বলিলেন—  
“কাল আমরা এতক্ষণে বাংলা দেশে, না দিদি?”

সেবা একটু হাসিয়া বলিল—“তা বটে। অনেকদিন বাংলা দেশ ছেড়ে এসেছি, বাংলার কথা প্রায় ভুলে গেছিলুম। এখন আবার নতুন করে বাংলার কথা মনে পড়ছে।”

শরৎ বলিলেন—“ভুলে গেলে বাংলার কথা?”

সেবা বলিল “তাই কি হয় দাদা? জন্মভূমির কথা কি কেউ ভুলতে পারে? তবে যে বলছি ভুলে গেছিলুম সেটা হচ্ছে—”

সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

শরৎ বলিলেন—“সেটা যা তুমি বলছো স্বাভাবিক, হবারই কথা। দেশে আপনার কেউ না থাকলে সে রকম আন্তরিক টান কিছুতেই হতে পারে না। তোমার আপনার লোক কেই বা দেশে আছে? সংসার যা, তা তোমার এখানে, কাজেই তোমার এইখান নিয়েই ভুলে থাকতে

হয়; সে সময়টার যে তার ছবি মনে জাগে, সে কেবল অতীতকাল মনে করে না কি?

সেবা বলিল—“হাঁ। মনে পড়ে ছোট বেলাটা বাংলা দেশেই আমার কেটে গ্যাছে। সহরের বুকে জন্মাইনি, সহরের বুকে ছোট বেলায় মানুষ হইনি; জন্মিয়েছি, মানুষ হয়েছি একটা পাড়াগায়ে। সেখানকার কথা যখন আমার মনে পড়ে দাদা, আমার বাহুজ্ঞান তখন হারিয়ে ফেলি। এই যে বুকে দিনরাত রাবণের চিতা জ্বলছে, সে কথা মনে করলে এই রাবণের চিতাও যেন নিভে যায়। মনে পড়ে—ছোট বেলায় সঙ্গিনীদের সঙ্গে খেলা, পুকুরের কালো জলে স্নাত্যের দেওয়া, সমস্ত দিন ছোট্টাছুটি করে সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্তদেহে ক্রান্ত মনে বাড়ী ফিরে গিয়ে গল্প শুন্তে শুন্তে ঘুমিয়ে পড়া। সকাল হতে না হতে এই ভাদ্রাখনি মাসে সিউলি ফুল কুড়ানোর কি আমোদ! সেই স্মৃতিটা আজও মনের মধ্যে স্পষ্ট গাঁথা রয়েছে দাদা। আমার বড় বেদনার শাস্তি দেয় সেই ছোটবেলার স্মৃতি। আঃ! মরলে যদি জানে আবার সে দিনটা ফিরে পাই।

গভীর বেদনার স্রব তাহার কণ্ঠে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। ছোটবেলাকার সেই চিন্তাশূন্য দিনগুলোর কথা ভাবিতে ভাবিতে সে বাহুজ্ঞান হারাইয়া ফেলিল।

শরৎ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন—“আমার ওখানে সবই পাবে, দিদিমণি। কাঁচের মত স্বচ্ছ জলপূর্ণ পুকুর পাবে, শিউলি তলা পাবে, অনেক সঙ্গিনীও পাবে—”

বিবাহে সেবা হাসিল—“পাগল দাদা তুমি—সবই তো পলুম, কিন্তু সে দিনটা কি আর পাব?”

শরৎ বলিলেন—“তা পাবে না বটে, কিন্তু আনন্দকে ইচ্ছা করলেই তো ফিরে পেতে পার দিদি?”

সেবা আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল “তা পাবার পথ যে বন্ধ হয়ে গ্যাছে দাদা, আর আনন্দ ভীষনেও পাব না। আনন্দ জন্মের মতই আমার ছেড়ে চলে গ্যাছে। মানুষের ছোটবেলার যে আনন্দ উৎসাহ থাকে, বড় হয়েও যদি তা থাকত, তবে সকলকেই ছোটবেলার দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে হোত না।

এই বার্থ সত্যের বিরুদ্ধে আর কোন কথা বলা চলে না। এমন কেহ নাই যে অতীতের পানে তাকাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলে, যে না বলে আহা! যদি সে দিন ফিরিয়া পাইতাম! মানুষের স্মৃতির সময় পূর্বস্মৃতি প্রায়ই মনে পড়ে না, হৃৎকের আঘাত পাইলে সেই দিনের কথাই মনে হয়। প্রাণের মাঝে যে ব্যথার স্মর বাজিয়া উঠে, তাহার মধ্য হইতে ঝরিয়া পড়ে সেই পুরাতন কথাগুলি। আজ তাই সেবার বৃকে বাজিতেছিল।

কবে সে এসেছিল, কবে যে চলে গেল

জানিতে পারি নাই গো জানিতে পারি নাই,

সে দিন না আসিবে, আর না দেখা দিবে,

কাঁদি যে ভাবি তাই গো, কাঁদি যে ভাবি তাই।

বৈকালের দিকে সব গুছানো শেষ হইয়া গেল।

শরৎ সেবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মিস্ গাঙ্গুলী কি এখানে আছেন, - সে সন্ধান জানো দিদি?”

“মিস গাঙ্গুলী!” মুহূর্ত্তে সেবার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, পুরাতন কথা মনে পড়িল; বিবর্ণ মুখেই সে বলিল, “কেন, তাকে কি দরকার?”

শরৎ বলিলেন, “তাকে আমার একবার দেখা দরকার। আমার মনে হচ্ছে দশ বার বৎসর আগে ইনি আমার পরিচিতা ছিলেন।”

নত মুখে সেবা বলিল, “তা হতে পারে। তিনি এখন কোথায় আছেন তা আমি ঠিক বলতে পারি নে, তাঁর খবর আমি ইচ্ছা করেই রাখি নি। তুমি একবার খোঁজ করলে জানতে পারবে

শরৎ ষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিলেন।

এই নারীর গোপন কথাটা তাহার নিকট গোপন রহিল না। মিস্ গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা করিলে হয় তো প্রভুলের আরও অনেক নির্দাকর কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, সেই ভয়েই সেবার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মিস্ গাঙ্গুলীর বাংলা সহরের প্রান্ত সীমার ইংরাজ পল্লীর মধ্যে অবস্থিত। একটা বড় পুকুরিণী এই বাংলার তিনদিক ঘেরিয়া আছে, সমুদ্রদিকে একটা সুন্দর ছোট ফুলবাগান, সাময়িক নানা ফুলে প্রায় বার মাসই রমণীয় থাকে। পুকুরিণীর একপার্শ্বে একটা বাঁধানো ঘাট, তাহার দুইদিকে বকুল গাছের শ্রেণী বাংলাটা দেখিতে বড় সুন্দর, ঠিক একখানি ছবির মত।

শরৎ গেটের বাহিরে থাকিয়া ভিতরে নিজের নামের কার্ডখানা পাঠাইয়া দিলেন।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশে শুভ্রা দ্বাদশীর চাঁদখানা পানিকন্দের উঠিয়া পড়িয়াছে এবং তাহার রক্তশুভ্র আলো স্মৃতিভাবে পৃথিবীর গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাগানে নানাজাতি ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে, সমুদ্রস্মৃতিত শেফালীর কোমল মিষ্টগন্ধ ও হেনার উগ্রগন্ধ এক হইয়া মিশিয়া গিয়া এক অভিনব গন্ধের সৃষ্টি করিয়া বাতাসে ছুটাছুটি করিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ স্বচ্ছ পুকুরিণীর বক্ষে বায়ুতাড়িত বীচিমালার উপর শুভ্র চাঁদের আলো পড়িয়া ঝিকমিক করিতেছে।

বহুদূরে কোথায় কোন দেবমন্দিরে আরতি হইতেছিল তাহার কাঁসের ঘণ্টা শব্দানিনাদ শব্দ কাণে ভাসিয়া আসিতেছিল। তাদের মাঝামাঝি, বর্ধাগতে এই অসময়ে ও একটা পাপিয়া এই চাঁদের আলো, ফুলের মিষ্ট গন্ধের মোহ ভাগ করিতে পারে নাই, বকুলগাছের অন্ধকারময় রোপ মধ্য হইতে সে তাহার চিরপ্রণাম্য চাঁৎকার করিতেছিল, “চোখ গেল চোখ গেল—”।

বাংলার মধ্যে পিয়ানো বাজিতেছিল। সম্ভবতঃ লেসের আন্তরণ যে জানালায় দেওয়াছিল, শুভ্র আলোর দীপ্তি বাহার মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া শুভ্র চাঁদের আলোর সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে, সেই

কক্ষটার মধ্যে পিরানো বাজিতেছিল। অল্পক্ষণ পরে একটা অতিমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও পিরানোর সুরের সহিত মিলিয়া গেল।

গায়িকা যে গানটা গাহিতেছিল সেটা শরতের চির পরিচিত। এই গানটা শুনিতে শুনিতে একদিন তিনি বিভোর হইয়া যাইতেন।

“এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্ত মন্দির মোর--”

এই একটা লাইন কাণে আসার সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের পুরাতন স্মৃতি তাঁহার মনে আগিয়া উঠিল।

কোন বিরহিনী এই সুল্লর সন্ধ্যায় এ গান গাহিতেছে, তাহার মন্দিরের দেবতা আজ কোথায়? এই ভরা ভাদ্রের পূর্ণতা তাহার মধ্যেও পূর্ণতা আনিয়া ফেলিতে চায়, কিন্তু হার, মন্দির যে শূন্ত, কিছুই যে নাই। দেবতা, ওগো কোথায় তুমি? পূজার্থিনী তোমার পূজার সাজ লইয়া নৈবেদ্য সাজাইয়া ওই যে কাঁদিতেছে—

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর শূন্ত মন্দির মোর,

‘বাবু, মেমসাব বহৎ পেলাম দিয়া আপকো।’ আত্মভোলা শরৎ চমকাইয়া চাহিয়া দেখিলেন, পার্শ্বে মেমসাহেবের ভৃত্য।

পিরানো কখন থামিয়া গিয়াছিল, তথাপি শরতের কাণে পিরানোর মিষ্ট সুরের সহিত ততোধিক একটা মিষ্ট সুর বাজিতেছিল, তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তখন পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছিল।

দরজার শেষের ক্রীণ সরাইয়া ভৃত্য বলিল, “ই কামরা মে মেমসাব হার।”

দরজার ক্রীণ সরাইতেই চেয়ারে উপবিষ্টা নারী মুখ কিরাইল। বৈদ্যাতিক আলোক দীপ্তভাবে তাহার অনিন্দ্যসুল্লর মুখখানির উপর গিয়া পড়িল, সেই মুখের পানে তাকাইয়া শরৎ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

প্রথম করেক মুহূর্ত নারীও স্তম্ভিতভাবে তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিল, তখনই সে নিজকে সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; শুক মলিন মুখে জোর করিয়া হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল “আসুন।”

বেয়ারার অপেক্ষা না করিয়া নিজেই সে একখানা চেয়ার সরাইয়া দিল।

এই সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, এমন কি কণ্ঠস্বর

পর্যাস্ত এতটুকু পরিবর্তিত হয় নাই; এই সেই সুল্লর ললাট, এখনও একটা চিস্তার রেখা তাহাতে পড়িতে সমর্থ হয় নাই, সুদীর্ঘ দশ বার বৎসরে তাহার সৌন্দর্য্য হ্রাস হয় নাই—বরং বাড়িয়াছে।

“ইভা!”

দাঁড়াইতে অসমর্থ শরৎ একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

মলিন হাসির রেখা ইভার ওষ্ঠে ফুটিয়া উঠিল, সে পার্শ্বের চেয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইল,—“ই্যা আমিই বটে। আপনি নিশ্চয়ই আশা করেননি অপরিচিতা মিস গালুলী আপনার চিরপরিচিতা ইভারূপে ফুটে উঠতে পারে।”

শরৎ বলিলেন, “একটু যেন বুঝতে পেরেছিলুম, তবু মনে সন্দেহ যে ছিল না একথা বললে মিথ্যা বলা হবে।”

ইভা একটা লঘুনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল “আপনার কার্ড পেয়ে আমরাও ঠিক এই সন্দেহ জেগে উঠেছিল। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারিনি যে আপনি এই দূরদূরেশে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। অবশ্য আমি জানতুম প্রতুলবাবু আপনার বন্ধু,—কিন্তু এমন বন্ধু অনেকেরই থাকে,—কেউ বন্ধুর বিপদে বড় একটা সাহায্য করতে যায় না, আপনি যে প্রতুলবাবুর স্বার্থ বন্ধু, তা এতক্ষণে বুঝতে পারলুম।”

শরৎ ক্রিষ্টমনে বলিলেন, “জিজ্ঞাসা করতে পারি কি প্রতুলের এ বিপদ উপস্থিত হল কেন, কার জন্তে সে নিজের সর্বস্ব নষ্ট করলে?”

ইভার আয়ত চক্ষু ছইটা দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে একটু তীব্রকণ্ঠে বলিল, “যদি মনে করে থাকেন আমার জন্তে, সে ধারণা আপনার ভুল। মনে করুন, একটা আলো জ্বলছে, কত পতঙ্গ উড়ে আগছে, সেই আলোতে গুড়ে মরছে, আলো তার কি খবর রাখে? মূর্খ লোকগুলো যদি আমার চারিদিকে ঘুরে মরে শেষে আত্মপ্রাণ বিসর্জন দেয়, সে কি আমার দোষ, শরৎবাবু?”

অকস্মাৎ দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া শরৎ বলিলেন “তোমার দোষ নয় তবে কার দোষ? ই্যা, দোষ তোমারই, কেননা তুমি তোমার ওইরূপের আশুন জেলে মূর্খ পতঙ্গদের

আকর্ষণ করেছে। সে তো শুধু আজ নয় ইভা! মনে আছে কি বার বছর আগের কথা? তোমার কাছে সে এক যুগ হয়ে গেছে, কিন্তু আমার কাছে সে যে সে দিনের কথা ইভা, এই বুকের নীচে সে ক্ষত আমার এখনও তেমনি রয়েছে, অনেক সাক্ষ্যের প্রলেপ তাতে দিতে গেছি, সব ভেসে গেছে। আমি জানি হ্যা, আমি জানি, ইভা তুমি যেমন করে আকর্ষণ কর, তারপর কেমন করে নিজেকে মুক্ত করে তফাতে সরে যাও।”

ইভা একবার, চোখ দুইটা শরতের মুখের পানে তুলিয়া ধরিয়া তখনই নামাইয়া লইল, অশ্রুট কণ্ঠে বলিল, “বার বছর, হ্যাঁ তাই বোধ হয়—”

তেননই উত্তেজিত কণ্ঠে শরৎ বলিলেন, “যত বছরই হোক ইভা, মনে করে দেখ, সে দিনে তোমার আমি ধর্মসম্বন্ধভাবে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম, আমার জীবনের স্বত্বঃস্বের সমান ভাগ দিতে চেয়েছিলুম। বড় ভালবেসে-ছিলুম ইভা, তোমার জন্তে সব ছাড়তে প্রস্তুত হয়েছিলুম। কোনদিকে চাই নি, কিছু ভাবি নি, একমাত্র তোমাকেই ভেবেছিলুম, কিন্তু কি পেলুম ইভা,—অত ভালবাসার বিনিময়ে আমি তোমার কাছ হতে কি পেলুম? পেলুম নির্দারুণ অবহেলা—ঘৃণা, যাতে আমার ভবিষ্যৎ আমার সামনে কালো হয়ে গেল, আমি সেই যে পড়ে গেলুম আর উঠতে পারলুম না। নিষ্ঠুরা নারী, তুমি তো একবার চেয়েও দেখলে না, এই বুকখানা দলে হাসতে হাসতে চলে গেল। আমি অধঃপাতে গিয়েছি ইভা,—আজ আমি মাতাল, কেউ আমার বিশ্বাস করে না, তবু বলতে পারি আমি চরিত্রহীন নই, জগতে একজনকে ছাড়া আর কাউকেই ভালবাসতে পারি নি। কিন্তু তুমি—তুমি কোথায় নেমে এসেছ ইভা, একবার তোমায় তাই দেখতে বলি। তোমায় কোথায় বসাতে চেয়েছিলুম, সে অর্থ্য পদাঘাতে ফেলে নেমে এলে কোথায়?”

ইভা অল্পদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, একটা কথাও তাহার মুখে ফুটিল না।

শরৎ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “আমি স্বপ্নেও আশা করি নি, মিস গান্জলীরূপে এখানে ইভাকে

দেখতে পার। আমি জানতুম, ইভা ব্যারিষ্টার অতুল মিত্রের জ্যেষ্ঠ কন্যারূপে স্বদেশে বাস করছে। স্বপ্নেও ভাবি নি ইভা মিস গান্জলীরূপে এখানে থেকে আমারই বন্ধুর সর্বনাশ করেছে।”

ইভা দুই হাত কচলাইতে লাগিল, কি বলিতে যাইতে ছিল, শরৎ বাধা দিলেন, “আজ, আমি ও সব কথা শুনতে চাইনে ইভা! যে যা করেছে বা করছে, তা যদি মন্দও হয় তার জন্তে কৈফিয়ত দেওয়ার কোন দরকার দেখিনে। আজ এই মুহূর্তে ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমায় যে আমি জ্যেষ্ঠ কন্যারূপে পাইনি সে আমারই সৌভাগ্য। এই অলস্তুপাবকরুণী নারীকে জীবনসঙ্গিনী করে আমি স্মৃতি হতে পারতুম না, চিরজীবন আমার জলে মরতে হতো। কিন্তু তবু বলছি এ রকমে স্বেচ্ছাচারের মধ্য দিয়ে না চলে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে কেন বিয়ে করলে না, আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পাত্রের জগতে কি অভাব ছিল ইভা? স্বেচ্ছাচারিতার ফলে তুমিই যে সকলের কাছে ঘৃণ্য হয়ে পড়েছ, কাউকে জয় করেছে ভেবে যদি গর্বান্বিতা হয়ে থাকো, সে তোমার ভুল ধারণা, আমি দেখছি, স্বেচ্ছাচার তুমিই পরাজিতা হয়েছে। তোমার শিক্ষা তোমায় উন্নত করতে পারে নি, তোমায় অধঃপাতে এনে দিয়েছে; সেটুকু কি বুঝতে পারছো ইভা?”

ইভা মুখ ফিরাইল, তাহার অনিন্দ্য ও সুন্দর মুখখানা শুভ্রালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ক্রমশঃ তার বড় বড় দুইটা চোখ অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছিল; রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “কিন্তু আপনি আমার ভুল বুঝছেন শরৎ বাবু, আমার ঠিক চিন্তে পারেন নি। আমার অপরাধ—আমি সুন্দরী, কিন্তু সে কি আমার দোষ? এ জন্তে যদি দোষ দিতে হয় তবে ভগবানকে দেওয়া উচিত, কেন না প্রাণীদের সৃষ্টি অথবা কুৎসিত করে তিনিই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে বাস করে আমার পৃথিবীর পরে ঘৃণা জন্মে গেছে, শুধু লোক পুরুষগুলোর জালায়। এদের সব আমার কাণ বধির করে দিয়েছে, এরা সব রকমে আমার অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এদের ছাড়াতে চাই, এরা ছাড়তে চায় না, আমার পদে পদে এরাই বাধা দেয়।”

শরৎ তাহার মুখের পানে বিন্মিত নেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে প্রতুল—”

ইভা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “মুখ অন্ধ যদি তার বখাসর্বস্ব স্বৈচ্ছায় আমার পায়ে কাঁছে জড় করে, সে দোষ তার,—আমার নয়, এটা বোধ হয় বুঝবেন।”

শরৎ যদিও তাহার হৃদয়ের মুখখানার পানে মুখুনেত্রে চাহিয়া ছিলেন তথাপি তাঁহার অন্তরে যে সত্য আগিতেছিল সে গর্জন করিয়া বলিতেছিল,—মিথ্যা কথা। সেবার মুখে যে পবিত্রতা আগিয়া, ইহার মুখে তাহা কই? প্রণতির চোখে যে সরলতা, তাহাপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। হইলেও ইতার চোখে তাহা নাই। ইহার মধ্যে পবিত্রতা নাই, সরলতা নাই, বিশ্বাস নাই। ইভা সব করিতে পারে, প্রকৃত ভালবাসার জ্ঞান তাহার নাই, ধর্মকে সে তর্কদ্বারা উড়াইয়া দেয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস শরতের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কখন বাহির হইল, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই।

( ১৩ )

কাজটা প্রণতি যত সহজ ভাবিয়াছিল বাস্তবিক পক্ষে তত সহজ ছিল না; মাণিককে লইয়া সে বেশ একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

মাণিক বেদিন আসিল, সেই কাজটা সে বাপুয়ার কাছে শুইয়াছিল। প্রাতে প্রণতি ঘুম হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, বাপুয়া মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বারান্দার চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

“কিরে বাপুয়া! মুখখানা অমন ভারি করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? সকাল বেলা তোর আজ কাজকর্ম কিছু নেই বুঝি?”

প্রণতির কথার উত্তর বাপুয়া দিল না, মুখখানা অজ্ঞ দিকে ফিরাইয়া লইল।

প্রণতি অল্পভবে ব্যাপারটা কতক বুঝিয়া লইল। বাপুয়া এই ভোর বেলায় নান করিয়া আসিয়াছে, তাহার কাপড় উঠানে বাঁশের আলনার মেলিয়া দিয়াছে। এই ধরণের কথার আভাস সেদিন শরৎ দিয়াছিলেন, প্রণতির মনে

সেই কথাটা আজ আগিয়া উঠিল। ছেলেটা অজীর্ণতে কষ্ট পাইতেছে, বাহা খায় কিছুতেই তাহা জীর্ণ করিতে পারে না, ইহা জানিয়া অনিয়াও কাল রাত্রে তাহাকে আহার করাইতে গিয়া তাহার লোলুপতা দেখিয়া নিতান্ত দয়াপরতন্ত্র হইয়াই খানিকটা দুধ আনিয়া দিয়াছিল, আজ তাহারই ফল চিন্তা করিয়া অল্পতপ্তা প্রণতি ঠিক রহিল, আজ হইতে ছেলেটার আহার সম্বন্ধে রীতিমত সাবধান হইতে হইবে, নহিলে ইহার আরোগ্যের আশা করাই বুখা।

বাপুয়ার গম্ভীর মুখখানার পানে চাহিয়া প্রণতির বড় হাসি পাইতেছিল, কোন মতে সে হাসি চাপিয়া রাখিয়া সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, “আজ এত ভোরেই চান করে ফেলেছিল বাপুয়া, এখনই কি রান্নার বোঁগাড় করে দিবি না কি রে? মাণিক কোথায় গেল, এখনও ঘুম হতে উঠে নি বুঝি?”

বাপুয়া বিরাট মুখভঙ্গী করিল, তাহার পর হঠাৎ জোরের সহিত বলিয়া উঠিল, “ওকে আমি কিন্তু কক্ষণ এখানে রাখতে দেব না, এখনি ওকে দূর করে দিন।”

প্রণতি গম্ভীর মুখে বলিল, “কেন রে, কি হয়েছে?”

বাপুয়া তেমনি মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, “কি হয়েছে? ঘর বিছানা সব নোংরা করে ফেলেছে; আমার কাপড়ে গায়ে—”

প্রণতি আর কোন মতে হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না, উদ্ভাসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসি দেখিয়া বাপুয়ার মুখখানা, আরও অন্ধকার হইয়া গেল, সে দারুণ বিরাগে মুখ ফিরাইল।

হাসিটা যে একান্ত অজ্ঞার হইয়া গিয়াছে তাহা বুঝিয়া প্রণতি হাসি সামলাইল, অতিকষ্টে মুখখানা গম্ভীর করিয়া সে বলিল, “না না, তুই কিছু মনে করিস নে বাপুয়া, তারপর কি হল তুই বল।”

কিন্তু বাপুয়া রাগ করিয়াছিল, একটা কথাও বলিল না।

প্রণতি হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিল, “তারপর সে আছে না গেছে, ঘুমাচ্ছে না জেগে আছে সেইটাই না হয় বল; তার অবস্থাটা দেখে তাকে দূর করার পথ দেখি।”

বাপুয়া বিরাগভরে বলিল, “ওই দরজার পাশে বসে

আছে চুপটি করে, দেখুন। গিয়ে আঁই ওকে পাঠিয়ে দিন বলছি, আমি কখনো আর ওকে রাখতে পারব না।”

সে কথায় কান না দিয়া প্রণতি অগ্রসর হইয়া দেখিল ছেলেটা বাস্তবিকই উদাসগন্তীরমুখে দরজার কাছে বসিয়া আছে। বাপুয়া তাহাকে গালাগালিই দিক আর মারুকই, আবার নিজেই তাহাকে পরিকার করিয়া দিয়াছে।

প্রণতি বাপুয়ার উপর ভারী খুসি হইয়া ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার নাম কি রে?”

সে প্রশ্নটাকে উত্তরের যোগ্য বলিয়া মনে করিল না, একবার প্রণতির পানে অবহেলার দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রু দিকে মুখ ফিরাইল।

বাপুয়া ধমক দিল,—“কথা বল না রে—চুপ করে রইলি যে বড়? কথা না বলে তোর পা ধরি—ছ হ,”

সে এমন বিকৃত মুখভঙ্গী করিল যাহাতে ছেলেটি চমকাইয়া গেল, উত্তর দিল,—“মাণিক।”

মাণিকই বটে; প্রণতি হাদি চাপিয়া তাহার পানে চাহিল। মাথাটা মোটা, পেটটা মোটা, হাত পা সরু, পেটের উপর সবুজ বস্ত্রের শিরাগুলি ভাসিয়া উঠিয়াছে। গলাটা লম্বা এবং সরু, বুকের পাঁজরাগুলি স্পষ্ট গণিয়া লওয়া যায়।

প্রণতি চা করিয়া ছেলেটাকে আগে একটু খাওয়াইল, বাপুয়া হালুয়া দিতে প্রবল আপত্তি তুলিল বলিয়া সামান্য একটু দিল। তাড়াতাড়ি রন্ধনাস্তে তাহাকে আগে খাইতে দিল।

নিজে আহাৰাস্তে স্কুলে বাইবার কাপড় পরিতে পরিতে মাণিককে জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন মাণিক, পেট ভরেছে তো?”

মাণিক আনন্দে মাথা কাত করিয়া সম্মতি জানাইল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া প্রণতি মাণিককে নুতনভাবে দেখিতে পাইল। সকালবেলায় মুখচোরা সে মাণিক আর নাই বাপুয়ার সঙ্গে ইহারই মধ্যে তাহার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়া গিয়াছে, বাপুয়ার ফরমাস খাটিতেছে।

প্রণতি ইহাতে খুব খুসি হইল। সে রাত্রে সে মাণিকের জন্ত খুব হালকা খাবারের বন্দোবস্ত করিল, বলা বাহুল্য, প্রভাতে সেদিন মাণিকের অসম্ভব রকম উন্নতি দেখা গেল।

শরৎ বলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার পারিবারিক ডাক্তার হিরণ্ময় বাবু প্রত্যাহ একবার করিয়া এই ছেলেটাকে দেখিয়া যাইবেন। সেই কথা অনুসারে সে দিন বেলা আটটার সময়ে হিরণ্ময় বাবু মাণিককে দেখিতে আসিলেন।

ডাক্তারটা বয়সে তরুণ, আজ বৎসর তিনেক মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। ইহার মধ্যে ভাল চিকিৎসক বলিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, পসারও বেশ জমিয়া গিয়াছে।

মাণিককে পরীক্ষা করিয়া প্রণতির পানে তাকাইয়া হাসিমুখে তিনি বলিলেন, “আপনাকে কিন্তু একে নিয়ে বেশ বেগ পেতে হবে মিস বোস, এমন নোংরা জগতে বোধ হয় আর ছুটি মেই। শরৎ বাবু একে নিয়ে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাই কোন মতে আপনার ঘাড়ে একে চাপিয়ে কিছুদিনের মত তিনি সরে পড়েছেন। শীঘ্র যে কিস্যবেন সে আশা খুব কম।”

বিস্ফারিত নেত্রে হিরণ্ময় বাবুর পানে চাহিয়া প্রণতি বলিল, “না, তিনি বলে গেছেন দিন পনের কুড়ির মধ্যে ফিরে আসবেন।”

হিরণ্ময় বাবু চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া আড়ামোড়া ছাড়িয়া বলিলেন, “আপনি তাঁকে চে:নন না মিস বোস, তিনি যে কি ধরণের মানুষ তা সহজে কেউ বুঝতে পারবে না। ‘এই আসছি’ বলে তিনি এমন গা ঢাক দেন যে ছয়মাসের পর যদি আবার দেখা হয়। দিন পনের কুড়ি বলে গেছেন তো, দেখুন না—কতদিন বাদে ফেরেন। আমার ছোটবেলার বন্ধু তিনি,—তাঁর যত কথা আমি জানি সব কথা বলতে গেলে মস্ত একখানা বই হয়ে পড়ে।”

তাঁহাকে সে কথা বলায় কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রণতি শরতের যে টুকু পরিচয় পাইয়াছিল তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট, ইহার বেশী সে আর কিছুই জানিতে চাহে না। প্রণতি জানে—স্বচক্ষে যাহা দেখা যায় তাহাই সত্য, কাণে যাহা শুনা যায় তাহা সত্য বহিরা গ্রহণ করা মেহাৎ সূৰ্ত্তার কাজ।

হিরণ্ময়বাবু অনেক কথা বলিয়া গেলেন, সব কথা

প্রণতির কানে গিয়া পৌঁছায় নাই। শরতের কথা শুনিতে গিয়া সে শরতের উন্নত দেহখানা, সরল উন্নত মুখখানা মনে অঙ্কিত করিয়া তাহাই দেখিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। হিরণ্ময় বাবুর প্রশংসারূপে ব্যক্ত অজস্র নিন্দাবাণীর মধ্যে তাহার কাণে শরতের সেই করুণ সত্য কথাটা ভাসিতেছিল, —“আমার জগতে স্নেহ কর্তে, ভালোবাসতে কেউ নেই, আমি জগতে একা, অথচ ভার বয়ে যাচ্ছি বেশ।”

অনেকক্ষণ অনর্থক বসিয়া হিরণ্ময়বাবু প্রায় দশটার সময় আসন ত্যাগ করিলেন, মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন, “আপনার অনেক কাজের ক্ষতি করে দিলুম মিস বোস, মাপ করবেন।”

প্রণতি প্রত্যুত্তরে একটু হাসিয়া বলিল, “না, ক্ষতি কিছুই হয় নি। আপনি আসার অনেক আগে আমার সব কাজ হয়ে গেছে; এইবার ওদের দিতে পারলেই হয়।

ইহার পর হিরণ্ময় বাবু বৈকালের দিকেই আসিতেন, সকালের দিকে আসিয়া প্রণতির কাজের ক্ষতি করিতেন না।

সন্ধ্যার সময় তিনি চলিয়া যাইতেন, নানা দেশবিদেশের গল্প করিতেন।

প্রণতি ইহাতে ভারী বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে যুবতী অভিভাবকহীনা, হিরণ্ময় বাবু যে এরূপভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকেন, গল্প করেন, ইহাতে তাহার চরিত্রে কেহ কলঙ্ক দিতেও তো পারে। মুখ ফুটিয়া ভদ্রতার খাতিরে সে না হয় কিছু বলিতে পারে না, হিরণ্ময়ের ইহা বিবেচনা করা তো উচিত। তাঁহার এ জ্ঞান নিশ্চয়ই আছে একাকিনী যুবতীর গৃহে তাঁহার ছায় যুবকের সন্ধ্যাবেলা গল্প করিতে যাওয়া বাস্তবিকই দোষাবহ।

মনে মনে বিপদের গুরুত্ব অনুভব করিয়া প্রণতি ভারী অস্থির হইয়া পড়িল, তথাপি সে মুখ ফুটিয়া একটা কথাও বলিতে পারিল না।

( ক্রমশঃ )

## সীতা

### শ্রীমতি কনকলতা ঘোষ

ধরামাঝে ঋষিশ্রেষ্ঠ জনকের ঘরে  
আবিভূতা লক্ষ্মী সীতা বিধাতার বরে।  
নিষ্ঠুর নিয়তি সনে যুঝিতে জনম  
লভিয়া দেখাল সীতা নারীর ধরম।  
লোকে বলে সীতাদেবী জনম দুঃখিনী,  
মোরা বলি ধন্য সীতা স্বামীগরবিনী।  
কি ছার সাম্রাজ্যগর্বি ছার রাজ্যস্থখ!  
বনবাসে পতি পাশে সদা হাসিমুখ।  
নিজ সহোদরসম দেবর লক্ষ্মণ  
সীতারে করিতে স্ত্রী ব্যস্ত অনুক্ষণ।  
ধর্মের মাহাত্ম্য হেথা দেখাতে সবারে  
সাক্ষী সীতা পতিব্রতা রাবণের ঘরে।

সত্যব্রত রামচন্দ্র সীতার কারণে  
সবংশে বধিল লক্ষাপতি দশাননে।  
অগ্নির পরীক্ষা নহে রামের আদেশ  
পবিত্র সীতার মূর্তি দেখাতে দেবেশ  
করাইলা অগ্নি শুদ্ধি দেখে সর্বজন।  
নতমুখে সতীপদে করিলা বন্দনা।  
ভাগ্যবিড়ম্বনা হেতু বনেতে বসতি  
পতি করে নাই ত্যজ্যা, করিল নিয়তি।  
ধর্মের প্রভাবে বনবাস মধুময়  
বান্দীকির তপোবন স্নেহের আশ্রয়।  
লব কুশ দুই পুত্র গুণের আধার  
বংশের গৌরব তারা গৌরব মাতার।

দূরে রহিলেও তবু স্বামীর অন্তরে  
কি উজ্জ্বল ছিল মূর্তি ! স্বর্ণ সীতা গড়ে  
দেখাইলা রামচন্দ্র সবার সম্মুখে  
'ভুলি নাই—ভোলা নাহি যায় রাজ্য স্মৃতি' ।  
রাজ গৃহে তপোবনে দৌহার হৃদয়ে

যে প্রেমের মন্দাকিনী ধীরে যায় বয়ে,  
সে প্রেমে যে প্রাণ পূর্ণ কি দুঃখ তাহার  
তার কাছে রাজ্য স্মৃতি অতীব অসার ।  
রাজকন্যা রাজবধু রাজরাণী সীতা  
যুগে যুগে দেশে দেশে তুমি মা বন্দিতা ॥

## বন্দীর আত্মকাহিনী

### শান্তি চৌধুরী

( এক )

ডাক্তারীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সবমাত্র রাঁচী  
পাগলা গারদের ( Lunatic Asylum ) চাকুরীতে যোগ  
দিয়েছি। যার পরিবর্তে আমি এখানে এসেছি, তিনি  
কয়েকদিন এখানে অপেক্ষা করে সব পুষ্কায়পুষ্কায়  
দেখিয়ে এবং বুঝিয়ে দিয়ে তার কর্তব্যস্থানে চলে গেলেন।

একদিন দুইদিন করে কিছুদিন অতিবাহিত হল। যতই  
আমি রোগীদের সঙ্গে মেশামেশি বেশী করতে লাগলাম,  
ততই আমার বিষয় উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে লাগল। কি  
আশ্চর্য! এক একজন এক এক ভাবের পাগল। তবে  
এখানে দেখবার এবং শিখবার অনেক কিছু আছে।

সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার এক তরুণ যুবক।  
বয়স ত্রিশতরি বর্ষ হতে পারে বা কিছু বেশী কম হতে পারে।  
অনেক রকম অনেক পাগলের মধ্যে আনাগোনা করে থাকি  
কিন্তু এই তরুণবয়স্ক পাগলটির পাগলামী যে কোথায়  
আজ পর্যন্ত তার কোনো সমাধান করতে পারলাম না।  
তাকে এক একদিন এক এক অবস্থায় দেখতাম। কখনও  
দেখতাম তার দৃষ্টি অতীত কোন্ এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ  
করছে, কখনও নিজের ভাবে তন্ময় হয়ে আছে, আর কখন  
কখন নিজের মনে কি বকে যেত বুঝতে পারতাম না।  
যথেষ্ট মধ্যে দু-একটা কথা শুনে পেতাম, তার মধ্যে 'অশ্রু'  
'নিষ্ঠুর'-এই দুটি কথাই বেশী শুনে পেতাম। তার জন্তে

সহানুভূতিতে আমার হৃদয় ভরে উঠল। অন্তরে তার  
জন্তে একটা টান অনুভব করলাম। আর আমার মাঝে  
জেগে উঠল একটা দুর্দ্দমনীয় বাসনা, একটা প্রবল কোতূহল  
—তার জীবনের ইতিহাসটা জানবার জন্তে। যতদিন না তা  
জানতে পারছি ততদিন আমার আর স্বস্তি নাই।

সেদিন ছিল বর্ষণক্ষান্ত আবাড়ে সন্ধ্যা। জমাট বাধা  
মেঘের কোন্ ভাঙা ফাঁক দিয়ে সূর্যদেব আড় চোখে ধরণীর  
বুকের উপর একটু খানি চেয়ে দেখছিলেন। লাল আভা  
চিকমিকিয়ে ঝড়নোমুখ জবার মতন দেখাচ্ছিল। এলোমেলো  
লম্বা লম্বা শুভ্র কুন্তলরাজি তার মুখের এখানে সেখানে শুচ্ছ  
শুচ্ছ হয়ে বকে পড়েছিল। মুখ প্রায় ঢেকে গিয়েছিল।

আমি দ্বিতলের উপর থেকে জানালা দিয়ে প্রায়ই তার  
হাবভাব লক্ষ্য করতাম, আঙ্গুণ করছিলাম। গর কোঠাটা  
( cell ) ছিল আমার পড়ার ঘরের সামনাসামনী। আমি  
প্রায় সময়েই খালি খালি বসে বসে তাকে দেখতাম। এতে  
আমার কেমন যেন একটা আমোদ বোধ হত। আমার  
মনে হত তার সঙ্গে আমার যেন কি একটা সম্বন্ধ পাতা  
রয়েছে। বাকু এখন তাকে আমি একটু বেশী করুণা করি  
অবশ্য তাকে বাধ্য করবার জন্তেই। অজ্ঞাত কর্মচারীর  
বংল—পাগল নিয়ে খেলা করলে অনেক আশঙ্কা আছে।  
আমি ওদের কথায় বর্ণপাত করতাম না। বরং তার সঙ্গে  
আরো বেশী অন্তরঙ্গের মতন মিশতাম। কিন্তু আমার আশ:



পূর্ণ না। যত সহজে কাজ সিদ্ধ হবে ভেবেছিলাম তা হল না। সেদিন হঠাৎ তার কি খেয়াল হল বুঝলাম না; সে মোটা মোটা লোহার সিক যা তার দরজায় ছিল, ভাঙবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। যখন কোনো রকমেই সফলকাম হতে পারল না তখন নিজের মাথা খুড়তে লাগল। আমি আর থাকতে পারলুম না। ছুটে তার কাছে গেলাম এবং তাকে নিয়ে ফিরে এলাম। যদিও তাকে জেলের বাইরে নেওয়া আইন বিরুদ্ধ তবু তাকে নিয়ে এলাম।

তাকে দেখে, আমার মেয়ে 'মলিনা' তো কেঁদেই অস্থির। বোধ হয় তার উন্মাদের চেহারা দেখে সপ্তমবর্ষীয়া কস্তা আমার ভয় পেরেছিল। 'শুভা' তো রেগেই অস্থির। কেন গুলব পাগল নিয়ে খেলা শুরু করেছি! শেষে কোন সর্বনাশ করে বসে। আমি তার কথা শুনে বিশেষ কোনো জবাব দেওয়া আবশ্যিক মনে করলাম না কারণ, আমি জামিনাম, বীরেন্দ্র অস্ত্রাস্ত্রদের মতো নয়।

এখনি করে কিছুদিন অতিবাহিত হল। আমার এই ঐকান্তিক বদ্ধ, অকৃত্রিম স্নেহ যে ব্যর্থ হয় নাই, তা বেশ ইঙ্গিত পাইলাম। দেখলাম সে ধীরে ধীরে আমার বেশ প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় তার আসা চাই-ই। আমাকে আর বেয়ে ডেকে আনতে হয় না। প্রহরীকে বললে সে তাকে মুক্ত করে দেয়, সে আমার এখানে চলে আসে। 'মলিনা' আর তাকে দেখে অস্থির হয়ে উঠেনা। তাকে দেখলে 'মলিনা' ছুটে গিয়ে তার কোলে ঝাপিয়ে পড়ত। 'বীরেন' মাকে মাঝে তার মাথায় হাত রেখে বলত লক্ষ্মীটি তুমি ফুলের মতন নির্মল হও সীতা সাধ্বীর মতন সাধ্বী, পবিত্রা হও আর স্বামী রানীর মতন কর্তব্যপারায়ণ হও। 'মলিনা' তাকে আমার নির্দেশমত কাকাবাবু বলে ডাকত। যে দিন 'বীরেন' আসত না, সেদিন 'মলিনা' কেঁদে চোখ ফুলিয়ে দিত। কিছুতেই তাকে শান্ত করা যেত না।

কিন্তু 'শুভার' সঙ্গে এখনও তার পরিচয় হয় নাই। 'শুভা' কিছুতেই তার কাছে আসতে চাইতো না। আজ অনেক বলে করে স্থির করেছি যে, যখন 'বীরেন' আজ আসবে, তখন 'শুভা' আমাদিগকে মিষ্টান পরিবেশন করবে। শুধুমাত্র আমি তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেবো।

'বীরেন' 'মলিনাকে' নিয়ে খেলা করছে এমন সময় ছু-হাতে ছু-খালা মিষ্টান নিয়ে 'শুভা' উপস্থিত। 'বীরেন' তারে দেখে মুখখানি এমন আরক্ত ও বিকৃত করে ভুলল যে সে অবর্ণনীয় ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি আজ পর্যন্তও আমি ভুলতে পারিনি। আলাপ করিয়ে দেওয়াতো দুয়ের কথা, আমিত ভয়ে এতটুকু! সে 'শুভার' দিকে পেছন দিয়ে ঘুরে বসল। আমি 'শুভাকে' চলে যেতে ইঙ্গিত করলাম। সে চলে গেলে আমি তাকে একখানা খালা এগিয়ে দিলাম অস্ত্রখানা নিজে তুলে নিলাম। খেতে খেতে নানারকম আবেগপূর্ণ এবং উত্তেজক গল্প করতে লাগলাম যার একটা না একটা তার বুকে আঘাত করবেই। যার একটা না একটাতে তার হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করে বেহুলা রক্তার তুলতে পারে। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হল না।

শী করে এক বাক পাখা আমার জানালার পাশ দিয়ে কোথায় কোন্ দূরদেশের উদ্দেশে চলে গেলো। আকাশে একাট ছুটি করে ঘনান তারা ফুটে উঠে আকাশ তরে ফেলতে চলল। বীরেন হঠাৎ একেবারে নীরব হয়ে গেলো।

আমি তাকে বললাম—বীরেন, তোমাকে পাগল বলতে আমার যে কত কষ্ট হয়, তা' বোধ হয় আমার ব্যবহারেই স্পষ্ট বুঝতে পারছ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে যতদূর বুঝতে পেরেছি তাতে বোধ হয়, তুমি আজ যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছ তা খুব মানসিক উত্তেজনা থেকেই একমাত্র সম্ভব। আর যেরূপের উপর তোমার যে অস্বাভাবিক ঘৃণা দেখছি এতে মনে হয় এর গোড়ায় কোনো রমনীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে। যদি তোমার বলতে কোনো আপত্তি না থাকে, বাঁধা না থাকে, তা হলে তোমার জীবনের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনতে পেলো আমি খুব সুখী হব। এই বলে আমি তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

আমার কথা শুনে তার চক্ষু ছটো এখন অস্বাভাবিক জ্যোতিতে জ্বলে উঠল যেন অগ্নি ফুলিঙ্গ সেই চোখ ছটো থেকে ঠিকরে বের হচ্ছে। নিজকে প্রকৃতিহীন করে সে বলে উঠল, 'উঃ! সে কি নিষ্ঠুর কাহিনী!

শোন তবে ডাক্তার! আমার জীবনের মর্মস্বঙ্গ কাহিনী। এ বুক কাটা ব্যথার কথা শুনে আনন্দ পাবে না, সুখ পাবে না কেবল ছুঁখ, কেবল ব্যথা। সারাটা জীবন সে বোঝা বয়ে বেড়িয়েছি, কাউকে এতটুকু দিয়ে হান্ধা হতে চাইনি। আজ তোমাকেও বল্‌তাম না, কিন্তু তা হলে তোমার স্নেহের অবমাননা করা হয়, তাই বল্‌ব। কিন্তু না শোনাই ছিল তোমার ভাল

সে দিন আমি এ পৃথিবীকে মনে কর্‌তাম সুখ-স্বপ্ন-রাজ্যবিশেষ। এখানে এতটুকু ছুঁখ থাকতে পারে, অবসাদ থাকতে পারে, তা আমার ধারণার অতীত ছিল। কিন্তু একদিন সে ভাব আমার টুটে গেলো। আমার সমস্ত স্বপনের ঘোর ভেঙ্গে গেলো। আমি দেখ্‌লাম, এ পৃথিবী শুধু হাহাকার আর ব্যর্থতার ভরা। আমি সত্যের দ্বারে এসে দেখি, আমার সমস্ত ভুল। কল্পনায় আর বাস্তবে কত আকাশপাতাল প্রভেদ!

আমার বাড়ী ‘মোহনপুর’ গ্রামে। শৈশবাবস্থা থেকেই অতিরিক্ত স্নেহমমতার মাঝে বর্দ্ধিত হয়েছি। বাবার শেষ বয়সের ছেলে, তাছাড়া আমিই ‘সবেধন নীলমণি’ আমরা তখন গৌহাটী থাক্‌তাম। বাবা সেখানকার একজন ব্যবহারজীবী ছিলেন। বাবার প্রথম সংসারের কোনো সন্তান না থাকায় আবার বিয়ে করেছেন এবং তাঁরই গর্ভে আমার জন্ম। বিমাতা হলে কি হয়, তাঁর কোলেই মানুষ হয়েছি। একমাত্র গর্ভে ধারণ ছাড়া আর বা কিছু সমস্তই তাঁর কর্‌তে হয়েছে। তাঁর নিজের অভাবটুকু পূরণ কর্‌তে দ্বিগুণ উৎসাহে এবং সমস্ত স্নেহ উজ্জ্বল করে দিয়ে আমাকে লালনপালন করেন। বাবার পসারও বেশ ছিল, কাজেই আমি যে কিরূপ আশ্বাস ও বিলাসিতার কোলে পরিপুষ্ট হয়েছি, তা না বল্‌লেও হয়ত বেশ বৃষ্‌তে পার্‌ছ।

আমি ক্রমে বেড়ে চল্‌লাম। ক্রমে সেখানকার পাঠ সমাপ্ত কর্‌লাম—অল্প ম্যাট্রিক পর্য্যন্তই। তারপর বাবার ইচ্ছানুসারে কল্‌কাতা প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হলাম। দিন কাহারো জন্তে অপেক্ষা করে না—অতি দীর্ঘ পথেরও অবসান আছে। আমি আই এ পাশ কর্‌লাম। তারপর

যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি, তখন একদিন আমার এক বন্ধুর বাড়ী তার অস্থলের খবর শুনে যাই। ফিরবার পথে একবার ইডেন উত্তানে গেলাম, কারণ সেদিন ভ্রমরানক গরম পড়েছিল। একটা ঘোঁপের কাছে বেকিতে বসেছিলাম, তারপর কখন এবং কেমন করে যে ঘুমিয়ে গেছিলাম জান্‌তেও পারিনি। যখন জাগলাম, তখন উত্তান এক রকম শূন্য হয়ে এসেছে, কেবল এখানে সেখানে ছ-চারজন এখনও বসে হাত্ত কোঁতুকে ব্যস্ত। আমি উঠে পড়্‌লাম। কিছুদূর এসেছি, দেখি একটা ‘গোড়া’ একজন বাল্‌গাণী তরুণীকে লক্ষ্য করে নানারকম বিশ্রী গালাগাল কর্‌ছে। সঙ্গে যে যুবকটী ছিল, সে গোড়া দেখে ভয়ে ত্রিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। যেহেতু কিছু বেশ সওয়াল জবাব শুনিতে দিচ্ছিল। এবার ঠুপিড্‌টা মেয়েটিকে ধরতে এলো। সইতে পার্‌গাম না, এক লাফে সেই রাস্কেলটার টুটি চেপে ধরলাম। সেও যে কম জোড় রাখে তাও নয়। আমাকে বেশ ছ-চার ঘা ঘুসী বসিয়ে দিলো। আমিও তাকে এমন জোড়ে এক ঘুসী বসিয়ে দিলাম যে সে ছিটকিয়ে ঘুরে পড়ে গেলো। আমি সেই অবসরে তাদের নিয়ে চলে এলাম। বাইরে তাদের মোটর অপেক্ষা কর্‌ছিল, সেখানে এলে আমাকে মেয়েটী বল্‌ল, আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ী আপনাকে যেতেই হবে। তা না হলে বাবা আমাকে খুব বক্‌বেন। আমি কিন্তু কিছুতেই যেতে চাইলাম না, কারণ আমার শরীর বড্ড ক্লান্ত হয়ে এসেছিল। যত শীগ্‌গীর হয়, নিজের বাড়ী বেয়ে পৌছ্‌তে পার্‌লেই বেঁচে যাই। কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়্‌ল না। আবার পেছনে চেয়ে দেখি অনেকগুলো লোক নোঁড়ে আস্‌চে; আবার কি বিপদ্‌ না জানি উপস্থিত হয় তেবে উঠে পড়্‌লাম। ভোঁ ভোঁ ডাক ছেড়ে মোটর ছুটল। তারপর মনে পড়ে যখন ভদের ‘রিডিং রুম’ ক্রমে পৌছলাম, যেখানে তার বাবা বসেছিলেন, হঠাৎ আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

বেদিন জ্ঞান ফিরিয়ে পেলাম, সেদিন চেয়ে দেখ্‌লাম, আমার কাছে ‘অশ্রু’, তার মা ও তার ছোট এক বোন বসে আছে। আমাকে চাইতে দেখেই তাদের মুখে একটা

আনন্দের রেখা ফুটে উঠল। ‘অশ্রু’ আমার জিন্সেস করল, আমার কেমন লাগছে। কি আর বলব! আমি দেখছিলাম, আমার কিছুই হয় নি। যা কেবল একটু হুর্দলতা। আমি ধীরে ধীরে সমস্ত স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম। হঠাৎ মাথাটা চিন্চিন্ করে উঠল। হাত দিয়ে দেখি বেণুজ বাঁধা। ‘অশ্রু’ বললে,—‘মাথার আগনার গুরুতর আঘাত লেগেছে। ওটাই আগনার বত অল্পের মূল। যাক আপনি শীগগীরই ভালো হয়ে যাবেন।’ আমি সে দিনই চলে যেতে চাইলাম, তারা কিন্তু যেতে দিলেন না। আরো দু-তিন দিন থেকে চলে এলাম।

(দুই)

এখন থেকে রোজ আমাকে না গেলেও মাঝে বেতেই হত। তারা আমাকে কত আদর বদ্ব বে করতে তা বলে বুঝাতে পারব না। অশ্রুর বাবা যতীন বাবু, আমাকে বে রেহাই না করতেন, বলে শেষ করতে পারব না। আমি স্নেহের হাতে বাঁধা পড়ে গেলাম।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা চারের টেবিলে বসে আছি। যতীনবাবু গল্প বলছিলেন—‘আমি, ‘নরেশ’ এবং ‘অশ্রুর’ ছোট বোন ‘লীলা’ শ্রোতা ছিলাম। একটু পরে অশ্রু চারের জল নিয়ে উপস্থিত হল এবং চা ঢেলে দিতে দিতে বলল, আমার কিন্তু নরেশবাবুর বীরত্ব দেখে হাসি পায়। ঐ দিন যদি ধীরেনবাবু এসে না পড়তেন তা হলে আমাকে কি অপমানই না পেতে হত?’

‘নরেশের’ দিকে চেয়ে দেখি, খেত পাথরের মূর্তির মতো ক্যাকাসে হয়ে গেছে সে। বুঝলাম অশ্রুর অপবাদ তাকে অত্যন্ত আহত করেছে এবং সে খুব লজ্জিত আছে।

আমি বললাম,—‘আপনি ভুল বলছেন মিস্ ঘোষ! নরেশবাবু ঠিক পণই বেছে নিয়েছিলেন, কারণ গোঁয়ার হাতে অপমানিত হওয়ার চেয়ে নীরবে চলে যাওয়াই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ। আমিও হয়ত চলে যেতাম কিন্তু তার অশ্রাব্য গালাগাল বরদাস্ত করতে না পেরেই খগড়া করেছি।

যতীনবাবু বলে উঠলেন—‘নরেশ’ যদি মাঝুয় হত তবে স্নেহের শব্দর হাতে লাহিত হতে ভুলে দিয়ে নিজেকে পেছনের দিকে সরে যেত না। এতেই বুঝা যায়, তার

সম্মানবোধ খুবই কম। সত্যিইতো যদি তুমি মাঝখানে এসে না পড়তে তবে ‘নরেশ’ ‘অশ্রুকে’ তার হাতে ভুলে দিয়ে নিশ্চয়ই পালাতো।

—না যতীনবাবু! মাঝুয় অত নাচ হতে পারে না কখনও। নরেশবাবু তখন সমস্ত ভুলে যেতেন যদি তার এরকম ইচ্ছা থাকতও যে তিনি এ সব হাল্কা মায় মধ্যে যেতে চান না তবু, যদি সে তাকে আক্রমণ করত, তবে যা তার সাধ্য তা’ তিনি করতেনই।

আমি সে প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য বললাম,—‘নরেশবাবুর পরিচয় তো এখন পর্যন্ত জানলাম না। আমার—

কথার বাঁধা দিয়ে অশ্রু বলল—তার নাম নরেশচন্দ্র বসু, সুরেশবাবু এডিসনাল, ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে। এম এ তে ফাষ্ট ক্লাস ফার্স্ট। শীগগীরই বিলাত যাবেন। গবর্ণমেন্ট থেকে বৃত্তি পেয়েছেন। এখানে তার কাকার বাড়ীতে থাকেন। তিনি আলীপুর কোর্টের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

আমি বললাম—‘নরেশবাবু কি I. C. S পড়তে যাচ্ছেন?’

সে বাইরের দিকে চেয়েই বলল—‘হ্যাঁ, তাইতো ইচ্ছা। তবে যাওয়া হবে কি না সে বিষয়ে স্থিরতা নাই।

আমি বললাম—‘কেন? এ সুযোগ হারাবেন না নরেশবাবু? আমি যদি এমন সুযোগ পেতাম তবে বোধ হয় হাতছাড়া করতাম না।

তিনি তারও কোনো জবাব দিলেন না—জানালা দিয়ে বাইরে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছিলেন।

যাক, তার চিন্তার আর বাধা দিলাম না। আমি সন্ধ্যা হল দেখে উঠে পড়লাম। নরেশবাবু বসে রইলেন।

কিছুদিন আর ওখানে যেতে পারিনি নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সে দিন ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসেছি, বেহারী এসে জানাল, আমার সঙ্গে কে একজন জীলোক দেখা করতে চান। আমি বুঝতে পারলাম না কে এসেছে। কতকক্ষণ পরে হঠাৎ মনে হল, ও তো এখনো বাইরে অপেক্ষা করছেন? লজ্জিত হয়ে বললাম,—‘উপরে নিয়ে এস। একটু পরে ‘অশ্রু’ লীলার হাত ধরে এসে উপস্থিত।

আমি এ কর্দিন বাইনি বলে সে চিন্তিত হয়েছিল, না জানি আমার কোনো অসুখ করেছে, তাই সে দেখতে চলে এসেছে। আমি তো অবাক, কারণ, তিন চারদিনের অসুস্থস্বাস্থ্য অত কি চিন্তার কারণ হতে পারে! আজ হয়ত যেতামই। যাক, তাকে প্রোত্তরাশ আজ এখানেই সমাপ্ত করতে হল। আমার অতিথি হয়েও সে নিজেই চা টেলে আমাকেও দিলো। নিজেও নিলে

শেষে আমার পড়ার ঘরে এসে আমার বিশৃঙ্খলতা দেখে বলল,—ভারি তো বিশ্রী আপনি? এসব কি সাজিয়ে রাখতে পারেন না?

—কেউ তো সাজিয়ে দেবার নেই? আমার কি সে সুযোগ বা অবসর আছে যে নিজেই সব সাজিয়ে রাখব? আর এই সব কি আমাদের কাজ?

সে আমার কথার কাণ দিলো কি না জানি না কিন্তু সে বইগুলো বেশ শুছিয়ে দিতে লাগলো। হঠাৎ আমার ‘ডায়েরীটা’ সে খুলে বসল। এত বিশেষ কিছুই না থাকলেও আমার অতীত জীবনের কয়েকটা স্মরণীয় ঘটনা ছিল। আমার জীবন দিয়ে যে একদিন আমি ভারতকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলাম, কোথার কোন হত্যা করেছিলাম, কোথার কার সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছিলাম, সে সব এতে ছিল। আমি তাকে বললাম যে এ আমার গোপনীয়। কিন্তু সে বলল,—আমার সেসব জানা খুবই দরকার যা আপনার খুব গোপনীয়।

তার কথার রহস্য ভেদ করতে না পেরে হাঁ করে চেয়ে রইলাম। তারপর কি কাজে একটু বাইরে এলাম, এমন সময় আমার ডায়েরী অন্তর্হিত হল। সে যখন চলে যার তখন আমার খেয়াল ছিল না, চলে গেলে আমার চমক ভাঙলো। এ বইটাতে যে আমার জীবনের একটা পরিবর্তন নির্ভর করছে? নিজের অসাবধানতার অল্প খুব লজ্জিত এবং অজুতপ্ত হলাম। কিন্তু তখন আর কোনো উপায়ই ছিল না।

বিকেল বেলা সে জানাল বে সে সেই বইটা নিয়ে এসেছে। আমার মত অসাবধানীর কাছে ওরকম একটা তদন্তক জিনিষ থাকতে কখনই পারে না। আমি একথা

ওনে কোমর থেকে একটা ছ-নলা রিভলবার বের করে বললাম,—এই যে আরো ভয়ঙ্কর একটা জিনিষ যা আমার অনেক কিছু সাহায্য করে। সে একটু চমকে উঠে বলল—এ তোমার ভীষণ বাড়াবাড়ি। দেখি কি রকম। আমি তার হাতে দিতেই সে ছুটে চলে গেলো এবং একটু পরে শূন্য হাতে ফিরে এসে বলল,—এ অস্ত্র আর পাবে না।

আমি একদিকে যেমন স্বস্তি পেলাম এই ভেবে, যে আমি আজ মুক্তি পেয়েছি, এবার আর কোনো ভয় নেই, অল্প দিকে অবাক হলাম এই ভেবে যে, যার সাথে আমার পথের আলাপ ভিন্ন অল্প কোনো সম্পর্ক নেই তাকে আমি এত বিশ্বাস করি কি করে—বিশেষতঃ সে স্ত্রীলোক। আর সেই বা কি করে আমাকে এ ভাবে বাধ্য করে ফেলছে!

সেদিন ছিল রবিবার। আমি আর অশ্রু অশ্রুদের বাগানে বসে গল্প করছি, বাড়ীতে আর কেউ নেই, সবাই কোথার নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছে, অশ্রু যার নি—তার কি অসুখ হয়েছে।

আমার মনে হল নরেশ্বরের সঙ্গে ওদের কি সম্পর্ক এত দিন তো জানতেও চাইনি জানতেও পারিও নাই। তাই ‘অশ্রু’কে সে প্রশ্ন জিজ্ঞাস করলাম।

‘অশ্রু’ বলল—ওদের বাড়ী বর্ধমান। এখান থেকে আমরা যেদিন সিমলা বাই, সেদিন সেও আমাদের এক গাড়ীতেই ছিল। তার আমাদের সেদিন থেকে পরিচয়। তারপর আমরা এখানে চলে এলাম, বাবা তাকে এখানে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বসেছেন, সে এসে দেখা করেছে কিন্তু তার মতলব ভারী অস্বাভাবিক। আমি তার হাবভাবে বুঝছি সে কি আশায় আমাদের সঙ্গে এত মেশে। আমি কিন্তু তাকে আমার বড় ভাইয়ের মতনই ভালোবাসি, পেতে চাই। আমি মা বাবার মনের কথাও স্তন্যভেদ পেয়েছি—তাদেরও কিন্তু তারই সঙ্গে একমত। আমার মোটেই মত নেই, আমি কিছুতেই একমত হতে পারব না ওদের সঙ্গে। বুঝতে পারছ হরত কি বললাম?

আমি বুঝেও ছুটামি করলাম—না, অত ব্যক্তি কি আমার আছে যে না বুঝিয়ে—চোখে আব্দুল দিয়ে না দেখালেও বুঝতে পারি?

সে একটু বিরক্তিতে বলল—জানি রাখ। আমি আর বুঝতে পারব না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা, তুমি একমত হতে পারছনা কেন? আমি কিন্তু তোমাদের—

—বাও, কি যে বল? যার তার সঙ্গে নিজকে একত্র করে দিলেই হল আর কি? তুমি কি বুঝনা যে, যে শত্রুর হাতে মেয়েদের ফেলে পালাতে চেষ্টা করে সে আবার একটা মাদ্রাস? আমি আবার তাকে—

এখানেই থেমে গিয়ে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল এবং মাথা নীচু করল। কতকক্ষণ চুপ করে থেকে আমাকে বলল—আচ্ছা, বলতো, মেয়েদের বেলায় এত অবিচার কেন? ছেলেরা আমাদের মতো জিনিসের মতো বাচাই করে নিতে পারবে, আমাদের দ্বারা ওদের কত রকমের ভোগের নৈবেদ্য সাজানো যাবে। তা দেখে নেবে আর আমরা কি কিছুই দেখতে পারব না? আমাদেরও কি একটা ইচ্ছা করেনা যে—

এমন সময় খানসাহা এসে জিজ্ঞেস করল চা কি এখানেই নিয়ে আসবে না ঘরে দেবে? কাজেই তার কথায় বাধা পড়ল। সে এখানেই সব বন্দোবস্ত করতে বলল। চা পান করতে করতে আবার সে বলতে লাগল—

আমাদের কি এতটুকু ইচ্ছা হয় না যে জীবনে কি পেলে সুখী হতে পারব? বা বাবা কেন সেটুকু দেখে দেন না? অবশ্য তাঁরা তার যথেষ্ট চেষ্টা পান—কিন্তু তা সম্পূর্ণ রকমে করতে পারেন না। মেয়েদের থেকে মত নেওয়া মা বাবার অবশ্য কর্তব্য যেমন করে ছেলেরদের থেকে নেন। আমি কিছুতেই আমার মনের বিরুদ্ধে যেতে পারব না। আমার মন যাকে চায়, আমার প্রাণ যার সঙ্গে পেতে চায় আমি তাকেই চাইব, অন্যকে কি করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রেরণ দেব? ঠিক এই সময় পাশের বাড়ী থেকে একটা মেয়ে গেয়ে উঠল—

আমার পরাণ বাহা চায়

তুমি তাই তুমি তাই গো।

তুমি ছাড়া শোর এ জগতে আর

কেহ নাই, কেহ নাই গো।

আমরা দুজনই শুদ্ধ হয়ে গান শুনে লাগলাম। গান যখন থেমে গেলো তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, তুমি একে কেমন ভাব? যেমন আমাদের বিয়েতে। মেয়ে চেনেনা ছেলেকে—ছেলেও চেনে না মেয়েকে। কেউ কারো চরিত্র জানে না, রং জানে না—তার বিষয়ে কোনো কিছু জানে না। অথচ তাদের মিলতেই হবে। বিয়ের পর এরা কি তেমনই করে মিলতে পারে? কখনই না। জোড় করে মিশানো ভালবাসা কি কখনো সুখ আনতে পারে? যদি পথ থাকত, তবে কখনও এমন মিলন হতে পারত না, পথ নেই বলেই আর কোনো উপায় নেই বলেই জোড় করে ভালোবাসা দেয়। আমার কিন্তু মোটেই তা ভালো ঠেকে না। ছেলে কি মেয়ে দু-জনেই দুজনে বেছে নিক নিজদের সারা জীবনের সহচরকে। বেছে না নিলে কি সুখ হয় বা হতে পারে?

—আমায়ও একথা মাঝে মাঝে মনে হয় বটে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত তো করি নি কোনো দিন? তবে তুমি যা বল্চ, আমিও সেই মতই দিচ্ছি। আমিও একে একটা কুসংস্কার না বলে পারছি না। আমার মতে ছেলেরদের বড়টুকু অধিকার দেওয়া হয়, মেয়েদেরও সেটুকু দেওয়া উচিত। তা হলে কোনো রকমে এদের মনের কোনো স্থানেই অমিল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ইঠাৎ কার ডাকে কথা থেমে গেলো। ফিরে চেয়ে দেখি ‘লীলা’ দাঁড়িয়ে। সে বললে, আমাদের বতীন বাবু ডাকছেন। চলে গেলাম

(তিন)

তারপর এক দিন আমাকে বতীন বাবুর এবং বাড়ীর সকলের অহুযোগে তাদের সঙ্গে পুরী আসতে হল। পুরী এসেছি মাত্র দুই দিন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা সবাই বারান্দায় বসে গল্প করছি এরই মধ্যে দেখি নরেশ বাবু এসে দরজায় দাঁড়িয়েছেন। তার আসার একটু যেমন অবাক হলাম তেমন আবার তার জন্তে একটু দুঃখও হল। সে তবে বুঝেই আশা নিয়ে অশ্রুর পেছনে চুটে চলেছে, অথচ অশ্রু

তার দিকে কিয়েও চাচ্ছে না। আগে যদি বা তার সঙ্গে বেড়াত, একত্র আলাপ করত, আজকাল আর তাও নেই।

আমি দেখছি যতই তার আমার দেখাশুনা বেশী হচ্ছে নরেশবাবু ততই বাদ পরে যাচ্ছেন। অশ্রু আমার খুব বেশী সঙ্গপ্রিয় হয়ে পড়েছে। আমাকে ছাড়া সে কোথাও নড়তে চায় না। তারই অল্পরোধে তার মা বাবা আমাকে অল্পরোধে ফেলে এখানে নিয়ে এসেছেন।

নরেশ যেইমাত্র এলো, অমনি অশ্রু আমাকে বলল—  
চল একটু বেড়িয়ে আসি। আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে।

মেরের মাথা ধরেছে শুনে অশ্রুর মা একটু ব্যস্ত হয়েই বললেন—মাও তো বাবা, ওকে নিয়ে একটু ঘুরে এস ততক্ষণ নরেশ আমাদের এখানে থাকুক।

আমি চলে এলাম। অশ্রু আমার পাশে পাশে যাচ্ছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে এবং পৃথিবীর গায় তার সমস্ত কিরণ নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে। আজই প্রথম আমার চোখে ঠেকল অশ্রু কত সুন্দর! এমন শোভা কি মানুষের কখনও সম্ভব! আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম এবং আমার অজ্ঞাতে তার হাত চেপে ধরলাম।

সে কোনো আপত্তি করল না বরং, আরো গা ঘেসে আমার সঙ্গে সঙ্গে হেটে চলেছিল।

কতকক্ষণ অমনি চুপচাপ কেটেছে, জানিনে হঠাৎ সে তার মাথাটা আমার বুকে রেখে ফুলেফুলে কেঁদে উঠল। আমি থমকে দাঁড়লাম। তখনই আমার চমক ভেঙে গেলো। এ কি।

সেই মুহূর্তেই সে আর্জকণ্ঠে বলে উঠল,—আজ তারা সাক্ষী করে—আকাশের দেবতা সাক্ষী করে—সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা সাক্ষী করে বলছি, আমি তোমাকেই চাই। আমার প্রিয়তম,—বল তুমি আমার হবে? আমাকে আমার জীবনে সার্থক করার অধিকার দেবে? আমি এতদিন যে এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করেই বসেছিলাম, আজ যদি সে অবসর হল, তবে একে হেলার হারান কেন? বল, চুপ করে থেকো না?

মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে বিজ্রোহ করে উঠল। ছিঃ! তা হলে যে আরেকটি প্রাণ অকালে নষ্ট হয়ে

যাবে? না না, তা হতে পারে না। আমি অত নির্ভর হতে পারব না। কিন্তু যদি অশ্রুকে বার্থ করি সে যদি তারপর আত্মহত্যা করে, তবে এর মরণের ভয়ে দারী থাকবে কে?—আমি। সত্যিই আমি।

—চুপ করে আছ যে? বল, আমার হেলা করবে না!

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, বললাম—  
তোমার কলিজা খান্ খান্ করে কেটে রক্ত রাঙা হাতে চলে যাওয়া আমার ইচ্ছা নয়, কিন্তু তা না হলেও যে তোমার প্রার্থনা পূরণ করতে পারব তাও তো মনে হয় না? আমি তবে দেখেছি নরেশবাবু তোমার আশায় দিন রাত ঘুরে ফিরছেন। তোমাকে না পেলে যে তার জীবন বার্থ হয়ে যাবে?

—আর আমি কি বার্থ হব না? আমি যদি বার্থ হই তবে কি নিয়ে বাঁচব? আমার দিকে কি তুমি তাহলে ফিরে চাইবে না? নির্ভর! আমার বুকের উপর দিয়ে হেটে যেতে তোমার এতটুকু বাঁধল না? তোমার কঠোর পদাঘাত যে আমার মৃত্যুর দ্বারে এনে পৌঁছিয়েছে? আমি মরতে বসেছি!

—ভুল করো না অশ্রু! আমি তার কাছে কি দাঁড়াতে পারি? সে ধন-মানঐশ্বর্যে, জ্ঞানে, সর্ববিষয়ে আমার কত উচে। তার কাছে গেলে তুমি কত সুখী হবে? আর—

—চাই না-চাই না আমি ধনমানঐশ্বর্য? তোমায় যা আছে তাই আমি চাই, এতেই আমি সুখী হব। যদি সে অধিকার না দাও আমি তোমার কাছ থেকে পাওয়া 'রিভলবারের' সাহায্যে মরতে তো পারব? সে সুযোগটুকু তো আমার নিষেধ। বেশ তাই হবে, আমি তাই করব।

সর্বনাশ! ধানিকঙ্কণের অস্ত্রে কেঁপে উঠলাম। তার হাতে চেপে ধরলাম, বললাম ছিঃ! ও কি রকম বাসনা তোমার? এ জীবন কি অত সহজেই নষ্ট করতে আছে?

—তবে বল, তুমি আমার হবে?

—আচ্ছা তাই হবে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব যাতে তোমার সুখী করতে পারি। ভগবান যেন আমার সে শক্তি দেন।

এই কথা বলতেই সে আমার তার ছই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে, এমন সময় নরেশ বাবু ডাকলেন—  
অশ্রু, তোমার একটু সময় হবে? আমার একটু দরকার আছে।

সে ফিরে বলল—এখন এখানে সময় হবে না। বাড়ীতে দেখা করবেন।

—সে সুবিধা আমার হবে না। এতটুকু অবসর কি তোমার নেই, অশ্রু?

—আমি আর কতকক্ষণ থাকব? তারপর তুমি—

—আচ্ছা বলুন কি বলতে চান?

—একটু এদিকে এস। আমি আমার শেষ নিবেদন তোমার পায়ে জানাতে এসেছি।

আমি দাঁড়িয়ে ঐ অতল জলধির আর উনার আকাশের চুমোচুমি দেখছিলাম। কতকক্ষণ এভাবে বিহ্বলের মতো—উদাসীর মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ অশ্রুর তীব্র কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম। তখন অশ্রু তাকে বলছিল—আমার বাক্যে ইচ্ছা ভালোবাস, আপনার ভাতে ক্ষতি কি? বান্ বান্, আপনি আর কোনোদিন আমার সামনে আসবেন না। আমি আপনাকে আর সামনে দেখতে চাই না। এই বলে সে চলে এলো। নরেশবাবু টলতে টলতে কোনো রকমে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমরাও ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে এলাম।

এসে আমি আমার ঘরের দিকে যাচ্ছি এমন সময় পিয়ার ডাকল—বীরেন্দ্র বাবুকা জরুরী তার হায়!

তাড়াতাড়ি কাপ্তে কাপ্তে এলাম। বাঙ্গালীর ‘তার’ খুব সুখ সংবাদ অথবা দুঃখের সংবাদ ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই বহন করে না। কোনো রকমে নামটা সহ্য করে, খুলে দেখি বাবা পীড়িত, শীগগীর যেতে লিখেছেন। বসে পড়লাম। আমার ফুলে ফুলে কান্না আসছিল। কি জামি, বাবা হস্ত বেঁচে নেই।

সেইদিনই রাত্তিরে গোঁহাটী রওনা হলাম। একমাস ঐকান্তিক চেষ্টা করেও তাঁকে রাখতে পারলাম না। বাবার ঔর্দ্ধৈহিক ক্রিয়া হয়ে গেলো। কলকাতা ফিরে যাব ধাব ভাবটি এরই মধ্যে বা আমার পীড়িত হলেন। বাবার

শোক তাঁর কাল হল। তেরোদিন অরে ভুগে আমাদের আধারে ঢেলে চলে গেলেন। আমি আবার একমাসের জন্তে আটকে গেলাম।

ছই ছইটা যা খেয়ে এবং হবিষ্যায় বেয়ে বেয়ে আমারও শরীর ভেঙে পড়ল। একদিন সত্যি সত্যি আমারও অসুখ হয়ে পড়ল। কোনো রকমে দেড়মাস পরে আমি উঠে দাঁড়ালাম। এই কয়মাসে অশ্রুর কাছ থেকে মাত্র একখানা চিঠি পেয়েছি। আমি কিন্তু একটাও দিতে পারিনি। তার নির্ভরতা আমাকে আঘাত করল।

আরো ছইমাস পরে যখন কলকাতা ফিরে এলাম, তখন শুন্লাম, তারা তখনও ফিরেনি। পুরী চিঠি দিলাম, কোনো জবাব নেই। তারপর একদিন সত্যিই পুরী চলে এলাম। দেখি বাড়ীতে আরেকজন বাবু ভাড়াটীয়া। আমি একেবারে ভেঙে পড়লাম।

এই বুঝি ভালোবাসা? আমার সাড়াটা বুক জুড়ে বসে আজ নিজে দূরে সরে বসেছ? ছিঃ! এই না তুমি কত ভালোবাসা দেখিয়েছিলে? আমাকে না পেলে মরবে বলেছিলে? কই তোমার সে প্রতিজ্ঞা!

আর ভাবতেও পারলাম না, কারণ তখনই আমাকে আবার কলকাতা ফিরে যেতে হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি টিকিট কিনে গাড়ীতে হুকতে যাচ্ছি একি এ? একজন বাঙ্গালী সাহেবের পাশে অশ্রু বসে, আর সে সাহেবটি তাকে চুমো খেতে উত্তত।

আর পারলাম না দাঁড়িয়ে থাকতে। মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। তারপর যখন জ্ঞান হল দেখলাম, আমি হাঁসপাতালে পড়ে আছি।

সেইদিনই পালিয়ে চলে এলাম।

তারপর তিন তিনটি বছর আমি কত দেশ, কত পাঠাড়, কত বন জঙ্গল ঘুরে যেদিন আবার শেষ পুরীতে এসেছি, সেদিন আবার সন্ধ্যায় আমার বুকটা হায় হায় করে কেঁদে উঠল। ঠিক সেই জায়গাটিতে বসে আছি যেখান তার আমার প্রথম মিলন হয়েছিল, সাক্ষী আকাশের দেবতা আর নক্ষত্রপুঞ্জ। ঠিক সেই সময়ে কে একজন বাঁশীতে গেয়ে উঠে:



বন্ধু আমার! থেকে থেকে  
কোন স্নহের বিজন পুরে  
ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে।  
আমার অনেকদিনের পথের বাসা  
বারে বারে ঝড়ে উড়ে  
পথহারা তাই বেড়াই ঘুরে।

লাগল সে কান্না। আমার প্রাণের মাঝে  
সে কান্না কি তুমুল সংগ্রাম বাধিয়ে দিলো। নিজের উপর  
কেমন একটা শিকার এলো। ভুবে মরব বলে সমুদ্রে ঝাপ  
দিলুম। মরতে পারলাম না, কে আমাকে উঠাল বলে মনে  
হল, তারপর আর কিছু জানিনে।

বেদিন আবার চোখ খুললাম, দেখি, আমি জেল  
হাসপাতালে। সুস্থ হয়ে উঠেছি, আমার বিচার হল।  
আমি বললাম যে আমি মরতেই চেয়েছিলাম। তাই জেল  
হল। জুরীরা সব মত দিল যে আমাকে পাগলা গারদেই  
রাখা হবে। এতদিন নানা জেল ঘুরে তো এখানে এসেছি  
এবং এখানে এসে তোমাদের পেয়েছি।”

‘মলিনা’ ততক্ষণে ঘুমিয়ে পরেছে। তার এ মর্মস্পর্শী  
আত্মকাহিনী শুনে শুনে এতই বিস্ময়-স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম  
যে, নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে বলে উঠলাম ‘পৃথিবীতে  
এমনটিও হতে পারে!’

‘শুভা’ পর্দার আড়ালে বসেছিল। সে কঁাদ কঁাদস্বরে  
তার সামনে এসে বলল—ভর কি ঠাকুর পো! এইতো  
ভালবাসার সুখ। এই ব্যর্থতা পেয়েছ বলেই তো জগতকে  
চিন্তে পেরেছ, নইলে তুমি আধারেই থাকতে।

সে কোনো জবাব দিলে না। ক্রমাগত চোক মুছে  
আমাকে এবং শুভাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল এবং  
বাঙরার পথে মলিনাকে ঘুমের মাঝেই একটা চুষন করল  
এবং খানিকক্ষণ তারদিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে তার  
কুঠরীর দিকে চলে গেলো।

পরদিন তো আর এলো না। আমি খবর নিয়ে  
জানলাম, সে চূপ করে বসে বসে কি ভাবছে। তার  
কাছে গেলাম, কত অনুরোধ করলাম, কিছুতেই সে এলো  
না।

এমনি করে কিছুদিন যায়, একদিন সকাল বেলা ঘুম  
থেকে না উঠতেই ‘শুভা’ এসে জানাল যে কে একজন  
প্রহরী শীগগীর যেতে ডাকছে। আমি ত্রস্তব্যস্তে ছুটে  
গেলাম। ‘শুভা’ দ্বিতলের উপরের জানালা খুলে তাকিয়ে  
রইল। গিয়ে দেখলাম, লোহার মোটা মোটা শিকের  
মধ্যে কাপড় বেঁধে ফাঁসি দিয়েছে—সে আমাদের বীরেন।

আমি আর দেখতে পারলাম না। কাপড়ের আঁচলে  
চোখ মুছে বাড়ী চলে এলাম। এরই মধ্যে আমার পিসতুত  
বোন ‘অমির’ এবং তার দেবর ‘শচীন’ এলো। আমাদের  
বিষয় দেখে সে একটু চমকে গেলো। আমি তক্ষুনি তাকে  
আদর করে নিয়ে গেলুম। সে সমস্ত শুনে ‘বীরেন’কে  
দেখতে চাইল। কাছে গিয়ে তার দিকে চেয়েই দুই চোখে  
মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল।

ওগো আমি তোমার নিষ্ঠুর বলেছিলাম, কিন্তু আজ  
দেখছি তুমি তা নও।—তুমি দেবতা, সত্যি দেবতা  
আর আমি নরক, পিশাচ।

এ মর্মস্বন্দ কাহিনী আজ কোন্ অতীতের কোলে  
চলে পড়েছে, ‘বীরেন’ বা ‘অশ্রু’ কেউ বেঁচে নেই। বেঁচে  
আছি কেবল আমি আর ‘শুভা’! এখনও বীরেনের  
কথা একটা হৃৎস্পন্দে মতন সর্বদা আমার মনে পড়ে।  
‘শুভা’ও, তার জ্ঞান প্রায়ই হৃৎ করে, কিন্তু যার কোনো  
প্রতীকার নেই, তা নীরবে সহ্য করা ব্যতীত আর কি  
উপায় থাকতে পারে!



## সাময়িক সাহিত্য

ত্ৰিহেম চৌধুরী

বিগত ১৩৩৩ সনের মাঘ মাসের ভারতবর্ষে “অতি আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্যে” ত্ৰিঅমল চন্দ্র হোম মহাশয় তরুণ লেখকগণের পিঠে চাবুক বসাইতেছেন। হুঃখ হয়। দোষ কাহার নাই?

তাহার মতে “সতেরো বৎসরের ছেলে যেখানে পনেরো বৎসরের মেয়ের বয়সকেই লোভনীয় বলিয়া কামনা করিতেছে, সেখানে প্রেমের বিকার হয় নাই, একথা কে স্বীকার করিবে? অথচ এই বিকৃত, বিষহৃষ্ট, অস্বাস্থ্যকর প্রেমকে আশ্রয় করিয়াই তো অতি আধুনিক বাংলার কথা সাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হইতেছে।” “বিকৃত, বিষহৃষ্ট অস্বাস্থ্যকর প্রেম”—চমৎকার আবিষ্কার (!)। সতেরো বৎসরের ছেলের সঙ্গে পনেরো বৎসরের মেয়ের প্রেম হইল কোন্‌খামুটার? আমরা তো জানি, পচা মাছের গার গোলাপ গাছের গোড়ায় দিয়া জল ঢালিতে ঢালিতে গাছের জোর হয়—খুব ভাল বড় ফুল ফোটে—সৌরভ বাহির হয়। প্রেমও গোড়ার কামকে আশ্রয় করিয়াই বাড়িতে থাকে। তারপর প্রেমের সৌরভ। এই নিকট সত্যটাই যে অমল বাবু চাপিতে চাহিতেছেন, তাহা নহে,—উদ্দেশ্য শুধু তরুণদের জন্ম করা। তারা নাকি সংযমী লেখক নহেন। প্রবীণদের মধ্যেও তো অঙ্গীলতার ক্রটি দেখা যায়। নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় “শান্তি” লিখিয়া সমালোচকের নিকট খুব শান্তিই পাইয়াছিলেন। অগ্রিয় সত্য কেহ প্রকাশ করিতে পারিবে না বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলে তাহা টিকিবে কি?

“নারীরূপে একটা মোহ আছে সত্য, কিন্তু তাহা কি সর্বদাই লাগসায় পড়িল?” হাঁ, সর্বদাই লাগসায় পড়িল। লোভ ও মোহ বড়রিপুর গভীর মধ্যে—দুঃষ্ট। হোম মহাশয় অস্বীকার করেন কি? ছয়টা রিপুকে জয় করিয়া তাদের উপর যথাক্রমে ঐর্ষ্যা, বীর্ষ্য, যশ, সৌভাগ্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে বসাইতেই হইবে। মোহ সর্বদাই পড়িল। পক্ষ না থাকিলে পক্ষ ফুটিবে কাকে আশ্রয়

করিয়া? মোহ যখন থাকে না—মাহুয যখন মোহের বশীভূত না হয়, তখনই সে সৌভাগ্যবান।

“অধিক প্রয়োজনীয় হইতেছে পূর্বেই বলিয়াছি—স্বপ্ন দৃষ্টি ও স্বপ্নভীর অন্তর্দৃষ্টি।” কথাটা খাঁটি সত্য। ত্ৰিঅচিন্ত্য সেন মহাশয়ের “কল্লোলে” প্রকাশিত ‘শ্রীশ্রী’ গল্পে গয়লানীর মেয়ে “বেকী” বলে—“মুখে ঝাড়ু, যেটা দিয়ে পাছদ্বার কাটাই। তারপর মুখে কাপড় ঠাসে, আর হাসে।” “বেকী” ভোলে নাট যে, সে গয়লানীর মেয়ে, তাই মুখে ঝাড়ু মাথতে চার কৈবর্তের ছেলে ভোমুরাকে। অথচ ছেলে বেলায় ভালবাসা—মুখে কাপড় দিয়ে হাসে।

“হোকনা গয়লানীর মেয়ে—তবু তো মববোবনা।” গয়লানীর মেয়ে “জগতের সমস্ত মববোবনারই মতো।” মববোবনা হলেও কি কৈবর্তের ছেলেকেই বিবাহ করিতে হইবে? এরূপভাবে অসমীচীন। ইহা পাশ্চাত্য Idealism বলে মনে হয়। এখানে বাংলার সমাজের চিন্তকে ভাবে, ভাবনার ও সহানুভূতিতে অভিজুত করিয়া দেয় নাই বলিয়াই মনে হয়। ওরা কি International Alliance চালাইতে চাহেন?

বিগত পৌষের ‘বীণা’ পত্রিকার ত্ৰিপটীন সেন রায় লিখিত ‘যাবনা, যাবনা ঘরে’ একটা ছোট গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। রায় মহাশয় তাহার লেখায় Provincialism চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন, পরন্তু নূতন styleএর লেখার প্রচেষ্টা সৰ্ব্বদে তাহার মনস্তত্ত্ব কতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও একটু আলোচনা করিতে চেষ্টা করা বাউক।

Provincialism ভাল কি মন্দ সে সৰ্ব্বদে নিতাই গবেষণা চলিতেছে। একদল তাকে জবাই করিতে চেষ্টিত, পক্ষান্তরে styleটা আপনার বলে ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ব্যাকরণে “গোয়াল” শব্দের জী-লিঙ্গে “গোয়ালিনী” ব্যবহার চলিয়া আসিতেছিল কিন্তু ছেলেদের কোমণ্ড ব্যাকরণে “গয়লা”—“গয়লাবউ”কে প্রাদেশিক গভীর মধ্যেই দেখিয়াছি। সুতরাং রায় মহাশয়ের ‘খোটা’,

‘টব্গা,’ ‘ইন্স,’ ‘কাঠের কুটিতাক,’ কানুন, ১৩৩৩, ‘কল্লোলে’ অচিন্ত্য কুমার সেনের ‘কুপি,’ ‘ক্যা ক্যা কচ্ছে,’ ‘খাবার পর খাবরা,’ ‘এক দমক বৃষ্টি,’ ‘ঘরের হাঁইচে,’ এবং চৈত্রের মাসিক ‘কল্লোলে’ প্রবোধ কুমার সান্যালের ‘ছয় লাপ’ ইত্যাদি স্থানোপযোগী সন্দেহ নাই।

“বাইজীর গানেই যেন ওকে একদম জ্যান্ত করে দিয়ে ফেলে।” সুরের মোহিনী শক্তি। বনের হরিণ এবং সাপ সুরে বশীভূত হয়, নিতাইই বা আত্মহারা না হইবে কেন? নিতাইর প্রাণ সুরে ডুবে গেছে। তাই তন্ময়তার চূর্ণ করে আছে। প্রাণের কৃতজ্ঞতা মিটেছে—স্বাভী নক্ষত্রের এক ফোটা জল পেয়েই অতলে ডুবে গেছে।

গান থেমে গেল—তন্ময়তা কেটেগেল—আবার সেই পাড়া গেয়ে নিতাই বাইজীর আহ্বানে ভীত। আবার সরল সঙ্কোচ ভাব—“বোধ হয় যেতে পারবোনা।” “আমি যে পড়ি।” আবার বাইজীর মুখে—“নাচি গাই, তা বলে কি এত ঘেরা?” অর্থাৎ তুমি আমার সুরে আপনহারা হতে পার, কিন্তু আমাকে ঘৃণা করে আমার প্রাণের ঠাকুরকে তুমি কোন অধিকারে ঘৃণা করতে পার? একথায় নিতাই অপ্রতিভ। “একটা কোচে দুজনেই একত্র বসল।” “তুমি আমার সাথে খাবে—তা না হলে খাবো না।” কথা শুনি বিসদৃশ ঠেকতে পারে, রুচিবিরুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু এখানে নিতাই আত্মহারা। প্রেম,—কামগন্ধ নাই।

তৃষ্ণা মাতৃঘের স্বাদ পাওয়ার জন্ত ব্যাকুল। তখনই নিতাইর মায়ের চিঠি চুপি চুপি পড়ে “মন বড় ভরানক ব্যাকুলিত হয়ে উঠল।” তার পরই অভিশপ্ত জীবনের প্রতি ঘৃণা—বিষ খাওয়া—সর্বস্ব নিতাইর চরণে সমর্পণ করিয়া “নুগু”। আত্মহত্যা মহাপাপ।

ডাংপিটে ছেলে নিশি, “পিতৃশূল বেদনার কাতরাচ্ছে” দেখে দয়া করে তুঝকে ঘরে নিয়ে গেল। পরের বোঝা বয়ে বেড়ান নিশির মত ছেলের পক্ষেই সম্ভব। এমন কেউ কেউ করেও। নবকুমারও সহযাত্রীর জন্ত কাঠ কুড়িয়ে আনতে গিয়ে কি বিপদ!—কপালকুণ্ডলার তার বইতে

হয়েছিল। তবুও পরের জন্ত কাঠ কুড়াইবেই। নিজের খাবারের সংস্থান নাই, তার উপরে তুঝি। “লজ্জার ধার ধারে না, সঙ্কোচের তোয়াক্কা রাখে না।” নতুন ঘর সংসার পাতাইয়া বেশ শান্তিতেই আছে। মাসিক পত্রিকা, চণ্ডীদাস, বন্ধিম, মাইকেল, দাস্তে, সেক্সপিয়ার, সেলিকে প্রাণের ভিতর আকড়াইয়া রাখিতে চায়। খোলার ঘরে তুঝি—নিশি, বন্ধিম সেলি (!) “এত কিসের লজ্জা! সেদিন তো গাইতে গাইতে নিতুর পঞ্জাবীর পকেটে পরসার জন্ত হাত চালিয়ে দেছিলি।” একেমন লজ্জা? রাত্তায় শ্রোতার উপর তুঝির এত জুলুম, ঘরে এসে চেনা মানুষ বলে কি এত লজ্জা (!)? রায় মশায় কি বলেন? নিশি বহু বড় বেয়াড়া। নিতাই গুর পিঠে ছুঁবা দিলে না কেন?

মাছুষের কচির অন্ত নাই। বাইজীর সঙ্গে স্কুলের ছেলের ভালবাসা সমাজের রুচিবিরুদ্ধ; কিন্তু তা বলে কি রুচি বাগীশেরা ভালবাসার পায়ে শিকল বেঁধে যথাতথ্য যাওয়ার দায় হতে এড়াতে পেরেছেন। প্রেমই চরম লক্ষ্য। যে বেঞ্চালয়ে কামেরই প্রভাব বেশী, সেখানে প্রেমের আশা খুবই কম। লেখক এরূপ চিত্র পাঠক পাঠিকার সম্মুখে না ধরিলেও পারেন। তবে গোবরেও পদ্ম কোটে। গঙ্গাজল চির পবিত্র।

হোম মহাশয় তরুণদের লেখার ভঙ্গী দেখিয়া নিরুৎসাহ হইয়াছেন। নিরুৎসাহের কি কারণ থাকিতে পারে? একমাত্র অভিযোগ—ইহাদের সংঘের অভাব। তাই “হবু তরুণদের” তিনি তখনই বরণ করিতেছেন। “নব জীবন” পত্রিকার ভাবার নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিল। বন্ধিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে ভাষার নগ্না মূর্ত্তীকে অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিল। যারা আজ সমালোচনার ক্ষেত্রে দাড়াইয়া নিন্দা করিতে উৎফুল্ল—লেখকদিগকে নিরুৎসাহ করিতে উৎসুক, তাহাদের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল। অগতের ক্রমোন্নতিই তো বৈশিষ্ট্য। নিন্দা না করিয়া গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখাই ঠিক নহে কি?

## ভোগের পরিপাক

### শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি, এ, ( সাদীর ভাবানুসরণে )

তরুণাথে পত্রতলে পাঁকিবারে দাঁও ফলে,  
ছিঁড়না ভরায়,  
ফলের পকতা সাধে বীজ যবে পুষ্ট হবে,  
ঝরবে ধরায়।

অদ্বিবে বিশাল তরু রসানবৈভবে তার।  
মিটুক ভূতলে  
শেষ বিন্দু ভোগ তৃষ্ণা সুপুষ্ট বৈরাগ্য বীজে  
চতুর্কর্গ ফলে।

## কমা কর যত অপরাধ

### শ্রীশচীন সেনরায়

ছায় ছোট্ট সহর-টা ; নাম শ্রীকেষ্টপুর। গোটা  
সহর-টাতে মোটে একটা মাত্র বড় রাস্তা আছে। তা'তে  
দেখী খুঁটান প্যারীমোহনের একটা বেশ ফ্যানসিওরাল  
চুলছাটার দোকান আছে।

বেশ উপার্জনও হচ্ছে ওতে।

তিরিশ বৎসর আগের কথা—

পরমাণিক প্যারীমোহনই তখন কিট্‌কাট বাবু  
ছোড়াদের কাছে চুল ছাটার অল্প খুবই আদর পেতো,  
কারণ সে' সময় তো আর নানা রকম সন্দের চুল-  
ছাটার নমুনাও ছিল না। লম্বা লম্বা চুলই রাখতো লোক।  
আর ব্যাটা-ছেলেরাও আস্তো চুল ছাটাতে কিম্বা দাড়ি  
কামাতেই। এখনকার মত তো তারা নানাপ্রকার সেন্সো  
পাউডার, গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার জানতো না। তাই আগের  
কালের নামজাদা পরমাণিকদেরও একেবারেই অকর্ষণ্য  
করে রেখেছে, তাসবেও প্যারীমোহনের কিন্তু বিশেষ কিছু  
কতি হয় নি। প্রায় সকল মেয়েরাই তার দোকানে এসে  
কেউবা 'ববু' করাতো, কেউবা সিম্পল করাতো, কেউবা  
আবার শরীরও টেগাতো।

মেরে মহলে কাজ করে প্যারীমোহনের ছেলে প্রশান্ত।  
ডাক নাম হারবার। সহরে খুব কাণামুসা চলে যে  
প্রশান্তর সুপ্রী মুখ খানার অল্পই নাকি এ মহলে খুব  
রোজগার। বড়িও ছোঁরা-ফ্রেশার হিসাবে সে খুবই জনপুণ,  
তবু ওটা কিন্তু এখন একেবারে টাপাই পড়ে।

প্রবাদ একেবারে ভিত্তিহীন হয় না ; সত্যের একটু  
আধটু আভাস তাতে থাকে। তা' নৈলে সহরের সব চৌত্ত  
চৌত্ত মেয়েরাই বা প্রিয়দর্শন প্রশান্তর কাছে এসে গল্প  
টেল করতে এক সুখ পায় কেন ? সে জল্প ও বড় একটা  
বিশ্রাম পায় না—একজন বার আরেক জন আসে।

প্রশান্ত কিন্তু সুন্দরী যুবতীদেরও যেমন বহু নিয়ে বব  
করে, সিম্পল করে, পুরুষদের কামাতেও কম যত্ন  
নেয় না।—

এর একটা বিশেষ কারণ আছে। ওর প্রাণচালা  
স্নেহ প্রেম মমতা সব কিছু কে' তে হয়ে আছে কুন্তলার  
উপর।

অল্পময় তার দেহলতা, চুলের গুচ্ছটা নিকব কালো।  
হাসলে সামনের ঠাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে খুঁইফুলের আধ  
কোটা কুড়ির মতন।

কুন্তলা প্যারীমোহনের দোকানেই কাজ করে।  
সাম্নে একটা চেয়ারে বসে দিনের রোজগার গণে রাখে  
নিকটের ছোট্ট হাত বাস্কে।

প্রশান্ততে আর কুন্তলাতে বড়ই বেশী ভাব—স্বচ্ছ,  
পবিত্র, নির্মল - স্বরগার জলের মতন।

প্রশান্তর মনে করেকদিন আগের শোনা একটা  
কথা আগে—কুন্তলা তাকে নাকি হুনিয়ার লক্সাইর চেয়ে  
ভয়ানক বেশী ভালবাসে। মনে করে সারা প্রাণটা খুসীতে  
ভরে উঠে। কিন্তু তখন তখনই সে খুসী কোথায় লুকিয়ে

যার, বধন ওর মনে আসে যে কুন্তলাকে তো সে প্রাণভরে পাবে না, কারণ কুন্তলা নাকি সন্ততি তাকে বিয়ে করতে গররাণী।

দোকানে' আর কেউ নেই।

প্রশান্ত আর কুন্তলা।

তখন প্রশান্তকে কুন্তলা বলে,—আমার বয়স প্রায় উন্নীশ কুড়ি হলো, আর তুমিও আমার চেয়ে গোটা কতক বৎসরের বড়। আমরা তো এখন বুঝতে পারি জীবনটা কি রকম। যা আমরা এখানে রোজগার করি, তা এক রকম কিছুই না। তাই আমি স্থায়ীভাবে এখানে থাকবো না। একটা ভাল রকম কিছু বোগাড় করতে পারলেই এটা ছেড়ে দেব।

প্রশান্ত স্বধোয়,—তাতে ত্রীকেটপুরের অপরাধ? ব্যবসাটাও তো বেশ সুন্দর চলছে আর তুমি বোধ হয় জান, বাবা ও আমাদের হুঁজনের বিয়ে দিয়েই অবসর নেবেন। তখন তো আমাদের হুঁজনেরই সব হবে।

তুনে কুন্তলা একটু বিরক্ত হয়ে যায়, বলে,—আঃ! তোমার ঐ এক কথা শুনে শুনে কাণ আমার ঝালাপালা হয়ে গেল। আচ্ছা, তোমার কি কোন উচ্চ আশাও নেই! তুমি কী এমন করে কামিয়ে আর চুল ছেঁটেই জীবনটা পরপাত করবে? হ্যাঃ!

—এ ছাড়া আর কী করতে পারি, লক্ষীটা?

—অন্ত কিছু করতে পারবে কিনা জানিনে। আমার কথা বলি আমি কিন্তু এ সহরে আর থাকছি নে।

তারপরে কিছু দিন কাটে।—

হরতো পুরো একটা মাসই।

কুন্তলা ও তার ছোট্ট হাতবান্ন নিরে বসে আছে; নিরবিতরূপে কাজ করে যায়। তা বেখে প্রশান্ত মনে করেছিল কুন্তলা বুঝি ত্রীকেটপুর ছাড়বার আশা ছেড়ে

দিয়েছে। তা কিন্তু না—এপর্যন্ত সে জেলার সহরে কোন কাজই জুটাতে পারে নি।

সে দিন রাতে প্রশান্ত কুন্তলাকে এগিয়ে দিতে তার বাড়ীর দরজা পর্যন্ত গেল। পরে সেখান থেকে বিদায় নেবার কালে কুন্তলা বলে,—কাল আমি এখান থেকে চলে যাব।

তুনে যেন সারা আকাশটা তার মাথার ভেঙ্গে পড়লো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—তার মানে? কুন্তলা উত্তর করলে—তার মানে আমি সাড়ে দশটার ট্রেনে কালই যাব। বুঝলে?

প্রশান্ত ওর মত ঘেরাবার জন্তে অনেক চেষ্টা করে। ফল হয় না কিছুই।

উত্তরে খালি কুন্তলা বলে—যা স্থির করে ফেলেছি, তাকি আর ফেরাতে পারি? বাক, তোমার বাবাকে বলো, তিনি যেন কিছু মনে না করেন। প্রায় একমাস হ'লো ওঁকে আমি একথা জানিয়েছিলুম। তবু কাল সকালে একবার গিয়ে বলে আসব।

স্বকোমল হাত জোড়া তুলে কপালে নৈশনমস্কার জানায়।

এ ছোট্ট খাট বিদায়টাই প্রশান্তকে অভিজ্ঞত করে।

পরদিন সকালে—

প্রশান্ত দোকানে ঢুকেই দেখতে পার কুন্তলাকে রোজের জায়গারই বসে আছে। পুঙ্খিত অন্তরে স্তম্ভভাত জানাল, পরে কি ভেবে যেন একটু মুচ্কি হাসি হাসলে।

প্রশান্ত তার সাদা কামাবার জামাটা গায়ে পরে এগিয়ে যায় একজন ভদ্রলোককে কামাবার জন্তে।

কিছুক্ষণ বাদে সে হঠাৎ চমকে ওঠে, শোনে কুন্তলা বলচে—কাকাবাবু, এখন তবে আসি।

প্রশান্তর বাবা কুন্তলার কাছে গেল, দেখে সে জামা-টামা পরে একেবারে স্তম্ভত। পরে সে একটা হুঃখপূর্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলে—কুন্ত! সত্যি আমি বড়ই হুঃখিত। কিন্তু তুমি বধন বলচো যে মন একেবারে স্থির করছে, তখন আর বাধা দেবোনা। আমি প্রার্থনা করি তুমি দোভাগ্য-শালিনী হও এবং যে পর্যন্ত আমি না তুনবো যে তুমি

ভাল স্থানে দৃকেছ, সে পর্যন্ত আমি তোমার স্থানে অল্প লোক নেব না।

প্রশান্ত আর থাকতে পারে না। কণেকের অল্প সে খরিকার ছেড়ে কুস্তলার কাছে এলো।

বল্লে—কুস্ত! আবারও বলি, তুমি যেও না। তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না।

—হারবার, কাল রাতেই তো তোমার সব বলেছি, তোমাকে যেখন নাকি আমি নাড়াতে পারি নি—তুমিও আমাকে পারবে না।

—ওহোঃ! সে কথা! আচ্ছা, দেখাও তো এ সহরে আমার মত পরামানিক আর কে আছে, নয় কি?

—আচ্ছা বেশ! বগড়া করে আর দরকার নেই। এই যে আমার অল্প ঘোড়গাড়ী এসেছে—আসি তবে, মঙ্গল কামনা ক'রো।

কুস্তলা তার বিছানাপত্র ও স্ট্রটকেশ ঘোড়গাড়ীতে টাঙ্গিয়ে দিলে। শেষে বেরিয়ে পড়লো দোকান হ'তে তাড়াতাড়ি, পাছে প্রশান্ত আবার কিছু ব'লে ক'রে বাধা দেয়।

সকাল বেলাটা তাদের বড়ই ব্যস্ততার মধ্যেই কেটেছে। চপ্পর না হওয়া পর্যন্ত প্রশান্ত একটুও সময় পায় নি তার বাবার সাথে কথা বলতে। কুস্তলার অনর্শন প্রশান্ত বড়ই অসুস্থ ব'লে। শূন্য অন্তর কেবল বার বার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে। কোন কাজেই মন ঠিক স্থির তাতে বসাতে পারে না।

ও ভেবে ভেবে হরহাণ হর, কিছুই ঠিক করতে পারে না। তার এখানে বন্ধ হয়ে থেকে জীবন কাটিয়ে দেওয়াটা কি ভাল? পরিষ্কার বুঝতে পারে যে কুস্তলা একটা বিরূপ ভাব তার উপর পোষণ করছে, শুধু এ অল্পই সুন্দর চলতি ব্যবসায়ী ছেড়ে দিয়ে নতনের দিকে ঝাপ দেওয়া কি উচিত হবে? কিন্তু কুস্তলা ছাড়া তার জীবন বড় শুষ্ক—অসাড় হয়ে যায়।

প্রায় দু'পক্ষের বেশী হয়েছে কুস্তলা এখান থেকে চলে গেছে!—

সেদিন একজন উচুদরের মহিলা এলো প্যারীমোহনের দোকানে।

মহিলাটা এ সহরে মটরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্যারীমোহনের দোকানের কাছে আসতেই তার গাড়ী বিকল হ'লো।

মহা মুন্সিল! কি করবে ভাবছিল। সহসা সে প্রশান্তকে দেখতে পেলো—সে একটা বালিকার চুল সিজেল করছে।

মহিলা তার সাধীর দিকে চেয়ে বল্লে—বাঃ! লোকটা তো বেশ চুল সাজ গোজ করতে জানে। আমারও ইচ্ছে করছে ওকে দিয়ে চুল ড্রেস করাই।

তারা দু'জনেই দেখতে লেগেছে প্রশান্তকে চুপে চুপে। ওর কাজ শেষ হলেই তারা দোকানে ঢুকলো।

খুব জাকজমক-ওয়ালা এক মহিলাকে দোকানে আসতে দেখে প্যারীমোহন ত্রস্তপদে তাদের কাছে এগিয়ে গেল। বুড়াকে সামনে রেখে মহিলা তাড়াতাড়ি অবজ্ঞাভরে মুখ চোক ফিরিয়ে নিল। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে যুবক প্রশান্তর সুন্দর কচি মুখখানির দিকে চেয়ে রইল। তারপর মহিলাটা তাকিলোর সুরে বুড়াকে বল্লে—তোমার দরকার নেই। ওই যুবককে আসতে বল—চুল ছাটাবে।

প্যারীমোহনের একটু আনন্দও হয়, আবার হুঃখও হয়।—

মনে ভাবলো—সত্যিইতো সেকলে ধরণ এদের পছন্দই বা হবে কেন?

প্রশান্ত যখন মহিলার চুল ড্রেস করতে ব্যস্ত, তখন মহিলাও তার সাথে আস্তে আস্তে গল্প করছিল। চুল ড্রেস করা শেষ হলে তিনি বড়ই আনন্দিতা হলেন।

বল্লে—সত্যি তুমি কিন্তু ভারী গুণবান! আগে হয়ত আমার চুল এত সুন্দর দেখাতো না। তোমার এমন গুণ—তুমি কেন হে মিছামিছি এখানে সময় নষ্ট করছো? একটা বড় সহরে গিয়ে beauty parlour খুলে বস না? অনেক বেশী রোজগার হবে। প্রশান্ত উত্তর করলো—আজ প্রায় দিন চৌদ্দ পনর বাবং সহরে বাবার সঙ্গে অনেক কিছু ভাবছি।

—‘যদি যাও-ই তা হ'লে আমার সাথে দেখা করো; আমি তোমাকে সাহায্য করতে রাজি আছি’। একটু

ধেমে—‘এই আমার কার্ড’, বলেই প্রশান্তের হাতে ভিজিটিং কার্ড দিলে।

প্রশান্ত সামরে গ্রহণ করে। কিছুক্ষণ ওটার দিকে নির্ণিমেষ চোখে চায়। দেখতে দেখতে কার্ডের লেখাগুলো যেন সব উরে গেল কোথায়। তার বদলে ভেসে ওঠে কুস্তলার অনিন্দ্য-স্বন্দর মুখখানা আর চল চল স্বকোমল চোক দুটী। তখনও যেন প্রশান্ত দেখে কুস্তলার চোখে মুখে কেবল একই কথা,—দেখ ওগো, অন্ততঃ একটা বারের জন্তও পরীক্ষা করে দেখ। আমিও এখানে আছি।

সন্ধ্যা উৎরে গেল।

দোকান একটু নিরিবিচলি হয়। প্রশান্ত বলে—‘বাবা, তুমি বোধ হয় ওর সব কথা শুনেছ, না?’

তবে প্যারীমোহন খালি উদাসীন ভাবে মাথাটানাড়লে।

—দেখ, বাবা, আমার ছেড়ে তুই বাসনে?’ ডঃখ-মাথা সুরে প্যারী সুরধোর।

—বাবা, আমি সে কথা কখনও মনে করি নি; কিন্তু কুস্ত যে চলে গেল। আরও এক কথা টাকা পরগা উপার্জনই যখন জীবনের উদ্যোগ, তখন সহরেই যাওয়া ভাল। খুব উপার্জন হবে। তাই অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম, সহরেই যাব। তুমি এখানে দোকান চালাবে। যদি লোকসান দেই, তবে আবার চলে আসবো। আর লাভ হলে এ দোকান বিক্রী করে কেলব।

—কতকটা ঠিকই বলেছি; কিন্তু আমার মনে হয় আমরা বেশ সুখশান্তিতেই আছি। আর আমারও দিন দিন শরীর ভেঙ্গে পড়চে।...

দিন দুই পরে—

প্রশান্ত এ সহর ছেড়ে বাবার কালে তার বাবা তাকে নিজে যে ক্ষুর দিয়ে কামাত তা দিয়ে দিলে। বলে—অবশ্য তুমি নতুন লাইম ধরবে, এ ক্ষুর তোমার কোন কাজে আসবে না আমি; তবু তোমাকে দিলাম, কারণ এটা সব সময়ই তোমার বুড়ো বাবার কথা মনে করিয়ে দিবে।

আর বলতে পারে না, ছু চোখ সজল হয়ে আসে।

নতুন সহর।

কেউ চেনে না প্রশান্তকে।

এত বড় সহর, লোকের এত ভীড়—তবু যেন ওর কাছে ভয়ানক নিরালা ঠেকে।

প্রশান্ত স্নানর মধ্যে একটা পোষাক তৈয়ারী করে নিয়ে ঐ মহিলার সাথে দেখা করতে যায়।

মহিলা কিন্তু প্রশান্তকে আদর আপ্যায়ন দেখাতে একটুও কার্পণ্য করে নি। বরং তিনি নিজে যেটেই বলেন—‘আমার বোধ হয় আমি তোমাকে একটা ছাঁট দিয়ে দিতে সাহায্য করবো। একটু অপেক্ষা কর’ বলেই তিনি তিনি তাড়াতাড়ি একটা নম্বর বের করে ফোন করলেন।

‘আমি সুলীলা দত্ত।’

‘ওহোঃ! মিস্ দত্ত। আচ্ছা বলুন তো কি দরকার আপনার?’

‘আমার হাতে একজন স্নানক পরামণিক আছে। যদি অনুগ্রহ করে তাকে একটা স্থান করে দিন, তবে বড়ই অনুগ্রহীতা হ’ব। মাইরি বলছি, লোকটা যে কত স্নানক ও স্নানিগুণ তা আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন। আপনার খুব কাজে আসবে। তবে একুনিই থাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেই—কেমন?’

সুলীলা দত্ত যখন ফোনে কথা বলছিল প্রশান্ত কিন্তু তখন ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিল। তার সাথের স্বপ্ন-পুরী যেন ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল এক মুহুর্তে। বা একবার ছেড়ে দিয়ে এসেছে তাই যে আবার তার বরাতে জুটে যাচ্ছে।

—দীরেন লীল খুব ভাল লোক। ওর একটা ‘হেয়ার ড্রেসিং সেলুন’ আছে। বেশ ভাল বেতন পাবে। বাও। একটু হেসে মহিলা বলেন।

—দেখুন, বা বোগাড় করে দিয়েছেন তা তো খুবই ভাল; কিন্তু কথা হচ্ছে কি আমি আবার ও ব্যবসা করতে চাই নে। একটু বিরামবদনে প্রশান্ত শুধাল।

—তুমি একজন ভাল পরামণিক এ পর্যন্তই আমি তোমার সম্বন্ধে জানি। এ ছাড়া আর কি জন্ত তোমাকে সুপারিশ করতে পারি?

—কিন্তু আপনি তো কথা দিয়েছেন—একটা ‘বিউটা পারলার’ এর ব্যবসা আমাদের খুলে দেবেন। অত্যন্ত হতাশের সুরে বলে।

—সে কাজ তো পরেও পারবে। আগে লোকজনের সাথে আন্তে আন্তে চিনা পরিচর হউক, তারপর সব হবে। বুঝলে?

প্রশান্ত বের হয়ে এল। পরে মনে ভাবলে—সত্যি তো, এ ছাড়া আমার আর কি আছে কারবার? একটা বিত্তেই তো কেবল জানি। কি বোকামী! একবারে এক লাফেই পাছের মাথার উঠতে চেষ্টা করেছিলাম।

এদিকে টাকা পরসার খলেও খালি হ’য়ে যাচ্ছে। উপায়ান্তর না দেখে প্রশান্ত ও-কাজই গ্রহণ করে।

সেই দিন রাত্রেই প্রশান্ত তার বাবাকে এক পত্র লিখল—“বাবা! বড় বড় সহরগুলো বেন সব একাচোরা, সখাতা মোটেই হয় না। এত দিন বাবৎ আছি তবু আমি এখানে নেহাৎই অপরিচিত। এখানে আমার বন্ধুতা গাঢ় করেছে তোমার দেওরা সাধের স্কুটাই শুধু। আগের ব্যবসাই করি। পত্র পেলে আবার আসব।”

শীতের সকাল। রোদ উঠে, আবহা আকাশও পরিষ্কার হয়।

রাতা দিয়ে প্রশান্ত বাচ্ছিল তার কার্য্যহলে। আচম্ভক চোক একটা দোকানের দিকে গেল, দেখে কুস্তলা একটা চেয়ারে বসে টাকা-পরসা গণ্ছে।

খুসীর বান ডাকলো প্রশান্তর প্রাণে। তক্ষণই সে ঐ দোকানে ঢুকলো। পরে কুস্তলার অতি নিকটে গিয়ে বলে—সমস্ত সহরময় তোমাকে খুঁজে খুঁজে হেরাণ।

—তুমি যে এসেছ তা আমি তোমার বাবার কাছ থেকে খবর পেয়েছি। হঠাৎ একটু খেমেই কুস্তলা আবার বলে—এখনও সেই ব্যবসা! ভাল! কর।

শুনতে কথাগুলো বহিঃ সহজই লাগে কিন্তু তবু—কেন জানি একটা ভাঙ্চিল্যের খোঁজা এসে প্রশান্তর বুকের পাজরাটা বিদ্ধ করে।

স্কুটহরে প্রশান্ত বলে—এক রকম অস্থায়ী ভাবেই একাজ পেয়েছি। আশা আছে বড় রকমই একটা কিছু করবো। দেখি কি হয়।

—আচ্ছা বেশ দেখা যাবে। বাকু, আমি বড়ই ব্যস্ত আছি এখন। তোমার ঠিকানা দিলে দেখা করবো।

দেয়—

...পরে চলে ভাঙ্চা পরাণ নিয়ে গন্তব্য পথে। ..

বিকেল বেলা দোকানের মনিব ধীরে প্রশান্তকে স্কুেশ বাবুর বাড়ীতে কামাবার জন্ত পাঠাল।

শীলের জন কতক ধনী বাজালী ও সাহেব মজেল আছে। তারা দোকানে এসে কখনই কামাতো না। তাই তাদের নিজ নিজ বাড়ীতেই পরামানিক পাঠাতে হয়।

প্রশান্ত যায়।

একটা স্তম্ভিত কামরার ভিতর প্রবেশ করেই সে দেখতে পেলো—একজন মধ্যবয়স্ক লোক, আর একজন পঞ্চবিংশতি বর্ষবয়স্ক যুবর সহিত আলাপ কচ্ছে।

প্রশান্ত জিজ্ঞেস করে—স্কুেশ বাবু আছেন?

—হাঁ আমিই। কি দরকার? মধ্যবয়স্ক লোকটা শুধায়।

—আপনি পরামানিকের জন্ত পাঠিয়েছিলেন,—আমিই।

পরামানিকের এমনতর স্তম্ভর ও ভয় চেহারাখানা দেখে স্কুেশ বাবুর চোখে বেন একটু আশ্চর্যের ছোপ ভেসে উঠলো।

প্রশান্ত তাকে কামাবার কালে সে বলে—সারা জীবন কি খালি এ কাজই কছ?

উত্তরে প্রশান্ত বলে—আজ্ঞে হাঁ, তার! কিন্তু আরও একটা ভাল ব্যবসার সন্ধানে আছি।

—তা বেশ, উচিত। এই তো বয়েস।

চুল ছাটা আর কামানো শেব হ’ল। বস্ত্রপাতি পরিষ্কার করবার জন্ত প্রশান্ত বাথরুমে যায়।

জেলার সহরে এসেই কুস্তলা যে চাকুরী নিয়েছিল —ছেড়ে দেয়। আরেকটা জুটিয়ে নেয় তাড়াতাড়ি।

ওর মন-ভুলানো চেহারা খানার দরুণই হয়ত তাই কি উচু দরের পরিবারের ছেলেদের সাথে মেলা-মেশা করবার সুবিধা ঘটে।

সন্ধ্যার সময় এত ব্যস্ত থাকে যে তাকে তখন বাসায় পাওয়া দুর্ঘট।

কতখান হ'তে নেমতনের আহ্বান আসে রোজ।

সেই দিন—

জন করেক স্তম্ভর যুবক বন্ধুর হাত ধরাধরি করে কুস্তলা জানি কোথায় বাচ্ছিল।

বিপরীত দিক হ'তে প্রশান্তও আসছিল তার কাজ থেকে। কুস্তলাকে দেখে সে পুলক-ডগমগ অন্তরে জর-জিজ্ঞাসা করবার অন্ত এগিয়ে গেল।

আগ্রহপূর্ণ স্তরে প্রশান্ত জিজ্ঞেস করে—কোথায় বাচ্ছ কুস্ত? আমি তোমার বাসায় চার পাঁচদিন ঘুরে এসেছি; —একদিনও কিন্তু দেখা পাই নি।

‘—এক বন্ধুর অমরোধ রক্ষা করতে। ব্যস্ত আছি’ এর চেয়ে সংক্ষেপ জবাব আসে না; তাই বলতে হয় এতখানি এক রকম অনিচ্ছা সত্ত্বেই।

মানুষ স্তম্ভের মিস্তি স্বাদ পায়।

হয়ত ভুলে যেতে চায় দুঃখের তেঁতো স্বাদও।

প্রশান্তর বাবার দয়ার কুস্তলা এতখানি—তাদের অধীনে চাকরী করতো। ভালবাসতো প্রশান্তকে খুব।

তুধু কি মুখে মুখেই...না—মনে প্রাণেও। এখন তার আরো ইচ্ছে না যে একজন পরামাণিক এসে তার সাথে আলাপ করে তাকে অপদস্থ করে তার ধনী বন্ধুদের কাছে।

এমনতর অপ্রাসঙ্গিক ব্যবহারে প্রশান্তর মনে দারুণ হুঃখ দেয়, কুস্তলা বলেই যে এতটা বেগী লাগে।

পরে মনে মনে নিজেকে প্রবোধ দেয়—বার যেমন অবস্থা তার তেমন ভাবে থাকাই যে উচিত।

গোটা কয়েক বছর কাটে—হুঃখে, স্তম্ভে। প্রশান্ত তার ব্যবসাতাকে জন্মিয়ে নিতে পেরেছে। ছোট্ট দোকানটা

এখন বেশ একটু জমকাল হয়েছে।

শ্রীকেষ্টপুরের দোকানও উঠিয়ে ফেলা হয়েছে।

তুধু প্রশান্তর মনে একটা মস্ত দুঃখের কাপড়ি অনবরত লেগেই আছে,—কুস্তলা যে তাকে বড়ই অবজ্ঞা করে—ওকে তো সে আর প্রাণভরে পেল না।

বড়ো বাবা জেঁদ করে ছেলেকে একটা স্ত্রী পাঞ্জী দেখে বিয়ে দিতে।

প্রশান্ত রাজী হয় না।—

অন্তরে যার পোড়া বার টাটানি সব সময়ই টাটায়, তার কি আর অন্ত কিছুতে সাধ থাকে!

প্রশান্তর বিয়েতে গররাজী দেখে বড়ো বাপ অত্যন্ত বিষন্ন থাকেন!

তবু ফল হয় না কিছুট।—

কোন সময়ের জানি একটা সকাল বেলা।—

কুয়াসাচ্ছর করে রয়েছে আকাশটা।

সূর্য ধীর মত্তর তালে ওঠে, কুয়াসা কাটে।

কোন কাজকর্ম নেই—তাই চুপ চাপ বসে আছে সব।

ডাকপিয়ন সকালের ডাক দিয়ে গেল। প্রশান্তর নামে এক পত্র।

লেখাটা দেখেই কৌতূহল বেজায় বাড়ে। ভাড়াভাড়ি খাম ছিড়ে ফেলে,—আগেই নাম দেখে নিল।

...কুস্তলা।

আনন্দ-সরসঅন্তরে অতি স্থস্থির ভাবে পড়ে অনেকবার। মাথায় হাত দিয়ে বসে—যেন কি ছড়াবলা মনেতে।

পত্রের নির্দেশ মত প্রশান্ত সকাল ছ'টার ট্রোপে গেল কুস্তলার কাছে।

অনেক ঘোরা ঘুরির পর জানতে পারলে কুস্তলা একটা চিপা গলির মধ্যে একটা বাড়ীতে থাকে।

হুকেই বিষয়ে ও বিহ্বলে একেবারে অভিভূত হয়। দেখে কুস্তলা কি একটা বেদনার যন্ত্রণায় বড়ই কঁোকাচ্ছে। নিজের মনে নিজেকে ছট্‌কটু কছে। কাছে একটা কেউ নেই।



সমস্ত পদে গিয়ে ও যেখানে গিয়েছিল সেখানে প্রশান্ত বসে।

কুন্তলা অল্পতব করে কে একজন এসেছে! চোক মেলে চার, আবার তখুনিই বুজে থাকে।

প্রশান্ত ওর কপালে নিজের হাতখানা স্থাপন করে। পরে ডাক দেয়—কুন্ত! আমি এসেছি। একী? আমি যে বৃত্তে পারছি নি কিছুই।

কুন্তলা সাড়া দেয় না।—

খালি ছ'চোক হ'তে অশ্রু গড়াতে লেগেছে অঝোরে। পরে প্রশান্তর হাতখানা টেপে ধরে রাখে।

তবু নির্দাক কুন্ত। মনে হয় যেন ওর কথার ভাঙার একেবারে উজার হয়ে গেছে।

এনি মৌনভাবে অনেকক্ষণ কাটে।—

পরে প্রশান্ত আবার রুদ্ধস্বরে ডাকে,—কুন্ত! চাও এদিকে। আমি অবাক হয়ে থাকছি তুমি এমন সময় একলা কেন?

—রস বন্ধি থাকে তদ্দিন আর বন্ধ বান্ধবের আঁকাল হয় না' কৈঁকাতে কৈঁকাতে বলে।

—আমি কিছু বৃত্তে পাচ্ছি নে। তুমি এখানেই বা এলে কেন?

—হাঁ বলছি। বিনোদ মাইতি ঐ যে সহরের নাম করা ধনী মাতাল যুবকটা কারবার দেবার উল্লেখ করে আমাকে আগের চাকরী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। দেখাবার জন্য একটা দোকান খুলে।

—হঁ তা জানি তাঁরপর।

—অনেক প্রকার প্রলোভন দেখিয়ে আমার মন চুরি কসলে—আমি আস্তে আস্তে উচ্ছ্বের পথে যেতে লাগলাম।

—তোমার এখানে আনলে কে?

—তারও অভূষ্টি লাগল—হয়ত বেড়ে ফেলে দেবে দেবেই ভাবছিল—সাথে সাথে আমারও এই সামাজিক রোগের হ্রস্পাত হলো। হাওরা পরিবর্তনের জন্য এখানে এসে রাখলো মাস ছ'রেক কাল। তারপর যখন ভরানক কঠিন হয়ে দাঁড়াল—আমিও উঠতে একেবারে অক্ষম, তখন আমার একা ফেলে চলে গেল।

ছ-ছ করে আবার কান্না, সাথে সাথে ঝঁক ঝঁক করে কাশির ঠেলা—আর গল্ গল্ করে রক্তের ফিন্‌কি—মুখ দিয়ে।

খাড়াকখাড়ি এমন অসম্ভব একটা অবস্থার পরিবর্তন দেখে প্রশান্ত যেন ক্ষণেকের জন্য চগ-ভোলা হয়ে গেল।

পরে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে ওর গুঞ্জরার মন দিল।

একটু প্রকৃতিস্থ হলে কুন্তলা আবার বলে—আমার জন্য তোমাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহিতে হয়েছে। ক্ষমা ক'রো, লক্ষ্মীটা আমার, এই দুর্বাবহারের জন্য।

—কেন অনর্থক আগের কথা মনে করে দুঃখ পাচ্ছ? ভাল হয়ে উঠ তুমি শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর।

না গো, তুমি বল—আমার ক্ষমা করবে কিনা।

—লক্ষ্মীটা! ভালবাসার বস্তু যে সে তো সব সময়ই ক্ষমণীয়। তা ভুল করে সে যত বড় দোষই—

আর বলা হলো না। কষ্ট যেন রুদ্ধ হয়ে এল। ধীরে ধীরে কুন্তলার শীর্ণ খোলা বুকের উপর প্রশান্ত নিজের হাতখানা স্থাপন করলে, আস্তে আস্তে বুলাতেও লাগল।

কুন্তলারও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস-বার হ'ল।

যোর সন্ধ্যা।—

চৈত্রের উল্লাসী বাতাস জানালার শাশিতে যেন মাথা খোঁড়ে। নিকটের মস্ত ঝাউ গাছটা বাতাসের চোটে শোঁ শোঁ করে—সাগরের সেই আকুল শোঁসানীর মতন। বিঁকি পোকায় দাগা দেওয়া অবিশ্রান্ত গুঞ্জরীও—

করণতা—বুক ফাটা করণতা

তা আরও বাড়ার শেষকালেও কুন্তলা আকুল আকৃতি কাকুতি জানিয়ে প্রশান্তর কাছে—বন্ধ, প্রাণ! অপরাধ আমার সব ক্ষমা করো—ভুলে যেও

আবার টাটকা রক্ত ঝড়ে—বমির মতন কলকলিয়ে।

মেহাৎ আট পোড়ে সাদাসিদে ভাবেই কুন্তলার জীবন তরী কোন্‌ অতলে ডুবে যায়।—

প্রশান্ত চলে বাজে হৃগ্ন বহু পথ দিয়ে যেন একটা না চলতে পারিলেই যেন বেশ ভাল ছিল;—অথচ না  
লোম ওঠা সারা গায়ে চকর চকর বা-থাকা কেঁটী কুস্তা বয়েও নয়।—  
—বহুপায় সারা পথ কেঁউ কেঁউ কছে।

তাকে চলতে যে হবেই।—

## দ্বারপণ্ডিত \*

(ব্যঙ্গগীতি)

শ্রীদিল্লিরিয়া শর্মা

ভূমি, লম্বিত কর স্তম্ভিত ভুঁড়ি  
স্বত-চপ চপে লুচিতে!  
তব, পুষ্টি টিকীটা বুলে' রো'ক' বেশ  
মোহ-কালিমা-শুচিত্তে!  
বুদ্ধিশূন্য বক্ষ্যা বাসনা  
ছুটিছে গভীর আঁধারে,  
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন  
অকুল-গরল-পাথারে!  
প্রভু, গন্ধকদলী-হস্তা!  
ভূমি, গায়ে দিতে আগে কস্থা!

এবে, মারিতেছ মজা খেয়ে দেয়ে খুব;  
'চষা' পেরেছে বুঝিতে!  
আছ, বিরাট প্রাসাদে মহাস্বখ-সাধে.  
ফেলিতে ফাঁসাদে সব্বারে;  
আছ, গোপন সভায় বমদূত প্রায়,  
বুঝি, "জাতি" যায়, বাবারে  
আমি, কাছাটি লাগাই কসিয়া,  
পাছে, সহসা পড়ে বা খসিয়া,  
আগে, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,  
বুঝিয়া মেতেছি বুঝিতে।

## সৈনিকের চিঠি।

শ্রীশান্তি চৌধুরী

গ্যারী, ফ্রান্স।

সকাল ৭।

৩০শে অক্টোবর,

১৯১৭।

প্রিয়তমা মানসী আমার!!!

এখানে এসে পৌঁছেছি। এ কয়দিন সময় হয়নি তাই  
লিখতে পারিনি। আমার সেই বন্দীরা কাল আত্মহত্যা  
করেছে। কি ভয়ানক! তারা হয়ত ভেবেছিল, শত্রুর হাতে

ভয়ানক নাতানাবুদ হতে হবে, তাই মরেছে। যেভাবে  
মরেছে—শিহরে উঠতে হয়।

ওদের যেখানে রাখা হয়েছিল সেখানে কতকগুলি দড়ি  
জমা ছিল। তারই কতটুকু সংগ্রহ করে রাজিহের কুলে

\* কান্ত কবির "ভূমি, নির্মূল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ষ যুছারে"—নামক বিখ্যাত গানের স্মরণে।

পড়েছে। আমাদের হাতে লাহিত অপমানিত হওয়ার চেয়ে মরাই তারা প্রের: মনে করেছে।

আমার কবি সৈনিকের পকেটে কতকগুলো লেখা পেরেছি। লেখাটা সত্যিই বড় সুন্দর! আমি ভেবেছিলুম বোধহয় তাঁরই জীবনের একটু কাহিনী, কিন্তু দেখ্‌লুম এ লেখা তাঁর নয়। তার নাম আমি জানি। লেখার উপরে লেখকের নাম লেখা আছে। কবির নাম ‘ভিয়েন’ আর লেখকের নাম ‘ভ্যার্নার’। ‘ভিয়েন’ বোধহয় ‘ভ্যার্নারের’ পকেট থেকে এ লেখা সংগ্রহ করেছে। তবে একটু চুখ যে প্রথম বা শেষ কোনটাই নেই। মাঝের থেকে কতটুকু আছে। যে টুকু আছে বেশ সুন্দর ছাঁচে লেখা। তুমি বোধহয় খুব ব্যগ্র হচ্ছে কি আছে এতে জানবার জন্ত? তাই লিখ্‌লুম, ঠিক যে রকম লেখা পেরেছি। তুমি পড়ে খুব আমোদ পাবে। একা আমি উপভোগ করে আমোদ পাচ্ছি না, তাই তোমাকে লিখ্‌ছি। আর তোমাকে না লিখে কি থাকতে পারি?

ঐশ ছাড়বার বেগী দেবী ছিল না, কিন্তু তোমাকে ফুল পাঠিয়ে দেবার মতো সময়ের অভাব আমার হয়নি। ‘একজিভিশন’ থেকে এক থোকা ‘বসরাই’ গোলাপ কিন্‌লুম। কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হতে পার্‌লুম না। আরো অনেক কিনবার ইচ্ছা হল। তাই ‘ক্রেগান্ থেমাম,’ ‘ডালিয়া’ এবং ‘প্যাল্মির’ করেকটা থোকা তোমার নামে পাঠিয়ে ছিলুম। কিন্তু রাণী, একটা মন্ত ভুল কর্‌লুম—আমার নামের কাউটা গুঁজে দিতে ভুলে গেলুম।

তুমি হয়ত বুঝতে পারনি কে তোমাকে ফুল পাঠিয়েছে? এইত আমার আহাঙ্গকী! কাউটা যদি গুঁজে দিতুম্‌ তো নিশ্চয় আমাকে তুমি অন্তত: একটু ধন্যবাদও জানাতে! না না, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, কে তোমাকে ফুল পাঠিয়েছে? যদি বুঝতে পেরে থাক তবে বতদিন না ওরা শুকিয়ে ঝার, ততদিন আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

‘ন্যান্সি, তুমি নাকি নাস’ সেজেছ? আমি তোমাকে বা ভাব্‌তুম এখন দেখ্‌ছি তুমি তার অনেক উপরে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে বাই, কি করে তুমি যুদ্ধে নাব্‌তে পেরেছ, এই হাঁসপাতালে বাসা বেঁধেছ।

তোমার সুন্দর বেশভূষা এখন কোথায় কেলে এসেছ রাণী? আমি কোনদিন আশা করিনি যে তুমি শেষে যুদ্ধে—গোলাগুলীর মাঝে এসে দাঁড়াবে! আমি পডাণিসের সমস্ত মেয়েদের মধ্যে তোমাকেই শাস্ত্র মমতাময়ী এবং সুন্দরী বলেই ভাব্‌তুম। নাস’ হিগাবে তো কোনো দিন ভাব্‌তে পারিনি?

এই তো ডাক এলো। ভেবেছিলুম, তোমার চিঠি পাব কিন্তু নেই দেখ্‌লুম। কেন লিখলে না প্রিয়ে? জগতে আমার বলতে যা আছে, সবার চেয়ে তোমার দাম আমার কাছে বেগী, সবার চেয়ে তুমি আমার কত আপন, অথচ তোমার হাতের লেখা কখনও আমি চোখে দেখিনি। এ থেকে স্পষ্টই বুঝ্‌ছি পরস্পরের কাছে আমরা কত অপরিচিত!

তোমার স্মৃতি অকস্মাৎ আমার মনে আসে—তোমার অঙ্গভঙ্গী, চলাফেরা, কথাবার্তা যা তখন লক্ষ্য করিনি। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন তোমাকে আমার পাশে অনুভব করছি, তোমার স্বর যেন কাণে বেজে উঠেছে, তোমার হাতখানি মুঠের মধ্যে নিয়ে যেন গার্ডেনে বসে আছি

দেখেছ কি ভেবে বসে আছি? তোমার আমার যে চিঠি লেখা চলতে পারে না, তোমাকে নিয়ে বেড়ানো যে এখন আর হতে পারে না তা আমার মনেই ছিল না। এখন আমরা যে একজন আরেক জনার শত্রু?

বাক্‌ সে সব। আচ্ছা লক্ষী, তুমি কি এই বোমার গর্জনে—রাইকেলের শব্দে ভয় পাওনা? হয়ত পাও না! তুমি যে বীরত্ব নিয়ে নেমে এসেছ? বিপদের আগুন তোমার মনে আলো জ্বলেছে।

ফ্রান্সে এটা খুব সাধারণ। পরের জন্ত নিজের প্রাণ দেওয়া তোমাধের অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। মরণকে আলিঙ্গন করা তোমাদের এতটুকু অসম্ভব নয়, কিন্তু তবু তোমরা কত শাস্ত! কিন্তু সবচেয়ে আমি আশ্চর্য্য হই এই ভেবে যে, তোমরা কখনও কোনো কাজে ছুলিয়ে বাওনা। কাজে তোমরা অতিরিক্ত মুগ্ধ হয়ে বাও বলেই বোধহয় গুরুত্বই হয়।

আরেক কথা! তোমাদের বিশেষত্ব এই যে, তোমরা যা কর, একমনেই করে যাও। দুই দুইটা ভাব পোষণ করা তোমাদের দ্বারা হয় না। সব সময় তোমাদের মনোভাব একই থাকে।

কিন্তু আমরা, জার্মানরা, সেইটাকে ঘৃণা করি, লুকাবার চেষ্টা করি। আমার কথাই ধর,—তোমাকে আমার ভালবাসার কথা জানাইনি কেন জান? পাছে তোমার আঘাত করি বা আমি নিজে আহত হই। যদি তুমি আমাকে ভালবাসতে না পার, একটু করুণা করবার সুযোগ না হয়? কারণ যে যুদ্ধে যাচ্ছে, তাকে ভালবাসতে হয়ত কখনও কেউ চাইবে না—তুমিও না, কেননা যদি আমি ফিরে আর না যেতে পারি, অথবা যদি ফিরে যেতেও পারি তবু কি তোমার আঘাত করা হবে না? আমি যতদিন যুদ্ধে থাকব, ততদিন তুমি আমার ভালবাসবেই; যদি পেতে চাও, এত দিন, এত মাস এত বছর কত কষ্টে তোমার কাটবে এতে তোমার বুক ভেঙে যেতে চাইবে না কি? তারপর ফিরে গেলেই তুমি ষোলআনা ভালোবাসা দিতে পারবে কি? কখনই না। তখন একটু বাঁধ বাঁধ ঠেকবেই। এতে অনেক বেশী আঘাত করা হবে নাকি?

তারপর যদি আমি তোমাকে ভালোবাসা নিবেদন করে ব্যর্থ হইতুম, তবে আমার কত কষ্ট হত? হয়ত সে আঘাতে আমার জীবনটা ব্যয়ে যেত। তা ছাড়া তোমরা নারীরা ভালোবাসতে না পারলেও একটা করুণা দেখিয়ে থাক। শেষে সেই করুণাকে ভালোবাসা মনে করে অলে মরতে হয়, এই ভয়েই তোমাকে কিছু বলিনি। অথচ তোমার ভাবে বিভোর হয়ে, ময়লা গর্ভের মধ্যে বসে এই কাগজের উপর রাশি রাশি মনোভাব চালুছি যার কোনো মানে নেই, উদ্দেশ্য নেই—যা একেবারেই পণ্ডপ্রম।

যুদ্ধের আগে আমি ভরানক খেরালী ছিলাম। কিন্তু এখানে এসে, সামরিক নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমি একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছি। সাহস করে বাঁচতে এবং প্রয়োজন হলে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মরতে শিখেছি। বুঝতেই পারছি, তোমাকে দেখার পর থেকে আমার আগেকার সব উদ্দেশ্য কি রকম স্থলিয়ে গেছে। মেরেকে ভালোবাসছে

অথচ ভবিষ্যতের মাঝে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে না, তার অভাব হৃদয়ে অনুভব করবে অথচ তাকে ভাববে না—এ একেবারে অসম্ভব।

যত কিছুই বলি না কেন আর যত কিছুই ভাবি না কেন আমাদের মিলনের অভাবনীয় বৈচিত্র্যই আমাকে ভরানক চঞ্চল করে তুলেছে। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, আমাদের প্রথম দেখা হল লণ্ডনে, তারপর এমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে, পরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে প্যারিসে। এই আমাদের শেষ দেখা। আমরা সেইদিন বিদায় নিলুম পরস্পরের কাছে সৈনিকদলে যোগ দেব বলে।

প্রিয় আমার! আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইত্যা করছি আর তুমি বাঁচিয়ে তুলছ। তোমার আমার স্পষ্টাপাষ্টি ভাবে কোন কিছু বলবার অধিকার নেই—উপায়ও নেই; কিন্তু সেই সাধারণ তুচ্ছ জীবনের আবর্জনা স্তূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, বলিষ্ট সাহস নিয়ে মরার মধ্যেও গৌরব আছে।

আচ্ছা মণি! তুমি আমার একটা জবাব দিবে কি? আমার জানতে ভারী সাধ আছে, তুমি আমার অভাব হৃদয়ে অনুভব কর কি? কোন মেরে আমার জন্ত ভাবছে এই কথাটা এই নিঃসঙ্গ নিরালা জীবনে বড়ই প্রীতিপদ—মনে বলের সঞ্চার করে।

ঐ দেখ কতসব অবাস্তব কথা ভেবে বসে আছি! আমার মনেই ছিলনা যে আমরা দু-জনই এমন একটা কাজে হস্তক্ষেপ করেছি যা উভয়ের পক্ষেই সমান ভাবে নিঃসঙ্গ এবং হালকা যে স্বার্থপরতার সামান্য আঁচেই তা নষ্ট হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

আজ সকালে সাম্রের লাইন থেকে কিরবার পথে কামানের সারের কাছে গেলুম। আজ ঠিক সেই রকম দিন প্রিয়ভমে, যেদিন মানুষ ভাগ্য পরিবর্তনের আশা করে।

মেঘমুক্ত আকাশ। মাঝে মাঝে সাদা মেঘের টুকরো ইতস্ততঃ ভেসে বেড়াচ্ছে। কাশা শুকিয়ে উঠেছে। বাতাস নবীন বস্তুর আমেজ জানাচ্ছে। এমন দিনে আমাদের দেশের লোক কত উৎসাহে, কত নতুন আশার গার্ডেনে ছুটে যায়।

আমরা যদি একত্র থাকতুম, তো আমরাও নিশ্চয়ই যেতুম। তুমি হয়ত আমি যে পোষাকটা সবচেয়ে ভালোবাসি, যে পোষাকে তিন বৎসর আগে তোমার আমি প্রথম দেখে-ছিলুম, সেই পোষাকে সজ্জিত হয়ে আসতে।

দেখেছ তামাসা? আমি ভুলেই গিয়েছিলুম যে কোনো পুরুষকে স্ত্রী করবার অস্ত্র কোনো রমণীই তিনবছর আগেকার পোষাকে সজ্জিত হতে চাইবে না।

আচ্ছা প্রিয়ে! যুগটা কি রকম ভয়ানক তুমি তো দেখেছ; কিন্তু কোনো দিনই কি তুমি ভয় পাওনি? আমার কথা কি কোনো দিনই তোমার মনে হয়নি?

আমার তো তোমার কথা প্রায় সমরই মনে হয়। আমি একেবারে মূল্যে পড়ি, যখন কোনোদিন শুনে পাই যে করাসীদের কোনো আড্ডা নষ্ট হয়েছে। আমি ভয়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ি। আমার নিজের সাহসী হওয়া খুবই সহজ, কিন্তু তুমি বিপদের সীমার মধ্যে আছ শুনে গেলে আমার পক্ষে তা অসহ্য হয়ে উঠে।

একবার যখন তোমাকে প্রথম দলের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে হচ্ছে শুনলুম, সেবার আমার যা অবস্থা হয়েছিল, কি করে

তোমাকে বুঝাব? কল্জা চিরে দেখলেও তুমি বুঝতে না কত কষ্ট হয়েছিল আমার। কিন্তু তুমি গিয়েছিলে বিপুল আগ্রহে।

আমি ভয়ে শিহরে উঠেছিলুম, কারণ তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ, তার সম্বন্ধে একবিন্দু ধারণাও তোমার নেই। তা ছাড়া জীবনে তুমি কোনোদিন কাজে হস্তক্ষেপ করনি, কেবল পোষাক পরে আর হাসিগানে ব্যস্ত থেকেই তুমি সময় কাটাতে এবং ইহাই ছিল তোমার জীবনের সবচেয়ে প্রধান কাজ। তা ছাড়া প্যারিসের সমস্ত তরুণীর মধ্যে তোমাকেই মনে হয়েছিল সুন্দর ও তরুণ।

হাঁ, মনে পড়েছে তোমার সেই বিদায়কালের কথা— যা আমাকে মুক্ত করে দিয়েছিল চিরতরে।

তোমাকে যুদ্ধে নাওতে মানা করেছিলুম বলে তুমি বলেছিলে—‘তোমাদের পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের জীবনের দাম জগতে খুব কম। জগতে মেয়ের অভাব হবে না। তোমরা যদি মরবার যোগ্য বলে ছাড়া পাও, তবে আমরা কেন সে সুযোগ হতে বঞ্চিত হব?’

## হে বসন্ত ! যেও না কো চ’লে

শ্রীপ্রণব রায়

হে বসন্ত ! যেও না কো চ’লে,

আকুল মিনতি মোর উপেক্ষায় দ’লে

নিশি-শেষে সুখ-স্বপ্নসম।

ওগো প্রিয়তম !

এই কি গো বিদায়-লগণ ?

স্বচ্ছ-স্নিগ্ধ সুনীল গগন

পূর্ণিমার দীপালিতে গিয়াছে ভরিয়া ;

রজত-নিবীর-শুভ্র জ্যোৎস্নাধারা পড়িছে বরিয়া

নিখিল প্লাবিয়া

হয় নাই গীত-হারা মুক।

পরিপূর্ণ আছে আজো ধরণীর বুক

বিকশিত-যৌবন-সজ্জারে।

হে চির-তরুণ যাত্রী ! কোথা যাবে—কোন দূর-বিস্মৃতির পারে ?

কানন-নিকুঞ্জ ভরি'

আজো ফোটে মুকুল মঞ্জরী,

মুঞ্জরে কুসুম ।

প্রেমিক জ্বর আজো একে দেয় চুম্

রূপসী ফুলের রাঙা অধরের 'পরে ।

মালতী মেলিছে আঁখি মৃদু লাজ ভরে ;

ফোটোর আনন্দ তরে হয় নি কো সারা,

গন্ধ তার হয় নি গো হারা ।

এখনো পড়ে নি ঝরে বিবশ বকুল ।

সৌরভ-আকুল

পথ-ভোলা সমীরণ তুলিছে মর্ম্মর

ব্যাকুলিয়া বনের অন্তর ।

সুন্দর পথিক ওগো ! এলে যদি যেও না কো আর ।

তরুণী প্রিয়ার

আঁখিছুটি ভরা আজো স্বপ্ন-স্বষমায় ;

গোলাপের রাগ-রক্তিমায়—

রঙিন্ কপোল তার হয় নি গো ম্লান ।

মোটে নাই সাধ আজো, তৃষাতুর অতৃপ্ত পরাণ

প্রণয়-বিধুরা

প্রিয়ার চুম্বনে আজো ভরা আছে আবেশের সুরা ।

আজি এ জ্যোৎস্নাময়ী মিলন-নিশায়

হে নিষ্ঠুর ! চেয়ো না বিদায়—

## বিক্রমপুরের পুরাণকথা

ত্রিহিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞাবিনোদ সাহিত্যরত্ন

আদিশ্বরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণ ও বাংলার দেশে সদাচার বাহ্যিক সার্বিক বেদপারগ ব্রাহ্মণদ্বারা  
প্রাচীনতম ব্রাহ্মণগণের বংশ লইয়া বাংলার ব্রাহ্মণসমাজ । দেশের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছিল ।

প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ আদিশ্বরের রাজত্বসময়ে বাংলা ৯৪২ খৃষ্টাব্দে বাংলার পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নক রা হয়, যথা—

“শান্তিলা-গোত্রজ শ্রেষ্ঠো ভট্ট নারায়ণঃ কবিঃ।

দক্ষো হৃৎ কান্তপ শ্রেষ্ঠো বাৎস্ত শ্রেষ্ঠো হৃৎ ছান্দুঃ

ভরদ্বাজকুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।

বোগের্গেহৃৎ মাবনে। যথা বেদ ইতি স্মৃতঃ ॥”

কিষকন্তী শুনা যায় রামশালের নিকটস্থ যে পঞ্চসার গ্রাম বিদ্যমান আছে তাহাই নাকি পঞ্চ গ্রামের নামান্তর।

পঞ্চ ব্রাহ্মণ রাজপ্রদত্ত পাঁচখানা গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া স্বখ-স্বচ্ছন্দে বাগ বজ্র সাগ্নিক ক্রিয়াধারা মহারাজের অভিপ্রেত পুত্রোষ্টি বাগ আরম্ভ করেন। এমন সময় মহারাজ আদিশুর মানবলীলা সংবরণ করেন। তদীয় কন্তা রাজকুমারী লক্ষ্মীদেবী বাংলার রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। বিপ্রগণ রাজকুমারীর সেবা শ্রবায় সন্তুষ্ট হইয়া পুনঃ বাগ আরম্ভ করিলেন, কিছুদিন পরে রাজকুমারী লক্ষ্মীদেবী গর্ভবতী হইলেন। সেই গর্ভেই মহারাজাধিরাজ বজ্রাল সেনের জন্ম হয়। কিশোর অবস্থায় লক্ষ্মীদেবী বীর পুত্রকে কয়েক বৎসরের জন্ত বিপ্র-গণের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়নে নিয়োগ করেন, তৎপর সাবালকত্ব প্রাপ্তে আদিশুরের ওয়ারিস সূত্রে দৌহিত্র বজ্রাল সেন রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া কন্তাকুজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বিবর অবগত হন। তিনি আরো বিশেষরূপে জানিতে পারিলেন যে পঞ্চ ব্রাহ্মণের ৫২টি সন্তান জন্মিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার সীমা বিভাগ নাই। সে সময় সারা বাংলার বৌদ্ধবিপ্লব প্রভাবে বাংলার আদি ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ক্রিয়াকলাপে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বৈদিক, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নামে সে সময় কোন সমাজের নাম শুনা যায় নাই। তাহাদের সামাজিকতা ও ছিল কি না সন্দেহ? সে সময় তাহারা নিজ নিজ সংসার ও ভোগ বিলাসে রত ছিলেন। মহারাজ একদিন বিপ্রগণকে আনিয়া বংশ বিস্তার এবং তদীয় মাতামহের বংশমান গৌরব রক্ষার জন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া ৫২ জন সন্তানের প্রত্যেককে সূত্রে বসবাস করিবার জন্য রাঢ় দেশে একখানা করিয়া গ্রাম নির্দিষ্ট করিয়া ৫২ খানা গ্রাম দেওয়া হয়। মোটের উপর পঞ্চ ব্রাহ্মণই এদেশবাসী বর্তমান “রাঢ়ী ও বারেন্দ্র উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের আদি পুরুষ বলা যায়। বিক্রমপুরের গৌরব কথা আরম্ভ করিবার পূর্বে আদিশুরের পঞ্চ ব্রাহ্মণগণকে আর বিশেষ পরিচর দেওয়া বাহুল্য মনে করিয়া বিক্রমপুর সম্মিলনের অধিবেশন এবং আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অভিভাষণ নিয়া একটু পুরাতন সাহিত্য কথার অবতারণা করিব। বিক্রমপুরের পুরাতন

ভিন্ন নূতন লিখিবার কিছুই নাই। বিক্রমপুর সম্মিলন উপলক্ষ্যে স্রুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বিরচিত আবাহন কবিতাটি চিরদিনের মত বিক্রমপুরের তরুণ যুবক-গণের মনে উদ্দীপনা জাগাইয়া দিবে।

( ১ )

যন্তি, যাগত, বিশ্বত বুল, জ্ঞানে, কর্ণে, ধর্মে, বীর।  
যাগত, যাগত, যন্তি, যাগত, উজল আজি গো বীর কুটার,  
ভুলেছ সবে এইত সে দেশ, আদিশুর বীর রাখিল দান,  
পুণ্য ভট্টের যিজের তবর ধর্ম বাহারে করিল দান;  
দেখ একবার এই সে তোমার হত গরিমার চিত্তার শেখ—  
বিক্রম বীর বঙ্গে অপার কর্ত্তি বাহার ছিল অশেষ?

( ২ )

চক্র ধরিয়া ভিক্ষু বধায়, দুজি-মন্ত্র করিল দান,  
হৃগত নিরত, ভারত-বিদিত, পুত্র বাহার বতি দ্বিজ্ঞান;  
সাগর-মুকুরে বরন হেরিত, যেই সমভট, এই সে দেশ  
তড়াগে, সেউলে, সৌধে, শিবিরে, ধারণ করিয়া মোহন বেশ;  
দেখ একবার এই সে তোমার হত গরিমার চিত্তার শেখ—  
যাতি বীর বঙ্গে অপার কর্ত্তি বাহার ছিল অশেষ—।

( ৩ )

কুপাণ বাহার শক্তি যেছিল, কামান বাহার গাহিল জয়  
লীলার দাটিল সময় তরলী যেখনার বৃকে অকুতোভয়?  
হর হর বলি বম্ বম্ বম্, ধাইল বাহার তনয়বীর—  
বিক্রম-পোষিত, পালপুজিত, কোদার সেবিত পুণ্যভীর;  
দেখ একবার এই সে তোমার হত গরিমার চিত্তার শেখ—  
বিক্রম বীর বঙ্গে অপার কর্ত্তি বাহার ছিল অশেষ।

( ৪ )

বিজ্ঞার ভাতি কুল ধরায় সোহিল বেধায় বঙ্গে আর  
হালা পরালো কটে বাহার, বরন শিলকলা কুমার—  
এই সে ধরলী, বরাল-জননী, বিজয় বাহিনী বিপুল বীর  
ধনের মানের বশের শ্রুতিটী বহিছে আজিও ভীতরে তার,—  
দেখ একবার, দেখ একবার হত গরিমার চিত্তার শেখ—  
বিক্রম বীর বঙ্গে অপার, কর্ত্তি বাহার ছিল অশেষ?

( ৫ )

এস হে সৌম্য, এস হে শান্ত, বলি সবারে আজি বেধায়,—  
এখনো বাহার কর্ত্তি অপার রয়েছে মিশিমা ধূলি কণায়;  
সম্পদ বীর বঙ্গে ধরিয়া গরবে পদ্মা বহিছে সে,  
সিংহ দুহারে রখী বশা’রে ভীম দরশন সেখনাদে,  
দেখ একবার এই সে তোমার হত গরিমার চিত্তার শেখ—  
দেখ তোমার, সাধ না তোমার, বর্গ তোমার, তোমার দেশ।

ভারতের বরেন্য আচার্য্য বসু জগদীশচন্দ্রের জন্মভূমি এই বিক্রমপুরের বসু বংশে। এইবংশ বিক্রমপুরের একটা প্রাচীন বংশ—সেই বংশে তাহার জন্ম।

( ক্রমশঃ )



## শ্রীগীর্ধা

**উড়োখই।** ফাল্গুনের সংখ্যা এই প্রথম আমরা পাইলাম। 'উড়োখই' যখন গোবিন্দায় নমঃ— ভগবচ্চরণে উৎসর্গীকৃত, তখন ইহার দীর্ঘজীবনগাভ অবশ্যস্তাবী। 'অশ্রু' ও 'মুক্তিল আসান' কবিতা মন্দ হয় নাই। আশুতোষ সাত্তাল মহাশয় গল্প ও পত্র লেখক; তাহার 'বাগ্দীর মেয়ে'—'পদ্ম', 'বুকের আগুন' নিয়া জলে ডুবিয়া মরিল; হিন্দু সমাজের বন্ধন যখন কড়াকড়ি ভাবে আছেই, তখন নিজের ছেলেকে গঙ্গাজলে শুদ্ধ করিয়া বাগ্দীর মেয়েকে জলে ডোবান আশুবাবুর পক্ষে ঠিক হয় নাই। 'আমেরিকায়' গোঁহ ও ইম্পাত শিল্পের ক্রমোন্নতি এবং 'অনুপম-মাহুর কথা' প্রবন্ধগুলি গবেষণামূলক ও সাময়িক।

**সমুদ্রশক্তি।** পল্লীসেবা সমিতির মুখপত্র। আমরা ফাল্গুনের মাসিক সাদরে গ্রহণ করিলাম। মাসিক পত্রখানা পল্লীতেই জন্মিয়াছে। যদিও দুই ফর্মী কাগজ, তবু পড়িবার বিষয় আছে। কাজী আব্দুল ওজ্জদ সাহেবের "একখানি পত্র" পাঠ করা প্রত্যেক উদীয়মান সাহিত্যিকেরই উচিত বলিয়া মনে করি। "সেদিন বলিয়াছিলাম, সাহিত্য সৃষ্টির জন্ত বীর্ঘবস্ত চিন্ত চাই, যে চিন্ত সত্যকে নিজে উপলব্ধি করবার জন্ত অকুতোভয়ে দাঁড়ায়" ইত্যাদি পড়িয়া তৃপ্ত হইলাম। বাংলা সাহিত্য কাজী সাহেবের নিকট অনেক আশা করে। "স্বপ্নসঙ্গিনী" কবিতাটি বিদ্রোহী কবির চংগাখা। মন্দ হয় নাই। 'তবু কই'—হিন্দু মুসলমান মিলনের প্রচেষ্টা,—সাধু!

**সৌরভ।** ফাল্গুনের হাওয়ায় 'সৌরভের' কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এহারের 'জীশিকার আদর্শ', 'বাক্সালার লেখক' ত 'উপবাসতত্ত্বাবর্ধিত' প্রবন্ধগুলির মূল্য আছে। ইহাতে সমাজের অনেক উন্নতি সাধন করিবে।

**নবমিলন।** পৌষ মাসের 'নবমিলন' পাইলাম। সকল লেখকের গল্পই প্রায় এক ছাঁচে ঢালা। এ সূত্রের যে অন্ত কোথায়, কে জানে! "বাসন্তী রংএর শাড়ীতে পরিপূর্ণ যৌবন আঁটেনা। বুকের আঁচল বারবার খসে পড়ে।" সংযমের বাঁধন না থাকিলে একরূপ নগ্ন পঙ্কিল ভাব লইয়া সাহিত্য বেশী দিন বাঁচিবে না।

শ্রীপ্রণব রায় এক মুরগী দুইবার জবাই করিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের "সচিত্র শিশিরে" যে 'অবেলার অভিসার' 'খোলার ঘর' খানিতে,—পৌষ মাসের "নব মিলনে" 'বেজাত পাড়া'র "কোঠাবাড়ীতে" "বহুদিন হোল কোন্ ফাল্গুনে"—সেই "মুক্তো" আর "অবনীরা" মিলন। গল্প বা প্রবন্ধের অভাব হইলেই কি একটা গল্পকে নাম ভাড়াইয়া সম্পাদকে ছাপিতে হইবে? ক্ষেত্রবাবুর তিনটা, সত্যেন্দ্র নাথের একটা—আর না হয় হরেন্দ্র বাবু একটা লিখিয়াই দিতেন। তবু প্রণব রায়ের উপর জুলুম না করিলেই হইত।

**পাতভাড়া।** পূজার সংখ্যা, ১৩৩৪। বার্ষিক মূল্য ১৮ এক টাকা।

"পাতভাড়া" নাম পড়িয়াই "তাড়ি বগলে ছেলের



দলে, পাঠশালাতে যায়” কবিতাটি মনে পড়িল। কিন্তু আগাগোড়া ঘাটুয়া দেখিলাম যে, গদাধর তাড়ি বগলে নিয়া ডবল প্রমোশন পাইয়াছে। শিশুর পক্ষে কঠিন। ৬ স্বকুমার রায়ের বাড়ির “সন্দেহ” ফুরিয়ে যাওয়ার পর, তেমন আরও একটা কিছু হওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু কর্মকর্তা ভবিষ্যতে “ভাল” করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন। আমরাও সেই ভরসায় রহিলাম।

**কল্যাণচোর পত্র—**ত্রিবিজয় কান্ত রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ৥০ আনা।

এস্থকার ব্রহ্মচর্য্যকেই কল্যাণের একমাত্র পথ নির্দেশ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, স্বর্গীয় অখিনীকুমার দত্ত এবং জনৈক ব্রহ্মচারীর গিথিত মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

যে আচরণ বা নীতিপালন করিলে স্বীয় তেজঃ বা জ্যোতিঃদ্বারা তমসাচ্ছন্ন দিগ্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়া নিজকে স্বাবরজ্জমাঅক বিশ্বরূপে প্রকাশ করা যায়, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে ব্রহ্মচারী সন্তানদের যুখে ‘বন্দেমাতরম্ বাণী’ বাহির করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। কামকে দমন করিতে হইলে মাতৃজ্ঞাতিকে মা ও পুরুষকে সন্তান হওয়াই প্রকৃষ্ট উপায়। মানবজীবনের

চরম উন্নতির উপায় নির্দেশকে আবশ্যকীয় যাবতীয় বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া এস্থকার জাতির ও সমাজের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। দেশের বর্তমান ছঃবহ্যার দিনে এরূপ গ্রন্থের আবশ্যকতা খুবই আছে, পূর্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে। কিন্তু এই থাকাটা ছেলেদের স্কুলপাঠ্য রূপে সজ্ঞা থাকিলে অনেকটা কাজ সহজ হইত। এস্থকারের এই কাঞ্চন, কাঁচের সংস্পর্শে গেলেও মরকতমণির দীপ্তি ধারণ করিবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

**শনিবারের চিঠি।** চৈত্র, ১৩৫৪।  
প্রবীণ বা তরুণ লেখকমাত্রেই শনিঠাকুরের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। তবে তাঁহারা, ‘স্ববুদ্ধি উড়ায় হেসে’ মনে করিয়া শনিবারের চিঠিখানা Waste paper basketএ ফেলিয়া নিজের কাজে ব্যস্ত।

‘প্রগতি’ সম্পাদক “কিনীতভাবে চোখে আব্দুল, দিয়া দেখাইতে” গিয়া শনিঠাকুরের “কাণমলা” খাইয়াছেন। কি সভ্যতা! এই কি সাহিত্যের সমালোচনা! পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।

“তুমি অধম তা বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন” এই মহাজন বাক্যাটো কি সম্পাদক ভুলিয়া গিয়াছেন?



# বাঙ্গালীর বীরত্ব

## বাঙ্গালাদেশের অবস্থা

১২০০—১৪০০খ্রঃ

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র সরকার বি, এ, সাহিত্যভারতী

“দ্বাদশ শতাব্দীতে উত্তরভারতে গৃহকলহের যে প্রবল ঝটিকা উথিত হইয়া আজমীরের চৌহান ও কান্তকুজের গাহড়বাল রাজভবন বিকম্পিত করিয়াছিল, তাহা অচিরে উভয়েরই কীর্তিসৌধ বিচূর্ণিত করিয়া চৌহান-গাহড়বালকুলের সমাধিস্তম্ভ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে ঝটিকার ভারতের সিংহদ্বার ধ্বংসিয়া গেল, সেই মুক্তপথে সাহুচর মহম্মদ ঘোরী এবং মধ্য এশিয়ার মরুময় মালভূমির তুরঙ্গ-অধিবাসীবৃন্দ প্রচণ্ডবেগে ভারতে প্রবেশ করিল।”

মহম্মদ ঘোরী যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন কনৌজে জয়চন্দ্র এবং দিল্লী ও আজমীরে পৃথীরাজ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ইহারা উভয়েই রাজপুত। রাজপুতগণ একতায় বদ্ধ হইতে পারিলে অনায়াসে তুর্কীবীরকে ভারত হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু উক্ত রাজবংশদ্বয়ের মধ্যে এমন প্রবল বিরোধ ছিল যে, একতাবদ্ধ হওয়া অসম্ভব হইল। যেহেতু পৃথীরাজ জয়চন্দ্রের কত্যা সংযুক্তাকে তাহারই অভিপ্রায়মতে হরণ করিয়া বিবাহ করেন, জয়চন্দ্র এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য মুসলমানগণকে আহ্বান করেন। ফলে, পৃথীরাজের সহিত মহম্মদ ঘোরীর তিরোতী নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। ইহাতে মহম্মদ ঘোরী পরাস্ত হইয়া অতিকষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে (১১৯৩ খৃঃ) পুনরায় ভারত আক্রমণপূর্বক পৃথীরাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। ইহার ছয় বৎসর মধ্যে মুসলমানগণ ক্রমে উত্তর ভারতের

প্রায় সমস্তই জয় করিয়া লইল। তিরোতীর যুদ্ধে হিন্দুর গোরব-রবি চিবভরে অন্তর্মিত হইল।

মহম্মদ-ই-বক্টিয়ার যখন বঙ্গ প্রবেশ করেন, তখন মহারাজ লক্ষ্মণসেন বঙ্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। বাঙ্গালীর বাহুতে তখনো শক্তি ছিল, তাহার শৌর্য ছিল, সাহস ছিল, ধনবল জনবলের অভাব ছিল না। বাঙ্গালী

তখনও ব্যাঘ্রমে বিমূধ ছিল না, অস্ত্র-পাঠানাগমনকালে চালনায় অপটু ছিল না, যুদ্ধব্যবসায় বাঙ্গালীর বল হয় বলিয়া বিবেচিত হইত না।

বঙ্গসৈন্য পাঠানগণকে পুনঃপুনঃ রণক্ষেত্রে বিধ্বস্ত করিয়াছে। তোঘন খাঁ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া বঙ্গসৈন্যের নিকট পরাজিত ও লাহিত হন। দিল্লীর সম্রাটের সুশিক্ষিত পাঠানসেনা—যাহারা জয় ভিন্ন পরাজয় জানিত না—তাহারা উড়িষ্যার কৃষকসেনার নিকট পরাধীন হইয়া দুইশত কোশ পর্যন্ত হাটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। লুপ্ত গোরব পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত সম্রাট পুনরায় বহু সেনা প্রেরণ করেন, কিন্তু বিজয়ী বঙ্গসেনার বাহুবলের নিকট বাতাতাড়িত ধূলিকণার তায় উড়িয়া গেল।

তোঘন খাঁর পরাজয়ের দশ বৎসর পরেও পাঠানসেনা পূর্ববৎ পরাজয় লাভ করিয়া উড়িষ্যার সীমা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। উড়িষ্যার বাঙ্গালী গঙ্গাবংশীয়গণের নিকট পাঠানের পরাজয়ের ও লাহুনার অবধি ছিল না। তিন শত বর্ষ পর্যন্ত গঙ্গাবংশীয়গণ সর্বদা তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইত।

বক্ষিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, —“উক্ত মুসলমানদিগকে গজাবংশীয়গণ তিন শত বৎসর ধরিয়া যেরূপ শাসিত রাখিয়াছিলেন, সেরূপ চিতোরের রাজবংশ ভিন্ন আর কোন রাজবংশ পারেন নাই। তাঁহারা যেমন মুসলমানদিগকে শাসনে রাখিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজদিগকেও তেমনি শাসিত রাখিয়াছিলেন।”

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের দেহান্তের পর হইতেই বাঙ্গালার সামাজিক ও রাজনৈতিক আকাশ ঘোর কুয়াসাজ্বর হইয়া গেল। “বিচারালয় বঙ্গের হিন্দুসমাজ ও রাজনীতি তখন মর্যাদাপ্রাপ্ত, অমাত্যবর্গ রাজার প্রীতি অমুরাগ ও শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয়া মহিষী বল্লাভদেবী এবং রাজ-জ্ঞালক কুমারদত্তের আচরণে প্রজাগণ তখন ‘ত্রাহি ত্রাহি’ ডাকিতেছে।” হিংসা, ঘেব, পরভীকাতরতা প্রভৃতি বঙ্গের রাজভবনে বাস্তবিক তৎপ্ৰসঙ্গ প্রবাহিত করিতেছে, ক্ষুদ্র তখন আপনার স্থান বিস্মৃত হইয়াছে, বৃহৎ তখন আপন অন্ত্রে আপনাকেই কাটিয়া ধরু করিতেছে।

মহম্মদ-ই-বক্তিরারের বঙ্গে আগমনের পূর্ব হইতেই বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত সেন-সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হইতেছিল। গোড়বঙ্গ ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ সকলেই স্বাধীন, সকলেই প্রধান হইবার জন্ত ইচ্ছুক থাকার বহিঃশত্রুকে বাধা দিবার জন্ত বঙ্গের মিলিত শক্তি অগ্রসর হয় নাই।

বঙ্গের সামাজিক অবস্থাও তখন অতি নিম্নস্তরে উপস্থিত হইয়াছিল। বঙ্গসমাজে ছিল ঘোর উচ্ছ্বলতা ধর্মের নামে উহার পত্রপল্লববহুল শাখাপ্রশাখার বিস্তার, সাম্প্রদায়িক স্বর্গীয়তা ও স্বার্থপরতা এবং আরক্তচক্ষু সমাজের নির্ভর অমুদারতা। “বঙ্গের হিন্দু-সমাজ সেকালে এতই স্থূন স্থূত্রে আবদ্ধ ছিল যে, উহা বাতাসের স্পর্শও সহ্য করিতে পারিত না। কোন

মুসলমান একজন হিন্দুর মুখে এক বিন্দু বারি নিক্ষেপ করিলেই সে সমাজচ্যুত হইত। শেষে এমন হইয়াছিল যে একজন মগের সামান্ত স্পর্শও ঘূরের কথা, কোন মগ বা ফিরঙ্গীর সহিত অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইলেই হিন্দুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, কোন হিন্দুর বাড়ীর উপর দিয়া একজন মগ হাটিয়া গেলেই হিন্দু জাতি-চ্যুত হইত।... সুতরাং পাঠানশাসন-সময়ে করতোয়ার পূর্বতীর হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমুদয় ভূ-ভাগে আর্ধ্য ও অনাৰ্ধ্য উভয় জাতিই ক্রমে ক্রমে মুসলমান হইতে লাগিল। আর্ধ্যগণ সমাজের তাড়নার ও অনাৰ্ধ্যগণ সমাজের দ্বণায় পরধর্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল।” \*

সমাজের অত্যাচার যখন চরমে উঠিল, তখন উৎপীড়িত ও বিপন্ন অধিবাসিগণ ‘যবন-রূপী’ ধর্মের আগমনে পবন পুঙ্কিত হইল। এমন কি দেবগণ পর্য্যন্ত “সতে হুয়া একমন আনন্দেতে পরিল ইজার।”

রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ।†

অমুদার সমাজের কঠিন ব্যবহার বঙ্গের সর্বনাশ হইল, জনশক্তি হ্রাস পাইল, জনসাধারণের সহানুভূতি লুপ্ত হইল, বঙ্গের প্রভুশক্তি কম্পিত হইয়া উঠিল। এই সুযোগে মহম্মদ-ই-বক্তিরার পাঠানের রাজপতাকা বহন করিয়া বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেন-বংশের শেষ ঐন্দ্রপী বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন পাঠানের গতি প্রতিরোধ করিবার জন্ত সচেষ্ট হইলেন। তাঁহারা তুরস্কদিগকে নানাহানে পরাভূত করিলেন বটে, কিন্তু দেশ ক্ষয়শূন্য হইল না। শেষে এমন এক দিন আসিল যখন “সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল, রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।..... গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল, আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ষা, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা সেই অন্ধকারে ঢাকিল, কুঞ্জতীরভূমি, নদীসৈকত, নদী-তরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার আঁধার আঁধার হইয়া লুকাইল।” †

\* বিভারিজ সাহেব বলেন, “The low-caste Hindus were generally glad to change a religion of degradation for one which gave them independence and self-respect.”

† বিবিধ এসজ—বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার রাজস্বী ক্রমে ক্রমে ভাগীরথী-গর্ভে ন্যস্ত লাগিলেন। বাঙ্গালার কানন প্রান্তর কম্পিত করিয়া তখন এক বিপুল রণ-নিদ্রা সহসা গজিয়া উঠিল—“দীন! দীন!!”

পাঠানের প্রবল বক্তা বঙ্গভূমি প্রাণিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। পাঠানগণ মগধের পূর্বভাগ আক্রমণ করিল। মগধ-জনপদবাসিগণ পুর্বেই আত্মরক্ষার জন্য ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। পাঠানেরা দেখিল তথায় জন নাই, ধন নাই—আছে কেবল রাশি রাশি বোদ্ধ গ্রন্থ। তাহারা সে সকল অমূল্য গ্রন্থ অনলে ভস্মীভূত করিল—বত শত বর্ষের সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার মুহূর্ত্তে ধ্বংস হইতে লুপ্ত হইল। “পৃথ-মিত্রেঃ হত্যা কাণ্ডেও যে ধর্ম্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, কুমারিল শঙ্করের চেষ্টাতেও যে ধর্ম্ম পূর্ব ভারতে অক্ষুণ্ণ ছিল, ব্রাহ্মণের নিরস্তর বিষেও যে ধর্ম্ম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল—মুসলমান আক্রমণেই সে ধর্ম্ম শুষ্ক যে ধ্বংস হইল তাহা নয়, বিশ্বাসি আক্রমণেই সে ধর্ম্ম শুষ্ক যে ধ্বংস হইল তাহা নয়, বিশ্বাসি নাগরে ডুবিয়া গেল। লাভ হইল মঙ্গোলিয়ার, লাভ হইল তিব্বতের, লাভ হইল পূর্ব উপদ্বীপের, লাভ হইল সিংহলের। তলোয়ারের মুখ হইতে যাহারা অগ্ন্যহতি পাইয়াছিল, তাহারা ঐ সকল দেশে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহাদিগকে পাইয়া ঐ সকল দেশ কৃতার্থ হইয়া গেল; তাহাদের বিস্তারিত হইল, ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইল, জ্ঞানবৃদ্ধি হইল, শিল্পবৃদ্ধি হইল, ক্ষতি বাহা হইবার তাহা বাঙ্গালারই হইয়া গেল।” \*

পাঠানেরা দলবদ্ধ হইয়া চারিদিকে লুণ্ঠন করিতে লাগিল। মগধ, অঙ্গ ও গোড় সম্রাট হইয়া উঠিল। বঙ্গ তখনো শোণ্যের অভাব ছিল না। বঙ্গিয়ার নবদ্বীপ বা বঙ্গের কোন অংশ স্বীয় অধিকারে আনিতে সমর্থ হন নাই, উহা লুণ্ঠন করিয়াছিলেন মাত্র।

লক্ষণসেনের রাজধানী লক্ষণাবতী বিজয়ের অষ্ট বর্ষ পরেও তাঁহার বংশধরগণ দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে স্বাধীন নরপতিরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। তখনো তাঁহাদের হয়, হস্তী, রণতরী ও সেনা ছিল। যেমন পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে, তেমনি কামরূপে, আসামে ও ত্রিপুরায়, তেমনি উড়িষ্যায় পাঠানসেনা প্রবেশাধিকার পায় নাই। “স্বর্গীশ শাসন কালের মধ্যে পাঠানগণ তখনো পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোট প্রবেশ করিতে

পারে নাই, দক্ষিণে সুলতান প্রদেশ হিন্দুরাজ অধিনে ছিল। ত্রিপুরায় ত্রিগুনানার পাঠানপতাকা উড্ডীন হইতে পারে নাই, বরং ত্রিপুরারাজই মধ্যে মধ্যে পাঠানের গোড়জনপদ আক্রমণ করিয়া সম্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল।”

হিন্দুদৈবত কখনও দুর্বলহস্তে অস্ত্র ধারণ করে নাই। তাহারা রণনৈপুণ্যে ও যৌধশক্তিতে গরীবান ছিল; তাহারা পদে পদে আততায়ী সৈন্তের গতিরোধ করিয়াছিল। “আরব দেশীয়েরা এক প্রকার দিগ্বিজয়ী, যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছেন, তখনই তাহারা সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীর অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। \* \* \* আরবোরা মিশর ও শিরিয় দেশ মোহাম্মদের মৃত্যুর ছয় বৎসর মধ্যে, পারস্য দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, ও তুর্কীস্থান অষ্টাদশ বৎসরে সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে।” \* কিন্তু তিন শত বৎসর চেষ্টা করিয়াও তাহারা ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারে নাই।

১০১৬ খৃঃ তুর্কীজাতীয় মুসলমানগণ পুনরায় ভারতাদিকারের চেষ্টা পায়। কিন্তু পঞ্চদশবিধোত প্রদেশ ব্যতীত আর কোন স্থানেই তাহাদের স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। “আরবোরা যেরূপ বিফলপ্রবৃত্ত হইয়াছিল গজনিগরাধিপতি তুর্কীরাও তজ্ঞ। \* \* \* তুর্কীদিগের প্রথম ভারত আক্রমণের ২১৩ বৎসর পরে তৎস্থানীয় পাঠানেরা ভারতবর্ষ অধিকার করে, তাহারা আরব্য বা তুর্কীস্থানীয়দিগের জায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপাবিত নহে। তাহারা কেবল পূর্বগত আরব্য ও তুর্কীদিগের স্থিতি কার্য সম্পন্ন করিয়াছিল। আরব্য, তুর্কী এবং পাঠান এই তিন জাতির যত্নপারস্পর্যে সার্বিক পাঁচশত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়।” †

ভারতবিখ্যাত হিন্দুসাম্রাজ্য বিচূর্ণিত হইল বটে, কিন্তু পাঠানগণ তিনশত বৎসরেও বঙ্গজয়ে সমর্থ হয় নাই। হিন্দু রাজত্বগণ বহুকাল স্ব স্ব রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর বাহুবলই তাহার কারণ।

‡ “সর্বকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর পশ্চিমে পার্শ্বভাষারে প্রবেশলাভপূর্বক ভারতাদিকারের

\* সভাপতির সন্ধান ১০১১—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

† ভারত কলঙ্ক—দক্ষিণ চব্বি চট্টোপাধ্যায়।

‡ আইন-ই-আকবরী।

চেঁটা পাইয়াছে। পারলীক, যোন, বাহ্লিক, শক, হুণ, আরব্য, তুর্কী সকলেই আসিয়াছে এবং সিঁছুপারে বা ওছভয় তীরের স্বল্প প্রদেশ কিছুদিনের জন্ত অধিকৃত করিয়া পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত অধোরা সকল জাতিকে শীঘ্র বা বিলম্বে দূরীকৃত করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়া ছিলেন। পঞ্চদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আক্রমণস্থলীভূত হইয়া এতকাল যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অল্প কোন জাতি পৃথিবীতে নাই এবং কখনও ছিল কিনা সন্দেহ। অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, তাহাদিগের বাহুবলই তাহার কারণ, সন্দেহ নাই, অস্ত্রধারণ দেখা যায় না।” \*

বাহ্লী হিন্দুরা তখন স্বতন্ত্রতার ক্রোড়ে নিদ্রা যায় নাই নিশ্চয়। পাঠানের রণভেরী যেদিন দিক্ প্রকম্পিত করিয়া উত্তর ভারতে বাজিয়া উঠিল, সেদিন বাহ্লীও আতঙ্কিত রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান হইয়াছিল। বহু পূর্বে হইতেই বাহ্লী রণজয়ে বা রাজ্যবিজয়ে, আক্রমণে বা আত্মরক্ষায় বাহ্লীর তথা ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বীয় গৌরবস্তম্ভ প্রোথিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পাঠান যে সময় উড়িষ্যার কিয়দংশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তখনো বাহ্লীর অধিকাংশই বাহ্লীর স্বাধিকারে ছিল। বাহ্লীর ভূস্বামিগণ তখন আবশ্যক হইলে ৮০১১৫২ পদাতিক, ১৮০ গজ, ২৬০ কামান ও ৪৪০০ রণতরী দিতে পারিতেন + প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের সমবেত শক্তি ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল।

কিন্তু বাহ্লীর দুর্ভাগ্য যে স্ব স্ব প্রধান ভূস্বামিগণ একত্র হইয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে যত্নবান হইলেন না। তাহারা একথা ভাবেন নাই যে “বাস্তবিক প্রতিকার উপরেও একটি বৃহত্তর প্রতিষ্ঠার আকাশ ছিল, একথা ভাবেন নাই যে, ক্ষুদ্র একটি জনপদের কীর্তিমণ্ডিত জয়ন্তভের স্বানে একটি সমগ্র দেশের বৃহত্তর মহত্তর অতুল কীর্তিমন্দির বাহ্লীরই অঙ্গুলিম্পর্শে বিরাট ব্যোমগগনে উন্নতশীর্ষে দণ্ডায়মান হইবার জন্ত শশাঙ্কের কাল হইতেই অপেক্ষা করিতেছিল।” কিন্তু বাহ্লীর জাতীয়তার অভাবই

তাহার জাতীয় জীবনচক্রের পরিপন্থী। বাহ্লীর কিসের অভাব ছিল? কিসের দৈন্তে বাহ্লী চিরপদ-দলিত? বাস্তবিকভাবে বীরত্বেও বাহ্লীর ইতিহাস সমুজ্জল, গৌড়ভূজঙ্গ শশাঙ্ক, সম্রাট ধর্মপাল, দেবপাল বাহ্লীর গৌরব সন্দেহ নাই; কটাসেন, একডালা মান্দারন প্রভৃতি বাহ্লীর শৌর্যপ্রভায় সমুদ্রাসিত, চাঁদ, কেদার, প্রতাপ, সীতারাম প্রভৃতির সিংহগর্জনে দিল্লীর সিংহাসনও একদিন প্রকম্পিত হইয়াছিল; কিন্তু এত থাকতেও কোন দিন একটি বাহ্লী জাতি গড়িয়া উঠিবার আকাশ পায় নাই। কেহই বাহ্লীকে একটি জাতিক্রমে গঠন করিবার চেষ্টা করেন নাই। সিংহাসনের গোষ্ঠে নিয়ত সময়কোলাহলে লিপ্ত থাকিয়া দুর্ভিক্ষ পাঠান জাতি গোড়ে আসিয়া সেকথা ভাবিয়া দেখে নাই, বিলাসের শ্রোতে গা ঢালিয়া বাহ্লীর মোগল তাহা বুঝে নাই।” \*

পাঠানের আক্রমণে কিরূপে হিন্দুস্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই :—

হিন্দুরাজত্বগণের “ঐক্য অবলম্বন করিয়া সম্মিলিত ভাবে অস্ত্রধারণ করিবার পক্ষে প্রবল অন্তরায় ছিল। তৎকালে সাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ষীয়েরা একতা শূন্য হইয়াছিল। ভারতবর্ষের রাজত্বমণ্ডলী মধ্যে সর্বক্ষণ ঈর্ষ্যা রেষ প্রজ্জ্বলিত ছিল। এক রাজ্য অল্প রাজ্যের ধ্বংসসাধনজন্ত সর্বদা সচেষ্ট থাকিত। মোসলমান আততায়ীরা ভারতবর্ষের দ্বারদেশে উপনীত হইলে রাজত্বগণ কদাচিত্ সম্মিলিত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন। ভারতবর্ষের রাজত্বমণ্ডলীর বিপুল সৈন্যবল ছিল। কিন্তু এই কারণে সে সৈন্যবল অবশেষে বৃথা হইয়াছিল। তারপর ভারতের জনসাধারণ কখনও মোসলমানের বিরুদ্ধে উত্থিত হয় নাই। কেবলমাত্র রাজত্ববর্গই ক্ষাত্রাধর্ম্ম ও রাজনীতি প্রতিপালনজন্ত আততায়ীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণে কখনও হিন্দু প্রজাকে বিচলিত করিতে পারিত না; তাহারা কেবল আপন আপন ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্তই যত্ন করিত, এবং উহা রক্ষা পাইলেই কৃতার্থ হইত। রাজ্যের পরিবর্তনে হিন্দুপ্রজা কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া অভিনব রাজ্যের বশত স্বীকার করিত।” ‡

\* ভারত কলক—বন্ধিন। ‡ বিবিধ প্রবন্ধ—ঐ

† ৮০১১৫২ পদাতিক, ১৮০ গজ, ২৬০ কামান ও ৪৪০০ রণতরী দিতে পারিতেন।

‡ বাহ্লীর বল—ক্রীষ্ণরাজেন্দ্র লাল আচার্য্য।



দেশের অবস্থা দিন দিন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে। লোকের আয় নাই, অথচ খরচ দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে লক্ষ লক্ষ লোক অর্দ্ধাধারে বা অনাহারে দিন যাপন করিতেছে এবং কলেরা, উদরাময় প্রভৃতি রোগে অকালে কাণ্ডাশে পতিত হইতেছে। চারিদিকে হাহাকার, অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে অন্ন নাই। দিন দিন বুদ্ধিমত্তার চীৎকার, মুমূর্ষুর হাহাকার বিলাপে ভারতের আকাশ বাতাস ভরিয়! উঠিতেছে। রোগ, শোক, জরা ভারতবাসীর দীন কুটারে ঘর বাধিয়াছে। অভাগী ভারতের মুখের পানে চাহিয়া জড়হৃদয় পাষণ্ড ও গণিয়া যায়, কিন্তু সেই শ্রামল স্নেহে চিরবর্ধিত সন্তানের কোমল হৃদয় ত কাঁদে না। আজিও উচ্চনীচ অহঙ্কার অভিমান আমাদের চরণগুলি কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মায়ের শীর্ণ দেহ, স্নান মুখ দেখিয়া সন্তানের হৃদয় কাঁদে না, অত্যাচার-পীড়িত ভ্রাতার ক্রন্দনে হাই উঠিয়া থাকে। যে কৃষককুল দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ, তাহাদের শতকোটির হাহাকার চীৎকারে বিলাসব্যসনলিপ্ত ধনীর আমোদে ব্যাঘাত ঘটে না।

ভারতের এ দশা চিরদিন ছিল না। এমন একদিন ছিল, যখন ভারতের স্বার্থ বিদেশী বণিকৃগণের মধ্যে একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধের সৃষ্টি করিত। তখন ভারত স্বাধীন ছিল, ভারতে ব্যবসায় বাণিজ্য অবাধে চলিত—বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সম্প্রদায় তাহাদের নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমাজের, দেশের অর্থবৃদ্ধির চেষ্টা করিত। তখন কামার কুমারের কাজ করিত না, জোলা তাঁতির জমিকর্ষণ করিয়া, বলদের ঘাস যোগাইয়া দিন কাটাইত না। ব্রাহ্মণ তাঁহার ধর্মকর্ম ফেলিয়া রাজদরবারে 'হা চাকুরী, হা চাকুরী' বলিয়া ঘুরিত না, ক্ষত্রিয় অসি ফেলিয়া মসী

ধরিত না, বৈশ্য বাবসায় ফেলিয়া চাকুরীর জন্ত ঘুরিত না। এখন চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, কাহাকে মারিয়া কে খাইবে সে জন্ত ছুটাছুটি। এদিকে ভারতের অর্থ-শোষণ হইতে লাগিল, ভারতবাসী নিষ্কাসিত-রস ইক্ষুর ছোবড়া হইতেও অধিকতর শুষ্ক হইয়াছে। বলিতে গেলে ভারতবাসী রক্তমাংসবিহীন কঙ্কালসম জীব মাত্র।

স্বর্গীয় দাদাভাই নোরজী ১৮৭২ সালে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, ভারতবাসীর বার্ষিক আয় জনপ্রতি ২০ টাকা মাত্র। লর্ড ক্রোমার বলিয়াছেন, ভারতবাসীর বার্ষিক আয় সম্প্রতি ২৭ টাকার অনধিক। ১৯০০ ডিগ্রী সাহেব দেখাইয়াছেন যে ভারতবাসীর জনপ্রতি আয় ছিল ১৮৫০ সালে মাত্র ৩০ টাকা, ১৮২২ সালে ২২ টাকা এবং ১৯০০ সালে ১১০ টাকা। ১৯০১ সালে লর্ড কার্জন বলিয়াছেন যে ভারতবাসীর জনপ্রতি বার্ষিক আয় ৩০ টাকা। ১৯০০ হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত ২০ বৎসরের গড় নিলে পাওয়া যায় ভারতবাসীর জনপ্রতি বাৎসরিক আয় ৪৪ টাকা।

এই ত ভারতের অবস্থা। তার মধ্যে দেশের অর্থের তিন ভাগের এক ভাগেরও অধিক অর্থ ভোগ করেন শতকরা ৫ জন। শতকরা ৩৫ জন ভোগ করেন উক্ত ধনের ৩ ভাগের এক ভাগেরও অধিক অর্থাৎ এই উভয় শ্রেণীর লোক বা শতকরা ৪০ জন ভোগ করেন অর্থের ১০০ ভাগের ৭০ ভাগ। বাকী শতকরা ৬০ জন ১০০ ভাগের ৩০ ভাগ ম'য় ভোগ করেন। ভারতের লোকসংখ্যা ৩১ কোটি ধরিলে বুঝা যায় যে ১০০ ভাগের ৬০ ভাগ লোক অর্থের অভাবে কতই না ক্লেশ ভোগে করিয়া থাকে। বস্তুতঃ ভারতের লোকের আয় এত অল্প যে প্রত্যেক তিন জনের মধ্যে দুই জন মাত্র অতি অপকৃষ্ট রকমের আহার দিনে পাইতে পারে এবং যদি শরীররক্ষার্থে

দিনে ৩ বার আহাৰ কৰে, তাহা হইলে কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ থাকিতে হয়, আশ্রয়ের অভাবে গাছতলার বাস করিতে হয়। ভারতের অবস্থা এই মাত্র বলিলেই বুঝা যাইবে যে ইংরাজশাসনের প্রায় পোনে দুইশত বর্ষমধ্যে ভারতে প্রায় দুই কুড়ি বার স্থিতিক উপস্থিত হইয়া কোটি কোটি লোকের প্রাণনাশ করিয়াছে।

একত্ব সরকারকে বা অপর কাহাকেও দায়ী করিলে চলিবে না। বর্তমান জগতে might is right নীতির অঙ্গসরণ করা হইতেছে, সবলের অধিষ্ঠান এবং ছুর্ললের নির্কীর্ণ সে নিয়মে অবশ্যভাবী। সুতরাং বাচিতে হইলে আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না কালের মহাধাত্রার পথে সকলকে নিজ সৰণ বহন করিয়া নিতে হইবে। আমাদের মনের দৃঢ়তা থাকিলে আমরা নিজেই মুক্তির পথ আবিষ্কার করিতে পারি, এবং কেহই ইহা বার্থ করিতে সমর্থ হইবে না—সকল বাধা বিয় ধুলির মত উড়িয়া যাইবে।

একত্ব দৃঢ় পণ ও কঠোর অধ্যবসায় আবশ্যক। পশ্চাতে ভারতের গৌরবময় অতীতের দিকে এক চক্ষু রাখিয়া ভবিষ্যতের নবীন ভাংতে গঠিত করিতে হইবে। আমাদের চরিত্রদোষেই আমরা পশ্চত লাভ করিয়াছি। সে সব দোষ বিদূরিত করিতে হইবে। দুর্ভাগ্যবশত বলা যাইতে পারে যে আমরা গরীব, ক্ষুধার অন্ন নাই, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নাই, অথচ স্বগড়া বিবাদ, মামলা মোকদ্দমা করিতে আমরা পিছু-পা হইনা। আমরা মায়ের পেটের ভাইয়ে ভাইয়ে, গ্রামবাসী ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করি, তারপর বিষয় সম্পত্তি বাঁধা দিয়া ১০।১২ ক্রোশ পথ হাট্টিয়া বা রেল কোম্পানী ও জাহাজ কোম্পানীর বুকোদয় পূর্ণ করিয়া আদালতে মোকদ্দমা করিতে যাই। হারয়ে হুত্যা! সেখানে কত কষ্ট, কত লাজনা, কত অবিচার! দুই পক্ষেই সর্বস্বান্ত হই, তবু চক্ষু ফোটে না। আমরা ইচ্ছা করিলেই এ সকল নিজেদের মধ্যে বীমাংসা করিয়া সর্বস্বান্ত হওয়ার দার হইতে মুক্ত হইতে পারি।

হার। আমাদের কি স্বরণ আছে 'সর্বনাশে সমুৎপন্ন অর্দ্ধ ভ্রাতৃপতি পণ্ডিতঃ।'

এখনও দেশে বহু অর্থ আছে। দেশের ধনী সম্প্রদায় সেগুলির সম্যবহার করিলে এখনও দেশের দুরবস্থা অপনোদিত হইয়া ভারতবাসীর হাত-মুণ্ডিত মুখ বিকশিত হইতে পারে। আমরা বলিতেছি না যে সে অর্থ দয়া দাক্ষিণ্যদ্বারা দেশের দারিদ্র্য মোচন কর বা ছুঃখীর ছুঃখ দূর কর। আমাদের বক্তব্য এই যে ব্যবসায় বাণিজ্য বিনা দেশের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইতে পারে না। ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্ত চাই টাকা। টাকা ছাড়া উহা চলিতে পারে না। অনেক বলিতে পারেন, বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে নিপুণতার অভাব এবং 'বঙ্গলক্ষ্মীর' মত প্রকাণ্ড ও দেশের হিতজনক মৌখ কারবার যখন 'পটল' তুলিতে পারে, তখন বাঙ্গালীদ্বারা এ কাজ হইতে পারে না। আমরা বলি হইতে পারে বিশ্বাসের অভাব হইলে স্বতন্ত্র কারবার করিয়া। নিজ নিজ কারবারে উপযুক্ত দক্ষ লোক রাখিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে বহু কারবার চলিতে পারে এবং দেশে এমন অনেক ধনী আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে তদ্বারা বেকার সমস্তার সমাধান করিতে পারেন। আমরা জানি, ধনীসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই স্বদেশের লোভে দেশের অর্থ শোষণ করিয়া নিজের ভাগ্যের অচিরে কাঁপাইয়া তোলেন। কিন্তু ইহাতে দেশের ছুঃখ দূর হয় না, দারিদ্র্যের নিপত্তি হয় না। বরং দিন দিন ইহার কুল দেখা যাইতেছে। নানাহানে অপারগ অধর্মগণ সংঘবদ্ধ হইয়া ঋণ অধীকার করে। ইহাতে মহাজনগণের সময় সময় নানা বিপত্তি ঘটে। বর্তমান সময়ে দেশ যে অবস্থার উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের মনে হয়, বুদ্ধি কৃষকগণ নিরুপায় হইয়া, অন্নবস্ত্রের অভাবে মরিয়া হইয়া উঠিবে। তখন কাহারও সাধ্য হইবে না সে জনশ্রোতের গতি নিরোধ করে। এখন হইতে দেশের হিটৈত্বী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, তৎপ্রতীকারে উত্তম না করিলে দেশের আরো যে কত অশান্তি ঘটিবে তাহা ভবিষ্যৎই জানেন।







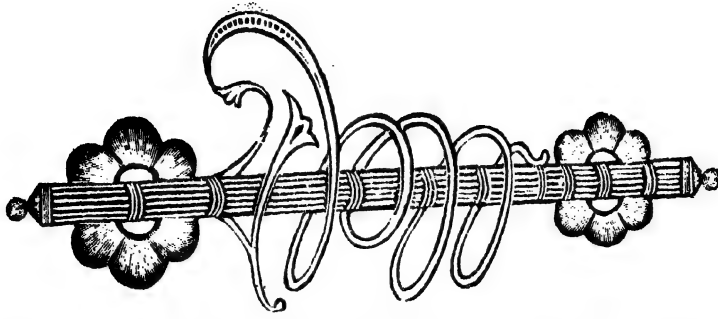
"বদ্ব"

"সবিলে 'দে' অর্থাৎ 'দে' বসে থাকে—

অর্থাৎ 'দে' বসে থাকে—

—বদ্বিলে

—বদ্বিলে



তৃতীয় বর্ষ ]

বৈশাখ, ১৩৩৫ ।

[ ৮-ম সংখ্যা ]

### বৈশাখবরণ

শ্রীকানিদাস রায় কবিশেখর, বি-এ

ধৃত্য দাতা পুণ্যচেতা হে বিশাখরাজ,

তোমায় আজি কর্তে বরণ,

পাইনে থুঁজে উপকরণ,

নিঃস্ব আমি এনেছি মন্—অঞ্জলিতে লাজ ।

তুমি দেহ পাখীর কুজন জুড়ায় তাহে কাণ,

দিলে—ফলের সুরস রসনারে,

ফুলের সুবাস নাসিকারে

মধুর ছায়া শীতল হাওয়া স্পর্শে জুড়ায় প্রাণ ।

বনবাগানে রঙ্গীন ক'রে দিলে আঁখির ভোজ,

দানে—ইন্দ্রিয় কেউ যায়নি বাকী,

ফুটাইলে মনের আঁখি,

\* রবির জনম দিলে, জ্ঞানের আলো যোগায় রোজ ।

কি দিবে আর অশ্রু যাহার কেবলি সম্বল ।

ঝরুক তাহাই তোমার পায়ে,

তুলসী অশখ্ বটের ছায়ে,

কাজল কবির প্রাণের গভীর গঙ্গাধারার জল ।

১লা বৈশাখ, ১৩৩৫

\* কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম বৈশাখ মাসে ।



## নিশীথের আলো

### শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

এদিকে মানিকের অভ্যাচারও দিন দিন একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। রজনগৃহে প্রণতি কাহাকেও বাইতে দিন না, মানিক তাহার সে আইন লঙ্ঘন করিয়াছিল। এক দিন রজন করিয়া রাখিয়া স্নানান্তে আসিয়া প্রণতি দেখিল, ছেলেটা নিজেই একটা খালার ভাত বাড়িয়া লইয়া অসজ্জিত চিন্তে খাইতে বসিয়া গিয়াছে। তাহার কাণ মগিয়া তাহাকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দেওয়ারসক্বেও কোম উপকার দেখা গেল না।

আহারের দিকে রীতিমত দৃষ্টি রাখায় দিন দিন মানিক আরোগ্যের পথে চলিতেছিল। প্রণতি জানিত শুধু চিকিৎসাভেই রোগ আরোগ্য হয় না, পথ্যের দিকে আগে দৃষ্টি রাখা দরকার।

বাপুয়া প্রণতির বিছানা ছপুৰ বেলা করিয়া রাখিত। এই ছেলেটা কখন নিদ্রিত বাপুয়াকে ফাঁকি দিয়া আসিয়া এই ছদ্মফণনিভ বিছানাটিতে কাদা ধূলা পায়, গায় উঠিয়া বেশ এক ঘুম দিয়া লইত। তাহাকে যতই কেন না উৎপীড়ন করা হোক, সে নির্বিকার থাকিত, যে কাজের জন্ত সে আজ প্রহার সহ করিলে কাল আবার তাহাই করিবে।

সেদিন বৈকালে শুল হইতে বাসায় ফিরিয়া প্রণতি দেখিল মানিক তাহার বইয়ের আলমারীর কাঁচগুলো ভাঙিয়া নিবিষ্ট চিন্তে বই বাহির করিতেছে ও বে বইয়ের মধ্যে ছবি আছে, তাহা ছিড়িয়া এক করিয়া রাখিতেছে। আলমারীর উপরে যে ছবিটা সুদৃশ্য কাঁচের মাস ছিল, সে ছটা চূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। বাপুয়ার সে দিন জ্বর আসিয়াছিল, সে আগা গোড়া কয়ল হুড়ি দিয়া তাহার ঘরে পড়িয়া আছে, ছেলেটা ততক্ষণে নিশ্চিন্ত ভাবে কাজ শুছাইতেছে। ঘরের মেঝের উঠানের যত

কাদা মাটি, পুতুল পড়িয়া আছে, সেই মাটিবৃত্ত হাত খানি মুছা হইয়াছে বিছানার চাদরে, বালিসের গায়ে।

শ্রান্ত প্রণতির আপাদমস্তক জলিয়া গেল। ছেলেটার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া সে একটা ঘরে সে দিনকার মত বন্ধ করিয়া রাখিয়া কুলের পোষাক খুলিয়া ঘর পরিষ্কারে মন দিল।

সন্ধ্যা বেলা হিরন্ময় রোগী দেখিতে দর্শন দিলেন। প্রণতি তখন বিছানার চাদর, বালিসের ওয়াড় কাচিয়া তুলিতেছিল। বৃহৎ চাদরটাকে কোম মতে কারদার আনিয়া সে মিণ্ডোইবার চেষ্টায় ছিল; ব্যস্তভাবে হিরন্ময় বলিলেন, “একি, আপনি যে,—বাপুয়া কোথায়?”

প্রণতি উত্তর দিল, “তার জ্বর এসেছে।”

হিরন্ময় জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই সন্ধ্যাবেলা এগুলো কাচ্ছেন যে? আমার চাকরকে কাল সকালে পাঠিয়ে দিতুম, সে আপনার কাজগুলো করে দিয়ে যেত।”

প্রণতি মুহূর্তে বলিল, “দরকার নেই, বাপুয়ার জ্বর প্রায় ছেড়ে এসেছে, সকালে সে নিজেই সব পারবে, আমার কিছুই করতে দেবে না।”

হিরন্ময় একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া হাসি মুখে বলিলেন, “আপনার প্রকৃতি আমি বেশ বুঝছি মিস বোস, আপনি কিছুতেই কারও সাহায্য নিতে চান না। বাক, মানিক কোথা গেল, তাকে দেখতে হবে যে।”

অকুণ্ঠিত করিয়া প্রণতি বলিল, “তাকে আজ আপনার দেখতে হবে না, সে বেশ ভালোই আছে। হরস্তুপণ তার এত বেড়েছে, যার জন্তে আজ তাকে বন্ধ করে রেখেছি, এক দিন বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া দরকার।”

হিরন্ময় মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, “দেখুন আপনি, আমি কিন্তু আগেই বলেছিলুম, ও ছেলেকে রাখা আপনার পক্ষে খুব কষ্টকর হবে। শরৎ বাবুকে আমি প্রথমেই বলেছিলুম আপনার বাড়ি যেন এ ভার না চাপান। আপনি কি একে শাসন করতে পারবেন? আমার তো তা মনে হয় না।

প্রণতি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, “নিশ্চয়ই পারব। তিনি পারেন নি বলে আমি ও যে পারব না এমন কথা হতে পারে না। আপনি দেখতে পাবেন আমি ওকে মাহুষ করে তুলতে পারি কিনা।”

সে দিনে গল্প জমিল না, খানিক বাদেই হিরন্ময়কে বিদায় লইতে হইল।

সে রাত্রিতে প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় ও একা একটা ঘরে বদ্ধ থাকিয়া মাণিক খানিকটা তর্জ্জন গর্জ্জন করিল, তাহার পর চীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিল, প্রণতি কেবল তাহাকে জঙ্গ করিবার জন্তই ঘর খুলিল না। কাদিয়া কাদিয়া শ্রান্ত বালক আপনিই চুপ করিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িল। সে রাত্রিতে তাহাকে অভূক্ত রাখিয়া প্রণতিও আহার করিতে পারিল না, সমস্ত রাত্রি তাহার বিনিদ্র অবস্থায় কাটিয়া গেল।

কিন্তু বাস্তবিকই পর দিন হইতে এই ছরস্ত ছেলের ছরস্তপণা একেবারেই ঘুচিয়া গেল। সে ভারী ঠাণ্ডা হইয়া পড়িল এবং একখানা বর্ণপরিচয় লইয়া অঁ আ পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার মনের বেগ এই দিকে পড়ায় কয়েক দিনের মধ্যে প্রথম ভাগ শেষ করিয়া দ্বিতীয়ভাগ ধরিল। তাহার লেখা পড়ায় ক্ষুধা উন্নতি দেখিয়া বাপুয়া চমৎকৃত হইয়া গেল; প্রণতিকৈ লক্ষ্য করিয়া বলিল, “যাই বলুন, দিদিমণি, ছেলেটা বাঁচলে একটা মাহুষ হবে। ওর মাথা আছে, আমার মত নয়।”

প্রণতি গভীর ভাবে উত্তর দিল, “তাই বটে।”

ফুলের মেয়েদের মধ্যে যে মেয়েটা প্রণতির বড় প্রিয় ছিল তাহার নাম লীলা; লীলা নামে সে খ্যাত ছিল।

এই মেয়েটার অল্পবয়সেই শরৎ সাহায্য করিয়া ছিলেন, তাহার পিতা হরিশাধন ঘোষকে নিজের জমিদারীতে একটা কাজ দিয়া এই পরিবারকে অনাহার হইতে বাঁচাইয়াছিলেন।

লীলার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল অর্থাভাবে এ পর্যন্ত মেয়েটার বিবাহ হইতেছিল না। বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ে জন্মান মহাপাপ, বিধাতার অভিশাপ। একটা মেয়ের বিবাহ দিতে যে অর্থের প্রয়োজন সেরূপ অর্থ হরিঘোষের ছিল না। মাসিক কুড়িটা টাকা বেতন পান, তাহাতে অতিক্রমে সংসার-যাত্রা নির্বাহ হয় মাত্র।

মেয়েটা ছিল শ্রামবর্ণী, পাতলা ছিপছিপে। যদিও তাহার মুখখানি সুন্দর ছিল, অঙ্গসৌষ্ঠব পাতলার মধ্যে নিন্দনীয় ছিল না, তথাপি ধৈর্যবলমাত্র অর্থের অনাটনের জন্ত পাত্র জুটতেছিল না। দুই একজন পাত্রী দেখিয়া পছন্দ করিলেও পাত্রীর পিতার অবস্থা শুনিয়া প্রকাশ্যভাবে অমত জানাইয়া গিয়াছিল।

ভদ্রলোকের অবস্থা লোকে জানিত না এমন নহে, তথাপি তাহারা নিন্দা করিতে ছাড়িত না। পিতামাতা এত বড় মেয়ে সম্মুখে রাখিয়া কেমন করিয়া যে আহার করিতেছেন ইহা ভাবিয়া প্রতিবাসীদের চক্ষে নিদ্রা আসিত না। লীলার মাতা পথে বাটে অজস্র নিন্দা শুনিয়া বাড়ী আসিয়া স্বামীকে দশকথা শুনাইয়া দিতেন, অজস্র চোখের জল ফেলিতেন, দরিদ্র উপায়হীন পিতা তামাক টানিতে টানিতে নীরবে সব শুনিয়া যাইতেন।

লীলাকে লক্ষ্য করিয়া লীলার মা সনদা গালাগালি করিতেন। দরিদ্রের ঘরে কেন সে জন্ম লইল, জন্মিল যদি মরিল না কেন? সে মরিলে তৎপাদের এত কথা তো শুনিতে হইত না,—এই সব কথা বলিতে বলিতে চোখের জল তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইত।

হায়রে, কষ্ট কি তাঁহারাই শুধু ভোগ করিতেন? ।। যে লক্ষ্যবান মৃত্যুকে আত্মান করিত, কিন্তু সে

ডাকে তাহার নিকট মৃত্যু আসে না, তাই নীলা মরে নাই। সে বেশী কথা বলিতে পারিত না, নীরবে চোখের জল মুছিত।

প্রগতি এই অল্পভাষিনী মেয়েটিকে বড় ভালবাসিত। নীলা দিন কত স্থলে আসিয়াছিল, তাহার পর লোক-নিন্দায় আর আসে নাই। এত বড় মেয়ে স্থলে পড়িতে যাইত ইহা গল্পীবাসীর একেবারে অসহ্য। ইহার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছিল, বিক্রপ করিতেও ছাড়েন নাই। সনদা কতাকে আদেশ দিলেন, “তুই আর পড়তে যেতে পাবিনে। লেখাপড়া শিখে তো চাকরী করবিনে; আর লেখাপড়ার দরকার নেই।”

মায়ের আদেশে নীলা স্থলে যাওয়া ছাড়িয়া দিল।

কয়েকদিন সে স্থলে না যাওয়ার প্রগতি ব্যস্ত হইয়া পড়িল, মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, নীলা আর স্থলে পড়িবে না।

সেদিন একটু সকাল সকাল স্থলের ছুটি দিয়া প্রগতি নীলাদের বাড়ী গেল।

সনদা তখন বারাণ্ডার পা ছড়াইয়া বসিয়া স্বামীর উদ্দেশে তর্জনগর্জনে করিতেছিলেন; বৃদ্ধ হরিষোষ চুপচাপ একটা পাশে বসিয়া অবিশ্রান্ত তামাক টানিতে ছিলেন এবং সম্পূর্ণ নির্বিকারচিত্তে স্ত্রীর তিক্তকথাগুলো পরিপাক করিতেছিলেন। প্রগতিক দেখিয়াই সনদা থামিয়া গেলেন, কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া বলিলেন, “এই যে মা, তুমি এসেছ; বেলা, একখানা আসন দিয়ে যা তো।”

কতখানা আসন পাতিয়া দিল।

প্রগতি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আগনারা সব ভাল আছেন তো মা?”

মুখখানা বিকৃত করিয়া সনদা বলিলেন, “আর ভাল বাছা, এরকম ভাল থাকার চেয়ে মরাই ভাল, জীৱন্ত থেকে দিনরাত যন্ত্রণা সহিতে আর পারা যায় না।”

প্রগতি বলিল, “কেন, নীলার বাবা এখন তো কাজ করছেন, তবে—”

বাধা দিয়া সনদা রুদ্ধভাবে বলিলেন, “কাজ করছেন, পেটে হুবেলা খেতে পাচ্ছি এই মাত্র, কিন্তু এমন খাওয়া তো পশুতেও খায় মা! সমাজে বাস করলে সমাজের রীতিনীতি মেনে চলতে হবে, যেমন তেমন করে খাওয়াই তো মানুষের জীবনের চরম সার্থকতা নয় বাছা! মেয়ের বিয়ে দিতে পারছিলেন, হাতে একটা পয়সা নেই। কুড়িটা টাকা পান; ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না, পেটে খেতে কুলায় না, একটা পয়সা তা থেকে বাঁচেন না। এই মেয়ের পানে তাকিয়ে ভাত মুখে দিতে পারিনে, রাতে ঘুম নেই, সর্কমা ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়—কখন কি হয়।

ওর কি সে ভাবনা আছে? বললে বলেন—ফুল ফুটবে তবে তো বিয়ে হবে, নইলে হাজার চেষ্টা করলেও বিয়ে হবে না। এ একটা বাঁধা গৎ বইতো নয়, নইলে এতবড় মেয়ের বিয়ের ফুল আজও ফোটেনি এও কি একটা কথা হতে পারে? মেয়েটা মরলেও যে বাঁচতুম। সে দিনে এমন যে ব্যারাম হল, অল্প মেয়ে হলে মরে যেত, নিতান্ত হতভাগা মেয়ে বলে মরল না; আমারই কপালে বেঁচে উঠল।”

তাঁহার চোখদিয়া হঠাৎ অনেকখানি জল উছলাইয়া পড়িল, তিনি তাড়াতাড়ি অন্ধদিকে মুখ ফিরাইয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন।

মা কখন সন্তানের মৃত্যু কামনা করেন তাহা ভাবিতে প্রগতির বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে ভাবিয়া দেখিল, বড় কষ্টে বড় দুঃখে মায়ের মুখ হইতে এমন কথা প্রকাশ হইতে পারে। মায়ের বক্ষে সন্তানস্নেহ অপরিণাপ্ত থাকে, সমাজের দারুণ ক্রকুটী, অজস্র নিন্দা মায়ের স্নেহ হইতে সন্তানকে বঞ্চিত করিতে পারে না। দোষ এ দেশের, দোষ এ দেশের ছেলের পিতার, কারণ তাহারা সময় সময় নৃশংস কশাইয়ের চেয়েও নৃশংস আচরণ করিয়া যায়। দেশে এই পণপ্রথা এমনই চলন হইয়া গিয়াছে বাছা না হইলে বিবাহ খাপছাড়া বোধ হয়। দরিদ্র কন্ডার পিতামাতাকে যথেষ্ট অর্থকষ্ট সহিতে হয়, ইহার পর

লোকনিষ্ঠা, সমাজচ্যুত হওয়া, নানা প্রকার লাঞ্ছনা অদৃষ্টে ঘটয়া থাকে। এই কুৎসালীল দেশের লোক এমনই করিয়া নিজের ক্ষতি করে, নিজের কাঁধে নিজের অবনত করে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রণতি বলিল, “ওকে অমন করে বলবেন না, মা! আহা, ওর দোষ কি তা বলুন দেখি? বলছেন—মরে গেলেই ভাল হতো, কিন্তু আমি তো নিজের চোখে দেখেছি তার ব্যারামের সময় আপনি যত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, এরকম আর কেউ হয়নি। আপনার আহাির নিদ্রা ছিল না, দিনরাত ওই মেয়ের পাশে বসে চোখের জল ফেলতেন। আপনি তো সেই মা, আজ কোন প্রাণে সেই মেয়ের মৃত্যুকামনা করছেন বলুন দেখি?”

সনদা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বুকের জমাট ব্যাধা হাল্কা করিয়া দিতে গেলেন; বেদনাভরা কণ্ঠে বলিলেন, “হাঁ; আমিই সেই মা, কিন্তু কত কষ্টে যে এ কথা বলছি, তা আর তুমি কি বুঝবে প্রণতি? আমাদের মত দুঃস্থ বাঙ্গালীর ঘরে তুমি জন্মাওনি, স্বভাবের যে কি তা তুমি জানো না; যদি জানতে তবে আমার বলতে পারতে না। জানো না—আমাদের ঘরের মেয়ে স্তান হতে শিক্ষা পায় তাকে খণ্ডর বাড়ী যেতে হবে, খণ্ডর বাড়ীর জুই তার জন্ম। দিনে একশবার আমরা তাকে জানিয়ে দেই তাকে খণ্ডর বাড়ী যেতে হবে, সেখানে তাদের সঙ্গে সব রকমে মানিয়ে তাকে চলতে হবে। এতটুকু বয়স হতে আমরা মেয়েদের নিয়েধের গাণ্ডী দিয়ে বেঁধে রাখি, তার যে চলতে দোষ, উঠতে দোষ, বসতে দোষ সব রকমে দোষটাই জানিয়ে দেই। তাকে আরও জানিয়ে দেই—মেয়েদের মধ্যে নিজের ভাব থাকে না, তাকে পরের মতে মত দিয়ে চলতে হবে, পরের চোখে চোখ দিয়ে জগৎ দেখতে হবে, পরের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে। মেয়েদের জানিয়ে দেই—তাদের সেটুকু শিক্ষা দেওয়া হয় সে শুধু তাকে বিয়ের বাজারে বার করবার জন্তে, তার বেশী আর দিতে চাইনে—

কারণ তার আর দরকার নেই। এই যে মেয়েদের লেখাপড়া শিখাচ্ছি, এ শুধু সেই বাজারের জন্তে, জানছি—এর পরে এ আর কোন কাজে লাগবে না; কচিং এক আধখানা পত্র লেখা ছাড়া। তোমরা লেখাপড়া শেখাও জ্ঞানের জন্ত, আমরা শিখাই বিয়ের জন্তে। এতেই বুঝতে পারবে—তোমাদের সঙ্গে আমাদের কতখানি প্রভেদ। বাংলার মেয়ে জীবন্ত অভিগাণ, সে নিজের জগে কেমন—বাপমাকেও জালায় যেমন। সে নিজের দিনরাত মৃত্যু প্রার্থনা করে, তার বাপ মাও তার মৃত্যু প্রার্থনা করে। মা, বাপ মাঘে কত দুঃখে স্তানের মরণ প্রার্থনা করে, তা বাপ মা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। এই স্তান, যাকে গর্ভে ধারণ করেছি, অসহ যন্ত্রণা যার জন্ত সয়েছি, নিজের বুকের রক্ত খাইয়ে যাকে এতবড় করেছি, যে ঘুমালে শান্তি পাইনি, চোখের আড়াল হতে দেই নে, যার অস্থির হলে আগেই অমঙ্গল আশঙ্কা মনে জেগে ওঠে, সেই স্তানের মরণ কামনা! কেন তা আর কেউ বুঝবে না, মা! সে দিন তার মাথার কাছে, যখন বসেছিলুম, তখন লোকনিষ্ঠা বিয়ের ভাবনা কিছুই আমার মনে হয় নি শুধু মনে হয়ে ছিল, আমার স্তান বেঁচে উঠুক, আমি আর কিছু চাই নে। আজ আবার বাইরের কথা আমার কাণে আসছে, ভাবছি, হয় ও মরুক নয় আমি মরি, আমার যেন কারও কথা আর না শুনতে হয়।”

এবার প্রকাশ্রে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, আর কোন বাধা মানিল না।

প্রণতির চক্ষু ছল ছল করিতে ছিল, সে আর্জকণ্ঠে বলিল, “আপনি এত ভেঙ্গে পড়ছেন কেন মা? আজকাল অনেক হিন্দু মেয়েদের বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া শিখাচ্ছেন, নীলাকেও তাই শিখান না। দেশের লোক নিষ্ঠা করবে—করুক, সমাজও করবে—করুক, তাতে কাণ দেবেন না, বাংলার মেয়েকে নিজের জীবন অভিগাণ ধারণা করতে শিক্ষা দেন আপনায়াই; কিন্তু আপনারা বলুন দেখি—তারা স্বপ্না

নয় ; তারা ছেয় নয়, তারা ও সংসারে কাজ করতে পারে। আপনারা বলুন দেখি—কার্যক্ষেত্র শুধু পুরুষের জন্তে প্রসারিত নয়, মেয়েদের জন্তেও প্রসারিত আছে। আপনাদের যদি এত ভার বোধ হয়, ওকে আমার দিন, আমি ওর ভার নিচ্ছি।”

সনদার চোখে জল, মুখে একটু হাসি ভাসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল ? সে বলিল—“তা কি হয় নাকি মা ? যদি তা হতো তা হলে এখনই দিতুম। সহরের দিকে ও সব চলতে পারে, পাড়াগাঁয়ের দিকে কিছু চলে না। আমাদের এখানে যেমন করেই হোক—যে পাড়েরই হোক বিয়ে দিতেই হবে, নইলে জাত বাবে।”

জাত যাইবে কথাটা শুনিয়া প্রগতি'র হাসি পাইয়াছিল, জাত এমনই চুনকো জিনিস বটে, নড়িতে চড়িতে কাঁচের জিনিসের মত ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, “পাজ যদি অন্ধ, ধোঁড়া, বুড়ো হয়—”

সনদা আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “অধঃপতিত বাংলার মেয়েকে অসকোচে তার হাতেই আত্মসমর্পণ করতে হবে।”

প্রগতি একেবারে শুদ্ধ হইয়া গেল। বৃদ্ধ, অন্ধ ঋদ্ধ ইহাদের যে কোনটার হাতে ইহার। এই পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকাকে অর্পণ করিবেন, দেও সমাজের চোখে সহনীয়, জাতি তাহাতে থাকিবে, কিন্তু মেয়ে লেখাপড়া শিখিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করিবে, তাহা সমাজ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। এই মহাপাণের শাস্তিস্বরূপ মেয়েকে বহুদূরে থাকিতে হইবে, অধিকন্তু তাহার আত্মীয় স্বজনগণকেও অনেক নির্ধ্যাতন সহিতে হইবে। চমৎকার বাংলার সমাজ।

আমাদের এ দেশে করুণা পিতামাতার বুকে এমন সাহস আছে ইহার। সমাজের পানে না চাহিয়া ব্যক্তিত্বের সন্মান রাখিতে গুজ কত্তাকে সমান শিক্ষা দিতে পারেন ?

প্রগতি শুদ্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে ছিল, এমন সময়ে একটা বৃহৎ মাটির কলসী পূর্ণ জল লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নীলা বাড়ী কিরিল। প্রগতি তাহার সেই স্বন্দর শ্রাম মুখ খানার পানে চাহিল ; বিশ্বের বত বেদনা সব যেন তাহার বিশ্বলাতন নয়ন ছুইটীতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে ; হায় অভাগিনী বাংলার মেয়ে !

কলসীটা রন্ধন গৃহে নির্দিষ্ট স্থানটীতে রাখিয়া আসিয়া নীলা সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিতে গিয়া বলিয়া উঠিল, “কাপড় বে এখনও শুকায় নি মা, বড্ড ভিজে রয়েছে।”

মা বিকৃত মুখে বলিয়া উঠিলেন, “ওই পর, ভিজে কাপড় পরলে মরবে না, ভয় নেই, তোমার মত মেয়েদের যম ভুলেও ছোঁবে না ; তা যদি ছুঁত, যদি মরবার হত, সেই ব্যারামেই মরতে, আমার এক কষ্ট সহিতে হতো না।”

নীলার রেখাহীন শাস্ত ললাটে কয়েকটা রেখা ভাসিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া গেল ; সে সেই কাপড় খানা পরিয়া পরণের কাপড় খানা শুখাইতে দিতে গেল।

এইবার হরিঘোষ কথা বলিলেন, ছঁকাটা মুখ হইতে সরাইয়া মুছ কঠে বলিলেন, “এই সে দিন অতবড় ষ্যারাম হতে উঠল, তারপর ওই ভিজে কাপড়টাই পরতে দিলে ? একখানা শুকনো কাপড়ও কি জুটল গা ?”

রুদ্রকণ্ঠে সনদা বলিয়া উঠিলেন, “ওঃ—কি দরদ, বলে—‘মার গোড়ে না গোড়ে মাসি, ঝাল খেয়ে ম’ল পাড়া প্রতিবাসী’ ওঁর হয়েছে তাই, বলে—‘বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চকর ;’” অত দরদ যদি, যাও না,—যাতে মেয়েকে আমাকে লোকের কথা না শুনতে হয় তাই কর, পাজ নিয়ে এসো—বিয়ে দাও। ঘরের মধ্যে বসে অত জারিকুরী আমার ভাল লাগে না বাপু! থেকে থেকে এক একটা কথা বললে গা জলে যায়।”

কথাটা শেষ করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন, এবং স্বামীর উপর নিতান্ত রাগ করিয়াই প্রণতি যে বসিয়া আছে তাহা ভুলিয়া গিয়া, অনাবশ্যক একটা কলসী লইয়া ঘাটে চলিয়া গেলেন।

বৃদ্ধ হরিবোষ নীরবে শুধু তাকাইয়া রহিলেন, স্ত্রী যখন চলিয়া গেলেন, তখন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হুঁকাটাকে দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া উঠিলেন।

তাঁহার বিষয় মুখ খানার পানে চাহিয়া প্রণতি কষ্ট পাইল। সে কোন দিনই নীলার পিতার সহিত কথা কহে নাই, আজ ভদ্রলোকের বিষয় মুখখানা তাহার সঙ্কোচ দূর করিয়া দিল, ধীরস্বরে সে বলিল, “আপনাকে আমি একটা কথা বলি—শুনুন।”

তাহার সহানুভূতি পূর্ণ মিষ্ট কথা হরিবোষের

বেদনাপূর্ণ হৃদয়ে সাস্থ্যনার প্রলেপ দিল। তিনি বাহির হইবার জন্ত পা বাড়াইতে দিলেন, খামিয়া বলিলেন, “কি কথা বলবে মা?”

প্রণতি অবনত মস্তকে বলিল, “নীলার বিয়ের ভার আমি নিচ্ছি; এখানেই যাতে তার বিয়ে হয় তার চেষ্টা আজ হতে আমিই করব। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, ওর জন্তে ভাববার কোন দরকার নেই।”

বিদায় লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

বৃদ্ধ হরিবোষ হাঁ করিয়া শুধু চাহিয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উর্দ্ধ মুখে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “মা ব্রহ্মময়ি! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।”

ক্রমণঃ—

## ‘জ্বলেনি আলো অন্ধকারে’

শ্রীহরীবোধ রায়

গিরিভি....

শুভ্রা একাদশী

বারই অবিন।

ভাই নীলা—

ঠিক বা’ আশা ক’রেছিলুম তাই। একটা সোজা কথার ঠীকা মানে না ক’রে তুই যে আমার সহজে রেহাই দিবি নে, তা’ আমি আগেই জানতুম। ..... আজ পর্যন্ত তোর কাছে ত’ কোনো কথাই লুকুইনি ভাই—সত্যি বল্চি তোকে যা’ জানিয়েচি, তা’র এক বর্ণও মিথ্যা নয়—একটি কথাকেও পল্লবিত অথবা অতিরঞ্জিত ক’রে লিখিনি—লিখিনি।

যা’ ঘটেছে, সেটা অবিবাহিতা কুমারী জীবনের পক্ষে নীতিসঙ্গত কিনা জানি নে তবে খুব যে স্বাভাবিক, একথা নিশ্চিন্তে বলতে পারি। ....প্রথম

দর্শনেই প্রণয়সকার পাওয়াটা সে নেহাৎ উপভাসের নায়ক নায়িকা এবং কবির কাব্যেই শোভা পায়, এমনই একটা ধারণা আমারও ছিল আগে। কিন্তু আজ স্পষ্টভাবে একথা স্বীকার করতে আমার একটুও লজ্জা নেই যে ছেলেটিকে প্রথম দেখেই আমার ভালো লেগেছিল। প্রথম দর্শনেই তাঁর স্মৃতিটি ‘এমন গভীর ভাবে আমার মনে মুদ্রিত হ’য়ে গেছিল যে, সে রূপকে সমস্ত দিন রাজি ধ’রে ধ্যান ক’রেও ভুলি পাই নি।

তারপর কি রকম অদ্ভুত উপায়ে পরিচয় হ’য়ে গেল, সে কথা ত’ তোকে আগেই জানিয়েচি।

ভেবেছিলুম আমার মনের এই গোপন কথাটি কারকেই জানানো না—হোক না সে যতোই আপন, যতোই অন্তরঙ্গ বন্ধু।.....আমার এই সত্যেরো বছরের নির্দোষ সঙ্গমত জীবনের ছোট্ট এই ক্রটি ও



হৃৎকণ্ঠাতুর্কুর সন্ধান পেয়ে কেউ যদি উপহাস করে, অবাচিতভাবে আমার এই আচরণটার বিরুদ্ধে ধবংসকারী কল্পে আসে তা হ'লে সেই অপমান, সেই উপহাসের তীব্র খোঁচাগুলো সত্যে ভারী মর্শাস্তিক ভাবেই আমার বুকে বাজত।

হিন্দু ধর্মের একজন বরুণা অবিবাহিতা মেয়ের পক্ষে তাঁর নিজের মুখে প্রেম স্বীকার করার মতো অপরাধ ও লজ্জাহীনতার বিষয় আর মাকি কিছুই হ'তে পারে না। তাই এমন একটা মার্শাস্ত্রিক অপরাধ হঠাৎ যখন করেই ফেলেচি, তখন সেটাকে খুব সাবধানে সন্ধানপনে রেখে দেব স্থির করলুম—কিন্তু এই ধরণের একটা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা নারীর পক্ষে যে কতদূর কষ্টসাধ্য তা' তুই নারী, বোধ হয় সহজেই বুঝতে পারবি।

ভেবেছিলুম তোকেও কিছু জানাবো না। অবশ্য একটা ছনিবার লজ্জা ও সঙ্কোচই আমার একথা ভাব'বার অবসর দিয়েছিল। নইলে তোর কাছে সব কথা গোপন করলে আজ এই অনাবিল তৃপ্তি বুক-ভরা সোয়ান্তিটুকু কোথায় পেতুম ভাই?.....ঐশা ও সঙ্কোচের জগদল পাখরটাই যেন বুক থেকে ঠেলে ফেলেচি, এমনই হালকা বোধ হচ্ছে।.....

ছেলেটা সে ইকনমিক্স এ এম-এ পড়ে, সে খবর ত' তোকে আগেই জানিয়েছিলুম। সঞ্জয় বাবু এম-এ পড়েন হিষ্ট্রিতে, তিনি তাঁকে চিন্বেন কি ক'রে? অশুভ তা'তে পরিচয় বাধে না। পূজোর ছুটির পর সঞ্জয় বাবু অনার্সেই তাঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিতে পারেন।

ছেলেটির চেহারার বর্ণনা আমি ঠিক যেমন ভাবে ক'রেচি, অবিকল ঐ রকম ভাবে বলতে পারলেই, নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে চিনে নিতে পারবেন।..... অবশ্য তা'তে তোর একটু বিপদও আছে, কারণ প্রানীর কাছে পর-পুরুষে রূপের বর্ণনা করাও নাকি পাপ। তবে ভরসা হয়, সঞ্জয় বাবুর মতো মিরীহ ক্রোশ নারী হয় ত' তোকে মুখ ফুটে কিছু পা-ও বলতে পারেন।

বিকলে রোজই দাদা, বোদি, স্মৃতি ও আমি বেড়াতে যাই। ব'শা বাহল্য তাঁর সজলাভ থেকেও কোনোদিন আমরা বঞ্চিত হইনে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়টুকু কাটে বেশ! বিচিত্র স্মৃতির ভঙ্গীতে এমন মজাদার সময় গল্প বলেন যে, হাসতে হাসতে পেটে খিল খ'রে যায়। শুধু কথা বলার মধ্যেও যে এত মজতা ও মনোহারিত্ব থাকতে পারে, সে অভিজ্ঞতা এই আমার একদম প্রথম। কিন্তু সব চেয়ে ভালো তাঁর ঐ প্রাণখোলা হাসি—তাঁর ভাবদীপ্ত স্বচ্ছ চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টিটুকু—সত্যি সে দৃষ্টি বুঝি শুধু তাঁকেই শোভা পায়।... 'মনে মনে হয় ত' ভাব'চিস—'লাভার ইঞ্জ অলওয়েজ বিউটিফুল'—তা' তোর ঐ মুখের ভাব আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু সে কথা থাক—

অচিন্ত্য বাবুর 'সন্ধ্যারাগ' পড়লুম। এই দরদী লেখকটির মিঠে হাতের পরিচয় এর আগেও কয়েকবার পেয়েছিলুম। কিন্তু এই গল্পটি আমার একেবারে মুগ্ধ ক'রে দিয়েছে। এমন মর্মস্পর্শী এমন করুণ অশ্রুসজল গল্প খুব কমই পড়েছি।

আজ এই পর্যন্ত। সঞ্জয় বাবুকে আমার ছোট্ট একটা নমস্কার দিবি। তুই আমার বুকভরা ভালো-বাসা নিস। ইতি—

'চিত্রা'—

দ্রপদ আড়াইটা

বিয়ুংবার...

...কলকাতা।

ভাই চিত্রা স্মৃতির,

তোর 'সাড়ে চুয়াত্তর' খানি ঠিক সময়ে পেয়ে ভারী খুসী হলুম।.....আমার প্রতি তোর ঐ প্রেম ও ভালবাসা চিরদিন অটুট থাকুক—ভগবানের কাছে শুধু এইটুকুই আমার একমাত্র প্রার্থনা।... ..

প্রথম দর্শনেই প্রেম সন্ধান হওয়াটা যে অসম্ভব, এমন কথা ত' আমি বলিনি। বলেছিলুম যে তোর স্বভাবের সঙ্গে ব্যাপারটা যেন খাপ খাড়া হ'য়েছে। যে রকম রিচার্ডড্ লাঙ্ক প্রকৃতির মেয়ে তুই,

আচম্কা শুনে তাই একটু খটকা লেগেছিল।  
কপালে হাত দিয়ে ব'সে পড়েছিলুম আর কি!.....  
আচ্ছা হুঁশিয়ার মেয়ে যা হোক—সিকিৎসিৎসিৎ ডিকিৎসিৎ  
ওরাটার, তখচ সেদিন পাত্তাই দিলি নে। আমি  
কিন্তু সেইদিনই তোর ঐ অসংলগ্ন কথা আর  
উদাস চাহনির মধ্যে একটা কথার স্পষ্ট উত্তর পেয়ে-  
ছিলুম। নিজেকেই আজ আমার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে  
হচ্ছে।

কাঞ্চনবাবুর রূপগুণের তুই যতোই প্রশংসা  
করচিস্, তোর প্রতি মন আমার অবিশ্বাসে স্থগায়  
ততোই বিধিরে উঠে। আমার এই এতদিনের  
ব্যগ্র উদ্বেলিত প্রেমকে প্রত্যাখ্যান ক'রে তুই যে  
তাঁর হবি, একথা যে কিছুতেই সহ্য করতে পারচিনে  
সখি! উঃ! নারী কি এমনই ছলনাময়ী—এত  
নিষ্ঠুর! অথই পাখার দরিয়ার ভাসিয়ে দিয়ে আজ  
আমার এগ্নি নিঃস্ব কাঙাল ক'রে—

মনে আছে সেই বাইশে ফাল্গুণের কথা? তখন  
আমরা থার্ড ক্লাসে পড়ি। টিফিন পিরিয়ডে দেবদাস  
গাছের তলে একান্ত নিতৃত্তে নির্জনে যে সেই আমার  
বুকে মুখ রেখে শপথ ক'রেছিল। মনে পড়ে সেই  
যে লজ্জাকড়িত অস্ফুটকণ্ঠে আমার প্রাণেশ্বর বলেই—  
.....হারেরে অবিশ্বাসিনী অকৃতজ্ঞ নারী! সে সব কথা  
হয় ত' এখন হৃঃস্বপ্নের মতোই মনে হবে।.....সবই  
হৃর্ভাগ্য আমার। তোমার পথ থেকে স'রে দাঁড়ানুম  
বন্ধু—প্রতিশোধ নেবার বাসনা আমার নেই।  
কাপুকুণের নই আমি।.....কাঞ্চনবাবুকে পেয়ে তুই  
চিরস্বধী হ'য়ে থাক্—এর চেয়ে বড় কামনা আমার  
মেই।

শুনলুম তোদের চার-চোখের মিলন প্রায় রোজই  
হচ্ছে, এবার চারহাত মিলনের সেই শুভ মুহূর্তটির  
প্রতীক্ষার উদ্গীৰ্ণ হ'য়ে রইলুম...বেশ মিলবে কিন্তু।  
তুই তা'র নয়নের মপি, সে তোর চির-কামনীয় ছল্ভ  
কাঞ্চন। একেবারে মনি-কাঞ্চন যোগ যাকে বলে।

আমার পতি দেবতাটির কাছে 'তাঁর' কথা বলে-

ছিলুম। প্রথমে তিনি খুব এক চোট হাসলেন।  
বলেন—'কাঞ্চন সেন'কে তিনি বিশেষ ক'রেই  
চেনেন। ঝটস্ চার্জ কলেজে চারটি বছর একসঙ্গে  
তাঁরা নাকি পড়ে এসেছেন। আরও বলেন—কাঞ্চন  
খুব ভালো কবিতা লিখতে পারে। একজন রূপদক্ষ  
ওস্তাদ শিল্পী হিসেবেও পে কিছু কম খ্যাতি ও সম্মান  
লাভ করেনি চিত্রপ্রদর্শনীতে অনেকবারই সে  
তা'র কৃতিত্ব ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েচে।

আরও একটা কথা কি বললে, শুন্বি? রাগ  
করবি নে, বল আগে? ইস্—কটমট্ ক'রে  
তাকাচ্ছি যে! যেন শোন্বার ইচ্ছেই নেই।  
আচ্ছা সত্যি ক'রে বল দিকিনি এ তোর কৃত্রিম  
বিরক্তি, না শোন্বার হৃদম আকাজ্জা? আশাহ!  
অমনি মেয়ের অভিমান হোলো। আচ্ছা তবে শোন্  
বল্চি, বলেন—কাঞ্চন খাঁটা প্রেমিক, একজন  
নিখুঁত—সৌন্দর্যের উপাসক। অনেক দিন থেকেই  
এই বাস্তব জগতে সে তা'র কল্পলক্ষ্মী, সেই অনিন্দ্য  
কান্তি সুরস্বন্দরীর সন্ধান করচে। আজ তোকে  
পেয়ে—

, এই চুপ করলুম। তুই কালো কুৎসিৎ  
একদম সাক্ষাৎ শ্রাওরা গাছের পেঙ্গী। কেমন  
খুসী হ'য়েচিস্ ত?

তুই রাগ করিস্ নে। আমার মনে হয় রূপসীদের  
এই বিনয়টুকুই তা'দের অহঙ্কারের স্পষ্ট পরিচায়ক।

সবিতা ও মীরা হঠাৎ আজ এসেছিল। কাশ্মীরে  
ছুটি মাস থেকে সবিতা স্বাস্থ্যটা কিন্তু বেশ ফিরিয়ে  
নিয়েচে। ওর স্বাভাবিক লাল গাল দুটি এবার যেন  
আরও বেশী রাঙা হ'য়ে রক্তগোলাপের রূপ  
পেয়েচে।.. এর খোঁকাটিও বেশ লাভলি হ'য়েছে।  
দেখলেই চুমো দিয়ে বিব্রত ক'রতে ইচ্ছে করে। বুকে  
চেপে ধরে অনেকক্ষণ আদর করলুম। সবিতা কি  
ব'লে রসিকতা করলে, শুন্বি? নাঃ—থাক্—

বড়লোকের ঘরে বিয়ে হ'য়ে মীরার অহঙ্কার ও  
চালিয়াতি আরও যেন বেড়েচে ব'লে মনে হোলো।

সে কি ভাই কথা বলবার ভঙ্গী, হাঁটুবার সে কি বিচিত্র অদ্ভুত ঢং! কথা অবশ্য বেশী বলে নি, কিন্তু যে ক'টা বলেচে সে শুধু ওর ঐশ্বর্য ও মর্যাদার কথাই।

সাহানা দেবীর বাবার বেলায় পিছু ডাকে' গানটি শুনলুম। বেশ ভালোই লাগল। গাইবার কৌশলে ওর সব গান ভালোই বেশ মনোমুগ্ধকর শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে! একটা নূতনত্ব ও বিশিষ্টতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

বেণী আর কি লিখব। পড়াশুনো মোটেই হচ্ছে না। তুই বোধ হয় এতক্ষণ তোর ঐ মনোচোরের মূর্তিকেই ধ্যান করচিস। আর দেবী নেই, এই বারই তাঁর মর্শন মিলবে। আমার বিনীত অমুরোধ, তোর উচ্ছলরঙ্গীন মন্দির মুহূর্তে আমার নামটি ভুলেও একবার স্মরণ করিস। লক্ষ্মীটি ভাই, ভুলিস্ নি, আমার আজ এই খানেই ইতি। পত্রের উত্তর লিখিগীর চাই।

ভালো রোম্যান্সের কয়েকখানি ফিকে সবুজ পাতার প্রত্যাশী।

‘লীনা’

পরং পূর্ণিমা

গিরিডি.....

যোলোই আশ্বিন।

ভাই লীনা,—

তোর মিষ্টি চিঠিখানি পেয়ে খুব খু-উ-ব-হলুম। .....সজ্জবাবুকে এবার উনি চিনতে পেরেচেন। হয় ত আমি ঠিক মতো বোঝাতে পারিনি বলেই তিনি গোলমাল করেছিলেন। বলেন—তোর স্বামী মশায়টি নাকি খুব বিনয়ী আর খুব শাস্ত। আমি কিন্তু কাকন বাবুর এই উদার মতটি কিছুতেই সমর্থন করতে পারলুম না। তাঁর মুখের ওপরেই বল্লম—আপনার বন্ধুটি বিনয়ী হতে পারেন, কিন্তু তাঁকে যদি সেজন্ত শাস্ত শিষ্ট বলেন, তা হলে অভিধানে

ওকথাটির অর্থটাকেই বদলে দিতে হয়। প্রতিবাদ না করে হাসলেন।

স্বতির অত্যাচারের মাজাটা ক্রমশঃই বেন বেড়ে উঠেচে। এমন অসংখ্য মতো বে-পরওয়া ভাবে কথা বলতে শিখেচে যে কি বলব? আমার হয়েছে উভয় সঙ্কট। চূপ করে থাকতেও লজ্জা লাগে অথচ ওকে শাসন করতেও সাহস পাইনে। জান্নার ধারে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে অনিমিখে চেয়ে আছি, হঠাৎ সেদিন কোথেকে ছুটে এসে একেবারে গলা জড়িয়ে ধরে বলেন—এই অনন্ত অসীমতার মাঝখানে কোথায় খুঁজে পাবে দিদি কাকন বাবুকে? তিনি যে কখন এসে নীচের ঘরে বসে তোমার অপেক্ষা করতেন।...ওকে মারতে হাত উঠবে কি,—আনন্দে বুকখানি ছক্ ছক্ করে কেঁপে উঠল।

শুধু বল্লম—ভারী বেরাদব হয়েচিস্ স্বতি! আমি না দিদি তোর? পনেরো বছরের খাড়ী হলি! আজও তোর বুদ্ধি হল না, ছিঃ।

কিন্তু পনেরো বছরেই মেয়েদের বুদ্ধি যে সব চেয়ে বেশী প্রথর হয়ে ওঠে সে কথা ভুলে গেলুম।

বৌদিও বুঝি আমার সন্দেহ করচে। ওর দৃষ্টি আগের মতো সহজ নয়, কেমন যেন পরিহাসচঞ্চল হয়ে উঠেচে। আমার দেখে অকারণে হাসে। কিন্তু সাহস করে কিছু বলতে পারো না, হয় ত আরও ছ'দিন পরীক্ষা করে একদম নিঃসন্দেহ হ'তে চায়।

কাল একটা ভারী মজা হ'য়েচে.....

সন্ধ্যার সময় আনমনে বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলুম। হঠাৎ গানের খাতাটি খুলতেই একটা পেন্সিলে আঁকা স্নানর ছবি চোখে পড়ল। শিল্পীর নাম ছিল না, কিন্তু এই রূপদক্ষ নিপুণ শিল্পী যে কে হ'তে পারে, সে কথা বুঝতে একটুও দেবী হ'ল না। আশ্চর্য! কখন যে চূপ করে এই কাণ্ডটি ক'রে গেছেন, কিছু জানতেও পারি নি। ছবিটির নীচে স্পষ্টাক্ষরে শুধু একটি নাম লেখা রয়েছে, ‘জঃবঃ’। একটি সন্দোভিত যৌবনা ভয়ী তরুণী মাঝরাজে হঠাৎ

কি একটা ছঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেচে। বাইরে তখন ভয়ানক ছরোংগ প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য শুরু হ'য়েচে। বজ্রের অবিশ্রান্ত গর্জন ও বড়বুড়ির প্রচণ্ড কলরোল ছাড়া আর বুঝি কিছুই শোনা যায় না। এর মধ্যে মেয়েটির মুখে চোখে একটা ভয় ও অসহায়ের ভাবটুকু ভারী চমৎকার ফুটে উঠেচে। .....তিমিররাত্রির ছরোংগ অভিসারে মেয়েটি যেন একটি বজ্রাহত মূমুরূপাণী।

ছবিখানিকে যতবার দেখছি ততবারই একটা সন্দেহ ও সংশয়ের দোটারায় পড়ে মনটা যেন ছলে ছলে উঠেচে। মেয়েটির ঐ ভয়ব্যাকুল দৃষ্টির অর্থটা ক্রমশঃই যেন সহজ হ'য়ে আসচে। মনে হচ্ছে ঐ রকম একটা ব্যথার স্বপ্ন আমাকেও বুঝি—

ছাটিকে ছিঁড়ে তে চাই, কিন্তু এতবড় রসস্থটিকে এমনি অবহেলায় ছিঁড়ে নষ্ট করব ? ন,—না—সে আমি কিছুতেই পারব না।

সকালে আজ তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। বল্লম—আপনার 'ছঃস্বপ্ন' চমৎকার হ'য়েচে। আপনি দেখছি অকৃতোপকারে। খুব মিষ্টি হেসে বলেন—তোমাকে একটু সার প্রাইজ ক'রে দেবার অবসর অনেকদিন খুঁজছিলাম। হঠাৎ কাল সে স্বযোগ পেয়েছিলুম। তোমার গানের খাতার বিশেষজ্ঞকে যদি নষ্ট ক'রে থাকি, তা হ'লে আমার ক্ষমা করো।

মনে ভাবলুম তুমি ঐ খাতাখানি আজ যে আমার কাছে ছপ্পাপ্য কোহীন্দের সাতরাজার ধন মণিকের চেয়েও বেশী মূল্যবান একথা তোমার কেমন করে বোঝাবো গো ? ও যে আমার অমূল্য সম্পদ—আমার বখা সর্বস্ব।

বলতে ত' চাই অনেক কথা, কিন্তু সব কথাই কি বলা যায় ? শুধু বল্লম—অরূপকে রূপ দেওয়া মানে যদি তা'র সৌন্দর্যকে নষ্ট করা বোঝায়, তা হ'লে রোজই আপনি একখানি ক'রে পাঠা আমার নষ্ট করবেন কাকন বাবু, আমার তা'তে বিস্তর লাভ।

জিজ্ঞাসা করলুম—কই আমার সে জিনিষটা ?

বলেন—হ্যাঁ—ভুলিনি, কিন্তু আমার যে তেমন ভালো ফটো আর একখানিও নেই, চিত্রা ! বল্লম—সে হবে না, ফটো আমার চাই-ই। কোনো ওজর শুনব না।

বলেন কি জানিস ? তোমার ঐ মড্রেলের ব্লাউস, পরিচয়ের প্রথম দিন যেটা তোমার গায়ে দেখেছিলুম—বলো সেটা আমার দেবে ?.....এমন সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত প্রশ্নের জ্ঞাত মোটেই প্রশ্ন ত ছিলুম না। লজ্জার চোখ দুটো তথুনি নামিয়ে নিলুম। কিসের লজ্জা জানিনে, কিন্তু সর্বদা আমার একেবারে আয়ত্ন বশীকৃত হ'য়ে উঠল।

ঠোঁটের গোঁড়ায় এসেচিল। ভাবলুম বলি—তোমার কাছে আমার অদের যে কিছুই নেই গো ! নিজেকে রিক্ত—কাল্প ক'রেই ত' তোমার হাতে বিলিয়ে দিয়েচি, তোমার আমি—

কিন্তু কথাগুলো বোধ হয় নেহাৎ কাবোর মতো শোনাতো, শেষ পর্যন্ত তাই চূপ ক'রে রইলুম। বুক কাটে তবু মুখ কোটে না, এ যেন আমাদের মজাগত স্বভাব

.শুনলুম মীরা নাকি এফ ধনী ব্যারিষ্টারের পুত্রবধূ। স্মৃতাং এ ক্ষেত্রে ওর মতো একটি ঠাইলিশ্ আত্মভিমানিনী মেয়ে যে ধরা ধানিকে সরা জ্ঞান করবে তা'র আর আশ্চর্য কি ? মীরা নাকি পড়াশুনা ছেড়ে দিচ্ছে লীনা, সত্যি ?.....

কাঞ্চনবাবুর দিদির কাছে ভারী স্তম্ভর একরকম খোঁপা বাধা শিখেচি। দেখলে তুই নিশ্চয়ই পছন্দ করবি। ক'লকাতায় গিয়ে নিজে হাতে তাকে বেঁধে দেব। তোর বড় চুলে মানাবেও বেশ। আর কটা দিনই ত' ?

ভালো কথা, আমাদের বণেজ কবে খুলবে জানাবি। লজিকখানা ক'বার শেষ করবি ? আমার প্রিপারেশন কিন্তু ভালো হ'ল না। পড়ার নামেই গায়ে জর আসে। তুই হয় ত' এ কথার একটা বদর্থ করে নিয়ে ঠাট্টা করবি, কিন্তু সত্যি বল্চি

সেইটেই একমাত্র কারণ নয়।..... প্রতিমা ও রিণা কেমন পড়চে? তাদের হৃৎকমকে আমার কাছে চিঠি লিখতে বলবি।

তোর ধৈর্যের আর অপমান করতে চাইনে। আজ এই পর্যন্ত। আমার বুকভরা আন্তরিক ভালোবাসা গ্রহণ করিস্।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে যাচ্ছি, কাঞ্চন বাবুকে আমি ব্রাউসটা দিয়েচি।

ইতি—

‘চিত্রা’

রাত্রি পড়েন ন’টা, মঙ্গলবার

কৃষ্ণা একাদশী.....

ক’লকাতা

রূপসী চিত্রা আমার—

বার বার পড়েও তোর চিঠিখানি শেষ করতে ইচ্ছে হয় না। কি অনির্বচনীয় তৃপ্তি যে পেলুম, তা’ প্রকাশ করার মতো উপযুক্ত ভাষা আমার নেই।..... এমন সুন্দর চিঠি তুমি কা’র কাছে লিখতে শিখি তাই?

ব্যাপারটা দেখ্চি অনেকদূর গড়িয়েচে। মাসীমাকে সব কথা জানিয়ে এখন একটা দিন স্থির করলেই হয়। কাঞ্চনবাবুকে আমরাও কবে যে আপনার লোক বলে দাবী করতে পারব, তাই শুধু ভাব্চি।

‘দুঃস্বপ্ন’ ছবিখানি দেখবার জন্য একটা অদম্য কৌতূহলে উৎসুক হয়ে উঠেছিলুম। তোর বর্ণনা-ভঙ্গী শুধু আমার অশান্ত চঞ্চল মনকে অনেকটা শান্ত করেছে। কতগুলো মিষ্টি কথার হালকা আঁচড়ে ছবিখানি ঠিক রূপ পেয়েচে কিন্তু।.....

যাই হোক, কাঞ্চনবাবুর ব্রাউস চাওয়ার ভেতর বেশ একটু বৈচিত্র্য ও নতনত্ব আছে। মার্জিত রুচিবাগীশদের এ একটা আধুনিকতম প্রেমের নমুনা বোধ হয়।.....কথাটা যখন মনে হচ্ছে, না হেসে থাকতে পার্চি নে।.....কবিদের সবই অদ্ভুত।.....

খুব তাড়াতাড়ি মি’ড়ি থেকে নামতে গিয়ে কাল খপাস্ ক’রে একটা আছাড় খেয়েছিলুম। আঘাতটা অবশ্য সর্বাঙ্গেই অনুভব ক’রেচি, কিন্তু পায়ের চোটটাই সব চেয়ে বেশী অসহ্য মনে হচ্ছে।..... খুঁড়িয়ে হাঁটচি। সর্বাঙ্গ ব্যথার টন্ টন্ করচে। তবু এই ভান্ধাচুড়ো ছর্সল শরীর নিয়েই রজনবাঘুর সব অত্যাচারকেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করতে হচ্ছে।

বিশেষ কার্তিক কলেজ খুলবে। তুমি বোধ হয় তা’র আগেই রওনা হবি। আমার বাকুল প্রাণের ভালোবাসা ও প্রেমস্বার্থপূর্ণ চুপন গ্রহণ করিস— জীবনে মরণে শুধু তোমারই—

‘লীনা’

\* \* \* \* \*

ভরস্তু সন্ধ্যা। রাত্রির অন্ধকার মায়ের আশীর্বাদের মতোই মাটির বুকে ঝরে ঝরে পড়্চে।..... সাক্ষাত্মমণের পর প্রায়ই এই সময়ে চিত্রার সঙ্গে কাঞ্চনের অনেক বিষয়ের আলোচনা হয়। অবসর মতো ছ’টা গোপন কথাও হয়। এ ওর মনের পুঁথি পড়ে।

সন্ধ্যার সেই শুভমুহুর্ত।

অবসর দেহটা সোফার ঢেলে দিয়ে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চিত্রা কাঞ্চনের মুখের দিকে চেয়ে ছিল। সে দৃষ্টি কিছু জ্ঞান ও গভীর বেদনাপূর্ণ, যেন ভাষা পেরে অন্তরের অন্তস্তলের কোন বন্ধ আবাক্কা তা’র প্রেম-স্পদের কাছে নিবেদন করতে চায়।

চিত্রার কুসুমপেলব হাতখানি ছ’টা হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে নিয়ে কাঞ্চন ভিজ্ঞাসা করলে— তা’হলে কালকেই ক’লকাতায় যাক?

—হ্যাঁ এই সোমবারেই কলেজ খুলবে।

—কেমন ক’রে থাক্বে চিত্রা? তোমার ছেড়ে এই শুক নীরস মরুভূমিতে প্রতিমুহুর্তেই প্রাণটা আমার হাঁকিয়ে উঠবে যে।

—কেন কবিতা লিখ্বে, ছবি আঁকবে। মনকে ভুলিয়ে রাখবার সেই ত’ তোমার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। হয় ত’ শেষটা আমাকেও আর মনে থাক্বে না।

ডালিমরাঙা ভরস্তু গালটিতে একটি আঙ্গুল দিয়ে  
গৃহ আঘাত ক'রে কাঞ্চন বলে—এমন জীবন্ত কাব্য-  
খানি চোখের অন্তরালে রেখে আমি যে—

মিষ্টি ভৎসনার ভঙ্গীতে বাধা দিয়ে চিত্রা বলে  
—আচ্ছা হ'য়েচে। কাব্যরচনা আপাততঃ ক্ষান্ত  
রাখলেও চলতে পারবে। বেশীদিন ত' নয় আর,  
একটি মাস পরে তোমারও ত কলেজ খুলবে।

—তোমার বৃষ্টি একটুও কষ্ট হবে না—আগাগোড়া  
সমস্ত ঘটনাটাই বৃষ্টি হৃৎস্পর্শে মতো মনে হবে?  
আমায় ভুলে যাবে চিত্রা?

একটা কৃত্রিম কোণ ও অভিমানের সুরে  
চিত্রা বলে—হ্যাঁ—গো হ্যাঁ মশাই, ভুলে যাবো—বেশ  
যাবোই ত।

শুভ্র হাসির স্নিগ্ধ লহর তুলে কাঞ্চন বলে—না হয়  
মানলুম ভুলবে না, কিন্তু তাই ব'লে আমার চেয়ে  
আব—ব'লেই নিবিড় আবেগে থাকে বুকে টেনে  
নিলে।।...তারপর তার লজ্জারক্ত গালখানি নিজের  
গাল দিয়ে স্পর্শ ক'রে আবেগ-বিহ্বলস্বরে বলে—  
অ'চ্ছা কা'র ভাষাবাসা বেশী গভীর, চিত্রা?

কাঞ্চনের ব্যাকুল বাহুবেষ্টন থেকে নিজেই মুক্ত  
ক'রে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে চিত্রা অত্যন্ত অধীর  
হ'য়ে অনুনয়ের সুরে বলে—এবারে ছেড়ে দাও  
লক্ষ্মীটি, না—না, ছিঃ! কেউ যদি এসে পড়ে হঠাৎ!

—আগে জবাব দাও আমার।

—আগে ছেড়ে দাও।

—ছাড়ব—উত্তর দাও।

—আঃ - ছাড়ো - ও।

—তা হ'লে বলো লীগ'গির।

বীণার বন্ধারের মতো করুণ সুরের রেশ টেনে  
চিত্রা বলে—আঃ, কি জ্বালাতন! আমি কিছু  
জানি নে যা—ও।

পরাস্ত হ'য়ে নিতান্ত হতাশার সুরে বলে—ভারী  
অবাধ্য মেয়ে তুমি। আর কোনো কথা যদি তোমায়  
কিঞ্জেস করি।

—ইস! অমনি ছেলের অভিমান হ'লো!

পুষ্পাঙ্গুরীর মতো হৃৎখানি শুভ্র কোমল হাত দিয়ে  
কাঞ্চনের কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে চিত্রা বলে—রাগ করলে—  
সত্যি? কি মুস্থিল, তোমার ঐ অদ্ভুত প্রেমের আমি  
যে কোনো উত্তরই পুঁজে পাচ্ছিনে। আমাদের  
ভালোবাসা কি কোনো ভাষা দিয়ে সীমাবদ্ধ করা যায়?  
ভারী ছেলেমানুষ তুমি!

আনন্দের একটা উচ্ছ্বসিত দীপ্তিতে কাঞ্চনের  
সমস্ত মুখখানি অকস্মাৎ অত্যন্ত দীপ্তিময় হ'য়ে উঠল।

নিরীকবিশ্ময়ে চিত্রা তার দীর্ঘোন্নত দেহ, তার  
তেজোদীপ্ত মুখের সুকুমার ধৌবন শ্রীটুকুর পানে স্তম্ভিত  
আচ্ছন্নের মতো চেয়ে রইল। সন্ধ্যা ভুলে তারপর  
সে এই প্রথম প্রাণের উন্নত আবেগে কাঞ্চনের বুকের  
ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার হৃৎ গালেই গভীর ভাবে  
চুমোর রেখা একে দিলে।...কিন্তু পরক্ষণেই একটা  
হৃদমনীয় কজ্জা ও সন্ধ্যা একদম সঙ্কুচিত হ'য়ে আরক্ত  
মুখখানি ছই হাতে ঢেকে বসে পড়ল।...

কাঞ্চন ডাকলে—চিত্রা!

লজ্জানত মুখে অশ্রুট কণ্ঠে চিত্রা বলে—কেন?

—আমার ভারী ভয় করছে চিত্রা, শেষ পর্যন্ত যদি  
তোমায় না পাই, উঃ! আমার পক্ষে সে যে—

—তোমার হৃৎ পায়ে পড়'চি চুপ করো গো!

—তোমার বাবা যদি অমত করেন, আমায় যদি  
নিঃসম্বল দরিদ্র মনে ক'রে—

অস্থির ব্যাকুলতার ছই হাত দিয়ে কাঞ্চনের মুখ  
চেপে ধ'রে চিত্রা বলে—তা হ'লে কিন্তু চললুম আমি!

তার সুগভীর অতল অপলক হৃৎ চোখ হঠাৎ  
ঘেন জলে ভ'রে উঠল।

—কাদছ? কেন চিত্রা?

হৃৎ সর্ব জলের রেখা টেনে মুক্তোর মতো হৃৎ  
কোঁটা অশ্রু গালের ওপর চক্ চক্ করছিল। আঁচল  
:দিয়ে চোখের জল মুছে শুক হ'য়েই চিত্রা ব'সে রইল।  
কোনো উত্তর দিলে না।

—কথা কও লক্ষ্মীটি—মুখ তোল। তোমার এই

জানবাখাতুর মুখখানির পানে আমি যে কিছুতেই চাইতে পারিনি গো।

তবুও নির্বাক—নিম্পলক। ‘.....তা’র সেই অশ্রু-সিক্ত দীর্ঘারত স্বপ্নের ছ’টি চোখ ভাবার মূর্ত হ’য়ে কুটে যেন জানাতে চায়,—ওগো এ কারার কারণ জানতে চেনো না গো, নারীর সব কথা জানবার অধিকার পুরুষের নেই গো, নেই।

অধৈর্য্য অস্থিরতার কাঞ্চন ছই হাতে তার মুখখানি তুলে ধরলে। তারপর বর্ণার ধারার মতো বাঁধনহারা চুমোর ধারা তার গালে, ঠোঁটে অশ্রুসিক্ত চোখের পাতায় অজস্র ধারার ঝ’রে পড়তে লাগল।

আর সেই ঝরণার তলে চিত্রা একদম তজ্রাচ্ছন্ন অভিভূতের মতো চোখ বুঁজে পড়ে রইল অনেক—অনেকক্ষণ।

কপাল থেকে চুলের ওচ্ছগুলো সরিয়ে, রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে দিয়ে কাঞ্চন আবার জিজ্ঞাসা করলে—বলো না, কেন কাঁদছিলে?

নিকষকালো মেঘের বুকে বিজলী লেখার মতো ক্ষীণ হেসে সে উত্তর দিলে—এমনিই। অনেকদিন কাঁদিনি, তাই হয় ত—কিস্ত ওকি! তুমি চললে নাকি না - না আর একটু—এবার বল্চি, সত্যি বলব।

দরজার বাইরে থেকে মুহূর্তের একটা অম্পষ্ট উত্তর এল—সময় নেই। একটা বিশেষ কাজ আছে।

\* \* \* \*

ছক থেকে রিসিভারটা তুলে কাণের কাছে ধ’রে লীনা বললে—হ্যালো, কে আপনি?

—তোর সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে লীনা। আমি চিত্রা।

—কি কথা ভাই? আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর। দরজাটা বন্ধ ক’রে আসি। ‘...ফোন্টা পুনরায় মুখে নিয়ে লীনা বললে—হ্যাঁ, তারপর?

—গিরিডি থেকে এখানে আসবার পর, ‘রণেন বোস’ নামে যে ছেলেটিকে প্রথমদিনই দেখতে পেলুম—দাদার অসুস্থতায় বন্ধ হিলাবে এবং কতকটা সম্পদ ও

সম্বলের দাবী নিয়ে যিনি আজকাল নিয়মিত ভাবে ছ’টি বেলাই আমাদের বাড়ী আসা-যাওয়া করেন তিনি নাকি—

—সেই আমেরিকা ফেরৎ ভদ্রলোকটি, যার কথা কাল বলছিলে? কেন—তোর রূপের অব্যর্থ জালে তিনিও বুঝি আটকা পড়েচেন? হায় রে—হতভাগা পুরুষ! হ্যাঁ—তারপর?

—দূর—তা কেন? আগে শোনই ছাই। ...

কলেজ থেকে কিরে কেবল ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলুম—হঠাৎ শুন্লুম বাবা কি একটা গোপন বিষয়ে মার সঙ্গে পরামর্শ করছেন এবং সে পরামর্শ সভায় বোদিও দেখলুম একজন বিশেষ উদ্ভোগী সভ্য। শুন্লুম বাবা বলছেন—তা হ’লে আর দেরী করে লাভ কি? এই দশই অজ্ঞানই দিন স্থির করা যাক। রণেনেরও সেই রকম ইচ্ছা। ...পরে আরও শুন্লুম—আমি নাকি বাকদত্তা। আর রণেন বাবুই নাকি আমার ভাবী স্বামী।

—সর্বনাশ! তারপর?

—অকস্মাৎ সমস্ত পৃথিবীটা ভূমিস্তাৎ হ’য়ে গেলেও বোধ হয় ততোখানি কাশচর্য্য হতুম না। উৎকণ্ঠায় আতঙ্কে প্রাণটা কঁপে উঠল। উঃ!—এর চেয়ে কঠোর শাস্তি আমার পক্ষে যে আর কিছুই হ’তে পারে না। ...পা ছ’টোকে কোনও রকমে চালিয়ে নিয়ে এসে ঘরের দরজা বন্ধ ক’রে দিয়ে একেবারে মেজের ওপর লুটিয়ে পড়লুম। বুকের ভেতর বোধ হয় সমুদ্রের প্লাবন জেগেছিল ছ’টি চোখে অশ্রুর বান ডাকিয়ে চূপ ক’রে পড়ে রইলুম।

—ভারী কঠোর সমস্তা বটে! কি করলি তারপর?

—নিঃশব্দে অনেকক্ষণ ধ’রে কাঁদলুম। সর্বদ্বন্দ্ব হারিয়ে মাছুষ যেমন ক’রে কাঁদে, বা’র সংসারের শেষ আশা, শেষ অবলম্বনটুকুও খ’সে যায়, সে যেমন ক’রে প্রাণ ভ’রে কাঁদে, তেমনি ক’রে অধোরে কাঁদলুম। নারী যে কতখানি হুর্দল অদহায়, সে কথা যেন আজ এই প্রথম অনুভব করলুম। ...

...মনের প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে তবু প্রতিজ্ঞা করলুম—

মনে মনে একবার থাকে পতিত বরণ ক'ণ্ঠে, তাকে ভিন্ন আর কাউকে দ্বন্দ্ব দান ক'রে বিচারিণী হ'তে পারব না—প্রাণ গেলেও নয়।...বিয়ে ত' অনেকেদিনই হ'য়ে গেছে আশার। বাকী আছে একটা গৌকিক আচার। কিন্তু আমাদের অন্তরের মিলন-স্বত্বের সেই যে হুঃক্ষেপ্ত স্মৃতি বন্ধন, সে কি এমনই হালকা যে বাইরের সামান্য একটা হেঁচকা টানেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হ'য়ে যাবে। বিবাহ-হীন প্রেম কি এমনই উপেক্ষার জিনিষ?

—বৌমিকে তুই সব কথা জানালি নে কেন?

—তাকে জানিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি স্পষ্টই অনুমান করছি যে তাঁর মতে রণেন বোসই একমাত্র সুপাত্র, কাঞ্চন বাবুর তুলনায় সহস্র গুণ বেশী কামনীয়।

—এক কাজ করলে হয় না? তুই যদি অবসর মতো তোর বাবার কাছে নিঃসঙ্কোচে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারিস, আমার মনে হয় তিনি হয়ত' ব্যাপারটাকে একেবারেই তাচ্ছিল্য ক'রে উড়িয়ে দেবেন না। যদি একলা সঙ্কোচ হয় তোর না হয় আমিও—

—তুই কি ক্ষেপেচিস লীনা? নিজের গোপন প্রণয়ের কথা বাবার কাছে স্বীকার করব? আজ পর্যন্ত আমার অনেক আবদার, অনেক বিচিত্র অদ্ভুত খেয়ালকে তিনি সহ্য ক'রে এগেচেন বটে, কিন্তু তাই ব'লে নিজের মেয়ের মুখে এত বড় নির্লজ্জতার কথা শুনেও কি তিনি আমার উৎসাহ দেবেন ভেবেচিস? আশ্চর্য্য! তোর এই অদ্ভুত প্রস্তাবের কথা শুনে অতি দুঃখে ও হাসি আসচে আমার।

—কিন্তু তাই ব'লে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকলেও ত চলবে না। একটা কিছু উপায় অবলম্বন করতে হবে ত?

—কাল কণ্ঠে গিয়ে অবসর মতো এ বিষয়ে ছ'জনে পরামর্শ করব। এখন চললুম তাই, স্বতিটা ভারী জালাতন করচে। রাক্তুলী তখন থেকে ক্রমাগত দরজা খাচ্ছে।

\*

— সব সময়েই আপনি যেন কেমন উদ্বিগ্ন, উদ্মনা হ'য়ে থাকেন। আপনার এই ওদাসীজ্ঞের কারণ কি, চিত্রাদেবী?

শাস্ত্র গভীর দু'টা চোখ তুলে মুচুকে হেসে চিত্রা বলে—আপনার দেখুটি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করবারও ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমার মধ্যে আপনি এমন কি বিশেষ জিনিষ লক্ষ্য ক'রেচেন বলুন ত?

খুব সহজ ভাবেই রণেন বলে—অপনি যেন আমার সর্বদাই এড়িয়ে যেতে চান, পুরুষের সঙ্গে সহজ ভাবে মেলামেশা করাটা আপনি যেন পছন্দ করেন না। আপনার বোনটির স্বভাব কিন্তু ঠিক বিপরীত। যেমি মিশুক, তেমনি হাস্যশ্রিয়। ঐ রকম স্মিটিং চিয়াংফুল মেয়েকে আমার কিন্তু ভারী পছন্দ হয়।

চিত্রা বলে—আপনার স্বতিকে পছন্দ হয় শুনে খুব খুসী হলুম। কিন্তু সকলেই ত' আর একরকম প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, রণেন বাবু।

—দেখুন চিত্রাদেবী, অনেকদিন থেকে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করব্ স্থির ক'রেচি। রোজই প্রস্তুত হ'য়ে আসি, কিন্তু—

—আপনি অনায়াসে নিবেদন করতে পারেন।

—আমি জানতে চাই আপনি আমার সত্য ভালোবাসেন কি না, এতদিনে আমার প্রতি আপনার কি এতটুকু প্রেম—একটুখানি অনুরাগও জন্মায় নি? আমি আপনার স্বামী হওয়ার যোগ্য কি না সে কথা আজ স্পষ্ট ক'রে বলুন।

নিরুপায় নিরুদ্ধ বেদনার চিত্রার বুকে তখম ঝড় ব'য়ে যাচ্ছিল। জ্ঞান হাসিতে চোখের পাতা দু'টো ভিজিয়ে তুলে রণেনের দিকে চেয়ে সে বলে—যদি ভালোবাসি না বলি, আপনি বুঝি রাগ করেন খুব?

প্রশান্ত মূঢ়তার সঙ্গে রণেন বলে—নিশ্চয়ই নয়। আমার অযোগ্যতার লজ্জা নিয়ে আমি আপনার পথ থেকে স'রে দাঁড়াই, কাঁটা হয়ে ফুটে থাকতে চাইনে।



মনের ওপর জুলুম চলে না। চিত্রাদেবী, ভালোবাসা কখনো গানের জোড়ে আদায় করা যায় না।

আবেগ কল্পিত কণ্ঠে চিত্রা বলে—সত্যি ?

—হ্যাঁ, সত্যি। আপনি আমার নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পারেন।

—আমার লজ্জাহীন ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা কর্ণে রণেন বাবু, আমি আপনাকে স্বামীয়ে বরণ করতে একেবারেই অক্ষম। কারণ আমার পক্ষে সেটা অসম্ভব। তার কারণ, অর্থাৎ—না—না, থাক্ সে কথা।

—লজ্জা কি চিত্রাদেবী! আপনি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন।

লজ্জায় সঙ্কোচে চিত্রা অত্যন্ত আড়ষ্ট হ'য়ে পড়েছিল। মুখ তার রক্ত গোলাপের মতো রাঙা হ'য়ে উঠল। অফুট্ কোমল কণ্ঠে প্রাণপণ শক্তি সঞ্চয় ক'রে সে বলে—আমি একজনকে ভালোবাসি রণেন বাবু!

—আপনি ?

—হ্যাঁ আমি। সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে একমাত্র তাঁকেই আমি স্বামী ব'লে স্বীকার ক'রেছি।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর একটা বুঝভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রণেন শুধু বলে—ও বুঝেছি !.....

পরক্ষণেই সে আবার বলে—ভাগ্যিস একথা বলেন আজ, নইলে—উঃ ! নইলে আমাদের ছ'জনের জীবনই চিরদিনের অন্ধ ব্যর্থ হ'য়ে যেত। চিরজীবন শুধু দুঃখ ও অশান্তির পসরা ব'য়ে চলা সে কি সহজ শান্তি চিত্রা দেবী ? মিথ্যা বিধা বোধ না ক'রে আপনি যে অসঙ্কোচে একথা আজ আমার কাছে স্বীকার করলেন, সেজন্য আমি আপনাকে বার বার ধন্যবাদ দিচ্ছি।

একটা অবর্ণনীয় নীরব কৃতজ্ঞতা চিত্রার দু'টা চোখে অজস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল। পরিপূর্ণ আবেগে স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে বলে—আপনি মহৎ রণেন

বাবু, আপনায় ছন্দ যে এতখানি প্রশস্ত ও উদার তা' আমি—

বাধা দিয়ে রণেন বলে—আপনি বাবু হবেন না চিত্রা দেবী, প্রশংসার কাঙাল আমি নই। ভালো কথা, আপনায় পিতা বোধ হয় এ ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও জানেন না ? জানেন কি ?

—না, কিন্তু সেকথা জিজ্ঞাসা কর্ণে য়ে ?

—প্রয়োজন আছে। আমি আজকেই আপনায় পিতাকে সমস্ত কথা খুলে বলব। আপনি চিন্তিত হবেন না, আমার খুব বিশ্বাস তিনি আমার অনুরোধ কিছুতেই অবহেলা করতে পারবেন না। আজ থেকে এ বিষয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত আমার আর অস্ত্র কাজ নেই। নিজের শক্তির ওপর চিরকালই আমার অগাধ বিশ্বাস।

—আপনায় মহত্বের সীমা নেই রণেন বাবু! এ ঋণ আমি কোনোদিনই পরিশোধ করতে পারব না।

খুব সরল অথচ উচ্ছ্বসিত স্বরে রণেন বলে—অনর্থক কতকগুলো বিশেষণে বিশেষিত ক'রে আমার লজ্জা দেবেন না চিত্রাদেবী, এ আমার কর্তব্য। আপনাদের দুজনের মিলন সহজ সফল স্নানর হোক, আমার কাছে তার চেয়ে বেশী আনন্দের বিষয় আর কিছুই হ'তে পারে না।

—আপনায় মতো জায়গায় গুণ্ডাকাজী উদারপ্রকৃতির মাহুষ সচরাচর চোখে পড়ে না, আপনাকে যে কি ব'লে—

—আপনি কিছু না বললেই আমি স্তবী হব। প্রশংসা জিনিষটার ওপর আমার একটুও লোভ নেই।

মিনতিভরা করুণ কণ্ঠে চিত্রা বলে—আমায় একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে রণেন বাবু,—স্বতিকে আপনায় নিতে হবে। আপনাকে আপনি করে নেওয়ার লোভ আমি কিছুতেই সম্বরণ করতে পারছি নে।

শুধু স্নান হাসি হেসে রণেন বলে—অনুগ্রহ না কি ? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আপনাকে দেখুটি

অনেকখানি বাক্স-পটু, বিবেচক ক'রে তুলেচে।.....  
কিন্তু আমি ছাড়াও কি আপনার বোনটির পাত্রের  
অভাব হবে চিত্রাদেবী?

—অপাত্রের না হ'লেও সংপাত্রের অভাব হবে।  
কেন আপনার কি মত নেই রণেন বাবু?

—আপনি অখুসী হবেন, কিন্তু উপায় নেই।  
আমি আপনার অহরোধ রক্ষা কর্তে পারলুম না।  
আমার ক্ষমা করবেন।

চিত্রা কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু  
হঠাৎ তা'র মেজ্জা'র সঙ্গে স্বৃতিকে ঘরে ঢুকতে দেখে  
সহসা তার সমস্ত মুখশানি সিঁদুরের মতো রাঙা হ'য়ে  
উঠল। তবে সেটা লজ্জার না প্রত্যাখ্যাত হওয়ার  
অপমানে ঠিক বোঝা গেল না।

\* \* \*

দশই অজ্ঞানের এক শুভলগ্নে চিত্রার জীবন  
সত্যিই কাঙ্ক্ষনের স্তম্ভ বাহু কারাগারের মধ্যে  
চিরদিনের জন্মই বন্দী হ'য়ে গেল। একমাত্র রণেনের  
ব্যাকুল পীড়াপীড়িতেই চিত্রার পিতা এ বিষয়ে  
অবশেষে সন্মতি দিয়েছিলেন।

আত্মীয় বন্ধু অনেকেই একত্রিত হ'য়ে চিত্রার  
বিবাহ-বাসর সরগরম ক'রে ছিলেন বটে, কিন্তু সেদিন  
সেই সর্বপ্রধান উদ্ভোগী এবং সর্বাপেক্ষা উৎসাহী  
রণেনকে সমস্ত শহর খুঁজেও কেউ তার সন্ধান করতে  
পারলেন না।.....

খোঁজ পাওয়া গেল বিয়ের তিন দিন পর। চিত্রার  
সেদিন বো-ভাত। ছোট দেওয়ার এবং অজ্ঞাত  
সমবয়সী মেয়েদের অসংখ্য বিচিত্র প্রশ্নের চিত্রা তখন  
যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতিল।  
ঠিক সেই সময়ে কাঙ্ক্ষনের দিদি স্মিত্রা দেবী ঘরে  
ঢুকে সন্নেহ কর্তে চিত্রার পানে চেয়ে বসেন—তোমার  
নামে একটা ইন্সিওর আছে বো-লক্ষ্মী। শীগগির  
উঠে এস।

চিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে খুব নিরিবিলা একটা ঘরে  
ঢুকে স্মিত্রা প্রথমে মোড়কটি ছিঁড়ে ফেললে।  
তারপর একটা ভেলভেটের বাস্কের ভেতর চমৎকার  
এক ছড়া আধুনিক ফ্যাশনের মফচেন এবং খুব দামী  
পাথর বসানো একটা সন্দের আংটি দেখে ব্যগ্রবিস্ময়ে  
উৎসুক হ'য়ে স্মিত্রা প্রশ্ন করলে—কে বো-লক্ষ্মী?  
এ উপহার কে পাঠিয়েচে তোমায়?

—আমার এক দরদী দুঃখী বন্ধু, সংসারে তার  
কেউ নেই।

ছোট্ট একটুকরো কাগজে শুধু ছ'টা কথা লেখা  
ছিল,—চিরায়ুস্বতী—‘রণেন’।.....অস্ত্রের নিকর  
বেদনা কিছুতেই আর গোপন রইল না। চোখের  
জল বর্ণার ধারার মতোই চিত্রার ছ'টা গাল বেয়ে  
নেমে এল।...অশ্রুসিক্ত নিম্পলক দৃষ্টি মেলে তবু সে  
এ বাপসা অম্পষ্ট অক্ষর গুলোর পানেই চেয়ে রইল...



যেদিন অজানারে আপন করিয়া

জানিবে তুমি

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

যৌবন-গৌরব-ভরা হে রজনীগন্ধা আমার—  
প্রতি পরাগেতে তব কী কামনা জাগে অনিবার ?  
ক্লান্ত তব যৌবন-উদ্বেল হিয়া বিভাবরী জাগি  
যুগ-যুগান্তের অনাদি অমর কোন্ প্রিয় লাগি—  
ধরণীর প্রথম প্রভাত হতে শেষ নিশাবধি  
যাপিবে সোণার জীবন তব এমনি কী নিরবধি ?  
কূলে কূলে তব চলিছে চঞ্চলিয়া যে পুলকের গান,  
তারে কী ফিরাবে রিক্ত হাতে, বঞ্চিত সক দান ?  
অবহেলে কী গো চূর্ণ করি দিবে কামনার মায়া  
জাগ্রত জীবন প্রভাতের পাতে—যৌবন-উচ্ছলকায়া  
নিয়া প্রিয়া লাগি রবে জাগি এই কি গো তব পণ ?  
দিয়োনা বিদায়, যৌবন-ময়ী চঞ্চল-চরণ  
বিধবা বনানীর কুঞ্জ-পত্র ছায় ; উন্মুখ চিত্ত চায়  
সন্তোষের সুরাপাত্রখানি পূর্ণ করি একেবারে হায়  
কামনার মদে নিঃশেষি দিতে লক্ষ কোটি প্রলোভন—  
যারা মোরে পঙ্করে পঙ্করে উতলিয়া তোলে অশুদ্ধণ !

\* \* \* \* \*

হে বন্ধু, আমার ও হৃদয়ের দুইকূল ছাপি চলে যৌবন  
চারিদিকে গানে-গন্ধে রচি আনন্দ নির্ঝর মৌ-বন—  
প্রিয়া লাগি আমি বন্ধু বাহিরিনু জীবনের পথে  
তুচ্ছ করি সীমার সীমানা নিখিলের নব রথে ।  
আনো বন্ধু, শরতের প্রথম সুপ্ত শেফালিসম্পাতে  
পীতম্বিন্দু মর্ম্মলিপিখানি তার, দিয়ে গেছে হেম হাতে—  
আর আজি আমি আপনারে নিঃশেষে হারাইয়া ফেলি  
নিখিল ভুবনের মুক্ত গগনের তলে দুই বাহু মেలి

ডাকিতেছি তারে, বন্ধ আমার কেঁপে ওঠে বারেবারে—  
 তারি মাঝে আমি বিসর্জিয়া দিমু মোর আপনারে ।  
 সেই ধ্বনি সাগরের দোলা সম চঞ্চলি চলে নিরন্তর,  
 ওই বনানীর জীর্ণ-পত্রদলে সেই ঢেউ লেগে কাঁপিছে থরথর—  
 মনে পড়ে মোর মাতালী মেঘের বাতায়নে ক্ষণে ক্ষণে  
 আঁখি তার দেখা দিত যে জনা ডুবেছে কালের বিস্মরণে ।

\* \* \* \* \*

রক্ত-করবীর কবরীর তলে জানো বন্ধু কত কোটি ছলে  
 তপ্ত তৃষা লুকাইয়া রেখেছিল প্রিয়া মোর কুতূহলে—  
 আমি তারে দিমু খুলি মুক্ত করি রঞ্জনের আবরণ,  
 সেইদিন প্রিয়া চলি গেল হায় নিরালায় চঞ্চল চরণ  
 জলধি যেথা যৌবন-ঢলঢল নদী লাগি রয় জাগি  
 শুধু ক্ষণিকের তরে দুইবুকে প্রেম-পরশন মাগি ।  
 হে বন্ধু, যাত্রা তব কোন্ অজানায় হবে ওগো শেষ—  
 যেথা শ্যামল তৃণের পরে এলাইয়া কমনীয় কালো কেশ  
 একেলা রহিবে তুমি আন-মনে প্রিয়তম পথ চাহি,  
 যেদিন অজানারে আপন করিয়া জানিবে তুমি—  
 আমি রাঙা গালে দিব সঁপি চামেলীর চুল একবার চুমি ।  
 প্রাণের প্রাঙ্গণ-তলে আনন্দ উঠিবে জাগি জীবন্ত কায় নিয়া,  
 যৌবন-চঞ্চল অঞ্চল তব উন্মনা করি পুলকের বান দিয়া ।



## কুলীর মূল্য

### শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র

....আটটার ঘরে ঘড়ির কাঁটা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই কলের সিটা বেজে ওঠে, হুড়মুড় করে খোলা ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়ে অগণিত নরনারী। ..যারা পিছিয়ে থাকে তারা সবাই ছুটে আসে হস্তে হ'য়ে।... সর্বনাশ! রোজকামাই.....

যারা আরও পিছিয়ে থাকে, মরি বাঁচি করে ছুটে আসে একেবারে ফটোক বন্দর মুখোমুখী সময়ে।..... স্তুতি, মিনতি, ধোবামোদ শেষকালে পান-খাওয়ার ইজিতে দরজার 'হজুরের' মেহেরবানী হয়, তবে তারা ঢুকতে পায়। আরও পিছে পড়ে থাকে যারা, তারা এসে বন্দ ফটোকের সামনে বসে ধুকতে থাকে শুধু।... প্রাণ বুঝি বেরোয়।.....

বিকেলবেলা সাড়ে চারটে বাজলেই সব এসে জড়ো হয় কলের দরজার সামনে। দরজার হজুরেরা রক্ত-চোখের তাড়না নিয়ে তল্লাস করে জামা কাপড়, ট্যাক, পকেট, কাছা প্রভৃতি। যদি কেউ কিছু চুরী করে! তারপর বেরিয়ে আসে ধোয়ার ছাড়া পশুর দল।

এই তল্লাসীটা বড় বিরক্তি কর।....একে তো খিদের জ্বালায় নাড়ীতে পাক ধরে। অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকতে মন আর চায় না।... তার উপর তল্লাসীর নামে হজুরদের গুঁতো, ধাক্কা, মিঠাবুলি, তারও উপর মাঝে মাঝে ট্যাক থেকে, পকেট থেকে ছ'চারটে পরসাদা চলে যায়।

মেয়েগুলোর মুকিল আরও ...ওদের নাকি সতীষ নেই! গরীব-ছোটলোক তো। ওদের আবার সতীষ, নারীষ কি?.....ময়লা, ছেঁড়া, তালি-মারা কাপড়ে কি আর সতীষগিরি চলে?

হজুরদের ধারণাই এই। তাই তল্লাসীর সময়ে

তাদের ছেঁড়া কাপড়ে ঢাকা বুকের আঁচলে টান পড়ে।...

অকস্মাৎ তল্লাসী প্রভুরা আনন্দে মসৃণ হ'য়ে তান ধরে,—মেয়ে পেশারী।

কত রঙ...কত ঢঙ।

বুকের কাপড় হাত দিয়ে চেপে ধরে.....বাকী কাপড়টা ঠিক ভাবে সামলিয়ে রেখে তল্লাসী হ'তে দেওয়া, সে এক ভারী গোলমেলে কাণ্ড।.....তার উপর আবার হাওয়ার অত্যাচার আছে। তাই অনেকেই বাধ্য হ'তে হয় লজ্জার মাথা খেয়ে বুক-ধানার ওপরেই তল্লাসী হাতের অত্যাচার সহিতে দিতে।

অল্পপায় ..., নইলে চাকরী থাকে না।

রোজ রোজ এ তাদের সহিতে হয়ই।

নিত্য যাদের ঘরে অভাবের তাড়না, নিত্য যাদের সংসারে ক্ষুধিতের ক্রন্দন, রোগে-শোকে-চিন্তায় শুধু দীর্ঘশ্বাসই যাদের সম্মল তাদের তো অতশত বাহুল্যে চলে না। মান-অপমান তাদের ডুবে যায়।.....

কলের মালিক আরে বিরাট মাহুষ তিনি। মস্ত ভুঁড়ি, সাফ মুড়ী।...

মাহুষ চোলাই ক'রে 'কুখির' তৈরী ক'রতে তিনি খুব জানেন ও করেন।

অল্পগৃহীতেরা বলে,—ও: আপনার কি দয়া! কত গুলো লোকের অন্ন জুটিয়ে দিয়েছেন।.....আপনি অন্নদাতা, অনাথের পিতা। আরও সব মেলা-রকমের। মনে নেই।.....

কল-টাকা তৈরী ক'রতে রোজ। সে কত রকমে।...মালিক মহাশয়ের বাড়ী, গাড়ী, নাচ, গান, আমোদ, ফুষ্টি কত কি হচ্ছে।...মস্ত খেতাব-কাগজে খুব নাম। অশ্রাস্ত ফুষ্টির ফোয়ারা।

মালিক মহাশয় যেমন ধনী—তেমনি দানী।  
দানও একটু আধটু নাকি! অমুক লর্ডের বিধবা  
পত্নীর সাহায্যে...—এত হাজার টাকা নিয়মিত  
বন্দোবস্ত। অমুক বন্-ড্যান্স-পার্টির সাহায্যে এত  
টাকা। অমুক মিশানের টাচার ও গার্লদের জুতা এত  
টাকা। এই রকম সব মোটা মোটা দান।

সাম'জ ক'থা কি?...

যাদের অন্নদাতা!—সেই সব অন্নহীন সন্তানেরা  
রোজ রোগে, শোকে জীর্ণ দেহ নিয়ে আসে—কলের  
চাকার তলে দেহ রেখে দেয়—রুধির তৈরীর জন্ত।...  
শরীরে রক্তই নেই, তা তৈরী হবে কি? তাই  
অচল, অকেজো দেহগুলোর ওপর মাঝে মাঝে  
লকলকে বেতের চুমু, বুটের ছোঁয়া পড়ে—তাদের  
কাজের ক'রে নেবার জন্ত।

মেয়েগুলো—যৌবন যাদের নিরাহারী দেহেও  
রাজস্ব ক'রতে ছাড়ে না, হ'য়ে পড়ে খেলার জিনিষের  
চেয়েও খেলো।...বা খুসী তাই।...টাকা, পয়সা,  
প্রলোভন নয়—, জবরদস্তী।—

ঘরে ক'চি ছেলে কাঁদে, মাকে সারা দিনের  
শেষেও না পেয়ে; অনাহারী স্বামী বসে থাকে  
আকুল প্রতীক্ষা নিয়ে, মুমূর্ষু পিতার রক্ত-হীন আঁখি  
মেলা থাকে ছুরোরের পানে কাতর দৃষ্টি নিয়ে...  
তাদের একমাত্র ভরসা যে, তার ওপর তখন চলচে  
জুলাম, অত্যাচার। যে মায়ের প্রাণ ব্যাকুলিত রয়েছে  
গৃহ-পানে শুধুই, তাকে তখন বুঝতে হচ্ছে বিরুদ্ধ-  
শক্তির সঙ্গে প্রবল সংগ্রামে।

কেউ হাঁসপাতালে যায়, কেউ মরে...কেউ ফেরে  
ঘূর্ণিত দেহ নিয়ে, হাহাকার, আত্মগোপন, ধিকারে বুক  
পূরিয়ে।...

হারে অভাগা দেশের অভাগা জাতি।

হুঁদিলে রবারের ব্লাডারটা ফোলে ন'লেই কি  
অবিরত হুঁ নিতে পারে? বেশী হাওয়া হ'লেই  
কেটে যায়।

কত আর সহিতে পারে লোকে!...রক্ত মাংসের  
শরীরই তো!...একদিন সব ক্ষেপে গেল। সমস্ত  
কল জুড়ে সত্যগ্রহ বিশাল জৌহ-দানব কদিন থেকে  
চুপ

হঠাৎ এতটা!...

ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে যে আগুন জ্বলতে থাকে—একটু  
সহযোগ পেলেই তা এমনই প্রদীপ্ত হ'য়ে দেখা  
দেয়।...আমরা বলি হঠাৎ।

...গৌরী কাহারের বউ পুনিয়া—সেদিন তল্লাসীর  
সময়ে সকলের শেষে তল্লাস হ'ল। তখন সবাই  
চ'লে গেছে। একা পুনিয়া '...আঠারো উনিশের  
মাকামাকি তার বয়স। কালীর ছাপের ভেতরে  
সাদা রেখা যেমন ফুটে ওঠে,—কলের ময়নার ফাঁকে  
পুনিয়ার রূপ তেমনি উকি দেয়।

গৌরীর অমুখ—বিছানাতে পড়ে থাকে।...বছর  
খানেকের একটা ছেলে, পাঁজুরা সার। কাজেই  
পুনিয়াকে কাজে আসতে হয়। নইলে কারুর ইচ্ছে  
নয়।

ইচ্ছে কি হয়—রোগা স্বামীর কাছে ক'চি ছেলেকে  
ফেলে সহস্র কলুষিত দৃষ্টির মাঝে নিজেই নিয়ে  
আসা?...কিন্তু খায় কি?

পুনিয়া ফটোকের দিকে পা দিতেই—তাড়া এল,  
উছ...। ছোট সাহেব ডেকেছে। সশঙ্কিত চাহনীর  
উত্তর এল—হয়ত গৌরীর অমুখ শুনে সাহেবের খুব  
দয়া হয়েছে। তাই সাহেবের হুকুম তার ঘরে  
যেতে।

অগত্যা!...

মনিব যে, হুকুম রাখতেই হবে।

তারপর সায়েব—রাজার জাত। ওরা তো গরীবের  
মা বাপ দয়ার কথাটা সম্ভবতঃ সত্যিই।...

দরটা সত্যিই বটে, আর একদিক দিয়ে।

পুনিয়া ছোট সাহেবের ঘরে যেতেই—গভীর কঠে-  
সায়েব ডাকলে,—ইখার আও—বাত ছায়।...কম্পিত-  
দেহা পুনিয়া ক্যাম্প-খাটটার কাছে যেতেই পিছনে  
দরজা পড়ে গেল। কে শেকল টেনে দিলে।

সাহেবের বাত প্রকাশ পেল তাকে ঝাপ্টে ধরবার সময়।... ছেঁড়া কাপড় আরও ছিঁড়ে গেল। জবর-দস্তি ও বাধার যুদ্ধে।

গৌরী কাহারের রক্ত চন্ চন্ ক'রে উঠল।... উঠতে পারে না, হঠাৎ শক্তি এসে জুটল।... সন্ধ্যার একটু পরে ছোট সাহেব বেড়িয়ে ফিরে—সাহেব এসে দাঁড়াল গৌরী। কী একটু তর্ক হ'ল। অকস্মাৎ 'শায়ে, সন্ধ্যার কি বাচ্ছা'—সঙ্গে সঙ্গে সবটুকু পদাঘাত। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে!... একটু দম নিয়ে আরও কতকগুলো।

রোগী দেহে আর কত সময়?...

গৌরীর মরা দেহ, আর পুনিয়ার কলঙ্ক দুটো মিলে আগুন জ'লল। এই সহযোগের অভাবটুকুই যেন এতদিন ছিল। অসীম সহিষ্ণুরা আজ ক্ষেপে দাঁড়াল।... বিচার—বিচার—বিচার চাই। আমাদের দাবী—মানুষের ভাষা পাওনা দিতে হবে। আর সুইব না,—কেন ?

হারে হতভাগ্য জাতি—বিচার করবে কে ? কে

তোদের ভাষা পাওনা দেবে ?

মনিব—সে স্বদেশী, বিদেশী যাই হোক—সমান।  
বিদেশী যদিও ভালো—স্বদেশী, আরও ভীষণ।

নিজের দেশ তাই কিনা! তাদের হুকুমে বড় বড় লোক খাটুচে, বিজ্ঞানের ম্যানেজার হচ্ছে সায়েব। তারপর আরও কত সায়েব। ছোট, বড়, মেজ।... এদের কাজের ওপর কি কথা চলে? বদ্মাইস ওয়াই—ছোট লোক পাজীরা।

এক দিন গেল—হুদিন গেল।

তিন দিনের দিন পুলিশ এল। বস্তি ঘিরে ফেললে।

গুলি-গোলা চলল। কতক গুলোর শিলে কাটল,—কতক গুলোর মাথার খুলী ভাঙল। বাকী গুলো চালান হ'ল—বাছা বাছা মোড়লরা।

কোথা থেকে কলে জুটে গেল—পাঁচ মিস্ত্রী জাত। চীমে, জাপানী, মগ, ফিরিকী, উড়ে, বাঙালী, খোঁটা প্রভৃতি।... দিব্যি কল চ'লল।...

আরও হুদিন বাদে—হুকুম হ'ল, বস্তির জমীদারের বস্তি ছেড়ে দেবার। কেনর কারণ নেই। খুসী...

একদিন বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হ'ল। গাছে কেউ কথা অমান্য করে থাকে।... দলে দলে রাস্তার ওপর বসে কুলীরা চেয়ে রইল—ঘর দোরের প্রতি।

চোখ ফেটে কান্না আসে।...

ম্যানেজারের মাইনে বেড়ে গেল। প্রোপ্রাইটার খুব খুসী, পাজীগুলোর উচিত শান্তিই হয়েছে।



# নারীর আসন কোথায়

॥হেম সেন

নারী জাতি সম্বন্ধে অধ্যাপক ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, পি, আর, এস, পি, এইচ, ডি লিখিত “নারীজাতির প্রতি সম্মান”, উচতট্ট আচার্য মহাশয়ের লিখিত “নারীর সম্মান—ভারতে ও ইউরোপে”, ‘উড়োখই’ মাসিক পত্রিকায় জনৈক “নবীনার পত্র” প্রবন্ধগুলি এবং অত্রাণ্ড আরো কত প্রবন্ধ প্রায়শঃই দেখিতে পাওয়া যায়। নারীজাতি সম্বন্ধে আলোচনা নারী এবং পুরুষ উভয়ের দিক হইতেই চলিতেছে—অবশ্যই ইহা মেয়ে—পিলটার লিখিত পুস্তক বাহির হওয়ার অনেক পূর্বেই। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার মনু হইতে যে সব শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার বিশেষ আবশ্যকতা ছিল বলিয়া আমার মনে হয় না। কারণ মনু ভাল মন্দ দুইই লিখিয়াছেন এবং তাহা সামাজিক শৃঙ্খলার জন্তই। মনুকে তো আমরা বর্তমানে old fool বলিয়া বাতিল করিতেই প্রস্তুত (!)। অত্রাণ্ড অধ্যাপক মহাশয়ই বা এতটা কষ্ট স্বীকার করিয়া মনুর শ্লোক ঘাটবেন কেন? যে সময়ে মনু নারীজাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন তখনকার সামাজিক অবস্থা অত্ররূপ ছিল। যে দেশে লিখিত উপদেশ বা নিষ্যার চেয়ে নারী সম্বন্ধে উজ্জল সদৃষ্টান্ত বর্তমান, সেখানে মিস্ মেয়ের স্থান নাই।

“নবীনার পত্র” খানা দান্তিকতায় পূর্ণ। “কার্য্যক্ষেত্রে নেমে আমরা দেখছি তোমরা অতি বোকা, অতি নির্বোধ,”—“তোমাদের মত আমরাও বলীয়ান”,—“জগতে আনন্দ আমাদেরও উপভোগের যোগ্য”—“আমরা আর তোমাদের ভাৰ্য্যা নই”,—“আমরা আর আতুর ঘরে শুধু বন্ধ থাকতে চাই না” ইত্যাদি পড়িলে মায়ের রণরঙ্গিনী মূর্তির কথাই মনে হয়। বোকা ও

নির্বোধেরা বুদ্ধিমতীদের অধিকার হরণ করে কিরূপে? সকলেই কি সকল ‘আনন্দ’ উপভোগ করিবার অধিকারী? তোমরা ‘বলীয়ান’ নয় কে বলিবে?—তোমরা বহুবলধারিণী। তোমরা ‘ভাৰ্য্যা’ নও কেন?—এক কথায় তোমরা সব। তোমরা “নারীম্বের মুকুট” পরিয়। এক platformএ আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। তখন আর তোমাদের এ ক্ষোভ থাকিবে না। “তাই আমরা আতুর ঘর ছাড়তে বন্ধপরিষক।” এ যেন সৃষ্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। নারী মাত্রই যদি এরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইতেন এবং তার ফলে নতন সৃষ্টি আর না হয়, তবে হে নারী, তোমার আবশ্যকতা সমাজে নাই;—তোমার কার্য্যে জগতের কতটুকু মঙ্গল সাধিত হইবে? ক্রমে মানবের অস্তিত্ব জগত হইতে মুছিয়া যাইবে। “গুণ হইয়া দোষ হৈল বিস্তার বিস্তার।” এও যে দেখিতেছি তাই। নারী দশমান গর্ভাবরণে রাখেন—প্রসবান্তে শিশুকে কোলে জড়াইয়া স্তন পান করান, তারপর সারাজীবনই এই নারী স্নেহ-সমতা-ভালবাসার আবরণে যত্নে রাখেন। এসব তাঁর প্রকৃতি। পাখীকে বলতে হয় না—তুমি তোমার শিশুগুলিকে আহাৰ যোগাইয়া দাও। এটীও তার প্রকৃতিগত। মাতৃম্বই নারীর চরম তৃপ্তি। তবে দুই এক জায়গায় exception দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা মানব মণ্ডলীর আশ্রয়ের বহির্ভূত।

এ জগতে সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দুইটীই বিরুদ্ধ প্রকৃতি অথচ এক জায়গায়ই মিলন,—অপূর্ণ প্রকৃতি পূর্ণতাকে বরণ করিয়া লয়ন।

আত্মার শিক্ষার জন্ত যেমন প্রকৃতির অস্তিত্বের আবশ্যকতা আছে, সেইরূপ পুরুষের-সমাজের—এক



কথার জগতের শিক্ষার জন্তও নারীর অস্তিত্বের আবশ্যিকতা ছিল, আছে এবং থাকিবে। পুরুষের শিক্ষার জন্ত যদি নারীর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা যায়, তবে দেখা যাউক, এই নারীর স্বরূপ কি? ভগবান কারণজলে ভাসমান থাকা অবস্থায় তাঁহার কপাল হইতে যে মহাতেজঃরাশি বিনির্গত হয়, তাহাই নারী বা মহাশক্তি। এখন জানা গেল নারীর মহাতেজঃ স্বাধীন পুরুষ—পুরুষ; অর্থাৎ নারীর মহাশক্তি ব্যতীত পুরুষের অস্তিত্ব বজায় থাকে না। এই জন্তই নারীর এত সম্মান—জগতে নারীর পূজা পুরুষ কর্তৃক হইতেছে। কিন্তু বর্তমানে সমাজে নারীর আসন নীচে নামিয়া আসিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কারণ,—

“নভাৰ্থ্যাস্তাড়য়েৎ কাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা”

কথাটা এখন আর সর্বত্র নাই বলিয়াই মনে হয়। একদিকে যেমন “কস্তাপোবৎ পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ” কথাটার সার্থকতা নাই বলিয়া নারী জ্ঞানান্ধই থাকিয়া যায়, পক্ষান্তরে এই নারীই মাতৃস্থানীয়া হইলে শিশুকে জ্ঞান ভাগাইয়া দিতে অক্ষম হয়, যদিও তাঁর হাতেই প্রাথমিক শিক্ষার ভার পড়ে। অন্ধ কখনও অন্ধকে পূর্ণচন্দ্র দেখাইতে সক্ষম হয় না। এই শিক্ষা না দেওয়ার দোষটা কার? কিন্তু এই নারী সময়ে বুঝিতে সক্ষম হয় যে সে জ্ঞানান্ধ। তখনই পুরুষের প্রতি—সমাজের প্রতি - সামাজিক নীতি ও দেশাচারের প্রতি মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এবং যার প্রতি পতিব্রতা ভাৰ্য্যা ভুট্টা না থাকেন, তিনি অধর্ষই করিয়াছেন, পরন্তু তাহার কর্তব্যের মন্ত একটা ক্রটি হইয়াছে এবং ইহার প্রতিকারের উপায় না থাকায় সমাজের বিশেষতঃ জগতের খুব বড় ক্ষতিই হইয়াছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকারে শ্রেষ্ঠ এবং নিজ নিজ কার্যের জন্য দায়ী। অজ্ঞানতাই যদি সংসারের দুঃখ কষ্টের কারণ হয়, তবে উভয়ে উভয়কে জ্ঞানদান দ্বারা বলীয়ান করিয়া তুলিতে হইবে। যদিও সমাজ অজ্ঞানান্ধকারে ঢাকিয়া আছে, তবু চেষ্টা করিতেই

হইবে। চেষ্টা অবস্থার অনুগত এবং কার্য সময়ের অধীন। চেষ্টা করিতে করিতে সময়ে কৃতকার্য হওয়া সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। ইহাতে ভীত হইয়া হাল ছাড়িলে চলিবে কেন? ভয় দুর্বলতার চিহ্ন। এই দুর্বলতাই মানুষকে কর্তব্যপথভ্রষ্ট করে। পুরুষের সংস্কার আছে যে নারী গৃহে রান্নার কার্য, সম্ভান পালন এবং ঘর-কন্নার কার্য ব্যতীত অল্প কোন বাহিরের বিশেষ কাজ তাহা দ্বারা হইতেই পারে না এবং হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও নাই। ইহা একটা সংস্কার মাত্র। সংস্কার মানে যদি মনের একটা বিশেষ বোক বলিয়া ধরা যায়, তবে ইহা স্বীকার্য যে বোক (whims, জিনিষটাই একটা মন্ত ভুল। নারী যদি মহাশক্তিই হয়েন এবং পুরুষ যদি নারীকে আশ্রয় করিয়াই সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, তবে নারীকে শ্রেষ্ঠ আসন না দিয়া উপায় কি? এক্ষেত্রে পুরুষ, তুমি দুর্বল, তীর! তুমি পুরুষ নও কাপুরুষ। পুরুষ তুমি বীর হও, প্রভু হও স্বাধীন হও, কামজরী হও। ক্রীতদাসের মত কার্য এবং ব্যবহার কর বলিয়াই তোমার দুঃখ দৈন্ত ঘটিতেছে না। তোমার স্বাধীনতা নাই, তুমি দাস মাত্র। দাসকে প্রেম দিতে নারী অক্ষম। বসুন্ধরা বীরের পূজাই করিয়া আসিতেছেন। তুমি যেমন জীকে ক্রীতদাসী করিয়া রাখিতে চাও, জীও তোমাকে দাস করিয়া রাখিতে চাহেন। এক্ষেত্রে ভালবাসা বা প্রেম কোথায়? একটা বিকার মাত্র। বিকার হইতেই তোমার যাতনা। তোমার আনন্দ আসিতেই পারে না। পুরুষ, তুমি স্বার্থপর। তাই নারী কতকটা পরশ্রীকাতর হইয়া পড়িয়াছে। ত্যাগেই মুখ। তুমি ত্যাগী নহ। তাই নারীর প্রকৃত স্বরূপ তুমি দেখিতে পাওনা। তুমি নারীর মুক্তির সহায় হও, নিজেও আনন্দ পাইবে!

অনেকে জীস্বাধীনতা দোহণীয় মনে করেন। স্বাধীনতা কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। নারী যদি পরাধীন হইয়াই থাকেন, একদিন তিনি স্বাধীন ছিলেন আবার তিনি স্বাধীন হইবেনই। অক্ষম শিশু

পড়িতে পড়িতে সমরে উঠিয়া দাঁড়ায় ও চলিতে থাকে। নারী লুপ্তশক্তি আগাইবেই এবং তাহা পুরুষের স্ব-শাস্তি ও মুক্তির জন্ত। প্রকৃতি নিজের জন্ত কিছুই করেন না। পুরুষ, যদি তোমার অহংকার হইয়া থাকে, তবে তাহা ত্যাগ কর—প্রকৃতিতে আত্ম-সমর্পণ কর।

নারী, তুমিই মা মহাশক্তি। তোমার এই মহা-শক্তির উদ্বোধন নিজেকেই করিতে হইবে। তুমি

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডারদরী, তাই তুমি নম্রা। তুমি বিলাসিনী নও মা,—তুমি ব্রহ্মচারিণী,—কঠোর ব্রতধারিণী। তোমার আত্ম সম্মান জাগিয়া উঠুক। তোমার যেমন অনন্ত শক্তি, তেমন অনন্ত কর্তব্য। তুমিই লক্ষ্মী, লজ্জা, শ্রদ্ধা, তুষ্টি ও স্বর্গ। তুমিই ত্যাগের—প্রেমের প্রতীক। তোমাহইতেই সকলের সৃষ্টি। তুমি জননী, সম্ভানপালিনী। অগ্নি প্রাণময়ী নারী, সেই কারণে তোমার আসন সর্বোচ্চে।

## স্মৃতির-দহন

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মোর এ দীর্ঘ-পঙ্খর ঠেলি' অনিবার আগে মুরতি কার ?  
হ'য়ে যায় মন উদাস কেমন চিন্ত-দোলায় দোলনে তার !  
তারই অশ্রাস্ত-দোলার-দোলনে হৃদয় গগনে দুখের হাওয়া,  
বারে বারে হায়, কাঁদাইয়ে যায়,—ভাবিলেই তারে বেদনা পাওয়া।  
কে সে মায়াবিনী এত ছিনিমিনি ক'রে গেল কত অলীক খেলা ?  
একি জ্বালাময়ী-স্মৃতির-দহন জীবনে এসেছে গোধূলী বেলা।  
চিন্ত-আকাশে লোহিত আলোর শিখাটি নীরবে নিভিছে রে,  
ব্যথার-কালিমা সঘন-আঁধারে ধীরে অতি ধীরে মিশিছে রে।  
জীবনের আলো ধিকি ধিকি জ্বলে, অবসান বুঝি হয় এবার ;  
ভালো তাই ভালো গোধূলীর-আলো নিভে গিয়ে যেন জ্বলে না আর।  
চির-জনমের সঙ্গিনী হ'য়ে মন-গহনের নিরাসা-কোণে,  
সে 'আশার-লতা' স্নমধুর কথা কহে না ত' আর সঙ্গোপনে।

\* \* \* \*

মনে পড়ে সেই আধ-বুমঘোরে রহিতাম যবে নিদ্রাগত,  
নয়নে কোমল-কর-পল্লব চাপিয়া ধরিতে সাদরে কত।  
সব ভুলে' গিয়ে ধরিতাম চাপি' আদর করিয়ে অধর-পরে,  
চুমার-চুমকি-হারেতে তোমায় সাজিয়ে দিতাম অশ্রু-তরে।

দুজনে বিজনে আঁখির স্বপনে কুসুম-ফোটানো-জ্যোছনা-রাতে,  
 অপলকে তোমা দেখিতাম চেয়ে—কি যে আঁকা আছে নয়ন-পাতে !  
 ঘুরাইতো মোরে তব পাশে পাশে তোমারি কাজল-আঁখির-ভাৱা,  
 চিত্ত-চকোর তোমারে দেখিতে উড়িয়া বেড়াত পাগল-পাৱা ।  
 তোমারি নিপুণ-কোমল-করের কঙ্কণস্বর শুনেছি আমি,  
 কত শতবার আনাগোনাছিলে দেখা হ'তো দৌঁছে দিবস যামী ।  
 ভুলিতে গেলেই ভেসে ওঠো, আর ভাসিলেই তুমি ছলিয়া ওঠো,  
 খাই পিছু পিছু ধরিতে তোমারে, তুমি তো আমারে ফেলিয়া ছোটো ।  
 চল-চঞ্চল-চরণে তোমার সরম জড়িত কি মাধুরিমা,  
 কত আনন্দ অন্তরে মোর সঞ্চারে' তার নাহিক সীমা !  
 'ডালিম' ফুলের রঙটি ছিটানো-নখর-অধরে মধুর-হাসি,  
 মা জানি কেমনে 'আমার-আমায়' পরায়ে দিয়াছে প্রেমের-ফাঁসী ।

\* \* \* \*

যে মনোমধুর বাক্যত সুর উঠেছিল রণি' পরাণ-তারে,  
 জীবন-বীণাতে সে সুখরাগিণী আর কেহ আসি' বাজায় না রে !  
 কে আর বাজাবে এ ভাঙ্গা-বীণায় সে মহা-রাগিনী গভীর সুর ?  
 পরাণ পাগল করে' দিয়ে মোর সে যে চ'লে গেছে অনেক দূর !  
 ভেঙ্গে' গেছে মম জীবনের বীণা, ছিঁড়ে গেছে তার সকল তাঁর,  
 চারি ধারে দেখি—ধীরে ধীরে ঘিরে' গভীর-ব্যথার অন্ধকার !  
 তবু সে রহিল সদা আগরুক অন্তর-পুর-চিত্ত-দোলায়,  
 দাও সাড়া দাও, হাসাও কাঁদাও, সঁপেছি যে শ্রাণ তোমারি পায় ।



## “আমার বিচার তুমি কর”

শ্রীহরিপদ গুহ

পৌর্ণমাসী মধুময়ী রজনী। নীল আকাশের কোলে বসিয়া সুধাকর ধরণী-বক্ষে রজত-ধারা বর্ষণ করিতেছিল; মুক্ত-গবাক্ষপথে তাহারই খানিকটা জ্যোতি আসিয়া পড়িয়াছিল মঞ্জুর চোখে-মুখে। স্বামী মৃগাঙ্ক বসিয়াছিল টেবিলের পাশে ঈজি চেয়ারখানির উপর। ইহার নবদম্পতি; মাসখানেক হইল ইহাদের পরিণয় হইয়াছে। সেও এমনই এক জ্যোৎস্না-হাসিত নিশার।

ধীরে ধীরে মৃগাঙ্ক উঠিয়া আসিয়া মঞ্জুর গোলাপী-অধরে একটা ভালবাসার চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিয়া খাটের উপর তাহার পাশটাতে বসাইল; তারপর কত ভালবাসা, কত সোহাগ করিতে লাগিল। সে কী পুলক! আনন্দে মঞ্জুর সর্বদেহ হইতে উঠিল একটা মধুর শিহরণ।

মৃগাঙ্ক নিত্যই মঞ্জুকে প্রশ্ন করে—সে কেন সব সময় বিমর্ষ থাকে? জোর করিয়া হাসিয়া কেন মুখের কালিমা ঢাকিতে চায়? এমনই আরো কত কি!

সেদিনও সে তাকে প্রশ্নে-প্রশ্নে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহার সহানুভূতিতে সেদিন মঞ্জুর বুকের ভিতরটা কি জানি কেন অসহ-বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। সে অপাঙ্গে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। মৃগাঙ্ক আরো একটু তাহার দিকে সরিয়া গিয়া তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া সকাঙরে কহিল—“মঞ্জু, লক্ষ্মীটী, বল তোমার কী এমন ব্যথা? বল, যদি কোনো উপায় করিতে পারি, যদি তোমায় একটুও শান্তি দিতে পারি। বল, তুমি কেন সব সময় এতো বিমর্ষ থাক?

আজ আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। কহিল—“বল? কিন্তু, তুমি কি তা সহিতে পারবে? থাক, বলে কাজ নেই। জান তো সেই পাথর-রাজ পুতুরের কথা। তাই, আমারও ভয় হয়,—শুনলে বুঝি তুমিও সহিতে পারবে না।”

মৃগাঙ্ক হাসিয়া বলিল—“যতই কেন কঠিন হোক না, আমি সহিবই। আর যদি তার কোনো প্রতীকার করতে পারি, তাও করব।”

মঞ্জু নতমস্তকে কহিল—“আচ্ছা, ধর, যদি এখন বলি—‘আমি তিন মাস সন্তান সম্ভবিতা’

মুহূর্ত্তে মৃগাঙ্কের উজ্জ্বল মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন যদি সেই গৃহে বজ্রপতন হইত তাহা হইলেও সে ততো বিন্মিত হইত না। ইহা যে তাহার কল্পনারও অতীত।

মঞ্জু রক্তিম মুখে ধীর-কণ্ঠে কহিল—“কই, পারলে না সহিতে? চুপ করে এখনো বসে রইলে কেন? আমার শান্তির বন্দোবস্তটাও সঙ্গে সঙ্গেই করে ফেলো।.....”

অনেকক্ষণ নীরবতার পর একটা বুক-কাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মৃগাঙ্ক তাহাকে কহিল—“আমাদের বিয়ে হয়েছে তাও তো এখনো তিন মাস হয় নি।—”

বাধা দিয়া মঞ্জু কহিল—“না, তা এখনো হয় নি। তার আগেই আমি.....।”

মৃগাঙ্ক শিহরিয়া উঠিল।

সমস্ত রাজিটা ছই জনেই ছটফট করিয়া কাটাইল; কাহারো চক্ষে নিদ্রা নাই। এক শয্যায় শয়ন করিয়াও

কেহ কাহারো সঙ্গে আর কোনো বাক্যালাপ করিল না। পরদিন ভোরে যখন উঠিল উভয়েরই চোখ জবাফুলের মতো লাল; মুখে কে যেন কালি মাখাইয়া দিয়াছে।

তাড়াতাড়ি মাথায় কয়েক ঘটি জল ঢালিয়া মুগাক তাহার ড্রেসিং রুমে বাইয়া বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া গেল। একটা ‘সুটকেসে’ তাহার কাপড় চোপড় ভরিয়া দেয়াল হইতে কিছু টাকা বাহির করিয়া সঙ্গে লইল; ‘বয়’কে ডাকিয়া বলিল—“মা, শীগগির একখানা ট্যাক্সি ডেকে আন।

মুগাক অনেকক্ষণ কি ভাবিল; পরে একটুকু কাগজে লিখিল—“আমি চললাম। কোথা যাবো কিছু এখনো ঠিক করিনি। ড্রয়ারের মধ্যে দেয়ালের চাবি রইল। যা কিছু রইল, সবই তোমার। বেধ হয় জীবনে আর ফিরব না। সে সাধও নেই।” কাগজখানি টেবিলের উপর ‘পেপার-ওয়েটে’ চাপা দিয়া রাখিয়া দিল। বাহিরে ‘হর্ণে’র শব্দ হইতেই সে ‘সুটকেসটা’ হাতে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িল। হল ঘরের সমুখ দিয়া বাইবার সময় মঞ্জুকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া গেল।

মঞ্জু ‘বয়’কে বলিল—“বাবুকে একবার বলে আয়, মা ডাকছেন।” সে ছুটিয়া গিয়া বাবুকে মাইজীর আদেশটা শোনাইয়া দিল। মুগাক প্রথম কি ভাবিয়া পরক্ষণেই ড্রাইভারকে বলিল—“স্টার্ট দাও।” ড্রাইভার ‘হর্ণ’ বাজাইয়া বেগে গাড়ী চালাইয়া দিল। ‘বয়’ ফিরিয়া আসিয়া বলিল—“বাবু এলেন না মা,” মঞ্জু একটা বুক ফাটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“হ্যারে, তোর বাবু কোথায় গেলেন রে?”

সে বলিল—“তাতো আমার বলে নি। আমাকে শুধু ট্যাক্সি ডেকে দিতে বললেন।”

মঞ্জু চা তৈয়ারী করিতেছিল, বয়কে বলিল—“তোরা চাটা খেয়ে ফেল; আমার শরীরটা আজ ভাল নেই।” বলিয়াই সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ঘরে আসিয়া প্রথমেই দৃষ্টি পড়িল স্বামীর হস্তের কয়েকছত্র লেখার প্রতি। সে টেবিল হইতে কাগজের টুকরাখানি তুলিয়া লইয়া একবার দুইবার করিয়া বহুবার পাঠ করিল। প্রতিনিয়তই তাহার মনে হইতে লাগিল—কেন তিনি এমন করিয়া চলিয়া গেলেন? তিনি তো ইচ্ছা করিলে তাহাকেই পদাঘাতে দূর করিয়া দিতে পারিতেন! তাহাই যে তাহার শ্রেয়ঃ ছিল!...চখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া গেল। এ পাপিনীর জন্তই তাঁহার এই বেশত্যাগ! তাহার নিজের প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া গেল। সে নীরবে অনেকক্ষণ কাঁদিল। সহসা তাহার মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এ ঘণিত জীবন বহন করিতে তাহার আর সাধ হইল না। আলমারী খুলিয়া মালিশের ওষুধের শিশিটা বাহির করিল; দেখিল, এক ফোঁটা ওষুধও তাতে নাই। তখন তাহার মনে পড়িল—স্বামীর বুক বেদনার সময় একটা বাটিতে ঢালিয়া মালিস করিয়াছিল। আলমারীর নীচ হইতে সেই বাটিটা বাহির করিয়া প্যাড হইতে একখানি কাগজলইয়া লিখিল—“স্বামিন্, দেবতা, আমি তোমার কাছে তো কিছুই গোপন করিনি; অকপটে আমার কলঙ্ককাহিনী বলতে একটুও দ্বিধা করিনি। তোমার সোণার কাঠির যাদুস্পর্শেই আমার স্তম্ভ-হৃদয় জেগে উঠেছে! নইলে গোপন করে হয় তো তোমাকে ঠকাইতে পারতুম। তাতে আমার পাপের মাত্রা বাড়ত বই একটুও কমত না। আমার ধারণা ছিল সব শুনে কলঙ্কিনী বলে আমাকেই ত্যাগ করবে; নিজে যে এমন করে বিবাহী হয়ে চলে যাবে, তা আমি স্বপ্নও ভাবিনি! কেন, আমার জন্ত তুমি এত কষ্ট সহিবে কেন? তোমার তুষ্ট্যের দাহন আমি দেখতে পারব না এ পাপদেহ নিয়ে বেঁচে থাকতে আমার আর সাধ নেই! তাই তোমাকে সব যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে চললাম। জন্মান্তরে যেন তোমার সেবার অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করি, এই আমার অন্তিম

প্রার্থনা। হ্যাঁ, আর একটা কথাও জানিয়ে যাই ;—  
যে পাপের ছাপ বহন করছি, তার জন্ত সম্পূর্ণরূপে  
আমি দোষী নই ; মনে করো না নিজের দোষ ঢাকবার  
চেষ্টা করছি !...আমার শেষ অনুরোধ তুমি আমার  
বিষয়ে করে, স্বামী হয়ে !...

আমার মৃত্যুর পর পুলিশে হস্তান্তর বাড়ীর অন্ত্যস্ত  
লোকের প্রতি অত্যাচার করবে, তাই জানাচ্ছি—  
কারো কোন দোষ নেই, আমি স্ব-ইচ্ছায় আত্মহত্যা  
করছি। ক্ষমা করো স্বামী !”

চিঠি খানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া, ঔষধের  
বাটি ও শিশি লইয়া মঞ্জু বাথরুমে প্রবেশ করিয়া কপাট  
বন্ধ করিয়া দিল।

হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া মৃগাক জাইভারকে ভাড়া  
দিতে গিয়া দেখিল—সে ভুলক্রমে মণিবাগটা সঙ্গে  
আনে নাই। স্ট্রট্‌কেসের চাবিও তাহাতেই রহিয়াছে  
তাহার বেশ স্মরণ হইল চিঠি লিখবার সময় সে ব্যাগটা  
টেবিলের উপর রাখিয়াছিল। কিন্তু এখন উপায় ?  
সে পুনরায় ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিয়া জাইভারকে বাড়ীর  
দিকে গাড়ী চালাইতে হুকুম করিল।

তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করিয়া মৃগাক দেখিল  
ব্যাগটা সেখানেই পড়িয়া আছে। ব্যাগটা তুলিয়া  
লইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল ; সহসা তাহার দৃষ্টি  
পড়িল মঞ্জুর লিখিত চিঠিখানির উপর। সে ইহা  
পাঠ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না ;  
তুলিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি পড়িয়া ফেলিল। পাঠান্তে  
তাহার হাত হইতে মণিবাগ পড়িয়া গেল ; সে ঘর  
হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া ডাকিল—“মঞ্জু, মঞ্জু !”

কোনো উত্তর না পাইয়া সে সব গুলি ঘর খুঁজিল  
কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। তখন সে  
ছুটিয়া বাথরুমে গিয়া দেখে কপাট ভিতর হইতে বন্ধ।  
জোরে জোরে ধারে করাঘাত করিয়া মঞ্জুকে কয়েক

বার ডাকিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। সম্মুখে দণ্ডায়মান  
মঞ্জু বেতস পত্রের দ্বার কাঁপিতেছে, আর নীচে এক  
বাটি গোলা ওষুধ পড়িয়া আছে।

মৃগাক হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া পলকহীন দৃষ্টিতে  
বাটিটার দিকে চাহিয়া আছে, মুখে তাহার একটাও  
ভাষা নাই।

মঞ্জু বেগে বাথরুমে হইতে বাহির হইয়া ড্রেসিং  
রুমে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার লিখিত চিঠিখানি  
তখনো মাটিতে পড়িয়া আছে। সে সেখানি তুলিয়া  
লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

মালিসের ওষুধটা বাটির গায়ে শুখাইয়া  
লাগিয়াছিল। জল দিয়া ওষুটাকে বসিয়া তুলিতেই  
এত বিলম্ব। সে যখন গোলা ওষুধের বাটিটা ধরিয়া  
চুমুক দিতে যাইবে, সেই মুহূর্ত্তে মৃগাক আসিয়া দ্বারে  
আঘাত করিয়াছে, কাজেই সে আর তাহা পান করিয়া  
উঠিতে পারে নাই।

মৃগাক ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া  
মঞ্জুকে টানিয়া নিয়া খাটের উপর পাশে বসাইল।  
তারপর তার রক্তিম-অশ্রুর একটা ভালবাসার চিহ্ন  
মুদ্রিত করিয়া দিয়া কহিল—“আজ থেকে তোমার  
নব-জীবন আরম্ভ হলো। আমি তোমাকে সর্লীভঃ-  
করণে ক্ষমা করলাম মঞ্জু ! তুমি জন্মান্তরে আমাকে  
স্বামী পাবার জন্য শেষ প্রার্থনা জানিয়েছিলে, তাও  
আজ পূর্ণ হলো ! তোমার অন্ততাপেই অগ্নিশক্তি  
হয়ে গেল, আমার মনে আর কোনো গ্লানি নেই মঞ্জু !  
আর তুমি বলেছ—‘পাপের ছাপ’। এ ‘পাপের ছাপ’  
নয়, এ আমার ‘জয়টীকা’। এরি জন্তে আজ তোমাকে  
নতুন করে চিনতে পারলাম !”

জানি না বঙ্গসমাজ এ বিচার গ্রহণ করবে কি  
না !

# আমার বন্দুরে

( বিরহ সঙ্গীত সংগ্রহ )

শ্রীহেম সেন

চিন্তা জ্বালাইলি রে বন্দু, আমার বন্দু বন্দুরে ।

চিন্তা জ্বালাইলি বন্দু ননদিনীর কথায় রে ॥

বন্দুরে—

যখন করিলাম প্রেম, চক্ষে চক্ষে চাইয়ারে বন্দু চক্ষে চক্ষে চাইয়া,  
পোলাপানের মাথা খাইতাম তারা দিল কইয়ারে ।

বন্দুরে—

কোন বা জ্বাশে গ্যালারে বন্দু, কত দিনের কতারে, বন্দু কত দিনের কতা,  
অবাগিনী নারীর দুকে কইলজায় পাওনা ব্যাখারে ।

বন্দুরে—

আমার বুকের মাইজে তুষের দিয়া আইল্যারে বন্দু তুষের দিয়া আইল্যা ;  
নারীর বিচ্ছাদের আশুণ দিলা তুমি জ্বাইল্যারে ।

বন্দুরে—

বিদেশিনীর রূপে মজ্বা আমি তবে জাইল্যারে বন্দু আমি তবে জাইল্যা,  
তোমারে করাইতাম বিয়া ফুলবতী কল্যারে ॥ \*

\* ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণার বেলাই বিলে ঘাস কাটিবার সময় কৃষকগণ এই গানটা প্রায়ই গাহিয়া থাকে ।

বন্দু = বন্ধু । পোলাপান = ছেলপিলে । কতা = কথা । জ্বাশে = দেশে । অবাগিনী = অভাগিনী ।  
দুকে = দুঃখে । মাইজে = মধ্যে । আইল্যা = হাঁড়ি বা পাতিল । জাইল্যা = জানিয়া । কইলজায় =  
কলিজায়, প্রাণে ।



## শ্রীগীর্বাণ

শনিবারের চিঠি (চৈত্র, ১৩৩৩)। অন্ধ মুনির অভিসম্পাত রাজা দশরথের উপর যে রূপ বর-স্বরূপ হইয়াছিল লেখকের “হুঃখের স্বরূপ” তেমনই উদীয়মান লেখকগণের মস্তকে আশীর্বাদস্বরূপ বর্ণিত হউক। কিন্তু এরূপ অভিসম্পাত দেওয়াটা সিদ্ধ-মুনির আত্মা হয়তো সার দেখে নাই; সাহিত্যের মুকুট—এক হিসাবে জনক, প্রতিপালক স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, হেমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন ও অন্যান্য মহারথিগণের আত্মা আজ স্বর্গ হইতেও তেমন নিবেদন করিতেছেন যে, তোমরা ওদের অভিলাষ দিওনা—সে অধিকার তোমাদের নাই। “যেটুকু সংঘর্ষ ঘটিবেই; তাহাতে কোন পক্ষের অপরাধ নাই। ব্যক্তি যেখানে সত্যই সমাজদ্রোহী, সেখানে তাহার সমাজ ত্যাগ করাই উচিত।” যদি অপরাধ নাই থাকে, তবে সমাজদ্রোহীকে “সমাজ ত্যাগ” করিতে বলার অধিকারও নাই। সংশোধনের সুযোগ দেওয়াই সমীচীন।

“হুঃখ চাই” কবিতাটা হইতে দুই লাইন মাত্র উদ্ধৃত করিলাম নিরপেক্ষ স্ত্রী পাঠকবৃন্দ শনিবারের চিঠির ভাষা ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিবেন :—

“আছে বিজ্ঞান, অর্থনীতিও আমাদেরই গায়ে জয়, শিশু—উদর দুয়ের মিমি সমান তাহারা কয়।” ইহাই কি সমালোচকের ভাষা এবং সাহিত্যের এক পৃষ্ঠা (!) ? এরূপ সমালোচনা বা এবিধ সমালোচনা-পূর্ণ কোন মাসিকের আবশ্যিকতা সাহিত্যে থাকা

সঙ্গত কিনা তাহার বিচার প্রবাসী সম্পাদকের হাতেই রহিল।

সমালোচনা সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ। তাহাতে একপক্ষে যেমন লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধন করে, পক্ষান্তরে দোষত্রুটি সংশোধিত হয়। কিন্তু এ যেন তরজার লড়াই। সাহিত্যে, মানুষের আত্মা যখন সমধিক উন্নত হয়, তখন সে পুরুষ এবং যখন অল্প আত্মা সেই পুরুষের শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়, তখন সেই আত্মা প্রকৃতিস্থানীয়। সাহিত্যচর্চায় যদি প্রাণের ভাবের আদানপ্রদান দ্বারা আনন্দবর্দ্ধন হওয়াটাই স্বাভাবিক হয়, তবে এরূপ সাহিত্য সমালোচনা দ্বারা সমালোচকের কল্যাণ কতটা সাধিত হইবে ? অসংযমী লেখক সর্বথা ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু অসংযমী হইয়া সমালোচকের আসনে বসিতে যাওয়াটাও ধুষ্টতা মাত্র। মত্তপান গহিত কার্য। তা’ বলিয়া আইন করিয়া যেমন মত্তপান সমাজে চালানো অসুচিত, তেমন সাহিত্যে অশ্লীলতা ঢুকিতে দেওয়াও ঠিক নহে। আদর্শ সর্বদাই উৎকর্ষের চরম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দেখা যাউক তরুণদের এ সাহিত্যের মূলভিত্তি কোথায় ? আমি বলি, তাঁহারা মহাজনত্ব পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। স্বর্গীয় সাহিত্য মহারথীরা তাহাদের ভাষা ও ভাবকে সামান্য গভীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন নাই বলিয়াই তাহাদের পুত্রেরা আজ মুকুটবানী ফলাইতেছেন এবং তাহাদের পৌত্র তরুণরা পৈতৃক সম্পত্তি



বাড়াইতে সচেষ্ট—যাহা স্বাভাবিক। সাহিত্য-চর্চ্চাদ্বারা প্রাণের ভাবের আদানপ্রদান হয় এবং সাহিত্য দেশকালের ব্যবধান মুছাইয়া সৃষ্টির অপর পার হইতে আশা, আনন্দ, উৎসাহ ও প্রেমের নির্বরিণ বহাইয়া দেয়।

একজন ইংরেজ লেখক বলেন,—In literature three years is boom, thirty years fame, three hundred years immortality and there thousand is Homer—সম্পাদক মহাশয় threeতে কি thirtyতে ?

“প্রসঙ্গ কথা” মুকবির যোগ্য উপদেশই হইয়াছে। বুদ্ধেরা যদি তরুণদের প্রতি এরূপ সহৃদয়শীল মার্জিত ভাষায় দেন, তবে তরুণ যে ভাবে গড়িয়া উঠিবে, তাহাতে বৃদ্ধদের গৌরব বৃদ্ধি বই হ্রাস হইবে না। কথাবাত ও “কাগমলা” বা অযথা গালাগালিতে বিদ্রোহী, বিদ্রোহীই থাকিয়া যাইবে। সংযম-শিক্ষা সাপেক্ষ। Guy de maupassant’র বই পড়িয়া যে বিশ্বসাহিত্যের (!) ধারণা আনিয়াছে, তাহা বদলাইবে। আর কেহ নথ চিত্রের “পারে মোজা” পরাইবে না। যুবকেরা “বুদ্ধন্ত বচনং” গ্রহণ করিলে ভোজননের বেলায় অপ্রবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু তাদের জ্ঞান উচিত যে এই বুদ্ধেরাই এক সময় যুবক ছিলেন, তাঁহারা হিমালয়ের চূড়া দাঁতে কামড়াইয়া ভাঙিতে গিয়া তাহাদের দাঁত ভাঙিয়াছে। তাই তাঁহারা আজ উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। স্মৃতির তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করিতে আপত্তি কি আছে ?

উত্তরা (চৈত্র, ১৩৩৩)। “ধ্বংস” গল্পটা মন্দ হয় নাই। “নারী প্রতিভা” হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—“পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কেবল মহারথীদের বীর্যবলেই নয়, অখ্যাতনামা ছোট, বড়, মাঝারিদের প্রাণবলেও চলিতেছে। অনেক স্নানতর জ্যোতিষের আলোও মানুষজীবনে সততই সাহায্য করে ও পথ দেখাইয়া থাকে। মেয়েরা যদি

চন্দ্র, সূর্য্য নাই হন, আপনাপন শক্তির প্রদীপ জ্বালাইয়া আকাশের তারা হইয়াই না হয় তাহারা থাকিবেন।” এ যেন একটা গভীর বেদনা—একটা অভিমানের সুর। “মানুষজীবনে সততই সাহায্য করে ও পথ দেখাইয়া থাকে” বই কি ? মায়ের মহাশক্তির “প্রদীপ” জ্বলেই—যদি মায়েরা নিজকে নিজে চিনিতেই পারেন, তবে তো পুরুষের সৌভাগ্য। ইহাতে পরশ্রীকাতরতাও আসিতে পারে না। জগতে কেহ কাহাকেও খাটো করিয়া রাখিতে পারে না, যদি সে নিজকে নিজে চিনিতে পারে। “কিন্তু ঘরকন্নার কাজ যে ভাবে বাড়াইয়া তুলিয়া ব্যক্তিগত অবিচ্ছিন্ন ভাবে কেবল তাহাদের উপরেই ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। উহাতেও মেয়েদের অধিকাংশেরই আর কিছু করিবার ভাবিবার সময় থাকে না।” ঘরকন্নার ব্যবস্থা যদি অল্প কোন “শ্রমলাঘব যাত্রাদির” সাহায্যে সমাধা হইতে পারে, সে পথও তো মায়েরাই নির্দেশ করিতে পারেন। সর্ব্বত্রই তাহা সম্ভব কি ?

“কল্যাণের পথ” বইয়ের সমালোচনা করিতে যাইয়া “বারো আনা পরশা খরচ করে কেন যে এ বই পড়বে তার কোন হেতু খুঁজে পাওয়া ভার” মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। বিবেকানন্দই যখন ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী, অরবিন্দ, ভাস্করনাথী ওরা না লিখিয়া তো কেবল ditto দিয়া গেলেই পারিতেন। এত মাসিক দেশে থাকিতে প্রতি সংখ্যা ১০ চারি আনা দিয়া “উত্তরা” পড়িবে কেন ? উত্তরে, সমালোচক কি বলেন ?

কটকটান (বৈশাখ, ১৩৩৫)। “কাক জ্যোৎস্না” একটা ছোট গল্প। একটু উদ্ধৃত করা গেল,—“রাঁধতে রাঁধতে এঁটো হাতেই ছবি ছুটে আসে, বলে—শিগগির একটা দাঁও, চটপট, ঘোমটাটা খসে’ গেল—

সহসা অমলের ধ্যান ভেঙ্গে যায়। ছবির ক্লান্ত মুখখানি ভারি সুন্দর লাগে। বলে, তুমি ভারি ছুটু হয়েছ ছবি !

ছবি বলে—দয়া করে' তুমিও একটু ছুঁ হওনা, লক্ষ্য ছেলে। শিগ্গির,—পিসিমা একুনি দেখে ফেলবেন—বলে' দুটা স্পর্শাতুর পেলব ঠোট অমলের মুখের কাছে নিয়ে আসে।" বো-বাদের "পেলব ঠোট" দুটা রান্না করিতে করিতে "শিগ্গির" "চটপট" "স্পর্শাতুর" হইয়া উঠে নাকি! তার আবার দোড়ে গিয়া চাওয়া। ছিঃ, মারেরা পড়তে পড়তে মাথা হেট করিবেন না কি? কি—বিড়ম্বনা!

প্রেমেন্দ্র বাবুর "সর্বগ্রাসী ছরস্ত" প্রেমের চিত্র দেখিলে প্রায় সকলেই শিহরিয়া উঠিবেন। তাঁহার "নীড়ে" এবার তীর শয্যা রচনা করিয়াছেন, না জানি কত ভীষ্মদেবের শয়ন হয়। "আগো দিতে এসে কমল খপ্ করে রবির হাতটা ধরে ফেললে।"

অকস্মাৎ ব্যগ্রবাহতে কমলকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সে বলে, তোমার কোথাও যে যেতে দিতে আমি

পারব না কমল!" এবার সেখানে সেখানে কোলাকুলি, ধরাধরি। যেমন কমলের খপ্ করে রবির হাত ধরা তেমনি অকস্মাৎ ব্যগ্রবাহতে বুকের মধ্যে কমলকে টেনে ধরা। দেবরাজ ইঙ্গ তখন নিশ্চয়ই নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিলেন, নতুবা তখন একটা বজ্র ছুড়িয়া মারিতেন। লেখকেরা যদি বিধবা মায়াদের একরূপ উলঙ্গবাহার কাপড় পরাইতে থাকেন তবে বিশৃঙ্খলা ঘটবে।

"তার মানে তুমি যা খুশী করো, আমার আপত্তি নেই" যাক্, বাঁচা গেল। অক্ষুণ্ণ মারিয়া পাগ্লা হাতিটাকে বশে আনা গিয়াছে (!)।

"কাকছোয়াংমা" এবং "নীড়" গল্পে লেখার যে দৌন্দর্য্য আছে তাহা Good printing sets off an ordinary drawing, but bad printing spoils the best,—হইয়াছে।

## সৈনিকের চিঠি

মাননী আমার! তোমার জন্মে আমার ভারী গর্ব্ব হচ্ছে, আমি গরব করছি! আমার ইচ্ছা ছিল কি জান? আমার ইচ্ছা ছিল যুদ্ধ শেষে তোমার কাছে ফিরে গিয়ে আমার সমস্ত ইতিহাস—কোথায় কোন্ দেশ জয় করেছি, কি করে হত্যা করেছি, কতগুলি নিষ্ঠুর হত্যা করেছি, কি করে শত্রুদের ফাঁকি দিয়েছি, কি করে বন্দী হওয়ার হাত হতে বেঁচে গেছি, কতদিন তোমায় পাশে অল্পভব করেছি—সব বল্ব এবং তোমার হৃদয় আরো বেশী করে অধিকার করব আর তোমাকে বিশ্বয়ে নির্বাক করে দেব, স্তব্ব করে দেব। তার আগে যেন তুমি এই সম্বন্ধে কিছুই জানতে না পার।

ভালোবাসুলে আর সকলে বা করে, হাহাকারে ফেলে, বিরহে ফেলে ভালোবাসাটিকে ঘনীভূত করে আমিও তেমন করতে চেয়েছিলুম। আমি তারপর যখন ফিরে আসতুম তখন কত আগ্রহে তুমি আমার টেনে নিতে?

সত্যি আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, তুমি তোমার এই ফুল তুল নিয়ে যুদ্ধের মাঝে করুণার অসি নিয়ে আত্ম বিসর্জনে নাবৃত্ত পার!

মগি আমার!! এতদিন তোমাকে আমি খেলার পুতুলই মনে করেছি, সৈনিকের সঙ্গে তালে তালে চলার অনধিকারী ভেবেছি, অক্ষম ভেবেছি, কিন্তু

আজ আমার সব ভুল ভেঙেছে। আমি দেখছি তুমি তা নও বা আমি তোমাকে ভাবতুম। তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলুম। তুমি সত্যিই সৈনিকের স্ত্রী হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

প্রিয়া আমার !!! তোমার যখন নাম হিসাবে ভাবতে যাই তখনই আমার মনে পড়ে যায় শুধু আনন্দের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত একটি মুখ। তখন তোমাকে এ পৃথিবীর বগে ভাবতেই পারি না। করুণার প্রতিমূর্তি না হলে কি আর অমন বেণে দাঁড়াতে পার ?

আমি যখনই চোক বন্ধ করি তখনই দেখতে পাই তোমার মাথার উপরের সাদা ওড়নাটা বাতাসে উড়ছে। এতে তোমাকে আমার হৃদ্রাপ্য বলে মনে হয়। তুমি যেন এ পৃথিবীর মানুষ নও। তুমি স্বর্গের দেবী।

রাণী আমার ! কত সৈনিক যুদ্ধে আহত হয়ে তোমার সেবার অধীনে এসেছে কিন্তু পরপারের ডাকে তাদের চলে যেতে হয়েছে। তুমি কাছে থেকে নিজ হাতে সেবা করে শেষে নিরুপায় হয়ে কত আশ্বাস দিয়ে হয়ত বিদায় করেছ তারাও দেবীর আশ্বাস মনে করে হাসতে হাসতে ঐ দেশের উদ্দেশ্যে চলে গেছে।

এ পারের শেষ তরুণী তুমিই যার কাছ থেকে তারা শেষ মেহ, মমতা, সেবা, ভালবাসা এবং সাহসনা পেয়ে গেলো, শেষ তরুণী তুমিই যাকে তারা শেষ দেখা দেখে গেলো।

আজ আমারও যদি তোমার হাতে মরবার সে সুযোগ হ'ত ?

প্রথম যখন যুদ্ধ বাধে তখন তুমি কত সৈনিককে রাতার পাশে দাঁড়িয়ে টুপী উড়িয়ে উৎসাহ দিয়েছ—যুদ্ধে বীরের মতো মরবার জন্তে। আবার যখন তাদের জীবনের আঁধার ঘনিয়ে এলো, তুমিই সাহসনা দিয়ে বিদায় করেছ।

তোমাকে তোমার এত সব কাজের জন্তে মানুষ মনে করতে পারি না। মানুষের এত শক্তি থাকা

কি সম্ভব, এত গুণ থাকা কি সম্ভব ? তুমি কত উচ্চ তুমি কত মহান !

আচ্ছা মনি—আমরা যে এতদূরে আছি হয়ত থাকবও, আমাদের কি এতে কষ্ট হয় ? আমি যখন খুব তলিয়ে দেখি তখন মনে হয় এতটুকু কষ্ট নেই। এতটুকু কষ্টে আমাদের কি ক্ষতি হতে পারে যদি আমাদের দৃষ্টি থাকে নিজের দিকে। মন যদি আগুনের শিখার মত আকাশের দিকে জলে জলে উঠে ! আমরা দু-জনেই জীবনকে কত ভয় করতুম কিন্তু আজ জ্বলের জন্তে সর্গস্বাস্থ হয়ে ভয় হারিয়েছি। এ সাহসের জগৎ। আমরা আজ তফাৎ আছি বলে, আমার মনে হচ্ছে আমাদের সাহস বেড়েই চলেছে। আমিও এখন তাই-ই চাই। তা না হলে আমি যে কতবড় একটা অস্ত্রায় করব তুমিও করবে তা না বললেও হয়ত বেশ বুঝতে পারছ।

কিন্তু লক্ষী এত চেষ্টা করেও কোনো রকমেই নিজেকে সরাতে পারিনি। তোমাকে যখন মনের বনে জাগিয়ে তুলি, তখনই এমন সব ভবিষ্য জীবনের কথা মনে আসে, যা কখনও আমাদের জীবনে ঘটবে না। একটা কারণ—বল না, দ্বিতীয়টি হচ্ছে কখন কোন বোমার ঘায়ে উড়ে যাব কে জানে ? কত লোককেই তো দেখেছি সকালে জেগে উঠল আর রাতে চিরদিনের মত স্থির হয়ে শুয়ে পড়ল।

অনেকে এই সময় যা দরকার এর চেয়ে বেশী বিপদের মুখে নিশ্চয়ই এগিয়ে যেতনা কিন্তু আমি তো তা পারব না ? যে সব বিপদ লোকে এড়িয়ে চলতে চায় তাইতে সাহস করে যাবার জন্তেই যে আমি এখানে এসেছি ? ভাল সৈনিকের একমাত্র প্রমাণ যে সে আশার অতিরিক্ত করে।

সন্ধ্যা—৭টা।

আজ আমাদের ল্যাভার্নের বীরত্বের পুরস্কার দেওয়া হল। তাকে চিনেছ বোধ হয়—যাকে আমি

খুব ভালবাসতুম যে আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত অমুচর ছিল। সে আজ অন্ধ—সে আজ বঁধির—সে আজ অক্ষম কিন্তু তবু তার বীরত্ব অসীম—অজ্ঞেয়। সে যে আর বাঁচবে সে আশা নেই বললেও চলে। তার মৃত্যু ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে। সে মরে গেলেও তার বীরত্বের পুরস্কার পেত, কিন্তু জেনারেল তাকে মৃত্যুর আগেই সে সম্মান তাকে দিলেন। তার জখম খুব বেশী না হলেও ভয়ানক। তাকে বাঁচানো যাবে না কিছুতেই তবু তার সেবা শুশ্রূষার এতটুকু ক্রটি হচ্ছে না। ইংরেজ কৃতজ্ঞ হতে জানে, তার বীরের সম্মান করতে জানে। তা না হলে মরণের যাত্রীক যে, তার জন্তে চেষ্টা করবার কি আবশ্যকতা ছিল?

আজ আমাদের সঙ্গলের প্রাণেই কি একটা ব্যথা গুমুরিয়ে উঠছে। কত কষ্ট যে হচ্ছে তা বলে বুঝতে পারব না। আমাদের বীর ভাইটি আজ আমাদের সম্পর্ক ছেড়ে চলল। হয়ত চিরতরেই চলে যাবে। আমরা যতটুকু গর্ভিত হিলাম তাকে পেয়ে আজ তার চেয়েও ঢের বেশী অস্থখী হয়েছি তার বিদায়ের।

ছপুর বেলা যখন আমার কাঁধের উপর ভর দিয়ে সে দাঁড়াল তখন উপস্থিত সমস্ত সৈনিকদের চোখে অশ্রুর বাণ ডেকেছিল। কেউ না কেঁদে থাকতে পারিনি।

তুমি বুঝতে পারবে না, বুঝাবার ভাষাও আমাদের নেই তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারবে যে, আমাদের কঠোর সৈনিকদের কান্না কত মর্মান্তিক।

আমাদের সৈন্তাধ্যক্ষ বলতে লাগলেন,—সৈন্তাগণ, তোমরা আজ যে রক্ত হারাতে যাচ্ছ, তার পূরণ হওয়া যে কত অনিশ্চিত তা তোমরা সকলেই বেশ জান এবং প্রত্যেকেই বুঝতে পারছ আমরা আজ কি হারাতে যাচ্ছি। ল্যাভার্ন তার জীবন দিয়ে তার দেশ রক্ষা করতে চেয়েছিল ভগবান জানেন

তার ইচ্ছা পূর্ণ হবে কি না শত্রুর হাত থেকে দেশ রক্ষা পাবে কি না? যে অচিস্তাণীয় সাহসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করেছে সে তা বেশ বিরল। তার সাহসিকতার প্রমাণ যারা তার সঙ্গী ছিলো তারা বেশ জানে! প্রথম থেকেই সে তার অসীম সাহসিকতার জন্তে বিখ্যাত ছিল। মাঝে কি কারণে জানিনা সে কেমন একটু বিষম হয়ে গিয়েছিল, তবু কোনো দিন কোনো বিশ্বাস ঘাতকতা করেনি।

যে এমন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পেরেছে প্রাণের এতটুকু মায়া না করে, যে বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্তে, দেশের জন্তে, রাজ্যের জন্তে হাসতে হাসতে বুকের রক্ত দিয়েছে, অন্ধ বধির হয়েছে,—সে সত্যিই মহান, সে সত্যিই বীরপুঙ্খ,—নমস্ত। তাকে ‘ভিক্টোরিয়া ক্রস’ সম্মানিত করলেও তার উপযুক্ত সম্মান হয় বলে মনে হয় না—কিন্তু আমাদের তাই দিয়েই সম্মানিত করতে হবে। কারণ, আমাদের সৈনিক বিভাগে এর উপর আর কোনো পুরস্কার বা সম্মান নেই। নিয়মাহুসারে আমরা তাই দিতে বাধ্য।...

তারপর একটু থেমে, ক্রমালে চোখ মুছে তার দিকে ফিরে বলতে লাগলেন—ভাই, তুমি যা করেছ, তার তুলনায় এ কিছুই নয়—তবু তোমাকে আমরা এই ‘ক্রস’ দিতেই বাধ্য হচ্ছি। তুমি আমাদের নিয়ম এবং আমাদের শক্তি এবং ক্ষমতা কতটুকু বেশ জান। ভগবান যিনি সর্বশক্তিমান, ক্ষমতাবান তিনিই তোমার উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন আমরা তার পায়েই তোমাকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিত হচ্ছি। আমার বিশ্বাস যে, দেশের জন্তে, দেশের জন্তে, সত্যের জন্তে এ ভাবে মৃত্যুর ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, হয়ত বা যাকে চিরকাল একটা ছুঃখের মাঝে, একটা অভাবের মাঝে থাকতে হবে, তাকে তিনি শান্তি দিবেনই—তার সিংহাসনের পাশে স্থান দিবেনই।

এই বলে তিনি চুপ করলেন।

ল্যাভার্ণ বীরে কম্পিত কর্তে বলল—বিদায় ! কিছুতেই আমি শক্তি পাচ্ছি না। না জানি সৈনিক ভাইরা আমার বিদায়!!! এই বলে সে ল্যাভার্ণের অবস্থাই হয় আমার। যাক্ যা অনুষ্ঠে সৈনিকদের দেখবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করল কিন্তু আছে, তা-ই হবে।

তার আশা পূরল না।

আমার আশীর্বাদ, ভালোবাসা এবং চুপন জেনো।

হুগো—আমার উন্নতির পথ বুঝি বন্ধ হয়ে  
এলো।

ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। Adieu.

আজ আর না। আমার মনটা বড্ড দমে গেছে।

ইতি

—শান্তি চৌধুরী

ক্রমশঃ—

স্থানাভাবে সম্পাদকের রায় দেওয়া গেল না

## সমাজের জীবন

( দ্বিতীয় খণ্ড )

### শ্রীরবীন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী

মানুষের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা যে প্রাচীনতম যুগের তথ্যাহুসন্ধানে অন্ধকারের ক্রোড়ে শেষ শয্যা পাতিয়াছে, সেই যুগেই ভারতীয় আর্ধ্যগণের ঐকান্তিক চেষ্টা ও আশ্রয় বন্ধ সাফল্যমণ্ডিতকরতঃ সৌভাগ্যলক্ষ্মী এক দিন উপধাটিকার মত তাঁহাদের প্রেম ভিক্ষা করিয়া-  
ছিলেন। ভুবনবিজয়ী আর্ধ্যনৃপতিবৃন্দ সেই প্রাচীন যুগেই বলদপিতহস্তে ঘনঘন কোদণ্ডটঙ্কারে বিশ্ববাসীকে চমকিত চতুরঙ্গদলের বীরপদভরে ধরণী কম্পিত, অশ্বকুরোধিত ধূলিগটলে গগনমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিয়া পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন যুগেই ভারতীয় সম্রাট প্রিয়ব্রতের বীরেন্দ্রাগ্রগণ্য সপ্তপুত্র সপ্তদীপা সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া বহু রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। “পুরাণানুসারে ঐ সপ্তদীপের নাম অশ্ব, কুশ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর ও প্লক্ষ। তাহারা পর্যায়ক্রমে এশিয়া, ভারতসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলেশিয়া, ইয়ুরোপ, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা।”—Hindu Superiority,

Page 160.—। ভারতীয় চন্দ্রবংশোদ্ভব নৃপ-তনয় রাজচক্রবর্তী যযাতি অসামান্য শৌর্য্যবলে সপ্তদীপা পৃথিবী জয় করিয়া পঞ্চভাগে বিভক্ত করেন। যথাঃ—

সপ্তদীপাং যযাতিস্ত জিত্বা পৃথ্বীং সঙ্গমরাম্।

বিভজ্য পঞ্চধা রাজ্যং পুত্রানাং নাহুযন্তদা ॥

ব্রহ্মপুরাণ, ১২ অধ্যায়, ১৮ শ্লোক।

বীরেন্দ্রপ্রবর কার্তব্যীর্ষ্যাজ্ঞনের ভীম পরাক্রমে সপ্তদীপা সঙ্গমরা পৃথিবী বিজিত হইয়াছিলেন। তিনি পৃথিবী জয় করিয়া নানাহানে উপনিবেশের পত্তন করেন। যথাঃ—“যোহসৌ বাহুসহস্রেন সপ্তদীপেন্থরোহভবৎ।

জিগায় পৃথিবীমেকো রথেনাদিত্যবর্জসা ॥”

ব্রহ্মপুরাণ, ১৩ অধ্যায়, ১৬০ শ্লোক।

তিনি এক রথে সমগ্র পৃথিবী জয় করেন। ব্রহ্মপুরাণের উল্লিখিত অধ্যায়ের ১৬৬ শ্লোক বিজয়ের আরো সাক্ষ্য দিবে। যথাঃ—

“তেনেনয়ং পৃথিবী সর্বা সপ্তদীপা সপত্তনা।

সসমুদ্র সনগরা উগ্ধেন বিধিনা জিতা ॥”

ভারতীয় স্বাধীনতা-বীরের স্মৃতি-সম্রাট  
মাক্কাতার সাম্রাজ্য সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ছিল। বর্তমান  
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মত তাঁহার সাম্রাজ্যে ও স্বাধীনতা  
অন্তর্গত করিতেন না। যথা:—

“যাবৎ স্বাধীন উদ্দেশ্য যাবৎ প্রতিষ্ঠিত।

সর্বত্র তৎ যৌবনাশ্রয় মাক্কাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥”

বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশে ২য় অধ্যায়।

যুগে যুগে ভারতীয় সার্বভৌম রাজচক্রবর্তীগণের  
পৃথিবী বিজয়ের ইতিহাস আজ নাই; কিন্তু পুণ্যাদি  
পাঠে তাহার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র।  
ভারতীয় নৃপতিগণের বিশ্ববিজয় খৃষ্ট পূর্ব কত সহস্র  
বৎসর পূর্বে যে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার সঠিক  
কাল নির্ণয় এখন দুঃসাধ্য। তবে এ’কথা অতি সত্য  
যে সমগ্র পৃথিবী যখন অজ্ঞানতার তিমিরান্বিত  
আচ্ছন্ন ছিল; আধুনিক ইউরোপের পূর্বপুরুষগণ  
যখন মৃত্তিকাগল্লরে অথবা বৃক্ষকোটরে বাস করিত,  
দিগন্তরবেশে ঘূড়িয়া বেড়াইত এবং পশুপক্ষীর অপক  
মাংসে জীবনানলে আহুতি প্রদান করিত;—এক  
কথায়, সভ্যতার অঙ্কুরগণও যখন মিশরে, গ্রীসে,  
রোমে প্রবেশ করে নাই—তখনই এই ভারতবর্ষ  
সুখ-স্বাধীনতা-বিলাস-বিলোলা ইন্দ্রাণীর মত সমগ্র  
জগতের সমুখে সগর্বে মহিমায় দীপ্তিতে ‘মহা-ভারত রূপে  
প্রতিভাত হইয়াছিল এবং এই মহা-ভারতের পদতলে  
বসিয়াই সমগ্র দর্শন বিজ্ঞান ও সভ্যতার জটিল প্রশ্ন  
সমূহের সমাধান প্রাপ্ত হইয়া সভ্য সমাজে প্রবেশাধিকার  
লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। দ্বিখন্ডীয় ভারতীয়  
আর্য্যনৃপতিবৃন্দ চেজিজ বা তৈমুরের ত্যায় ধনৈর্ধন্য  
লুণ্ঠনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়া অথবা বিকটবাদান  
শাস্ত্রের মত শোণিত-তৃষ্ণায় লোলুপ রসনা নিয়া  
পৈশাচিক আনন্দের তীব্র তাড়নায় বিশ্ববিজয়ে ত্রুটি  
হন নাই;—বঙ্গাবাতের মত বিজিত দেশের উপর  
দিয়া তাঁহার রক্তাক্ত শকট পরিচালিত করেন নাই।  
তাঁহার সভ্যতার উজ্জ্বল বৃত্তিকাহ্নে বিজিত দেশ  
সমূহের চক্ষু এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া

উঠিয়াছিলেন। দ্বিখন্ডীয় ব্যাপ্ত সৈনিকগণ ঐ সমস্ত  
দেশে যে সভ্যতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা  
ফলপুষ্প প্রসব করিয়াছিল বিজিত দেশে ভারতীয়  
শাসন এবং উপনিবেশকে বৈজ্ঞানিক করিয়া।

পৌরাণিক যুগে ভারতবর্ষের পশ্চিমসীমা বর্তমান  
North-Western Frontier পর্যন্ত শুধু সীমাবদ্ধ  
ছিলনা;—পরন্তু যবন, পহ্লব, গাক্কার, বাহ্লীক, পহ্লব,  
কেকয় প্রভৃতি দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তথা উক্ত  
বান্দুপুরাণে:—

বাহ্লীক বাটখানাশ্চ আভীরাঃ কালতোয়কাঃ।

অপরীতাশ্চ শূদ্রাশ্চ পহ্লবশ্চ বৃত্তিকাঃ ॥ ১১৫ ॥

গাক্কার যবনশ্চৈব সিন্ধু সৌবীর ভূতিকাঃ।

শকা ইদাঃ কুলিন্দাশ্চ পরিতা হারপুরিকাঃ ॥ ১১৬ ॥

রমটা কঙ্কটকাঃ কেকয়া দশমালিকাঃ।

কত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈজ্ঞানিকুলানিচ ॥ ১১৭ ॥

কাথোজা দরদাশ্চৈব বর্কীরাঃ স্রিয়লৌহিকাঃ।

আজোয়াশ্চ ভূতিকাঃ প্রতাপাশ্চ কসেরিকাঃ ॥ ১১৮ ॥

লম্পকা স্তনপাশ্চৈব পীড়িকা জুহুড়ৈ সহ।

অপমাশ্চালিমজাশ্চ ক্রিয়াতানাক জাতয়ঃ ॥

তোমরা হংসমার্গাশ্চ কাশ্মীরাস্তনাস্তথা।

চুলিকাচাহকাশ্চৈব পূর্বদর্কীণ্ডিকা ॥

এতৎ দেশাঃ উত্তীর্ণাশ্চ.....

পঞ্চদ্বারিংশ অধ্যায়—

উপরোক্ত দেশসমূহ ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে  
অবস্থিত ছিল; পুরাণবর্ণিত বাহ্লীকদেশ বর্তমান  
বলখ (Bulkh) প্রদেশ। গাক্কারের বর্তমান নাম  
নাম কান্দাহার। অনেকে রামায়ণের বর্ণনা দৃষ্টে  
অসম্ভব করেন কেকেয়দেশ কেকাশাস পর্বতের  
পাদমূলস্থ কোন জনপদ ছিল। রাজা দশরথ তৎদেশীয়  
রাজকুমারী কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করেন। কুরুবংশীয়  
রাজা শান্তনু পিতা বাহ্লীক দেশের বাজকন্তাকে  
বিবাহ করেন। পহ্লব দেশ ও মদ্রদেশ বর্তমান কাবুল  
রাজ্যের উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল। হিন্দুগণ গ্রীক-  
গণকে যবন আখ্যায় অভিহিত করিতেন। চন্দ্রবংশীয়  
রাজা যযাতি জরাভারতগ্রহণে অস্বীকৃত পুত্র তুর্কসমূহকে

যবনগণের অধিনায়ক হইবেন বলিয়া অভিষাপ প্রদান করেন এবং নির্ধারিত করেন। যথা:—

“তুর্কসোর্ববনা জাতাঃ”—মহাভারত।

মহাভারতে কথিত আছে রাজা বিখ্যাত ঋষি বশিষ্ঠের দেহ বলপূর্বক অপহরণ করিতে গেলে তাঁহার শরীর হইতে শক, যবন, পল্লব প্রভৃতি পরাক্রমশালী স্নেহ জাতির উদ্ভব হয় এবং তাহারা বিখ্যাতকে পরাজিত করে। এই সমস্ত জাতির সহিত ভারতীয় আর্ধ্যগণের বিবাহাদি পর্যন্ত হইত। ঋতরাষ্ট্র-গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারী পাণিগ্রহণ করেন। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্র প্রপৌত্র গান্ধার নামক এক রাজা গান্ধার জনপদ স্থাপন করেন। ভারতবর্ষের পূর্বদিকে কিরাত এবং পশ্চিমে যবনগণের বাস। উহার মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ভেদে অবস্থান। তথা উক্ত ব্রহ্মপুরাণে—

“পূর্বে কিরাতাঃ যস্তান পশ্চিমে যবনাস্থবা।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চাস্তে স্থিতা দ্বিভাঃ ॥

২৭ অঃ, ১৭ শ্লোক।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গ্রীকগণকে যবন বলা হইত। ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী Ionia দ্বীপপুঞ্জ গ্রীক অধুষিত দেশ; Ioniaকে যুনানী বলা হইত। যুনানী অর্থাৎ যবন অধুষিত দেশ ভারতবর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত হইলে ভারতের পশ্চিমসীমা Asia Minor পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া ধরা যায়। মধ্যযুগে ইউরোপীয় ভৌগোলিকগণও তাহারই সমর্থন করেন। যথা:—

“European Geographers in mediaeval times classified East Africa as one of the Indies and Marco Polo located Abyssinia in “middle India.”—Ibid, Page 92. ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এই বিশাল ভূখণ্ড প্রাচীন যুগে ভারতীয় শিক্ষাসভ্যতার দীক্ষিত এবং ভারতীয় অনুশাসনে শাসিত হইত সন্দেহ নাই। পূর্বকালে আফগানিস্থান এবং পারস্ত প্রভৃতি দেশেও বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচলিত ছিল। মহাসংহিতার উল্লেখ আছে যে পল্লব, পারদ, যবন, শক দরদ, কিরাত, চীন প্রভৃতি

জাতি পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিল কিন্তু বহুকাল যাবত ব্রাহ্মণ-গণের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় তাহারা পতিত হইয়াছিল। মহাভারতও ঐ উক্তির সমর্থন করেন। ইক্ষাকুবংশীয় নৃপতি বাহুর রাজ্যহরণে শক, যবন, পারদ, কাষোজ ও পল্লবগণ হৈহয় ও তালজঙ্ঘকে সাহায্য করায় তাঁহার পুত্র বীরেন্দ্রকেশরী রাজচক্রবর্তী সগরনৃপতি ঔর্ধ্ব ঋষির প্রদাদে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পৈত্রিক রাজ্যাপহরণে প্রধানতঃ লিপ্ত হৈহয়গণকে নিশ্চল করিয়া শক, যবন, পারদ, কাষোজ ও পল্লবগণের বিনাশ সাধনে উদ্বৃত্ত হইলে তাহারা ইক্ষাকুকুল-পুরোহিত ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হয়। বশিষ্ঠের নির্বন্ধাতিশয্যে সগর তাহাদিগকে আশ্রয় মারিলেন না বটে, কিন্তু বেশবিশ্রাস ব্যত্যয় করিয়া তাহাদিগকে ক্ষত্র ধর্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া দিলেন। তিনি শকদিগের মন্তকাকর্ষ এবং কাষোজ ও যবনদিগের সমস্ত মন্তক মুগ্ধন করতঃ বিতাড়িত করিলেন। তাঁহার প্রভাবে পারদগণ মুক্তকেশ, ও পল্লবগণ ঋশ্রধারী হইল। শক, কাষোজ, যবন, পারদ ও পল্লবগণের স্বাধায় ও বশটকার প্রভৃতি রাজা সগর বারিত করিয়া দেন। তথা:—

“সগরঃ স্বাঃ প্রতিজ্ঞাং তু গুরোর্বাক্যং নিশম্যচ।

ধর্মং জঘান তেষাং বৈ বেশানস্তাংশ্চকাঃ ২ ॥ ৪৭

অন্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যাসর্জয়ৎ।

যবনানাং শিরঃ সর্জং কাষোজানাং তথৈবচ ॥ ৪৮

পারদা মুক্তকেশাশ্চ পল্লবা ঋশ্রধারিনঃ।

নিঃ স্বাধায় বশট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহান্মনা ॥ ৪৯

৮ম অধ্যায়, ব্রহ্মপুরাণ।

বাণিজ্য ও উপনিবেশের যোগসূত্রে ভাবের আদান প্রদানে যেমন প্রত্যেকের জাতীয় জীবন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল—তেমন বিভিন্ন ধর্মের ঐক্যতানে সমাজের জীবন পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় বণিকগণ ভীষণ বোলান বা খাইবার গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া কাবুল ও পারস্ত ইরাণ দেশের মধ্য দিয়া কক্সসাগর

অতিক্রম করতঃ ইয়ুরোপে বাণিজ্য করিতেন। ইয়ুরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যের এই পথ বহুকাল পর্যন্ত ব্যবহৃত ছিল। প্রাচীন বণিকগণ এই স্থলপথে কি অকুতোভয়ে, কি অসীম অধ্যবসারে পণ্য দ্রব্য নিয়া যাইতেন তাহা ভাবিলে শরীর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। ভারতীয় পণ্য দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে মধ্য এশিয়ার বৃকের উপর দিয়া যুগে যুগে ভারতীয় জ্ঞান ও সভ্যতার ধারাও বিভিন্ন দেশে বিস্তারিত হইয়াছে। প্রাচীন যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের সন্ধিস্থল এই মধ্য এশিয়াও ইরাণ। ভাবের আদান প্রদানে অতি প্রাচীন যুগেই ভারত ও ইরাণ জ্ঞান গরিমায় বিভূষিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই যুগেই উভয়ের জাতীয় জীবন ও সামাজিক জীবন একই ধর্ম বিশ্বাসের অনুরোধে উদ্ভূত হইয়া উঠিয়াছিল। একই ধর্ম বিশ্বাসের নবীন আলোক তরুণ উবার স্নিগ্ধ আলো রেখার মত বিশ্ববানীর প্রাণে এক অননুভূত সৌন্দর্য্যবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। যে ধর্ম বিশ্বাস নিয়া ইরাণে ভ্রাতৃত্ববোধের স্রুচনা হয়,—সেই ধর্ম বিশ্বাস পঞ্চনদের সরস্বতী তীরে আৰ্য্য ঋষির জিতব্রীতে নূতন ছন্দে স্বকৃত হইয়া বেদের ভাষায় সেই মোহন সুচ্ছন্দার রেশ মিশাইয়া দিয়া পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছিল। সরস্বতীর পুণ্যময় তটে নবলব্ধ জ্ঞানের অম্লিসিক্ত বার্তা ইরাণের ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিতরণ করিতে আৰ্য্যগণ কার্পণ্য করেন নাই। মহিমময় অতীত যুগের পূর্ণ গৌরবের মধ্যে পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থ পঞ্চনদের প্রান্তে আৰ্য্য ঋষি উদাস্ত কর্তে প্রচার করিয়াছিলেন—“শ্রবন্ত বিধে অমৃতস্ত পুত্রাঃ।” খুষ্টের জন্মের করেক সহস্র বৎসর পূর্বে ইরাণের অধিতীয় ধর্মগুরু জরথুষ্ট্র দেব প্রভাতের বিহগ কাকলীর মত স্তম্ভুর স্বরে বেদের অতিশ্রুতি করিয়া ইরাণের ধর্মজীবনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। এই নূতন ধর্মশ্রোতরীর পবিত্রতায় ইরানের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ধস্ত করিয়া-মধ্য এশিয়া প্রাবনে ভাসাইয়া দিকে দিকে উদ্ধাম গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল।

বৈতাত্তিক উভয় মতই বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদোপনিষদ “একমেবাদ্বিতীয়ম্” বলিয়া কথুকর্তে প্রচার করিয়াছেন,—আবার একই “বহুধা ভবন্তি” বলিয়া প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। “সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্র পাদঃ” বলিয়া বেদে বিরাটরূপেরও কল্পনা করা হইয়াছে। জ্ঞানের প্রথম প্রভাতে প্রথমতঃ প্রকৃতির স্তম্ভের স্তম্ভরূপকে ঈশ্বরের প্রতীক বলিয়া উপাদান করা হইত। প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্যকে ঈশ্বরের প্রতীকরূপে উপাদান হইতেই পরবর্তীকালে সাকার উপাসনার সৃষ্টি হয়। ভগবানকে কেবল সৌন্দর্য্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই— তিনি “ভয়ানান্ ভয় ভীষণং ভীষণানান্”—উদ্ভূত বজ্রের সহিত ও উপমিত হইয়াছেন। মিত্র, অর্ঘ্যমা, বক্রণ প্রভৃতি দেবগণের ইন্দ্ৰেখওবেদে পাওয়া যায়। মানুষের দার্শনিক প্রাণ যখন ভাবের নবনব ধারায় অভিসিক্ত হইয়া নূতন তত্ত্বানুসন্ধান প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখনি রূপের নানা কল্পনা ও ধর্ম বিশ্বাস সামাজিক জীবনে পরিবর্তন সংঘটিত করে। “একম্ অদ্বিতীয়ম্” এর এই যে রূপের কল্পনা তাহা মানবের সমাজপ্রিয়তার একটা জগন্ত দৃষ্টান্ত। মানুষ যখন “এক অদ্বিতীয়” গুণাতীত, নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনায় স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে পৃথক্ করিয়া শাস্তি পাইতেছিল না,— নিরাকার ব্রহ্মের কল্পনার বিড়ম্বনায় যখন সে অন্ধকারে ইতস্ততঃ সঁতার কাটিতেছিল, তখন ছই একজন ভাবুক সাধক সাধনাগুরু অপূর্ব বাণী প্রচার করিলেন—“বহুরূপে বিরাজিছে সমুদ্রে তোমার, বৃথা কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর—

\* \* \* \*

আব্রহ্মতত্ত্ব সকলি তাঁর রূপের বিকাশ। নদ নদী, বৃক্ষলতা, সাগরভূধর, মহুশ্য, কীটপতঙ্গ, প্রতি ধূলিকণা সকলি তাঁর বিভিন্নরূপ। ধর্মের এই যে নূতন তত্ত্ব স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে অভেদ করিয়া দিয়াছে তাহা সামাজিক জীবনের মধ্য দিয়াই গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষের যখন আত্মসন্ধান জ্ঞান হইল,—



সে যখন সামাজিক জীবনের পূর্ণ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিল, তখনই প্রকৃত পক্ষে এই ধর্মবিশ্বাসের জন্ম। শক্তি-বাদের মধ্য দিয়া এই ধর্ম-মত অতি প্রাচীন কালেই সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়। শাক্ত জানেন আধার ও আধেয়ে যে সম্বন্ধ;—অগ্নি ও তার দাহিকা। শক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধ—শক্তি ও শাক্তে সেই সম্বন্ধ অগ্নি ও দাহিকা। শক্তির মধ্যে যেমন একটা বাদ দিলে অপরটির কোন মূল্য থাকেনা। তেমনি শক্তি ও শাক্তের মধ্যে সম্বন্ধ। এই দ্বৈত বাদই শক্তি বাদের মূল সূত্র। শক্তিবাদের উৎপত্তি স্থল বাংলা;—তন্ত্র সকল বাংলাতেই রচিত। বাংলা হইতেই এই ধর্ম তাঁহার সুযোগ্য বরপুত্রগণের মারফতে জগতের বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হইয়া তদেবশীলগণের সামাজিক জীবনকে সফল করিয়া তুলিয়াছিল। বাংলার গৌরব এখন ধূলাবলুষ্ঠিত, সৌভাগ্য সূর্য্য অন্তমিত;—বাংলার শক্তি পঙ্গু, বাংলার শাস্ত্র লুপ্ত, সাহিত্য কীটদষ্ট, বাংলার বাণী এখন নিষ্ক্রিয়; কিন্তু এই বাংলাই এক দিন ভাবপ্রবণতার বিজয়-দ্রুতি নিনাদে নীরস কঠোর জ্ঞানমার্গের সংস্কার সাধনে ভক্তির পীযুষ-নিঃস্রব্দিনী ধারায় ভারত এবং বহির্ভারত প্রাবৃত করিয়া ধর্ম এবং সমাজে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। বাংলা সেই যুগেই ‘মাকে চিনিয়াছে—শক্তি এবং শাক্তকে অভেদ দেখিতে শিখিয়াছে। জগতে মূর্তিপূজার প্রথম প্রচারক শাক্ত সম্প্রদায়। বাংলা হইতেই এই ধর্ম ধীরে ধীরে জগতে বিস্তৃত হইয়াছিল। রোমে, গ্রীসে, মিশরে, আফ্রিকায়, প্যারিসেইনে, মক্কা ও মদিনায় এক সময়ে ভারতীয় প্রভাবে প্রতিমা পূজা হইত। Moses তাহাই নিবারণ করিতে বাইয়া বাইবেল লিখেন;—হজরত মহম্মদ সেই সাকার উপাসনার মূলে কুঠারাঘাত করেন। আজও ভারতের শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধ্যান ধারণা, পূজাপদ্ধতি

শাক্ত প্রণালীতে নিয়মিত হয়। জগতের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে আচারগত এবং আনুষ্ঠানিক যত বৈষম্যই থাকুক না কেন-ধর্মের মূল সূত্র পৃথক নহে। বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ—বৈদিক বিশ্বাসের সূদৃঢ় ভিত্তিকেই মূল সূত্র করিয়া বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, জেন্নাভেস্তা, এড্ডা, প্রভৃতি গ্রন্থ এবং প্রতীচ্যের ব্যাস, বাল্মিকী, গোতম, কপিল, কণাদ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহামনিবীর্ণের উপদেশাবলীর পার্শ্বে পাইথাগোরাস, সকেটান, প্লেটো, আরিস্টটল, হোমার, সিসিরো, ভার্জিল, হাফেজ, তমর খৈয়াম প্রভৃতির উপদেশাবলী রাখিলে সাদৃশ্য দেখিয়া অবাক হইতে হয়। তখন স্বতঃই মনে হয় এত সৌসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ আদান প্রদান ভিন্ন হইতে পারে না। তাই Col. Alcot বলেন—“প্রাচীন ভারতের আর্ধ্য ঋষিদের মতের সহিত পরবর্তী গ্রীস ও রোমের দার্শনিকগণের মতের এত সৌসাদৃশ্য আছে যে জ্ঞান হয় যে প্রথমেই প্রতিবিশ্ব পরবর্তী দর্শনরূপ দর্পণে দেখিতেছি। শিক্ষক বা পুস্তক প্রাচ্য দেশ হইতে পাশ্চাত্য দেশে না আসিলে একরূপ সাদৃশ্য হইতে পারে একরূপ বিশ্বাস বুদ্ধির অগম্য। আবার উহা আমাদের ধারণা আরও বদ্ধমূল করিয়াছে যে ভারতবাসীরাই মিশরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং মুসা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীক Plato পর্যন্ত প্রায় সমুদয় প্রাচীন দার্শনিকগণই জ্ঞান আহরণার্থে মিশরে গিয়া-ছিলেন। ধর্মতত্ত্বের নূতন আলো যখনই ভারতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে তখনই ভারতীয় আধ্যাত্ম ইরাণে প্রচার করিতে বিলম্ব করে নাই! প্রাচীন যুগে ভারত ও ইরাণ সৌভ্রাতৃস্বত্রে আবদ্ধ ছিল। সেই যুগে প্রাচীনগণে এই দুইটা বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃত্বাতি জ্ঞানগরিমায় শ্রেষ্ঠ, শোধ্যবীৰ্য্য ও সভ্যতায় অতুলনীয় হইয়া তরুণ তপনের মত বিমল কিরণ বিচ্ছুরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

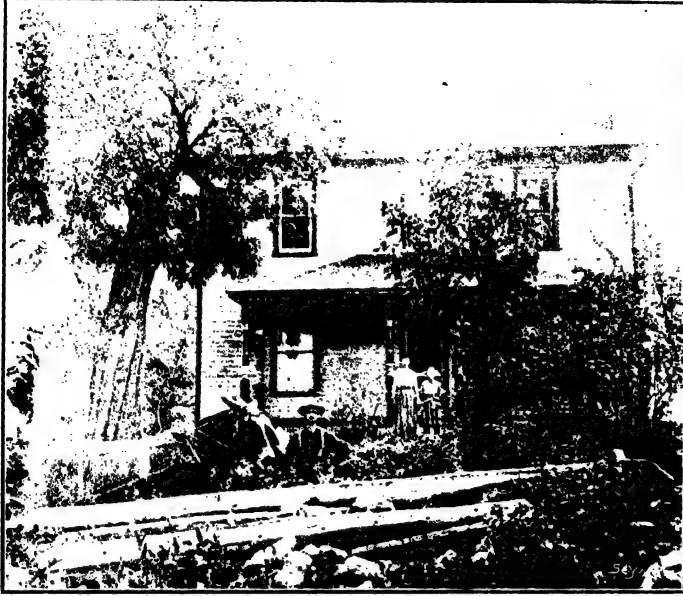
ক্রমশঃ—



## মার্কিং ও জাপ-কৃষকের বাড়ী ।

বীণা—

৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা



মার্কিং-দেশের গরীব কৃষকের বাড়ী ।



জাপানের গরীব কৃষকের বাড়ী

"কৃষি-সম্পদ"-সম্পাদক

কৃষি সম্পদ প্রেস, ঢাকা

১৯৬৩-৬৪ সালের মার্চ মাস

# বান্ধ

সচিত্র মাসিক পত্র

তৃতীয় বর্ষ ]

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৫ ।

[ নবম সংখ্যা

রাই

শ্রীকরণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

হে বঁধু তুহারি তৃপ্তির লাগি' ফুটেছি যৌবনে,  
গাঁথিয়াছি হার পরাতে তোমারে পীরিতি রঞ্জে ।

পরান-বন্ধু মোর,

ভেজোনা-তস্ত্রা-ঘোর

ঔাখি যে মজেছে কাজল মেঘের রূপের অঞ্জে !

গান হ'য়ে বাজে গুরু-গঞ্জন ; কুলমান চুরমার  
তুমি বই ওগো রাই কমলের কেবা আর আপনার ?

কারে বা লজ্জা নাথ !

বিরহ অশ্রু-পাত

আঁচলে চাপিয়া লোকের স্রুখে লুকাতে চাহিনে আর ।

ছিঁড়িলে বন্ধু আমার সরম দুকূল-গুঞ্জে,  
কি নিধি মিলেছে আমার পূজার দেউল লুঞ্জে ।

এ দুখ দুঃখ নয়,

মিছে আশঙ্কা ভয়,

সকল খোরানু বাঁশীর খেরালে সুরের মূর্ছনে ।

এত যে কেঁদেছি বুকে মাথা খুয়ে অদূর বিচ্ছেদে,  
কাছে পেয়ে পাছে আবার তোমারে হারাই সেই খেদে।

কহিছে করুণ আঁখি  
দিওনা দিওনা ফাঁকি,  
রেখো গো আমারে দিবস রজনী স্নদূত পদে বেঁধে।

চির যুগ ধরি রয়েছি জাগিয়া ত্রাজের ফুল শোভে,  
মধু মন্থরে অন্তর গাঁথা তোমারি সজে যে।

লও গো অঞ্জলি,  
গানের শেষ কলি,  
জল-তরঙ্গ সারজে ওই ওঠে কি সুর বেজে !

খেলায় খেলায় উতল রহিমু গেল যে দিন চ'লে,  
প'লনা চরণে কমল-পরাগ এ নীল-অঞ্চলে।

আধারে অশ্রু-ঝরা  
হ'ল না কুস্ত ভরা--  
ভাসিল না হিয়া চুম্বন রসে স্খার হিলোলে। \*





## নিশীথের আলো

ত্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

( ১৩ )

কথাটা বলা যত সহজ, কার্যে প্রতিপন্ন করা তাহাপেক্ষা লক্ষণ কঠিন। প্রগতি কথা দিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সে কথা যে কি করিয়া কার্যে পরিণত করা যাইবে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া প্রগতি অস্থির হইয়া পড়িল।

শরৎ এখানে থাকিলে সে তাঁহার কাছে একবার কথাটা তুলিত। শরতের স্বরূপ সে দেখিতে পাইয়াছিল, শরতের স্বপ্নের ভাব সে অনুভব করিয়াছিল। তাঁহার অন্তরে বেরূপ দয়া তাহাতে এই দুঃস্থ পরিবারকে যে তিনি উদ্ধার করিতে সন্মত হইবেন ইহাতে প্রগতির একটুও সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু কোথায় শরৎ? একমাসের স্থলে দেড়মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, আজও তাঁহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। পূজার আর কয়েকদিন মাত্র বিলম্ব আছে, কাল ফুলের ছুটি দিয়া পরশ্বদিনে সে বাড়ী যাইবে, মানিকের উপায় সে কি করিবে? শরৎ তাহার হাতে মাণিককে দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত সে মাণিককে লইয়া যায় কি করিয়া?

প্রতিদিনকার মত হিরণ্ময় আজও সন্ধ্যাবেলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রগতি তাঁহার এরূপ আগমনে মোটেই খুসি হইত না ইহা বলাই বাহুল্য। উপায় নাই, বাধ্য হইয়াই তাহাকে সহ্য করিয়া যাইতে হয়।

এ কথা সে কোথায় পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “পূজার বাড়ী গাছেন কি?”

প্রগতি উত্তর করিল, “যেতে হবে বই কি? এতদিন ছুটি, এখানে থেকে কি করব?”

হিরণ্ময় বলিলেন, “সে কথা ঠিক, প্রবাসীর মন দেশের পানেই পড়ে থাকে, একদিনের অবকাশ পেলেও সে বাড়ী ছুটিতে চায়। আমি যখন কলকাতার থেকে পড়তুম, একদিন ছুটি পেলে আর সেখানে থাকতে পারতুম না, বাড়ী পালিয়ে আসতুম। তবে আমার সঙ্গে আপনার কথা আলাদা। এখানে আমার আত্মীয় স্বজন সকলেই ছিলেন, আপনার তো শুনেছি তেমন আত্মীয় কেউ নেই, না বাপ, তাই বোন—”

প্রগতি শুক হাসিল, বলিল, “কেউ নেই তবু ডিটের টান বলে একটা কথা যে চলিত আছে সেটা জানেন কি? আবার যার ডিটে নেই তারও অন্যতুমির ‘পরে একটা টান থাকে এ কথাটা ও বোধ হয় মানবেন।’”

হিরণ্ময় বলিলেন, “নিশ্চয়ই মানতে হয়, না মামলে আর চলে কই? তবে একটা কথা—আপনি তো পল্লীগ্ৰামের জুর্গোৎসব ব্যাপারটা কখনও দেখেন নি, এ বছরটা এখানে থেকে না হয় দেখেই যাবেন।”

তাহাকে এখানে রাখার জন্য হিরণ্ময়ের এত ব্যস্ততা কেন তাহা স্পষ্টরূপে না বুঝিয়াও প্রগতি শঙ্কিত হইয়া উঠিল; নত দৃষ্টিতে বলিল, “জুর্গোৎসব ব্যাপারটা দেখবার আগ্রহ আমার কোন কালেই নেই। বা চিরকাল হয়ে আসছে এখনও তাই হচ্ছে তবে অনেকটা সংক্ষিপ্ত জ্ঞানে, এর পর ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হতে হতে শেষটার একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে।”

“বাগুয়া—”

প্রাঙ্গণ হইতে এই আহ্বানটা আসিয়া আসিল। কথা বলিতে বলিতে প্রণতি হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, হিরণ্ময় সহজেই তাহা লক্ষ্য করিলেন।

“বাগুয়া বাড়ী আছিল না কি ?”

প্রণতি উঠিয়া পড়িল, হিরণ্ময়ের পানে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “শরৎ বাবু এসেছেন, তাঁকে—”

সঙ্গে সঙ্গে দরজার উপর শরতের সুদীর্ঘ সুগৌরব দেহ দেখা দিল। প্রণতি সসজ্জমে নমস্কার করিতে তিনিও নমস্কার করিলেন, হিরণ্ময়ের পানে তাকাইয়া বলিলেন, “এই যে হিরণ, এখানে। বেশ বেশ, ভারি খুসী হয়েছি।”

একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। প্রণতির পানে চাহিয়া হাসিমুখে বলিলেন, “আমার কথার সত্যতা দেখছেন মিস বোস? সেই যে একটা গল্প বলেছিলুম না,—ভিখারীকে যদি এতটুকু অধিকার দেওয়া যায় সে ক্রমে সবটা চেয়ে বসে। গৃহের অধিষ্ঠাত্রী আপনি,—আপনি রইলেন দাঁড়িয়ে, আমি কিন্তু আপনি না বলতেই আপনার চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে পড়লুম।”

নতমুখে প্রণতি একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “না না, আপনি বসুন। আপনারই বাড়ী—জিনিসপত্র সবই, আপনি বলবেন না?”

শরৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া হিরণ্ময়ের পানে চাহিয়া বলিলেন, “মিস বোসের কথা শুনছো হিরণ,—আমি কিন্তু আপনার এ সব কথা যেনে নিতে রাজি নই মিস বোস। আপনাকে এই অতিরিক্ত বিনয়ীভাবে ছেড়ে দিতে হচ্ছে, নইলে আমার সঙ্গে কিছুতেই বনবে না।”

হিরণ্ময় এ হাসি ভাষাসার মধ্যে মোটেই বোগ দিতে পারিলেন না, চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া অবিরত হাই তুলিতে তুলিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

শরৎ প্রণতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, “তারপর, আমাদের সে গল্পটা কেমন আছে, আপনাকে খুব বিরক্ত করে দেয়েছে বোধ হয়? বা হোক, আচ্ছা এক বোঝা আপনার মাঝার চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছিলুম, এখন খুব বিরক্ত হবেন, নিশ্চয়ই আমার খুব গালাগালি দিচ্ছেন,—না—”

বাধা দিয়া ব্যগ্র কর্তে প্রণতি বলিয়া উঠিল, “আপনি নিজে অনেকগুলো অজ্ঞার কথা ব্যবহার করছেন। আমি আপনাকে গালাগালি দিয়েছি এমন কথাটা আপনি বলতে পারলেন কি করে? হিরণ্ময় বাবু জানেন, আমি কোন দিন আপনাকে কোন কথা বলেছি কিনা।”

হিরণ্ময় মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিলেন, সে চেষ্টার তাহার মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল মাত্র; তিনি, শরৎ ও প্রণতির দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন,—ইহাদের কথাবার্তা কেমন সরল, ইহারা যেন কতকালের পরিচিত। ইহাদের কথাবার্তার মধ্যে ধার করিয়া আনা সত্যতার অকারণ গাভীখ্য নাই, কেমন অকৃত্রিম।

এই রকম সময়ে এইসব কথার মাঝখানে মানিক তাহার পুষ্ট মেহখানা আনিয়া দাঁড়াইল, তখন শরৎ সত্যই আশ্চর্য হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। দেড়মাস আগে তিনি যে মানিককে রাখিয়া গিয়াছিলেন, এ সে মানিকই নয়, আশ্চর্য হইবারই কথা।

তাঁহার চোখে বিদ্রিত দৃষ্টি দেখিয়া প্রণতি একটু হাসিল, বলিল, “দেখছেন মানিক কিনা?”

প্রশংসমান নেত্র তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া শরৎ বলিলেন, “বাক্তবিকই তাই দেখছি, বিষয়ে আমার প্রাণ ভরে উঠেছে। মাত্র দেড়মাস আগে, বাক্য রেখে গেছি, সে আজ মানুষ হয়ে গেছে, এই আশ্চর্য পরিবর্তন দেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে না কে বলুন দেখি?”

প্রণতি বলিল, “হিরণ্ময় বাবুকে ধন্তবাদ দিন শুধু তাঁর চিকিৎসার গুণেই—”

ব্যস্তভাবে তাহাকে বাধা দিয়া হিরণ্ময় বলিলেন, “অমন মিথ্যে কথাটা মুখে—আনবেন না মিস বোস, আর শরৎ, তুমিও এ কথাটা এমন চট্ করে মেনে নিলে চলবে না। তোমার ওখানে থাকতেও তো চিকিৎসা করতুম, কোনদিন সামান্য কিছু উন্নতিও দেখতে পেরেছিলে কি? জেনো বাক্তবিকই ওর উন্নতি শুধু মিস বোসের হাতের গুণে, ওর হাতের সেবা না হলে শুধু ওরূপে কি হোতো?”

শরৎ একটু হাসিলেন, তখনই গভীর হইয়া বলিলেন, “সে কথা আমি বেশ জানি। কেবলমাত্র কষ্ট হতে হয়

না পেলে ছেলেগুলো কিছুতেই বাঁচতে পারে না, কারণ পুরুষ তাদের লালন পালন করবার নীতি কিছুই জানে না। ওরা বেথানে কোন কিছু পাওয়ার জন্তে আবদার করে আবার পুরুষেরা সেখানে ধমক দিয়ে থামাতে চাই, ছেরেরা সেখানে আদর করে ভুলিয়ে দেন। যেহেতু যে বাবা হস্তে পেরেছে সেও সংস্কার বশে শিশুপালন নীতি বেশ জানে, এটা তার মহাকাব্য, কিন্তু আমাদের মত অপদার্থ লোক জ্ঞানো কিছুতেই এ সব কাজ পেরে উঠবে না; সারা জীবন শিশুদের কাছে কাটালেও তাদের প্রকৃতির সঙ্গে মিলে কাজ করতে পারব না এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি।”

প্রগতি মুখ কিরাইয়া হাসি গোপন করিল, তাহারপর বলিল, “একে কি আপনি আবার নিয়ে যাবেন, না আবারকেই হান করলেন বলুন দেখি?”

শরৎ বলিলেন, “সেটা আপনার ইচ্ছা, আপনার সঙ্গে এর যদি ঠিক মত মিলে যায় তবে রাখতে পারেন, তাতে আমার আপত্তি করবার কোন কারণ নেই; আর যদি না রাখতে চান,—আমার জিনিস আমার কিরিয়ে দিন—আমি নিয়ে চলে যাই।”

প্রগতি একটু ভাবিয়া বলিল, “তবু এই ছুটির সময়টা আপনি ওকে নিজের কাছে রেখে দিন, তারপর আমি এসে ওকে নেব। আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারতুম, কিন্তু আমার মামিমা,—তিনি এ সব বড় একটা পছন্দ করেন না।”

শরৎ বলিলেন, “না না, আপনাকে ওর তার আমি এখনই দিতে চাই নে। প্রভুদের জী ছেলেসেয়ে নিয়ে এখানে এসেছেন, তিনিই এ ছেলেটার তার নেবেন, তাঁর ছেলে সেয়ের সঙ্গে এই হতভাগাটাকেও তিনি রাখুব করে ফুলবেন।”

প্রগতি কিরিয়ে বলিল, “তিনি আপনার সঙ্গে এসেছেন?”

শরৎ উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, তাঁকে নিয়ে এসুন; একদিন তাঁর কথা সব শুনে পারবেন।”

সেই অন্তিমিনী অপরিচিতার কথা মনে করিয়া প্রগতি একটা বীধিকিবাঁস কেবিল, বলিল, “বেশ করেছেন তাঁকে

এনেছেন; আপনাকে দেখা শোনার একজন লোক হ’ল।”

শরৎ হাসিয়া বলিলেন, “আপনার মুখ সে জন্তে বড় ভাবনা হয় মিস বোস?”

প্রগতি শাস্ত কণ্ঠে বলিল, “ঠিক তা নয়; তবে সময় সময় আমার মত আর কারও অন্তরের কথা ভাবতে গেলে আপনার কথাই মনে হয়।”

তাহার এই কথা শুনিতে একটা ভারি কল্পণ জ্বর বাজিয়া উঠিল বাহা দুইটা স্রোতারই স্বর স্পর্শ করিল।

শরৎ বলিলেন, “কেন মিস বোস,—আপনার মামি-মা—” প্রগতির বেদনা ভরা হাসি সে কথা সমাপ্ত হইতে দিল না। কথাটা এইখানেই বন্ধ হইয়া গেল।

হিরণ্ময় একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া আলস্ত ভরে বলিলেন, “এখন তবে ওটা বাক, আটটা বেজে গেছে।”

শরৎ তাঁহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, “চল, একসঙ্গেই দুজনে যাওয়া বাক। তা হলে আপনি পরশু দিনই যাচ্ছেন মিস বোস?”

প্রগতি উত্তর দিল, “হ্যাঁ, পরশুই যাব।”

শরৎ উঠিয়া বলিলেন, “তবে কাল এসে একে নিয়ে যাওয়া হবে। আপনার বেতন—”

প্রগতি বলিল, “সেক্রেটারী সব মিটিয়ে গেছেন।”

শরৎ ও হিরণ্ময় বিদায় লইলেন।

নীলার কথাটা মনে আগিতেছিল, কিন্তু হিরণ্ময়ের সন্মুখে সে একটা কথাও বলিতে পারিল না। হিরণ্ময়ী রাখিল কলিকাতায় বাইবার পূর্বে শরৎকে এ কথাটা জানাইতেই হইবে।

( ১৩ )

মাণিক আসিয়া জ্যোতি ও মিনতির পার্শ্বে গভীর মুখে বধন দাঁড়াইল তখন তাঁহার দুইটা ভাইবোন আশ্চর্য হইয়া গেল। এই অপরিচিত ছেলেটা কোথা হইতে আসিল এবং তাহাদের পাশে দাঁড়াইল তাহাই তাহারা ভাবিয়া পাইল না।

অবশেষে তাহারা নিতান্ত দরপত্র হইয়াই মাণিককে তাহাদের খেলার সঙ্গীত্রে কাছে ডাকিয়া গেল।



কিন্তু কি যে ছেলোটো প্রবল উপেক্ষা ভরে তাহাদের আস্থান সে এড়াইয়া গেল, কিছুতেই কোন কিছু মধ্য ইহার নাগাল পাওয়া গেল না। জ্যোতি ভারি রাগিয়া গেল, মিনতি মুখ ঝাঁকাইয়া দানার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, “হোক গে দাদা, আমরা ছ’জনের কেউই ওর সঙ্গে কক্ষনো খেলব না, চল আমরা ছ’জনে একলা একলা খেলি গিয়ে।”

মাসিক যেন এ বাড়ীতে পর হইয়া গিয়াছে। সে এই বাড়ীতে পূর্ণ চারমাস কাটাইয়া গিয়া ছুদিন তফাতে গিয়া যেন নিঃসম্পর্কীয় হইয়া গিয়াছে। প্রগতির সেই ছোট বাড়ীখানাই যেন তাহার বড় আপনার ছিল, প্রগতি যেন তাহার নিজের,—আর সব পর। সেখান হইতে আবার তাহার পূর্ব পরিচিত এই স্থানে আসিয়া সে যেন অতল জলে পড়িয়াছিল, এই অতল জলে পড়িয়া সে বুধা আঁকু বাকু করিতেছিল, কিছুতেই স্থল পাইতেছিল না।

এবার শরতের সহিত আড়ি করিয়া দারুণ বিঘেষে ইন্দু খুব বেশী করিয়া পূজার যোগাড় করিয়াছে। পূর্বের সজ্জিত অর্থ—শুধু শরৎকে দেখাইবার জন্য সিদ্ধক হইতে বাহির করিয়া তাইয়ের সাহায্যে কলিকাতার থিয়েটার, থাত্রা, কীর্তন আনিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

শরৎ একবার মাত্র মুছ কণ্ঠে বলিলেন, “এতগুলো টাকা অনর্থক খরচ করছেন না, এ গুলো দেশের কোন সংকাজে দিলে ভালো হতো। অনেক জায়গার লোকে জলের অভাবে শুকিয়ে মরে, সেখানে জলের ব্যবস্থা করা যেত, বারা খেতে পার না, তাদের খেতে দেওয়া যেত। টাকাগুলো শুধু জলে ফেলে দিচ্ছেন না, একটা পরসার জন্তে কত লোক হাহাকার করে কিরছে।”

ইন্দু একটাও উত্তর দিল না। মণিষকে গিয়া বলিল, “তুমিছিস মণি, শরতের কথা? বলছে—এতটাকা এমন ভাবে উড়িয়ে দিয়ে কি হবে, তার চেয়ে কাজ করতে এই টাকা গুলো দেওয়া হোক। এর কাজ পরের ধনে পোদারী করা, অর্থাৎ কি—না আমার টাকাগুলো আমি ওর হাতে রেই, সে নিজের নামে কাজ করে লোকের কাছ হতে বাহরী নিক। আমি ছেলে মানুষ নই, সব বুঝি,—

কেন দেব? আমার টাকা আমি বা খুসি তাই করবো, কেউ তাতে কথা বলতে আসবে কেন?”

সেবাকে দেখিয়া ইন্দু মোটেই খুসি হইতে পারে নাই। সেবার সন্ধে সে মনের মধ্যে কি ধারণা করিয়া লইয়াছিল তাহা সেই জানে। সেবা নিজে সাধিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিল, ইন্দু তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না, অপমানিতা সেবা ফিরিয়া গেল।

পূজার পূর্বে একদিন ইন্দু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেবাকে ডাকিয়া বলিল, “ওই বাগদীর ছেলোটাকে এ কয়দিন একটু সাবধান করে রেখো গো,—যেন পূজার দালানে কখন না উঠে পড়ে। তোমাদের তো বাছা ভাতজন্ম কিছু নেই, হিঁদুর কোনও আচার বিচারও তোমরা রাখতে চাওনা। জেমানদের খিটেন বলি কি সাথে বাছা,—কেউ কখনও শুনেছে কোনও বামন কায়েতের ঘরের ছেলেমেয়ে বাগদীর সাথে বসে খায়? তোমাদের বাছা সবই ঢুল, নইলে ওই “জলজ্যাস্ত” বাগদী ছোঁড়া তোমাদের ঘরে দোরে ওঠে, সব ছোঁর, একসাথে বসে খায়? যাক গে ও সব কথা, তোমরা মর বাঁচ তাতে আমার কিছু এসে যাবে না, আমার নিজের ধর্ম বাঁচিয়ে চললেই হল। পূজো এসেছে, তোমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে হয় তো ও ছোঁড়াও দালানে উঠে পড়বে।

সেবা শান্তকণ্ঠে বলিল, “একসঙ্গে থাকতে গেলেই তা হতে পারে না। আমার ছেলেমেয়ে এবার না হয় ওর জন্তে ঠাকুর দেখবে না,—ওকে নিয়ে তফাতে থেলা করবে। ওরা বেঁচে থাকলে বছর বছর ঠাকুর দেখতে পাবে, বড় হলে মানিকেরও জ্ঞান হবে, সে নিজেকে তফাতে রাখবে।”

গলার সুর নরম করিয়া ইন্দু বলিল, “তা বাছা, বা ভাল হয় তাই কোর,—আমার পূজোটা যেন ভালর ভালর হয় আমি শুধু তাই করতে চাই। ও সব অনাচারের ছোঁরা আমি সহিতে পারব না, আমার ভালও লাগে না। যত সব স্লেচ্ছাচার এই বাড়ীতে,—বাড়ীর কর্তারই ধর্ম জাত জ্ঞান নেই,—অন্তের আর থাকবে কি?”

সেবা নীরবে শুনিয়া গেল,—উত্তর দেওয়া তাহার প্রকৃত বিকল্প বলিয়াই সে উত্তর দিতে পারিল না।

অন্তরালে তাহার ক্ষুদ্র মন কাঁদিয়া ফিরিতেছিল—উহারা কি কেহই নয়? বিশ্বের দরবারে এইসব উন্নত শ্রেণীর লোক আত্মজি পেশ করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সকল অধিকার আছে, নীচ অস্পৃশ্যদের কোন অধিকার নাই। এই স্পৃশ্যস্পৃশ্য ভেদ জ্ঞান জাতিকে কতটা নত করিয়া রাখিয়াছে তাহা এ দেশের লোক কোনদিন কি মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারিবে? যেখান হইতে আসিয়াছে এবং ছুদিনের খেলা শেষ করিয়া যেখানে আবার যাইয়া মিলিতে হইবে সেখানে কি জাতির পার্থক্য থাকিবে? কবি সত্যাই বড় দুঃখে গাহিয়াছেন

ছু'লে তোর জাত যাবে—

জাত ছেলের হাতে নয় তো মোরা।

সেবা আজ বেশ বুঝিতেছিল জাতির গলদ কোথায়—কোথায় এবং কেমন করিয়া নিজের স্বাভাব্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে? যে দিন দেশের মেয়েরা নিজের মন হইতে এই আচারের মিথ্যা মোহ দূর করিতে পারিবেন, সেইদিন বড় ছোটকে নিজের পাশে টানিয়া লইতে পারিবে,—জাতি আবার বৃহৎ জাতিক্রমে দাঁড়াইতে পারিবে, তাহার পূর্বে নহে।

সেবা জ্যোতি ও মিনতিকে মাণিকের রক্ষক নিযুক্ত করিল, মাণিককে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল সে যেন পূজার দালানে না উঠে!

বালক সে, তাই বাহা তাহাকে নিবেদন করা যায় তাহাই করিয়া বসে। অনেক করিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও অধ্য বাগদীর ছেলেটা সে সাবধানতা ভুলিয়া অস্ত্র ছেলে-মেয়েদের সহিত মহাষ্টমীর দিন পূজার দালানে উঠিয়া পড়িল।

ইন্দু তখন দানান্তে শুদ্ধ নেহে, শুদ্ধ মনে অঞ্জলি দিতে বসিয়াছিল, মাণিককে নিজের পার্শ্বে দাঁড়াইতে দেখিয়া সে একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

“রামচরণ—জলদি এদিকে এসো—”

অঞ্জলি দেওয়া হইল না, রামচরণকে ডাকিতে ডাকিতে ইন্দু দালান হইতে নামিয়া পড়িল,—কোথেকে তাহার সর্দার কাঁপিতেছিল, তাহার স্নগের মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

ইন্দুর আছানে জমাদার রামচরণ ঘোঁবে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অস্পৃশ্য বাগদীর ছেলেটার কান ধরিয়া তাহাকে দালান হইতে নামাইয়া লইল, তাহার পর তাহার পাকা হাতের বিরাগী সিকার চড় গণ্ডে বসাইয়া পৃষ্ঠে গোটা কত কীল দিয়া ধাক্কা মারিতে মারিতে পূজাবাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল। জ্যোতি ও মিনতি আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিল। দেবী প্রতিমাকে বিগ্ৰহ করিয়া লইয়া আবার পূজার আয়োজন চলিতে লাগিল।

পুরোহিত বধন স্তোত্র পাঠ করিতেছিল—

যা দেবী সর্ব ভূতেষু আত্মরূপেন সংস্থিতা,

নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

তখন তাঁহার স্তোত্র কাহারও হৃদয়ে হতভাগ্য পতিত বাগদী ছেলেটার কথা জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই। সর্ব ভূতে আত্মরূপে যে দেবী বিরাজিতা, প্রাণী যাজাই যে শক্তি অনুভব করে সেই আত্মা—সেই শক্তি বাগদী বালকের মধ্যেও ছিল কিনা তাহা কেহ ভাবিয়াও দেখিল না। ইহারা মাপকাঠি লইয়া অত্যন্ত হৃদয়তাবে বিচার করে, সেই জন্ত যদিও স্বীকার করে দেবী সকলের মধ্যেই আত্মরূপে বিরাজিত, কাজের বেলায় সেটা মানিয়া লইতে চায় না। বাগদী, হাড়ি, মুচি প্রভৃতি অস্পৃশ্যদের অতি সাবধানে তরফতে রাখিয়া দেশের স্পৃশ্যরা নিজদের বাঁচাইয়া চলিয়াছে। দেবী, তোমার ডাকিবার অধিকার বধন অস্পৃশ্যেরও আছে, কেন ইহারা তোমার নিকটে বাইবার অধিকার পাইবে না? তোমার সন্তানের মন তুমি পবিত্র করিয়া তোলা, জামাও মাতৃ পূজার সকলেরই অধিকার আছে।

(ক্রমশঃ)

## ব্যথিত ভগবান

শ্রীকণীন্দ্র পাল

জীবনের এত ক'টা দিন কাটিল এমনি করিয়াই।—  
বন্ধনহীন।

ভিতরের অস্থির বাষাঘরটি চিরউদ্ভূথ।

মনে হয়, এই বৃহৎ জগৎটার সহিত অনিবিড় পরিচয়  
তো এতদিনেও হইল না—কিন্তু হইবে হয়ত একদিন.....  
কে জানে...।

ভালই লাগে —

উদ্ভূত দরশনপনার উদ্দাম কল-কাকলি।

তাই চলি আর চলি পৃথিবীর বুকে তাল হুঁকেই।

দুর্য্যোধনের রাজি।

সমুখের অনন্ত অন্ধকার রহস্যময় মারাপুরীর মত  
ভরোদৌপক।

আকাশের চোখের অল দুর্কার

পৃথিবীর বুকে তার পতন।—কান্তিহীন।

একেবারেই ভিষ্মিরা গিয়াছি।

সর্বদে কাপুনি ধরিয়াছে।

পথের পাশের জীর্ণ বাড়ীটার টিম্‌টিম্ আলোটি মুহূ-  
প্রভীকার বাদীটি ঘন।

ডাকিলাম। সাড়া নাই।

...অবিশ্রাম পতন আর বাতাসের হুহুকার।

হুঁকিরা পড়িলাম।

অরাজীর্ণ একটি বৃদ্ধ আধবৃদ্ধ অবস্থার পড়িয়া আছে।

আর তাহার মুখের উপর...

যেন কাণ পাতিয়া শুনিতেছে— কখন মুখি ওই স্তিমিত  
লোকটির স্পন্দনটুকু খামিয়া যায়।

একখানি স্থিতি-নিবর আনত কমরীর মুখ...

অপরূপ তবীটি।

হিন্ন বিভ্রত বসনের কাঁকে মদির বোবনের উছলতা।

গরীব বেচারী...

নিরাজ চোখ দুইটি আমার বলিয়া উঠে।

কিন্তু আমি বাষাঘর—আমি সন্ন্যাসী।

ভাবি, হয়তো তা' শুধু আশ্রয়লনা!

তবু—

ডাকিলাম, বুড়া।

সাড়া দিল, হঁ...

সিক্ত গৈরিক বসন দেখিয়া বলিল, চুল্লিকা পাশ বৈঠকে

সামুজী।

নিবু নিবু আশুপের পাশে বলিয়া কাঁপি।

বুড়া বলল, তার নাম ভজন...আরো কত কি বলিয়া

চলে।

তার পূর্বজীবনের কথা.. তার দায়িত্বের কথা...আর  
মোগের...

অর্ধেক কথা কাণেই আসে না।

বলে, একটা ঝাড়ফুঁক, না হয় তো একটা ওয়ুধ- সন্ন্যাসী  
আদমীর মেহেরবানি না হইলে সে মারাই বাইবে...

হাসি আসে।

সন্ন্যাসী হওয়ার মত সর্বনাশা ছলনা আর দ্বিতীয়টি বুঝি  
নাই।

কিন্তু তবু তাহাকে আশ্বাস দিই।

বাহিরের প্রলয়জ্বল রাজি উত্তাল।

যরে বলিয়া তাহার উদ্ভূত গর্জন শুনিতে পাই।

এমনি করিয়াই ভজনের সহিত আলাপ অমিয়া উঠিল।

সে গৃহী, আমি বৈরাগী।

একটা প্রস্ন কেবলি মুখের কাছে আসিয়া ছটিকটু করে।

কিন্তু লজ্জার বলিতে পারি না।

নিজেই নিজেকে থিকার দিই—সন্ন্যাসীর আবাস লজ্জা...

বলিয়া কেলিলাম—

ওই বুঝি তোর বিটরা ?

ভজনের চোখ দুইটি কণিকের অস্ত্র জলিয়া উঠিয়া আবার  
সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। বলিল, 'ওর অন্তেই তো বাঁচতে চাই  
দেবতা; ওই আমার কলিজা... আমার শাদি-করা 'বহু'...  
আশ্চর্য্য হই, কিন্তু হাসিতে পারি না।

বাহাত্তুরে বুকের জী এক বোড়ী তরুণী।

উত্তপ্ত যৌবনের দৈহিক স্রুথ উহার কাছে মরীচিকা...

ভাবিতে, তাহার অস্ত্র আমার বুকের ভগবানটি ব্যথার  
উদ্দেশ্য হইয়া উঠে।

ঈশ্বর বলিয়া ভগবানের লোকটি বোধ হয় কাণা...

...আমি সন্ন্যাসী সেক্ষণে তুলিয়া যাই—

তুলিয়া যাই যে কামনার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযানের তিলক  
কাটিয়াই সন্ন্যাস ব্রত।

ওই তরুণীটির কথা বলিয়া যেন নিজ হাতেই ভজনের  
মুখের ছিপিটা খুলিয়া দিলাম।

ভজন বলে, ওর নাম জাহ্নবী। ছয় মাস পূর্বে বিবাহ  
করিয়াছে .....তিন বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পাওনা—  
তাহার বধাসর্ব্বস্ব তিন কুড়ি সাত টাকা খরচ করিয়া।.....  
ভাবিতেছিলাম—

অব্রের সংস্থানের চেয়ে বিবাহটাই কি বড় হইল।

ভজন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

বাবাজী, তুমি নারীর ঘেহ মমতার মূল্য কি বুঝবে.....

পথই তো তোমার ধর—

মনে হইল, সভ্যই তো—

এত বড় সমস্তার সীমাংসা করার জীবন আর বাহারই  
হয় হউক...

আমার তো নয়ই।

কিন্তু ভজনের বাকী কথাটুকুও শুনিতে হইল—

...জাহ্নবী নাকি তাহাকে ভালবাসে—থুব।

বলে আর খলিত দস্তের ফাঁকে হাসি উপচাইয়া পড়ে।

লোলচর্মে বিরক্ত মুখখানিতে অপার আনন্দ।

উদ্ভাস।—

না হইলে এমন অসম্ভব কথাটা...

আমার বলে আমিই নাকি তাহাকে ঝাঁচাইয়া তুলিব—

হতভাগ্য মরুক।...

চুপ করিয়া থাকি।

জাহ্নবীর ঘুমন্ত চোখ দুইটি বিম্বিত...

আমার দিকে চাহিয়াই রহিল।

নিজের দিকে—নিজের বেশের দিকে চাহিয়া আমার  
মনে হইল—

তবু বিরক্ত হইতেছিলাম।

জাহ্নবী খিল খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,  
সন্ন্যাসী!—

অসহ।—

আমার জীবনের পদ্ধতি লইয়া এই তরুণীটির সেধ  
করিবার স্পর্ধা।

কাসিতে কাসিতে বুঝি ভজন দম্ আটকাইয়া মরে।

আমার দিকে আঙ্গুলটি তুলিয়া বলিল, দেবতারে  
দেবতা...

আর যেটুকু বলিল সেটুকু একান্তই অস্পষ্ট।

মিমিয়ে পরিবর্তন ঘটিতে দেখিলাম।

কাতর কণ্ঠে সেদিন জাহ্নবী আমাকে বাহা বলিয়াছিল  
তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্য না হইয়া পারি নাই।

বলিয়াছিল—

তাহার স্বামীটিকে আরাম করিয়া দিতে হইবে।

ইহাঙ্গের অন্ধনিষ্ঠা দেখিয়া কক্ষণ হয়।

দুর্ঘ্যোগের মতই ভজনের নিষ্ঠা আজ অসরল...

তাহার যন্ত্রনাবিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া জাহ্নবীর  
হৃচ্ছিতা...

উৎকর্ষ।—

বুঝিলাম, এই সর্ব্ববিধ সন্ন্যাসীর মোহ কেননার অন্ধত্ব  
নিরুদ্ধ হইলেও জাগ্রত।

জাহ্নবীর পাশে বসিয়া ভজনের স্তম্ভা কন্ঠি।

তিনদিন পরে ভজন আজ পথ্য করিলে।

মুক্ত মনটা একটা ভাবনার অন্তরঙ্গ।—ভাবি  
কেবলই...

জীবনের প্রয়োজন তো এতদিন পথেই চালিয়া দিয়াছি,  
নিঃশেষে।

কিছু—

আজকে আমার সে উদ্দাম পথিকটি গেল কোথা !

পাশে বলিয়া ভক্তনের অবিশ্রান্ত বকুনি...

বলে, ওই দূরের ভালবন তারপর একটি উন্নত সমুদ্র  
.....আশেপাশের দ্বিধাদিক্‌জ্ঞানশূন্য খণ্ড পাহাড়.....তারি  
একটির গুহার থাকে এক জাগ্রত দেব .....ছোট গ্রামটির  
উপর কখন তাঁর স্নিত আনন্দ, কখন রুদ্র ক্রকুটী—ভগিতার  
হয়তো প্রয়োজন ছিল।

সে নিঃসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিল—

তাহার সহিত আমাকে সেখানে বাইতে হইবে।—

শুধু তাহাই নয়.....

স্বকল চাই—তাহার অর কষ্টের নিবৃত্তির জন্য আর রোগ  
শাস্তির.....

বিশুখ দেবতাটি নাকি আমি না গেলে কিছুতেই তাহার  
উপর প্রসন্ন হইবেন না !

একটা উত্তর হয়তো বিতায়—

সম্মতি-অসম্মতিয়।

তাহার পূর্বেই আসিল জাহ্নবী। মুখে তার অসঙ্কোচ  
হাসি, বৃদ্ধ।

আবার পথ সঞ্চল হুগিটি হাতে লইয়া।—

তাহার ভিতর ছিল সন্ন্যাসী সাজিবার সরঞ্জাম।

কাঁধের হুগিটি কেলিয়া দিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া  
লইয়া চলিল।

আপত্তি করিবার অবসরও মিলিল না।—এমনই সম্ভব।

...কৈকিরং সে একটা দিল—

বলিল, ভিক্ষা না করলে খাবে কি ?

চমৎকার তার অতিথি সমাদর...

সাধু সন্ন্যাসীর উপর ভক্তি।

জাহ্নবী কি করিয়া আমার মনের কথাটি জানিল জানি  
না।

বলিল একজনকে ভিন্নটা লোকের আহাৰ্য্য ভিক্ষা দিবার  
মত বিশ্বাস এখানকার লোকের নাই।

মনে হইল, কি অবিচারই না এতক্ষণ উহার উপর  
করিয়াছি।

ভক্তনের অসম্বদ দারিদ্র্য তো আমার অজ্ঞাত নয়।

অদ্ভুত সঙ্গীনীটিকে লইয়া ভিক্ষা শেষে কিরি।

ভূখা কুকুরটির মত অন্ধকার বেন অবসন্ন বেলাকে

চিরাইয়া গিলিতেছে.....

তাহার রক্ত উলগার—

আর দূর সমুদ্রের অধীর কলোচ্ছ্বাস।

ক্লান্ত জাহ্নবীর অপরাধ রূপ।

...চাহিয়া থাকি।

ভিতরে মোন সন্ন্যাসী বেন চোখ রাঙাইয়া বলে—

সাবধান বাবাবর, এইবার পথ পিচ্ছিল।

জাহ্নবীকে মনে হয়, ও জটিল—

হয়ত নয়।

একটা লুক্ক গোপন অববব আমার নিকট প্রার্থনার

ভাষার উদ্ভূত হইয়া উঠিতে চার...

কিন্তু পারে না—

স্বকল অর্পনিয়াছিলাম তাহার পরদিনই।

এক অস্থির রেখার এপারে শুধু শুভ্র কেনপুঞ্জ.....

তাহার ক্রন্দন, গর্জন।

জাগ্রত পাথরটি—দেবতাটি কোন আদিম যুগ হইতে  
তাহার তারকাহীন চোখ মেলিয়া অস্থির পানে চাহিয়া  
থাকে—

যেন শুক প্রহরী ; সতর্ক, উৎকর্ণ।

আর তার আছে এক সঙ্গী—পূজারী...

বৃদ্ধ।—কুজ।

একটি চক্ষু বুজিয়া গেছে।

তাহার সঙ্গী চক্ষুটি আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বহুকাল পরে পাষাণের বুকে চেতনার মত তার মর্মভেদী

দীর্ঘনিশ্বাস—

বলিল—

ধর বা ব্যাটা, ধর বা।

মনে হইল পথের বেদনা ও ব্যাধার সহিত এই লোকটি  
সুপরিচিত।

হাসিয়া বলিলাম, আর তুমি ? এই নির্জম বেলোভূমি...

কোন্ আলোয়ার পিছনে ছুটিয়াছ !

পাথরের পিণ্ডটির দিকে সক্রম দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—

ওই আমার হাসিকান্না—আমার জীবন—

অন্ধ চকুটির কোলে এক কোঁটা জল জমিয়া উঠে।

আবার বলিল—

শান্তি, অশান্তি ওই ওপরের দেনেওলার হাতে ছেড়ে  
দিয়ে ঘর বা ব্যাটা।

.. নেহাৎ মানুষলি।

কিন্তু ভিতরে কোন্ খানটা যেন থাকে খাইয়া বিদ্রোহী  
হইয়া উঠিল।

অবসন্ন দেহ ততোধিক অবসন্ন মন লইয়া ভাবিতেছিলাম।

ভজন আসিয়া হাজির।

সুফল পাইয়া তার আনন্দ।

বলে, মানুষের মারা যেখানে সেখানেই তার ঘর.....

চম্কাইয়া উঠিলাম।

বুকটা টিপ্ টিপ্ করিয়া উঠিল।

নিজেকে আশ্বাস দিলাম—

এ মারা নয় এ রোগীর সেবা।

ভজন কিছুক্ষণ আপনার মনে বক্ বক্ করিয়া চলিয়া  
গেল।

...আজ ভাল করিয়া সন্ন্যাসী-সাজিতে হইবে।

কুনিট তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেছি।

দেখি জাহ্নবী হাসিতেছে।

বলিল, ফেলে দিয়েছি...

—কোথায়?

—ওই পুকুরের অতলে।

সে হাসিয়াই আলুখানু—হুঃখ নাই, অল্পতাপ নাই।

যেন একটা মত্ত বড় আমোদ।

অভিমান হইল বুথাই আমি সন্ন্যাসী।

চূপ করিয়া বসিয়াছিলাম। গভীর।

জাহ্নবী আর হাসে না।—

তার মুখখানিতে অদ্ভুত বিষন্নতা ঘনাইয়া আসে।

ওই মেয়েটিকে দেখিয়া বিশ্বয় লাগে।

সেবতার চেলি আমি; সকলের কাছ থেকে পাই  
নির্জলা ভক্তি।

দেহহীন—ওক্, কঠোর।

কিন্তু ও ..।

গভীর রাত্রি

বন্ধ ঘরে অন্ধকার; বাহিরে উৎফুল্ল জ্যোৎস্না।

জীর্ণ ঘরটার গুইয়া আছি।

পাশের ঘরটার ভজন আর জাহ্নবী।

আমার মাথার উপর বাহুড়ের বটাপটু, চাম্‌চিকার  
হুড়াহুড়ি

যেন কার ত্বিত প্রেতাচ্ছা ছট্‌ফট্‌ করে।

.. অশরীরি কারার বুকো কামনা—তুচ্ছ লাগে।

কিন্তু সন্ন্যাসীর...

ভজা আসিতেছিল।

পায়ের উপর দুইটা কোমল স্পর্শ ..

চম্‌কিয়া ডাকিলাম, কেও।

ও শুধু কাঁদে।—জাহ্নবী।

...শিরায় শিরায় প্রতি রক্তবিন্দুর সেকি তাণ্ডব নৃত্য?...

ভয়চ্ছাদিত অঙ্গারের মত কঠোর ব্রতধারীর মেহে কি  
সুগুপ্ত প্রচণ্ড ক্ষুধা! ..

পা ছাড়াইয়া আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইলাম।

মানুষের জন্ম-মৃত্যুর মত রাত্রির বুক আলো, আঁধার  
নিশ্চিন্ত নির্জিকার।

ঘরের ভিতর জাহ্নবীর কান্নার শব্দ।—হাঃকার।

রাত্রির এই শুভ্র সজ্জার দিকে চাহিয়া থাকি।

হঠাৎ জাহ্নবী ছুটিয়া আসিয়া পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল...  
বলিল—

শুধু বল, তুমি মানুষ ..তোমার রক্তমাংসের আকাঙ্ক্ষা  
আছে, তৃপ্তি আছে...

উত্তর দিবার সামর্থ্য।—সে হারাইয়া ফেলিয়াছি।—

চৈত্রের প্রথর রোদের মত চোখের উপর জলিয়া উঠিল  
নারীর দুইটা দিক।—

অক্ষয়ের উপর ককনা।

প্রেম।

কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলাম জানি না।

এক অম্পষ্ট শব্দে ভজনের কক্ষঘারে আসিয়া হাজির  
হইলাম।

ভজন মানুষ—

...সে তখন বীভৎস দৈহিক তৃপ্তিতে মত্ত।

জাহ্নবী দুই হাত দিয়া মুখটা ঢাকিয়া ফেলিল—

আবার পথ; উষ্ম—নিরুৎসাহ।

এক নিপীড়িতা নারীর জীবনব্যপী দীর্ঘনিশ্বাসের মতই  
দীর্ঘ—বেদনাময়।

চলিয়াছি—

## চিরবন্দী

শ্রীহরিপদ গুহ

পদ্ম-পলাশ আঁখি প্রিয়া মম গৃহ-নন্দী ।  
 সুন্দরী ওগো প্রেয়সী মম চরণ তব বন্দি ॥  
 তোমার মধুর হাস্তে,                      বিজলী পুলক লাগ্তে  
 আমারে করেছ গো ভূমি বন্দী ।  
 তুমি জান যে অনেক ফন্দি ॥

( ২ )

আমার হৃদি-সরসী মাঝে  
 তোমার বুকের কমল রাজে ।  
 তোমার প্রেমের মস্তুরে,                      হংস-হংসী সম্বরে—  
 বন্ধ করে দম্বশত লভে গো আজি সন্ধি ।  
 হৃদিপুর-বন্দ্য তুমি মম গৃহ-নন্দী ॥

( ৩ )

বিন্দাধর-চুম্বরত কপ্তুগ্রীবা ভঙ্গে ;  
 শুভ্রকান্তি-পদ্ম গন্ধ তোমার সর্ব্ব অঙ্গে ।  
 তোমার ষাট্ঠ মল্লবলে,                      রেখেছ মোরে চরণ তলে  
 অসাম-অতুল অশেষ তোমার ফন্দি ।  
 আঁখি বাণে তাই করেছ আমারে চিরবন্দী ॥

## মমতার ফুল

## শ্রীশচীন সেনরায়

নেহাত-ই যেন নাছোড়-বান্দা,—হাতের ছবিটা শেষ করে দেবে বলেই।

হাঁ,—মুখ-খানা বা' দিকে আরেকটু ফেরাও তো। এই হচ্ছে—হলো প্রায়—আর সামান্য একটুখানি হলেই চলবে। ফেরাও! ব্যাশ—ঠিক হয়েছে। বাঃ! এখন এ 'পোজ্'টাই ঠিক করে রাখ তো। নড়োনা কিন্তু। অঃ কী চমৎকার!

ঈশ! আমার কিন্তু বড্ড বিচ্ছিন্ন লাগচে। অসিত বাবু আগনি ভারী কড়া লোক তো। মেয়েটা একটু খিটখিটে ভাবে বলে।

ওর চেহারা কেমন মনোরম, শরীরের গড়নখানিও কি মোলায়েম—নিটোল! চোক জোরা ভাগা ভাগা, টলটলা। নিখুৎ ক্লপের লহরি যেন মেহে সারাফণই দোলে। এমনতর যে রূপ তা তো প্রকাশ পাচ্ছে না... লুকিয়ে রয়েছে কিনা এই পঙ্কের মধ্যে! তাই বুঝি পঙ্কেরও জন্ম ঐ পঙ্কেই! অসিত বাবু ভাবেন।

হঠাৎ অসিত বাবু জিগ্গেস করে, আচ্ছা—আজ তোমাকে এত উতলা দেখাচ্ছে কেন? মন যেন ঠিক বসাতে পারছে না। বলবে, কি ব্যাপার?

মেয়েটা শুধোর, তা হয়ত থাকবে—পরে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলিয়ে নেয়। সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে অসিত বাবুর দিকে তাকায়।

অসিত বাবু বালিকার মনের সন্দেহ ভাবটা চট্ট করে ধরতে পারে। একটু খানি ফিক্ করে হেসে বলে, কি গো ঠিক করে উঠতে পারছে না বুঝি বিশ্বাস করবে কিনা সংবাদটা বলতে—না?

ঈশা অবাক হয়ে যায় ওর মনের কথা ধরবার অপূর্ণ শক্তি দেখে।

শেষে সরল ভাবেই বলে, সন্দেহ করাটা বোধ হয় কোন অসঙ্গত হয়নি। সত্যি তো আমরা আপনার সম্বন্ধে

বিশেষ কিছুই যে জানি না। মোটে তো মাস দু'তিন বাবৎ এখানে আছেন এবং অল্প দিনের মধ্যে এ নোংড়া স্থানটাকে কেমন সুন্দর একটা studio করে গড়ে তুলেছেন! এ ছাড়া কত গরীব লোকদের যে আপনি সাহায্য করেন তাও যে আমরা জানি। তাই বলি কি—আপনার মত বড়লোক এমন পাড়াতে এসে থাকবে কেন?—

সে রকম ভাবে মুচ্কি হেসেই অসিত বাবু আবার বলে, আমি ধনী কি করে হবো?—আমি একজন সামান্য চিত্রকর। চিত্রকররা প্রায় সকলেই গরীব থাকে;—তা বুঝি তুমি জান না?

কিন্তু আপনি তো আর গরীব নন;—তা হলে সে দিন পাড়ার ঐ ছুখী ছেলেটা যক্ষা রোগে মর মর হলো শুনে সমুদ্রের ধারে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য পাঠালেন কি করে? এ ছাড়া আরও কত জনকে যে কত ভাবে উপকার করেছেন তার খবর বুঝি আমরা জানি না?

অসিত বাবু যেন একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

আর এক তুলি রং ভর্তি করে নেয়, পরে একবার একটু চোক গিলে জবাব দেয়, দেখ, কথা যখন উঠিয়েছ তখন তোমার কাছে সরল ভাবেই সব খুলে বলচি। বাস্তবিক যদিও আমার অবস্থা তেমন অসচ্ছল না.....। আমি ফ্যাসানওয়ালা স্ত্রীলোকদের বিস্তর ছবি একেছি, রোজগার ও করেছি বেশ এ বাবৎ। কিন্তু হঠাৎ আমি বুঝতে পারলুম আমার ছবিতে এমন একটা কিছু অভাব থাকে বা নাকি খুব মারাত্মক! ঈশা, আমি একজন শিল্পীর মত শিল্পী হতে চাই। ফ্যাসান-ট্যাসান আর ভাল লাগে না। তাই ওসবের সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে এখানেই এলাম;—যাতে গরীব ছুখী পরিবারের সাথে মিশতে পারি এবং খাঁটা জিনিষ গ্রহণ করতে পারি।

বলেই একটু থামে, কি যেন একটু ভাবেও, আবার বলে, আমার মনে হচ্ছে আমি পেরেছি।



শুনে ঈশ্বারও স্বভাবগত সরল মুখ-খানি যেন সজীব, সতেজ হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বসে, মনে কিছু করবেন না—আমিও কিন্তু আপনাকে পুলিশের লোকই মনে করেছিলাম। কোন গোয়েন্দা টোয়েন্দা।

কেন আমাকে সে রকমটা দেখায় নাকি? একটু কৌতুকপূর্ণ স্বরে জিগ্‌গেস করলে।

হুই হাত জোর করে, জীবটা একটু কেটে বসে, মাপ করল। বাক্—আপনাকে বলচি কেন আমি উৎকর্ষা ছিলাম? খালি আমিই না—বাড়ী শুদ্ধ সব্বাই; কারণ আমাদের অমল আজ বাড়ী আসবে—দীর্ঘ ছ' বছর হাজত থেকে।

—হাজত থেকে! অমল কে? ভাই?

—না।

—তবে—বন্ধু?

—আজ্ঞে হাঁ। আমি তাই মনে করি। আমি তাকে জানি তখন থেকে, যখন আমি নাকি একেবারে ছোটটি ছিলাম। ঠান্ডা হাত চালাক চতুর লোক হয়ত এখানে নেই। সত্যি, আমরা তার আসার আশায় চেয়ে আছি।

নিঃশব্দে ভাবতে লেগেছে কত কি। ঈশ্বার বাবার কথা—একটা জুচ্চোর, লম্পট। তার কিনা এই মেয়ে;—কত কমলীয়তা—কত বস্তুতা এই কচি মুখখানাতে। ওকে দেখলে যে কিছুতেই ভাবাও যায় না যে এমন অপদার্থ পিতার ঘরে এমন মেয়ে হয়।

বালিকার পবিত্রতা মাথা চেহারাখানা আরও একবার পষ্ট করে দেখবার জন্য নজর করে, অনুভব করে, হ্যাঁ—যেহেঁচো নির্মলতার আধারই বটে। কিন্তু উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে ওর জীবনটা হয়ত নষ্ট হয়ে যাবে। ও হয়ত ধারণাই করতে পারে না—তার বাবা কি রকম জঘন্য জীবন যাপন করছে।

হঠাৎ অসিত জিগ্‌গেস করে, আচ্ছা ঈশ্বা তুমি যে তখন বসে আমার এমন স্থানে থাকতে দেখে তুমি নাকি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেছলে; কিন্তু সে' রকম ডবল আশ্চর্য যে আমি হয়ে যাচ্ছি তোমার এমন একটা পাড়াতে দেখে। জ্ঞানেন থেকেও তুমি কেমন লেখা-পড়া শিখেছ—

কেমন সুন্দর গাইতে জান, কি মিষ্টি গলায় স্বর। তাই বলি—এ ষায়গাটা যেন তোমাকে কিছুতেই মানায় না—যেমন নাকি মানায় না স্নিগ্ধের মধ্যে মুক্তা।

শুনে ঈশ্বার প্রাণ বিপুল খুশীতে টলমল করতে থাকে। হাসেও।

বাইরের সিঁড়ীতে জুতার শব্দ শুনা যায়। অসিত বাবু ও ঈশ্বা নির্ঝাঁক অথচ উৎকর্ষ—

সহসা গেটের দরজা খুলে যায় বানান্ধ করে।...এক যুবক নিশ্চল ভাবে দরজার নিকট দাঁড়িয়ে। সুন্দর বলিষ্ট চেহারা।

অসিতের ভারী ভাল লাগে ওর পেশল দেহ ও বুদ্ধিমত্তা চোখের দৃষ্টি দেখে। এমন লোক আবার কেন জেল খাটিলো।

অমলের সন্তুষ্ট দৃষ্টি ঈশ্বার প্রতি। সায়ে যে অসিত রয়েছে সে দিকে যেন তার হৃদয় নেই।—

অমল ধীরে ধীরে ঈশ্বার অতি কাছে গিয়ে দাঁড়ায় বলে—ঈশ্বা না? তুমি কি সেই?

—হ্যাঁ। কেন, খুব বদলে গেছি নাকি?

—যখন আমি বাই চলে তখন তো তুমি কত ছোটটি ছিলে! আর এখন যে ঝাঙ্-ঝাঙ্ করে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঈশ্বাই পূরণ করে—কত বড় হয়ে গেছি! না?

অসিত বাবু হয়ত তাদের দুজনের আলাপের মধ্যে থেকে নিজেকে খুবই ফাঁটু মনে করে। নির্জন আলাপ নিশ্চিন্তে উপভোগ করতে দেবার জন্য একটা উচ্ছল দেখিয়ে সরে পড়বার মনলব আঁটে। অমলের নিকট গিয়ে নেহাৎ পরিচিতের মতই নিজের হাতখানা অমলের কাঁধের উপর স্থাপন করে বলে—আপনার সাথে আমার যদিও পরিচয় নেই তবু আপনার কথা আমি অনেকদিন শুনেছি ঈশ্বার কাছে। আপনার উপস্থিতির জন্য আমার খরচায় আজই একটা ছোট্ট-খাট আমোদ করা বাক্। আমি একুনিই বাজারে যাচ্ছি। আমি না আসা পর্যন্ত আপনার এখানে ততক্ষণ থাকবেন কিন্তু।

অসিত চলে যায়।

তারা হুজনেও পাশাশাশি হয়ে বসে থাকে।

—এ লোকটা আবার কে? হিংস্রকে সুরে অমল জিজ্ঞেস করে।

ভাবটা বুঝতে পেয়ে ঈশ্বা খালি হেসে কুটপাট হয়; আন্তে আন্তে ওর অতি কাছে গিয়ে একদম বেঁসেই বসে। পরে বলে—ওঁকে ভয় কচ্ছো কেন? তিনি একজন মহৎ লোক—খুব নামজাদা চিত্রকরও আবার।

অমল আর কিছু বলে না। একবার খালি উদাসীন দৃষ্টিতে 'ষ্টুডিও'র দিকে তাকাল। অকস্মৎ পুলকের তড়িৎ ওর সারা মনে খেলে গেল। জিজ্ঞেস করলে—আরে, তোমারই যে চেহারা একেছেন! সত্যি লোকটা কিন্তু ভারী গুণী।

শুনে ঈশ্বাও অমলের দিকে গর্জিত চাহনিত তাকায়।

—তোমারও তো খাঁটি জিনিস চিন্‌বার বেশ শক্তি আছে দেখছি।

বলেই আনন্দের আতিশয্যে অমলের শরীরের উপর চলে পড়ে, নিজের কোমল পুষ্ট হাত জোড়া দিয়ে ওকে জড়িয়ে রাখে।

অমলও ঈশ্বার ঘন কুস্তলাবৃত মাথাখানি অতি সন্তর্পণে ধরে' ওর পুস্প-পেলব ঠোঁটে একটা মধুর চুমা খেলো।—

আবেশ ও ব্রীড়া হেতু হুজনেরই চোখ বুজে আসে।

পুরাণ অথচ নেহাৎ-ই অকিঞ্চিৎকর একটা ঘটনা অমলকে জানাবার জন্তে ঈশ্বার প্রাণ চায়, বলে—দেখ, দিন পোনার আগে মস্ত বড় একটা দা' ফসকে গেছে। সেদিন রাত্তা দিয়ে একটি লোক হীরার আংটি আর মূল্যবান চেন পরে বাজিল। দেখে আমরা ক'জন মিলে কত কারসাজী করলুম ওটা মারতে। তুমি তো ছিলে-ই না—বাবাও অল্প কাজে আরেক ব্যয়গার গেছলো। মেঘনাথ কিন্তু লোকটার পেছনে ভারী লেগেছিল,—খুব খেটেও ছিল, কিন্তু কোন ছরাহা আর করা গেল না।

ঈশ্বার বতখানি উৎসাহ লাগছিল অমলকে শুনতে—অমলের কিন্তু ভতখানি বিশ্বাস লাগছিল সে-সব শুনতে।

তাই কি ঈশ্বা কিছুকণ অমলের প্রত্যেক হাব-ভাবের দিকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে?—কেন যেন অমলের চোক মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে, কি একটা কইবে কইবে করে-ও যেন কইতে পারে না, সরবতের গেলানটা ধুপ্ করে ধুয়ে দিল অল্প একটুখানি খেয়েই ইত্যাদি।

কৌতূহলী ঈশ্বা অমলকে জিগ্‌গেস করে—তোমাকে আজ এমনতর লাগ্‌চে কেন? কোথায় এদিন পরে এলে একটু আমোদ আহ্লাদ করবে—তা না তুমি যেন একেবারে চুপ্‌মেয়ে গেলে..... বল না কেন?—

অমল খালি ঔদাসীন্যভাবে মাথাটা নাড়ে, তারপর উত্তর করে—আমি আর এসব কাজ কখনও করবো না,—বল, তুমিও করবে না। তোমার বাবা একজন কেমন লোক...; তুমি তার মেয়ে,—কিন্তু তোমার প্রকৃতি তো সে' রকম মোটেই না,—ঠিক শিশুর মতন নরম ও পবিত্র।

হেসে হেসে ঈশ্বা বলে—আচ্ছা গো রাখ, সাম্নে প্রশংসাটা আর না-ই বা করলে!

—আচ্ছা বেশ! আমি কখনও এসব জঘন্‌ম কাজ করোঁ না। বুঝলে?

—ওমা! কি যে বল! আমরা তো আরও কত কিছু জল্পনা-কল্পনা করে রেখেছি, তুমি ফিরে এলে আমরা হ'জনাতে মিলে কত রোজগার করবো!

—ঈশ্বা, ভগবানের আমার উপর বড়ই অমুগ্‌দহ—ঠিক সময়েই এই জঘন্‌ম জীবন ব্যাপন থেকে তোমাকে রক্ষা করোঁ আর সুযোগ আমায় দিয়েছেন। ওঃ এসব হৃদয়ের দক্ষণ কি সব ভয়ানক ভয়ানক শাস্তি যে চোকের সাম্নে দেখেছি! আমার ইচ্ছা—এস আমরা দুজনে একত্র থেকে সৎকর্মে জীবন কাটিয়ে দি।'

বলেই ঈশ্বার খুব কাছে গিয়ে ওর হৃদয়ের চুলগুলোর উপর হাত বুলাতে বুলাতে আবার বলে—লক্ষীটি! আমার কথা রাখবে না? আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি—

ক্রুদ্ধ অন্তরে নিশ্চুপে অমলের কথা শোনে, সহসা হেচ্‌কা টান ঘেরে অমলের হাতখানা সরিয়ে দেয়, তারপর তার স্বরে বলে' উঠে—ঈশ্! তারকথা আবার রাখবে! বোকা ভিক কোথাকার—যাও! খালের আবার বান ডাকতে

ইচ্ছা করে! যেখনাথ চের ভাল! বলেই ঝাঁ করে বের  
হয়ে গড়ে ঘূর্নী বায়ুর মত।

অমল হতবাক ও হতভম্ব।—

অবস-তবস ব্যক্তির মতন হাত ছুটো ছড়িয়ে দিয়ে বসে  
থাকে চেয়ারের উপর।

কি একটা ব্যাপারে আটকে গিয়ে অসিত বাবুর ফিরতে  
দেয়ী হয়। এসেই অমলকে ঐ রকম অবস্থায় বসে থাকতে  
দেখে বড়ই অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—আপনার  
কি হয়েছে? এম্মি ভাবে বসে যে? ঈশ্বাই বা কোথায়?

অসিত বাবুর সহায়তূতিপূর্ণ কথা শুনে অমল চোক  
তুলে তার দিকে তাকায়। তারপর কিছুক্ষণ বাদে সে জবাব  
দিলে—দেখুন, জেল হ'তে মুক্ত হয়ে এসেই জানলাম যে  
অসভ্যের দল আমার জন্ত একেবারে খাঁপ্ পেতে বসে  
আছে। আমি ঈশ্বাকে যখন বললাম যে এসব খারাপ সঙ্গে  
আর আমি থাকবো না—সহপায় হারাই জীবন কাটাও,  
তখন ও আরও আমাকে বাঁধা দিতে চাইলে। কিন্তু  
টল্লুম না দেখে আমার সাথে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে গাল  
দিলে—আমি নাকি ভীতু, বোকা! বলেই হ' হাত দিয়ে  
মুখ চোক ঢেকে ফেলল। পরে ফের কান্না ভাঙ্গা সুরে বলে,  
আমি যে ওকে ভালবাসি। ওর বিচ্ছেদ যে আমার  
একেবারে পাগল করবে! ওদের দলে থাকলেই হয়ত ভাল  
হতো—অজ্ঞাতঃ ঈশ্বাকে তো হারাতাম না।

অসিত তাকে বুঝ দিয়ে বলল—বুকে বল নি। যা ভাল  
বলে জানবেন তাই গ্রহণ করবেন।

অসিতের উপদেশপূর্ণ কথা শুনে সে কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে  
তার দিকে নোয়া মাথা তুলে চাইলে, ওর কথা শুনে মন  
দিলে।

—জুছোর জীবনরাম ওর বাবা—তাই ও হঠাৎ তার  
বাবাকে ছেড়ে আসতে পারে না। ঈশ্বা এত সরল যে  
শঠতা বাক্য বলে সে অভিজ্ঞতাই ওর একদম দেই।  
ব্যাপারটা যখন ও বেশ বুঝতে পারবে তখন নিশ্চয়ই ও ফিরে  
আসবে।

—হ'তে পারে;—কিন্তু আমি যে চাইসে ওর সেই  
অভিজ্ঞতা হউক। জেলটাকে আমি বড়ই ভয় করি।  
দেখুন জেলে একজন খুব ভাল লোকের সাথে আলাপ  
হয়েছে। লোকটা একটু প্রবীন কিন্তু তবু আমি তার সাথে  
খুব ঠাট্টা তামাসা, গল্পগুজব করতাম। তার নাম গজেন্দ্র।  
তিনি একজন নামজাদা ব্যাকার ছিলেন। প্রায় ১৫ বৎসর  
যাবৎ জেলেই আছেন। ওর অংশীদারই তাঁকে বিপদে  
ফেলেছে। খাম্বা ওর বিচ্ছেদে তবিল তছরপের চার্জ আনে।  
রক্ষা পাবার জন্তে তিনি ওর অনেক ব্যবস্থা করেন। কোন  
লাভ হলো না। পরে একদিন আকসিৎ গিয়ে অংশীদারের  
সাথে সাক্ষাৎ করে এককথা ছ' কথার পর বেশ হাতাহাতির  
পালা গড়ে উঠলো। রেগে গিয়ে তাকে তিনি গুলী  
করলেন; সৌভাগ্য বশতঃ মারা পড়েনি—কিন্তু সাম্বাতিক  
জখম হয়। তাই পোনার বছর কারাদণ্ড। ওদের দলে  
থাকলে তো আমাকেও আবার কত লোকের প্রাণ নষ্ট  
কর্তে হবে! ওঃ এসব কথা মনে করলেই আমার চোকের  
উপর ভাসতে থাকে ফাঁসি কাঠ, জেলের পৈশাচিক  
অত্যাচার। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আর কখনও  
ওদের সঙ্গে নোব না।

—তা বেশ। আর কখনও ঐ পথে যাবার নামও  
করেন না। যাক, আপনি যদি কোন সাহায্য চান তা আমি  
আপনাকে খুশীতেই করোঁ।

শুনে কৃতজ্ঞতার অমলের মাথাটা নুয়ে গেল।  
রা করতে পারে না তাই।

—আচ্ছা আপনার বন্ধু কবে জেল হ'তে বের হয়ে  
আসবেন? তাঁরও যদি কোন সাহায্য দরকার মনে করেন  
আমি তাও কর্তে রাজী আছি।

—খুব শীগগীরই মুক্তি পাবেন। আমি তাকে কথা  
দিয়েছি—ওর খালাস হবার দিন আমি তার সঙ্গে দেখা  
করবো। ওরে বাবাঃ! মনে করতে ডর এখনও লাগে  
কি সব ভীষণ ভীষণ কথা আমাদের কাছে তিনি বলতেন।  
একটা কিন্তু সৌভাগ্যই বলতে হবে—ওর এই অপমানের  
কিছুদিন আগেই স্ত্রী মারা যান—একটা কস্তা প্রসব করেছে।  
জেলে যাবার আগে তিনি তার মেয়েকে পুষন করার ও

সুশিক্ষার জন্ত তার একজন বন্ধুর হাতে এই প্রতিজ্ঞা করে  
সুপে মেন—মেরেটীকে যেন কক্ষনও তার বাবার পোড়া  
অঙ্গুষ্ঠের কথা জানতে না দেওয়া হয়। কি আশ্চর্য্য!  
নিজের মেরের কাছেও আত্মগোপন করলে!

তার কথা শুনে কি চিন্তা করতে করতে যেন অসিত বলে  
—এ সংসারে কত রকম কাণ্ড ঘটতে যে!—একটু ধামে,  
আবার বলে—দেখুন, কাল আপনাকে আমি এক বন্ধুর  
কাছে নিয়ে যাব। আপনি যতদিন কোন ভাল ফিকির  
করতে না পারেন ততদিন শুধানেই লেগে থাকবেন—কেমন?

অসিত ক্রোম হ'তে ঈশ্বার অসমাপ্ত আঁকা ছবিটিতে  
হুঁচরবার তুলীর পোঁচ দিলে, এগিয়ে পিছিয়ে গিয়ে আবার  
কিছুক্ষণ ছবিটা ভাল করে নজর করে দেখলে, পরে আন্তে  
আন্তে ওটা ঢেকে রাখলে।

বড় রাতায় গিয়েই একটা টেক্সী ডেকে উঠে পড়ল।—

টেক্সী চলতে থাকলো বেদম, বেহুস চলতি। নিমিষের  
মধ্যে ঐ স্থানটা পেছনে পড়ে গেল।—

মটর একটা স্কোয়ারের ধারে মস্ত একটা বাড়ীর দ্বারে  
এসে জিরুতে লাগলো। বাড়ীটা দেখে অমল আশ্চর্য্যে  
অভিভূত হয়ে গেল, তাবলে—অসিতবাবুও নিশ্চয় খুব  
ধনী; কারণ তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবও যখন এত  
বড়লোক।

অসিত দরজার সামনে এসে নিজের আগমনবার্তা জানায়  
আন্তে আন্তে কড়া নেড়ে।

দরজা খুলে গেল। একজন চাকর বেরিয়ে এল,  
অসিত বাবুকে দেখেই বিনীত নমস্কার জানিয়ে সসন্ত্রমে  
কোঠার নিরে গেল।

—বিচিত্রাদি বাড়ী আছেন তো? চাকরটাকে জিজ্ঞেস  
করলে,—নিজের গায়ের চাদর ও ছড়ি তার হাতে রাখতে  
দিয়ে। তাবটা এমন—এ বাড়ীও যেন অসিতবাবুর  
নিজেরই।

একটু পরেই একজন যুবতী দোতারা থেকে নেমে  
দীচের কোঠার দিকেই অসিতের দিকে চেয়ে এক নিশ্বাসে

বলে—অসিতদা, তোমার জন্ত ভেবে ভেবে হরমাম।  
আচ্ছা, বল দেখি ঐ নোঁড়া স্থানটা কবে ছাড়বে? কি  
করে যে রয়েছ এমন একটা বিচ্ছিন্নী যারগার! ঘেরাও  
করে না?

প্রায় একমাস বাদে অসিতকে কাছে পেয়ে বিচিত্রার  
মন খুলিতে টুপ-টুপ। আদরহেতু অসিত নিজের হাতখানা  
বিচিত্রার হাতের উপর সংস্থাপন করতে একটুও কুণ্ঠা বোধ  
করে না।

অসিত আরেকটু বিচিত্রার কাছে সরে গিয়ে বলে—বাক,  
কাজের কথা বলি। একটা বন্ধু বড়ই বিপদে পড়েছে।  
তাকে তোমার একটা হীলা করে দিতে হবে।

তক্ষুনিই বিচিত্রার দ্বিগু-কালো-চোক জোড়া দিয়ে  
অমলকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে নেয়।

একটা সুন্দর ফুটফুটে ছেলে দোড়ে এসে অসিতের হাত  
খানা ঝাকুনি দিয়ে বলে—কখন এলেন দাদাবাবু?

—এই ত কতক্ষণ যাবৎ। কোথায় ছিলি? দেখ  
তো কালু, একে তোমার মাষ্টার রাখতে পছন্দ হয় কিনা?

বালকটা অমলকে সামনে দেখেই তার অভিমত জানাবার  
জন্তে অসিতের অতি কাছে যায়, খুব অক্ষুট স্বরে বলে—  
আচ্ছা।

অমলের প্রতি চেয়ে অসিত বলে—আপনি তবে এখানেই  
থাকুন। আপনার সেই বন্ধুর জন্তও একটা কাজ ঠিক করে  
রেখেছি। উনি খালাস পেলেই আমার জানাবেন।

অসিতের কথা শুনে অমলের হুঁচক দিয়ে যেন  
কৃতজ্ঞতার একটা স্পষ্ট ছোপ ভেসে ওঠে। হরত তাবে—  
হুঁদণ্ডের আলাপে পরিচিত আমি—আমার জন্ত তিনি কতটা  
কষ্ট স্বীকার করেছেন। এই পাপী সংসারে এমন মহান  
উদারচেতা ব্যক্তিও আবার থাকেন।

গজেন্দ্রর খালাস পাবার দিন এসেছে।—

অমল সকাল বেলা জেলের দরজার গিরে দাঁড়ায় ওর  
সাথে দেখা করবার জন্তে। দেখা হয়। সিরে আল  
সাথে করে ওর ওখামেই।

বিচিত্রাও তাকে বিশেষ আদর আপ্যায়নদ্বারা গ্রহণ করেন। গজেন্দ্রকে দেখে ওর বড়ই হুঃখ লাগে। ভাবে—গজেন্দ্র-ই যেন মানব জীবনের দারুণ করুণতার আত্মল্যামান আদর্শ। পোনারটা বছর হাজত খেটেছে।.....কত রকম জালা-যন্ত্রনা, আত্মদ্রোহ এবং মৃত জীব ও বিষাক্ত অতীত স্মৃতির দংশন করে করে এমন বিশাল বলিষ্ঠ দেহটাকে কেমন কাঠখোঁট্টা,—কড়াতি করে দিয়েছে!

একটা হুঃখ-ভরাট দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বিচিত্রাকে বলে—মা, দেখচো কি? আমি একটা মানব জীবনের পচা কীট। হুঃখের সাথে মিতালী পাতিয়েছি—তাই ও আমাকে ছাড়তে চায় না। মা, এত হুঃখও আমার এক শাস্তি যে আমার একটা মেয়ে কোন একখানে আছে হয়ত। ও যদি এখনও বাঁচা থাকে তবে হয়ত তোমার মতই এতখানি হবে।

বলতে বলতে গজেন্দ্রের চোক ত'টো সজল হয়।

বিচিত্রা তার কথা শুনে যেন গলে গেল। ভেবে চিন্তে গজেন্দ্রের জন্ত একটা কাজ নির্ধারণ করলে। ওর মস্ত বড় বাগানের ও বাগানবাড়ীর ম্যানেজার করে দিলে।

চাকরীটা ও স্থানটা ওর বাসনা-বিহীন মনের সাথে খাঁপ যায়;—নিম্নকর্তাপূর্ণ বলেই। সে নিম্নকর্তা মাঝে মাঝে ভাঙ্গে কৃত্রিম বর্ণার কল-কল তানে, বোকখা-কও পাখীর 'কথা কও কথা কও' বলে একটানা আকুল কাকুতি মিনতিতেই।

ব্যর্থ জীবনে আনন্দের ক্ষীণ আশ্বাদ পায়। এক রকম আশাতীতই বটে।

এতে অমলের একটু আধটু অসহ্য লাগে; এরকম লাগাটা খুবই—স্বাভাবিক—আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।—যে হেতু অমলের মনে যে এক মহত্ত্বের জন্তও সোয়াস্তি নেই। জৈঙ্গার অহরহ চিন্তাই যেন ওকে ভয়ানক জালা দিচ্ছে—যেন শত সহস্র দাবানল জ্বলে।

এদিকে আবার ভূমল-বাস্ততার ব্যাপার অমলের উপর। অসিতের আঁকা চিত্রগুলির এক প্রদর্শনী হবে তার প্রায় সমস্ত ভারই ওর 'পরে জন্ত। সে জন্ত খুব খাটুনি খাটুতে হচ্ছে;—নেমস্তর চিঠি ছাপতে হবে, ওসব আবার

নামে নামে পাঠাতে হবে, ছবিগুলোতে পছন্দ-সই স্ক্রেম লাগাতে হবে। এত কাজ—তার মধ্যেও জৈঙ্গার কথা তুয়ের আঙুনের মত গুৎগুৎ করে সর্ককণ জ্বলেছে!—বাদ নেই!

প্রদর্শনী আরম্ভ হবার আর মোটে দু'দিন বাকী। কাজ কর্তব্য সব প্রায় একরকম শেষ।

মলয়ের কোঠায় বসে অসিত নিমজ্জিত ভদ্রলোকদের জন্ত একটা লিষ্ট কচ্ছে। মলয় কোঠার ঢুকে বলে, মাঠার বাবু, একটা নেমস্তরের চিঠি এই ঠিকানায় দয়া করে পাঠাবেন, বলেই পকেট হ'তে একটা ঠিকানা লেখা কাগজ ওকে দেয়।

অমল খানিকক্ষণ ঐ ঠিকানার দিকে স্থির চোকে চায়। ওর মন যেন বারবারই বলে—এই অশ্রু দেবীই আমার অন্তরের ধন জৈঙ্গা। পরক্ষণেই আবার ভাবে, ছর ছাই, ছনিরায় কত শত অশ্রু নামে যে মেয়ে আছে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, বিচিত্রা দেবী কি এ'কে জানেন?

—না। আমার সাথেই যে মোটে এক হুণ্ডা বাবৎ খাতির হয়েছে। কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যেই ও যেন আমাকে ভারী মুগ্ধ করেছে। বলেই অতি গুরুতরে নিজের বুকের উপর আঙু আঙু দু'তিনটা খাবড়া মারলে।

একটু টিপ্সনী কেটে অমল বলে, মেয়েটা নিশ্চয় খুব সুন্দরী। এক কাজ করুন না—তাকে বিয়ে করে ফেলুন না?—

—হাঁ, মাঠার বাবু, খুবই সুন্দরী! অতিশয় গুরুতরে মলয় তার পকেট থেকে একটা কটো বের করে অমলকে দেখতে দেয়।

অমলের মাথার উপর যেন সারা আকাশটা ভেঙ্গে পড়ে আর কি। সত্যিই তো, তার অসুমান যে ঠিকই! জৈঙ্গার জন্ত একটা নাম যে অশ্রু! আগে যদি এসব সে জানতো তা হলে অসিতবাবুর আঁকা তৈল চিত্রটা তো প্রদর্শনীতে জুড়ে দিত না!

মলয় কটোটা নেবার জন্ত হাত বাড়ায়, বলে, দিন তো। ওঃ বজ্র ঝুম পাচ্ছে—ভুতে বাই। একটা কার্ড ওকে পাঠাতে ভুলবে না কিন্তু!

অমল ভাবে কত সব আশঙ্কার কথা। খুব জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। অপলক, উদাস, অর্থহীন দৃষ্টি বাইরের দিকে পড়ে। তারাগুলি রয়েছে নিকষ কালো আকাশটার বুকের উপর ঝুলে ঝুলে। কৃষ্ণা রাতের বৃক-কাটা চাঁদ আন্তে ধীরে উঠতে লেগেছে—বড় মন্থর গতি ওর। ছিন্ন মেঘের বহর সাগরের ঢেউএর মতনই চলে' যায় এক মনে ;—কোথায়—কে জানে !

কোন রকমে ওর চকল মনকে স্থিতির করে, ভাবে অসিত বাবু তো আমার কথা সব জানেন। তিনি তো আর আমার সাথে প্রবঞ্চনা করবেন না !

প্রদর্শনী আরম্ভ হচ্ছে।—

বাছ-বাছা কার্যদাহরন্ত দর্শকের ভির। বাজে খেলো লোকের ভির না কিন্তু।

অমল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিকিট নিচ্ছে, আর দেখতে বাজে বেনিমন্ত্রিত লোক যেন না চুকতে পারে।

খানিকক্ষণ বাদে ঈশ্বা আসচে দেখতে পায়, ওর প্রাণের মধ্যে আনন্দের প্রচুর শিহরণ দিতে থাকে।

আজ তো ঈশ্বাকে খুব চমৎকার দেখাচ্ছে। যেন সৌন্দর্যের কিরীট। আজ যদি সৌন্দর্যের প্রদর্শনী হতো তা'হলে ও-ই হয়ত এখানে প্রথম স্থান পেতো।

বী। করে মলয় এসে জিগ্গেস করে—মাষ্টার বাবু, দিদি কোথায় ? সেই অশ্রু দেবী এসেছেন, তাকে সাথে আলাপ করিয়ে দিতে হবে।

অমল উত্তর করে, কতক্ষণ আগে ঐ কোনার ঘরে অসিত বাবুর সাথে কথা বলতে শুনেছি। আপনি ওকে খুঁজে আনুন ততক্ষণ আমিই ওর সাথে আলাপ করছি।

দূর থেকে পরিচিত স্বর শুনে ঈশ্বা চমকে যায়, সামনে এগিয়ে গিয়ে অমলকে দেখেই ওর মুখখানা ফ্যাকাসে হলো। কাঁপা স্বরে জিগ্গেস করে, অমল ! তুমি যে এখানে

—হ্যাঁ। বিজিতা দেবীর অধীনে চাকরী করি যে। খেমে একটু চোটকা স্বরে খোঁচা মেরে বলে, আচ্ছা ভালই আছি। তোমার সাথে কার কথা ;—না ঈশ্বা ?

আহত হয়ে কুপিত স্বরে জিজ্ঞেস করে—তুমি কি মনে কচ্ছো ?

কই—না, কিছু না। এই ধর না এক হণ্টা বাদে অসিত বাবু হবেন মলয়ের ভারী ভয়ীপতি ; আর তুমিও তখনই হবে কিনা—এই যে গিয়ে—মলয়ের অধ্বাঙ্গিনী। মনে হয় এতে তোমার যেন একটুও মত নেই। কেমন ঈশ্বা ?—

অমলের চোটকা চোটকা কথাগুলো যেন ওকে সপাং সপাং করে চাবুক মারলো।—এমনতর কড়া ব্যঙ্গ সে জীবনে কক্ষণও শোনে নি। ছুখে, ক্ষোভে ওর সুন্দর গোলাপী মুখ কালচে মেরে গেল।.....

এক এক করে লোকজনের ভির বাড়ে। ছবির কাছে জড় হয়। মহা ব্যস্ততার সাড়া পড়ে।—ছুটাছুটা দৌড়াদৌড়ি।

মলয় আর বিজিতার সাথে অসিতকেও আসতে দেখে ঈশ্বা যেন ভাবাচাংগা লেগে যায়। একটা ভীতিকর চিন্তা এসে ওর মনকে আচ্ছন্ন করে। অসিতের সাথে চোখাচোখি যখন হবে তখন ? সে কি ভাড়াভাড়ি কোথায়ও পালাবে ?.....

মলয় কাছে এসেই সুরাজ্জড়িত স্বরে বলে—মিস্ ডট্ট, এই আমার দিদি। এ ছনিয়ায় তুমি আর দিদি ছাড়া আর কেউ আমার আপনজন নেই।

বিজিতা মলয়ের ভাব দেখে ঈশ্বার অলঙ্কিতে একটু চোক পাকিয়ে শাসায়। পরে ঈশ্বার হাতখানা সাদরে চেপে ধ'রে মুহু স্বরে বলে—ভাই, তোমার মত সুন্দরীর জন্ত আকুল হওয়া মলয়ের পক্ষে আশ্চর্যের ব্যাপার কিছুই না। একবার একটু মুচকি হেসেই ঈশ্বার প্রতি অমুসন্ধিগ্ন ত থাকায়।

ঈশ্বা কিন্তু কোন কথা কয় না। কি' করে একটু হাসলে—বার দেখান হাসিই যেন। বিজিতার ইজিতটা বুঝতে পেরে ওর মগজ বন বন করে ঘোর। এমন একটা কাণ্ড দাঁড়াতে তা যে সে কক্ষণও ভাবেও নি।

মুখে যদিও প্রকাশ করে না—কিন্তু ওর মনপ্রাণ যে সতত ছটকট করে অমলের জন্ত।—শেষে না কেন আবার

কোন রকম ঘোর-প্যাচে পড়ে একটা উচ্ছ্বল মাতালের সাথেরেই একটা রাহাজানি কাণ্ড ঘটে' বসে। এসব কথা ভেবে ভেবে ওর মন বড়ই ব্যাকুলিত। এখন ওদের কাছ থেকে ফাড়াঙ্ থাকতে পারলেই ও বেন পরিজ্ঞান পায়।

মতলব জাঁটে। লুকিয়ে লুকিয়ে খোঁজাখুঁজির পর দেখে বাগানের একটা দরজা খোলা।

ওদিকে বার।

এখানেও যে সে একা না। দেখে একজন লোক,— একটা চারা গাছের ডাল ছুরিয়ে বেন কি কচ্ছে।

পারের শব্দ শুনে সে পেছনদিকে ফিরে দেখে ঈঙ্গাকে।

লোকটা তার কাছে আসে। সন্তুষ্টভাবে ঈঙ্গা বলে— আমার শরীরটা খুব বমি বমি কচ্ছে, তাই এখানে এসেছি। এক মাস জল দিন না, খাব।

—স্থানটা খুব নির্জন ও শান্তিপূর্ণ। লোকটা বলে। পরে এক মাস জল এনে ওকে দিলে।

ঈঙ্গা একটু সুস্থ হলে লোকটাকে ভাল করে দেখে নেয়। কি একটা বৈশিষ্ট্য বেন লোকটার মধ্যে আছে। তার সাধা চুল, পাণ্ডু বিবর্ণ মুখ, কোটরগত চোকের ছঃখিত দৃষ্টি। ও ভাবলে, কোথায়,—কখন যে তাকে ও দেখেছে,—হরত বা সপ্নেই।

সরল হাসি হেসে বুদ্ধ বলে—তুমি কিন্তু খুব সুন্দর। আমার ভরানক ভাল লাগে তোমাকে দেখতে। একটু খেমেই একটা প্রকাণ্ড নিশাস ছেড়ে আবার বলে—মা, তোমার চেহারাটা দেখে আমার মৃত পত্নীর কথা মনে করে দেয়।

লোকটার ভদ্রোচিত অর্ধচ মায়ায় কথা শুনে ঈঙ্গা অতি সহজেই তার পরে বেন বিশ্বাস স্থাপন করে। পরে সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলে—খুব ছঃখ লাগলো যে আপনি বিপন্নীক। কোন ছেলেরপিলে আছে না?

একটা অপূর্ণ দীপ্তি বেন ভেসে ওঠে বুদ্ধের চোকে, বুধে।—

—হাঁ, একটা মেয়ে আছে মাত্র।

—খুশী হলেম।

আতুল দিয়ে চোক ছুঁটো ডলে, মুহূর্তে বলে,—কিন্তু সে যে আমাকে চেনে না।

—সে কি! চেনে না!

ঈঙ্গা হঠাৎ আংকে ওঠে।—ভাবো, এ কি রকম ব্যাপার! কেমনতর লোক! কিন্তু তবু—সে বেন বীরে বীরে মায়ার বাঁধনে আকর্ষণ করে।

—একজন লোক যদি পোনারটী বৎসর কারাবাসে থাকে তা' হলে সে কি আর কিংবদন্তি দেখাতে পারে?— যদিও সময় সময় দেখবার জন্ত একটা দুর্দমনীর আকাঙ্ক্ষা জাগে তবুও—

—পোনার বছর!.....আর বলতে পারে না। বীর বীরে নিশ্বাস আটকে আসে বেন।.....তার জীবনের আধ্যাত্মগুণিও বেন আংশিক ভাবে এই বুদ্ধের করুণতার সাথে মিলে যায়। পাড়ার এক বুদ্ধো পিসির কাছে সে একদিন শুনেছিল তার জীবনের একটুখানি কাহিনী।

—বলবেন কি আপনার মেয়েটা কোথায়? একটু ব্যস্ত কঠে জিগগেস করে।

আবার সেই পুরাণ স্মৃতির ক্ষীণ আলোটুক ভেল গেয়ে বেন দাঁড় দাঁড় করে জলে উঠলো।

কারা-ভাঙ্গা স্বরে বলে—বেশ নিরাপদেই আছে হরত। আমার বাবার আগে ওর সুবন্দোবস্ত করেছি। বিষয়-আশর যা ছিল তা সমস্ত ওর নামে লিখে দিয়েছি। এক বছর তত্ত্বাবধানে রেখেছি।

শুনতে শুনতে ঈঙ্গার হাস-প্রশাস অভ্যন্তরীণ গতিতে বইতে লেগেছে—, মাঝে মাঝে বেন রুদ্ধ হয়ে বেতে চার। চিন্তা, স্মৃতি, কোন-একদিনের-দেখা একটা আশ্চর্য সপ্ন, বুড়ো পিসির কথাগুলি সব একত্রিত হয়ে মগজের মধ্যে বেন হিজিবিজি করতে থাকে।

খুব অসহিষ্ণুভাবে ঈঙ্গা শুধোর—করা করে আপনার বছর নামটা বলুন না? আমি বোধ হয় আপনার মেয়েকে চিনি। তার সবকিছু আমি হরত অনেক কিছু সংবাদ দিতে পারি

গজেন্দ্র ব্যখিত।—

সে তো অনেক কথাই বলে কেশেছে। আর না।

...কিন্তু প্রলোভনের ভেজ যে কত তীব্র!...

—প্রতিজ্ঞা কর তুমি কখনও তাকে আমার কথা জানাবে না।

ঈশ্বা খালি মাথাই নাড়ে।

—তার নাম জীবনরাম দত্ত। তুমি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছ খুব গোপনে রাখবে।

—জীবনরাম! আমি ছাড়া আর কোন মেয়েই যে নেই ওখানে। তবে কি আমার ধারণাই সত্য, সেই পিসির কথা, সেই সত্য? কাঁপা কণ্ঠে বলে।

—হাঁরে, সবই সত্য—সবই সত্য! তুই-ই আমার মমতার ফুল—তুই-ই! পলক-গদগদ সুরে বলেই ঈশ্বার অতি কাছে যায়; হৃদয় বাড়িয়ে ওকে চেপে ধরে রাখে।—আর বারে বারে ওর মুখের দিকে স্থির চোকে তাকিয়ে তাকিয়ে খালি দেখে...

অমল ঈশ্বাকে কোথাও না দেখতে পেয়ে বড়ই চিন্তিত হয়।

খুঁজতে খুঁজতে বাগানের দরজা খোলা দেখেই চোকে।

অবাক হয়ে যায় ঈশ্বাকে এরকম অবস্থায় বাগানের মধ্যে দেখে। কোতুলকের অতিশয্যে গজেন্দ্রকেই জিজ্ঞেস করে—আমি যে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নে—কি ব্যাপার! বলুন না। তারপরে গজেন্দ্রর উত্তরের জন্ত সবুর না করেই ঈশ্বাকেই বলে—ঈশ্বা! তুমিই বল না কি হয়েছে? এমন—দেখাচ্ছে যে?

তবু গ্রীবা তুলে অশ্রু-ভেজা চোকে স্থির ভাবে বিবাদ চাহনি চায়, একটু পরে মুহুঃ সুরে উত্তর করে—এসো না লক্ষ্মী! এই আমার বাবা। আলাপ কর না বাবার সাথে?

—এস অমল। কাছে। আমার হারাণ-ধনই যে তোমার ঈশ্বা। দেখ বন্ধু, আজ আমার কত সুখের দিন। গম্ভীর অধচ মমতা-মাখা-সুরে গজেন্দ্র বলে।

তারপরে বড়ো মনে মনে হয়ত এক বোঝা কথা ভেবে ফেলে,—অমলের ঈশ্বাই যে শেষে আমারই অশ্রু হয়ে গেল।—ওর কথা তো অমল আমাকে জেলে থাকতে কত বলেছে। কথাগুলো আমারও কত যে ঠাট্টা করেছে। তারপর উপর দিকে চেয়ে হৃদয় তুলে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে—ঠাকুর! বড়োকে শেষ সময় একটু শান্তি দাও—ওদের মধু-মিলন দেখতে দাও, ওদের সংপথে থাকবার সুমতি যেন চিরকাল থাকে।

... ঈশ্বা অবাক, কোতুলী, জিজ্ঞাসু।

অমল ঈশ্বার ভাব বুঝতে পারে, জিজ্ঞেস করবার আগেই বলে,—তোমার বাবার সাথে আমার আলাপ তোমারও আগে। ওনিই আমার সংপথে থাকবার কত উপদেশ দিতেন।

বড়ো কি একটা ছুঁতো ক'রে ওখান থেকে সরে যায়।—

—লক্ষ্মীটি, তোমার সাথে যে কত হর্য্যাবহার করেছে! ওসব ভেবে কত দুঃখ পাই! ভুলে যেরো সব!—কেমন? অনুসোচনার সুরে ঈশ্বা বলে।

—কেন অনর্থক দুঃখ পাচ্ছ আগের কথা ভেবে?...

আন্তে আন্তে ওর এলান দেহখানার 'পরে নিজেকেও সজ্জনে ডুবিয়ে দেয়, হৃদয় দিয়ে ওকে শক্ত করে জড়ায় যেন মিশে যাবে। পরে ঈশ্বার অশ্রু-ভেজা চোকে চুমা দেয়, পেলব ঠোটে, তুল-তুলে গোলাপী গালেও।...

ভালবাসার মতন কোমল, সুচারু বুকে অমল নিজের মুখ গোঁজে : শেষে ওখানেও চুমা.....!\*

\* ইংরাজীর অনুবাদ।



## বিক্রমপুরের পুরাণ কথা

।হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞাবিনোদ সাহিত্যরত্ন

চৈত্র সংখ্যার “বীণা”—“বিক্রমপুরের পুরাণ কথা” আদিশূরের ইতিহাস সম্বন্ধে কলিকাতা হইতে কতিপয় ঐতিহাসিক কয়েকটি প্রশ্নের উল্লেখ করায় আমি বাধ্য হইয়া—আদিশূরের সময়ের সেক্ষণ কোন ইতিহাস অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করিতে না পারায় বৈশাখের সংখ্যায় প্রকাশ করিতে পারি নাই।

Mr. Vincent Smith, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ‘ফুট নোট’ দেখিয়া বত দূর খুঁজিয়া পাইয়াছি তাহাই লেখা গেল। পরে আরও অনেক বিষয় প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

অশোকের সময় হইতে আদিশূরের রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রবল ছিল। এমন কি এই দেশ হইতে বৈদিক ক্রিয়া কলাপ ইত্যাদি এক প্রকার লোপ পাইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। মহারাজ আদিশূর প্রথমতঃ কনোজপতি হিন্দুরাজ বীরসিংহের নিকট পাঁচজন সূত্রাঙ্গ চাহিয়া পাঠান।

কান্তকূজ হইতে সূত্রাঙ্গ তীর্থযাত্রা ব্যতীত বাঙ্গালা দেশে আসিতে চাহিলেন না। কারণ অল্প কোন কারণে বাঙ্গলাদেশে আসিলে সে সময়ে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।

এই সম্বন্ধে মনু বিশেষভাবে লিখিয়া গিয়াছেন—

“অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেশু সৌরাষ্ট্র মগধেশু চ।

তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন পুনঃ সংস্কার মর্হতি ॥”

চাকার ইতিহাসপ্রণেতা লিখিয়াছেন—

“সমুদয় কুলজগণের মতেই আদিশূর বঙ্গ সম্পন্ন করিবার জন্যই ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। বঙ্গ সম্পন্ন করিতে অধ্বর্যুর, হোম এবং উলগান এই তিনটি ক্রিয়ার প্রয়োজন। তন্মধ্যে অধ্বর্যুর-সম্বন্ধীয় কার্য যজ্ঞ দ্বারা, হোম-ক্রিয়া গব্ দ্বারা, উলগান সাম দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বঙ্গ সম্পন্ন করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রয়োজন

হইলে, শুধু সামবেদী ব্রাহ্মণ দ্বারা ঐ কার্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে?

৷লালমোহন মুখোপাধ্যায় বন্দ্যবংশে লিখিয়া গিয়াছেন, “কনোজ জাত মহর্ষি দক্ষের কান্তাপ গোত্রের বংশধরগণ যখন যজুর্বেদীকূলে অধ্বর্যুর কার্য করিয়াছেন, তখন তিনিও প্রধানতঃ যজুর্বেদী ছিলেন এবং আদিশূরের যজ্ঞ অধ্বর্যুর কার্য করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।”

মুখোপাধ্যায় মহাশয় আরো বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন, “দক্ষঋষি যজুর্বেদী ছিলেন।”

আদিশূরের রাজধানী যে রামপাল নগরের অনতিদূরে পঞ্চ গ্রাম—এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় আদিশূরের ইতিহাস সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনীতে বাহা লিখিয়া গিয়াছেন—বাহাঙ্গা বলেন, আদিশূর ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন, তাঁহাদের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাঁহাদের এ ধারণা সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক। আদিশূর নিশ্চিতই একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠা আদিশূরের কথায় পূর্ণ থাকিবার বিষয় আছে। তিনি একজন ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন না। অথচ এই রাঢ় ও গোড় বিজয়ী আদিশূরের সন্তা কেন যে ঐতিহাসিকগণ খুঁজিয়া পাইতেছেন না তাহা বুঝা যায় না।

আদিশূর এই বাঙ্গালা দেশের একজন মহাপরাক্রম-শালী স্বাধীন হিন্দু নরপতি ছিলেন। সে সময় বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রাবনে সমগ্র ভারতেই ভাঙ্গিয়া চলিয়াছিল, এই বঙ্গেশ্বর আদিশূর সে সময়কার সেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রাবনে ভাসমান বাঙ্গালাকে ফিরাইয়া বর্ণাশ্রম ধর্মের কূলে তুলিয়া দিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্যের প্রদীপ্ত আলোক শিখা তাঁহারই প্রভাবে ও প্রচেষ্টায় আবার নবভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

বঙ্গলার সে সময়ে বর্ণশ্রম-ধর্মের ও ব্রাহ্মণ সমাজের অধোগতি দেখিয়া তিনি যে কান্তকুজ হইতে পঞ্চসারিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া বর্ণশ্রম ধর্মাবলম্বী হিন্দুসমাজের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, তাহা ত সকলেই জানেন। আজ এই সকল কথা কেমন করিয়া অস্বীকার করা চলবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছিলাম। বঙ্গলার বর্তমান রাষ্ট্র ব্রাহ্মণগণ সকলেই সেই আদিশূরের আনীত সেই কান্তকুজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণেরই বংশসম্ভূত।

তাহা ছাড়া সেই—পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন যে, বঙ্গলার বর্তমান উচ্চ বংশীয় কায়স্থগণও সকলেই, আজ আদিশূরের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করিলে বঙ্গলার বর্তমান সমাজ, সামাজিকতা, বর্ণশ্রম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম সবই যে অস্বীকার করিতে হয়—সমস্তই যে ওলটপালট হইয়া যায়। বঙ্গলার ইতিহাসটাকে যে তাহা হইলে সম্পূর্ণ নূতন-ভাবে পরিবর্তিত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু তাহাই কি বঙ্গলার স্বার্থ ইতিহাস হইবে?

আদিশূর বাস্তবিকই একজন চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক ব্যক্তি। আদিশূরের ঐতিহাসিকতা বঙ্গলার ইতিহাসের একটা দিকের ভিত্তি। সে ভিত্তি উড়াইয়া দিয়া বঙ্গলার ইতিহাস খাড়া করিতে গেলে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে। বঙ্গলার বর্তমান সামাজিকতার পূর্ব ইতিহাসটা তাহা হইলে সত্য হইবে না। বঙ্গলার বর্তমান সমাজ গঠন ও সামাজিক পদ্ধতি, বর্ণশ্রম ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি যে গুলি এখনও বঙ্গলার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে, আদিশূরের ঐতিহাসিকতা জানিলে, এগুলির মধ্যে সত্যতা ও সারস্ব থাকিবে। তবে কেমন করিয়া বলিব, তাহা বঙ্গলার স্বার্থ ইতিহাস?

আদিশূরের ইতিহাসের সঙ্গে বঙ্গলার বর্তমান রাষ্ট্র ব্রাহ্মণগণের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। যুগের সেই হিন্দু নরপতি আদিশূরের প্রবর্তিত নীতির পরই এখনও বঙ্গলার বর্তমান বর্ণশ্রম ধর্ম দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

Vincent Smith বলেন,—পালরাজ্যের অভ্যুদয়ের পূর্বে গোড়ের নিকটবর্তী স্থানে আদিশূর নামক একজন ক্ষুদ্র রাজা থাকিতেন ও পারেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—“দক্ষিণ রাঢ়ের বর্দ্ধমান বিভাগবাসী রণশূর বঙ্গলার শূরবংশের একজন রাজা ছিলেন। তিনি পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাদের রাজ্য পালরাজ্যগণ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কাঞ্চীরাজ রাজেন্দ্র চৌলকে বঙ্গলা দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টায় এই রণশূর রাজা মহীপালকে ১০২৩ খৃষ্টাব্দে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন।”

ইহা হইতে আমরা দুইজন আদিশূরের সন্ধান পাইতেছি। একজনের রাজধানী গোড়ে, অপর জনের রাজধানী রাঢ়ে। অথচ রাঢ় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বলেন,—আমরা সেই এক পঞ্চ ব্রাহ্মণেরই বংশধর, অথচ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের উপাধি বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাই এবং বেদও উভয়ের এক নহে।

যাহা হউক, ইহা লইয়া বহু বাগ্মন্যবাদ হইয়া গিয়াছে। যে সকল কথার উল্লেখ এখানে আবশ্যক নাই। রাঢ়ভূমে যে একজন আদিশূর ছিলেন, সেই আদিশূরই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

Vincent Smith যে ভাবে গোড়ের নিকটবর্তী স্থানে একজন আদিশূরের পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে ঐস্থানে কোনও আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

ষটকদের কুলগ্রন্থেও উল্লিখিত আছে যে আদিশূরের সৈনিকগণ সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই সকল কথার সহিত স্থানীয় জনপ্রবাদাদি মিলাইয়া এখন আমরা আদিশূরের ঐতিহাসিকতা কতদূর নির্ণয় করিতে পারি তাহাই দেখিব।

দক্ষিণ রাঢ়ের বর্দ্ধমান জেলায় আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা যে সকল প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

ইতিপূর্বে এই সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধাদি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, এখানে আর সেই সব কথা না বলিয়া বর্তমানে আরও কিছু নূতন কথা প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়া আমরা আদিশূরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা

কমিন। আমাদের অনুসন্ধানের ফলে যে সকল প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহারই কয়েকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম।

১। আদিশূরের সৈনিকগণ সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং এই সপ্তশতী ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান হইতে তাঁহার অন্ত্যস্ত সৈনিকগণ নিয়োজিত হইত। এখনও আমরা দেখিতে পাইতেছি, বর্দ্ধমান জেলায় অনেক স্থানেই, বিশেষতঃ যে অংশে আদিশূরের রাজধানী ছিল, সেই অংশ সপ্তশতী বা সাতশহরা পরগনার অন্তর্গত।

এখন ইংরাজ আমলে সাতশহরা পরগণার আরতন কুত্র হইয়া গিয়াছে। নতুবা পূর্বে এই সাতশহরা পরগণা বোলপুর হইতে পূর্বদিকে ভাগীরথী তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রবাদ এইরূপ যে, তাহারও অনেক পূর্বে সমগ্র রাঢ় দেশই ছিল এই সাতশহরা পরগণা।

তাহা অসম্ভব নহে। কারণ মুসলমান আমলে বাঙ্গালা দেশ নব নব পরগণায় বিভক্ত হইলেও সাতশহরা পরগণা ইহার অনেক পূর্বে হইতেই ছিল। এ পরগণা হিন্দু আমলের। হিন্দুযুগ হইতেই মুসলমান রাজত্ব এবং তাহা হইতে ইংরাজ আমলে আসিয়া বাঙ্গালাদেশের আরতন ও যেমন কমিয়া গিয়াছে, সাতশহরা পরগণারও আরতন ক্রমশঃ সেইরূপ হ্রাস হইয়া গিয়াছে।

বর্দ্ধমানের উগ্র-ক্ষত্রিয়—২। বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে বর্দ্ধমানে আমরা যে “উগ্রক্ষত্রিয়” নামক একটি বিশেষ প্রভাবশালী সম্প্রদায় দেখিতে পাইতেছি, মনে হয় তাহাদের পূর্বপুরুষগণ সে যুগে আদিশূরের সৈনিক বিভাগে নিয়োজিত হইতেন এইরূপ প্রবাদও আছে এবং বর্দ্ধমান জেলার এই উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রভাব, প্রতিপত্তিও প্রতিষ্ঠা দেখিয়া বতঃই মনে হয় যে, ইহার পূর্বে একটা কিছু ছিলেন। এখনও সমগ্র বাঙ্গালার মধ্যে শতকরা ৭৭.৫ জন কি তাহারও বেশী উগ্র ক্ষত্রিয় এক বর্দ্ধমান জেলার বাস করে।

এ জেলার এই সুপ্রতিষ্ঠ সম্প্রদায়টি সমগ্র বাঙ্গালার মধ্যে বর্দ্ধমান জেলার যে একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমানের হিন্দু নাম—৩। সাতশহরা পরগণার জমিদারগণ পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন। নবাবী আমল হইতে তাঁহারা মুসলমান হইয়াছেন। ইহাদের বাসস্থান সমুদ্রগড়; ইহাদিগকে এখনও সমুদ্রগড়ের রাজা বলে।

সমুদ্রগড়ের ঠাকুর নামেও ইহার অভিষত হইয়া থাকেন। এখনও ইহার একটা করিয়া ব্রাহ্মণ নাম ধারণ করেন।

ঐ বাণেশের সকলেই নাকি একটা হিন্দু এবং একটা মুসলমানী নাম থাকে। বর্দ্ধমান জমিদারের হিন্দু নাম কেশব লাল ঠাকুর ও মুসলমানী নাম ইয়াসিন খাঁ।

আদিশূরের প্রাঙ্গাদ—বর্দ্ধমান মটরা গ্রামে অন্ততঃ ২০০০ গজ লম্বা এবং ৬০০ গজ চওড়া। আদিশূরের যে ভিত্তি আবিস্কৃত

হইয়াছে, তাহার ইটগুলি পুর, চৌকো টালির ভাণ্ড এবং ঠিক বেন পাথরের মত কঠিন। ইটগুলি আকারেও খুব বৃহৎ। এইরূপ ইট সচরাচর অল্প কৃত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তবে দুর্শিদ্ধাবাদ জেলার রাজা শশাঙ্কের কাণ সোণার খণ্ডোবশেষের ইটগুলির সহিত এই ইটের মিল হয়। কিন্তু এই ধরণের ইট বাঙ্গালা দেশের আর কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। অথচ ঐ ইট বর্দ্ধমানে কাইশ গ্রামে অবস্থিত আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত বরাহগোপাল দেবের মন্দিরে এবং তৎসংলগ্ন প্রাচীরাদিতেই দেখা যাইত। এখন আবার অনুসন্ধানের ফলে কাইশ্রামের অনেক স্থানেই সুভিকার ভিতর হইতে এই ধরণের ইটকমর ভিত্তি বাহির হইয়া পড়িতেছে।

নূতন নদী—৪। যে গ্রামে আদিশূর দুর্গের ভিত্তি আবিস্কৃত হইয়াছে, সেই গ্রামটির বর্দ্ধমান নাম মটরা। কিন্তু কিছুদিন আগেও সকলে বলিত—শুটরো। এখনও অনেকে বিশেষতঃ প্রাচীন লোক মাত্রেই তাহাই বলিয়া থাকেন। তৎপূর্বে ছিল শুরো। প্রাচীন দলিলাদিতে কৃত্রাপি মটরা নাম নাই। শুঁরা বা শুরো এইরূপ নামই পাওয়া যায়। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের সন্নিকটেই যে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার চিহ্ন এখনও রহিয়াছে, সেটি আদিশূরের দাবি বলিয়া এখনও প্রবাদ। এই দীর্ঘিকার অনতিদূরে এবং বর্দ্ধমান মটরা গ্রামের নিম্ন দিগা যে খড়্গেশ্বরী বা বড়ী নদী প্রবাহিত হইতেছে, সে নদীর অস্তিত্ব যে পূর্বে ছিল না, সে কথা স্থানান্তরে প্রকাশিত প্রবন্ধ পূর্বেই বলিয়াছি।

এ কথার আরও একটা প্রমাণ পাইয়াছি। কিছুদিন আগে এই মটরা গ্রামের খুব একখানি প্রাচীন নক্সা জমৈক গৃহস্থের কুঠারে পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে এই নদীর কোনও পরিচয় বা চিহ্ন মাত্র ছিল না।

আদিশূরের দুর্গা—৫। আদিশূরের দুর্গের ভগ্নাবশেষ অনুসন্ধানের ফলে এখানে কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায় এবং তৎসহ যে একটা ভগ্ন প্রস্তর মূর্তি এবং একটা স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়, তাহারই কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণ মুদ্রাটির আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র—একটা শুটকে পরসার মত। অনেকটা পুর। খাঁটি সোণার নির্মিত। মুদ্রাটির একদিকে একটি বীর পুরুষ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বিজয় চান্দে দণ্ডায়মান। যত্নকে শিরস্ত্রাণ কতকাল পূর্বে খোদিত এই মূর্তি, তবু সে মূর্তির সুখখানি এখনও কত উজ্জ্বল কত বেন দীপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে দুর্গা প্রতিমার চাল চিত্র অঙ্কিত। এই বহনবনের পুরাতন মুদ্রার চাকচিক্য এখনও নষ্ট হয় নাই। অনেক অনুমান করেন, এই শিল্প বৈপ্লবী গুপ্ত যুগের শিল্প ধারার অনুরূপ। কাই গ্রামের একটি নিষ্ঠাবান সম্প্রদায়ের গৃহে এই মুদ্রা দৃষ্ট হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণ পরিবারে মুদ্রাটি দেবতারূপে সম্পূর্ণ হইয়া থাকেন। এই মুদ্রাটি কিছুদিন পূর্বে একজন দরিদ্র ব্যক্তি আদিশূর-দুর্গের সীমার মধ্যেই হউক বা সীমার বাহিরেই হউক, এইরূপ কোন এক স্থানে পাইয়া বিক্রয় করিতে চাহিলে এই পরিবারের একাধ স্বর্গীয়মুদ্রাণী ও পরম অভিজ্ঞান

পুণ্য বর্ণীর হরিদাস চন্দ্রবর্তী মহাশয় তাহার বিকট ক্রন্দন করিয়া রাখিয়া দিগাহেন এবং তাহারই নির্দেশ মত তদবধি এইভাবে মৃত্যুটির পূজা হইয়া আসিতেছে।

মূর্তির-সাদৃশ্য—১।—আমিশুরের প্রতিষ্ঠিত বরাহগোপাল দেবের মন্দিরে—“অনন্ত বাহুদেব”—নামক আর একটা দেববিগ্রহ স্থাপিত রহিয়াছে। বরাহগোপাল দেবের সহিত সেটিরও নিত্য পূজা হইয়া থাকে। আমরা বিশেষ প্রাধিকান করিয়া দেখিয়াছি—সেই অনন্ত বাহুদেবের—একাত্মে খোদিত অপর একটা প্রতিমূর্তি এবং হুটরা হইতে সংগৃহীত ভগ্ন প্রস্তর মূর্তি, এই দুটিই একরূপ এবং এই দুটি

মূর্তির সহিত পূর্বোক্তিত এই বর্ণ মৃত্যুর খোদিত মূর্তির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

এই সকল বিষয় এবং আরও অনেক বিষয় দেখিয়া শুনিয়া এই স্থানই যে আমিশুরের রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আরও একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখি। কয়েকদিন পূর্বে হুটরা গ্রামে মৃত্তিকা খনন কালে ভূগর্ভ হইতে একখানি পাথরের চৌকী পাওয়া গিয়াছে।

প্রস্তরটি লাল রং এবং খুবই দীপ্তিময়। আমিশুরের দুর্গের পাৰ্শ্বেই ইহা পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি রৌপ্য মূর্তিও এই সঙ্গে বাহির হইয়াছে।

## প্রতীক্ষার

### শ্রীমতী হাসিরানি দেবী

( ১ )

রজন যেদিন প্রভু কস্তা সারাকে জানাইল সে তাহাকে বিবাহ করিতে উৎসুক, সে দিন প্রথমে সারা তাহার মুখের প্রতি বিম্বিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পরে তাহার মুখমণ্ডল কোণে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। ধীর কণ্ঠে রজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—“রজন আজ তোমার কথা শুনে আমি ম’নে বড় আশাত পেলাম। আমি আশা করিনি যে তোমার মুখে এরকম কথা আমি কোনদিন শুনেতে পাব। যাক্ বা হবার তা হ’য়েছে, আমার ইচ্ছা, এখন হ’তে আর একদিনও যেন একথা আমার কানে না আসে।”

রজন কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে ডাকিল—“সারা”—

সারা হতবৃত্ত গোলাপ গুবকটি মস্তকের কবরীতে ঝুজিতে ঝুজিতে উত্তর দিল—“কেন?”—

রজন তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পরে ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—“তুমি কি কিছু বুঝতে পারো না? না,—বুঝেও অবুঝের মত থাক দয়া ক’রে আমার তার একটা উত্তর বেবে কি?”

সারা দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল “না।”

রজন কিছুক্ষণ নীরবে রহিল। পরে বলিল—“যদি ম’নে ক’রে থাক আমি তোমার দয়া ভিক্ষা কর্তে এসেছি, তবে জেনো এ তোমার ভুল ধারণা। আমি তোমার অনুরোধ ক’রেছিলাম, ভিক্ষা নয়।”

সারা তীব্র দৃষ্টিতে রজনের মুখের প্রতি চাহিল। বলিল “কিন্তু তোমার মুখে, আমার পিতার কর্মচারীর মুখে এত গর্বের কথা শোভা পায় না। চুল’ত জিনিসের আশা করাও বাতুলতা মাত্র। সাহারিয়ার সর্দারের মেয়ের মুখের সম্মুখে একটা নকর দাঁড়িয়ে কথা বলবার লক্ষ্য করে? আশ্চর্য্য বটে।”—

রজনের হৃগৌর মুখমণ্ডল অপমানে রক্তিমাক হইয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। পরে বলিল—“সারা, তুমি আজ সাহারিয়ার সর্দারের মেয়ে বলে নিজের মধ্যে গর্ভ অল্পতব ক’র্তে পার, সামান্য নকর বলে আমাকে অপমান ক’র্তে পার বটে, কিন্তু ম’নে রেখ সকলের দিনই সমান যার না বা চিরদিনই আমি নকর থাকবো না। চিরদিনই তোমার বাবার কাছে কাজ শিখবো না, চিরদিনই আমার পরসার অতাব থাকবে না। আমি আমার নামে শপথ করছি আমার গারে যদি

আমার মায়ের রক্ত থাকে, তবে আমি নিশ্চয়ই একদিন মাহুব হ'ব। বাকু আর আমার কিছু ব'লবার নেই। তোমার বাপ-জান কে জানিয়ে আমি চলেম। যেখানেই যাই, খোঁজ কেউ পাবে না। যদি আমার মাহুবের মত মাহুব হ'তে পারি তখন ফের এই দেশে, তোমাদের সামনে ফিরে এসে দেখাব আমি কাপুরুষ নই। আমি পরসার কাঙাল নই। গেলাম, সারা বিবি 'চলুম'।—

রজন ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সারা তখনও নীরবে নত নেড়ে কক্ষতলে বিহ্বত গালিচার প্রতি চাহিয়াছিল। তাহার কর্ণে তাসিয়া আসিতেছিল—রজনের সেই কথাটি “আমি পরসার কাঙাল নই।”

সত্যই। সেতো পরসার জন্ত লালারিত নয়। যদিও তাহার পরসার তুণ নাই, তথাপি সে পরসার জন্তও কাঙাল নয়।.....

কেন?—সে প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করে না। তাহার সজ্জিতও কিছুই নাই।—.....

সারা বধর মুখ ভুলিয়া চাহিল তাহার বহু পূর্বে রজন সে স্থান ত্যাগ করিয়াছে। সারা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল “রজন”—

কেহ সাড়া দিল না। সারা ছুরারের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। চতুর্দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিয়া পুনর্বার ডাকিল—“রজন-রজন”—রজনের সাড়া পাওয়া গেল না। দাসী আসিয়া জানাইল সে কিছু পূর্বে আন্তাবল হইতে তাহার আপনায় অঁচাটিতে আরোহণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সারা তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কোথায় গেল জাদিস?”—দাসী জানাইল—“না”। সারা সেই স্থানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুকণ পরে উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিল—“রহমান”।

“রহমান আসিলে সারা তাহাকে আদেশ করিল—“বত তাড়াতাড়ি পার আন্তাবল হ'তে বোড়া মিরে রজনকে কিরিয়ে নিরে এস। ব'লবে সারা তোমার কিরিয়ে মিরে যেতে ব'লেছেন। বাও বত শীত্র পার।—”

রহমান চলিয়া গেল।—সারা ছুরারের উপরে হাত রাখিয়া তাবিলে লাগিল—“সে এত ছোট ব্যাপারে তাহার উপরে

রাগ করিয়া চলিয়া গেল”।—সে কি জানেনা সাহারিয়ার সর্দার বংশের কস্তার মান কিরুপ? সে কি জানেনা, তাহাদের সর্দার বংশীর পুত্র ভিন্ন তাহাদের বিবাহ হইবার উপায় নাই? তবে সে এমন অবুরের জ্ঞান কার্য করিল কেন? যদি সেরুপ পাত্র না পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদিগকে অবিবাহিতা থাকিতে হয়, সবই তো সে জানে, তবে সে কেন এরূপ কার্য করিল? সে কি সারাকে ভুল বুঝিয়াছে? হাঁ তাহাই সম্ভব! কিন্তু তাই বলিয়া কি এরূপই—না, না, সে তাহার উপরে অভিমান করিয়া চলিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল না, কেন তাহাকে সারা অপমান করিল। হায়,—সে যে ভাবিয়াছিল গোপনে বাহা আছে তাহা গোপনেই থাকুক। রজনও যেন তাহার আভাস না পায়।

কিন্তু রজন,—তুমি উণ্টা বুঝিলে,—তাবিলে সারা তোমাকে উপেক্ষা করিল, অবহেলা করিল?—

রহমান কিয়দূর আসিয়া সারার হস্তে একখানি পত্র দিল। সারা খুলিয়া দেখিতে পাইল,—রজন লিখিয়াছে—

“সারা,—চলিলাম কোন অজানা পথের উদ্দেশে। তোমার উপরে রাগ করিয়া নয়,—নিরন্তর উপরে হুংখ করিয়া। যদি পারি, আমার তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইব। আর যদি না পারি, তবে এই শেষ। আশা করি, সর্দার কস্তার মুখের উপর কথা কওয়ার দৃষ্টতা মার্জনা করিবে। ইতি—রজন।

সারার হস্ত কম্পিত হইয়া পত্রখানি গালিচার উপরে পড়িয়া গেল। বিবর্ণ মুখে সে পত্রখানির প্রতি চাহিয়া রহিল। ‘চলে গেলে—’সম্বন্ধে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সে সেই স্থানে লুটাইয়া পড়িল। অশ্রুতে তাহার পরিধের ভিজিয়া উঠিল।—‘চলে গেলে’—কিছু বুঝেনা, আমাকে কিরো দেখলে না,—তুমি চলে গেলে’—তুমি জানতে চাইলে না, আমাদের সংসার বাজার পথে কত বিষ, কত বিপদ। অভিমান করে চলে গেলে! বড় গর্কিতা দাসী আমি—তাই কি আপনার হাতে সারা মিরে গেলে রজন,—কিন্তু এ সারা কেন বিলে,—দিনান্তে যদি একবারও তোমার দেখতে পেতাম,—তাও যে আমার শতগুণ বাহনীর ছিল। নিষ্ঠুর।

পরশ। সারার বা আছে, তা যে অনেক সারার ভাঙারেও প্রায় থাকে না—তবে তুমি কিসের জন্ত চলে গেলে।

“তুমি লিখিরাছ ঝুঁটতা, কিন্তু রজন, স্বামী,—দেবতা,—আমি যে তোমার এ ঝুঁটতাকে আমার সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। তুমি বখন কথা বল তখন আমি তোমার অনিন্দ্য স্নানর মুখের প্রতি নির্ণয়ে চাহিয়া থাকিতাম। কিন্তু তুমি সমস্ত ভুল বুঝিলে—তাই, তাই প্রিয়তম, হুঃখিনী সারার উপরে অভিমান করিয়া চলিয়া গেলে—”

( ২ )

হুঃখী এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, রজন আর ফিরিয়া আইলে নাই। সারা তাহার আশার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, সে ফিরিল না।

মেহের কন্ডার বিবর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সলোমন চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। দিন দিন সে যেন শুখাইয়া যাইতেছে। তাহার মুখে হাসির রেখা নাট। চক্ষু বসিয়া গিয়াছে। কেন? কেন এমন হইল?—

কন্ডার মন্তকে হাত রাখিয়া মেহ-সিক্ত-কণ্ঠে ডাকিলেন—“সারা,—সারা তাহার নিশ্চিন্ত দৃষ্টি পিতার মুখের উপরে স্থাপিত করিয়া উত্তর দিল—“কেন বাপ্‌জান”—সলোমন কন্ডার ললাটে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—“দিন দিন এমন শুকিয়ে যাকিস্ কেন মা? তোর কি কোন অসুখ করেছে?” সারার শুক গুঠের কোণে বিবাদের ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিল—“না বাপ্‌জান!”—সলোমন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। হায় রে পিতৃহনন! সন্ত মাতৃহারা কন্ডাটিকে তিনি যেদিন বকে ডুলিয়া লইয়াছিলেন তখন সে কতটুকু?—পাছে সে মনে হুঃখ পায় তাবিয়া তাহাকে কোন প্রকার পরাধীনতার ভিতরে থাকিতে দেন নাই। একজন্ত তাঁহাকে মুসলমান সমাজেও নিন্দার পাত্র হইতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি অটল। হায়, ও যে মাতৃহারা! ... ..

সলোমন কিছুকণ কন্ডার নিকটে বসিয়া রহিলেন, তাহার পরে কি তাবিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন। হায়, আজ যদি সারার মাতা বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে তো সলোমনকে এত তাবিড়ে হইত না।

কক্ষ মধ্যে হইতে সারার ডাক শুনিতে পাওয়া গেল—“বাপ্‌জান—”

সলোমন পুনরায় কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সারা একখানি হস্তে পিতার একখানি হস্ত টানিয়া লইয়া, অছুরোধ ভরা স্বরে বলিল—“বাপ্‌জান রজন কি আর আসবে না?”—“কে? রজন?” মুহূর্ত্তে একখানি কাল ববনিকা যেন সলোমনের চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। সলোমন চমকিত হইয়া উঠিলেন। বিবর্ণ মুখে কন্ডার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অমৃতপ্ত কণ্ঠে ডাকিলেন—“সারা—”

সারা উত্তর দিল না। মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া তখন তাহার দৃষ্টি বহুদূর বিস্তৃত মাঠের উপরে গিয়া পড়িয়াছিল।

সলোমন অধীর কণ্ঠে ডাকিলেন—“সারা!”—সারা অন্তমনস্ক হইয়া উত্তর দিল—সলোমন উত্তর করতলে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন—। হায়, কত বড় ভুল! এ ভুলের জের কি সারাজীবনই সারাকে বহিয়া চলিতে হইবে! মাতৃহারা কন্ডা আমার,—আজ যদি তোর মা বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে হয়তো তোকে এইরূপে জলিয়া ছাই হইতে হইত না। হয়তো সে তোর একটা উপায়ও করিতে পারিত।

কিন্তু তোর পিতা?—সে যে অক্ষম! তারও মন গুড়ে ছাই হ’য়ে বাছে তোর ঐ শুক মুখখানি দেখে।—

“সারা,—মা আমার! অক্ষম বাপ্‌জানকে তোর কমা ক’র্ত্তে পার্কি না রে?—কথার শেষে সলোমনের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সারা ব্যথিত দৃষ্টিতে পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। কথা কহিতে পারিল না। সলোমন বলিলেন—“বড় ভুল করেছে সারা! কিন্তু কি ক’রবো মা? চেষ্টা ক’লেও তো কিছু হ’তো না। আমার বুকটা হিঁড়ে পড়লেও তো আমি আমার পূর্ব পুরুষের মুখ হেঁট ক’র্ত্তে পার্কি না।—

কিছুকণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলেন—“আমি-আমি না পাজেও কি তুই তাঁদের মুখ নিচু ক’র্ত্তে সম্মত হ’তিস্ সারা?—”

সারা বৃহৎ অংক কটন কণ্ঠে উত্তর দিল—“না বাপ্‌জান!”

কস্তুর মনের তাব বদলাইবার জন্ত সলোমন সারার বিবাহের জন্ত পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সুবোগ মত একটি পাত্রও মিলিয়া গেল। সলোমন একদিন কস্তাকে সন্ধান করিয়া বলিল—“সারা”—আমি তোঁর বিয়ে দিই, শান্তিতে যেতে চাই না।”

মুহুর্তে সারার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। একটা অক্ষুট শব্দ করিয়া পুনর্বার নীরব হইল। সলোমন ডাকিলেন—“সারা”—

“বাপ্‌জান”—

অর্ধমুহুর্তে সে ডাকিল—“বাপ্‌জান,—কমা করো।” সে আর কিছু বলিতে পারিল না। বন্ধ কাঁপাইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিলাইয়া গেল। নয়ন অন্ধ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সলোমন কিছুক্ষণ নীরবে কস্তার মুখের প্রতি চহিয়া রহিলেন, পরে হতাশপূর্ণ স্বরে বলিলেন—“কিন্তু আমি বড় আশা করে নগরজকে ভিনদেশ হ’তে আনিরে ছিলাম সারা! বড় আশা করেছিলাম তোকে সুখী দেখবো ব’লে। আমি বিশ্বাস করি নগরজের মত ছেলে লাঞ্জে একটি মেলে! বড় আশা করেই যে আমি ওকে আনিরে ছিলাম সারা! তোঁর সঙ্গে ওর বিবাহ দিই তোকে—সুখী দেখে নিশ্চিন্তে মরতে পারবো বলে, কিন্তু আল্লা যে আমার হুম্মন রে।—তিনি আমার সুখ দেখবেন না!—সারা কথা কহিল,—ধীরে ধীরে বলিল—“বেশ তো বাপ্‌জান, নগরজকে এখানে রেখে দাও। তুমি ব’লে সে নিশ্চয়ই থাকবে। আর সে বাতে সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারে তারই ব্যবস্থা করে দাও।”—

সলোমন নীরবে বসিয়া রহিলেন।—অল্পশোচনা তাঁহার হৃদয়ে সূচীকার স্রাব বিদ্ধ হইতেছিল। বহুদূরে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন।

( ৩ )

ঘন ক্লক শেষ গগন চাকিয়া ফেলিয়াছিল। ঘন ঘন বিজলী চম্‌কাইতেছিল। বাতাস হার হার শব্দে বহিয়া বাইতেছিল।

সারা গুপোড়ানে একটা মন্দির বেদীর উপরে বসিয়া সারেন্দ্ হস্তে মুহূর্তে গাহিতেছিল—

“আজু সখি কাহে গিরা, আবহ’ ন আওরে।

গগন পটহে শোহে সে সুখ তারা।

চন্ডকা পাঁতি জোতি হীন ভেই—

পরশে দহতি মোহে,—যতি মো হ’রা।”

ধীরে ধীরে সারেন্দ্‌এর তারে তারে করণ স্বরে মুহূর্তে উঠিতেছিল। বড় বেদনা ভরা, বড় করণ সে সুর। স্তব্ধ আকাশের কোড়ে যেন সে সুর আছড়াইয়া পড়িতেছিল। অন্ধরের বকুল গাছটি হইতে বাতাসে কতকগুলি বকুল ফুল ঝরিয়া পড়িল।

আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইয়া সেই মুহূর্তে উঠিতেছিল—“আজু সখি কাহে গিরা, আবহ’ ন আওরে—গান শেষ হইল। সারা নীরবে বসিয়া রহিল। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। শুধু এক একবার বাতাসের শব্দ শব্দ করণে ভাসিয়া আসিতেছিল।

—“সে আজও ফিরিয়া আসিল না। আর ফিরিয়া আসিবে কিনা কে জানে? বাহার উপরে অভিমান করিয়া সে বিদায় লইয়া গেল,—সে কি জানিতে পারিল,—তাহার হৃদয়ে কত গভীর আঘাত লাগিল? সে কি জানিতে পারিয়াছিল সারা কখনও তাহার জন্ত অক্লান্তে সেই মন্দিরের চরণতলে হৃদয়ের বেদনাকে নিবেদন করিবে? সে কি জানিয়াছিল—সারা তাহার আসার,—আশা পথ চাহিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে বার বার ডাকিবে—“ওগো, অভিমান ভুলে কিরে এস? আমি কমা ভিক্ষা করছি। ফিরে এস, ওগো স্বামী, ফিরে এস।” না সে তাহা জানিতে পারে নাই। হয়তো আর পারিবেও না। সেই ভাল।... সে, অকারণে তাহার উপরে অভিমান করিয়া চলিয়া গেল। কোথায় গেল। হয়তো কোন অজানা দেশের পথিক হইয়াছে। আর আসিবে না। আর রক্তনের মোহন মূর্তি তাহার দৃষ্টির সন্মুখে ডাকিয়া উঠিবে না। আর সে তাহাকে ভিন্নকার করিতে আসিবে না। আর সে তাহাকে বিজ্ঞপ্ত করিবে না। সম্মুখে “সারা” বসিয়া ডাকিবে না। সে চলিয়া গিয়াছে। কয়েক মণ্ডলের



জন্ম শুধু সে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে কোথা হইতে আসিয়াছিল তাহাও কেহ জানে না, কোথায় চলিয়া গেল তাহাও কেহ জানিতে পারিল না। স্রোতের জলের দ্বারা সে একটি ভূগে বাধা প্রাপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,—আবার স্রোতের মুখে পড়িয়া কোন অজানা দেশে চলিয়া গেল।

“সারা”—

গিছন হইতে ডাক শুনিয়া সারা মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল অদূরে নগরজ দাঁড়াইয়া—তাহার প্রাণ চাহিয়া আছে।

উড়াগীথানি গারে আর একটু টানিয়া দিয়া সারা উঠিয়া দাঁড়াইল। নগরজ তাহার সম্মুখিত ভাব দেখিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল—“দাঁড়াতে হবে না, বোস। আমার কয়েকটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।—তাই ব’লতেই আয় এখানে এসেছি।—মুহুর্তে সারার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কম্পিত কণ্ঠে বলিল—“এখনই?”—

“হ্যাঁ,”—

সারা হৃদয় দ্বারা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। কিসের আতঙ্কে তাহার হৃদয় কাঁপিতেছিল। নগরজ কিছু দূরে শ্রামল হরুদলের উপরে বসিয়া পড়িল। কিছুকণ নীরবে কাটিয়া যাইবার পরে নগরজ ধীরকণ্ঠে বলিল—“আমি একটা ঠিক কথা তোমার কাছে শুনতে এসেছি। আশা করি, উত্তর দেবে।” সারা উত্তর দিতে পারিল না। নত নেত্র নিয় দিকে চাহিয়া রহিল। নগরজ সে দিকে লক্ষ্য করিল না। অস্ত্র দিকে চাহিয়া বলিল—

“তোমার বাবা আমার একটা কথা বলে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। সে কথা তুমি বোধ হয় জানো।”

সারা ধীর কণ্ঠে উত্তর দিল “জানি”—

নগরজ বলিল—“কিন্তু তিনি এখন আমার অস্ত্র কথা বলছেন। এর কারণ কি?”

সারা অবিচলিত স্বরে উত্তর দিল—“এর কারণ অস্ত্র কিছুই নয়,—আমারই অমত —”

“তোমার অমত,—” নগরজ একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে সারার

অনিচ্ছা হৃদয় মুখের প্রতি চাহিল। তৎপরে দৃষ্টি মত্ত করিয়া কঠিন কণ্ঠে বলিল—“তবে তিনি, তার মেয়ের মত না ভেনে কেন—আমাকে নিয়ে আসতে যান—একি প্রতারণা করা নয়—” সারা নগরজের মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—“তার ভ্রাত্তে আমি আপনার কাছে কমা চাচ্ছি, নগরজ সাহেব। আর আমাদের প্রতারণা করা স্বভাব নয়। যদি ইচ্ছা করেন,— এখানে অনেক হৃদয়ী মেয়ে আছে, বিবাহ ক’র্তে আপনি পারেন। আর অর্থের যদি আবশ্যক বোধ করেন,— আমি আপনার সে অভাব পূর্ণ ক’র্তে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।”

নগরজ সারার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল—“আমার তা ইচ্ছা নয়।”—

—“তবে—”

“আমি বাক্যে বিবাহ ক’র্তে এসেছিলাম, তাকেই চাই।” সারার মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। যথাসাধ্য আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল—“আমি আপনার মুখে একথা শুনতে ইচ্ছা করি না—নগরজ সাহেব। অস্ত্র কথা বলতে পারেন।—”

“আমি কিন্তু আজ এই কথাই ব’লতে এসেছিলাম।” সারার মুখের উপরে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। অধীর কণ্ঠে বলিল—“আমি কিন্তু ও কথা শুনতে ইচ্ছুক নই।—নগরজ কিছুকণ নীরবে কি ভাবিল। পরে বলিল—“কিন্তু আমি তোমার আত্মীর মত জিজ্ঞাসা ক’র্তে পারি কি, কেন? সারা নীরবে নতনেত্র বসিয়া রহিল। বোধ হইল সে যেন কিছুই শুনিতে পার না। নগরজ পুনরায় প্রশ্ন করিল। সারা চমকিত হইয়া উঠিল। সজল নয়নে নগরজের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—“সত্যি কি—আপনি আমার আত্মীর মত জিজ্ঞাসা ক’চ্ছেন—”

“হ্যাঁ, বিখাস করো।”

চঞ্চল চরণে সারা উঠিয়া দাঁড়াইল, কম্পিত কণ্ঠে বলিল—“এখন নয়! বোলবো আপনাকে সমস্তই ব’লবো। সন্ধ্যার পরে। নিরুজ্জব ব’সে।—”

সারা আর সেইস্থানে অপেক্ষা করিল না। দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বতকণ দেখা যায় নগরজ তাহার পশনপদ



নৃষ্টির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পরে একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

\* \* \*

সমস্ত কথা শুনিয়া নগর'জের উত্তর চক্ষু অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সারা করতলে মস্তক স্থাপিত করিয়া নীরবে বসিয়াছিল। বহুক্ষণ পরে নগর'জ সারাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—“বহিন, যে চ'লে গেছে তারই শ্রুতি নিয়ে জীবনটা কি ব্যর্থতার ভরিয়ে তুলবে? সে কিভাবে কিনা তার তো কোন আশাই সে রেখে যায় নি।—”

সারা ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—না থাক্—, কিন্তু সেই ব্যর্থতাকেই যে আমি আমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি তাইসাংবে।” নগর'জ নীরবে নতনেত্রে বসিয়া রহিল। সারা বলিল—“সে গেছে থাক্,—কিন্তু আমি তাকেই স্বামী ব'লে জানি,—সেই জন্ত, আর কাউকে আমি বিবাহ কর্তে পারব না।—জানো তাইসাংবে,—আমিই তাকে বড় কঠোর কথায় বিদায় দিয়ে ছিলাম, তখন জানতে পারিনি সে আমার কত আপনায় ছিল।—”

কথার শেষে তাহার কণ্ঠ অশ্রুভারে রুদ্ধ হইয়া আসিল। চক্ষু অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সারা কিপ্র হস্তে রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া, কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল—“তাইসাংবে,—তোমার বতদিন খুসি তুমি এখানে থাক। যদি বাড়ীতে খুব কাজও থাকে তা হ'লেও দিন কতক কি এখানে থাকবেনা,—মনে কর তোমার বহিনের অসুস্থতা।” নগর'জ কিছুক্ষণ পরে উত্তর দিল—“আজ্ঞা”—সারা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—আমি একটু পরে আসবো। তুমি যদি পারো, এই স্থানে কিছুক্ষণ আমার অস্ত্র অপেক্ষা করো।—সে ক্ষণ্ত পড়ে চলিয়া গেল। আপনায় কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিল, পরে গাশিচার উপরে লুটাইয়া পড়িয়া, আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

( ৪ )

ধীরে ধীরে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। সে কিরিয়া আসিল না। ধীরে ধীরে সারার জীবন প্রৌপ নিশ্চত হইয়া উঠিতেছিল।

কভদিন, কতমাস, কতবর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল—, আকাজিকত যে সে আসিল না। অশ্রুহার শুধাইয়া গেল, ভাষা ফুরাইয়া গেল, দমিত কিরিয়া আসিল না। সে অভিমান করিয়া চলিয়া গেল,—সারাকে তুলিয়া গেল। কিন্তু সারা তো তাহাকে তুলিতে পারে নাই। সে যে আজও আমার নিকটে করবোড়ে প্রার্থনা করে—তাহার মধুময় শ্রুতি-ভার বক্ষে লইয়াই সে যেন অনন্ত পথের বাজী হইতে পারে।—বেহেস্তে স্থান পাইবার আশা সে রাখে না। যদি দমিতের শ্রুতি বক্ষে লইয়া,—আহার্যমণ্ডে বাইতে হয়,—সেও ভাল,—কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া সে বেহেস্তে স্থান পাইতে চাহে না।

শ্রাবণের শেষ। সারাদিন বরষা নামিয়াছিল। বর্ষ বর্ষ বর্ষ - মাঝে মাঝে সজল 'বাতাস' কি করুণ ছুর তুলিয়া চলিয়া বাইতেছিল। আজও যেন বাদল দিনে সেই যেননগীতি কে গাহিয়া বাইতেছিল—“আজু সখী কাছে পিয়া আবহ' ন আওরে।”

সারার ক্ষীণ দেহলভা স্নেহকোমল শয্যার উপর পড়িয়া ছিল একটি ঝাড়া ফুলের মত। কোন দিন সে বসন্তের বাতাস আসিয়া একটি পোলাপ বৃন্তচূত করিয়াছিল, তাহা জানিত না। আজ যেন সে ধরণী হইতে বিদায় চাহিতেছিল। প্রৌপ যে নিভিয়া আসিয়াছে, আর সে জলিয়া উঠিবেনা, আর তাহার দ্বিধ আলোকে চতুর্দিক উজ্জল করিয়া তুলিবেনা। আজি অসময়ে সে ধরণীর নিকট বিদায় প্রার্থনা জানাইল।

সারার মস্তকের উত্তর পার্শ্বে নগর'জ এবং সলোমন বিবর বদনে বসিয়াছিলেন। কস্তার পাণ্ডুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সলোমন অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। উত্তর করতলে মুখ ঢাকিয়া আঁচ কণ্ঠে ডাকিলেন—সারা! সারা চমকিত হইয়া পিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল—“বাগজান”—

নগর'জ সলোমনকে তুলিয়া অস্ত্র কক্ষে লইয়া গেল, সে বুঝিয়াছিল—মৃত্যু পথ-বাজী এখন একটু নীরবতার ছায়ার শান্তির আশা করিতেছে। সারা এখন কিছুই প্রার্থী নহে।

নগর'জ ডাকিল—“সারা,—বহিন—”

সারা বলিল নগর'জ তাই, অন্তিম সময়ে কি একটু শান্তি দিতে পার না,—

নগর'জের নয়নধর অশ্রুভাষাক্রান্ত হইয়া উঠিল, বলিল—  
“বা ইচ্ছা হয় বল সাখ্যাহুসায়ে চেষ্টা করবো।”

সারা বলিল—“বাগ্জান বড় কষ্ট পেলো, ভাইসাহেব। আমি চ'লে গেলে কে আর তাকে দেখবে নগর'জ?”  
সারার কোটারবিটচক্ দুইট চক্ চক্ করিয়া উঠিল। নগর'জ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিল—“তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিত হ'তে পার, কারণ আজ হ'তে আমি তোমার নামে শপথ ক'রে ব'লছি সারা তোমার বাগ্জানের ভার আমি নিলাম। যদি আমি পথের ককিরও হই, তা হলেও আমি ভিক্ষা ক'রে তোমার বাগ্জানকে খাওয়াব।—”

“ধন্যবাদ,—। নগর'জ সাহেব আমি যে আজ কি শান্তি পেলাম, তা তোমাকে মুখের কথায় জানাতে পার্কনা। আমার যুকের ভিতর বড় কাঁপছে। নগরোজ, বাগ্জানকে একবার ডাক তো।—”

নগর'জ সলোমনকে লইয়া আসিল। সারা পিতার শুক বিবর্ণ মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তাহার অন্তর দুর্ভাগ্য পিতার জন্ত হাহাকার করিয়া উঠিল। সে আপনায় অন্তর সংযত করিয়া লইয়া পিতাকে কার্য্যে ব্যস্ত রাখিবার জন্ত কীদকণ্ঠে বলিল—“বাগ্জান—তুমি আর ভাইসাহেব আমাকে ধরে আন্তে আন্তে এই মুক্ত মাঠটার উপরে নিয়ে যেতে পারনা? ওখানকার বাতাস মুক্ত। এ বন্ধের ভিতর যে আমার প্রাণটা ইপিগরে উঠছে বাগ্জান।—”

সলোমন ও নগর'জ বধন বহ কণ্ঠে সারার দেহ ধরাধরি করিয়া আনিয়া ময়দানের কোমল ভূগুচ্ছের উপরে শয়ান করাইয়া দিল; তখন দিবাকর অন্ত গিয়াছেন। সমস্ত আকাশটির গাজে কে যেন এক কোটা আবার ঢালিয়া দিয়াছিল। পক্ষীকুল দিনান্তের কলগান গাহিতে গাহিতে আপন আপন কুলাভিমুখে উড়িয়া বাইতেছিল।

সলোমন অধীর চিত্তে অদূরে পানচারণা করিতেছিল। নগর'জ সারার নিকটে বসিয়া ছিল। সারা ডাকিল—  
“নগর'জ” —“কেন সারা?”

সারা করুণ কণ্ঠে বলিল—“বড় আশা ছিল মরণের শ্রুত পূর্ণের তার দেখা পাব! কিন্তু কই তাই? সে তো এলো না আমার যে আর সময় নাই। আমি যেন কার ডাক শুনতে পাচ্ছি।—” নগর'জ কাঁদিয়া ফেলিল। কোন কথাই সে কহিতে পারিল না। ... ..

এমন সময়ে কিছু দূরে ঘোড়ার পদধ্বনি শ্রবণ করিয়া সারা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কম্পিত কণ্ঠে কহিল—“যেথ তো কে আসছে রজন কি ফিরে এল? আমার মনে হচ্ছে সেই-ই যেন আসছে।” নগর'জ কিরিয়া চাহিল। ঘোড়ার উপরে সে একটি লোককে দেখিতে পাইল বটে কিন্তু চিনিতে পারিল না। সে রজনকে চিনিত না।

সলোমন দূর হইতে অস্বাভাবিক দেখিতে পাইয়া চিনিতে পারিলেন। সে রজন! উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—  
“রজন, রজন” আশ্বারোহী নিকটে আসিয়া বোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সলোমন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—“রজন—আজ তোমার জন্তে আমি সারাকে হারাতে ব'সেছি। শরতান,—আজ তুমি আমার ক্ষমার অযোগ্য।” তিনি রজনের প্রতি ছুটিয়া আসিতে-ছিলেন, নগর'জ যুহুর্ন্তে তাঁহাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া ফেলিল। সারার প্রতি চাহিয়া ডাকিল—“সারা,—সারা—রজন এসেছে। তাকাও। চেয়ে দেখ।—” সারার উত্তর চক্ মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল। অতি কণ্ঠে পুনর্বার চাহিল। রজন সারার পার্শ্বে বজ্রাহতের জায় বসিয়া পড়িল।

সারা নীরবে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।—রজন ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল—“কোথার বাচ্ছ সারা”—আনি, আমিই যে আপনায় হাতে তোমার হত্যা কর্দ্দুম। আমার ক্ষমা করো।—”

সারা বহ কণ্ঠে উচ্চারণ করিল—আমি বাচ্ছ, রজন, আমার পক্ষাতে এস। সে আর কথা কহিতে পারিল না। ধীরে ধীরে তাহার চক্ষুর নিয়ন্তা হইতে একটি সাদা পর্দা উঠিয়া সমস্ত চক্ ছাইয়া ফেলিল। রজন বাণাহতের জায় তাহার পার্শ্বে লুটাইয়া পড়িল।

তখন সলোমন নীরবে চক্ মুদ্রিত করিয়া বসিয়াছিলেন এবং নগর'জ যুক্তকরে আল্লার নিকটে মৃত আত্মার জন্ত মুক্তি প্রার্থনা করিতেছিল। হার, চিরজীবন বাহারা তুমি বহিয়া চাহিয়াছিল, জীবনের পরপারে তাহার পরম্পরকে পাইবে কি না কে জানে?—

# পুস্তকপানিক সমালোচনা

## আলোচনা

### শ্রীগীর্বাণ

“বিবাহের চেয়ে বড়” শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখিত একটি গল্প। বিগত ১৯৩৪ সনের অগ্রহায়ণ মাসের “শনিবারের চিঠিতে” এই গল্পটির সমালোচনা বাহির হইয়াছে; যদিও আমি ইহাকে সমালোচনা বলিতে রাজী নহি; কারণ, সমালোচনার ভাল মন্দ হই-ই থাকিবে। সমালোচক মাত্র একটি দিক দেখিয়া আলোচনা করিয়াছেন, অন্তরিকটা বাদ পড়িয়াই গিয়াছে।

প্রভাত দিগিকে “বিরের নারী” আনিতে মধ্য প্রদেশের এক “বুনো গায়ে” রওনা হইয়াছে—রেল গাড়ীতে। রাত্তার এক গাড়ীতে অশ্রু ও তার দাবার সঙ্গে দেখা। “দীর্ঘ চব্বিশ বছরের নিরাসিতা নারী বাঙালার” পিত্রালয়ে চলিয়াছেন। কত উৎসাহ!—বাগের বাড়ীর—জন্মভূমির কত কথাই এক সময়ে মনে আগিয়া উঠিয়াছে—কত তৃপ্তি! সে আরও ভাবার ব্যস্ত হইয়াছে;—বেন গোমুখীর পুতখারি খরিয়া চলিয়াছে। “বন্ধে—সবুজ মাঠ কত দিন দেখিনি প্রভাত—হুয়ে পড়া নীল আকাশ। এখনো নদীতে বকের ডামার বতো সাঁদা পাল তুলে বোম্টা দেওয়া বোর মত নৌকা নাচে, পানকোটী ডুব দেয় জলে? মাছরালা—গাছপালিক? ছেলেরা উঠানে তেমনি কাপামাছি খেলে? মেয়েরা মাঘমঙলের ব্রত করে? হারে আর তেমনি কাঠপোলাপ কোটে—সজনে ফুল? হাওয়ার তেমনি পাটের খোঁপা ঘোলে আর? সালিখানের চিরা পাওয়া যায়? কাউনের চাল?” কি অন্ধর প্রাণ চিত্রের রঙ্গ! দিগির পক্ষে পূর্ববঙ্গের এ সৌন্দর্যের স্মৃতি বড়ই প্রাণতন্ত্রী হইয়া লেখকের ভাবার কুটীরা উঠিয়াছে। “চিরা”

পূর্ববঙ্গের ভাবার খাড়া বিশেষ। “চিরা” শব্দের অর্থ—বলপ্রয়োগে উদ্ভূত করা অর্থাৎ বাহ্য বল প্রয়োগে উদ্ভূত করা হইয়াছে (ধান হইতে বল প্রয়োগে বাহির করা হইয়াছে ইত্যর্থ)। “চিরা” শব্দ অপ-প্রয়োগ বা অপ্রাচ্য হয় নাই। কবি ৮ জনমোহন সেন “রএর উড়িয়া যাত্রার” লিখিছেন যে, গোয়ালুপ টেশন হইতেই “র”টা “ড়” হইল :—

“এই একেদেহ, এই পোড়াহ  
এই গড়ইএড় পোল,  
কানে গড়গড়, দাঁতে কড়কড়  
কড়সে মাছেড় খোল।”

“জগতনাথের পণ্ডা তখন  
নামাইল ধড়াধি।”

“এঁড়ে” বাছুর বলার চেয়ে “বাড় বাছুর” বলা বোধ হয় শুদ্ধ। দেশ বিশেষে একার্থ বোধক ভিন্ন শব্দ এবং একার্থ বোধক ভিন্ন বানানযুক্ত একই শব্দ প্রায়শই দেখা যায়। “কাউনের চাউল” শুনিতে যেমন মিষ্ট ও স্বাভাবিক লাগিয়াছে, “চিরা”ও তেমনি অপ-প্রয়োগ হয় নাই। “নারী” শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায় :—

“খুসনা লইয়া সাধু হুখে ঘর কর,  
বিবাহ হইয়া আমি বাইব নারী।”

(কবি কবর)

হিন্দিতেও “নৈহর” শব্দের অর্থ পিত্রালয়। নারীর শ্রী নারী। লেখকের কি অপরাধ হইয়াছে?

প্রভাতের সঙ্গে অশ্রুর “প্রথম দেখা টেনেই।” “কোণের ঐ ছেলেটির দিকে চেয়ে কেমন ওর একটু ভালো লাগলো - এমনিই।” প্রথম দর্শনেই একটু ভাল লাগাটা অস্বাভাবিক নয়। মানুষের মনের অভ্যস্তরস্থ কোন কোন ভাবের সঙ্গে ঐ নতুন মুখখানির কোনও বিশেষ সাদৃশ্য আছে, যাহার সন্ধে পূর্বে কখনো চিন্তাই করে নাই। প্রত্যহ শত শত মানুষ দেখিতেছে, কিন্তু মনের শত শত ভাবের মিলন মাত্র ঐ একখানি মুখে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সঞ্চয় জাগরিত হইয়া উঠিল এবং অতি সহজেই ঐ মুখ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। কিন্তু “অশ্রু” বুঝিল না কেন এমন হইল; তাই ভাবিল - “এমনিই”। “পাতাবাহারের চেয়ে ভাল বনতুলসী।” কথাটা অতি সুন্দর - অতি পবিত্র। এরূপ উপমা একমাত্র মাইকেল মধুসূদন দত্তই দিয়াছেন—“তুলসীর মূলে ঘেন সুবর্ণ দেউটা।” অশোকবন বাসিনী সীতার সহিত পবিত্র তুলসীর উপমা অতি শোভনীয় হইয়াছে এবং এরূপ উপমা বোধ হয় প্রথম মধুর কলমেই মধু ক্ষরিত হইয়াছিল। লেখকের এমন ধারা আর একটা কথা ভারি সুন্দর লাগিয়াছে,—“অশ্রুর হৃদপিণ্ড পূজার ঘটীর মতো বেজে উঠল।” এ যেন মন্দিরে প্রাণের ঠাকুরের আরতির শব্দ ঘটীর বাজনা। ঘুমন্ত হৃদয় দেবতা ঘটাবাজিতেই জাগিয়া উঠিলেন “যেটুকু বেজুত লাগছিল,— ঠিক হয়ে গেল।”

“আমাদের ছোট-খাটো স্নিগ্ধ সংসার শান্তিনিকেতনেই ভালো।” কি সুন্দর আদর্শ। বি, এ পাশ করা মেয়ে ছোট কু’ড়ে ঘরে বড় মন নিয়া থাকার শান্তিটুকু বুঝিয়াছে। হিমগিরিস্থিত প্রকাণ্ড মহীকুহ হইতে চাহে না—চাহে পথপার্শ্ববর্তী পত্রপূর্ণ বটবৃক্ষ হইতে, বাহার তলার নিদাঘতাপ-দহ পথিক কণেক বিশ্রাম সুখলাভ করিবে। অতল স্পর্শী সীমাহীন সমুদ্র হইতে চাহে না—চাহে ক্ষুদ্র শ্রোত-স্বতী-হইতে বাহার স্নানীতল বারি পান করিয়া পথিক সংসার যাত্রার পথে শান্তি পাইবে। “অশ্রুর কথাগুলি যেন মনের কোটার মতো।” উদ্বাদনা আমে। হৃদয়জনিত সন্মোহের কোটারই মত—আনন্দের একটা কণার মতই।

“হ্যাঁ, শেষে হোটট খেয়ে পড়ুন। সে সেবার তার

কিন্তু আমার ওপর নেই।” এ কিসের ইঙ্গিত? হোটট খেয়ে পড়লে পারে ব্যথা পওয়াটাই স্বাভাবিক, সে সেবার তার নিতে—অর্থাৎ পদসেবার তার নিতে অশ্রু রাজী নহে। ইহা মুখের কথা। অথচ প্রাণের কথা হচ্ছে—“আচ্ছা, আচ্ছা, তাও নেওয়া যাবে”—অর্থাৎ তোমার পদসেবা করিয়া জীবন ধন্য করিতেও রাজী আছি। কিন্তু প্রভাতের ভাবটা ফলুর মত অন্তঃসলিলা; বাহিরে প্রকাশ নাই, অথচ সংঘর্ষের ভিতর দিয়াই চলিয়াছে।

পিতার সঙ্গে দেখা। “রোগ শয্যা থেকে বাবা চেষ্টা করে ওঠেন—এবার কলা চোষা।” শরতবাবুর লিখিত ‘দস্তা’ বইখানিতেও রাসবিহারী বিলাসবিহারীকে বলিয়াছিল—“কুলধর্ম করে বেড়াও গে।”

“এখানে কেউ ঘুমায় না, এই নিয়ম।” এই কয়টা কথায় প্রভাতের গভীর বেদনার একটা উচ্ছ্বাসই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। “আমি তোমার বুকের কাছে গুয়ে মরে যাব,—আর তুমি উলু দেবে।” প্রভাতের জীবন জোড়া হৃৎকের মাঝে এই যে মরণের সাধ, ইহাতেও অক্ষর স্বর্গ আছে। এই মুহূর্তটাই তার স্রব্ধের চরম।

সংস্কৃত ভাষাই বাংলা ভাষার জননী। বছদিন হইতেই সুযোগ বুঝিয়া এই বাংলা ভাষার সহিত অনেক আদিম শব্দ যথা কুলো, কিচ্‌কিচ্‌, থাম্‌কা, সেয়ান, বৈটে প্রভৃতি,—মুসলমান রাজত্ব কালে, আইন, আদালত, আবদার, কাগজ, কসুর, খবর, খরচ, নরম, ফুল, কণ্টক ইত্যাদি এবং ইংরেজী আমলে বহু ইংরেজী শব্দ যথা,—অক্সিস, ইন্স, একার, কলেজ, কলোরা, কুইনাইন, ট্রেন, টিকেট, টিন, প্রভৃতি আরো কত বিদেশীয় শব্দ বাংলা সাহিত্যে স্থান পাইয়া চল হইয়া গেল, কিন্তু আত্ম-আব, অজ্ঞ - আছে, অহম্মি—আমি, বহু—বো শব্দগুলি প্রাকৃত হইতে অপভ্রংশ হইল, তাহাতেও জাতি গেল না; কেবল প্রাদেশিক শব্দ প্রচলনের বেলায় চিরা, চিপা, চুল চিপ্তে, চণ্টা পড়া, টাইটুয় ইত্যাদি শব্দ একঘ’রে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আদিথ্যোতা, মাইরি, গ্যাছলো প্রভৃতি শব্দের আগমন কোথা হইতে? বাংলা ভাষার standard কি? শব্দ সম্পদে বাংলা ভাষা যে দীনা, তাহার সন্দেহ নাই।

কিন্তু বিভাগাগরী আমল হইতেই শব্দ সংগ্রহ চলিয়া আসিতেছে।

“যেমন রান্ধা আমলা, তুলে যমলা

গামলা ভাজেনা,

আমরা ভূবি গেলেই খুসী হব

ঘুসী খেলে বাঁচব না।”

কবিরের আমলা, মামলা, গামলা, ভূবি ও ঘুসি কোন সংস্কৃত শব্দ? অথচ সেকাল হইতেই সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। আশা করি কালে, চিরা, টাইটুস, টব্‌গা ইত্যাদি অচল থাকিবেন। কিন্তু “অশ্রু এবার মোটুস্কি,” — “টাইটু ঘোড়ার মতো বৌ টগ্‌বগ্‌ করে’ করে’—এসব বুঝিতে পারি নাই।

অচিন্ত্য কুমার সেন ও তদীয় সঙ্গবদ্ধ তরুণ লেখকগণের প্রতি বাক্যবাণ বর্ষিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্র নাথের ‘চোখের বালি’ ও ‘নোকা ভূবির’ তীব্র সমালোচনা ও বে হইয়াছিল, তাহাও বেশ মনে আছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তকেও “ভাল করে মুখতিবে পড়া” ইত্যাদি ব্যঙ্গোক্তি শুনিতে হইয়াছিল। কিন্তু—আজ—তঁাহারা প্রণম্য। কে জানে যে এই “মোটুস্কি” লেখকও একদিন বরণ্য না হইবেন। প্রতিভাবান ব্যক্তি একটা প্রবন্ধের জন্যও স্মরণীয় হইয়া বাইতে পারেন। কিন্তু সাহিত্যে অসংখ্যের স্থান নাই ইহা নিশ্চিত।

**শনিবারের চিঠি**—বৈশাখ, ১৩৩৫। প্রগতি সম্পাদক বুদ্ধদেব বাবুর ‘কালো কলম’ ও ‘একটা মাসিক পত্রিকার’ “নাম মুখে আনতে লজ্জার লাল হয়ে উঠেছে।” সেই মাসিক পত্রিকাখানিই বুঝি শনিবারের চিঠি, উক্ত মাসিকই অন্তর্ভুক্ত লিখিতেছেন—“সেই তথাকথিত সাহিত্যের বিরুদ্ধে শনিবারের চিঠি আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে।” আলোচনা করা বাউক, ‘তথাকথিত সাহিত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন’ করা সম্ভব কিনা এবং এরূপ আন্দোলনকারীর সাহিত্যক্ষেত্রে থাকার আবশ্যকতা আছে কিনা বঙ্গীয় সাহিত্যিকের কলম লাল হইয়া উঠিতেছে।

বসন্ত বাষ্টারের ‘সেকান্দরী কিল’ হজর করতঃ class IX পর্যন্ত উঠিয়া বখন Hd. master মহাশয়ের

রক্ত চক্ষু, বাক্যবাণ আর বাংলার সর্ব লিকলিকে বেত্রদণ্ডে বধাক্রমে নয়ন-শ্রবণ ও দেহের গ্রাস হইতে লাগিল, তখন ছাত্রের দল অতিষ্ঠ হইয়া কেহবা অন্তর্ভুক্ত চলিয়া গেল; কতক অনন্তোপায় হইয়া স্কুলেই রহিয়া গেল, আর কেহবা বিপথগামী হইয়া গুরুমারা বিগ্রহাই শিক্ষা করিল। তখন অভিভাবকগণ প্রমাদ গনিলেন। প্রব্র উঠিল, কচি-কাঁচাদের শিক্ষার জন্য অন্তর্ভুক্ত শিক্ষক আনা হউক, অথবা তিনিই যদি শিক্ষার ধারা পরিবর্তন করিয়া লইতে রাজী হইলেন, তবে এ শিক্ষক পরিবর্তনের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু স্কুল নষ্ট হইতে দেওয়া বাইবে না। কলে শিক্ষকের শিক্ষার ধারাই পরিবর্তিত হইল। আমার মনে হয়, “দেশ, কাল ও আবহাওয়ার দোষ” বখন সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করেনই, তখন আন্দোলনের ধারা বদলাইতে আপত্তি কি? শনিবারের চিঠি বাঁ এবিধ মাসিকের আবশ্যকতা খুবই আছে। মাষ্টার ঠাইই। কিন্তু ছেলেরা না বিগড়ায়। আমি আন্দোলন করিতে বলি—ধাকা চাই—শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা। বুধা আন্দোলন প্রয়াসই কুফল প্রসব করে। নীরব কর্ম ও অধ্যবসায়ই জরুরে বরণ করে। শনিবারের চিঠির উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু রোগীর মুখে ঔষধ তিস্ত লাগিবেই।

বাঁটা সত্য প্রকাশ করিতে দোষ নাই। কিন্তু কেহ কেহ প্যাটেন্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনের মত বর্ণনা দিয়া ইহার স্তম্ভ দেহকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন। “Realistic মহলে সর্কাপেক্ষা আমার বিবর স্বভাবতই নারী।” চিত্রকর বখন নিজের ইচ্ছামত কোন চিত্রাঙ্কন করেন, তখন প্রকৃতির চিত্রই তাহার নিকট লোভনীয় হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে কোনও চিত্রকর শিক্ষকের আসনে বসিয়া বলিয়াছেন যে, চিত্রকর নারীচিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া বখন মাতৃভাব আনিতে পারিয়াছেন, তখনই শিল্পীর কলা-সৌন্দর্য্য হুটরা উঠিবে। কিন্তু উলঙ্গবাহার কাপড় পরাইয়া নারীকে জগত সভার মাঝে দাঁড় করাইলে পরিণামে হুঃশাসনের দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে।

মাহুঘের চিন্তা, কথা এবং কার্য্য মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহাই মুখদর্শনে প্রতিকলিত হয়।

কাজেই নাড়ীর দৈহিক-সঞ্চয় অঙ্কনেরও আবশ্যিকতা তার প্রচার কার্য আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ববর্তীদের থাকে। তবে সবুজ বা অল্প রঙ্গিন আবরণ দিয়া নয় সহিত একটা সংবর্ধ উপস্থিত হয়। কিন্তু “তার কোন আলোর সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া দিলাম, কীট পতঙ্গ আসিয়া গুড়িয়া মরিতে পারিল না, এবং তজ্জনিত দুর্গন্ধে ঘরটির বায়ু দূষিত হইয়া স্বাস্থ্যহানি ঘটিল না।—সমাজ নিষ্কণ্টক রহিল।

“একযুগ আরএক যুগকে লুপ্ত না ক’রে আপনায় স্থান পায় না...ইত্যাদি.” স্বীকার করি। নূতন যুগ-প্রবর্তক যখন নূতন জিনিস লইয়া নবোন্মেষে দাঁড়ায়, হইবে, ততদিন বিদ্রোহ চলিবেই। আর যদি সেই তখন সে দেখতে পায় যে তার দাড়াইবার শীলাতল সত্যপ্রসূনে লুকাইয়া বিবধর তার বিশাল কণা বিস্তার (foundation stone) প্রস্তুত হইয়াই আছে। এবং করিয়া দংশন করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহার যত্ন অদূরে।

## মিলন বাসর রাতে—

শ্রীক্ষেত্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যবিনোদ।

ভরা পদ্মার ছ’ধারে নিয়ত আগিছে বালির চর,  
সুখের সেতারে কে যেন কেবল চালায় ব্যথার ছড়।

মিলন বাসর রাতে

বিধবার বীণা নিঃস্ব-শয়নে কাঁদনের সুর গাঁথে।  
সাগরের জল-উর্ধ্বিতে ভুলোনা শাহারার খরা বুক,  
মাধবীর মধু-মিলনে স্মরিয়ে প্রবাসীর ব্যথাটুক।  
তোমার সুখের উৎসবে শুনো ব্যথিতের কোলাহল,  
প্রাণের নব প্রাণে ভেবো বোকোকের ভুখানল।

অকালে শুকাল যারা

বিকশিত নব পুষ্প হেরেও মনে যেন রয় তারা।  
যে নদী তাহার হারিয়েছে গতি সাগরে মেশার আগে,  
জাহ্নবী কল-উচ্ছ্বাসে যেন তাহাদের কথা আগে।

হাসেনি যে আশাহত

তোমার হাসির বাঁশীতে তাদের জানিয়ে বুকের ক্ষত।  
চোতের সবুজ সঙ্কায় ভেবো শীতের শিশির রাত,  
গোধূলী শোভায় ভুলোনা রবির বুকের রক্তপাত।

মিলন বাসর রাতে

মনে রেখো কোথা কোন্ অভাগার নির্দ নাই আশিপাতে।

## শান্তি ।

## শ্রীবৈষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

অধিকাচরণ সাক্ষ্য-ভ্রমণ শেষে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। অন্ধকার একটা ভাঙা আন্তাবনের ভিতর হইতে কে আর্ন্ত-কণ্ঠে চিংকার করিয়া উঠিল, “ওঃ, আর যে পারি না! দয়া, দয়া, ওখো, একটু দয়া...”

অধিকা বাবু ঠাড়াইয়া পড়িলেন। ভিতরে ঢুকিবেন কিনা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। হঠাৎ আবার শুনিলেন, “ছুটির দিন কি এখনও আসেনি ভগবান! তিন দিন উপোস, হাত গেছে, পা গেছে কিন্তু পেট যে যায় নি...”

অধিকা বাবুর মনের দৃষ্টি মনেই রহিয়া গেল। স্বরিত-পদে তিনি ভাঙা আন্তাবলটার ঢুকিয়া পড়িয়া একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইলেন। সেই ক্ষণিক আলোকে চকিত হইয়া ভিতরের লোকটা বলিয়া উঠিল, “কে, কে আসে গো!”

অনেক নড়ল বোধ হয় পড়াছিল, তাই এ প্রথম সম্ভাবণের উত্তর অধিকাবাবু সেই ভাবেই দিলেন। “ভয় নেই, আমি বন্ধ!”

“বন্ধ, বন্ধ কে? এ জগতটার বন্ধ বলে কি কারও কেউ আছে? মিথো, মিথো, সব ভয়ো, সব ধান্নাবান্নি : সব...”

উত্তেজিত স্বর যেমন হঠাৎ গর্জিয়া উঠিয়াছিল, ঠিক তেমনই জুড়াইয়া গেল। তার স্থানে কাতরভাভরা-কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল, “না, না, না, ভুলে গিয়েছিলুম। তুমি আছ, দেবতা, জগতে কেউ না থাকলেও, দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা তুমি, তুমি আছ!!”

দেশলাইয়ের ক্ষীণ আলোকে অধিকাবাবু বাহা দেখিলেন, তাহাতে শিহরিয়া উঠিলেন। হাতের কাঠিটা নিভিয়া গেলেও সে বীভৎস দৃশ্য তখনও তাহার চক্ষের সম্মুখে থেলা করিয়া ফিরিতেছিল। নিশ্বাস ছাড়িয়া আপন-মনে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “কী ভয়ানক, ওঃ!”

লোকটা ‘হো হো’ শব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহার সে বিকট হাসিতে স্থানটা বেন গম্গম্ করিতে লাগিল।

জল, খাবার ও বাতি লইয়া অধিকাবাবু দ্বিতীয় বার বখন নিকটে আসিলেন, তখন সতৃক্কনয়নে সেগুলির দিকে চাহিয়া লোকটা বলিল, “নেহাৎ বাজে খরছা করে ফেললেন বাবু। আগে শুছন, তারপরও যদি দয়া থাকে, বলবেন, থাকো। কিন্তু, না, না, তার আগে নয়, কিছুতে না!”

সেই গলিত হস্তপদ বুড়ুকু কুটীর ভিতরেও যে এত বড় প্রলোভন জর ক্ষমতা আছে দেখিয়া অধিকাবাবু আশ্চর্য হইয়া গেলেন। তাহার কথাগুলি শুনিবার অদম্য কৌতুহল ও তিনি সম্বরণ করিতে পারিলেন না; গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, “যদি একান্তই ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে বল, শুনি।”

লোকটা একটু দূরে অধিকাবাবুকে বসিতে অনুরোধ করিয়া বলিল, “ভয় নেই বাবু, এ ছোঁয়াছ আপনার। গায়ে লাগবে না, কত বড় পাপের সাজা তা যদি জানতেন,...” বলিয়া ধানিক সে নীরবে কি চিন্তা করিল; তারপর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল।

“গ্রামের নাম শ্রীপুর, শ্রী কিন্তু তার অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের জমিদার যদি অত্যাচারী হয় বাবু, সেখানে কি লক্ষ্য থাকে? মনিব যদি করেন এক গুণ; চাকর লোকজন করে শতগুণ? পাঁচ ভুতের জালায় গ্রাম অশ্রান না হয়ে আর যায় কোথায়?

“শ্রীহরের দশা ঠিক এমনই হয়েছিল, এই সময় আমি আসি। পশ্চিমে ঘর-বাড়ী, যুবতী বোঁ সব ছেড়ে...পরসার লোভে বাবু, পরসার লোভে! এ শরতান বার ঘারে চেপেছে বাবু, তার কি হুহির হবার ধো আছে?

“বোলছিলুম, দশ বিঘে ক্ষেত, ভাগীদার কেউ ছিল না। লোকজন নিয়ে নিজে চষতুম, মেহনতে সোঁনা ফলত বাবু, সোঁনা ফলত। আকাশের মুখচেয়ে বসে থাকতে হ’ত না; সামনেই নদী, তবে বলে কখন কখন বা কিছু গোলযোগ লাগাত।...তাতেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠতুম; আরও পাঁচজনে বাঙলা থেকে ফিরে গিয়ে গল্প বা বলত তাতেই....



“এসে দেখ্‌লুম, সত্যিই বাজলার পয়সা উক্‌ছে; কেউ ধরতে জানে না। চক্কুলজ্ঞ। আর মান-সত্ত্ব ভয় জড়িয়ে তারা পড়ে আছে। তাদের কাছে হয় ত সেগুলো বড় হ’তে পারে, কিন্তু আমরা বিদেশী, ও বালাই আমাদের থাকবে কেন?”

“আসবার সময় বাড়ী মুখে প্রাণ নিয়েই এসেছিলুম বাবু, তাই মাইনে সবে বার টাকা হলেও প্রথম প্রথম সব মাসেই অন্ততঃ বার গুণা টাকা দেশে পাঠাতে ভুল করতুম না। কোথায় পেতুম!—বললুম ত অত্যাচারী মণিবার তাঁবে থেকে প্রজার রক্ত শুবে থেকে একতিল আমরা উদাস ছিলুম না। সবে এ পথে পা দিয়েছি, তাই ভয় করত। কেমন মায়্যাও যে হ’ত না, তা নয়। তবে বিদেশীর এসব ঝগড়া ভাল নয় বলে মনকে প্রবেশ দিতুম। আবার দেশের পাঠান টাকার রসিদখানা হাতে পাবার আশায় হাঁ করে পথ চেয়ে থাকতুম। জানি, কোম্পানীর ঘর, তবু, কেমন ভয় করত, যদি ভোগে না আসে? যদি, মাঝ রাত্তার পাঠান টাকাটা উরে যায়। এ চোরের ওপর যদি কেউ বাটপাড়িই করে বসে.....”

“ক্রমে সরে গেল! তখন ছুচার টাকার আর মন উঠত না, এ দিকে হাতে উপরি পয়সা এলে যে সব রোগ হয়, একটার পর একটা এসে দেখা দিতে লাগল! দেশ, পরিবার, মা একে একে সব ভেসে চলল বাবু আমি রীতিমত.....”

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে চুপ করিল। বুঝি হারাণখেই খুঁজিয়া বাহির করিবার আশায় মুক্ত দ্বার পথে পাগলা হাওয়ার তালে বার কয়েক হাঁ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া লইল। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্থতির ব্যথার তাড়নায় অস্থির হইয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, “তবু বেঁচে আছি, ধন্ত এ প্রাণকে.....এই হাতে ঘর জালিয়েছি, বেচারীদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আশ্তা কুঁড়ে কেলে দিয়েছি, ছোট ছেলের গলা এমনই করে টিপে.....ভাবলুম, দিন বুঝি এমনই করেই কেটে যাবে; কিসের ভয়! জীবনের ঢাকা একদিন যে গড়িয়ে ভিন্ন পথেও চলতে পারে, সে কল্পনাই আস্ত না। আসবে কোথা থেকে, অন্ধ যে, সে কি কখন সূর্যের আলো দেখতে পার?”

“মনিবের প্রিয় হ’তে একতিলও দেরী হ’ল না। ক্রমে তাঁর অভূত ক্ষুধা মিটারবার তার আমারই ওপর পড়ল। গ্রামবাসী অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে পাগল। আমার কিন্তু মহানুষ্ঠি.....”

“সেদিন” বলিয়া সে খানিক নীরব রহিল।

“তারপর সেদিন বামুনেদের বিধবা বৌকে নিয়ে আসার তার পড়ল!.....রাবণের সীতা হরণের মত আমিও তাকে জোর করে ঘরে নিয়ে এলুম।.....”

“সে অপমান সে সহ করতে পারলে না, কেঁদে অভিসম্পাত করলে কায়মনোবাক্যে যদি সত্যী হই.....”

“হেসে উঠলুম, বললুম, ‘সে সত্যী এই মাত্র ধূলোর গুটিয়েছে তাত জান্‌ছ; আর কেন, কিসের গুমোর.....’

“ডাক ছেড়ে সে কেঁদে হাত ছুঁখানা ওপর দিকে তুলে বলে উঠল, ‘ভগবান্‌, তুমি কি নেই?’

‘হো হো’ করে হেসে উঠে বললুম, ‘ওটা কোন দুর্কলের চালাকি বুঝ্‌লে! মোটের ওপর সব বাজে, সব বুটো, সব.....’

“নিশ্বাস ফেলে সে বললে, ‘ঠাকুর, বুঝলুম, তোমার বাজের আশুগ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নইলে.....’

“আমি তেমনই হেসে বললুম, ‘সে অনেক কাল। আপাততঃ, আমার কাছে বা হবার তা’ত হ’ল, এখন মনিবের কাছে বল!’

“তিন দিন কাটেনি! সত্য বলছি, তার সে গুমরে-পড়া দেহটা মনিবের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবার পর তিন দিন কাটে নি!.....পরে শুনলুম আর বেশী অত্যাচার সহ তাকে করতে হয়নি, পথেই বুক কেটে সে মারা গেল..... সে দিন হাসতে পেরেছিলুম বাবু, আজ কিন্তু তা পারি না; কারণ, সত্য নুষ্ঠি ধরে আজ আমার পাগের দণ্ড দিতে এসেছে!.....”

“হ্যাঁ, তিনটে দিন আমি বেশ নুষ্ঠিতেই ছিলাম। বাদাম পেস্তার দিকি ভাল ভাল ওড়াতুম, আর হজম করবার জন্তে.....কিন্তু, তিনদিন মাত্র তিনটে সূর্যের আলো আমার অন্ধত ঝাঝুতে পেরেছিল! তারপর.....”



“দেখতেই পাচ্ছেন তারপর কি? হ্যাঁ, কি করে হ’ল তাই বলছি, সেবজার কোঁপ যখন সাধ করে কিনে এনেছি, তখন.....তবু উপলক্ষ্য, হ্যাঁ, তাও একটা আছে।

“সেদিন কিছুতেই আর স্বস্তি আসছিল না। তিন তিনটে পালোয়ানকে কসরতে হারিয়েও ‘দম্’ হয় নি। কোদাল হাতে মাটি কোপাতে লেগে গেলুম। সেই হ’ল কাল।

“বাবু দূর থেকে হরত দেখেছিলেন, কাছে এসে উৎসাহ দিয়ে বললেন, এমন কোপাতে পার তুমি রাম সিং, আর পেছনের বাগানটা রদি হয়ে পড়ে আছে! একটু যদি দেখ.....

“ক্ষুষ্টি দেখে কে, আমি তখনই লেগে গেলুম। বাবু মানা করলেন; বড় বড় সাক্ষরদরা হাত থেকে

কোদাল কেড়ে নিতে এল! হু’জন বুড়ো আমার বাপের বয়সী হবে, বললে, ‘গরম হয়ে গেছে বাচ্চা, আর নয় ছোড়....’

“আমি ঠাট্টা করে বললুম, ‘এ তোমাদের ঠাণ্ডা রক্ত নয় দোবেজী, আমি এখন পাঠাঠা গরম হতে ঢের দেবী?’

“সকলের নিষেধ না শুনে গিয়ে একথানা এতটুকু কাঁচের আচড়ে এই প: থানা জখম করে এলুম! রক্ত আর ধামতে চার না! কত ডাক্তার, বন্দিই এল, সাক্ষরদরা কত জলপটিই বাঁধলে! কিন্তু, দেখছেন ত অবস্থা? বলুন, বলুন, বাবু, এর পরও কি এ পাখটাকে আপনার দয়া হয়? খেতে দিতে হাত উঠে?...”

অধিকা বাবু উত্তর দিবেন কি, তাঁহার সে শক্তি তখনই একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে!

## মুক্তি নীতি

### শ্রীমতী শরৎকামিনী সেন

( ১ )

নিদাঘের ভীষণ দাহনে

মনে হ’ল অধীনতা ছালা

বরষার ঘন বরিষণে—

মুছিল না জলয়ের ম’লা।

( ২ )

শরভের শিশির সম্পাতে

আগে যবে মুক্তি পুরুষ,

হিমালীর কুপাণ সজ্বাতে

আর্য্য নারী হয়নি বেহুস।

( ৩ )

বরষের চাপা বক্ষ: তলে

লক্ষ বলির করি আয়োজন,

বসন্তের কাগ্ মাখি তলে

জননীরা হেসে হেসে বলে

রক্ত গড়া হল আয়োজন।



বাংলার পাটের চাষ সম্বন্ধে এত দিনে কংগ্রেসকর্মীর চৈতন্যোদয় হইয়াছে। সত্যিকার কাজ যদি কিছু করিবার থাকে তবে প্রথম কৃষি ও পরে শিল্প। বাংলার পাটের চাষ যদি Control করা যায়, তাহা হইলে পাটের বিক্রীটাও হাত করা যাইবে এবং ইচ্ছামত মূল্য দিয়া বণিকগণ নিতে পারিবে না, পরন্তু middle man (মধ্যবর্তীদের) দের হাতে পড়িতে হইবে না বলিয়া কৃষকগণ পাটের মূল্য বেশীই পাইবে। কৃষকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা হইলে, মহাজনের ঋণ, জমিদারের খাজানা দিয়া বাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা দ্বারা ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় বহন করিতেও পারিবে। কিন্তু এই সকল সম্বন্ধেও তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। মোট কথা, কংগ্রেস যদি এ কাজ হাতেই নিরাছে তবে সবদিক ছাড়িয়া একনিষ্ঠ কর্মী দ্বারা যদি কৃষকদের সংগঠন সাফল্যমণ্ডিত হয়, তবে দেশে Common wealth বাড়িবে ও অন্ন সমস্যার (Bread question) সমাধান হইবে। অবশ্য বেকার সমস্যাও ইহার গভীর মধ্যে আসিয়া পড়ে। পাট সম্বন্ধে, বিগত আধুনিক মাসের পূজার Forward পত্রিকার প্রবৃত্ত প্রভুদয়াল হিন্দুসিংহ, যে suggestion দিয়াছিলেন তাহা মূল্যবান মনে করি।

পাটের চাষ কমাইয়া দিলেই হইবে না। ব্যাঙও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক Jute Centre গুলিতে গোলা স্থাপন করতঃ কৃষকদের উচ্চমরে পাট বিক্রীর ব্যবস্থাও করিতে হইবে। যতদূর ব্যবসায়ীসুগ সম্ভবদ্ব ভাবে অগ্রগতি করিয়া যে দর নির্ধারণ করিয়াছে, তাহাই তাহাদের দ্বারা দান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

দেশের আর সমস্ত দূর করিতে হইলে, শিল্পোদয় হইবে। কৃষকদের হস্তে কৃষি যন্ত্রাদি দান করা হইতে পারিলে, তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে।

থাকি। অথচ চটকল করিয়া অন্ততঃ দেশের ছালাগুলিও তো বিক্রী চলে। তাহাতে হাজার হাজার লোক খাটিয়া থাকিতে পারে। যে সব জেলায় সুবিধা আছে, যেমন—নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে চটকল করিয়া কাঁচা মালগুলির দ্বারা ছালা ও চট করিতে পারিলে সত্যিকার কাজ হইত। এক চাকেরখরী বিল হওয়ার বহুলোক খাটিয়া থাকিতেছে। আরো ২০টা চটকল হইলে পাটের বাংলার চড়িয়া যাইত। প্রতি বৎসর প্রায় ১১০০ খানা চট ও ছালার তাঁত বাড়িতেছে। কলিকাতার চটকলগুলি প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকা রিজার্ভ ফণ্ড রাখিয়াও লভ্যাংশ কোটি কোটি টাকা বিভাগ করিয়া দিতেছে। অর্থাৎ হইতে হয় যে, ১৯২০ সনে 'কিনিসন মিল' (Kinnison) শতকরা চারিশত টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছে। গৌরীপুর ফুট মিলের রিজার্ভ ফণ্ড (Reserve other funds) সত্ত্বেও হই কোটি টাকার মত। এসব দেখিয়া তুমিরাও কি দেশের লোকের চক্ষু ফুটিবে না? কাউন্সিলে গিয়া গলাবান্ধী করিয়া যে কথা কিছুই হয় নাই, তাহা কি এতদিনেও দেশের নেতারা বুঝিল না? কিন্তু একটা প্রবল নেশা। স্বতঃস্ফূর্ত বতবির জেলে ছিলেন, ততদিনেও কোন কাজ করেন নাই—কাউন্সিলেও বান নাই, এথেন্সো কাউন্সিলে না গিয়া বাংলার পরি সংগঠনই করুন। তারপক্ষে দেরর না হওয়াটা ভালই হইয়াছে। বাংলার পরীক্ষননী তাহারে ডাকিতেছেন, তিনি বহু থাকিতে পারেন কি?

বাংলার অর্থের অভাব নাই কর্মীরও অভাব নাই প্রত্যেক জিলা কংগ্রেসগুলি শিল্প বিধানে অবহিত হউন। দেশের লোক কৃষকদের হস্তে কৃষি যন্ত্রাদি দান করিয়া পারিলে আর কষ্ট ও সঙ্গে সঙ্গে দূর ডাকিয়া বাড়ির

বাইবে। দেশের বহু সুবক আধুনিক লেখাপড়া শিখিয়া নিরুপার—কর্ষহীন অবস্থার বলিয়া আছে। দুঃখ দৈন্ত আরও বাড়িয়া বাইতেছে। বিপদ হইয়াছে মধ্যবিত্ত লোকদের। একসঙ্গে কত্কা, বস্তা, চুর্ভিক, মহামারী ইত্যাদি কত কি যেন চারিদিক হইতে গ্রাস করিতে উত্তত। যে নিজকে নিজে সাহায্য করে, ভগবান তাহাকে সাহায্য করেন। নিজের পায়ই দাড়াইতে হইবে। দেশের ধনিক ও শ্রমিক মিলিয়া শিল্পোন্নতির চেষ্টা না করিলে অদূর ভবিষ্যতে উভয়কেই মরিতে হইবে।

বাণিজ্য বলিতে, ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের শিল্পোন্নতি দ্রব্যের আদান প্রদান। এবং ঐ সকল দ্রব্য আনা নেওয়ার যান বাহনাদির সুব্যবস্থা প্রভৃতি ভারতের নিজস্ব ভেতন উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। অন্তর দেশ যেমন আমাদের কাছে পাকামাল ( Finished manufactured goods ) পাঠায় আমরা তৎপরিবর্তে তেমন কাঁচা মাল ( Raw produces ) পাঠাই। ইহাতে আমাদের ক্ষতি বই লাভ জতি সামান্যই। লোহার কারখানা, কাঁচের কারখানাগুলি হইয়া কতকটা টাকা দেশে থাকিয়া বাইতেছে বটে এবং তা পাঠাইয়া বিদেশের টাকা আসিলেও পাট চামড়া গম প্রভৃতি শস্ত সস্তার পাঠাইয়া জতি অল্প টাকাই আসিতেছে।

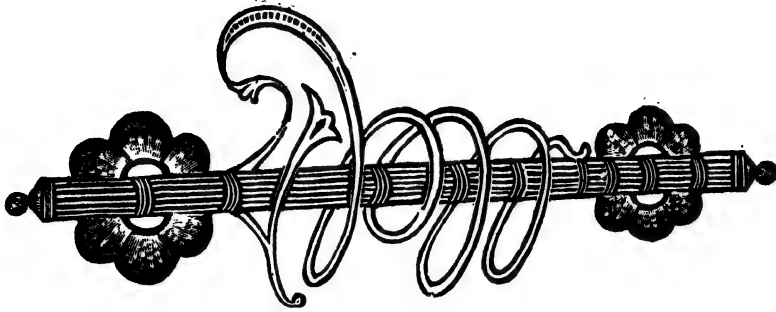
‘জাপান পোর্ট’ বর্তমানে বাঙ্গালার খুব বড় অন্ততম (মাল বিদেশে বাণিজ্য করিবার) ‘বন্দর’। রেলুন হইতে

প্রশান্ত মহাসাগরীয় বন্দর ( Pacific Ports ) গুলিতে মাল পাঠানো পূর্ববর্তের মহাজনদের খুবই সুবিধা হইয়াছে এ সময় দেশীয় বৈজ্ঞানিক সাহা মহাজনগণ শিল্পোন্নতির দিবে চেষ্টা করুন না। সাহস করিয়া বিদেশে বাণিজ্য করিবার এ সুযোগ ত্যাগ না করিতে অনুরোধ করি।

অর্থাত্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিশৃঙ্খলা আসির পড়িয়াছে। অর্থাত্ভাব মুখ্য না হইলেও ইহার গৌণ কারণ। আমার মনে হয় সামাজিক ঋণী সরকারের দিকে যতটা ন গিয়াছে, ঈর্ষা সমাজকে ততটা অগ্রদিকে নিয়াছে। বাস্তবিক উন্নতি যদি মানুষ চাহিতই তবে পেটের সংস্থান ঠিক রাখিয়া অন্য সব করিত। যে দেশে ‘অন্নচিন্তা চমৎকার’ সে দেশের লোক কি করিয়া দলাদলিতে যোগ দিয়া সমাজের উন্নতির চিন্তা করিতে পারে। ইহার মূলে জন করেক লোকের স্বার্থপরতা ও আত্মসত্ত্বিতাই প্রকাশ পাইবে। প্রকৃত জাতীয়তা যদি জাগিয়া উঠে, সে তো ভাব কথা। কিন্তু বর্তমানে উপনয়ন রূপ শাটফিকেট নিয়ম অশৌচ কমান ব্যতীত আর কিছু সামাজিক উন্নতি হইয়াই বলিয়া তো মনে হয় না। হিন্দুর কর্ণ, পতিত—অন্ত্যত হিন্দুর মধ্যে জ্ঞানদান দ্বারা জাতির উদ্ধার করা। সমাজের নেতাগণের সে প্রচেষ্টা আছে কি? কেবল ‘আমি তোমার বলে বড়’ ইহা ব্যতীত অন্য কথা কারো মুখে নাই। তাই হিন্দু সমাজের বিশৃঙ্খলা।







তৃতীয় বর্ষ ]

শ্রাবণ, ১৩৩৫

[ ১১শ সংখ্যা

## বাদল-বেলার অঙ্ককারে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাদলবেলার-অঙ্ককারে সাগর-তীরে একা’

পেলাম তোমার দেখা ।

তরঙ্গেরি রঙ্গভরা—আঁখির পানে চেয়ে,

দেখ্’ কারা আসছে ধেয়ে আপন তরী বেয়ে

ধূসর বালুকায় ;

লুকিয়ে বসে একলা আমি দেখ্’ছি গো তোমায় ।

দিনের আলো পালিয়ে গেল জ্বালিয়ে কালো বাতি,

মন-গহনে কোন্, পাগলের এমন মাতামাতি !

কাজল আঁধারে

না জানি হায় কোন্ তরুনী আসবে এপারে ?

বসে’ আছ আজকে তুমি অঙ্ককারের মাঝে,

শূণ্য জুড়ে’ গভীর সুরে বাদল ভেরী বাজে !

ঋগ্‌পা পবন আনছে বয়ে’ মেঘের-মেলা ওই,

লেখা আছে ওইতে তোমার প্রিয়ের হাতের সই ।

অমন করে করুণ-ভরে বাদল-আঁধারে,

চেয়ো না আর পথের দুঁধারে !

দেখ্‌ছ' না ওই দূরে,  
 শাল তমালের সুর মিশেছে বাদল ধারার সুরে !  
 ওই সুরে মোর পাগল হিয়া যায় গো ভেসে যায়,  
 কোন্ সীমানার আড়াল হ'তে কে ডেকেছে হায় ।  
 সেই পুরানো প্রিয়ায় আমার লাগছে না ভালো,  
 সাগরকূলে আপন ভুলে এসেছি তাই খুঁজতে সে অলো  
 সেই আলো ওই তোমার আঁখি তারায়,  
 আজকে মোরে পথ দেখায়ে যায় নিয়ে যায় কোন স্রুদূরের সীমায়  
 সেই আলো মোর লাগলে ভালো।  
 মন মাঝারে,  
 কোন্ তরুণীর আনাগোনা  
 অন্ধকারে ?  
 বুঝতে নারি পরাণ কোণে কাহার ব্যথা ?  
 নিঃশ্রমিয়া বইছে কেবল করুণ কথা !  
 বাদল-ব্যথার সুরে সুরে  
 কে কাঁদে আজ পরাণ-পুরে ?



## বাঙ্গালা ও আসামে বিধবা-বিবাহ\*

### শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষচৌধুরী

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে কোন কোন পরাক্রান্ত অনার্য্য নৃপতি বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া এই দুই গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এরূপ রীতি যে তাহাদের বথেষ্টাচারিতায় সংঘটিত হইয়াছিল, প্রাণধানপূর্ব্বক বিচার করিলে তৎসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কেহ কেহ বলেন—“মহাভারতে অভাষ পাওয়া যায়, দময়ন্তী জানিতেন নলরাজ্য নিরুদ্দেশ হইলেও জীবিত ছিলেন। কিন্তু দময়ন্তীর পিতা ইহা জানিতেন না। মহাভারতের যুগে বিধবা বিবাহপ্রথা প্রচলিত না থাকিলে দময়ন্তীর পিতা তদীয় প্রাসাদে সম্বরণ সভার অধিবেশনে বাধা দিতেন। যাহা হউক, অনার্য্য সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের কোনরূপ অভাষ এই দুই প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত কলিযুগে “নিয়োগ” পদ্ধতি রহিত হইয়াছে। ইহা বিবাহের অত্যন্ত পদ্ধতি বিশেষ নহে। অপুত্রক বিধবার পুত্র না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঋতুকালে তাহার দেবর অথবা জ্ঞাতি উপগত হইতে পারিত। এই প্রথাকে নিয়োগ এবং এই বিধবার গর্ভোৎপন্ন সন্তানকে “ক্ষেত্রজ” বলে। নিয়োগ প্রাপ্ত রমণীকেও বিধবার যাবতীয় আচার পালন করিয়া চলিতে হইত। আদিত্য পুরাণের মতে নিয়োগ গ্রহণ নিষিদ্ধ।

কোন স্থিতি শাস্ত্রকার “বিধবার বিবাহ হউক” বলিয়া স্পষ্টভাবে কোন বিধিবিধান দেন নাই। মনু বিধবা বিবাহের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া কেবল মাত্র বলিয়াছেন, “বিধবা বিবাহের কোন শাস্ত্র বিহিত পদ্ধতি নাই।” আপস্তম্ব স্থতিতে বিধবার পক্ষে দুইটা পথ নির্দেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি সহমরণ এবং আর একটি ব্রহ্মচর্য্য

অবলম্বন। পরাশর সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে আগরা দেপিতে পাই :—

গতে মৃতে প্রব্রজিতে ক্রীবে চ পতিতে পতৌ।

পঞ্চাপংসু নারীনানং পতিরন্তো বিধীয়তে ॥ ২৭

অর্থাৎ—স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, মরিয়া গেলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্রীব বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে অথবা পতিত হইলে, এই পঞ্চবিধ আপদে স্ত্রীলোকদিগের পুনর্বিবাহের বিধি আছে। এখানে উল্লেখ যোগ্য—শ্লোকস্থ “পতিতে” অর্থে পতিত হইলে, অর্থাৎ স্বামী শাস্ত্রবিহিত আচার ব্যবহার অথবা সংস্কার লুপ্ত হইলে নারী পুনর্বিবাহ করিতে পারে। এখানে কথা হইতেছে—বর্তমান যুগে কয়জন ব্যক্তি বেদবিহিত আচার ব্যবহারের ব্যতিক্রম করেন না? এরূপ স্থলে নারীমান্নকেই পুনর্বিবাহের বিধিব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত “পঞ্চাপংসু নারীনানং পতিরন্তো বিধীয়তে” এই উক্তির অন্তর্গত পতি শব্দে ঠিক স্বামী বুঝায় না। বাগদানের (১) পর পাত্রকেও যে পতি বলিয়া অভিহিত করা চলে, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত অন্যান্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ইহাই প্রচলিত ব্যাখ্যা। সুতরাং পরাশরের এই বিধানটা বাগদত্তা কথ্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য—বিবাহিতা স্ত্রী সম্বন্ধে নহে।

যে নারী অত্র ব্যক্তিকে পুনরায় বিবাহ করে সাধারণতঃ তাহাকে “পুনর্ভূ” বলে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে কি অক্ষত যোনি, কি ক্ষত যোনি, যে স্ত্রীর

\* এই প্রবন্ধটি “বঙ্গীয় গ্রন্থকার সমিতির উদ্যোগে লেখক কর্তৃক কলিকাতা সরস্বতী ইনষ্টিটিউটে গঠিত হইয়াছিল।

(১) বাগদান—প্রায় ৫০ বৎসর (অর্থাৎ প্রায় ১৮৭৭ খ্রিঃ অব্দের) পূর্ব্বে বৈদিক কল্পাগণের বিবাহের পূর্ব্বে



পুনরায় বিবাহ সংস্কার হয়, তাহাকে পুনর্ভ বলে ।  
প্রমাণ যথা :—

“অক্ষত চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতঃ পুনঃ ॥” ১।৬৭  
যাজ্ঞবল্ক্য

বশিষ্ঠ বলেন :—

পাণি প্রোহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্র সংস্কৃত ।

স। চৈদক্ষতযোনিঃ স্তাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ ১৭ অঃ

অর্থাৎ—পতির মৃত্যু হইলে অক্ষতযোনি স্ত্রীর  
পুনরায় বিবাহ সংস্কার হইতে পারে ।

মহাভারতের আবির্ভাবের পরবর্তী যুগ হইতে  
হিন্দুর সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে,  
যে সকল জাতির লোকেরা বর্ণাশ্রম ধর্মের একান্ত  
পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, অথবা ঠাঁহার উচ্চ শ্রেণীর  
হিন্দুদিগের আদর্শ ও ক্রিয়াকলাপ অনুবর্তন করেন,  
তঁাহাদের সমাজে বিধবা বিবাহ আমোল পায় নাই ।  
প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়—  
উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুরা ছিলেন সংযমী । তঁাহাদের  
সামাজিক রীতি-নীতি সাত্বিক ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত  
ছিল । তঁাহারা বিধবা কন্যাদিগকে বর্ণাশ্রমাদি  
ধর্ম শিক্ষা দিতেন । ইহার ফলে ঐ কন্যাদিগের মনে  
সংসার অসার, ঐহিক স্বখ-স্বচ্ছন্দ কিছুই নহে এইরূপ  
বোধ হইলে, ভগবৎ চিন্তা মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য  
ভাবিয়া তাহাতেই তঁাহারা আত্মনিয়োগ করিতেন ।

১৭৫৬ সালে ঢাকার রাজা রাজবল্লব রায় বাহাদুর  
বৈধব্যদশাপন্ন তদীয় কন্যার পুনর্বিবাহ প্রদানার্থ  
ইচ্ছুক হইয়া তৈলঙ্গ, বংগালী, মিথিলা প্রভৃতি  
নানাদেশ হইতে বহুসংখ্যক মহামহোপাধ্যায়  
পণ্ডিতকে তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদান করিতে আহ্বান  
করিয়াছিলেন । সেই সকল অধ্যাপক মহাশয় রাজা  
বাহাদুরের মতামতকুল স্মৃতিসম্মত বিধিবিধান না

বাগদান হইত । কোন কারণে যে সকল কন্যার বাগদত্ত  
পতির সহিত বিবাহ হইত না, সেই সকল কন্যার পিতামহা  
সমাজে পতিত হইতেন । অতঃপর তঁাহারা শাস্ত্রীয় বিধান  
অনুযায়ী সমাজে গৃহীত হইলে ঐ কন্যাদিগের পাতিত অন্ন  
গ্রহণ করিতেন না ।—লেখক :-

পাওয়ায় বহু আলোচনার পর পরামর্শের উক্ত বিধি  
ব্যবস্থাটি প্রদান করেন । পণ্ডিত-প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র  
বিদ্যাসাগর দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, অক্ষতযোনি  
বিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়া শাস্ত্রসিদ্ধ । স্বামী  
সহবাস ঘটিয়াছে, এমন কোন বিধবার বিবাহ তিনি  
সমর্থন করেন নাই, বরং তাহাতে প্রতিকূল অভিমত  
প্রদান করিয়াছেন । বর্তমান যুগে এই মহাত্মার  
উক্তি প্রাণধান যোগ্য ।

বহুকাল হইল বঙ্গদেশে বিধবা বিবাহ অতীব  
মানিকর কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে ।  
এদেশে তথাকথিত বৈষ্ণব ও কাওরা ব্যতীত অতি  
নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু সমাজে এই উনবিংশ শতাব্দীর  
প্রারম্ভেও আমরা বিধবা বিবাহ দেখিতে পাই নাই ।  
মহাপ্রভু তদীয় ভক্তগণকে বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষা করিতে  
অথবা উঠাইয়া দিতে বলেন নাই । তথাকথিত  
বৈষ্ণবগণ স্বেচ্ছানুযায়ী কণ্ঠিবদল করিয়া বিধবার  
পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে মাত্র । ১০।১১ বৎসর  
( অর্থাৎ—১৯১৭—১৮ সাল ) পূর্বে কোন কোন  
কাওরা জাতীয় বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহের কথা  
আমরা শুনিয়াছি । অতঃপর তাহাদের সমাজ  
হইতে এই প্রথাটি ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে । পশ্চিম  
বঙ্গের নমঃশূদ্র সমাজে আজিও বিধবা বিবাহের  
প্রচলন হয় নাই । পূর্ব-বঙ্গের কয়েক জন উচ্চ  
শিক্ষিত নমঃশূদ্র বিগত ১৯২৪—২৫ সাল হইতে  
তঁাহাদের সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলনার্থ সবিশেষ  
চেষ্টিত হইয়াছেন । আমরা জানি—তঁাহাদের চেষ্টায়  
ঐ অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে বিধবা বিবাহ সম্পন্ন  
হইয়া গিয়াছে । যাহা হউক, বিধবা গর্ভোৎপন্ন  
পুত্রকে পৌনর্ভব বলা হইত । বর্তমানে ( অর্থাৎ  
১৯২৭ সাল ) বঙ্গদেশে এই পুত্র কি উচ্চ-শ্রেণীর কি  
নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুর নিকট অস্পৃশ্য ? যাহাতে বিধবার  
গর্ভজাত জগৎহত্যা সংগোপনে না হয়, এজন্ত কিছু  
দিগ হইল নবদ্বীপ ধামে “মাতৃ মন্দির” নামক একটি  
প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত হইয়াছে ।

উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু-সমাজে সচরাচর দেখা যায়— যদি বিধবার স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত ধন সম্পত্তি না থাকে, তাহা হইলে কি পিত্রালয়ের, কি স্বস্ত্রালয়ের আত্মীয়রা সাধারণতঃ তাহাকে গলগ্রহ ভাবিয়া তাহার স্মৃৎ-দুঃখে ওঁদাসিত্ব দেখাইতে থাকে। তখন বাঁচিয়া থাকা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র বলিয়া বোধ হয়\*। অধিকাংশ সংসারে পিতামাতার অবর্তমানে বিধবার দুঃখ-কষ্টের পরিসীমা নাই। আর এক কথা—অল্প বয়স্কা বালিকা, বিধবা হইবার পর পিতামাতা কিংবা আত্মীয়-স্বজনের নিকট নৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইল না কিংবা তাহার কোন আদর্শ চরিত্রা সঙ্গিনী মিলিল না। যৌবনে মানসিক বৃত্তি নিচয় প্রবল থাকে। সঙ্গিনীগণের বৈশিষ্ট্যের পারিপাট্য দর্শন ও বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে তাহাদের নিকট স্বামীর নিত্য নূতন আদর সোহাগের কথা শ্রবণ দ্বারা অনেক সময় যুবতী বিধবাদিগের মানস ক্ষেত্র হাহুতাশে বিক্ষুব্ধ হওয়া সম্ভবপর। ইহার দ্বারা মানসিক বৃত্তিনিচয় বিকৃত হইয়া থাকে। ৫০।৬০ বৎসরের কোন কোন বিপত্নীকে দারপরিগ্রহ করিতে দেখা যায়। তাহার অন্তিমকাল আগত প্রায় তথাপি তিনি সংসার বাসনা ও স্মৃথের আশা করেন, হিন্দুসমাজে সে বিষয় কর্তব্য নহে। আর দুঃখনীয় হইল অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ দেওয়া!! আমাদের বিশ্বাস—সমাজ সংস্কার ও বর্ণাশ্রম ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা না হইলে সমাজে বয়স্কা বিধবার বিবাহও ক্রমশঃ আমোল পাইবে, হিন্দুর বড়ই গৌরবের এই সাবেক প্রথাটি বিলুপ্ত হইবে।

অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত এদেশের কোন কোন ব্যক্তি—(ঈহারা নামে হিন্দু, আচারে হিন্দু নহেন) — বলিতেছেন :—“প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্মলোপ পাইয়াছে। কালমাহাত্ম্যে জায়েগ মতিগতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আদর্শ নিয়মপ্রণালীর ও পরিবর্তন ঘটয়াছে। বর্তমানে এদেশে পূর্বের মত বিধবার আদর্শ পিতামাতা পরিলক্ষিত হইতেছে না

এবং “আপনি শিখান ধর্ম আপনি আচারি” এই মহান ভাব এককালে যাহা তাঁহাদের অন্তর্নিহিত ছিল, এখন তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। এ কারণ সাবেক বিধি ব্যবস্থা জাহারামে গিয়াছে এবং বর্তমান যুগধর্মের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং বিধবা বিবাহ দেওয়া যুক্তি সঙ্গত।” এই অভিমতের মিমামসা স্থগিত করিবেন। ইহাদের (২) সমাজ গঠন, জাতীয়তা সংগঠন এবং নৈতিক শিক্ষা বিস্তারের দিকে আদৌ লক্ষ্য নাই। এই কয়টি বিষয়ের সফল উৎপাদনে ইহারা যদি প্রয়াস পাইতেন তাহা হইলে হিন্দুর বিলুপ্ত গৌরব ক্রমশঃ উন্মেষ লাভ করিত। সত্য কথা বলিতে কি—ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধোঁপা, মেথর ও বিধর্মীর সহিত একত্রে ভোজন করিয়া জনসাধারণের নিকট আপনাদের উদারতার পরিচয় দিয়া থাকেন—অথচ সাধারণ শ্রেণীর কোন ব্যক্তি কোন কার্য উপলক্ষে ইহাদের বাড়ীতে গিয়া ধরা দিয়াও সাক্ষাৎ পান না।

আসামে ব্রাহ্মণ, ‘খাতি’ (বিশুদ্ধ) কারহু ও দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ (গনক) ব্যতীত কলিতা, কেওট, নাজিত, কুমার, নট প্রভৃতি জাতির সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। আসাম কলিতা প্রধান দেশ। ইহারা কৃষিজীবী। বিগত ১৯২৯ সন হইতে গোহাটী অঞ্চলের চাষ্ট, বেনসর প্রভৃতি গ্রামের কয়েকজন শিক্ষিত কলিতা জাতীয় ভদ্রলোক আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় (৩) কলিতা বলিয়া সর্ব প্রথম ঘোষণা করেন। অতঃপর তাঁহারা সমাজে উপযুক্ত পরি ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন চালান। ইহার ফলে প্রথমে তাঁহাদের কয়েক জন আত্মীয় স্বজন এবং তৎপরে অগ্ৰাণ স্থানের কলিতাগণ তাঁহাদের দেখাদেখি ক্ষত্রিয় হইয়াছেন ও হইতেছেন। কিন্তু

(২) পুত্রপুত্রের জ্ঞান এরূপ কষ্টকে পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ দেওয়া একান্ত কর্তব্য।—লেখক। (৩) ক্ষত্রিয়—কলার জন কয়েক কারহু আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কারহু কখনই ক্ষত্রিয় নহে—মৌলিক জাতি।

আজিও গোঁহাটা অঞ্চলের এই নব্য ‘ক্ষত্রিয়কলিতা’ সমাজে বিধবা বিবাহের পূর্ববৎ প্রচার প্রচলন আছে। প্রাচীনকাল হইতে ক্ষত্রিয় সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্মের আমোল পাইয়া আসিতেছে কিনা, তাহা ঐতিহাসিকগণের আলোচনা সাপেক্ষ। যাহা হউক আসামে কলিতা, কেওট, নট আদি জাতির সমাজে বহুকাল হইতে একই পদ্ধতিতে বিধবা বিবাহ হইতেছে।

আসাম অঞ্চলের কুত্রাপি বিধবা বিবাহ ‘কনর গুরিত গা ধুয়ান’র কালে গাজ হরিজার আবশ্যক হয় না। হোম করিবার বিধিও নাই। ‘মধ্য আসাম’ও ‘উপর আসাম’এ এই বিবাহ উপলক্ষে ‘বেই’ নিম্নয়োজন। এতদ্ব্যতীত অত্যাশ্র প্রচলিত প্রথার কথা পরে বলা হইতেছে। অসমীয়া বিধবারা কপালে সিল্পুর পরিধান কিংবা ব্রতাদির অনুষ্ঠান করেন না। নগ্ন-সংখ্যক ভদ্রঘরের কলিতা, কেওট ও ‘সাধারণ কায়স্থ’ জাতীয় মহিলাদিগের পর্দা আছে। গোঁস্বামী বংশীয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, বিশিষ্ট দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ও বিদ্বৎ কায়স্থ দিগের বাটীর মহিলারা ব্যতীত অত্যাশ্র শ্রেণীর মহিলারা ‘নাট—ভাওনা’ (যাজা), ‘ভঠানি’ (৪), দেউল প্রভৃতি উৎসব দেখিতে বাটীর বাতির হইয়া থাকেন।

তেজপুরের ত্রিমূর্ত লক্ষীকান্ত বড়কাকতি মহাশয় বলেন (৫)—দরঙ্গু জেলার তেজপুর অঞ্চলে ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ব্যতীত অত্যাশ্র জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবা বিবাহে গাজ হরিজা দেওয়া অথবা প্রথম বিবাহে যেরূপ নিয়মমত হোমাদির অনুষ্ঠান করা হয়, এ অঞ্চলে তজ্রপ করা হয় না। পাত্র পাত্রী উভয় পক্ষের অত্যাশ্র স্বজন এবং গ্রামস্থ ব্যক্তির নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহ সভায় সম্মিলিত

হইলে বরপক্ষ, পাত্রীকে অলঙ্কার পরিধান করাইয়া সভাস্থলে উপস্থিত করিলে পাত্র-পাত্রীকে আশীর্বাদ করিয়া জলযোগ করে।

নগাঁও, শিবসাগর ও লখিমপুর জেলায় বর, বিধবার পিত্রালয়ে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে ‘আলোচাউল’ দেওয়া হইলে বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু নিম্ন আসামের অর্থাৎ গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার প্রথা অনুসারে বিধবাকে তাহার পিত্রালয় অথবা মৃত স্বামীর বাটী হইতে লইয়া গিয়া নূতন স্বামীর বাটীতে ‘আলোচাউল’ দেওয়া হয়। যদি কথা স্বামীগৃহে যাইবার পূর্বে বিধবা হয়, এবং তাহার দ্বিতীয় সংস্কার না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নূতন স্বামী ঢাক-ঢোলের বাগ্গসহ তাহাকে পিত্রালয় হইতে একটু আড়ম্বর করিয়া নিজ গৃহে লইয়া যায়। বিধবা বিবাহে ‘আলোচাউল’ প্রদান কার্যটি সংক্ষেপে হয়। অবশ্য ভদ্রলোক হইলে একটু শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্ত পূরাভাবে উহার অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে পায়সপূর্ণ পাত্রবয়ের আদান প্রদান হয় না। ‘আলোচাউল’ দেওয়ার অগ্রে কন্ডার বাটীতে উলুধনি ব্যতীত শঙ্খ বাজান কিংবা বিবাহের কোন নিয়ম প্রতিপালিত হয় না—কেবল বিধবাকে উপবাস করিয়া থাকিতে হয়। বরের বাটীতে ‘আলোচাউল’ দেওয়া হইয়া গেলে থাওয়া দাওয়া হয়।

নিম্ন আসামে বিধবার পূর্বস্বামীর গৃহে কিংবা পিত্রালয়ে কোনরূপ উদ্ধাহ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয় না। বিধবা বিবাহিত হইলে পিত্রালয়ে যাইতে পারে—তাহাতে কোনরূপ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নাই। আসাম অঞ্চলের সর্বত্র পূর্ব কথিত কলিতাদি জাতীর বিধবার বহবার বিবাহ হইতে পারে। তাহাতেও সমাজে কোনরূপ আপত্তি নাই। মনে করুন—স্বামীর মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তি তাহার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিল। এই দ্বিতীয় স্বামীরও মৃত্যু হইল। তখন ইচ্ছা করিলে সেই বিধবা তৃতীয়

(৫) উঠানি—এই পার্বন কেবল নিম্ন-আসামের স্থানে হানে হইয়া থাকে।—লেখক

(৬) ১৯২০ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্র—লেখক।

পতি গ্রহণ করিতে পারে, এক তৃতীয় পতির মৃত্যু হইলে চতুর্থ পতি—এই প্রকারে যত ইচ্ছা তত পতি গ্রহণ করিতে পারে। বিধবারা তৃতীয় অথবা চতুর্থ পতি গ্রহণ করিলে অসমীয়ারা তাহাদের স্বামীর এই বিবাহ কার্যটিকে ‘চেমনি-আনা’ বলেন। চেমনির পানিপীড়নার্থ যে কোন সময় তাহাকে বরের বাটীতে আনা যায়।

বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্রগণকে কামরূপ অঞ্চলের লোকেরা ‘সুত কুলিয়া’ বনাম ‘বরিয়া’ বলিয়া থাকেন। প্রথম স্বামীর ঔরসজাত পুত্র যদি মাতার সহিত দ্বিতীয় স্বামীর গৃহে গিয়া বাস করে, অসমীয়ারা ঐ পুত্রকে ‘গুরগুরীয়া’ বলেন। ১৮৭২ খৃঃঅব্দে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে Civil marriage Act

প্রবর্তিত হওয়ায় বিধবার গর্ভজাত পুত্রগণ সম্পত্তির বৈধ অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আসাম অঞ্চলে বিধবার প্রথম পতির ঔরসজাত পুত্র বিধবার দ্বিতীয় স্বামীর সম্পত্তির অংশ পায় না সে বড় হইলে, তাহার নিজ পিতার সম্পত্তির অংশ পাইয়া থাকে। সতীন পুত্রেরা ও বিধবার পুত্রেরা সমভাবে পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ পায়। মনে করুন—জন্মক নাপিত বা বৈশ্যের বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত একপুত্র আছে। পত্নীর মৃত্যুর পর সে ব্যক্তি একটা বিধবাকে বিবাহ করিল। এই বিধবার গর্ভে দুইটা পুত্র জন্মিল। ঐ নাপিত বা বৈশ্যের মোট তিনটা পুত্রের মধ্যে বিষয় সম্পত্তি সমভাবে বিভক্ত হইবে।

## মোলায়েম চাবুক

### শ্রীরেবতীমোহন সেন

স্বখ্যাতির সহিত মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিয়া মনীষা যখন বেথুন কলেজে আই, এ পড়িতে ছিল, তাহার পিতা গোপেশ্বর বাবু তখন অবধি নানাদিকে তা’র সম্বন্ধ খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু মেয়ের ইচ্ছা ছিলনা তাহার ছাত্রী-জীবনের সেখানেই পরিসমাপ্তি হয়। হৃদয়ে তা’র জ্ঞানার্জনের আকুল বাসনা, বেশি না হউক, অন্ততঃ বি, এ পর্য্যন্ত পড়া চাই-ই।

গোপেশ্বর বাবু যে মেয়ের মনোভাব জানিতেন না তা’ নয়। কিন্তু তাঁহার দেশের ও সমাজের অবস্থা ভাবিয়া, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত কায়স্থ-গৃহস্থের পক্ষে কতাদায়ের কঠোরতা কিরূপ ভীষণ তাহা স্মরণ করিয়া, তিনি গোপনে ছ’একটি ছেলের সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাহার দুর্ভাগ্য যে তিনি উপযুক্ত চারিটি কস্তার পিতা। এই দুর্ভাগ্য

লইয়াও তিনি যখন কনিষ্ঠা কস্তার নাম “কান্ত-মণি,” “আরা” বা “খামকা” না রাখিয়া শব্দ-কল্প-ক্রমের সহস্রাধিক পাতা খুঁজিয়া অবশেষে “মনীষা” নাম রাখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রতিবেশিগণের শুধুই যে বিস্ময় লাগিয়াছিল তা নয়, গোপেশ্বর বাবুর মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্বন্ধেও তাঁহাদের সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। ভীষণ কস্তা-দায়ের দিনে এতটা কস্তা-প্রীতি সঙ্গতি-বিহীন গৃহস্থের পক্ষে একান্তই অশোভন, গ্রামের মধ্যে এই রকমের একটু সমালোচনা বেশ জমিয়াই উঠিয়াছিল।

গোপেশ্বর বাবুর অপরাধ, গ্রামের অপর দশ জনের মত তাঁহার আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না, অথচ মনের বলে, সত্য-নিষ্ঠার সর্ববিধ সংকার্যে সহায়তা উৎসাহ প্রদর্শনে তিনি সকলের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় অপরাধ, ইউনিভার্সিটির একজন লক্স-প্রতিষ্ঠ

গ্রেজুয়েট হইয়াও তিনি চাকরিতে প্রবেশ করেন নাই। তাঁহার সামান্য ৪০।৫০ বিঘা জমিতে চাষ আবাদ করাইয়া সাধারণ ভাবে জীবিক নির্বাহ করেন। সমাজের চক্ষে ইহা হীন-রুত্তি বলিয়া প্রথম কয়েক বৎসর তিনি গ্রামে রীতি মত অবজ্ঞাত হইয়াই ছিলেন। গোপেশ্বর বাবু তথাপি বিচলিত না হইয়া স্বগ্রামের উন্নতির জন্ত অনেক চেষ্টা করিতেন, কিন্তু প্রতিবেশিগণের প্রতিকূলতার তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে লাগিল। একটি বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্ত উদ্যোগী হইলে গ্রামবাসীরা তাঁহাকে সম্বোধিয়া দিলেন, মেয়েদের লেখা-পড়া জ্ঞানার কোনও প্রয়োজন নাই, তাহাতে সমাজে শুধু কতকগুলি মেম সাহেবের সৃষ্টি হইবে। ছেলেদের জন্ত হাই-স্কুল করিবার প্রস্তাব করিলে গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু সম্প্রদায় একবাক্যে বলিলেন, নিয়ন্ত্রণীর লোকেরা লেখা-পড়া শিখিয়া সকলকে অগ্রাঙ্ক ও অসম্মান করিবে। কাজেই গোপেশ্বর বাবুর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অবশেষে নিজ কন্যাগণের শিক্ষার ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

রন্ধা জননী, জী ও চারিটি কন্যা লইয়াই গোপেশ্বর বাবুর সংসার। পরিবারে এতস্তিন্ন দুইজোড়া বলদ, তিনটি গাভী এবং চাষ আবাদের কাজের জন্ত দুই তিন জন ভূত্য আছে। দিন দিন সংসারের ব্যয়-বৃদ্ধি ও জিনিষপত্র হ্রাস হইতেছে দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আয়ের অপর একটি পথ বাহির করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তখন তিনি সস্তার সময়ে ধান, চাউল, যব ইত্যাদি ক্রয় করিয়া গোলাজাত করিতে লাগিলেন এবং পরে চড়া-বাজারে বিক্রয় করিয়া সংসারের অভাব অনটন দূর করিতে সমর্থ হইলেন। এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন সংঘটিত হইল। আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি গ্রামবাসিগণের অবজ্ঞার ভাবও ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল।

গোপেশ্বর বাবু একে একে তিন কন্যার বিবাহ দিলেন। সমান ঘরে সম্বন্ধ করিতে গিয়াও তাঁহাকে পণ ও যোতুকে বিস্তর টাকা ব্যয় করিতে হইল। তাহার ফলে, তিনি ঋণ-ভাবে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এই তিন কন্যাকে ইচ্ছানুরূপ উপযুক্ত শিক্ষা দিতে না পারিয়া তাঁহার মনে যথেষ্ট ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছিল। এইজন্ত তিনি মনীষাকে তার দশবৎসর বয়স হইতেই কলিকাতায় রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

বড় দিনের ছুটি। মনীষা বাড়ী আসিয়াছে। গৃহ আনন্দময় সে যেন জগতের যাবতীয় আনন্দ ও ক্ষুণ্ণি কুড়াইয়া আনিয়া বাড়ীতে ছড়াইয়া দিয়াছে। ছপুয়ে ঠাকুর-মার রান্নাটা মনীষাই করে। সে শুধু লেখাপড়া লইয়াই সময় কাটায় না। গৃহের যাবতীয় কস্মেই সে তাঁর জননীর সহায়তা করে।

সে দিনকার ডাকে একখানা পত্র পাইয়া গোপেশ্বর বাবু কিঞ্চিৎ চিন্তাকুল হইলেন। তিনি মাতার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ করিতেন না— তাই মাতার নিকট যাইয়া তাঁহাকে পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইলেন। সমস্ত শুনিয়া মাতা বলিলেন, “দিনকাল এখন বদলে গেছে, এখনকার ছেলেরা নিজেদের চোখ ছাড়া আর কারো চোখ বিশ্বাস করে না। কি করবে বাপু, রাজি হও এতে আমাদের পক্ষেও ছেলে দেখাটা সহজ হ’য়ে থাকে। তা’ছাড়া এখানে পণের টাকাও দেড় হাজারের বেশী দিতে হবে না।”

গোপেশ্বর বাবুর মনটা যেন রাজি হইতেছিল না। তবে যা যখন অল্পমোদন করিয়াছেন, তখন আর দ্বিধা বোধ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। কথাটা বেশীক্ষণ চাপা রহিল না; মনীষার কানেও গেল। সে এখন আর শিশু নয়, সমস্তই বুঝিতে পারিল। পিতা যে দেশের ও সমাজের অবস্থা ভাবিয়াই তাহার বিবাহের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, বুদ্ধিমতী বালিকা তাহা বেশ অনুভব করিল। পিতামাতা ও অল্প

গুরুজনের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহাদের মনে কষ্ট দেওয়া কি সম্ভব হইবে? মনীষা একটা মন্ত সমস্তার ভিতর পড়িয়া গেল। জীবনকে জ্ঞানোন্নত করিবার আকুল তৃষ্ণা তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। পরিণয়বন্ধ-জীবনে সে তৃষ্ণা মিটিবার সম্ভাবনা কোথায়?

অবশেষে মনে মনে একটা সংকল্প স্থির করিয়া মনীষা তাঁর ঠাকুর মার নিকট গিয়া নিভূতে বলিল, “ঠাকুরমা, একি তোমাদের কাণ্ড! লুকোচুরি করে কাঁর বিয়ে দিতে যাচ্ছ?”

“কেন লো, বিয়ের নাম শুনে একেবারে ক্ষেপে উঠেছিঁস্ যে?”

“কেন উঠবনা ঠাকুর-মা? আমরা তো আর তোমাদের কালের মতো অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা নই, যে মা বাপকে গৌরীদানের ফলভোগ করবার স্বর্ষোগ দিতে পারব। আমাদের মতো ঢেঙা মেয়েরা হয়েছে এখন সমাজের আবর্জনা। এই সমাজকে একটু সায়েস্তা করার দরকার হ'য়ে পড়েছে; তাই ক্ষেপে উঠছি।”

“স্বয়ংস্বরা হ'য়ে বুঝি সমাজকে সায়েস্তা করবি?”

“ক্ষতি-ই বা কি? যেমনি ব্যাধি, তেমনি তার প্রতিকার চাই তো?”

“তবে সেই সঙ্গে ধনুর্ভঙ্গ-পণটাও তো থাকা চাই।”

“নিশ্চয়—আমরা এত সহজ-লভ্য ব'লেই তো যত অত্যাচার আমাদের উপর দিয়ে যাচ্ছে। শুধু আমাদের উপর হ'লেও বা' হোক কিন্তু এ অত্যাচারের পীড়নে যে গরীব মা বাপের হাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেল।”

“তা আর বলতে। কিন্তু যাক্ সে কথা। তোকে আর গোপন ক'রে কি হবে, তোর একটা বিয়ের প্রস্তাব উপস্থিত হ'য়েছে। বর মশাই নাকি স্বচক্ষে কনে দেখে পরখ ক'রে পছন্দ হ'লে তবে বে' করবেন। তোর বাবা তো কিছুতেই তাতে রাজি

হবে না, আমি ব'লে ক'য়ে তাকে সম্মত ক'রেছি, কারণ কালের রীতি না মানলে চলবে কেন? তুই কি বলিস্?”

“আমি আবার কি বলবো। তোমার বর-মশাই যে, কোনো অন্ডায় আব'দার ক'রছেন তাতো আমার মনে হয় না। বাকে চিরদিনের জ্ঞাত স্বথ হুংগের সঙ্গিনী করতে হবে, তা'কে না দেখে শুনে বে'করাটা কি বোকামো নয়?”

“তবে তুই রাজি আছিস্?”

“তোমরা যখন আমাকে আর আইবুড়ো থাকতে দেবেনা, তখন এই Matrimonial Examination অর্থাৎ বিয়ের পরীক্ষাটা দিতে রাজি না হ'য়ে আর কি করি ব'ল।”

“তবে যে বলেছিঁস্ স্বয়ংস্বর হ'য়ে সমাজ-শাসন করবি, তোর ধনুর্ভঙ্গ-পণটা গেল কোথায়?”

“ভয় পেয়ো না ঠাকুর-মা, সব ঠিক আছে।”

“ভাল দেখা যাবে। তোর কেরামতি।”

“কেরামতি যে দেখবে ঠাকুরমা, বাবা কি তবে সত্যি মত দিয়েছেন?”

“শুধু তোর মতের অপেক্ষা। তুই আপত্তি করলে সে আর এতে এগোবেনা।

“না, ঠাকুরমা, আপত্তির দরকার নেই। ইউ-নিভার্সিটির পরীক্ষা তো একটা দিয়েছি, আবার মা হয় তোমার এই সমাজেরও পরীক্ষা দেবো; যদি পাশ করি তো মন্দ কি?”

“বেশ, তা-ই হবে।”

জননীর কথাগুলোতে গোপেশ্বর বাবু পত্র লিগিয়া দিলেন। উত্তর আসিল, তিন দিনের ভিতর পাত্র স্বয়ং মনীষাকে দেখিতে আসিবেন।

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে পাত্র শ্রীমান্ বিমলকুমার মজুমদার তাহার বন্ধু বিভূতিভূষণ রায়কে সঙ্গে করিয়া গোপেশ্বর বাবুর গৃহে উপস্থিত হইল। বিভূতিভূষণ এই গ্রামেরই অধিবাসী এবং গোপেশ্বর বাবুর নিকট আত্মীয়। কলিকাতায় রিপণ কলেজ-হোষ্টেলে একই

সময়ে বাস করার উভয়ের পরিচয় হয়। এই বিবাহ-প্রস্তাবের মূলেই ছিল বিভূতিভূষণ। যাই হোক, বিভূতিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসার বিমলকে আর আত্ম-পরিচয় দিবার বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইল না। বড় দিনের ছুটি উপলক্ষে বিভূতি বাড়ীতেই ছিল।

গোপেশ্বর বাবু বিমলকে সমাদরে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন এবং বিভূতিকে বিমলের নিকট বসিতে বলিয়া বাটার ভিতর গিয়া জননীকে সংবাদ দিলেন। গোপেশ্বর বাবুর মাতা পূর্বে হইতেই সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি নিজের আসিয়া বিভূতি ও বিমলকে বাটার ভিতর লইয়া গেলেন; এবং বিশ্রামান্তে উভয়কে কিঞ্চিৎ মিষ্টিমুখ করাইলেন। বিভূতির নিকট ঠাকুরমার পরিচয় পাইয়া বিমল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, “দেশের চিরাচরিত প্রথা না মেনে একপভাবে উপস্থিত হওয়ার আমাকে হয়তো অনেকেই মন্দ বলবেন এবং আপনার চোখেও হয়তো এটা খুবই খারাপ ঠেকে থাকবে, কিন্তু এ বাটাতে পা দিয়ে অবধি আমার যেন সে আশঙ্কাটা দূর হ’য়ে গেছে। আশা করি, আপনি আমার তেমন কিছু বলবেন না।

“না বাছা, মন্দ বলবো কেন? আগেকার দিন তো এখন আর নেই, যে মা-বাপ যা ধ’রে এনে দেবে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এখন তোমরাও বেশ লেখাপড়া শিখে দেশ-বিদেশ ঘুরে নতুন ভাবে তৈরি হচ্ছে, আর মেরেরাও খনা, লীলাবতী হবার চেষ্টায় আছে। বাছাবাছটা এখন তোমরা নিজেরাই করবে, এতো স্বাভাবিক।”

“আপনার হৃদয়ের উদার ভাবের কথা বিভূতির মুখে যা শুনেছি, তা দেখছি সবই ঠিক। বাস্তবিক আপনার বয়সের মহিলার কাছে এমন আধুনিক ভাবের কথা শুনতে পাওয়া আশ্চর্য।”

বিভূতিভূষণ বাধা দিয়া বলিল, “তা আমার কাছে আপত্তি বোধ হ’তে পারে, কারণ তুমি জানো না,

ঠাকুরমা এই বয়সে এখনও তেমন পড়াশুনা ক’রে থাকেন।

বিমল একটু হাসিয়া বলিল, “আশা করি, আপনার নাতনী তা’র ঠাকুরমার এই বৃত্তির উত্তরাধিকারিনী হ’তে পেরেছে।”

“নাটক নভেল ছেড়ে পুরাণ মহাভারতাদি পড়ার বৃত্তি সং কি অসং ঠিক বলতে পারিনা, কারণ সকল লোকের রুচি একরকম নয়। তবে নাতনী এর কতকটা পেরেছে, কিংবা আদৌ পেরেছে কিনা, পরখ করলেই বুঝতে পারবে। এখন এসো তুমি আমার সঙ্গে এই পাশের ঘরে।”

বিভূতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বিভু, তুই তো বাড়ীর ছেলে; তুই বাছা বোমার কাছে গিয়ে খানিকক্ষণ গল্প কর। তোর কাছে মাংগ হয়তো লজ্জা বোধ করবে।”

বিভূতিভূষণ তাক্তাই করিল।

তখন বিমলকে লইয়া ঠাকুরমা পাশের ঘরে গেলেন। এইটাই ঠাকুরমার ঘর—মনীষা ঠাকুরমার সঙ্গেই থাকে। গৃহটি বেশ পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটী-রূপে গোছান। এক পাশে একটি বড় খাট, অপর দিকে মনীষার পড়ার স্থান। একখানি বড় টেবিলের উপর তার পড়ার পুস্তকগুলি সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত টেবিলের কাছে ছ’খানা চেয়ার ও একটু দূরে একটি দেওয়াজ ও আলমারী। আলমারী কাঠের আবরণের ভিতর দিয়া উপরের দুই শেল্ফে সুন্দর চক্চকে বাধানো বইগুলি দেখা যাইতেছিল। সমস্তই ঠাকুরমার বই।

ঠাকুরমা যখন বিমলকে নিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, মনীষা তখন টেবিলের কাছে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল। ঘরে ঢুকিয়াই ঠাকুরমা তাকে বলিলেন, “মাংগ, ইনি সেই বিমল বাবু, যার আসবার কথা ছিল। ইনি যা জিজ্ঞেস করেন, উত্তর দিয়ো—লজ্জা করোনা।” বলিয়া তিনি তাঁহার খাটের উপর গিয়া বসিলেন।

মনীষা উঠিয়া বিমলের দিকে একথানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। ঠাকুরমা উভয়কে বসিতে বলিলেন। বিমল আসন গ্রহণ করিলে পর মনীষাও বসিল। একটু ইতস্ততের পর বিমল মনীষার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ওখানা কি বই পড়ছিলে?”

“দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।”

“এই বই যখন পড়ছো, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নিশ্চয়ই বেশ একটু পরিচয় হয়েছে।”

মনীষা কোনও উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। ঠাকুরমা বলিলেন, “ওর বাবা এ বিষয়ে একটু কড়া—সে নিজে বেছে বেছে বই এনে দেয়, মণি তাই পড়ে। বাজে বই পড়া সম্বন্ধে তার নিষেধ আছে।”

“সে তো ভাল কথা।” তার পর জিজ্ঞাসা করিল, “মেট্রিক পাশ ক’রেছ কোন্ স্কুল থেকে?”

“ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয় হ’তে।”

“এবার তোমার কোন্ ইয়ার?” “আই, এ ফাষ্ট ইয়ার।”

“Combination এ সংস্কৃত অবশ্যই আছে।” “হাঁ।”

“শেলাই, সঙ্গীত ইত্যাদির চর্চা আছে তো?”

“সামান্য। যা’ স্কুলে শেখানো হয়।”

“কোন পার্টিতে কখনো গান ক’রেছ কি?”

“পার্টি বলতে যা বুঝায় তা’তে গাইবার ইচ্ছা বা সুযোগ কখনো হয়নি।”

“হার্মোনিয়ম বাজাতে পার?” “একটু একটু অভ্যাস আছে।”

“সেমিজ, ব্রাউজ, সার্ট এর কাট-ছাট শেলাই জানো?”

“সামান্য রকম জানি।”

“তোমার গানের ব্রাউজটা কি দরজির তৈরি?”

“এটা ঘরেই করা হয়েছে।”

“বেশ হয়েছে তো। আচ্ছা, আমার উপরের নক্সার কাজগুলো?” “এই Embroidery workও ঘরেই হয়েছে।”

“Excellent it is indeed—a very fine piece of work.”

“আজকাল স্কুলের মেয়েরা এর চেয়ে অনেক ভাল কাজ করতে পারে, আমার হাতের কাজতো তেমন ভালো নয়।”

“তোমার বিনয় প্রশংসার যোগ্য।”

আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া বিমল টেবিলের উপর হইতে একথানা বাধানো খাতা টানিয়া লইল। খাতা খুলিতেই তার চোখে পড়িল একটি বাংলা প্রবন্ধ, নাম “পল্লী-জীবন”। সুন্দর হস্তাক্ষরে লিপিত এই সুন্দর প্রবন্ধটি পড়িতে পড়িতে বিমল এমন তন্ময় হইয়া গেল যে তার মন হইতে তখন যেন অল্প সকল চিন্তা দূরে অপসারিত হইয়া গেল। মিনিট তিন চারি পর খাতার পৃষ্ঠা হইতে চক্ষু উঠাইয়া বিমল জিজ্ঞাসা করিল, এ তোমার লেখা?”

মনীষা নিরুত্তর। বিমল বলিতে লাগিল, “বেশ প্রবন্ধটি মাসিক পত্রের সম্পাদকেরা আদরের সহিত গ্রহণ করবে। প্রবন্ধের ভিতর একটা নূতন চিন্তার ধারার পরিচয় পাওয়া যায়।”

বিমলের পরবর্তী প্রশ্ন হইল, “আমাদের এ সাফাতের অভিপ্রায় অবশ্যই জানো?” “হাঁ, জানি।”

“আমার দিকে একবার চাও দেখি?”

মনীষা একটিবার চোখ তুলিয়া চাহিয়াই মাথা হেঁট করিল।

“আচ্ছা, আমার দিকে পেছন দিবে একটিবার দাঁড়াও।”

মনীষা নীরবে এই আদেশ বা অমুরোধটিও রক্ষা করিল। বিমল দেখিল, মনীষার ঘন-কৃষ্ণ কেশদাম কোমর ছাড়িয়া নামিয়া আসিয়াছে।

“ভাল, দেখি তোমার হাতখানা।”

মনীষা তাহার বাম হাতখানা বাহর করিল। বিমল বলিল, “বা হাত বের করলে যে?”

“জ্যোতিবীরা ওনেছি মেয়েদের বা-হাতই দেখে থাকেন।



“আমি কি জ্যোতিষী ?”

“তা জানিনে, তবে যখন হাত দেখতে চাইলেন, তখন মনে করলুম, হয়তো সে বিষয়ে আপনার বেশ জ্ঞান আছে।”

“জ্ঞান বিশেষ কিছুই নেই, আর সে উদ্দেশ্যেও হাত দেখতে চাইনি।”

“তবে ?” বলিয়াই সে হাত গুটাইয়া লইল।

“হাত সরিয়ে নিলে যে ?”

“যদি জ্যোতিষীর চোখে হাত দেখার প্রয়োজন না থাকে, তা হলে আর হাতে কি দেখবেন ?”

“বিশেষ কিছুই নয়—তবে, হাতের তলা আর আঙ্গুলের গড়নটা দেখা মাত্র। তা থাক, আর দেখতে হবে না।”

“স্বচ্ছন্দে দেখতে পারেন—তবে কি না, এই গোটা দেহটাই ভগবানের দান—এতে খুঁত ধরবার অধিকার বোধ করি মানুষের নেই।”

উত্তর শুনিয়া বিমলের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তাহার ধারণায়ই আসে নাই কোন বাঙ্গালী মেয়ে এরূপ অবস্থায় এমনভাবে কথা বলিবার মত সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে। মনীষা পরমাসুন্দরী না হইলেও কুৎসিৎ ছিল না। একটা উজ্জল প্রতিভার দীপ্তি কমণীয়তার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহার মুখমণ্ডলকে অপূর্ণ লাভণ্যমাণ্ডল করিয়া রাখিয়াছিল। বিমলের মনে হইল, সেই প্রতিভার নিকট সে যেন হীন-প্রভ হইয়া পড়িতেছে, আবার সেই লাভণ্যের আকর্ষণও এড়াইতে পারিতেছে না। তখন তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করিয়া বিমল উঠিয়া পড়িল এবং ঠাকুরমার দিকে চাহিয়া বলিল, “আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্তা নেই,—আপনার নাতনীর সুশিক্ষা, বিনয় ও তেজস্বিতার পরিচয় পেয়ে যথেষ্ট প্রীত হয়েছি। আমার খুব সৌভাগ্য যে বিভূতির কাছে এই পরিবারের সংবাদ পাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল।”—বলিয়াই বিমল ঠাকুরমার পদ-ধূলি লইয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিলে—মনীষা তাড়া-

তাড়ি বলিয়া উঠিল, “আপনি যাবেন না—এতটা সময়ই নষ্ট করেছেন, আর একটু বসুন।”

বিমল অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিল এবং মনীষার নিকট হইতে এরূপ অমুরোধের কারণ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আমাকে বসতে বলছো ?”

“হাঁ, আপনাকেই।”

বিমল মনীষার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিল। মনীষা সংকুচিত না হইয়া বলিল, “আপনি হয়তো আশ্চর্য্য বোধ কচ্ছেন, কিন্তু কথাটা এই—আচ্ছা, আপনি বসুন, তারপর বলছি।”

বিমল অগত্যা বসিল।

মনীষা গম্ভীরভাবে বলিল, “আপনিতো আমাকে নানারকমে পরীক্ষা করলেন ; এখন এ পক্ষ থেকেও একটু পরীক্ষার দরকার।”

“সে আবার কি ?”

“বিয়েটা তো শুধু আপনার নয়, আমারও স্তূতরাং আমার এ প্রস্তাবের আপনার আতঙ্কিত হ'বার কিছু নেই। যে ব্যাপার দুইটি জীবনে ইহকাল ও পরকালের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের সৃষ্টি করে, এবং যার উপর ছ'জনের সুখ দুঃখের সম্পূর্ণ নির্ভর করে, সেই ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আপনিও সেই আদর্শ নিয়েই আজ এখানে এসেছেন। আমাদের তরফ থেকে যদি আপনারই আদর্শের অনুকরণ করা হয় তাতে আপনার আপত্তির কারণ কি হ'তে পারে ?”

বিমল কল্পনাও করিতে পারে নাই যে তাহাকে এরূপ অবস্থায় পড়িতে হইবে। তাহার মনে হইল, কলিকাতার আবহাওয়া আর কলেজের শিক্ষা এই বালিকাকে প্রগল্ভা করিয়াছে। মনীষার বাক্য যতই যুক্তিপূর্ণ হউক তাহা তাহার কাছ হইতে বাহির না হইলেই শোভন হইত। পরীক্ষা করিতে আসিয়া নিজেই পরীক্ষা দিতে হইবে, তাহা আবার একটা বালিকার কাছে, এ শুধু বিড়ম্বনা নয়—

অতি লজ্জাকর। কিন্তু ইহা এড়াইবার পথও বিমল  
খুঁজিয়া পাইল না—আবার ভাবিল, একটি বালিকা  
এমনই বা কি জিজ্ঞাসা করিবে যে অল্প তাকে  
ভাবিতে হইবে? তখন যথাসম্ভব ঔদাস্তপূর্ণ হাসির  
ভাব মুখে আনিয়া বলিল :—

“আপত্তি? মোটেই নয়—এ তোমার অতি  
সঙ্গত প্রস্তাব।”

মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কাজ-কর্ম  
কি করেন?” “আপাততঃ স্কুল-মাষ্টারি।”

“হাইস্কুলে?” “হাঁ।”

“হেড-মাষ্টার?” “না, এসিষ্ট্যান্ট টিচার।”

“আপনি গ্রেজুয়েট?” “হাঁ।”

“মাষ্টারিতে আয় কত?” “সম্প্রতি ৫০০ টাকা  
হিসাবে পাচ্ছি—তবে স্কুলে গবর্ণমেন্ট aid পাওয়ার  
কথা আছে, তা পেলে বেতনের হার হয়তো আর  
কিছু বাড়বে।”

“এই মাষ্টারি-করাই কি আপনার জীবনের লক্ষ্য?”

“অল্প কোনদিকে কিছু সুবিধে হ’য়ে উঠলো না  
ব’লে এই নিয়েই থাকতে হচ্ছে।”

“অল্প কোনদিকে চেষ্টা করেছিলেন?” “সামান্য  
কেরানীগিরি থেকে অনেক কিছুরই চেষ্টা ক’রেছি,  
কিন্তু আজকাল বড় মুরব্বি পেছনে না থাকলে  
চাকরি পাওয়া অসম্ভব।”

“চাকরি ছাড়া কি অল্প কোনো দিক আপনার  
চোখে প’ড়েনি—যেমন ব্যবসায়াদি?”

“ব্যবসা করতে অনেক অর্থের প্রয়োজন,  
তা’ছাড়া তাতে risk ও যথেষ্ট।”

“আপনার সঙ্গে ঠিক একমত হ’তে পারলুম না।  
আমি খুব ভাল লোকের কাছে শুনেছি, বড়  
ব্যবসায়ীদের ভিতর অনেকেই সামান্য মূলধন নিয়ে  
ব্যবসার আরম্ভ করে বড় হয়েছে। তাতে riskও  
কম অথচ সফলতার সম্ভাবনাও বেশি। নিরক্ষর  
মোড়োরারীরা লোটা কষল নিয়ে এদেশে এসে  
ক্রোড়পত্তি হ’য়ে যাচ্ছে—তাকি শোনেননি?”

“মোড়োরারীরা মোট বইতে পারে, ছাতু খেয়ে  
থাকতে পারে, বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছেলেরা তা  
পারে না।”

“এইখানেইতো গলদ। তা যাক, পরিবারে  
আপনারা কে কে আছেন?” “আমার মা, ছোট  
ছুইটি ভাই, আর একটি ভগিনী মাত্র।”

“এরা সব বাড়ীতেই থাকেন?” “হাঁ।”

“দেশে বিষয় সম্পত্তি কিছু আছে?” “ছিল এক  
সময়ে বেশ ভালই, এখন অতি সামান্য আছে।”

“তা’র আরে বাড়ীর সকলের খরচ পুষিয়ে যায়?”  
“না, তবে বৎসরের চিড়ে মুড়ির ব্যবস্থা হয়।”

“অল্প খরচ তবে কি ক’রে চলে?” “আমি  
সাহায্য ক’রে থাকি।”

“কি পরিমাণ?” “মাসে বিশ, পঁচিশ, সময় সময়  
ত্রিশ টাকা ক’রেও মাকে পাঠাই।”

“খুব ভাল কথা, মার সাহায্য করা সব ছেলেরই  
কর্তব্য।”

“মার চেয়ে বড় কিছু নাই।

“আপনার মাতৃ-ভক্তি প্রশংসনীয়। আজকাল  
অনেক ছেলেই শুনতে পাই বুড়ো মা-বাপের কথা  
তেমন ভাবেনা।” “যারা ভাবেনা তারা নরাধম।”

“আচ্ছা, আপনি যেখানে মাষ্টারি করেন সেখানে  
আপনার থাকার অল্প free quarters আছে কি?”

“শুধু আমার একার কথা হ’লে আছে, কারণ  
স্কুল বোর্ডিংএ থাকার অল্প seat ভাড়া স্বরূপ আমার  
কিছু দিতে হয় না। তবে পরিবার নিয়ে বাস করার  
অল্প কোনও বাসা নেই।”

“পরিবার নিয়ে থাকার প্রয়োজন হ’লে কি  
করবেন?” “তখন একটা বাসা ভাড়া করতে হবে।”

“ভাড়া দিলে সেখানে বাসা পাওয়া যায়?” “হাঁ।”

“কত টাকার ভিতর হ’তে পারে?” “মাসিক  
সাত আট টাকা।”

“আপনার হার্মোনিয়ম আছে?” “না।”

“তবে গান-বাজনা শোনবেন কি ক’রে?”

“একটা কিনে নেওয়া যাবে,—আর যদি খুশুর থেকে যৌতুক স্বরূপ পাওয়া যায়.

“খুশুর অসমর্থ হ’লে ?” “নিজেরই কিনে নিতে হবে।”

“তার মানে পঞ্চাশ ষাট টাকা।” “হাঁ, এর কমে আর কি ক’রে হয়।”

“আপনার বাড়ীতে সেলাই-কল আছে ?” “না।”

“না থাকলে, সাট, সেমিজ বডিস্ ইত্যাদি কি ক’রে তৈরি হবে ?” না, এটাও হতভাগ্য খুশুরের ঘাড়ে চাপাতে চান ?” “শুনেছি, মাসিক ৫০ টাকা ক’রে দিলেই একটা নূতন কল পাওয়া যায় সুতরাং এর জন্ত বিশেষ ভাবনার কারণ নেই।”

“আপনি রাঁধতে জানেন ?” “রাঁধতে জানি—আমি ?”

“হাঁ।”

“অতি অল্পত প্রশ্ন।” “তা হ’তে পারে, কিন্তু আপনি আপনার ভাবী পত্নীর যে সমস্ত qualifications খুঁজে বেড়াচ্ছেন তার মধ্যে রাঁধার item টা মেই। কাজেই সংসারের এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটা কি ক’রে সম্পন্ন হ’তে পারে তা নির্ণয় করবার জন্ত ওকথা জিজ্ঞেস ক’রেছি।”

“একজন পাচক ঠাকুর রাখলে কি এ কাজটা হ’তে পারে না ?” “পারে বৈ কি, কিন্তু তার মাইনে পড়বে কত ?

“সাত আট টাকাই যথেষ্ট।” “Menial work এর জন্ত আবার একজন চাকর চাই তো ? ঘর-লেপা, বাসন-মাজা, কাপড়-কাঁচা, কুটনো-কোটা, বাটনা-বাটা ইত্যাদি কাজ, নইলে কে করবে ? “চাকর চাই বই কি।”

“তাকে দিতে হবে কত ?” “ছয় সাত টাকার ভিতরই হ’তে পারে।”

“তা হ’লে আপনার বাড়ীতে পাঠাতে হয়, ২৫ টাকা, বাসাভাড়া ৮ ঠাকুর চাকরের বেতন আট আর সাত পনের টাকা। আপনার আয়ের সব

টাকা এতেই তো ব্যয় হ’য়ে গেল—খাওয়া-দাওয়া ও অশ্রান্ত খরচ তবে কি ক’রে চলবে ?”

বিমল নিরুত্তর।

মনীষা বলিতে লাগিল, “আপনার আয় ব্যয়ের এই হিসাব দেখিয়ে আপনাকে ভীত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে আপনার বর্তমান অবস্থায় বিবাহিত জীবনের জন্ত পত্নী-নির্ভরচনে অগ্রসর হবার পূর্বে ঐ হিসাবটা একটু খতিয়ে দেখলেই বোধ করি ভাল হ’তো।”

বিমলের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। একটা অপরিচিতা বালিকার কাছে এমন ভাবে অপ্রস্তুত ও অপ্রতিভ হইতে হইবে, ইহা তাহার কল্পনার অতীত। লজ্জা ও অবমাননায় বিমল নতমুখ হইয়া রহিল।

মনীষার ভাষায় বিনয় ও সন্ত্রমের অভাব না থাকিলেও উহা যে তাহার দারিদ্র্যের প্রতি প্রকাশ্য ইঙ্গিত, ইহাই বিমলকে বেশী পীড়ন করিতে লাগিল। মনীষা যেন তাহা বুঝিতে পারিয়াই বলিল—

“আয়-ব্যয়ের কথা তুলে যদি আপনার মনে ব্যথা দিয়ে থাকি তবে আমায় মার্জনা করবেন। আর সেই কথা থেকে যদি আপনি বুঝে থাকেন যে আমি দারিদ্র্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখি, তা হ’লেও আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। কারণ আমি নিজে দরিদ্রের সম্ভান, আর প্রকৃত প্রস্তাবে দারিদ্র্য একটা অপরাধ নয়; অপরাধ হ’য়েছে তা দূর করবার যথোচিত চেষ্টার অভাব। আমাদের দেশের যুবকেরা hero হবার কল্পনায় মাতোয়ারা, অথচ নিজেরা কৰ্ম্ম-বিমুখ। খুশুরকে নিপীড়িত ক’রে তাঁর অর্থে নিজের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করবার চেষ্টার চেয়ে হীন কাপুরুষতা যে আর কি হ’তে পারে জানিনে। অথচ এঁরাই আবার নিজেরদের পুরুষ ব’লে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন না।”

বিমল অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, সেই ঘরের ভিতর দিয়া যেন একটা গরম বাষ্প বহিয়া যাইতেছে। মনীষা পুনরায় বলিতে লাগিল;—

“যথোচিত চেষ্টা করলে আপনি যে আপনার

বর্তমান অবস্থার উন্নতি করতে পারবেন না, একথা আমি বিশ্বাস করি না। আপনি বিবাহিত জীবনের যে সকল চিত্রের কল্পনা ক'রে রেখেছেন, সেই কল্পনাগুলিকে বাস্তবে পরিণত করতে হ'লে নিজের অবস্থার ঘটটুকু পরিবর্তন প্রয়োজন সেই পরিবর্তন সংঘটন না ক'রে বিবাহের জন্ত অগ্রসর হওয়া কি অবিবেচনার কার্য্য হয় নাই? আমার মনে হয়, আপনার জন্ত মাত্র দুইটি পথ আছে—হয় আপনি উপযুক্ত চেষ্টা দ্বারা প্রথমতঃ নিজের অবস্থার উন্নতি সাধন ক'রে বিবাহের জন্ত প্রস্তুত হ'তে থাকুন, নয়তো অর্থাৎ এখনই যদি আপনার বিবাহ না করলেই নয়, তবে পাড়াগায়ের এমন একটি মেয়ের সন্ধান করুন, যে অত গান-বাজনা সেলাই প্রভৃতির দ্বারা ধারবে না, অথচ নীরবে অশ্লান-চিত্তে আপনার সংসারের বাবতীয় কাজ, ক'রে যেতে পারবে আপনি তাই করুন।”

বিমল আশ্বে আশ্বে উঠিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া গেল। ঠাকুরমা ডাকিলেন, “বাহা, একটু দাঁড়াও একটা কথা শুনে যাও।”

বিমল ততক্ষণ বাটার বাহিরের আঙ্গিনা ছাড়িয়া রাস্তা ধরিয়াছে।

ঠাকুর-মা বলিলেন, “মাগ, তুই করলি কি? তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলি?”

“অপমান কি ঠাকুর-মা? হ'টো সত্যি কথায় যদি তাঁর অপমান হ'য়ে থাকে, তার আর আমি কি করবো? একটু কড়া না হ'লে কি সমাজ-শাসন

হয় ঠাকুর-মা? তুমি ধর্ম্মভঙ্গ পণের কথা ব'লেছিলে, দেখলেতো—লক্ষাধীশ্বর দশমুণ্ড আর কুড়ি হাত নিয়ে এসেও অবশেষে চুপি চুপি পগার পার হ'য়ে গেলেন।”

হঠাৎ বিভূতি ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, “ঠাকুর-মা, শুনলুম, বিমল নাকি চ'লে গেছে। আশ্চর্য্য! আমার সঙ্গে দেখাটাও করলে না?”

ঠাকুর-মা বলিলেন, “দেখা আর কি করবে বেচারি! বড় অপ্রতিভ হ'য়ে পালিয়ে গিয়েছে বললেই হয়।”

“সে কি, পালিয়ে যাবে কেন? কিছুইতো বুঝতে পাচ্চিনা।”

ঠাকুর-মা তখন বিভূতিকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলিলেন। বিভূতি সমস্ত শুনিয়া বিষয় ও শ্রদ্ধাপূর্ণ চক্ষে মনীষার দিকে চাহিয়া বলিল—“মাগ, তুই যে এমন সংসাহসের পরিচয় দিতে পারবি, ভাবতেও পারিনি। বেশ ক'রেছিছ বোন্, তুই আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিস।”

“বিভূ-দা, সমাজের চক্ষে আমার একাজটা হয়তো খুবই নিল্লেণীয় হবে, কিন্তু যা সত্য ও সঙ্গত, আমি শুধু তা-ই ক'রেছি।”

“এ নিল্লেণ কিছ আসে যায় না—বর্তমানে আমাদের সমাজের অবস্থা যা হ'য়ে পড়েছে তাকে হ্রস্ত করতে হ'লে এই রকম একটু মোলায়েম চাকুরই দরকার।”





## ঝাঁকা-মুটে

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

৩

আমরা ঝাঁকা-মুটে !  
পেটের দায়ে রাজধানীতে সবাই এলাম ছুটে !  
নাইকো মোদেব আপন ও পর,  
খাটছি মোরা রাত্রি ছপর,  
ঝাঁকা মাথায় 'রকে'র উপর  
আমরা পড়ি লুটে' !

২

আমরা ঝাঁকা-মুটে !  
হরেক রোজুই দিন-মজুরী করছি খেটে-খুটে !  
মুর্থ হিন্দু মোসলমান,  
কাজ করে, যাই সমান সমান,  
মানের চেয়ে পাই অপমান  
কই যদি মুখ ফুটে' !

আমরা ঝাঁকা-মুটে !  
শহরের বুক জরিপ করি আমরা সবাই জুটে !  
হাঁকায় বাবু মোটার, জুড়ী,  
খাটার মতো কই মজুরী ?  
মোদের পেটে ঢালায় ছুরি  
পাওনা কেটে-কুটে !

৪

আমরা ঝাঁকা-মুটে !  
খেয়ে দেয়ে রয় না কিছুই, স্বাস্থ্য গেল টুটে !  
মাগছেলেদের কোথার কাপড় ?  
চাইলে কসে' লাগাই চাপড়,  
অম্নি লাগে ভীষণ ফাঁপর,  
পুলিশ চোকে 'বুটে' !

আমরা ঝাঁকা-মুটে !  
মার খাওয়াটা ভাগ্য মোদের, দেখছি ঘেঁটে-ঘুঁটে  
জন্ম থেকে মৃত্যু নাগাদ  
আঘাত পাওয়া পড়বে না ষাদ,  
ধর্মঘটে পূরাতে সাধ  
মরবো এবার 'সুটে' !

## ভাগীদার

### শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী

রামগোপাল দাদার সহিত বধূরূপে বাণ্য-সঙ্গিনী সরলা বখন গৃহে আসিল তখন বিধু যেন হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিল। কহিল—বাঁচলুম সরি।—এইবার তোর হাতে আমার বুড়ী মায়ের ভার ছেড়ে দিয়ে আমি দেশ ছাড়ব।—

মুখের ধোমটা তুলিয়া সরলা করিল—কেন ?—

হাসিয়া বিধু কহিল—“কেন আবার কি ?—জানিসনে যে চিরকালই আমি দেশ বেড়াতে কত ভালবাসি। তবে তখন একটা ভাবনা ছিল—ওই বুড়ী মায়ের জ্ঞাতো। এখন তো আর তা নেই, তুই তো বউদি হ’য়ে এসেছিস এখন তোর শাশুড়ীর ভার তুই নে সরি, বেঁচে বাই।”

সরলা কিছুক্ষণ নির্ঝাঁকি বিধুর মুখের প্রতি চাহিয়া চোখ নামাইয়া লইয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল।

বিধু কহিল—হাসিলি যে—

সরলা কহিল—“হাসি পাচ্ছে বড্ড, হাসবোনা —”

“কিস্ত কেন ?—”

“তোমার কি বলে ডাকবো বলতো দাদা ? না নতুন সম্পর্কের ঠাকুর পো” ?—

বিধুও হাসিয়া ফেলিল। সত্যিই এ কথাটা হাসবার মতই কথা বটে। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—“বা ইচ্ছে হয় বলো, তবে আমি আর তোমার ‘তুই’ ব’লব’ না সরি। সত্যি বলছি এবার হ’তে সরলবো ব’লে ডাকবো।—নইলে লোকে কি মনে ক’রবে—মধ্য পথে বাধা দিয়া সরলা বলিয়া উঠিল—না বিধুদা, তুমি আমায় তুমি ব’ল না। ও কথাটা ছেড়ে দিয়ে তুই ব’লে ডেকো। সেইটেই আমার কাছে খুব ভালো লাগে।—

“আচ্ছা—আচ্ছা সে দেখা যাবে।—এখন কিছু পেতে দাও তো। খাওয়া যাক,—তার পরে মার কাঁছে গিয়ে সে মীমাংসা হবে এখন।—আন কিছু খাবার।—”

সরলা কি একটা কথা অক্ষুটপরে বলিতে বলিতে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। এবং কিছুক্ষণ পরে এক হস্তে খাবারের সেকাবী এবং অণ্ড হস্তে জলের গ্লাস লইয়া আসিল। সে গুলি মেঝের উপরে রাখিয়া দিয়া ও একখানি আসন বিছাইয়া দিয়া সরলা কহিল—“বোস—”

বিধু বসিল না। কচুরী একখানা তুলিয়া মুখে দিয়া কহিল, তুই খেয়ে নে সরি—

বিধুর স্বভাব যে চিরদিনই এইরূপ বালকের মত সরল তাহা জানিত। এবং সে চিরদিনই বিধুর সাহিত অনঙ্কোচে মিশিত। খাওয়ার ব্যাপারেও সে বিধুকে দোখরা কোনও দিনই লক্ষ্য করিত না কিন্তু আজ তাহা না করিয়া পারিল না। চতুর্দিকে সচকিত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল—“বাও বিধুদা’ কি যে বল।—”

হাসিয়া বিধু কহিল, কি যে বলি তার মনে—চট্‌ছিস কেন।—রাগের ভান করিয়া সরলা কহিল—চট্‌বো না ?—এটা খণ্ডর বাড়ী না—এখানেও বুঝি তুমি আমায়—

বিধু হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল—আপনি কেন ? বল্ বল্ ব’লে যা—তেমনি পেরেছ কিনা, এখন আমি একজন হ’য়েছি, বিশেষ তোমার বৌদি।

সরলা হাসিয়া ফেলিল। ছোট বেলার মতই ছোট একটি কিল উঠাইয়া কহিল—ভাল হবে না

বিধুদা,—চুপ কর ব'লছি। সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্রতপদে বুদ্ধা জননীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল “মা—”

মা তখন মালা জপ করিতেছিলেন। কাহলেন “কেন বাবা”—হর্ষান্বিত স্বরে বিধু কহিল—“মা তোমার বড় ছেলের বোয়ের কাণ্ড শুনেছ, আমি খাবার খেতে দিলাম, লজ্জা ক'রে খাওয়া হ'ল না। দেখ তার আকেলখানা কেমন ধারা—”

মা হাসিয়া কহিলেন—“ও তেমনি ধারা পাগ'লা মেয়ে। ওর দোষ ধরিসনে বিধু।—”

বিধু উত্তরে শুধু একটু হাসিল মাত্র।

( ২ )

মাতৃপিতৃহীন বিধু যখন মায়ের ছেলে-বেলার সই রাইমনির স্নেহময় বক্ষে স্থান পাইয়াছিল সে আজ প্রায় সত্তের কি আঠার বৎসর পূর্বের কথা।—তখন সে মাত্র চার বৎসরের। সইয়ের ঘরে, বাড়ীতে ডবল তালা লাগাইয়া সইয়ের ছেলেকে বক্ষে লইয়া রাইমনি স্বামী গৃহে চলিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার পুত্র রামগোপাল আট নয় বৎসরের।

রাইমনির স্বামী এই পিতৃমাতৃহীন বালককে অত্যন্ত ভালবাসিয়া ফেলিলেন।—মারা যাইবার পূর্বে তিনি তাহারও রামগোপালের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আপনার বিস্তৃত জমীদারী ও টাকা কড়ি সমভাবে আধা-আধি বখরা করিয়া উইল করিয়া দিলেন।

রামগোপালের পিতা মাতার স্নেহমায়া বিধুকে জড়াইয়া উঠিলেও একজন কিন্তু বিধুকে স্নদৃষ্টিতে দেখিল না, সে রামগোপাল। পিতামাতার স্নেহ দৃষ্টি যে হইজনকেই পাশাপাশি রাখিয়া নিস্ত্রি ওজন করিয়া চালবে ইহা রামগোপাল ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারিল না।

সে ধীরে ইহাদের নিকট হইতে আপনাকে সরাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মা কাহলেন—

“ইয়ারে গোপ'লা, তুই যেন দিন দিন কেমন ধারা হ'য়ে যাচ্ছিস—কেন বলতো”—ছেলে উত্তর দিল না।

বড় হইয়া সে যখন জানিতে পারিল পিতার যাহা কিছু বিষয় আশ্রয় ছিল, সমস্তই হই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, তখন তাহার হৃদয়ের বিদ্রোহ ভাব গিয়া পড়িল নিরপরাধ সরল চিত্ত বিধুর উপরে। বিধু কিন্তু ইহার কিছুই জানিল না। সে হাসিয়া খেলিয়া প্রতিদিনকার কাজগুলি করিয়া যাইতে লাগিল।

রাইমনি কিন্তু পুত্রের মনোভাব বুঝিয়াছিলেন। হৃৎখে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু এ বিষয় লইয়া তিনি পুত্রকে কোনও প্রশ্ন করিলেন না কেবল নির্জনে স্বর্গগত স্বামীর প্রতিমূর্তির পদতলে হাত জোড় করিয়া রুদ্ধস্বরে কহিলেন—

—“এ কি হ'ল গো”—

রাইমনির স্নান মুখ দেখিয়া বিধু ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কহিল—“কি হ'য়েছে মা তোমার”—

স্নান মুখের উপরে জোর করিয়া হাসি টানিয়া আনিয়া মা বলিলেন—“কিছুইতো হয়নি, বাবা।”—বিধুর মনে তথাপি বাধা মানিতে চাহিল না। তাহার মনে হইতেছিল, মায়ের ওই কাতর দৃষ্টির অন্তরালে কিছু গোপন রহিয়াছে। রাইমনি বিধুর অবিচল কেশগুচ্ছ সম্মুখে সরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—“জল খাবি চ' বাবা। এই রন্ধুরে অনেকটা পথ এসেছিল, মুখখানা শুকিয়ে আমসী-পানা হ'য়ে গেছে। আর, ইটুলও তো কাছে নয়, ক্রোশ খানেক পথ হবে।”

হাতের বইগুলি কক্ষ মধ্যে সেলফের উপরে রাখিয়া আসিয়া বিধু কাহল—“চল,।”

পুত্রের বিবাহ দিয়া বধু গৃহে আনিয়াও রাইমনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার সর্বদাই মনে মনে ভয় হইতে লাগিল ছেলে এই বুঝি কিছু বলে—

ছেলে কিন্তু তাঁহাকে কিছু বলিল না, বলিল সরলাকে। কহিল—“ও তোমার কে হয় বোঁ, যে এত তোমাদের—”

সরলা অতটা তলাইয়া দেখিল না। দেখাও তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ। হাসিয়া কহিল—“কেন জান না নাকি ;—বিধুদার সঙ্গেতো সেই ছোট-বেলা হ’তেই আমার মেলামেশা।—”

“ওকে তুমি ভালবাস ?—

“তা আর বাসবো না’—তোমার কথাগুলো যেন কেমন ধারা’—রামগোপালের চক্ষুর্দয় ধব্বক করিয়া একবার যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া সরলা কহিল—“তোমার কথাগুলো এত বেঁকা বেঁকা কেন ব’লতে পার—”

রামগোপাল যেন অতিকষ্টে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল—“সে তো তোমায় কাছে লাগবেই বোঁ।—হয়তো তোমার সঙ্গে কথা ব’লবার সময়ে অনেকটাতে আমার গলার স্বরে জড়িয়ে যায়।—”

সরলা বিস্মিত নেত্রে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। এইরূপ কথাগুলো আর কাহারও মুখে সে শুনিয়াছে বলিয়া মনে হইল না।—কিন্তু কথাগুলির অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও তাহার মনে হইল কথাগুলি যেন কেমন ধারা—রামগোপাল জীর সহিত কথা কওয়া বন্ধ করিয়া দিল। সরলা ইহার কারণ কিছু বুঝিল না ; জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া কোনও উত্তরই রামগোপালের নিকট হইতে পাইল না।

তাহারই প্রায় নয় দশ দিন পরে রামগোপাল যখন রাত্রে জীকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে বিধুর সহিত তাহার মেলামেশাই রামগোপালের এই ব্যবহারের কারণ, তখন সে যেন কেমন ধারা হইয়া গেল। চক্ষু ভরিয়া অশ্রু উছলিয়া উপধানের উপরে ঝরিয়া পড়িল। রামগোপাল ডাকিল—বোঁ—ভগ্ন কর্তৃষ্ণর যথা-পশ্চব পরিত্রুত করিয়া সরলা উত্তর

দিল। রাম গোপাল কহিল—“কাঁদছ নাকি ?—তাড়াতাড়ি অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া সরলা কহিল—“ভারি দায় পড়েছ আমার।—পাগল নাকি—”

(৩)

বিধু আসিয়া ডাকিল—সরি—

সরলা রন্ধন গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। সেই চিরস্বন্দর হাসিটুকু আজ যেন তাহার অধর হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। কহিল—তোমার সঙ্গে আজ একটা কথা আছে—

তাহার গভীর কর্ণধরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিধু নিজের অজ্ঞাতে যেন একটু চমকিয়া উঠিল।

কহিল “কি কথা সরি ?—”

“রান্নাঘরে এস, তরকারী চড়িয়ে দিয়ে ব’লব এখন। নইলে এখন তো আমার দাঁড়াবার সময় নেই, এস।” বালিকা সরলা ধীরপদে রন্ধন গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিধুও রন্ধন গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল

একখানি পিড়ী পাতিয়া দিয়া সরলা কহিল “বোস।—”

বিধু বসিল। কহিল—“কি ব’লছিলে ?—”

সরলা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল—“তুমি আমায় আর “সরি” ব’লে ডেক না বিধু দা’,—বৌদি ব’লেই ডেক। আর আমিও তোমায় বিধুদা ব’লে ডাকবো না ঠাকুরপোই ব’লবো। সে চুপ করিতেই দেগিতে পাইল বিধু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া আছে। সরলা দৃষ্টি নত করিয়া ফেলিল।

বিধু কহিল—“কিন্তু আজ হঠাৎ কেন তোর এ খেয়াল হ’ল সরলা ? কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ধরা গলায় কহিল—“তুমি কি কিছু বোঝ না বিধুদা’—না আরও বুঝবার সাধ হয়,—“কেন, তোমার দাদাকে কি আজও চিনতে দেবী রয়েছে ?—”

বিধু হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ! সরলা কহিল—“চলে—সবটা শুন্‌লেনা—”



“না—ওকথা শুন্তে আমার ভাল লাগে না। তবে তোমার কথা প্রতিপালন ক’রবার চেষ্টা ক’রবো।”—

বিধু দ্রুতপদে রন্ধন গৃহ ত্যাগ করিল। সরলা হাতের খুস্তিটা কড়ার মধ্যে ফেলিয়া নীরবে আগুনের প্রতি চাহিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার পর হইতে বিধু বথাসম্ভব সরলার সঙ্গ এড়াইয়া চলিল, কিন্তু সরলা তাহা সহজে পারিতেছিল না। তাহার শুধু মনে হইতে লাগিল, যে আজ হইতে বিধুদা’ও তাহার পর হইয়া গেল। সেও বুঝিল না যে সরলা তাহাকে কতখানি ভালবাসে, শ্রদ্ধা ভক্তি করে।...

একদিন না থাকিতে পারিয়া সে অশ্রুপূর্ণ-চক্ষে বিধুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কাহিল—“আচ্ছা, তুমিও কি আমার আলাতেই চাও শুধু ?—”

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিধু কহিল—“কেন ?—”

—“আমার দিকে আস না, কথাও কও না—কেন তা আমি বুঝতে পারিনি’—আমি—আমি এত কি দোষ ক’রেছি তোমার কাছে, বলতে পার ?—” বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল। বিধু হাসিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল—“তুই দেখছি পাগল হ’রেছিস সরি।—নইলে এমন ধারা কথা বলতে পারিস ?—”

সরলা কথা কহিল না, শুধু নীরবে ফুলিয়া ফুলিয়া কাদিতে লাগিল। বিধু সরিয়া আসিল। একখানি হাত সরলার মস্তকে স্থাপন করিয়া ডাকিল—“সরি—”

সরলা কথা কহিল না।

বিধু একটু হাসিয়া বলিল—“তোমার ওপরে কি আমি রাগ ক’রে থাকতে পারি!—তুই যে আমার বোন, সরি। তবে এইটুকু জেনে রাখ যে—শুধু শুধু—তোকে বিপদে ফেলতে, মানে, কারও বকুনি কিম্বা মুখ ভার, আমার জন্তেই সহ্য ক’রতে দিতে ইচ্ছে আমার নেই সরি।—শুধু, তুই স্বখে থাক, এই আমার ইচ্ছে।”—

সরলা কি যেন একটা কথা বলিতে গিয়া চুপ করিয়া মুখ নত করিয়া ফেলিল।

( ৪ )

তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল।...

রামগোপালের মাতা মারা গিয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধাদি হইয়া যাইবার মাস কতক পরে রামগোপাল বিধুকে ডাকিয়া সমস্ত সম্পত্তি ও বাড়ী ভাগ করিয়া দিল।...বিধু বাড়ীর অত্যাংশে চলিয়া গেল।

সরলা—রামগোপালের আদেশ ক্রমে সমস্ত জিনিস পত্র বি-চাকর দিয়া পাঠাইয়া দিল। বিধু শূন্যকক্ষ মধ্যে একাকী পানচারণা করিতেছিল। বি চাকরকে জিনিস লইয়া আসিতে দেখিয়া সে একটু হাসিল মাত্র। কহিল—“নন্দনায় ফেলে দিয়ে আর মেধো,—ওতে দরকার তো আমার কিছুই নেই।...”

জিনিস লইয়া মেধো পুনরায় সরলার নিকটে ফিরিয়া গেল। আদেশের স্বরে সরলা কহিল—“বারান্দায় রেখে দিয়ে ব’লে আর, যে তোমার জিনিস তুমি ফেলে দাও গে, আমরা পারব না।—না, আর দাঁড়াসনে।”—

মেধো চলিয়া আসিল। বলিতে হইল না, বিধু আপনাই শুনিতে পাইল। মেধো জিনিস দিয়া চলিয়া গেল। বিধু বাহিরের রোজ—দক্ষ আকাশের প্রতি নির্নিমেমে চাহিয়া জানালার উপরে বসিয়া রহিল।

রামগোপাল কোর্টে যাইবার পরে, দ্বিপ্রহরে সরলা যখন বিধুর অংশে ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল তখনও বিধু তেমনি ভাবে নীরবে বসিয়াছিল। সরলা কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—বিধুদা—

বিধু চমকিয়া চাহিয়াই বিরক্তি ভরে বলিয়া উঠিল “আবার তুমি লুকিয়ে এলে যে”—ভয় হয় না প্রাণে?— সরলা বারান্দা হইতে জিনিস গুলা কুড়াইয়া আনিয়া ঘরে সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে নিশ্চিন্ত ভাবে কহিল, ভয় হ’বে কেন, চিরদিন তো ঠাণ্ডা কথা রেখে চ’লবই, তবে আজকের দিনটি ছাড়া। পরে একটু হাসিয়া

কহিল “ভয় নেই, তোমার সামনেও এর পর হ’তে আমি আসব না।—”

বিধু মুখ ফিরাইল না, শুধু তেমনি বিরক্তি ভরা স্বরে কহিল—“ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তাই-ই হয়। আর কিছু চাইনে আমি তোমার কাছে।”

বিধুর কথা শেষ হইতেই সরলা সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র দৃষ্টিতে বিধুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু কিছু উত্তর দিল না। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নত হইয়া হস্তস্থিত কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

বিধু তাহার আরক্ত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যঙ্গ মিশ্রিত স্বরে কহিল—“আমার গেরতলা গুছিয়ে দেবার জন্তে তো তোমায় ডেকে আনা হয়নি নতুন বোদি। রাখ ওগুলো, হাতের নরমতলা বে গাল হ’য়ে যাবে, ফোঁকা পড়’বে।—ছাড়।”—

সরলা কোনও উত্তর দিল না। যেন শুনিতেই পায় নাই এই ভাবে সে হাতের কাজগুলি সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু, ইহার ঠিক দিন তিনেক পরেই একদিন গভীর রাত্রে বিধু কয়েকটি আবশ্যকীয় জিনিস লইয়া গৃহত্যাগ করিল। প্রভাতে উঠিয়া সরলা রামগোপালের নামে একখানি পত্র পাইল। তাহাতে লেখাছিল—

পূজনীয় দাদা,

সম্পত্তিতে আমার কোনও দরকার নেই,—বাড়ীতেও নেই। আমি আজ এই বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইলাম, আর আসিব কিনা বলিতে পারি না। তবে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, যেন ফিরিতে না হয়। আমার নামের যাহা কিছু ছিল, আজ হইতে সমস্তই আপনার। প্রণাম লউন, ইতি—

বিধু।

পত্র পাঠ শেষ করিয়া সরলা শুভিতের ছায় বসিয়া রাহল। প্রভাতের বাতাস তখন চতুষ্পার্শ্বে কি

একটা উদাস সুরের অজানা গান গাহিয়া চলিয়াছে। ... ..

\* \* \* \* \*

সাত বৎসর পরে ... ..

তেমনি ভাবেই দিন চলিয়া যাইতেছে। বিধু আর ফিরিয়া আসে নাই। সে কোথায় এবং কেমন আছে তাহাও কেহ জানিত না।

বৈকালে কোট হইতে ফিরিয়া আসিয়া রামগোপাল, উপরের এক খানি ইঞ্জি চেয়ারে বসিয়া, পার্শ্বস্থিত ছোট টেবিলের উপর জল—থাবারের রেকাবী হইতে এক এক খানি থাবার তুলিয়া লইয়া মুখে দিতেছিল।

পার্শ্বে চেয়ারের উপরে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল সরলা। রামগোপাল ডাকিল—বৌ—অন্যমনে সরলা উত্তর দিল—“কেন”;—

“আজ ফুটপাথের ওপোরে বিধুকে ভিক্ষে করতে দেখে এলাম, অন্তরে সরলা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল—কি কি বললে?—

পূর্বে কথাটির পুনরুক্তি করিয়া রামগোপাল হাসিল সরলা আর কোনও কথা কহতে পারিল না। তড়িৎস্পর্শে সে যেন একেবারে নিকট হইয়া গেল।

পথের পার্শ্বে অন্ধ ভিক্ষুক একাকী বসিয়াছিল, হঠাৎ একটি চির-পরিচিত কণ্ঠস্বর আসিয়া কানে বাজিল—“বিধুদা—” বিধু আপনার অজ্ঞাতেই যেন শিহরিয়া উঠিল। কম্পিত স্বরে প্রশ্ন করিল—“কে, কে তুমি?—

“আমি সরলা।—”

তেমনি স্বরে বিধু কহিল—“তুমি, তুমি এসেছ?—কিন্তু, কেন?—”

সরলা রুদ্ধ স্বরে কহিল, তোমায় নিয়ে যেতে—  
বিধু কি একটা বলিতে গিয়া হঠাৎ নীরব হইয়া গেল। সরলা বিধুর হস্ত স্পর্শ করিয়া কহিল—  
আমার হাত ধরে ওঠ বিধুদা, চল।—

বিধু কহিল—“না, সরলা, আমি আর যাব না  
সেখানে, আর যাব না।—”

“যাবে না?—কেন?—”

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিধু করিল—“এমনি  
ভিক্ষে করেই তো দিন আমার বেশ কেটে যাচ্ছে—  
আবার কেন সরি”.....সরলা বলিল—“তুমি যা  
তোমার দাদাকে দিয়ে এসেছ তা তোমার দাদারই  
থাকবে বিধুদা,—তার থেকে তোমার ঘরচের জন্তে  
একটি পয়সাও আমি নেব না। আমার হাতে যা  
আছে তাতে যে তোমার জীবনটা সচ্ছন্দে কেটে  
যাবে, এই কথাটা আমি বলতে পারি।—”

বিধু নীরবে কি ভাবিতেছিল। উত্তর দিল না।  
সরলা কাহল—“ওঠ, তোমায় না নিয়ে যে আমি  
যাব না বিধুদা। বিধু কি একটা কথা বলিতে মুখ  
তুলিতেই সরলা দেখিতে পাইল—অন্ধের দুই চক্ষুর  
কোন বাহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু ধীরে ধীরে নামিয়া  
আসিতেছে। সরলা ডাকিল “বিধুদা”—শীর্ণ ওষ্ঠের  
উপরে স্নান একটু হাসির রেখা টানিয়া আনিয়া বিধু  
কহিল—“আশীর্বাদ করি,— সরি তুই সুখী হ’, বোন্।  
—কিন্তু আমার, আমার আর তুই টেনে নিয়ে যেতে  
চাসনে দিদি”——। অন্ধ হ’লেও এ আমি বেশ সুখেই  
আছি।—

অর্ধস্বরে সরলা ডাকিল—“বিধুদা—”

বিধু কহিল—সত্যই—কি তুই আমার নিয়ে যেতে  
এসেছিস, সরি—সরলা কথা কাহল না, শুধু দুই  
ফোঁটা তপ্ত-অশ্রু অন্ধের ললাটের উপরে ঝরিয়া  
পড়িল।.....

বিধু ক্ষণ-কাল নীরবে থাকিয়া ডাকিল, সরি—

“কেন?—”

“আচ্ছা আজ তুই যা, কাল আমার নিয়ে  
যাস।—

পরদিন প্রভাতে সরলা ও অল্পতপ্ত রামগোপাল  
যখন বিধুকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিল, তখন  
যে স্থানে বিধু বসিয়া থাকিত সেখানে কেহই ছিল  
না।

তাহার পার্শ্বের বটগাছের ছায়ায় যে খজ  
ভিক্ষুক বসিয়াছিল রামগোপাল তাকে প্রশ্ন করিয়া  
জানিল—কাল রাত্রে সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে,  
তাহা সে জানে না।

সরলা স্তব্ধ ভাবে ফুট-পাতের উপরে দাঁড়াইয়া  
অল্প দিকে চাহিয়াছিল।—রামগোপাল ডাকিল—  
“বৌ—”

সরলা উত্তর দিল না। রামগোপাল কহিল—  
“আর কেন,—চল বাই।” সরলা রামগোপালের  
মুখের প্রতি চাহিয়া হতাশ স্বরে কাহল—তাই  
চল—

উভয়ে আসিয়া গাড়ীতে উঠিল।

উভয়েই নীরব। এক জন ভাবিতেছিল—সে  
চলিয়া গেল, কিন্তু কোথায়? আর কি সে ফিরিয়া  
আসিবে না?—কবে? সে আবার কবে আসিবে?—

আর একজন ভাবিতেছিল—যে আর এক  
জনকে হৃৎথের অশান্তির হাত হইতে রক্ষা করিতে  
সেচ্ছায় সমস্ত ত্যাগ করিয়া—কোন অচেনা স্থানে  
চলিয়া গেল সে কত দূরে?





## রূপের নেশা

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার ঠোঁটের একটু স্খা  
ঢালো—ঢালো ;  
তোমার রূপের রঙ্গিন্ বাতি  
জ্বালো—জ্বালো ।

তোমার অলস পরশ থানি,  
তোমার সোহাগ সরস বাণী,  
তোমার কাজল ডাগর ঐাখি  
ভালো—ভালো ।  
রঙ্গিন্ ঠোঁটের মদির স্খা  
ঢালো—ঢালো ।

দীপ্ত সুরায় পেয়ালাখানি  
ভরো—ভরো ;  
রূপের নেশায় মাতাল মোরে  
করো—করো ।

কুসুম লতার বাঁধন দিয়ে  
নিবিড় কোরে জড়িয়ে নিয়ে,  
নিভিয়ে আনো আমার ঐাখির  
আলো—আলো ;  
তোমার ঠোঁটের একটু স্খা  
ঢালো—ঢালো ॥



## দক্ষিণান্ত

### শ্রীশচীন সেনরায়

অসিতা তাকে লক্ষ্য করেছিল - আলাপ হবার অনেক আগেই।

অসিতা মনে আনতে পারে না—কোন দিন যুবকটাকে প্রথম দেখেছিল—কোন অবস্থায় বা কোথায়।...কিন্তু খুব চিন্তা করলে হয়ত বা পারতে পারেও আবার।—

নরেশ খালি একটা নির্দিষ্ট সময়ের ‘বাসেই’ সহরে বাতায়ীত করে। বাধে রবিবার,—তা’ নৈলে রোজ। সকাল নয়টার সময় যে ‘বাস’ খানি এসে দাঁড়ায় পেসেজার নিতে অসিতার বাড়ীর দ্বারেই, সেখানির দোতালার উপর একটা সিটে বসে থাকতে দেখা যায় তাকে।

সেই দিন—

অসিতাকে একটু সকাল ক’রে হাসপাতালে যেতে হবে। তাই নয়টার ‘বাস’ ধরবার জন্তে অপেক্ষা কচ্ছে।—

‘বাস’ আসে। অসিতাও উঠে। মধ্যে এক তিল স্থানও নেই। খালি নরেশ যে ‘সিটে’ বসেছে সেখানে ঠেলাঠেলি করে বসলে একজনের আলাজ জারগা হবে।

পুরুষমানুষের সাথে লেগে বসতে ওর যেন কেমন—কেমন লাগে। ও যে স্বভাবতঃই লজ্জালু। বেশী লোকের সাথে মিশতে বড় একটা চায় না। তাই দোতালার জারগা আছে মনে করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যায়—তখন কন্ডাক্টর বাধা দেয়। উপরে নাকি একটুও স্থান নেই।

বাস ছোটে বেদম।—

অগত্যা ওখানেই বসবার জন্তে আস্তে আস্তে পা টিপে-টিপে একটা হাতল ধরে এগোয়।

বসতে গিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। ভাবে, এই যুবকটাকেও রোজ দোতালার উপর বসতে দেখি।

সহসা চোক তুলে চাইতেই সাম্নে এক মহিলাকে দেখে নরেশ যেন কেমনতর হয়ে গেল। পরে নিজেকে একটু কষ্টে রেখেও তার পাশে ফষ্ট অন্তরে একটা জারগা করে দেয়।

বিনয় নম্রভাবে অসিতা বসে।

নরেশ অতর্কিতে ছ’চার বার অসিতার অমুণম মুখখানা দেখে, মনে ভাবে হয়ত, কোথায় যেন একে একবার দেখা হয়েছে।

অসিতা কিন্তু তাকে প্রথম দৃষ্টিতেই চিনে ফেলে। খুসীতে ভরে ওঠে মন। সহসা ওর মনটা যেন অহৈতুক পুলকে নেচে নেচে উঠল যেমন নাকি শারদীয়া পূজায় মুখরিত ঢাকে আরতিস তালে—

নরেশ আস্তে আস্তে হতস্থিত খবরের কাগজ-খানা ভাঁজ করে, জোড়-করে-রাখা হাটুর ‘পরে’ রাখে, খুব সন্তর্পণে মোচড় ফিরে অসিতার দিকে বসে। একটা উছলং দেখিয়ে হেসে কথা পারে—আপনাকে আগে যেন কোথায় দেখেছি—না? ভারী চেনা-চেনা লাগচে কিন্তু আপনাকে!

অসিতা কোন জবাব দিতে পারে না। জীব আড়ষ্ট হয়ে আসে। ভাবে, একজন অপরিচিত যুবকের সাথে আলাপ করতাই যে কত লজ্জা করে তার উপর আবার একেবারে গা খেসে বসা—ছিঃ!

নরেশ আবার বলে—বাস্তবিক, আমার ভারী

হুঃখ হয় যে কিছুতেই মনে করতে পারছি নে কোথায় দেখেছি। আপনার কি মনে আছে ?

অসিতা ধীরে ধীরে মাথাটা দোলায়। সে ভাবে, কি একটা বিচ্ছিন্নী শুনাবে যদি আমি তার মুখের উপর বলে দি 'না'—। তাই বলে—সত্যি, আমিও কিন্তু মনে করতে পারছি নে কোথায় আমাদের দেখা হয়েছিল একদিন !

বলেই নিখিল আনন্দ হেতু একটা স্বচ্ছ সুশীতল তরল হাসি অসিতার ঠোঁট বেয়ে যেন গড়ায়।

আলাপ-ই আস্তে আস্তে সঙ্কোচের অবশুর্গণ উদ্ঘাটিত করে।

স্মারিকক্ষণ চূপ করে থেকে নরেশ আবার জিজ্ঞেস করলে—আপনি কি এই সময় রোজ এই বাসেই যান ?

অসিতাও হেসে জবাব দেয়—সাধারণতঃ কিছু পরেই বাই ! আপনি তো এই বাসেই যান রোজ না ?

—হাঁ, আমি প্রায়ই দোতলায় উঠে বাই। কিন্তু আজ যা ভীড় ! আমি 'লাকি' যে নীচে একটা জায়গা পেয়েছি।

—আপনার বুঝি আফিস করতে হয় ?

—হাঁ।

অসিতা একদৃষ্টে নরেশের প্রতি ঋদ্ধ চোখে চায়, আবিষ্কার করে বাস্তবিকই লোকটা নিতান্ত ভদ্র,—তার কথা বলবার ধরণ, তার বেশ—ভূষাও

—আপনি কোন বাসে বাড়ী ফেরেন ? নরেশ উৎস্রেকের সহিত জিজ্ঞেস করলে।

—কাজ বেশী থাকলে শীগ্গীর ফিরতে পারি নে। তা' নইলে রোজই প্রায় সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরি

অসিতা হাসপাতালে গিয়ে ভারী অস্বস্তি অনুভব করলে। মনের কোন একটা জায়গায় যেন সহন্য ভয়ানক বেজুত হয়ে গেল।

সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে এসে চূপচাপ বসে রয়েছে ; তখনও যেন ওর মনের পটে স্পষ্ট করে কে একে দিয়ে গেল—স্ববক নরেশ বাবুর সূচারু পেশল দেহখানা, তার ভাসা-ভাসা কুচকুচে ঢোক ইটা।

নরেশ দত্ত নিশ্চয়ই সচ্ছল অবস্থাপন্ন একজন ভদ্রলোক। অসিতা শয্যা গ্রহণ করতে গিয়েও সে' কথাই ভাবলে।

সে দিন শনিবার।—

সাক্ষাৎও সেই সাড়ে নয়টার বাসেই।—

একত্র এক 'সিটেই' ছ'জনে বসে, পুটন-পুটন করে ছ'জনে আলাপের তুবড়ি ছুটায়।

কথায় কথায় নরেশ বলে, আপনি বায়কোপ-টায়কোপ দেখতে যান না ?

বাড় নেড়ে অসিতা বলে—হ্যাঁ, যাচ্ছি তো। ভালো ফিল্ম হলে বড় একটা বাদ পড়ে না।

—কাল তো খুব ভাল ফিল্ম আছে। চলুন না কেন কাল বাওয়া যাক ?

—কি ফিল্ম ? কে করেছে ?

—'ডার্ক এঞ্জেল' ( Dark angel )। প্রধান এন্টার হচ্ছে 'রোনাল্ড কোলম্যান' আর এন্ট্রেন—'ভিমা-বেংকি'

—'রোনাল্ড কোলম্যান' ! কিন্তু 'ভিমা-বেংকির' নাম তো আগে শুনি নি।

—বড় 'প্লে'তে এই এক রকম নতুন নাবছে। কাগজে তো ওর ভয়ানক সূখ্যাতি পড়েছি। 'চার্লি' নাকি এই ছবি দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছে—'রুড্‌লাফ-ভেলাস্টেট' নাকি এ ফিল্ম ও 'ভিমা-বেংকি'কে দেখেই তাড়াতাড়ি নিজের জন্ত ও 'সান অফ শেক' ( Son of shick ) আর ঙ্গল 'প্লে'তে প্রধান নায়িকা করে নিলে।

—তাই নাকি ! আশ্চর্য্য হয়ে অসিতা বলে। পরে রাজি হয় বায়কোপে যাবার জন্তে। স্থির করে

যে নরেশ চারটা কি সাড়ে চারটার সময় অসিতার হাসপাতালে এসে তাকে নিয়ে যাবে।

পরের দিন—

ঠিক সময়েই নরেশ,—অসিতা যে হাসপাতালের 'নার্স' সেখানে গেল। গেটের সাম্নে দাঁড়াল। তাকে দেখে হাসপাতালে অসিতার বিশেষ আলাপী জনকতক নার্স জানালা দিয়ে তাকে দেখতে লেগেছে। এতে অসিতার মন যেন বেশ গর্ষিতা হয়ে ওঠে।

নিকটেই আরেক জন নার্স, নাম তার স্মৃতি,— ভারী পরশ্রীকাতরা, হিংস্রটে। ঙ্গ কুচকে, নাক সিটকে শুধায়—উনি কি তোমার কাছে এসেছেন নাকি? কে তোমার?

—এই যে গিয়ে—বন্ধু। একটু সলজ্জ সুরে অসিতা উত্তর করে।

—আগে তো তাঁর কথা কোন দিন বল নি।

বলেই জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অসিতার প্রতি একটা শোঁচা-মারা দৃষ্টিতে চায়, একটা বিকল্প পূর্ণ হাসি হাসেও। পরে সামনের 'বেডের' একটা রুগীর কাছে জর দেখবার জন্তে যায়। স্মৃতি চলে গেলে উষা বলে—ভাই অসিতা! তোর বন্ধুকে আমার কিন্তু ভারী ভাল লাগে। খুব স্মৃতি-সম্পন্ন তো। নিশ্চয় তিনি বড়লোক—না?

উষার কথাগুলিতে বেশ একটা অকৃত্রিমতার ভাব আছে।

দূর থেকে স্মৃতি শুনেতে পার। এতে যেন ভারী গাভ্রুল হলো। ঈর্ষার সুরে বলে, দেখতে তো বেশই লাগে। ধ্যাক করে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই, বুঝলে?

স্মৃতির কথাগুলো যেন অসিতা গ্রাহ্যের মধ্যেই নিল না, তাই একটুখানি চোরা হাসি হাসলে। একটা জবাবও পর্যন্ত দেয় না। বরং স্মৃতির হিংস্রাটা প্রচণ্ডভাবে জ্বালাবার জন্তে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে ধপ্-ধপ্ করে নেমে নরেশের কাছে

গেল; পরে একটা টেলি ডেকে তার চোকের সাম্নেই দুজনে একত্র বসে' চলে গেল।.....

গোটা কতক সপ্তাহ অতীতের গর্ভে মিশে যায় সে'দিন স্মৃতি অসম্ভব রকম মুখখানা কালো করে' অসিতার সাম্নে এসে দাঁড়ায়,—কাল বৈশাখীরা মেঘে ঢাকা কৃষ্ণ আকাশখানা আর কি

কপালের চামড়া কৃষ্ণত করে স্মৃতি একটু উত্তেজিত সুরে প্রশ্ন করলে—অসিতা, তুমি কি জান তোমার বন্ধু কি করেন?

—কে? কার কথা বলচো? একটু আমতা আমতা করে অসিতা বলে।

—ঐ যে নরেশ বাবু! যিনি এখানে এসেছিলেন।

—নাঃ! আমি ভাল করে জানি না। একথা আমি তাকে কক্ষুনিই জিজ্ঞেস করিনি। কেন—বলতো ভাই কি ব্যপার? একটু ভীতু কণ্ঠে শুধায়।

—এই যে তোমার গিয়ে—না থাক,—বলেই কতক্ষণ চুপ করে থাকে, পরে আপনা-আপনিই আবার বলতে থাকে— আমি তো বেদিন ওকে দেখেছি সেইদিনই বলে রেখেছি লোকটা খাঁটি না। আমার সন্দেহ হয় ও একটা সামান্য লড়িয়াণ যে!

—কেন—কি করে বুঝলে? ব্যাকুলিত সুরে অসিতা বলে।

—আরে,—সেদিন তো যাচ্ছিলাম ডালহৌসী স্কোয়ারের ধার দিয়ে, দেখি কি ওই নরেশ অনেক-গুলি মাল নিজেই বয়ে লড়িতে উঠাচ্ছে। কী ধাপ্লাবাজ লোকটা! স্মৃতির সঙ্গে-শুভে ভদ্রলোকটা হয়ে থাকে!

আমার মনে হয় তুমি ভুল করেছ। চিন্তাবিতা ভাবে অসিতা বলে। হঠাৎ তার স্মৃতির রূপা চেহারা খানা যেন ফ্যাকাসে হয়ে উঠল

অসিতার শক্তি ভাবটা স্মৃতি চট করে ধরে ফেলে, ভাবে—তার কথাগুলি কার্য্যকরী হয়েছে, তাই আরও একটু ভাল করে শানিয়ে দেবার জন্তে

আবার বললে—বিশ্বাস তো কর না! শোন তবে। সেই দিন তাকে ঐ রকম করতে দেখেই কাছে গিয়ে আলাপ করলুম,—তোমার কথাও বললুম। সে তখন ফট করে ঘাবড়ে গেল। আর বেশী ভিড়লে না। অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায় যেন।—

বলতে বলতে খীল খীল করে হাসতে লাগল। অসিতা এমন একটা অবস্থা বোধ করলে—হুঁচোক দিয়ে যেন কান্নার ফাপড়ি হুঁ-হুঁ করে এখনই ছুটেবে আরকি। আতঙ্ক গালে হাত দিয়ে একেবারে মাটির উপরেই বসে ভাবলে—যখন একবার নিজেকে সমর্পণ করে ফেলেছি—তখন কি আর পরিবর্তন করা যায়? যদি সে রাস্তা ঝাড় দিয়েও জীবিকা অর্জন করে তবু আমার এখন ক্ষোভ নেই। তারপর প্রকাশ্যে স্মৃতিতে গুনিয়া বললে—ভাই! তবু তো কোন অমঙ্গলপায়ে রোজগার করে না।...

স্মৃতি একটা অস্বাভাবিক ভাবে হাসি দেয়।

—তা বেশ, ভাল কথা! বলেই আবার আরেকটা অশ্রাব্য হাসিও।—

স্মৃতিতে চোখের সারে দেখলে ওর মন বিষিয়ে ওঠে।

কী নীচ এর অন্তঃকরণ! কী ঘৃণিত এর মন!—

সেই দিনও অসিতা ছুটির পর নরেশের জন্ত মটর ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কচ্ছে

নিয়মিত সময়ের বাসে অসিতা ওঠে পড়ে, একটা ভয়ানক হুচিন্তা ওর মনকে ছেয়ে ফেলেছে—

নরেশ নাই ওখানে।—

তাই তাড়াতাড়ি নেবে পড়ে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তার জন্তে। কত ‘বাস’ যায়, কত ‘বাস’ আসে;—তবু নরেশের পাত্তা নেই।

নিতান্ত হতাশ ভাবে অসিতা একাই বাড়ীর দিকে চলে। ও যেন নিজেকে ছন্দ-পতন কবিতার মতন বোধ করলে। ওর প্লবিত অস্তরটা যেন হঠাৎ বোবা কিংবির মতন হয়ে গেল।

বাড়ী গিয়ে হাসপাতালের কাপড় জামা জুতা না ছেড়েই বাড়ীর পেছনে মাঠটার ধারে গিয়ে হুঁহাত দিয়ে নিজের মুখখানা ঢেকে বসে রইল। দূরে বনের গাছের পাতার মর্ম্মর ধ্বনির সাথে ওর নিজের উদাসী অন্তরকে মর্ম্মিরিত করতে চায়। অতি দূরের একে বেকে প্রবাহিতা কাহিল খালটার কলকল্লোলের সাথে কল্লোলিত করতে চায় ওর হতাশী প্রাণকে। নক্ষত্র বিহীন বিস্তীর্ণ আকাশের নিঃসঙ্গতা ও নিঃসঙ্গতার সাথে মিতালি পাতাতে চায় ওর বক্ষা মন।.....

অনেকক্ষণ ওখানে বসে থেকে কত কথা ভাবে, আর খালি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। পরে ঘরে গিয়ে নরেশকে এক চিঠি লিখতে বসে। মনোভাব ভাষায় কুটান একপ্রকার যেন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।..... তবু লিখবেই।—

“বিকলে ওইখানে তোমার সাক্ষাৎ না পেয়ে আমার মনে যে কী রকম একটা অবস্থা হলো—তা তোমাকে কে জানায়? সেই অতীত দিনগুলো হয়ত আমার জীবনের অনন্ত সুখের দিন গেছে। তুমি কেন না জেনে, না শুনে আমার উপরে রাগ করলে, বন্ধো! স্মৃতি কি তোমাকে কোন অপমান-জনক কথা বলেছে? মাণ করো। পবিত্র বন্ধুত্বকে নষ্ট করো না। তুমি যা-ই হও না কেন তবু তুমি আমার কাছে বন্ধু। দয়া করে একবার এদিকে এসো, লক্ষ্মীটী।”

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিছানার পড়ে থেকেও নিদ্রাদেবী অমুগ্ধ করত চায় না।—

পরে বহু চিন্তা-ভাবনার পর এই নির্দ্ধারণ করে—নরেশ যদি একটা কুলিও হয় তবু ওর সংকল্প অক্ষুন্নই রাখবে।

ঠিক পুরোপুরি হুঁটা দিন কাটে।

অসিতা নিজেকে অমুহু ও হুর্দ্বল বোধ করে, তাই হাসপাতালেও অমুপস্থিত থাকে।



ভোর অনেকক্ষণ হয় হয়ে গেছে ; তবু আঁখা জাগ্রত অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছে। সহসা যেন চম্কে ওঠে, চোক মেলে চেয়ে নরেশকে সান্নেয়ে দেখেই ধর-ফরিয়ে উঠে পড়ে, বলে,—মাইরি, তুমি যে এসেছ তা ঘুমের চোকে টের পেয়েছি, ভাবছিলাম বুঝি স্বপ্নেই তোমাকে দেখছি। আমার চিঠি পেয়েছ ?—

কোন কথা না করে নরেশ এগিয়ে অসিতার অতি কাছে গেল, ওর পুষ্ট হাতখানা ধারণ করে একটা বেশ মোলায়েম ভাবে চাপ দেয় ;—এইটুকুতেই যেন অসিতার সমস্ত কথার উত্তর দিল ; তাই কথা বলে জবাব দেওয়ার কোন দরকার হয় না।

চা পান দু'জনে একত্রেই সম্পন্ন করে।.....

সোমবার দিন কিনা তাই নরেশের সময় খুব কম, আফিস করতে হবে। সকাল সকাল যাবার জন্তে উঠে পড়ে। তাই আর বেশী আলাপ জমে না। যাবার বেলায় বলে যায়, আচ্ছা উঠি—কেমন ? বিকেল বেলা আসবো একবার, থেকো কিন্তু। আজ 'ইডেন গার্ডেনে' গেলে হয়,—যাবে ?

বিকেল বেলা একবার সে আসবে শুনে অসিতা আনন্দে ডগমগ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বলে—হাঁ, এসো কিন্তু। বেশ, যাওয়া যাবে 'ইডেন গার্ডেনে' ;—ওঃ কতদিন যাবৎ ওদিকে যাইনে !

নরেশ বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে সে পেছন দিকে একবার ফিরে তাকালে।

অসিতা দরজায় দাঁড়িয়ে দু'হাত জোঁর ক'রে নিজের হাত বাড়়ের উপর রেখে, স্থির চোকে চেয়েছিল তার যাওয়ার পানে। নরেশকে আর একবার তাকাতে দেখেই জানিয়ে দিলে—এসো কিন্তু লক্ষ্মীটী। দেখো ভুল না যেন। এসো—এসো—এসো—বুলে ?—

মুহূর্তের মধ্যে ওর...বেশ ঝড়-ঝড়ে রৌদ দিনটা যেন একেবারে মেঘলা হয়ে গেল।

পরে অসময়েই বিছানায় আবার শায়, শুয়ে শুয়ে মনে ভাবে—আজও তো সে কি কাজ করে তা'

স্পষ্ট করে' কিছুই বলে না। তবে কি স্বকৃতির কথাই—আর ভাবতে পারলে না। শেষে নিজের মনে নিজেকে প্রবোধ দিলে—করুক গে সে যে-কোন কাজ ! তবুও পবিত্র। চাঁদিনী যামিনী হাসা উজ্জল আলোক দিয়ে আমার কি হবে ? চাইনে আমি তা ! আমার তুলনীতলার নিম্ননিমে প্রদীপটি অক্ষয় হয়ে থাক। তারপর বিধাতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানায়—ঠাকুর ! এই প্রদীপটি আমায় জ্বালাতে দাও, তার পবিত্র আলো আমায় ভোগ করতে দাও।—কোন বাদ সেধো না !

নির্ধারিত সময়ও কেটে যায়, তবু নরেশ আসে না।

অসিতা নিজেকে যেন অবশ স্থবির ব্যক্তির মত বোধ করলে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ওর বুকের পাজড়া ভেদ করে শা করে বেরিয়ে পড়লো।

কতক্ষণ যাবৎ কত মন্ত একটা আশা বুকে চেপে অসিতা বসেছিল ! কিন্তু হায় !

সারা পৃথিবীটাই যেন ওর কাছে একেবারে তেঁতিয়ে উঠল। চুপ করে নিরাশার ছায়া বক্ষে চেপে সটান শয্যায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে বারাণ্ডায় জুতার শব্দ শুনে অসিতা তাড়াতাড়ি উঠে, একেবারে চোকের সান্নেয়ে নরেশকে দেখে ওর মন প্রফুল্ল এমন দীপনীয় হয়ে ওঠে ঠিক বাড়ীর সান্নেয়ে পুষ্পিত কুমুদা গাছটার মতনই যেন,—নরেশকে অসিতা নিজের পাশেই বসতে ইঙ্গিত করে।

নরেশও বসে, ...নিঃসঙ্কোচেই—

একটু ভনিতার স্বরে অসিতা বলে—তবু 'যা' হো'ক। আমি তো প্রতীক্ষা করে করে হয়রান হ'য়ে গেছলুম। ভাবলুম এলে না বুঝি আজ আর !

নরেশ একটু লজ্জিত কর্তে জবাব দেয়—রাস্তার একটা লোক আটকালে, তাই।

—যাক্, একটু চা করে দি' ?

—গেপেছ ? এই কতক্ষণ হ'লো খেয়ে-দেয়ে  
বা'র হয়েছি।

—না—তবু একটু খাও।

বলেই রান্নাঘর থেকে একটা 'ডিসে' করে খান  
কতক লুচি, তরকারী, সরভাজা আর কত কি এনে  
হাজির করলে। পরে চা-ও।

—ওরে-- বাবাঃ ! এত শুলো !

—আহাঃ—হাঃ, এতগুলি না— আরও কিছু !  
নাও, খাও তো ধীরে ধীরে

—তোমরা মেয়েমানুষ কিনা—কেবল খাওয়াতে  
পারলে—ই তোমাদের সব হলো।

অগত্যা খেতে শুরু করলে।

—আজ আর যাওয়া হলো না বেড়াতে বলেই  
গায়ের দামী চাদরটা নিরীক্ষাবাদে অসিতার হাতে দেয়  
আলনার উপর খুঁয়ে দিতে।

পানিক্ষণ মৌন ভাবে কাটে।

পরে নরেশ আরও একটু অসিতার কাছে সরে  
গিয়ে বসে বলে—তোমার চিঠি আমি পেয়েছি সেই  
দিনই

—পেয়েছিলে ?

—হাঁ।

—কি স্থির করলে ? ওহ্ ! তুমি যে আমার  
কি করেছ তা' কি তুমি একবার ভাব ?

তবু কোন কথা কয় না। ধীরে ধীরে অসিতার  
গায়ের একেবারে কাছে লেগেই বসল

অসিতা আরও বলে—তুমি আমার মনটা ছিড়ে  
নিয়েছ। তোমার ভাবনা, তোমার চেহারা,  
তোমার কথা বলার ধরণ, তোমার সব কিছুই যে  
আমার চোকে ভাসে। তা আবার মনে করতে  
আমি যে কত ব্যাকুলিত হয়ে পড়ি—সে-টা তোমাকে  
কে জানায় ? আমার খরচা চালাবার জন্যে তুমি  
কিছু ভেবো না। নিজেই রান্না-বাগ্না, ঘর ঝাড়—  
সব আমিই করবো।

—লক্ষীটী, তুমি এসব কি বলচো ? জেনো,  
নিজের জীকে স্নেহ-সজ্জনে রাখবার মত শক্তি ও  
অর্থ আমার খুবই আছে।

খুব সরল অথচ বিনীতভাবে অসিতা উত্তর  
করে—কেবল 'লড়ি' চালিয়ে বেশী রোজগার না-ও  
হ'তে পারে; তাই আমি বলছিলাম, দু'জনে মিলে  
উপার্জন করবো, ঘর-সংসারের কাজও সবই আমি  
করবো—তখন কত অর্থ হবে।

নরেশ শুনে আংকে উঠে। কি একটু চিন্তা  
করে হা-হা করে হেসে বলে,—আমি যে 'লড়ি'  
চালাই—তোমাকে বললে কে ?

—কেন, স্মৃতি।

—অ-হঃ ! তোমার সেই বস্তুটা যিনি আমার  
কাছে তিন দিন ঘুরে গেছিলেন। হাঁ, ভারী পারাপ  
কিন্তু মেয়েটা

—কেন—কি করেছে তোমার ?

—তেমন কিছুই করেনি যদিও আমার, কিন্তু  
তোমার ভারী বদনাম করেছে। ও এসেছিল আমার  
সাথে থাতির করতে।

—তাই নাকি ?

—থাক্ এখন ওসব কথা। তুমি তো আমার  
বিষয়-আশয় সম্বন্ধে আজ পর্যন্তও কিছুই জান না।  
তোমাকে জানান উচিত আগেই। আমি সোম-চা-  
কোম্পানীর ম্যানেজার। তার মালীক আমার  
কাজের উপর খুশী হয়ে আমাকে চার আনা সেরার  
দিয়েছেন।

নরেশের কথা শুনে অসিতা মাথা হুয়ে পসে  
পাকে, পরে লজ্জিত কণ্ঠে বলে—ছিঃ, কি লজ্জা !  
স্মৃতির কথা মত আমিও তোমাকে ভেবেছি—কোন  
একটা ছোট কাজই বৃষ্টি তুমি কর।

—এতে তুমি অনর্থক এত লজ্জা পাচ্ছো কেন ?  
তুমি বা আগে শুনেছ, তাই ভেবেছ।

বলেই অসিতাকে অতি সন্তর্পণে নিজের কোলের  
কাছে টেনে আনে।... অসিতার শিরিষ পেলব ঠোঁটে

চুমা দেয়, পরে আরার বলে, লক্ষ্মীটী, আমার খালি কত উদার—কত উচ্চ!...আমার সম্বন্ধে এতসব  
বারে বারে একটা কথাই মনে হচ্ছে। শুনবে? কথা শুনেও তোমার সংকল্প থেকে একটু নড়োনি।

অসিতা তার কোলে নিজের মাথা রেখেই শুনে অসিতার সুন্দর মুখ খানি ব্রীড়া হেতু লাল  
শুধায়—বলনা,—কি? হয়ে গেল।—

—অমি ভাবছি তোমার কথা। তোমার মনটা কোন একটা জবাবও দিলে না।

## কিশোরী

শ্রীহেম সেন

কেমনে বাঁধিয়া রাখিব তাঁহারে আচল-বাসে,  
যাহারে ধরিয়া রাখিতে নারিনু বাহুর পাশে !  
যে দিন দেখিনু বরাজ সুন্দর আঁখির কোণে,  
অলখিতে চিত হরিয়া লইল নয়ন-বাণে ।  
নিরমল তনু কষিত-কাঞ্চন হৃদয়ে এনে,  
দিবস রজনী পরাণের দাহে মরণ আনে ।  
আজো মনে পড়ে ‘বিকিয়ে দেওয়া’সে যমুনা কুলে ।  
সুবরণ হেরি, নিজ কু-বরণ দিলাম ঢেলে ।  
“নিজ তনু জারি’ ভসম করিতে অনল মাঝে” ।  
দাহত রয়েছে, আলো নাই, শুধু বেদন বাজে ।  
সখি সে চতুর বড় ।  
‘মম-মন-কাঞ্চন, আপন প্রেম-মণি  
জোড়ি পরাইল হার ।’  
কুল কাঠে জ্বালি মদন-অনল বুকের ‘পরে,  
বেণুটি ফুকিয়া হাপর বানায়’ হৃদয়ে ধরে ।  
পরশ-সোহাগা, দরশন-পানি, শ্বেদ-সলিলে,  
নব অনুরাগ-রঞ্জে রঞ্জিল, পরাণ ঢেলে ।  
গুরুজন-আঁখি-চৌর ভয়ে ঝাপি বুকের কোণে  
সেই প্রেম-হার, শুধু দেওয়া তার, আপন জেনে ।  
তাই নিয়া আমি মরিব ডুবিয়া যমুনা জলে ।  
কাঁচুক বাঁশরী শত বিনাইয়া কদম তলে ।

# সমাজের জীবন

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

## শ্রীবীন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী

বৈদিক যুগে যৌবন বিবাহই প্রচলিত ছিল; কিন্তু পৌরাণিক যুগে যৌবন বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বালা-বিবাহও ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল। সমাজে কখন বালা-বিবাহের প্রচলন হয় তাহা নিম্না নানা মূনির নানা মত। গান্ধর্ব বিবাহ যৌবন বিবাহ সন্মহ নাই। গান্ধর্ব বিবাহও যখন সমাজের কল্যাণ সমাক্রমে সাধন করিতে অসমর্থ হইল তখন উক্ত বিবাহ প্রথা সমরোপযোগী পরিবর্তিত ও পরিণোদিত হইতে হইতে বর্তমান ব্রাহ্ম বিবাহ প্রথায় পরিণত হইয়াছে। ভারতীয় সমাজে অর্দ্ধাঙ্গিনীর এক আখ্যা সহধর্মিনী। পত্নীর সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করা হয় বলিয়া তিনি সহধর্মিনী। পতি পত্নী একত্রে এক মন এক প্রাণে গৃহস্থের নিত্যকর্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি সাধনের মধ্যেই ধর্মোচরণের প্রধান অন্তরায়। তাই শাস্ত্রকার পরিণয়োগ্রন্থ বরের মুখ দিয়া উপদেশচ্ছলে পত্নীকে বলাইয়াছেন “বদেদং হৃদয়ং মম তদেদং হৃদয় তবঃ।” সত্বীক আচরণ ব্যতীত গার্হস্থ্য ধর্মের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়—তাই শাস্ত্রকার বরের মুখে অহুরোধচ্ছলে কতাকে বলাইতেছেন—“মম ব্রতে তে হৃদয়ং দদাতু, মম চিন্তস্তে চিন্তমগ্নবর্ততে।”

বৈদিক যুগের পরে পৌরাণিক যুগে ভারতে বালা-বিবাহের প্রচলন আরম্ভ হয়। মনে হয় গান্ধর্ব বিবাহ বনাম যৌবন বিবাহে নরনারীর আত্মতৃপ্তির পূর্ণ সাফল্য হইলেও সমাজের কোন প্রকার স্বাস্থ্যোন্নতি না হওয়ার ধীরে ধীরে বালা-বিবাহ প্রথার প্রচলন হইয়াছে। সামাজিক জীবনের পূর্ণ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালা-বিবাহের

প্রচলন হয়। ভারতীয় সমাজে যৌথ-পরিবার বা Joint familyর বহুল প্রচলন অতি প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। যৌথ-পরিবারে বাস করিতে হইলে বালিকাবধু নির্ধাচনই সব দিকে মন্থন-কর। তাই অতি প্রাচীন কালেই সামাজিক জীবনের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্ত ভারতবর্ষে বালা-বিবাহের প্রচলন হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে মুষ্টিমের আর্ধ্য এই দেশ জয় করেন—অনার্য জনসংখ্যা তাহাদের লক্ষ শূণ্য ছিল সন্দেহ নাই। কালক্রমে বহু অনার্য আর্ধ্য সমাজে মিশিয়া তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল। তখন বহু আর্ধ্য পুরুষ অনার্য নারীকে পত্নীত্বে বরণ করিত। আর্ধ্য সমাজে মিশিয়া আর্ধ্য সভ্যতা প্রসাদে কিয়ৎ পরিমাণে সভ্য হইলেও সেই সমস্ত অনার্য রমণীর পক্ষে আজন্মসঞ্চিত-সংস্কার বিসর্জন দেওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। আর্ধ্য অনার্যের এইরূপ সংমিশ্রণে সমাজে বোরতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সেই বিশৃঙ্খলার হস্ত হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্ত বালা-বিবাহ প্রথার প্রচলন হয়। কারণ কোনও অনার্য বালিকাকে আর্ধ্য পরিবারে রাখিয়া আর্ধ্যের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও ধর্মোচরণ শিক্ষা দিলে তাহার জাতি ও বংশগত সংস্কার তাহার চরিত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিত না—অচিরে সে আর্ধ্য শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে আর্ধ্য পরিবারে আত্মগোপন করিত। বালা-বিবাহের প্রচলনের পরবর্তী কালে প্রায় উঠিল যে নারীই প্রকৃতিত না হইলে বালিকার পতিত্বে বরণের কোন মূল্য নাই,—তাই

সমাজে Second marriageএর প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। বালা-বিবাহের সৃষ্টি সম্বন্ধে ব্রজেননাথ শীল মহাশয় বলেন—“ঐবিড় জাতির মধ্যে যৌন সম্পর্ক অনেকটা উচ্ছৃঙ্খল ( Promiscuous ) ছিল। ইহারা যখন আর্ষা সভ্যতার মধ্যে আসিয়া পড়িল তখন হইতে আর্ষাদের প্রধাম চেষ্টা হইয়া দাঁড়াইল, যেমন করিয়া হউক নিজেদের স্বাভাবিক রক্ষা করিতে হইবে। যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে এই উদ্বেল ভাব হইতে আত্ম রক্ষা করিবার জন্য আর্ষা জাতির মধ্যে বালা-বিবাহ প্রচলিত হইল। ঋগ্বেদের সময়ে বালা-বিবাহ ছিল না, কিন্তু মনুর সময়ে বালা-বিবাহ সমাজে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। ইহার অন্য কারণও থাকিতে পারে। ঋগ্বেদের আর্ষোরা হয় তো শীত প্রধান দেশে ছিলেন; সেখানে যৌবনোদগম কিছু দেরীতে হইয়া থাকে। বিবাহও একটু বয়সে হইত। গ্রীষ্ম প্রধান ভারতবর্ষে বহুকাল অবস্থানের ফলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য দেহ বস্ত্রের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়া থাকিবে এবং যখন যৌবনোদগম অশেষাঙ্কিত অল্প বয়সে হইতে আরম্ভ হইল তখন বিবাহের বয়সও পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে।

প্রাচীন সমাজে বিধবা বিবাহেরও প্রচলন ছিল। শাস্ত্রে তাহার অনুশাসন প্রচার করিয়াছেন। যথা:— উত্তর জাতিই আদান প্রদানের স্বর্ণযুগে দৃঢ়বদ্ধ ছিল—তাই অতি সহজে ভারতীয় ধর্মের প্রতিবিম্ব ইরাণের সামাজিক জীবনে প্রতিকলিত হইতে পারিয়াছিল। বেদান্ত যখন বিশ্ববাসীর সমক্ষে আধ্যাত্মিক জগতের এক নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া গুরুগম্ভীরে গাহিয়া উঠিলেন—“অহং ব্রহ্মস্মি”— তখন পূর্ণ জ্ঞানের এই চরম সত্যকে বিশ্ববাসী অহঙ্কারের কণ্ডুরন আখ্যায় বিকৃত্বিত করিলেও— পরবর্তী যুগে পারস্তের পার্শ্বাত্যাকান্তারে ভারতের এই চরম সত্যের প্রতিধ্বনি উঠিয়াছিল। এই সত্য সাধারণের ধারণার অতীত হইলেও পারস্তের দার্শনিক বজ্রবরে জগতে ‘আনলহক’ প্রচার করিতে

ত হন নাই। রাজরোষের ক্রকুটী-কুটিল-মেজ তাঁহাকে এই সত্য প্রচারে বিরত করিতে পারে নাই। তারপরে ভারতের পঞ্চরসের শ্রেষ্ঠ মধুর ভাবের উপাসনাও ইরাণীয়গণের দ্বারা সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। পারস্ত কবির সুরমধুর লেখনী নিঃসৃত “লায়লামজ্নুন্ন” আখ্যায়িকা তন্দ্রেশীর সমাজে প্রেমের বজ্রা ছুটাইয়া দিয়াছিল। সুফীধর্ম বৈষ্ণব ধর্মের মত প্রেমের ধর্ম—প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া এই উভয় মতবাদই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণবের যেমন ‘রাধাধ্বজ’ একে অন্তের প্রেমে আত্মহার্য্য, তেমি সুফীর ‘লায়লামজ্নুন্ন’। বাস্তবিক পক্ষে ধর্মের প্রভাব অতি পুরাকালেই আদান প্রদানের মধ্য দিয়া এই উভয় জাতির সামাজিক জীবনকে পূর্ণ সাফল্য দান করিয়াছিল।

বিভিন্ন বংশধারার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ গঠন শীল হইয়া উঠিলে প্রাচীন সমাজে আমরা নারীর সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাই। পুরাণে দেখিতে পাই দক্ষ প্রজাপতির ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপের সঙ্গে বিবাহিতা হন। তাহাদের নাম যথাক্রমে অদিতি, দিতি, দনু, অরিশ্টা, সুরসা, খসা, সুরভি, বিমতা, তাম্রা, ক্রোধ-বশা, ইরা, কক্ষ ও মুনি বা মনু। পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রাচীন সমাজে সন্তান মায়ের নামে পরিচিত হইত। মুনি বা মনুর সন্তানগণ মানব বলিয়া পরিচিত। তখন নারীর আধিক্যপ্রযুক্ত এক এক পুরুষ বহু নারীর পানিগ্রহণ করিত। বর্তমান বিবাহপ্রথা বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান অবস্থার আসিয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন সমাজে আত্মতৃপ্তিটাই বোধ হয় কাম্যবস্তু ছিল। তাই নরনারীর একত্র সম্মিলন কিয়দংশে সামাজিক শাসনাধীনে থাকিলেও বর্তমান বিবাহের সঙ্গে তাহাদের তুলনা হয় না। সমাজের মঙ্গলাকাজিগণ যথেষ্টভাবে বিচরণের চেয়ে ঘেম তেন প্রকারেণ নরনারীর সম্মিলনকেও তখন ভাল মনে করিতেন। তাই মনু আত্মর, রাক্ষস, পৈশাচ, গান্ধর্ব প্রভৃতি অষ্টবিধ বিবাহের প্রকারভেদ করিয়াছেন;—

অর্থবাহী কন্যাকে ক্রয় করা আশ্রয়, কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করাকে রাক্ষস এবং স্ত্রী বা প্রমত্তা কন্যাকে উপগত হওয়ার পৈশাচ বিবাহ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। বরকন্ডার পরস্পর ইচ্ছাসংযোগে মিলনের নাম গান্ধর্ব বিবাহ। গান্ধর্ব বিবাহের প্রতিবিম্ব আমরা আধুনিক Courtship-এর বিবাহের মধ্যে দেখিতে পাই। মনুষ্যের ঈশ্বরিকারের মধ্যে বলপূর্বক অপহরণ করা বা স্ত্রীবা প্রমত্তা কন্যাকে উপগত হওয়া স্থগিত বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। কন্ডার সংখ্যা কম হওয়ার বাধ্য হইয়া বহু পুরুষকে অবিবাহিত থাকিতে হইত এবং বিবাহোপযোগী কন্যা নীলামে বিক্রীত হইত। আশ্রয় বিবাহের যুগে হয়ত একই কন্ডার পাণিপ্রার্থী চারি পাঁচটা পাত্র জুটিত, তখন যিনি অধিক অর্থ দিতে পারিতেন তিনিই কন্ডার পতিত্ব বহাল হইতেন। তারপরে গান্ধর্ব বিবাহ;—উপরোক্ত তিন প্রকার বিবাহ প্রথা হইতে অনেকটা উন্নত সন্দেহ নাই;—কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য নহে। মনুষ্য ইহাকে কামজ বিবাহ বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। তরুণ তরুণীর হৃদয়ের বিনিময়ে যে মিলন তাহা কবি তাহার কল্পনার ঐক্সজালিক রঙ্গ যতই রঙ্গীন করিয়া তুলুন না কেন—তাহার মূলে আছে কঠোর সত্যের মত আত্মতৃপ্তি এবং ইন্দ্রিয় স্তম্ভ। মানুষ যখন বৃথিতে পারিল যে ব্যক্তিগত স্ত্রীর চেয়ে সমাজের হিত বেশী মূল্যবান;—ব্যক্তির তৃপ্তি সমষ্টির তৃপ্তির নিকট অতি হেয়;—লোকে যখন সমাকল্পে বৃথিতে সমর্থ হইল যে “আমাদের ধন, জন, বিবাহ ইন্দ্রিয় স্ত্রীর, নিজের ব্যক্তিগত স্ত্রীর জন্ত নয়”—তখন গান্ধর্ব বিবাহ বর্জন করিয়া সমাজ ক্রতগতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইল। বস্তুতঃ ভালবাসা যদি বিবাহের মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত হয় তবে আত্মতৃপ্তি প্রচুর পরিমাণে হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজের মঙ্গল কি পরিমাণে সাধিত হইবে তাহা চিন্তার বিষয়। তাই Sir Adam Paul বলেন—“Love can not be adequate basis for marriage, because the

latter is a social institution existing on the benefits of Society. A young girl should not marry for love a penny-less fellow, for their children will not receive their due, seeing the education is an expensive matter. So also, an old man of fifty should not marry and thereby frustrate the legitimate hopes of their nephews and nieces.”

সামাজিক জীবনের প্রয়োজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন আৰ্য্যসমাজসংস্কারকগণ বৃথিতে পারিয়াছিলেন যে আত্মতৃপ্তির মধ্যে সমাজ দৃঢ়ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতে পারে না। তাই তাঁহারা অতি প্রাচীন যুগেই মেঘ-মন্ত্র-স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে মানবজীবন শুধু আত্মতৃপ্তিতে উন্নত Gay Butterfly হইয়া ঘুরিবার জন্ত নহে;—তাই প্রাচীন আৰ্য্যগণ যুগে যুগে ত্যাগের মহিম্বাসী মন্ত্র জগতকে শুনাইয়া আসিয়াছেন। ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতীয় সমাজে গান্ধর্ব বিবাহও আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। পাশ্চাত্য সমাজে গান্ধর্ব বা Courtship-এর বিবাহের পরিণাম আমরা প্রতিনিয়ত সংবাদপত্রের স্তম্ভে দেখিতে পাই। কিছুদিন হয় চিকাগো সহরের এক Justice আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—“Marriage has been proved to be a failure in this Country.” পাশ্চাত্য সমাজে প্রস্তুতুয়োন নরনারী Courtship এর সময়ে নিজের অভ্যাসগত বা চরিত্রগত দোষ ধ্যাসম্ভব গোপন রাখিতে সক্ষম সচেত থাকে—তাই পরস্পরের দোষ কাহারও চোখে ধরা পড়ে না। পরিণয়ান্তে নিশ্চিতাবস্থায় প্রকৃতির প্রভাব চরিত্রের উপর পূর্ণমাত্রায় প্রকট হয়—তখন নানাকারণে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়—এবং সেই মনোমালিন্য পরিণেবে বিবাহবিচ্ছেদে পর্যাবসিত হয়। পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের এত ছড়াছড়ি দেখিয়া মনে হয় যে অচিরে তদেবীয় সমাজ বিবাহ প্রথার পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইবে।



## আলোচনা

### ত্রিগীর্বাণ

সাহিত্যের সমালোচনা কিরূপ হওয়া সম্ভব সে সম্বন্ধে অনেক অনেক ব্যবস্থা দিলেও ১৩২২ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসী পত্রিকার “বিবিধ প্রসঙ্গ” লিখিতে গিয়া সমালোচকের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বর্তমান সময়ে বাঙ্গালা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে তথাবিধ-সমালোচক আছেন কিনা (একমাত্র উক্ত প্রবন্ধ-লেখক ছাড়া), সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অথচ সমালোচনা কার্যটি বাঙ্গালা-সাহিত্যের জন্ম-কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। নবজীবন, নব্যভারত, বঙ্গদর্শন, বাক্য, সাহিত্য প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় যে ভাবে এবং যে ভাষায় কোনও গল্প, নবেল বা প্রবন্ধের সমালোচনা হইত, তাহা মার্জিত রুচি-সম্পন্ন বলিয়াই ধরা হইত। তবে বঙ্কিম বাবু নাকি “কখন কখন সমালোচনা করিতে গিয়া কোন কোন গ্রন্থকার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিতেন যে, তাহাদের পৃষ্ঠদেশ তাঁহাদের বেত্রাঘাতের উপযুক্ত নয়”, (প্রবাসী, ১৩২২, জ্যৈষ্ঠ)।” কখন কখন সমালোচনা করিতে গিয়া কোন কোন গ্রন্থকার—মানে, তিনি প্রায়ই গ্রন্থকারদের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতেন। আবার একটু পরেই তিনি লিখেন,— \* \* \* “কলম ছাড়িয়া চাবুক ধরিলে লোকে হঠাৎ ভাবিতে পারে যে আমাদের রাখালী বা গাড়েয়ানী করাই পেশা।”

স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্রকে রাখাল বা গাড়েয়ান আখ্যা দিয়া প্রবাসী-সম্পাদক যে বাহাদুরী নিরাছেন, তাহাতে তাঁহার সম্পাদকের আসন খানা কতটা নীচে নামিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? আমি প্রত্যেক সাহিত্যিক বিশেষতঃ সমালোচকমাত্রকেই এই প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

‘আর্য্যজীবন’ নামে একখানা মাসিক বাহির হইয়াছিল। তাহাতে কোনও কবি বিক্রমপুরের বর্ষাবর্ণনা দিয়া একটা কবিতা লিখিয়াছিলেন। স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাহার সমালোচনা করেন। নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

কবি—“ডাকে কেড়ালিয়া অহহ অহরে  
মান্দার গাছে।”

সমাজপতি—“আর্য্য-জীবন কবি কি তাহার  
শাখায় নাচে?”

কাহারো কাহারো কানে বেশ মিষ্টি লাগিবে, কিন্তু ইহা কি ভদ্রোচিত হইয়াছিল? অথচ সমাজপতি মহাশয়কে একজন বড় সমালোচক না বলিয়া উপায় কি? একথা মানি যে, কোনও বিষয়ে নিজ মত স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। কিন্তু তাই বলিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি মানীর মান রাখিবেন না, ইহাকে অরাজকতা বই আর কি বলিব! এরূপ সমালোচনা দ্বারা সমালোচকের লুক্কায়িত রূপটি

প্রকাশিত হইয়া পড়ে মাত্র। যুগে যুগে যেমন অবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তেমন সাহিত্য-ক্ষেত্রে বলিয়া নহে, কর্মক্ষেত্রে প্রকৃত কর্মীর আগমন হয়। পরস্তু সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীরও আবির্ভাব সম্ভব হয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে কত সমালোচক কত কত উৎকৃষ্ট বীজ বপন করিয়া ফল ফলাইয়া গিয়াছেন এবং বর্তমানে যাহারা আছেন তাঁহারা ও বাইবেন। কিন্তু অনেক শত্রু আছে, যাহারা সেই ফলবান বৃক্ষ গুলি মূলে ধ্বংস করিতে যত্নবান অর্থাৎ খেলের বা প্রকৃতি।

রাক্স সর্বভূক এবং শণি পরছিদ্রাধেয়ী সর্বনাশ সাধনে তৎপর। রাক্স বলেন—“আর এক রকমের সমালোচনা আছে, যাহাকে পণ্ডিত বলা চলে। এইরূপ সমালোচনার সমালোচক গ্রন্থকারের বানান, ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার প্রচলিত পুস্তক লিখিত নিয়ম অনুযায়ী কিনা, প্রধানতঃ তাহাই দেখেন এবং উহার মিল না থাকিলে গ্রন্থকারকে পাশ না করিয়া ফেল করেন। বানান ভুল, ব্যাকরণের নিয়মভঙ্গ, এই গুলি থাকিলেই কোন গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হয়, এমন কথা কে বলিবে? কিন্তু অন্যদিক বিবেচনা করিবার বিষয়ও কিছু আছে। \* \* \* যদি বানান ব্যাকরণ ছন্দ, অলঙ্কার আদিতে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ না করেন এমন কি যদি সত্য সত্যই ছ’ চারটা ভুলও করেন, তাহা হইলেও শিক্ষক মহাশয়ের ছাত্রদের রচনা যেমন কারিয়া কাটেন, কোন সমালোচক তাহাদের লেখার উপর সেইরূপ পণ্ডিত ফলাইলে বড় অববিবেচনার কাজ হয়, এবং অশোভন হয়। বাঙ্গলা-ভাষা ও সাহিত্যের গতি বিখ্যাত পাঠ্য, ব্যাকরণের লেখকদের দ্বারাও নিয়মিত হইবেনা, এই সব সমালোচকের দ্বারাও নিয়মিত হইবে না; নিয়মিত হইবে শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা দ্বারা। সবদেখে যাহা হইয়াছে, বন্ধেও তাহাই হইবে।” বেশ কথা। সাহিত্যিকগণ এই ঘোষণা পত্র (declaration) পাঠ করিয়া প্রকৃত সমালোচকের

রূপটা চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করুন এবং তার পাশে, Cock Brand letter খানি পড়িয়া, সমালোচকের স্বরূপটা—যার গায় অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুর আঁচ লাগিয়া ফোঁকা পড়ে, রাখুন। অন্ততঃ আষাঢ়ের ‘সৌরভের’ লেখক থাকে, কছে, নিচ্ছে, বলা, করো ইত্যাদিকে যিনি ‘জারজ’, ভাষা বলেন এবং কেহ, কেহ “ধাবনী ভাষা” এবং “পূর্বের বর্বর শব্দ” ইত্যাদি আখ্যা দিয়া ভাষার গৌরব বৃদ্ধি (!) করেন, তাহাদের সম্বন্ধেও আলোচনা করুন যে কোনটা ঘোষণা-পত্রের সঙ্গে মিলে। দেখা বাইতেছে, বর্তমানে সাহিত্যিকদের অবস্থা—“বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা” হইতে বসিয়াছে। কাজেই মা সরস্বতী এখন মর্ত্যধাম ছাড়িয়া স্বর্গে গেলে দোষ দেওয়া যায় না। এবং তিনি হয়তো শণি মণ্ডল হইয়াই বাইবেন। মা সরস্বতীর অন্তর্দ্বানের জন্ত দায়ী লেখকগণ নয়, বতটা তথা কথিত সমালোচকগণ। কারণ সমালোচকগণই একের সহিত অল্পের লেখার তারতম্য করিয়া দোষগুণ দেখাইয়া তাহাদের গন্তব্য পথ নির্দেশ করিয়া দেন। এখন সেই সমালোচকরাই যদি লেখকের কেবলই দোষ খুঁজিয়া বেড়ান এবং মুক্তার মালা গাঁথিয়া নিজের গলায় পরেন তবে তাহারা রোগীকে ঔষধ দেওয়ার পরিবর্তে বিষই দিতেছেন এবং সাহিত্যের সেবা না করিয়াই সাহিত্যকে উদ্ধার করিতে রূথা প্রয়াস পাইতেছেন।

এবার Cock brand letter ঘোষণা করিতেছেন যে ‘খোকা ভগবান’ অবতার রূপে বন্ধে কলম ধরিয়াছেন। সে তো আমরা বহুদিন হয় জানি যে, ভূস্বর্গ ইউরোপ হইতে Journalism শিক্ষা করিয়া তিনি বন্ধে মীন, কুর্শ, বরাহ, নৃসিংহ ইহার কোন একটীর ভায়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আজ দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য যে, যে মাসিকের পাতাগুলি আগজ্ঞানা জানে ফেলিয়া দিতে হইবে বলিয়া সম্পাদক পত্রাঙ্ক না দিয়া perforate, করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, সে পাতাগুলি অলীলভার



বিজ্ঞাপন স্বরূপ উক্ত মাসিকে না দেওয়াই সম্ভব ছিল। মাসিক পত্রিকার প্রচলন হইবার পর হইতে আজ পর্যন্ত কোন সম্পাদক এহেন গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই বা দেখি নাই। সাহিত্যে বর্তমান যুগের মাসিক পত্রিকার প্রবীণ কর্ণধার প্রবাসী-সম্পাদকের মাথায়ও বোধ হয় এরূপ উদ্ভট খেয়াল গজাইয়া উঠিবে না।

মোরগ-মার্কা চিঠির চিত্র সম্বন্ধে ছ'একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না। বাংলার যে সব স্ন-সাহিত্যিকদের চিত্র যে ভাবে মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের সম্মানের লাঘব হইয়াছে কি উক্ত মাসিকের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে বিচার সাহিত্যিকদের কাছে। রুচির পরিচয় মাত্র। “অতিত্যাগি গুণান্ সর্বান স্বভাবো মুর্দ্ধিনববর্ততে।”

বিগত ১৩২৫ সনের পৌষ মাসের প্রবাসী পত্রিকা হইতে কাজী আব্দুল ওহুদ সাহেবের কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করিতেছি। কাজী সাহেব একজন নিপুণ শিল্পী। সাহিত্যিক মাত্রই কথাগুলি জানেন।— “সে কথাটা এই যে সাহিত্যে এরূপ গালাগালি করা ভাল কাজ নয়। ইহাতে মাত্ৰে মাত্ৰে একটা দৃঢ় ব্যবধান রচনা করা হয় এবং এরূপ নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে নিজের শক্তিরও যথেষ্ট অপব্যয় হয়। \* \* \* \* \* মাত্ৰে মাত্ৰে বাহা অনন্তের আভাস, বাহিরের প্রতিকূল অবস্থার পীড়নে অনেক সময় তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে না; কিন্তু প্রকাশ হইতে না পারিলেও তাহার বেদনা মাত্ৰে মনে থাকিয়াই যায়। \* \* \* \* \* আর এরূপ গালাগালি, কুৎসা, নিন্দা প্রভৃতি ছোট কাজ, কবির পক্ষে বাস্তবিকই শোভা পায় না। বিশ্বজোড়া মিলনের জয়গান গাওয়াই তাহাদের ধর্ম্ম। তাই তাহারাই যখন কোনরূপ পক্ষপাত করিয়া বিরোধের সৃষ্টি করেন, তখন তাহাদের সেই সংকীর্ণতা পাঠকের প্রাণে বড়ই বাজে।” যদি ওহুদ সাহেবের

উক্তি বাস্তব সত্য হয় (আমি স্বীকার করি), তবে জানিয়া শুনিয়া লেখাপড়া জানা ব্যক্তিরা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া গালাগালি, কুৎসা, নিন্দা প্রচার করিয়া, ভদ্রলোককে নাচনেওয়ালী শাজাহিয়া বাহবা নিতেছেন অথবা “আধো আধো ভাবী বাঙ্গালী উকি মারিতেছে” লিখিয়া নিজকে ইহুদী-বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তাহার একজন পরমাত্মীয় “আস্তানানারিভো হইতে তাহাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন—“হোং ফিন তিদ্কা ছয়োস্তুপে বা রবীন্দ্রনাথ, কিউটাপাক্স লোহাম।’ পোপোকেটা-পাটল হইতে—কপট সাম লোন্টিফিস্ প্রশাণ্ট অপূর্ব্ প্রমথ ষ্টুবেলানডিফিক্স। ডিনেশা বুডু অচিণ্ট পুদ পাঙ্কের ?” ইত্যাদি। পাঠক-পাঠিকা, ভাষা পড়িয়া বুঝিতে পারিলেন শনিবারের চিঠির “চিপোর্টু” লেখক কোন বংশধর? তবে তিনি যে বাংলার মানুষ নহেন ইহা নিশ্চিত।

সমাজ ও সাহিত্য লইয়া যে কথা উঠিয়াছে, তাহাতে তিনটা মতই দেগিতে পাইতেছি। (১) সাহিত্যের জন্ত সমাজ, (২) সমাজের জন্ত সাহিত্য এবং (৩) “উভয় পক্ষই ভুল করেন। \* \* \* \* \* সমাজ বিদ্রোহ বা সমাজ সমর্থন কোনটাই সাহিত্যের কাজ নয়। \* \* \* \* \* রুচি যদি অতিমাত্রায় দুর্বল ও সৌখীন হয়, তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রেই এ অপবাদের জন্ত লেখক দায়ী নহেন। কারণ, এটাও মনে রাখিতে হইবে যে, বস্তু ও বর্ণনা অঙ্গীল হইলে রচনা অঙ্গীল হয় না” (শনিবারের চিঠি)। অত্ৰ ১৩২৫ সনের কার্তিক মাসের প্রবাসী পত্রিকায় নরেশ সেন মহাশয় লিখেন—“সত্য যে ভাবে অনুভব করুক না কেন, ঠিক সেই ভাবেই তাহাকে জগতে উপস্থিত করিতে হইবে—সাহিত্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার এই এক হুত্র ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই। নূতন কোনও কথা যদি তোমার মনের কণ্ঠিপাথরে যাচাই হইয়া সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে তাহা

জগতের কাছে যত আশ্চর্য্য বা যত অকৃতিকর ইউক না কেন, তাহা তুমি জগতে প্রচার করিতে বাধ্য।” সমাজের সহিত যদি সাহিত্যের কোন সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী-ভাবে না থাকে, এবং রুচি যদি অতিমাত্রায় হ্রাস ও সৌখীন হওয়ায় লেখক অপবাদে জন্ম দায়ী না থাকেন, পরস্তু বস্তু ও বর্ণনা অঙ্গীল হইলেও রচনা অঙ্গীল যদি নাই হয়, তবে নরেশ সেন মহাশয়ের সঙ্গে মতের অনৈক্য কোথায়? এবার হইতে শনিবারের চিঠির আবশ্যকতা আছে কিনা, সে বিচারের ভার পাঠক-পাঠিকার উপরই রহিল। মণিমুক্তার থলিয়াট

ও তো অতলে ডুবিয়া গেল (পত্রাক নাই ইত্যর্থ)। ডুবুরিবা এবার নিরাকারের উপাসনা করিবে।

\* \* \* \* \*

সম্পাদক মহোদয়গণকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া ‘ধূপছায়া’, ‘গল্পলহরী’, এবং “অর্চনা” মাসিক পত্রিকার প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি

বী: সঃ।

## নিশীথের আলে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

( ১৯ )

গ্রামের সীমা পার: হইয়া শরৎ ও মণীশ উভয়ে মাঠে আসিয়া পড়িলেন।

যতদূর দৃষ্টি চলে—ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র সুনীল বর্ণ ধান গাছে ভরিয়া গিয়াছে, ইহারই যাকথান দিয়া গ্রামান্তরে যাইবার অপরিষর পথটী; চলিতে গেলে হই পার্শ্বের ধান গাছ হইয়া গায়ের উপর আসিয়া পড়ে।

হৈমন্তিক ধান পাকিয়া উঠিয়া সমস্ত মাঠ আলো করিয়া আছে। বাতাস বহুদূর হইতে বহিয়া আসিয়া ধান গাছের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। স্থির নদীকে তুফান আসিলে নদীজল যেমন তরঙ্গায়িত উচ্ছলিত হইয়া উঠে, বাতাস লাগিয়া ধান গাছগুলিও তেমনই বিক্ষোভিত হইয়া উঠিতেছিল। সে এক অভিনব দৃশ্য। সূর্য্য তখন পশ্চিমে ছেলিয়া পড়িয়াছে, শেষ বেলায় লাল আলোচুই বাহা কিছু হুঘন

করিতেছে তাহাই বড় রমণীয় হইয়া উঠিতেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় ধান গাছের পর ধান গাছ চলিতেছে, বাতাসে দোলা খাইতেছে। দূরে কোথায় একটা পক্ষী দিবা-শেষের বিদায়গীতি গাহিতেছে।

নীলাকাশের তলে সবুজের বাহার নীলাকাশের তল দিয়া সবুজ ক্ষেত্রের উপর দিয়া পাখীগুলি দল বাধিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। শরৎ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার আকাশের পানে একবার নীচের পানে চাহিলেন তাহার পর অগ্রসর হইলেন।

“বল দেখি মণীশ, সহর দেগতে ভাল না গ্রাম দেখিতে ভাল?”

হঠাৎ এই প্রশ্নে মণীশ একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল, বলিল, “আমার তো গ্রামই ভাল মনে হয়, তবে বর্ষাকালে নয়।”

শরৎ ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, “বর্ষাকালে বড় জঙ্গল

হয়, ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয় সেই জন্তে বর্ষাকাল ভাল বোধ হয় না, কেমন ? কিন্তু সে হয় কাদের জন্তে কাদের দোষে তাই বল দেখি মণীশ, সেটা কোনদিন ভেবেছ কি ? মণীশ চুপ করিয়া রাহল।

শরৎ বলিলেন, সেটা হয় আমাদের—তথা কথিত বড়লোকদের দোষে। অন্ততঃ পক্ষে পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের দেশের অবস্থা যে এখনকার চেয়ে অনেক উন্নত ছিল, এখনকার তুলনায় গ্রাম স্বর্গ ছিল তা আমরা বেশ জানতে পারি। আমাদের ঠাকুরদারা যখন বর্তমান ছিলেন তখন দেশে রেলওয়ে হয়নি, জল নিকাশের পথ বন্ধ হয়নি,—তখন এত খানা ভোবা থাকলেও জল পচতে পারত না, জঙ্গলে দেশ ভরে উঠত না। বাস্তবিক সেদিন আমি ভাবছিলাম আমাদের দেশে কেন এত ব্যারাম হয়, কেন আমাদের দেশের লোক এমন করে মরে—কিন্তু এর উত্তর পাওয়াতো খুবই সোজা, মোটেই ভাববার দরকার হয় না। আমাদের জমির ‘পরে আমরাই রেলপথে তৈরী করতে দিয়েছি, নিজেরা দেশ ছেড়ে সহরবাসি হয়েছি, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই চলে! দেশ যে ঋণান হয়ে যাচ্ছে, এর জন্তে দোষ আমরাই, আর কেউ নয়।

বিশাল ধাতুক্ষেত্রে পায় হইয়া তাহার পর ক্ষুদ্র হুরপুর গ্রাম। অধিবাসীরা অধিকাংশ মুসলমান, হিন্দু যে করজন থাকে তাহারা একটা পাড়ায় বাস করে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বড় সুন্দর, পরস্পর পরস্পরের সহিত যে কোন সম্পর্কে আবদ্ধ।

দূর হইতে বৃক্ষশ্রেণী সুশোভিত ক্ষুদ্র গ্রামখানি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। কত বৎসর পূর্বে হইতে কৃষকেরা এইস্থানে এইক্ষুদ্র পল্লীটি স্থাপন করিয়া বাস করিতেছে তাহা কে জানে। ইহারা এখানে মনের শান্তিতে দিন কাটার কারণ ঐশ্বৰ্য্যের আড়ম্বর তাহাদের নাই। আধুনিক সভ্যতার ধার তাহারা ধারে না। একজনের বিপদ হইলে হিন্দু মুসলমান সকলেই নিজেদের বিপদ জ্ঞান করিত। কাহারও

। হইলে জাতি ধর্ম না মানিয়া তাহার সেবা করিত। একতা স্বত্রে এই গ্রামবাসী গ্রথিত তাই ইহাদের মধ্যে শান্তির অভাব ছিল না; আনন্দের অভাব ছিল না।

বর্ষার সে ঘন জঙ্গল বর্ষাশেষে উৎপাটিত হইয়াছে। জলপূর্ণ খানা ডোবায় অসংখ্য শ্বেতবর্ণের লিলিফুল ফুটিয়াছে; কলমী লতা জলের মধ্যে থাকিয়া মাথা তুলিয়াছে, নীল বর্ণের ফুল ফুটিয়া বাতাসে দোলা খাইতেছে। গৃহস্থের বাড়ীগুলি ঝকঝকে পরিষ্কার, প্রাঙ্গনগুলি গোময়লিপ্ত; প্রত্যেক প্রাঙ্গনে একটা ছইটা করিয়া ধানের গোলা, তাহার কপাটে শিমুর ও আলিপনা চিত্রিত। কৃষকগণের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পথে খেলিয়া বেড়াইতেছে, গৃহিনীরা গৃহকর্মে ব্যস্ত। পুরুষেরা দু পাঁচজন মিলিয়া কোথাও গল্প করিতেছে, কোথাও বা ছ’চারজন বসিয়া চোটেই, মাছর বুনিতেছে।

শান্ত এই পল্লীবক্ষে দাঁড়াইয়া শরতের চকুও প্রাণ জুড়াইয়া গেল। একদিন বাংলার সব পল্লীগুলি এই রূপেই ছিল, আজ সেদিন অতীতে মিশিয়া গিয়াছে। একদিন বাংলার হিন্দু মুসলমান পরস্পরের বিপদ-ব্যথা নিজেদের বলিয়া মনে করিত, আজকার মত পাশাপাশি বাস করিয়া পরস্পর পরস্পরের বুকের শোণিত লইবার জন্ত উদগ্রীব হইয়া থাকিত না। পর-জাতি হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, মাতৃতুল্য জ্ঞান করিত, নারীর সম্মান রাখিতে ছোট বড় সকলেই প্রাণ দিতে পারিত আজ সে দিন নাই। দারুণ হিংসারূপ্তি মানবের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে, মানুষ এখন সবই করিতে পারে।

ইহারাই ছোটলোক, ভদ্রলোকেরা ইহাদের স্বণা করেন। তাঁহারা ভাবেন না এই সব নিরক্ষর ছোট লোকদের মধ্যে যা আছে, তাঁহারা শিক্ষিত ভদ্রলোক হইলেও তাহাদের মধ্যে তাহা নাই। তাঁহারা যাহা বলেন, করেন তাহা মুখস্ত মাত্র। ইহারা যাহা করে বা বলে তাহা আন্তরিক। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা আসে

নাই বলিয়াই ইহারা ছলনা শিখে নাই, মনের মধ্যে এক ভাব রাখিয়া মুখে এক কথা বলিতে শিক্ষা করে নাই।

জমিদারকে দেখিয়া গ্রামবাসিগণ সম্মুখ হইয়া উঠিল, যে যাহা করিতেছিল সব ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। প্রবীন রতন মণ্ডল এবং ইসমাইল খাঁ অগ্রসর হইল।

একটু হাসিয়া শরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি রকম, গাঁয়ের সব ভাল তো? পুকুর কাটা আরম্ভ হয়ে গেছে কি?”

ইসমাইল খাঁ সেলাম করিয়া বলিল, “এখনও আরম্ভ হয়নি হজুর, সোমবার নাকি দিন ভাল আছে, মোড়লের কথা মত আমরা ওইদিন হাতে পুকুর কাটাৰ ঠিক করেছি।”

উৎফুল্ল মুখে শরৎ বলিলেন, “বেশ বেশ মোড়ল, খরচের জন্তে ভাবতে হবে না,—তুমি আর খাঁ সাহেব থেকে সকলকে খাটিয়ে নেবে। তোমাদের ছেলে পুত্রের মাঠের কাজ করবে, তোমরা শুধু পুকুর কাটানোর দিকে থাকবে। আমি মাস খানেক বাদেই আবার আসব—দেখে যাব কি রকম হয়।”

রতন মণ্ডল একটু থামিয়া বলিল, “খরচ পত্র হজুর ম্যানেজার বাবুর হাতে”—

“ক্ষেপেছ তুমি মোড়ল, ম্যানেজার বাবুর হাতে দেব, কেন,—তোমাদের হাতে দিলে তোমরা কি খেয়ে ফেলবে? এতটা অবিশ্বাস আমি রাখিনি মোড়ল, তা হলে আমার মোটে কাজ চালাতে হতো না। এই নাও, শ’ খানেক টাকা নিয়ে এসেছি, আমি না হয় দশ দিন পরে আবার আসব, দেখে শুনে যাব।”

পকেট হইতে দশ টাকার দশ খানি নোট বাহর করিয়া তিনি রতনের হাতে দিলেন।

রতন সে টাকা ইসমাইল খাঁর হাতে দিয়া বলিল, “খাঁ সাহেবের হাতে থাক হজুর,—উনি খুব ভাল হিসেব রাখতে পারেন।—”

শরৎ বলিলেন, “বেশ তো, খাঁ সাহেবের হাতেই থাক, কিন্তু তোমরা হজরনে থেকে সব কাজ করো কেউ যেন ছেড়ে দিয়ো না। মনে রেখো তোমাদেরই জন্তে পুকুরটা হচ্ছে, যেন ছেড়ে দিয়ো না।”

খাঁ সাহেব একটু হাসিয়া বলিল, “তাকি আর একবার করে বলতে হজুর, আপনি আমাদেরই জন্তে নিজের পয়সা খরচ করছেন, আমরা ছেড়ে দেব, এ কখনও হতে পারে?”

সব বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া শরৎ বিদায় লইলেন, ইসমাইল খাঁ বলিল, “সন্ধ্যা হয়ে এলো হজুর, এ সময় মাঠের রাত্তায় যাবেন না, রেলের রাত্তা দিয়ে যান। আমার ছেলে একটা আলো নিয়ে যাচ্ছে আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে এখন।”

শরৎ একটু হাসিয়া বলিলেন, “কিছু দরকার নেই খাঁ সাহেব, আমরা হুজর আছি, জ্যোৎস্না রাত্র আছে, বেশ চলে যেতে পারব এখন। এই তো রেল লাইন, গাঁ ছাড়িয়ে সামনেই পড়বে এখন।”

তথাপি ক্লবকগণ সঙ্গে চলিল, জমিদারকে লাইন পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া তাহারা ফিরিলে।

শরৎ পিছন ফিরিয়া বলিলেন, “আর আসতে হবে না মোড়ল, তোমরা ফিরে যাও, এই তো সামনেই লাইন পড়েছে, জ্যোৎস্না উঠছে, আমরা বেশ যেতে পারব।”

কেহ সেলাম, কেহ প্রণাম দিয়া বিদায় লইল।—সম্মুখে রেল লাইন, চক্ষুরালোকে ঝিকঝিক করিতেছে। রেল লাইনের উপর দাঁড়াইয়া শরৎ একবার পিছনের পানে ফিরিয়া চাহিলেন।

এ যেন রূপ-কথার একখানি ছবি মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। চক্ষুরালোক নিস্তর পল্লীখানার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—গাছ লতা পাতা, কুটীর সব যেন হাসিতেছে।—

পার্শ্বে ধু-ধু করিতেছে মাঠ, আর এক পার্শ্বে নীবিড় ধাত্ত ক্ষেত্র। খাল বিলের জলের উপর, চাঁদের আলো পড়িয়া ঝিকঝিক করিতেছে।

গভীর স্বরে শরৎ ডাকিলেন, “মনীশ,—”

মনীশও স্তব্ধ ভাবে ব্যগ্র চোখে প্রকৃতির এই অপরিমিত রূপরাশি দেখিতেছিল। তাহার ভাগ্যে এমন দৃশ্য দেখা কখনও জুটিয়া উঠে নাই, আজ এই প্রথম তাহার এমন স্থানে পদার্পণ করা।—

“কেমন দেখলে মনীশ?”

মনীশ উত্তর দিল “চমৎকার।”

শরৎ চলিতে চলিতে বলিলেন, “ডি, এল, রায় একখানা গানে লিখে গেছেন—

‘এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে,’ অনেক গানটা গেয়ে থাকে,—মুখস্ত বলে যায় মাত্র, অন্তরের মধ্যে কেউ কি ধারণা করেছে ধানের উপর ঢেউ খেলিলে বাতাস কেমন করে বয়ে

যায়? চাঁদের আলোর গান অনেকেই করেছে, তারা কি জানতে পারে সীমার বাইরে আসীমের সৌন্দর্য্য কতখানি? অনেকে আকাশকে জন্মাবধি সীমাবদ্ধ দেখে আসছে, তারা কখনও বাইরে অসীম আকাশ দেখতে পারনি, কাজেই অসীমের ধারণা তারা কোনদিন করতে পারেনি।”

একটু খামিয়া নিজেই আসিয়া উঠিয়া বলিলেন, “তাদের কথাই বা বলি কেন, আমি নিজেও ঠিক এমনি আনাড়ি ছিলাম। সৌন্দর্য্য চের দেখেছি মনীশ, এমনি জ্যোৎস্না রাত্রে এমন জারগার দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে এমন সৌন্দর্য্য জীবনে কখনও দেখিনি।”

ক্রমশঃ—

## নিবেদন

আগামী আশ্বিনে ‘বীণা’ ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ করিবে। এই বৎসর বীণার সংখ্যাগুলি নিয়মিত সময়ে বাহির হইতে পারে নাই। আগামী বর্ষে যাহাতে এবাধিধ ক্রটি না ঘটে এবং ঠিক সময়ে বীণা বাহির হইতে পারে সে জন্ত বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছে।

বীণার গ্রাহক ও অগ্রগ্রাহক বর্গের ঐকান্তিক অহুরোধে আমরা বীণার আকার ও আরতন বজার রাখিয়া মূল্য সাড়ে তিন টাকার স্থলে **আড়াই টাকা ধার্য্য করিলাম।**

যথাসম্ভব সমস্ত দিক দিয়া পত্রিকার উন্নতির জন্ত চেষ্টা করিতেছি ও করিব। প্রচারাদিক্য হেতু বৃষ্টিতে পারিতেছি যে অল্প দিনের মধ্যেই বীণা বিতরজন-সমাজে পরিচিত হইয়া আদর পাইতেছে। বোধ হয় এত অল্প মূল্যে এত বড় সচিত্র মাসিক পত্রিকা বাংলা দেশে আর নাই বলিলেই চলে।

বঙ্গের প্রতিভাবান লেখকগণ বীণার স্বার্থকতা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্ত অগ্রগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের রচনাদি পাঠাইতেছেন। আগামী বর্ষে আরও নূতনত্ব এবং বৈশিষ্ট্য থাকিবে।



## —বীণা—

৩য় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা।

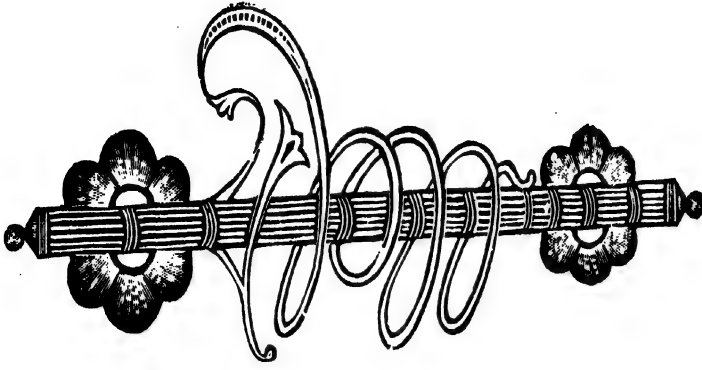


### স্বর্গগত গিরিজাকান্ত ঘোষ।

জন্ম—১২৯০ সনের ১৮ই পৌষ, মঙ্গলবার।

মৃত্যু ১৩৩১ সনের ১৯শে আশ্বিন, রবিবার।

৬গিরিজাকান্তের লিখিত বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থকেই “ঢাকা রিভিউ”, “প্রতিভা” প্রভৃতি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-সমাজে পঠিত এবং মাসিকপত্রে প্রকাশিত প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক গ্রন্থকেই ৬গিরিজাকান্ত পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিকদিগকে বহু অজ্ঞাত বিষয় জানিতে দিয়াছেন, এবং পূর্ববঙ্গের লুপ্ত-গৌরবের পুনরুদ্ধার করিয়া গিয়াছেন।



তৃতীয় বর্ষ]

ভাদ্র, ১৩৩৫

[ ১২শ সংখ্যা

## বর্ষ বিদায়

শ্রীভুবনমোহন চক্রবর্তী, বি-এ

আজি বর্ষশেষে !

পুরাতনে দেও গো বিদায় !

যেই বর্ষ মাঝে হাসি কান্না, স্মৃথ দুঃখ লভি,  
রহিয়াছ কত ভাবে, কত ছন্দে এই ধরা 'পরে,

সে আজি মাগিছে বিদায় !

নবীন এসেছে আজি দ্বারে—

বরিয়া লও সবে তা'রে,—

ছাড় পুরাতনে, ধর নব কায় !

সে নবীন

পুরাতনে কহিছে ডাকিয়া,—

“ছাড় দ্বার । ওগো পুরাতন !

আমাকেও যেতে হবে বর্ষশেষে

তোমারি মতন, এমনই বিবাদ মুখে ।

তুমিও যে আমারি মতন

বরষের প্রথম প্রভাতে,

উষার অরুণালোকে



বিস্মিত জগতের পুষ্প অর্ঘ্য লাভ  
কাটায়েছ মহানন্দে এই ধরা'পরে সেই একদিন।  
তবে কেন ছাড়িয়া যাইতে এই ধরা,  
ধরনীর শাস্ত শ্যামতল,

হৃদয়ে বেদনা তব বাজে ?  
মোরোও লভিতে দাও সেই পূর্ণ সুখ।  
পূর্ণানন্দ লভিয়া ধরায়, দুঃখ ভারসহি নিশিদিন!  
শান্তিহীন অবিরাম সময়ের স্রোতে  
চালিয়া দিতে যে হবে সব আশা সকল সম্পদ !

তুমি যবে ধরা'পরে প্রথম আসনখানি তব  
পাতিয়া লইলে ধীরে ধীরে, তখনও যে  
দুঃখ ভারে নত স করুণ দুটি ঝাঁখি  
সকাতরে বার বার চাহিয়াছে এই ধরাপানে ;  
ফিরে কি তাকায়েছ কভু তাহাদের পানে ?  
আজি তারা অনন্তুর কালস্রোতে  
গিয়াছে মিশিয়া !

সবারই যে যেতে হবে সেথা  
তবে কেন ব্যথা ?

✽

হে বন্ধু !  
বরষ মাগিছে বিদায় !  
যতনে সেবিলে যারে দীর্ঘ দিন যাপি,

রৌদ্র তপ্ত ধরা'পরে যাহারে বরিলে সবে

নবীন আলোকে !

বিহগের আকুলিত আনন্দ কুজনে,  
শিখীর আনন্দ নৃত্যে,

অর্দ্ধ-সিক্তাধরণীর পুষ্প অর্ঘ্য ভারে  
নবীন অতিথি জ্ঞানে যাহারে পূজিলে সবে

বরষের প্রথম প্রভাতে,-

সে আজি মাগিছে বিদায় !

জনে জনে অর্পিয়াছি সুখ দুঃখ ভার ; —

সে নহে নহে গো সখা কীর্তি আমার !

আমার এ ক্ষুদ্র বক্ষা'পরে,

বিধাতার অপূর্ব কীর্তি,—

আমি শুধু লক্ষ্য মাত্র তার !

আজি তাই ছাড়ি যেতে শ্যামধরাখানি

পরাণে জাগিছে ব্যথা। হৃদয়ের পরতে পরতে  
রহে শুধু বেদনার ভার।

কিন্তু তবু ছেড়ে যেতে হবে এই শ্যামধরাখানি,

শেফালি বকুল আজি মোর তরে পড়িবে না লুটি

ক্ষুদ্র মম জীবনের আজই হবে শেষ

তাই ধীরে সবা'কারে নমি,

চিরতরে লইলাম ছুটি।





## নিশীথের আলো

### শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২০)

ধীর পদে শরৎ অগ্রসর হইলেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মনীশ চলিতেছিল।

শরৎ বলিলেন, “আচ্ছা, ভাব দেখি মনীশ, এমন সময়ে একটা ভীষণ কাণ্ড হয় আকাশ নিবিড় মেঘে ছেয়ে আসে, ঝড় এসে সব ছারখার করে, বজ্রাধাতে সব পুড়ে যায়, সেটা কি রকম দেখতে হবে? এমন সুন্দর প্রকৃতি, এত সৌন্দর্য আর নিমেষে সে দেখতে কদর্য হয়ে যাবে—”

মনীশ বলিল, “সে কল্লনাও অদৃশ্য মনে হয় শরৎ বাবু।”

কোমল সুরে শরৎ বলিলেন, “কিন্তু এমন মানুষও চের থাকে মনীশ, যারা সৌন্দর্য দেখতে পারে না; জগতে যা কিছু ভাল তা তারা সবই বর্জন করে চলে, কদর্যতাটাই মনে প্রাণে উপভোগ করতে চায়।”

মনীশ বিস্ময়ে বলিল, “এমন মানুষও আছে?”

চলিতে চলিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া ফিরিয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া শরৎ বলিলেন, “আছে বই কি? আমি যদি বলি সে রকম মানুষ তুমি,—সেটা কি বড় আশ্চর্য্যকর মনে হবে, মনীশ?”

“আমি—” বজ্রাহতের স্থায় মনীশ থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখের ভাব নিমেষে পরিবর্তিত হইয়া গেল, চাঁদের আলোকে স্পষ্ট তাহা বুঝা গেল না।

শরৎ তাহার স্বন্ধের উপর হাতপানা রাখিলেন, —“হ্যা তুমি, শুধু তুমিই নও,—আরও কতকগুলি অপরিণত বুদ্ধি, তরুণও এ দলে আছে। আমি সব জানি মনীশ, এক অচিস্তিত উপায়ে তোমাদের দলের সব কথাই আমি জানিতে পেরেছি।”

অতি কষ্টে কষ্টে সুর ফুটাইয়া মনীশ খীণ ভাবে বলিল, “কি জানতে পেরেছেন?”

শরতে চক্ষু দুটি নিমেষে দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিল, তখনই শাস্ত হইয়া গেল; তিনি বলিলেন, “আমি জানতে পেরেছি তোমরা তরুণ-সঙ্গ নামে একটা দল গড়ে তুলেছে, এ দলের লক্ষ্য দেশ সেবা নয়, দেশ উদ্ধার করা। কিন্তু আমি বলি মনীশ উদ্ধার করবে কাকে,—এই দেশকে? যারা নিজেরা হাজার সংস্কারের বেড়া জালে পড়ে রয়েছে, তারা কি অপরকে উদ্ধার করতে পারে? দেশের বৃক অভাব অনাটন, নিত্য হাহাকার,—এ ভ্রংশ আগে দূর কর, ভেতরের পানে দৃষ্টি কর, শুধু বাইরের পানে চেয়ে ছুটলেই তো চলবে না, ভাই। তোমরা তরুণ, তোমাদের মধ্যে আশা আছে, উৎসাহ আছে, সাহস আছে, শক্তি আছে, তোমরা দেশকে আগে বাঁচাও, তারপর একে উদ্ধার করবার চেষ্টা কোরো। যে মরতে বসেছে,—আগে তার দাহের বন্দোবস্ত না করে—যাতে সে শাস্তিতে মরতে পায় তাই করা উচিত।

রোগ হলে চিকিৎসা করানোর চেয়ে রোগ যাতে না হয় তার চেষ্টা করা উচিত। একবার সন্তানের চোখ নিয়ে মায়ের পানে চাও দেখি—দেখ মায়ের প্রকৃত ব্যথা কোথায়, তারপর ব্যবস্থা কর।”

একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, “আমি সব জানি মনীশ রাজজ্যোহী গোপাল মিত্র তোমার সঙ্গে মিশেছে। একদিন সে আমারও বন্ধু ছিল, আমাকেও দলে টানবার চেষ্টা করেছিল। সে আমার চোখ ফুটিয়ে দেছে এজন্তে তাকে আমি প্রণাম করতে পারি, কিন্তু সে যে পথ সোজা বলে আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, যা সব কথা বলেছিল তার জন্তে তাকে আমি ঘৃণা করি। মনীশ, রক্ত দিয়ে কখনও মায়ের পূজা হয় না, রাগসীর তৃপ্তি হয় মাত্র। আমাদের দেশ মাতৃকা যে দেবী, তিনি তো রক্ত চান না মনীশ, তবে মায়ের চরণে তোমরা বলিদান দেবার আয়োজন করেছ কেন বল দেখি?”

মনীশ শিহরীয়া উঠিল, চোখ সম্মুখের দিকে ফেলিতেই শরতের চোখের পরে তাহার চোখ পড়িল, শিহরীয়া সে চোখ ফিরাইল।

আবার চলিতে চলিতে শরৎ বলিলেন, “তোমরা যে পথ বয়ে চলেছ, ভারতের মহাপুরুষ সে পথ তো দেখাননি মনীশ, তিনি অহিংসা অসহযোগের পথ বলে দিয়েছেন, হিংসানীতি বর্জন করবার উপদেশ দিয়েছেন। রাজার সঙ্গে বিবাদ করে কতক্ষণ টেকতে পারা যায়, কারণ তোমার যে এতটুকু শক্তি নেই। নিজের জিনিস পরে নিয়ে যাচ্ছে, তোমার বাণিজ্য ব্যবসা সব বিদেশীরা একেচেটিয়া করেছে, অবশেষে তোমার জমীজমা পর্যন্ত তারা দখল করছে, তুমি ওই একদিক লক্ষ্য রেখে ছুটেছ। উদরে অন্ন নেই,—দেশের মাঠ অন্সর; দলে দলে আফগানিস্থানের লোক এসে চাষাদের পাঁচ টাকা ধার দিয়ে দশ আনা সুদ আদায় করছে। জমীদারের পীড়নে দরিদ্র চাষা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে,—এর পরে আছে ম্যালেরিয়া-নানা রকম

ব্যারাম। ভুল পথে বেয়ে চলেছ মনীশ, রক্তের ছবি মুছে ফেল, দেশের অবস্থা ফিরাবার চেষ্টা কর, যাতে ব্যারাম দূর হয়, বাংলার চাষা আবার মামুষ হয় তাই কর।”

অদূরে ট্রেনের শব্দ শুনা যাইতে ছিল, শরৎ বলিলেন, “লাইন ছেড়ে নেমে এসো, ট্রেন আসছে।”

হস হস করিয়া ট্রেন আসিয়া পড়িল, আবার তেমনি ভাবে চলিয়া গেল।

শরৎ এক দৃষ্টে ট্রেনের পানে তাকাইয়া রহিলেন, ট্রেন থানা বখন মিলাইয়া গেল তখন একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনীশের পানে তাকাইয়া তিনি ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, “এই রকম—এক থানা ট্রেন যদি কেউ ডিন-মাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তাকে কি বলা যায় বল দেখি মনীশ? একজনের ‘পরে তোমাদের আক্রোশ, তার জন্তে শত শত নির্দোষী প্রাণিকে তোমরা হত্যা করবে মনীশ? বল দেখি, এক থানা ট্রেনে কত নারী কত শিশু রয়েছে, একজনের পাপে এরা সবাই মরবে মনীশ? এতগুলি প্রাণিকে জগৎ হতে বিদায় দিতে তোমাদের প্রাণে কি এতটুকু ব্যথা বাজবে না?”

মনীশ খানিক মূরের মত তাকাইয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ শরতের হাত ছ’খানা চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “আমায় মাপ করুন শরৎ বাবু, আমি বুঝতে পারি নি—”

শরৎ মুহূর্ত্তে বলিলেন, “তা আমি জানি মনীশ, আমি জানি তোমরা কেউই ব্যাপারটা বুঝতে পারনি, কেবল ঝোঁকের বশেই চলেছ। তোমরা তরুণ—দেশ তোমাদের কাছে অনেক পাওয়ার প্রত্যাশা করে, সে পাওয়া তো এরকমে নয়। সন্তানের উপযুক্ত কাজ কর, স্বৈচ্ছায় নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে না। তোমরা বাঁচলে কত কাজ হবে, কিন্তু বাঁচার পথ তো তোমরা রাখছ না ভাই। স্বৈচ্ছায় মরণের কোলে ঝুঁকে পড়ছো, ভবিষ্যতের পানে চাও নি, বর্তমান নিয়ে থাকতে চাও। এই স্থল

একে এমন করে কদর্য্যতায় ভরিয়ে তুলো না, স্বন্দরকে আরও স্বন্দর—আরও রমণীয় করে তোলো।”

মনীশের ছুই চোখ ভরিয়া অনেকখানি জল আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—সে মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল।

উভয়ে তখন গ্রামের প্রান্ত সীমায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন।

শরৎ বলিলেন, “আমাদের ওসব কথাই এই পানেই শেষ হয়ে যাক মনীশ। তোমায় শেষবার বারণ করে দিচ্ছি,—তুমি গোপাল মিত্রের সঙ্গে ছেড়ে দাও—সে তোমার উন্নতির নামে অধঃপতনের পথে নিয়ে যাচ্ছে, দেশ সেবার নামে দেশোদ্ভোহী করে তুলছে। তোমরা যা করছ এর নাম দেশোদ্ভোহীতা,—এর ফলে দেশকে আরও বিপদগ্রস্ত হতে হবে, আরও কতকগুলি নির্দোষী লোক পর্য্যন্ত জড়িয়ে পড়বে, দণ্ডভোগ করবে।”

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনীশ বলিল, “অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলুম শরৎ বাবু, এবার যাতে ফিরতে পারি তারই চেষ্টা করব।”

গুরুর একাদশীর চাঁদখানা তখন আকাশের গায়ে দোলা খাইতে খাইতে অনেকদূর উঠিয়া পড়িয়াছে। পার্শ্বের একটা বাড়ীতে হাংশোনিয়ামের সঙ্গে গলা মিলাইয়া কে গাহিতেছিল—

আজ গুরুর একাদশী, হের নিদ্রাহারা শশী,

ওই স্বপন পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি।

নিম্নরূপে চলিতে চলিতে শরৎ হঠাৎ কথা কহিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরে মনীশ চমকাইয়া উঠিল।

“হ্যাঁ,—আমি তাদের বড় ঘৃণা করি যারা দেশ সেবার নামে দেশের ক্ষতি করে, মাথার বোঝা নামাবার নাম করে আরও বোঝা চাপিয়ে দেয়, একজনের পাশে সহস্রজনকে পীড়ন করে। আগে নিজেরা মানুষ হও, তারপর দেশোদ্ধারের চেষ্টা কর। যাদের দাঁড়াতে গেলে পা কাঁপে, চলতে গিয়ে যারা আছাড় খায়, যারা অন্ধকারে একলা বার হতে পারে

না, তারা চায় এমনি করে দেশোদ্ধার করতে,—পাংগলের পাংগলামী, ছেলেখেলা মাত্র।”

পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন মনীশ সরিয়া গিয়াছে।

২১

গ্রামের বৃকে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি ভূমিতে পাইল মাণিক এজগতে নাই।

প্রগতি আড়ষ্ট হইয়া গেল।

ইহাও কি সম্ভব হইতে পারে—যে ছেলেটিকে সে এত যত্ন করিয়া বাঁচাইল, সে আজ এমন করিয়া লাজিত হইয়া আসিয়াছে।

বেশী দিনের কথা তো নয়, এই তো মাসখানেক আগে প্রগতি তাকে স্বস্থ দৃষ্টপুটে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছে। যখন সে গাড়ীতে উঠিতেছিল, কানিয়া বালক তাহার পানে চাহিয়াছিল, কেবলমাত্র একটা শব্দে তাহার আত্মকণ্ঠ চিরিয়া বাহির হইয়াছিল, “মা”

সমস্ত পথ এই “মা” শব্দটা প্রগতিককে অনুসরণ করিয়া গিয়াছিল, কলিকাতায় গিয়াও সকল কাজের মাঝে আনন্দের মাঝে তাহার কানে সেই মা শব্দটা ভানিয়া আদিয়াছে, প্রগতি অশ্রুমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। মামার বাড়ীতে লাজনার ভয়ে সে মাণিককে লইয়া যাইতে পারে নাই; নহিলে সে লইয়া যাইত।

সেই কণ্ঠস্বর আজও প্রগতির বৃকের মধ্যে বাজিতেছিল। পথে আসিতে গাড়ীর ফাঁক দিয়া সে ব্যগ্র চোখে বাহির পানে চাহিতেছিল—যদি মাণিককে দেখা যায়। সে আশা করিয়াছিল পথের ধারে হয়তো সে দাঁড়াইয়া আছে, তাকে দেখিয়াই মা বলিয়া ছুটিয়া আসিবে।

প্রগতি অশ্রুমনস্কভাবে কোনদিকে তাকাইয়া রহিল;—দুর্ভাগ্য বালক, হৃদনের জন্ত আসিয়া মনের মধ্যে এমন একটা রেখাপাত করিয়া গেল, যাহা আর এ জীবনেও মুছিবে না।

শরতের উপর প্রথমটায় তাহার বড় রাগ হইল, পরক্ষণে ভাবিয়া দেখিল—তাঁহার কোন দোষই নাই। তিনি কি করিবেন, তিনি তো দিনরাত তাহাকে চোখে চোখে রাখিতে পারেন না।

অভাগা মাণিক—

প্রণতির বক্ষভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

বাপুয়া তাহার মলিন ভাবের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিতেছিল, “আহা দিদিমণি,—মরে গেছে কে বলবে ; জল হতে যখন তুলণে, ঠিক তেমনি চেহারা,—তেমনি মুখ, তেমনি হাসিটুকু পর্য্যন্ত রয়েছে। মনে হচ্ছিল সে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে,—ঠিক যেন—”

“ওরে তুই থাম রে থাম,—” হাঁকাইয়া উঠিয়া প্রণতি বলিল, “আর আলাস নে বাপুয়া, থেমে যা। ও সব কথা আর আমার কাছে বলিস নে, ওতে আমার ভারি কষ্ট হয়।”

তাহার আর্দ্র কণ্ঠ স্বরে চমকাইয়া উঠিয়া বাপুয়া তাহার পানে তাকাইয়া দেখিল প্রণতি ডাডাস নেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া আছে, তাহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে।

বাপুয়া বান্ধবিকই হৃদয়ে বেদনা পাইল। সেই যে প্রণতিকে অকারণে কাঁদাইল, ইহা ভাবিয়া ভারি অপ্রস্তুত হইয়া গেল। বিমর্ষ মুখে সে প্রণতির পানে চাহিয়া রহিল, কি বলিয়া সাঙ্গনা দিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক পাইল না।

প্রণতি আসিয়াছে সংবাদ পাইয়া শরৎ একটু ইস্তমতঃ করিলেন, তাহারপর দেখা করিতে আসিলেন।

প্রণতি অভিভাদন করিল, বসিতে চেয়ার দিল, কিন্তু তাহার মুখে সে হাসি ফুটিল না। তাহার মলিন মুখের পানে একবার তাকাইয়াই শরৎ চোখ নামাইয়া লইলেন।

হাত দুখানা কচলাইতে কচলাইতে নিতান্ত

বিপন্নভাবে তিনি বলিলেন, “আপনি সবই শুনেছেন মিস বোস, আমি...”

মলিন হাসিয়া প্রণতি বলিল, “হ্যাঁ, আমি সবই শুনেছি, কিন্তু তার জ্ঞে আপনি এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন, বলুন দেখি ?”

শরৎ রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “কারণ আমি নিজের বড় বেদনা পেয়েছি মিস বোস। হয় তো সে মরত না, সে সেরায়ে আর কারও কাছে যায়নি,—আমার কাছে এসেছিল, কিন্তু আমি তাকে সাঙ্গনা দেইনি, তাকে কাছে ডাকিনি,—তাকে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম। যদি তাকে তখন সাঙ্গনা দিতুম তবে সে এমন করে মরত না—মিস বোস।”

শাস্ত কণ্ঠে প্রণতি বলিল, “আপনি জ্ঞানী হয়ে ও বুঝতে ভুল করেছেন। জীবের মরণ যখন আসে, কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না,—যেমন করেই হোক তার দণ্ড সে জীবের অঙ্গে ছোঁয়াবেই। আপনার চারিদিকে চেয়ে দেখুন,—কত রকমে কত লোক মরছে। কেউ ব্যারামে ভুগে মরছে, কেউ অতর্কিতে মরছে, কেউ স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করে মরছে ; যে যেমন করেই মরুক, মরণ নে সেই এক—এতো অস্বীকার করবার যো নেই। যে কোন রকমেই জীবমাত্রেরই মৃত্যু আসবে, একে এড়াবার যো কিছুতেই নেই। বুঝতে গেলে বোঝা যায় কিছুই না,—সবই মিছে, কিন্তু আঘাতটা ইঠাৎ লাগলে প্রথমটা আমাদের বোধ শক্তি থাকে না, আমরা বেদনায় কাঁদি। প্রকৃত জ্ঞানী ধারা তাঁরা কিন্তু এত সহজে ভেঙ্গে পড়েন না। আপনি ভুল ধারণা করে অনর্থক কষ্ট পাচ্ছেন ; আপনার সাঙ্গনা দেবার অভাবেই যে সে মরছে তা নয়।”

শরৎ স্থির দৃষ্টিতে প্রণতির পানে তাকাইয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ তিনি একটা কথা বলিতে পারিলেন না। এই জ্ঞানবতী তরুণীটা তাঁহাকে প্রতি কথায় এমনি করিয়া স্তম্ভিত বিমুগ্ধ করিয়া দিতেছে।

প্রণতি চোখ তুলিতেই দেখিল শরৎ তাহার পানে তাকাইয়া আছেন; কুণ্ঠিত সলজ্জ দৃষ্টি সে তাড়াতাড়ি নামাইয়া লইল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শরৎ বলিলেন, “আপনি যে কথাগুলো বলেছেন মিস বোস তা সত্য এবং মূল্যবান। আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি আপনি এই অল্প বয়সে এত অভিজ্ঞতা লাভ করলেন কি করে?”

প্রণতি হাসিল, পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া বলিল, “মানুষ ঠেকে অভিজ্ঞতা লাভ করে। যাদের মা ছোট বেলায় মারা যায়, তারপর পরের দয়্যায় কোন ক্রমে যারা মানুষ হয়, তারা সংসারকে বড় বেশী রকম চেনে।”

শরৎ একটু ভাবিয়া বলিলেন, “মা তো অনেকেরই থাকে না মিস বোস, আমারও তো মা নেই।”

প্রণতি হাসিল, সে হাসিতে ঝরিয়া পড়িল অন্তরের জমাট বাঁধা বেদনা;—সে বলিল, “অনেক প্রভেদ,—আপনার মা গেলেও পরের লাঞ্ছনা আপনাকে সহিতে হয়নি, আপনার বাপ ছিলেন, কিন্তু আমার যে কেউ নেই সে কথা বোধ হয় জ্ঞানেন। আমার মামা যদিও আমায় স্নেহ করেন তাঁর দর্য্যতেই আমি মানুষ হতে পেরেছি, কিন্তু মামী আমার কিছুতেই স্নেহে দেখতে পারেননি। চিরদিন তাঁর স্বর্ণা অবহেলাই কুড়িয়ে এসেছি। বলবেন তবু আমি ছুটির সময় কোথাও থাকতে পারিনি কেন, কেন তবু ছুটে সেখানে যাই,—যাই শুধু আমার মামার জন্তে,—তিনি আমায় আজও বড় ভালবাসেন।”

শরৎ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার অঙ্গে অঙ্গে ধরার গায়ে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল,—বাপুয়া আলো দিয়া গেল। গ্রাম বন্ধ হইতে শব্দনিবাদের শব্দ ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

বাহির হইতে কে ডিকিল. “বাপুয়া—”

“বাচ্ছি বাবু—”

বাপুয়া বাহিরে চলিয়া গেল, একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “হরিবাবু আপনার খোঁজ করছেন দিদিমণি।”

অনেকদিন পূর্ব্বের একটা কথা প্রণতির মনে জাগিয়া উঠিল। সে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, সে কথা নানা ভাবনায় সে ভুলিয়া গিয়াছিল, হরিঘোষের নাম শুনিয়াই সে কথা মনে পড়িয়া গেল।

প্রণতি অত্যমনক ভাবে বলিল, “তাঁকে নিয়ে এসে।”

হরিঘোষ প্রবেশ করিতেছিলেন, বারাণ্ডায় শরৎকে দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, আর অগ্রসর না হইয়া আঁস্তে আঁস্তে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন।

শরৎ ডাকিলেন, “ঘোষ মশাই যে, আসুন।”

মুখখানা অত্যন্ত বিমর্ষ করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে হরিঘোষ বলিলেন, “একটা দরকার ছিল আমার কাছে,—তা উনি এখন ব্যস্ত আছে, এখন বরং থাক, আমি এর পরে এক সময়ে এসে—”

তিনি থামিয়া গেলেন দেখিয়া শরৎ তাঁহাকে আর কোনো প্রশ্ন না করিয়া প্রণতির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “আপনার কাছে গুঁর দরকার আছে বুঝি?”

প্রণতি বিবর্ণ মুখে বলিল, “হ্যাঁ, আমার কাছে গুঁর একটা দরকার আছে বটে।”

হরিঘোষ কম্পিত হস্তে পকেট হইতে এন্ডেলাপ বন্ধ একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিলেন, “ডাক্তার বাবু এই পত্রখানা দিয়েছেন। আপনার হরতো মনে নেই মা,—মনে না থাকবারই কথা—সেই জন্তে—”

“দেখি” বলিয়া হাত বাড়াইতে হরিঘোষ একটু ইতস্ততঃ করিয়া শরতের হাতে পত্রখানা দিয়া প্রণতির পানে তাকাইলেন।

শরৎ সাধা এন্ডেলাপথানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন। কভারে সুন্দর ইংরেজিতে লেখা—মিস প্রণতি বোস।

শরতের প্রশান্ত ললাট মুহূর্তেরতরে কুঞ্চিত হইয়া তখনই পরিষ্কার হইয়া গেল, তিনি সেখানা প্রণতির হাতে দিয়া হাসিমুখে বলিলেন, “আপনাদের মধ্যে পত্রে কথা বার্তা চলে দেখছি। গোপনীয় কথাবার্তার মধ্যে আমি থাকার ইচ্ছে করিনে, সুতরাং আমি এখন উঠি।”

প্রণতির উজ্জল মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল, সঙ্কুচিতভাবে সে বলিল, “আপনি ভুল করছেন, গোপনীয় কথাবার্তা কিছুই নয়, তিনি নিজে আসতে পারেননি, এঁকে কথা দিয়েছেন সেই জন্তেই—”

হরিষোষ বলিলেন, “আমি এখন যাচ্ছি মা খানিক বাদে আসব এখন।”

তিনি যে চলিয়া গেলেন, সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া শরৎ বলিল, “আমি আপনাকে লজ্জিত করবার জন্তে কোন কথা বলিনি মিস বোস। আমার একটা কাজ আছে,—ফিরে গিয়ে করতে হবে। আবার কাল যদি পারি তবে আসব। নমস্কার—”

তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া প্রণতি খতমত খাইয়া গিয়াছিল, প্রতি নমস্কার দিতে তাহার মনে ছিল না।

ক্রমশঃ —

## ছল

### শ্রীগিরিজাকুমার বসু

তুমি নাকি আমার সঙ্গে আর কখনো কথা বোলবে না শুনলুম। আমার অপরাধ এই দেখিয়েছো যে সেদিন ডেকে পাঠিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কথা কইনি, তুমি এলে মুখ ফিরিয়ে বোসেছিলুম।

কথা তুমি আমার সঙ্গে অনেকদিন আগে থেকেই কওনি, দেখাও করেনি। সুতরাং আর কখনো কথা না কইবার বিভীষিকা যে দেখিয়েছো তার কোনো অর্থ নেই, ভীষণতাও নেই। তবুও তোমার উক্তির মধ্যে ছ’একটা ভ্রম আছে বোলে তা সংশোধন কোরছি।

সেদিন আমি তোমার আসতে বলিনি—বোলেছিলেন তোমারই প্রিয়তম আত্মীয়, আমার

বন্ধুটি। তুমি দেখা না কোরলেও বা কথা না কইলেও, প্রতিদিনই যে আমার খবর নিতে সে কথা আমার অজানা নেই। আমার সাসুনা ছিল এই যে আমি দৃষ্টি, বাণী এবং স্পর্শ হারালেও, করুণা হারাইনি। যেন কথা বোলছিলুম :—বন্ধুটি ডাক্তার তুমি যে এলে, কই এসে, অতোদিন পরে আমার দেখে একবার প্রশ্নওতো করেনি তুমি ‘কেমন আছেন’ বা ‘কেনো ডেকেছেন’? বন্ধু তোমার ডেকে পাঠিয়েছিলেন বটে কিন্তু আমার নাম কোরেই। সুতরাং তুমি জানতে যে আমিই ডেকেছি। অথচ তুমি এসেই তোমার আত্মীয়জনের সঙ্গে রসালাপ কোরতে শুরু কোরলে আমার অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে।

এর পরে যদি আমি বিমুখ বা বিপরীতমুখ হোয়ে বোসে থাকার অপরাধ কোরেই থাকি তো তার নিন্দা বা শাস্তি ঘটতে পারে না।

তুমি কেনো বোলেনা 'আমাকে ডেকে কথা কইছেন না যেই' আমি তোমার চেয়ে বয়েসে ও সম্পর্কে বড়ো ভুলে যেয়ো না। তা ছাড়া লোকে ও তোমার আপনজনে তোমার সঙ্গে আমার সে নিবিড়তম সম্বন্ধের কথা নিয়ে রঙ্গরহস্য করে, সে সম্বন্ধ ধ'রলে তোমারই উচিত ছিলো আলাপ স্তব্ব করা। তোমার শীগ্গীর বিয়ে হবে শুন্দি, যারপর নাই স্তব্বের সন্দেশ। কিন্তু যতদিন তা' না হচ্ছে, ততদিন বিনা কারণে নিজের ও অপরের মনের পবিত্রতম ও মিষ্টতম সম্বন্ধকে কুণ্ঠিত ও বিড়ম্বিত

কোরে অন্ততঃ একজনেরও বুক ভাঙ'বার তাৎপর্য কি বুঝতে পারলুম না।

তুমি যে আমাকে দুগা করো না এ কথার প্রতিবাদ স্বয়ং ভগবান এসে কোরলেও বিশ্বাস কোরবো না! বোলতে পারো 'ভালো তো বাসিনা'; তর্কের খাতিরে না হয় এটুকু মানলুম যে এই উক্তি বার্থ। তা হোলেও, মনে কষ্ট দেবার অধিকার এই ব্যক্তির বলে প্রমাণিত হয় না। ভালো না বাসলে যে পায়ের তলায় দলে ঠাস্তে হয়, এমন কথা কোনো শাস্ত্রই বলে না।

আমার বলা এইখানে শেষ হোলো—তোমার ঢলা আরো কতোদিন চলবে?

## তিমির-শৰ্ব্বরী-শেষে অরুণ-প্রভাত

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

—প্রথম—

সন্ধ্যায় লগ্ন; কাজেই বিবাহ চুকিয়া গেল খুব সকাল সকাল। বিজ্ঞান যখন বাসর ঘরে উপস্থিত হইল, তখনো দশটা বাজিতে দেবী আছে।

বিজ্ঞানের বরাত ভালো কি মন্দ সে বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে যাওয়া ঋষ্টতা, কেননা বাসর জাগিবার মতো সঙ্গিনী সে রাত্রে একজন ছাড়া আর কেহই ছিল না। সেই একজন আবার নব বিবাহিতা। একালের ছেলে বিজ্ঞানের রসিকতা খুবই ধারালো, তাই লজ্জায় সঙ্গিনীটি উঠিয়া পালাইলেন বটে; কিন্তু মাঝে মাঝে খড়খড়ির ফাঁকে দেখা দিতে কসর করিলেন না। কিন্তু সে বৌদ্ধগণের জন্ত নহে রাত বারোটার পরই সব নিস্তব্ব হইয়া গেল।

জীবনের প্রথম মধুময় বসন্তের রাতে উপভোগ করিবার বহু আকাঙ্ক্ষিত ক্ষণটা এইবার উপস্থিত হইল।

খাটের উপর শুন্ন নরম বিছানা—ফুলে ফুলময়। বেল ও ঘুঁইয়ের মিষ্টি গন্ধে সমস্ত ঘরখানি আমোদিত বৈদ্যুতিক নীল আলোর পার্শ্বে নিদ্রিতা (?) জীবন সঙ্গিনীর নীল ওড়নাখানি বিজ্ঞানের মনে এক মোহন কল্পলোকের সৃষ্টি করিল। ছাদের দিকের খোলা জানলাটা দিয়া মাঝে মাঝে ঝলকে ঝলকে দখিনা বাতাস প্রবেশ করিতেছে।

বিজ্ঞান উঠিয়া বসিল,—একটু নড়িল চড়িল,—থুক থুক করিয়া একটু কাশিল—কিন্তু ও পক্ষ, হইতে কোন ওরুপ সাড়া পাওয়া গেল না।



কিছুক্ষণ পরে অতিষ্ঠ হইয়া একটু সরিয়া গিয়া বিজন ডাকিল—সুখমা !

কোন উত্তর নাই। বিজনের শুধু যে আশ্চর্য্য ঠেকিল তাহা নহে,—রাগও একটু হইল। সত্যই তো, রাত আর এমন কি বেগী হইয়াছে? বারোটা অবধি এমনিই তো সাধারণ লোকে জাগিয়া থাকে! জীবনে বাসররাত একবার বই ছ'বার আসে না! আর সুখমা?—কচি খুঁকিটি নহে হাজার হইলেও বাংলা দেশের সতেরো বছরের তরুণী! তবে?

বিজন রাগ করিয়া শুইয়া পড়িল। ভাবিল—থাক্ আমার একারই বা এতই কি গরজ?

কিছুক্ষণ চোখ বুজাইয়া শুইয়া থাকিয়া বিজনের অমুতাপ হইতে লাগিল। নাঃ একজন নির্ঝুন্ধি ও ভুলের বশে এমন মধু-যামিনী যদি ব্যর্থ করিয়া দিতে চায়, সেও কি তাহাতে সায় দিবে? কি বোকা সে!

বিজন আবার উঠিল। এবার অনেকখানি আগাইয়া গিয়া বধূর লীলায়িত একখানি হাত নিজের হাতে লইয়া ডাকিল—শুনছ?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সুখমা পাশ ফিরিল। মাথার একরাশ ঘোমটা, আরও একটু টানিয়া দিয়া বলিল—ডাক্‌ছিলে?

হায়রে! তাও আবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? বিজন ক্ষুণ্ণ মনে বলিল—হাঁ, কিন্তু তুমি কি এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলে?

—প্রথমটা বটে, কিন্তু তুমি ডাক্‌বার পরেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

শুনিয়া বিজনের মন আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল—তুমি অত ভয়ে ভয়ে শুয়ে আছ কেন সুখমা? মাথার একরাশ ঘোমটা, অত জড়ো-সড়োভাব—কেন? আর তো কেউ আড়ি পাতেছে না।

সুখমা উহার উত্তর দিল না, শুধু মুখ রাঙ্গা করিয়া ঘামিতে লাগিল।

বিবাহিত বন্ধুদের নিকট বিজন শুনিয়াছিল—

প্রথম প্রথম সকলেই ওইরূপ করিয়া থাকে। হাজার চালাক মেয়ে হইলেও প্রথম প্রথম কেহ কেহ লজ্জায় কপাই বলিতে পারে না। একটু একটু করিয়া লজ্জা ভাঙাইতে হয়—সবুরে নাকি মেওয়া ফলে!

বিজন কহিল—আচ্ছা সুখমা, আজ থেকে তুমি আমার কে হ'লে বলত?

সুখমা শুনিয়াই উত্তর করিল—বউ!

বিজনের রসিক মন এরূপ উত্তরে সন্তুষ্ট হইল না। বলিল—ও কথা তো সাধারণ লোকেও বলে থাকে, তুমিও তাই বলবে?

—তবে কি জীবন-সঙ্গিনী, অর্দ্ধাঙ্গিনী, প্রিয়া? বলিয়া সুখমা অধর টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

বিজন মনে মনে লাফাইয়া উঠিল—বাঃ সুন্দর 'ফর্ওয়ার্ড' মেয়ে তো?

মুখে বলিল—এই তো জানো সুখমা, বলিয়া তাহার হাতে একটু চাপ দিল।

বিজন আবার প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, তুমি তো বেথুন স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাস অবধি পড়েছ শুনেছি,—রবিবাবুর কবিতার বই কখনো পড়েছ সুখমা?

—প্রায় সব গুলোই।

—সোনার তরী?

—হাঁ।

—ওতে মানস সুন্দরী বলে যে কবিতাটা আছে, সেটা?

সুখমা হাসিয়া বলিল—সেই—

অগ্নি প্রিয়া

চুপন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া

বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরাও না মুখ

উজ্জল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ মুখ

রেখো ওষ্ঠাধর পুটে—তো?

বিজন মুগ্ধ হইল। সত্যি তাহার বিবাহ করা সার্থক হইয়াছে! মনের কথাটা এরূপ ভাবে টানিয়া আনিবে—এতখানি সে মোটেই আশা করে নাই!

এই তো চাই ! এই-তো। তাহার যুগ যুগবাস্তিতা  
আকাজ্জিতা প্রিয়া !

স্বমার হাতখানি নিজের মুঠার ভিতর শক্ত  
করিয়া ধরিয়া অর্ধ শায়িত অবস্থায় বিজ্ঞন বলিল—  
তুমিই তো আমার মানস-সুন্দরী স্বময়া, অতএব  
বাক্যে না গ্রীবাখানি, ফিরায়ে না মুখ।

হঠাৎ একি হইল ? বিজ্ঞনের হাত হইতে নিজের  
হাত মুক্ত করিয়া স্বময়া সহসা উঠিয়া বসিল। তাহার  
চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিয়াছে। আয়ত হরিণাক্ষিও  
অশ্রুতে চক্ চক্ করিতেছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস  
ফেলিয়া স্বময়া মুখ ফিরাইল।

কি হইতে কি হইল ? বিজ্ঞন ভালো করিয়া  
বুঝিতে পারিল না। তাহার যেন সমস্ত গোলমাল  
ঠেকিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিলে পর  
সে উঠিয়া বসিয়া কহিল—স্বময়া, একি ?

স্বময়ার চক্ষু হইতে হুফোঁটা জল টপ্ টপ্  
করিয়া ঝরিয়া পড়িল। আঁচলে তাহা মুছিয়া স্বময়া  
ধরা গলায় বলিল—আজ আমার মাপ করো।

সেকি ! বিজ্ঞনের বুদ্ধি যেন লোপ পাইতে  
লাগিল। স্বময়া একুণ বলে কেন ?

বিজ্ঞন বলিল—ওকি স্বময়া, তুমি ওসব কি  
বলছ ? দোষই বা কি করলে যে মাপ চাইছ ?  
এসব কি ?

স্বময়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল তোমার চরণে আমি  
শত সহস্রবার অপরাধী, মাপ চাইবারও আমার পথ  
নেই ; তুমি আমার কাছে আজ যা চাইছ, আমি  
তা দিতে পারবো না, আমার কিছু দিনের ছুটি দাঁও,  
জানি বাসররাত একবার গেলে আর ফেরে না, কিন্তু  
কি করবো আমি যে বড় অভাগিনী, পারবো না উপায়  
নেই, উপায় নেই,—বলিতে বলিতে স্বময়া হুই তাতে  
মুখ ঢাকিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

### —দ্বিতীয়—

বিবাহের দুই মাস পরে আর এক পূর্ণিমা  
রজনীতে ছাদের উপর রখিনা বাতাসের লুকাচুরি খেলা

চলিতেছিল। সতরঞ্চির উপর বিজ্ঞন বসিয়া। আর  
তাহারই পায়ের কাছে বসিয়া স্বময়া কম্পিত কণ্ঠে  
বলিতেছিল—বিয়ের পর এই ছোটো মাস কেন যে  
আমি আমার এই তুচ্ছ দেহটাকে তোমায় দান  
করতে পারিনি, সেই কথাটাই আজ বলবো। দয়া  
করে শুনে আমার বিচার কোরো।

“আমাদের বাড়ীর পাশে তেতালা বাড়ীটায়  
মানীমারা যখন ভাড়া এলেন, তখন আমি ফোর্ণ  
ক্লাসে পড়ি,—বয়স আমার তখন চোদ্দই হবে।  
হু’ এক মাসের ভেতরই মানীমাদের সঙ্গে আমাদের  
খুব আত্মীয়তা জমে’ গেল। আমরা যখন তখন  
গুঁদের বাড়ীতে যেতুম—গুঁরাও আসতেন, এক কথায়  
কিছুদিনের মধ্যেই আমরা সব একই সংসারের ছেলে  
মেয়ে বনে’ গেলুম।

“কি জানি কেন মানীমার ছেলে হীরেনদার সঙ্গে  
আমার যেন একটু বেশী বন্ধুত্ব হ’য়ে গেল। হীরেনদার  
বোন রমলাও আমার বন্ধু ছিল বটে কিন্তু অবসর  
সময়ে হীরেনদার কাছে থাকতে পেলে আমি যেন  
আর কিছু চাইতাম না।

কাবণটা অবশ্য আবিষ্কার করলুম পরের বছর  
থার্ড ক্লাসে ইস্কুলের বন্ধু মীরার কাছে।

“আমার তেরোবছরের জীবনে হঠাৎ একদিন  
টের পেলাম যেন জগতের সব জিনিসেই একটা  
আনন্দের উৎস উথলে উঠছে। চোখে যেন আমি  
এক নতুন দৃষ্টি পেলাম। নারীত্বের প্রথম আত্মদানে  
মন প্রাণ আমার যেন এক নতুন আনন্দে, নতুন  
পুলকে ভরে উঠলো।

সেই সময় যৌগ তত্ত্বের একখানা বাংলা বই মীরার  
আমায় পড়তে দিয়েছিল। পড়ে অবধি, যৌবনের  
একটা চঞ্চল আবেগ সারা দেহে অহুস্তব কোরতে  
লাগলুম। পুরুষের কঠিন আলিঙ্গনে আমার তরুণ  
দেহটাকে নিপীড়িত করবার প্রবল কামনা আমার  
পাগল কোরে তুলতো।—একদিন মীরা বোললে—  
সে নাকি একটি ছেলের প্রেমে পড়েছে, আর এই

গোপন প্রেমকে সার্থক করতে তারা লুকিয়ে বিয়ের চেষ্টাতেও আছে। মীরার ওপর রাগ হতে লাগলো—তার কি দরকার ছিল আমার এসব জানাতে? আমি এ মোহের হাত থেকে উদ্ধার পাই কি করে?

“কিন্তু উদ্ধার পাবার পথ একদিন দেখিয়ে দিলে হীরেনদা। আমার সমস্ত জীবন মন সার্থক করতেই সে একদিন এমনি পূর্ণিমা রজনীতে ছাদের ওপর হীরেনদা পরিপূর্ণ স্নগা পাত্র আমার বহুকালের তৃষিত হৃদয়ে উজ্জ্বল করে ঢেলে দিলে।

তারপর থেকে আমার অবস্থা মীরার মতই হ’য়ে উঠলো। অবসর পেলেই আমাদের অভিনয় চলতে লাগলো।

“এমনি করেই তিন বছর কাটলো—আমি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠলুম। হঠাৎ শুনলুম, বাবা আমার বিয়ের সঙ্কল্প করছেন। শুনে ভাবনা ও হৃদয়ে মনটা বড় দমে গেল। হীরেনদার কাছে পরামর্শের জ্ঞা ছুটলুম—বললুম—তুমি আমার বাঁচাও হীরেনদা, তোমাকে ছাড়া, আরতো কার গলায় মালা আমি দিতে পারবো না। হীরেনদা অভয় দিয়ে বললেন—ছদ্দিন সবুর কর, দেখি আমি কি করতে পারি।

“সেই আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলাম—কিন্তু হায়রে পুরুষ! ভণ্ড! স্বার্থপর!”

স্বামীর কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল—সমস্ত মুখ রক্তিমবর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ থামিয়া আবার সে বলিতে লাগিল—

“তারপর তোমার সঙ্গে বিয়ের কথা যেদিন আমার পাকা হ’ল সেই দিনই হটাৎ পশ্চিমে বেড়াতে যাবার নাম করে সেই যে সে গোপনে পালিয়ে গেল তারপর আর তার দেখা পাইনি।

“তখন থেকে মনকে কঠিন করলুম—সব ভুলতে চাইলুম, তবুও স্মৃতির কাঁটা বুকে বিঁধেই রইলো।

তোমার সঙ্গে বিয়ে হ’ল কিন্তু এই কলঙ্কিত দেহটা কি করে তোমায় দান করবো এই চিন্তাতেই অস্থির হয়ে উঠলুম। কপট অভিনয় করতে গেলেই মনটা

সঙ্কচিত হয়ে উঠতো। তখনো একজনকে ভুলতে পারিনি, তাই বিবেক ধমক দিয়ে উঠতো—ষিচারিনী!

“এই নিয়েই এতদিন তোমার নিরুদ্বল উদার মনে কষ্ট দিয়ে এসেছি—এতখানি ছলনা করেছি। কিন্তু আজ আর আমার কিছু বলবার নেই। সেই স্বার্থপর নীচ ভণ্ড কাপুরুষকে শুধু ভুলিনি তাকে আমি আজ ঘৃণা করি, গলিত কুষ্ঠের চেয়েও ঘৃণা করি। কেন জান? এই চিঠিখানাই আজ আমার চোখ গুলে দিয়েছে—পড়বে একবার?”

হাতের মুঠার ভিতর হইতে চিঠিখানি স্বেয়া বাহির করিয়া দিল। বিজ্ঞান পড়িল—চিঠিখানির অর্ধেক প্রণয়োচ্ছ্বাসে ভরা, শেষে হীরেন লিখিয়াছে—“বিবাহই প্রেমের চরম পরিণতি নয়। আমি ব্রাহ্মণ, তুমি কায়স্থ—আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, আমাদের বিবাহ হইতে পারে না কিন্তু চুলায় যাক বিবাহ, আমাদের এতদিনকার প্রেম কি বার্থ হইবে? না, তাহা হইতে পারে না—স্বয়ম্বা, তোমার বিবাহ হইয়া গেলেও আমাকে ছাড়া আর কাহাকেও তুমি তোমার মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে পারিবে না, ইহা জানি। আমি শীঘ্রই যাইতেছি তুমি ভাবিও না, এ চিঠি কাহাকেও দেখাইও না,—গিয়া তোমার স্বশ্রবণবাহীর পার্শ্বে যাহাতে বাঁজীভাড়া করিবার সুবিধা হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি—

বিজ্ঞানের চিঠি পড়া হইলে স্বয়ম্বা বিজ্ঞানের পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল—সমস্তই তোমায় গুলে বললুম, সমস্ত শুনে এখনও কি এই কলঙ্কিনীকে তোমার পায়ে স্থান দিতে পারবে?

অশ্রুতে বিজ্ঞানের পাখিটি ভিজিয়া উঠিল।

বিজ্ঞান বাহ প্রণারিত করিয়া স্বয়ম্বাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিল—অনুতাপই মানুষকে শুদ্ধ করে—আগুণে পুরে তুমি খাঁটি সোনা হয়েছ আর ভয় কি স্বয়ম্বা? সব শুনে এখনও যদি তোমার ওপর স্মৃতিচারণ না করি, তা’হলে জগতে কোথাও আমার স্থান হবে না। আর নে যুগ নেই স্বয়ম্বা। তরুণের দল আমরা, সমস্ত সঙ্গীতকে দূর করে আজ আমরা উদার, আজ আমরা মহৎ। এস রাগি আমরা, নবযুগের প্রাণ: স্বর্ধ্যকে আজ আমরা নমস্কার করি।

# সুপরামর্শ

(রঙ্গমন্ত্রী)

## শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

দুনিয়ায় যারা টিকিয়া থাকিতে বাসনা করেছে ভাইরে —  
তারা, ভেঞ্ছারী হোয়ে টিকি নেড়ে কোরো ‘তাইরে নাইরেনাইরে’ !  
কভু, সত্য কথাটি বলিও না, ভায়া, মিথ্যা কথাটি বিনে !  
আর, দোকানীয়ে কভু নগদ পয়সা দিয়ে না দ্রব্য কিনে !  
এই, স্বার্থের লাগি মেজাজ বুকিয়া তোয়াজ করিও সদা ;  
আর, সুযোগ পাইলে যার খাবে তার নাথায় ঠুকিও গদা !  
ওরে, হাতে হাতে ঘুস খেয়ো না আপিসে, চাকুরী যাইবে তাইতে ;  
শুধু, বিজনে বসিয়া রাতে খাবে ঘুস আজ্ঞাবাহিনের হাতে !  
আরে, ‘বড়বাবু’ হোক হস্তিমূর্খ, তার কাছে সেজো বোকা ;  
তা’লে, কার্য্য হাঁসিল করিতে পারিবে লাগায়ে ভীষণ ধোঁকা !  
আর, যাহার সর্ব্বনাশটি করিবে, খুসী রেখো তারে হাসি’ ;  
আহা, কথাদায়ের ভাবনা রবে না, মরিলে লাগায়ে ফাঁসি !  
ভবে, ভণ্ডামি কোরো, গুণ্ডামি কোরো, বিবাহ কোরো না, বাবা ;  
এই, টিকি-কাটা ভট্টাচার্যের নিকটে খাঁটি পাঁতি এই বাবা !

## নারী প্রগতি

### শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ্র

বাঙালার ‘কাল্চার’ বা বৈদগ্ধ্য আজ আবার  
আপনার স্বরূপটিকে চিনিতে চলিয়াছে ইহা আনন্দের  
বার্তা বটে। যুগ-নির্দেশ্যের সবুজ-পতাকার তলে  
দাঁড়াইয়া সে দিকে দিকে স্বাধীন প্রাণ বিস্তার  
করিয়া দিতেছে—মুক্ত যাহা, শুদ্ধ যাহা তাহাকে  
আবার গ্রহণ করিতেছে। ঋষি আর্য্যাবর্তের বৃকে  
দাঁড়াইয়া বিশ্ববাসীকে ডাকিয়া বলিলেন—“শ্রবস্ত  
বিশ্বে অমৃতস্ত পুত্রাঃ !” নিখিল মানব-চিত্তে সাড়া  
পড়িয়া গেল, অগংজনের ছয়ায় কে যেন কড়া

নাড়িল। ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া অদীম  
আকাশের পানে যখন তাহারা বিপুল বিশ্বয়ে চাহিল  
উপর হইতে তখন আলোর বর্ণা তাহাদের মাথায়  
চিরকালের মাহুঘটীরই আশীর্বাদরূপে বরিয়া পড়িতে-  
ছিল। সে আলোতে তাহাদের আঁখি ঝলসিয়া  
গেল—বিরাতিকে তাহারা প্রাণে প্রাণে অলুভব  
করিল।

\* \* \* \* \*

বাঙালার নারী, কল্যানত্রীর কল্প-প্রদীপ নারী—

সে আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। ধরণীর স্বরের সেতারের একটা তার সে আপন মহিমায় ছড়িয়া আছে, তাহাকে একপাশে ঠেলিলে চলিবে কেনো!... মায়া-পুত্রীর সোনার কাঠির পরশে সে যদি জাগিয়াই উঠিল তো তাহাকে তাহার ঘোলআনা বুঝাইয়া না দিলে চলিবে কেনো!... নারী, পৃথিবীর পায়ের তলায় বাহারা প্রীতির পাত্র ধরিয়া যুগে যুগে মানুষের মুখে অমৃতের আশ্বাদনই দিতেছে তাহাদের আজ দাবইয়া রাখিতে চাহিলে আমি বলিব মানুষ বিশ্ব-শিল্পীর বিধান উন্টাইয়া দিতে চায়, আমি বলিব মানুষ তাহা হইলে আমার স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষন করে—বিবেকের নিশানকে পদদলিত করে। নারীকে এমনভাবে কারাবদ্ধ করিয়া, ধরণীর আলো-বাতাসের রাজ্য হইতে ছিনাইয়া লইয়া, প্রাণের প্রকাশের চেতনা লুপ্ত করিয়া কোন্ জনা সে এই ভুবনে আপনাকে প্রবল বলিয়া প্রচার করে?... জননীর স্নেহ-বিন্দু মন লইয়া, আঁখির কোণে অতল অশ্রু লইয়া, বুকে স্তন্য-সুখা লইয়া—কে মানব তোমাকে ধরণীর পথে চলিতে শিখাইয়াছিল?... নারীর স্বাধীনতার কথা স্বয়ং স্রষ্টার সৃষ্টির মতনই সত্য। .....

\* \* \* দার্শনিক স্বপ্নহর

বলিলেন—“নীল চোক যত উপারিয়া ফেলো!” কেন, ওই কালো-চোখের মনোরম বিন্দুতা যে আকাশ-স্পর্শী আগুণকেও মুহূর্তকে জল করিয়া প্রাণের প্রলেপ দিয়া যায়। শেলির এমিলিয়া ভিভিয়ানী, দাস্তের বিয়াক্রিস আর মোনাগিসার হাসি—এদের বাদ দিতে চাহিলে মানব-মনের ইতিবৃত্তের সাড়ে পনেরো আনাই যে পড়িয়া থাকে। ধরণীর পথে চলিতে চলিতে মানুষ যখন ক্রমাগত চৌকর খাইয়া অচল হইয়া পড়ে নারীরই বুকের বাণী তখন জীবনী-শক্তির বয়সারে তাহার পাঁচ গুণ জোড় আনিয়া দেয়—এর পাল্টা জবাব কোন্ মনুষ্য দিবে? পৃথিবীর commercialism বা ব্যবসানেশা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। কেউ কেউ বলিতে সুরু করিয়াছেন... নারীও commercial commodity. আমার একজন ইংরেজ-বন্ধুও ভারতীয় নারী সম্বন্ধে ঐ ধরণের একটা কথা আমাকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন। মুক্তাকাশের নীলাবরণের তলে দাঁড়াইয়া বলিতেছি, নারী যদি ব্যবসার বস্তুর মতনই সম্ভা হয় তো মানুষের বুকের ব্যথা, মানুষের মনের মানুষটার স্বাচ্ছন্দ্য বাজারের পণ্য। নারীকে যতদিন আমরা না চিনিব, নারীর অন্তরের গুহা-তলে যে কাম্য-ধন চিরস্তনী-রূপে লুকাইয়া আছে যতদিন না তাহাকে জানিব ততদিন আমাদের সমাজ, আমাদের আমাদের তথা-কথিত সমাজ পঙ্গু ও অচল হইয়া জগদল পাথরের মতই দাঁড়াইয়া থাকিবে। বদ্বশক্তি ও বিংশতাব্দীর সভ্যতা ছাড়িয়া নারীকে আজ এই স্বর্ঘ্যালোকদীপ্ত বিচিত্রবর্ণময়, নদী-মেথলা বনচ্ছায়া-বিন্দু স্নানরী ধরণীর মুক্ত বক্ষে ক্রীড়ার জন্ত স্বাধীনতা দিতে হইবে। এ পরোয়াণা অস্বীকার করিবে যে মাথার উপরে তাহার পড়িবে ভগবানের উত্তম বস্ত্র। কবি শেলী জিজ্ঞাসা করিলেন।

“.....And man and woman ;  
And what still is dear  
Attracts to crush repels  
to make thee wither,  
The soft sky smiles, the low  
wind whispers near.”

নারীর ভিতরকার মানুষটা সম্বন্ধে সত্য, শিব ও স্কন্দরের কবি বলিতেছেন—“that light whose smile kindles the universe.” নারীকে ইহার চেয়ে ভালো করিয়া বুঝিতে গেলে ভাষা হার মানিবে। নারী.....নিখিলের নীলাঞ্চলতলে সে আপনাতঃ নীলাম্বরীর অঞ্চল-প্রান্ত দোলাইয়া দিবেই দিবে, জীবন উৎসের সন্ধান যখন একবার সে পাইয়াছে তখন শত বন্ধন আপনা হইতে খসিয়া যাইবে—নিষেধ মানার দুর্গ ধ্বংসিয়া নারীর নব-অভিব্যক্তির পথ স্রুগম করিয়া দিবে।.....

\* \* \* বাস্তবিক সত্য আকাশ  
আগুণ ছড়াইয়া গিয়াছে—সে সাধনা তার শুভ সমাপ্ত  
হউক। ওই শোনা যায় ঋষির জলদ-গভীর ডাক।

—উত্তীর্ণ জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ! \*

\* প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রন্থ একট বক্তৃতা মর্ম্ম কথা—বিঃসঃ

# দিল্-খেয়ালী

## শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়

( ১ )

আজ্জকে তোমার এ কোন্ খেয়াল  
ও খেয়ালী মন !  
খেয়াল বশে খেলছ তুমি  
আজ্জ হেয়ালী কোন্ ?  
ও খেয়ালী মন !  
ফুল ফুটেছে নদীর ধারে,—  
হৃদয় মাঝে ঢাওকি তারে ?  
চাও কি তুমি চাঁদের সাথে  
ক'রতে আলাপন ?  
আজ্জ কি তোমায় হাতছানি দেয়  
শিউলি ফুলের বন ?  
ও খেয়ালী মন !

( ২ )

ভেবেছিলাম তোমার ব্যথার  
নাইক' বৃষ্টি শেষ ।  
আর কত না পরবে তুমি  
উষার রাঙা বেশ ।  
তোমার মানস-ফুলের মধু  
লুঠবে নাক জ্যোৎস্না-বঁধু,  
উঠবে না আর তোমার বীণার  
মাতন-সুরের রেশ ।  
তোমার ব্যথার ভেবেছিলাম  
নাইক বৃষ্টি শেষ !!

( ৩ )

আবার কেন ভাঙা বীণায়  
গাইতে চাহ গান ?  
অনাদরের শুক-গাঙ্গে  
আরকি আসে বান ?  
হেলায় দ'লে ভালবাসা—  
আবার কেন স্মৃতি আশা ?  
বরণ ক'রে মরন, কেন  
প্রেমের অভিযান ?  
আর কি পারে ছিন্ন-তারে  
গাইতে বীণা গান ?

( ৪ )

সেদিন গেছে, বখন তুমি  
কাটিয়ে দিতে দিন—  
শত ব্যথার ঝড়ের মাঝে  
বাজিয়ে স্বপ্নে বীণ ।  
সেদিন গেছে অতল তলে—  
সখের-আনা-চোখের-জ্বলে,  
ভগ্ন আজি আশার বাসা  
ব্যথায় হ'য়ে লীন ।  
অতল তলে আজ্জকে তোমার  
অতীত-স্মৃতির দিন

( ৫ )

খাম্ খেয়ালী মনরে আমার  
এ কোন্ খেয়াল আজ্জ ?  
চাঁদের পানে চাইতে ফিরে  
হয় না মনে লাজ ?  
কইবে কথা প্রেমের সাথে ?  
চুমতে চাহ মুকুল মাথে ?  
ফুলের বনে ফুলের হাতে  
পরবে ফুল সাজ ?  
এ সব কথা ভাবতে কি গো  
হয় না মনে লাজ ?

( ৬ )

খেয়াল রাখ, খেয়াল-মন  
হেঁয়ালী কাজ কি ।  
সত্যি ক'রে বলতে হবে  
চাইতেছ' আজ্জ কি !  
অনেক কিছু নূতন খেলা  
খেললে তুমি জাগার বেলা ;  
অরণ্য রাগে—তরুন রাগে  
চাইতেছ সাজ কি ।  
খেয়াল রেখে সত্য বল,  
হেঁয়ালী কাজ কি ॥

## বাঙ্গালার মাঝি

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সরকার, বি-এ

পৃথিবীতে বাঙ্গালীর নাম চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ইতিহাসের অভাবে সে কলঙ্ক কল্পনা বলে ক্রমে ঘনীভূত করিয়া লেখকবর্গ তাহাকে হুঁসুটি করিয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গালী আজি অধোপাতিত হইলেও, চিরদিন এরূপ অধঃপতিতভাবে জীবন বাপন করে নাই। তাহার জীবনেও একদিন গৌরবের দিন আসিয়াছিল। সেদিন বাঙ্গালীর বীরবাহু দ্বিধিভ্রমে বিশ্ব বশীভূত করিয়া রাজসিংহাসনে অপরূপ করিতে সমর্থ না হইলেও, জ্ঞানবিগারে ভারতবর্ষের মূল অমূল্যস্বত্ব করিয়া জগতে কীর্তি স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার চিহ্ন প্রশান্ত মহাদাগরের ভগ্নমন্দিরে বা গিরিকোটরে অতাপি পর্য্যটকদিগকে বিশ্বয় উৎপাদক করিয়া থাকে। জাপানেও তাহার চিহ্ন লুপ্ত হয় নাই। (Ideals of the East).

চিরদিন কাহারো সমান যায় না। উত্থান, পতন, উন্নয়ন, পরাজয় প্রকৃতির নিয়ম—নীচৈর্গচ্ছতি উপরি চ দাশা চক্রনেমিক্রমেণ। আজ ভীকৃত বাঙ্গালীর কলঙ্ক—কিন্তু চিরদিন বাঙ্গালী। সত্য সত্যই ভীক ছিল না, তেজ বীৰ্য্য শৌর্য্য বাঙ্গালীর জগতে গৌরব ছিল। কিন্তু বাঙ্গালী আজ সকল ভুলিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালী আত্মবিশ্বস্ত, কারণ বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই। ইতিহাস সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত কালের জঁকুটি উপেক্ষা করিয়া জাতির স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আসিতেছে, ইতিহাস সেই আদর্শ, সেই জাতীয় গৌরব নবীনের সনাক্ষেপ ফুটাইয়া তোলে। কিন্তু বাঙ্গালীর সেই গৌরব গাথা নাই। তাই “বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই নহিলে বাঙ্গালী মাগুয হইবে না। বাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখনও মানুষ্যের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখনও মানুষ্যের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশ রক্তের দোষ আছে।

তিন্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিন্ত নিম্ব বৃক্ষই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদের পূর্বপুরুষ চিরকাল দুর্বল, অসার, আমাদের পূর্বপুরুষদিগের কখনও গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য ভিন্ন অস্ত্র অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করেনা, চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।”

ব্যক্তিক অতীত কার্যের চিন্তা ভাবী কার্যের উত্তেজক। প্রত্যেক দেশেরই ভবিষ্যৎ সেই দেশের অতীত ইতিহাসের উপর নির্ভর করে। “অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পার, পশ্চাদ্ধিকে দৃষ্টি কর, পশ্চাতে যে অনন্ত নিরীক্ষণী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া আকর্ষে তাহার সলিল পান কর, তারপর সম্মুখ প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হও ও ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরবশিখরে আরুঢ় হইয়াছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জলতর, মহত্তর, মহিমাশালী করিবার চেষ্টা কর। আমাদের পূর্বপুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রথমে ইহা জানিতে হইবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রথম জানিতে হইবে, আমরা কি উপাদানে গঠিত, কোন্ রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবহমান। তারপর সেই পূর্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত শোণিতে বিশ্বাসী হইয়া, তাহাদের সেই অতীত কার্যে বিশ্বাসী হইয়া, সেই বিশ্বাস বলে, সেই অতীত মহত্ত্বের অলঙ্কার ধারণা হইতেই পূর্বের যাহা ছিল, তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর নূতন ভারত গঠন করিতে হইবে।”—ভারতে বিবেকানন্দ।

অতীত ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে প্রবীণ ও প্রধান ব্যক্তিদেগের জীবন-বৃত্ত ব্যতীত কিছুই নহে। স্বদেশের অতীত কাহিনীর শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা,

স্বদেশীয় মহাপুরুষগণের আদর্শ জীবন হইতে শিক্ষা লাভ করিলে উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়। বাহার অতীতের গৌরব স্মরণে হৃদয় আর্দ্র হয় না, যে জাতীর কি ইতিহাস, কি সাহিত্য কোনটারই মর্যাদা অনুভব করিতে অনর্থক তাহার জাতি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়াস পণ্ড্রম মাত্র। সাহিত্য ও ইতিহাস জাতীয় চরিত্র গঠনের মূলভিত্তি। এই ভিত্তির উপরে স্প্রতিষ্ঠিত হইলে জাতিমাত্রই গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ। নতুবা, বালুস্তূপের উপরে জাতীয় দৌল নির্মাণ করিলে অচিরে উহার ধ্বংস অনিবার্য।—

A people that can feel no pride in the past, in the history and literature loses the mainstay of its national character —  
*Max Muller.*

সুখের বিষয় বাঙ্গালী এখন প্রাচীন গৌরবগাথাংর অনুসন্ধানে উদ্যত নহে। অনুসন্ধিস্থ বাঙ্গালীর সম্মুখে আজ বাঙ্গালীর শৌর্যকাহিনী স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে। এখন আমরা জানিতে পারি বাঙ্গালীর শৌর্য কল্পনার কাহিনী নহে। রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যে যুগে মিসর ও পারগু জল বিহার করিতে ভীত হইত, তাহার বহু পূর্বেই ভারতবর্ষ সাগরপথ জয় করিয়াছিল। মিসরের প্রাচীন কবি লিখিয়াছিল যে হিন্দুগণ স্থলযুদ্ধ অপেক্ষা জলযুদ্ধেই অধিক প্রতাপশালী হইয়াছিল (Asiatic Research. Vol. XVII. P. 619—620.) কেরি সাহেব কৃত হেডো ভোটার্নের অনুবাদে দেখিতে পাই হিন্দুসেনা পারস্তের সম্রাট Xerxes এর সহিত গ্রীসে গমন করিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব ৭৫ সালে হিন্দুগণ যখন যবদ্বীপে ভারতবর্ষের—জ্ঞান ও সভ্যতা বিস্তার করিতে গিয়াছিল, সেই সঙ্গে বাঙ্গালীও ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। খৃষ্টের পূর্বতন শেষ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে কলিঙ্গগণ যবদ্বীপে অর্ণবপোতে উপস্থিত হইয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, যে

কলিঙ্গাধিপতি রাজ্যরাজ দশম শতাব্দে সমগ্র দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র সম্রাটরূপে পূজাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন—বাঙ্গালী-ই সেই কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।\*

পঞ্চম হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত দুই শতাব্দী সময়ট, তাম্রলিপ্ত ও হরিকেলব—বাঙ্গালার এই প্রধান তিনটা বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এই সকল বন্দরে বাঙ্গালীর পোত অবস্থান করিত এবং বাঙ্গালী বণিক পণ্যসম্ভার লইয়া নানাদেশে বাতায়ানত করিত। রাজ্য বিজয় ও সময় জয়ের জায়া ইচ্ছা ও বাঙ্গালীর অকুতোভয়তা, সাহস ও বাহনগণের পরিচয় দেয় মুসলমানের দিগ্বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বকাল পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের নাবিকগণ পুরাতন বাণিজ্যপথে অগ্রসর হইয়া সিংহল, যবদ্বীপ, ও সুমাত্রার উপনিবেশ সংস্থাপন পূর্বক চীনসাম্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের আদান প্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং তৎসূত্রে ব্রহ্ম ও গ্রামদেশের সমুদ্রোপকূলে বর্ণসঙ্কর জাতির অভ্যুদয় সাপিত হয়

পরাক্রান্ত বীরের সহিত অনায়াসে যুদ্ধে লিপ্ত হইতেও সেকালে বাঙ্গালী পরায়ণ হইত না। একদিন ইন্দ্রাকুবংশাবতংশ রণুর বিরুদ্ধে বাঙ্গালী অস্ত্র ধারণ করিতে সাহসী হইয়াছিল। সেদিন বাঙ্গালীর

\* It was the Bengalis who founded the Kalinga Empire whence they spread their conquests beyond the seas and colonised Java and other islands (Indian Archipelago).—  
Dawn, 1909.

Down to the days of the Mahomedan conquest, went by the ancient highways of the sea, the intrepid mariners of the Bengal Coast, founding their colonies in Ceylon, Java and Sumatra, baring Aryan blood to mingle with that of the seaboard races of Burma and Siam, and binding Cathay and India fast in mutual intercourse. Ideals of the East, P. 64.



নৌ বিভাগ পরাজিত করিয়া রণ জয়ন্তস্ত সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক সেকালে বাঙ্গালীর নৌ-শক্তি হীন ছিল এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। বরং মহাকবি কালিদাস কর্তৃক বঙ্গের সৈনিকের বিশেষ উল্লেখ \* দেখিয়া মনে হয় যে সেকালে বাঙ্গালীর নৌ বাহিনীর গৰ্ব করিবার মত শক্তি ছিল।

সিংহপুরের উক্ত নবরাজ বিজয়সিংহ পিতৃ নির্ধারিত হইয়া পঞ্চদশ শত বীর অমুচর সহ হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি লইয়া বাঙ্গালার পোতাশ্রয় হইতে সমুদ্র যাত্রা করেন এবং বাহুবলে কনকলঙ্কা অবিকার করিয়া তথায় বাঙ্গালীর জয়ন্তস্ত প্রোথিত করেন। তাই কবি গাহিয়াছেন।

একদা বাহার বিজয় সেনানী

হেলায় লঙ্কা করিল জয়,

একদা বাহার অৰ্ণবপোত

বহিল ভারত-সাগরময়।

যে পোতে আরোহণ করিয়া বিজয় সিংহ লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন তাহা এত বৃহৎ ছিল যে, উহাতেই সপ্তশত আরোহীর স্থান হইয়াছিল।\*

ভারতের নৌবলের কাহিনী বহু চিত্রে, বহু স্থাপত্যে, বহু স্বর্ণ মুদ্রায় ও হিন্দু, বৌদ্ধ এবং দৈনিক সাহিত্যে আজিও সুব্যক্ত রহিয়াছে। জনক, সুন্দরক, শঙ্খ, বালহস্ প্রভৃতি বাতকে অনেক বৃহৎ লোকের-সন্ধান পাওয়া যায়। স্বন্দপুরাণের রেখাখণ্ডে দরিদ্র সহদেব ও সখা সোমবর্ষার আখ্যায়িকার দূর সমুদ্র যাত্রার কাহিনীর ইঙ্গিত লাভ করা যায়।

\* বঙ্গাভূত্থায় তরসা নেতা নৌ-সাধনোত্ততান্।

নিচমান জয়ন্তস্তান্ গঙ্গাশ্রোতোহস্তরেষু সঃ ॥

\* The ship in which Prince Vijoy and his followers were sent away by king Sinbahu (Singhabahu) of Bengal was so large as to accomodate full seven hundred passengers, all Vijoy's followers.

The fleet of Vijoy carried no less than fifteen hundred passangers. (Mr. Mukherjee's Indian shipping.)

“বেগশালিনী নদীর প্রবাহ, উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গের লীলাভঙ্গ বাঙ্গালীকে যৌবন দৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল উপনিবেশ স্থাপনের ইচ্ছা, বাণিজ্য শ্রী-লাভের ইচ্ছা তাহাকে সমুদ্রপথ বাতী করিয়াছিল; পরবর্তীকালে আত্মরক্ষা ও রাজ্য জয়ের স্বাভাবিক ধর্ম তাহাকে জলযুদ্ধে তীব্রতা প্রদান করিয়াছিল।”

ঐতিহাসিক মায়ে বলেন, অতিপ্রাচীন কালে ভারতের বণিকগণ পণ্যসম্ভার লইয়া পাশ্চাত্য প্রদেশে গমনাগমন করিত।

মেক্সিকোতে গণেশের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় হস্তী নাই। সুতরাং এমূর্তি তদ্দেশবাসিগণের কল্পনা সম্ভব নহে। তাই অনেকে মনে করেন হিন্দুবণিকগণই ঐ মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা। হিন্দুবণিকগণ ছই সহস্র বৎসর পূর্বেও গ্রেটব্রিটেন ও জর্মনীতে গিয়া বাণিজ্য করিতেন ( বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ৭৬ পৃঃ )।

একদিন বাঙ্গালীর অর্ণবপোতসমূহে সাগর হইতে সাগরান্তরে তরঙ্গ তরঙ্গে লীলাবিভঙ্গে নৃত্য করিয়াছিল। খৃষ্ট পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতেও বাঙ্গালার বণিকুল চীণদেশে গমনাগমন করিত। কথিত আছে যে একদা উপনিবেশিক হিন্দুবণিকগণ চীনপতির সাহায্যার্থ ২৮০০ নৌসেনা এবং কতকগুলি রণতরী প্রেরণ করিয়াছিল। চীন, কোরিয়া, জাপান, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি দেশে তাহাদের ধর্ম আজিও স্তূয়মান। কি কোরিয়ার, কি কোচিন চায়নায়, কি ব্রহ্মদেশে, কি মার্তাবান উপসাগরের কূলে আজিও বাঙ্গালীর স্মৃতি বিদ্যমান। বস্তুতঃ অল্প সমুদ্র যাত্রার প্রভাব বাণিজ্যের সঙ্গে জ্ঞান বিস্তার কার্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া ভারতবর্ষের বাহিরে একটা বৃহত্তর ভারতের রচনা আরম্ভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে দ্বিগুণ পোতের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যে গ্রন্থে ভারতের নৌ-শিল্পের ধ্যান রচিত হইয়াছিল সেই যুক্তকল্পতরুর প্রভাব বলও ছিল

প্রাচীনকালে জলবান ছই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল সামান্ত্র ও বিশেষ। 'সামান্ত্র' জলপথগুলি নদীপথে এবং 'বিশেষ' সমুদ্র পথে চলাচল করিত। কোন কোন যানের ৪টা পর্য্যন্ত গুণবৃক্ষ থাকিত। পোত নিৰ্ম্মানোপযোগী কাঠ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এই সকল পোতে যে কেবল বাণিজ্য-দ্রব্যাদি বহন করা হইত তাহা নহে, আবশ্যক হইলে উহারা কখনো আক্রমণে, কখনো বা আত্মরক্ষায়, এমন কি জলযুদ্ধে কখন কখন ব্যবহৃত হইত।

যুদ্ধ জাহাজগুলিকে 'নৌবাট', 'নৌবাটক' বা নৌ-বিতান বলা হইত। নৌ-সেনার অধ্যক্ষ 'নাবাধ্যক্ষ' বা 'তারক' নামে পরিচিত হইতেন। পোত নিৰ্ম্মাণ স্থান সমূহ 'নাবতাক্কেদী' নামে কথিত হইত।

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে ও গাথায় আজিও বঙ্গের নৌবলের কাহিনী পাওয়া যায়। কবি নারায়ণ দেন ও বংশীদাস, কেতকদাস ও ক্ষেমানন্দ নৌবাণিজ্যের ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। খুলনার কাত-রোক্তিতে দেখিতে পাই,—

বহুত মিনতি মালি অর্গবে না লও ডিঙ্গি

পাটা যার শতেক যোজন।

অথবা বিজয়াগুপ্তের 'মনসা মঙ্গলে'—

চুয়ার বদলে চন্দন পাব

ধুতির বদলে গড়া

শুকুতি বদলে মুকুতা পাব

ভেড়ার বদলে ঘোড়া।

কিন্তু মাণিকগঙ্গুলির 'ধর্ম্মমঙ্গলে'—

আনল নিশাণে নৌকা ছোটে ঐরাবত।

শিশারু মালুখ কাঠে দিশা কঁরে পথ ॥

মাল দহের 'গস্তীরায'

গোড় কিনারা ছায় ভাগীরথী নদী।

জাহাজ সে ছানিয়া ছায় ধনপতি ॥

ঘাট বন্ধ কিয়া জাহাজ বেহারাসে।

নাহি আদমি পাবে পাণি ভরণে ॥

অথবা কবি কঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে—

বদল আশে নানা ধন এনেছি সিংহলে।

যা দিলে যা বদল হবে শুনহ কুতূহলে ॥

আমরা যগে যগে বাঙ্গালার নৌ-সাধনের পরিচয় পাই। চম্পকনগরের বণিক চাঁদ সদাগরের নাম কে না জানে? তিনি সেকালে 'কুশাই কামিলা'র দ্বারা নৌ নিৰ্ম্মাণ করাইতেন। গোড় তখন নৌনিৰ্ম্মাণের জ্ঞাত অতি প্রসিদ্ধ ছিল।

ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব বলেন, সেকালে নৌপরিচালনা ও সমুদ্রপথে বাণিজ্য রাজকুমার দিগের নিত্যশিক্ষার বিষয় ছিল। খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে কলিঙ্গ বা উড়িষ্যার বীর উপনিবেশিকগণ বঙ্গে ও নবদ্বীপে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন (Hunter's Orissa, vol I. P. 216.) পঞ্চশতাব্দী পরেও ঐ নৌ-বিজ্ঞান স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তখন বঙ্গের অত্যন্ত পোতাশ্রয় তাম্রলিপ্ত হইতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান অর্গবপোতে আরোহণ করিয়া নবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন।

বক্তার খিলজীর দেহাবসানের পর গিয়াসউদ্দীন যখন গোড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তখন দিল্লীর সুলতান আলতামাস লক্ষণাবতী আক্রমণ করিলে বঙ্গের নৌশক্তি তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করিয়াছিল। ইহার প্রায় ৩৭ বৎসর পরে বঙ্গের সুলতান তোখন খাঁর রণতরী এবং সেনা অযোধ্যার সীমান্তে কাড়া প্রদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল।



# সোনার বাঙলা

## শ্রীবৈষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম দৃশ্য

সময়—গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন। রোজ কাঁ কাঁ করিতেছে।  
নির্জন পল্লীপথের তপ্তধূলিকণার উপর দিয়া ভুবন  
লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছিল। মাঠের পার্শ্বের  
পুকুরটার লালজল একপুরু সর বুকে লইয়া আসন্ন-  
বাধির শুভাগমন সূচনা করিতেছে। মশককুল  
তাহা হইতে উথিত হইয়া পল্লীবাসীকে বেশ একটু  
সজাগ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। ভুবনের সে দিকে  
দৃষ্টি নাই। হাঁপাইতে হাঁপাইতে দ্বারে আসিয়া সে  
একেবারে নিশ্চেষ্টের ন্যায় ভাঙ্গা মাটির দাওয়ার উপর  
বসিয়া পড়িল। ভয়ী পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া  
তাহার মুখের পানে চাইয়া ‘থ’ হইয়া দাঁড়াইয়া  
রহিলেন। পার্শ্বের রান্নাঘর হইতে পত্নী উকি মারিয়া  
দেগিতেছিল। একটা কথা জিজ্ঞাসার জ্ঞাত প্রাণটা  
তাহার চঞ্চল হইয়া পড়িলেও ভুবনের ভাব দেগিয়া  
সে তাহা করিতে পারিতেছিল না।

দিদি—খোঁজ কিছু পেলি ভুবন, নন্দরা কোন  
পবর পাঠালে?

ভুবন—না দিদি, এত বড় জোরবরাত অগ্নে যে  
করে করুক, তোমার ভাই করে নি! আঃ! মাঃ!  
(খানিক নীরবে কাটিয়া গেল) ভুবনের কিন্তু  
এ নীরবতা সহ হইল না; সে উত্তেজিত ভাবে  
বলিয়া উঠিল—বাস্, এইটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়ে গেলে  
দিদি? মুর্খকুণ্ডে ভাইয়ের কোন যোগ্যতা নেই  
বলে ছ’-দশটা গালই নয় দাও, একা যদি নাই  
পার, ভাই বলে মায়া হয়, মেয়ের গর্ভধারিনীকে  
ডাক, সে এসে সাহায্য করুক।

দিদি—ভাবিস্নি ভুবন, ভগবান্ আগে বর গোড়ে  
তবে ওকে সৃষ্টি করেছেন! একদিন না একদিন  
জুটবেই! তবে ছ’দিন আগে আর পিছে।

ভুবন—ভুল দিদি, ভুল! জীবনে ভগবান্ অন্ততঃ  
এই একটা ভুল ক’রেছেন। তুমি দেখে নিও, বেদ  
যদি মিথ্যে হয়, হবে; ওর বর কিন্তু জুটবে না।

দিদি—বালাই, বাট! ঠিক দুপুরবেলা বাপ হয়ে  
ওকি কথা! এই ত কত আসছে, আমাদের অবস্থায়  
কলুষে না, এই যা! যার হাঁড়িতে মিলু আমাদের  
চাল দিয়েছে, একদিন না একদিন তার টান পড়বেই,  
গুরে দিলে এসে জুটতেই হবে।

ভুবন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল তোমার  
ভাস্কর পো বলেই সেখানে গিয়েছিলুম দিদি। তারা  
দেখালে কি জান,—সে এক লম্বা চওড়া ফর্দ; হাজার  
ছই হবে। বললে কাকীমার ভাই, তাই এত সন্তায়  
স্বীকার করছি, এর কমে কি আর মেয়ের  
বিয়ে হয়?

দিদি—আমারই ভুল ভুবন, তাই মরতে তোকে  
সেখানে পাঠিয়ে ভিলুম! যাক, ভালই হয়েছে যে  
চামারের বাড়ী আমিই টিকতে পারিনি, অতটুকু মেয়ে  
মলু টিকতে কি ক’রে।

ভুবন—টেকা টেকি পরের কথা দিদি, প্রবেশ-পথই  
বন্ধ। আজকাল মেয়ের ছাড়-পত্রের দাম শুনেছ ত,  
খুব সন্তায় যদি হয়, একটা মোদো-মাতালের হাতে  
যদি তুলে দেওয়া যায়, তবুও হাজার টাকা! তার  
কম গুঁজলে তোমার ভাস্করপোর ভাষায় বলি, মাগ্নধ  
জুটবে না, শ্রাল, কুকুর, গাধা, ঘোড়া যা হয় একটাকে  
ধরে এনে বিয়ে দিতে হবে।

দিদি—এ্যা! নন্দ, একথা বললে! তুই তাই শুনে  
কোন জবাব না দিয়ে এমনই চলে এলি?

ভুবন—না এসে কি করব দিদি, বাঙলা-দেশে  
মেয়ের বাপ হ’য়ে জন্মেছি যে! আমার হাত-পা মুখ

সব বাঁধা, সব বাঁধা ! (মিহ্ন এই সময় পুকুর হইতে বাসন মাজিয়া ফিরিতেছিল, দিদি কি কথা তুলিতে দিলেন, ভুবন নিষেধ করিয়া পরম আগ্রহে মেয়েকে ডাকিয়া বলিল), বাঃ! লক্ষ্মী-মা আমার সব কাজ সেরে এসেছে। যা ত, একটু তেল নিয়ে আয় ত মা ! (মিহ্ন তাড়াতাড়ি তৈল আনিতে গেল ততক্ষণের রুদ্ধ অশ্রু কিন্তু আর গোপন রহিল না, ভুবনের চোখ ঠেলিয়া টপ্ টপ্ করিয়া মাটির উপর বরিয়া পড়িতে লাগিল)

### দ্বিতীয় দৃশ্য

বাঁট পাতিয়া দিদি বিন্দুবাসিনী আনাঙ্গ কুটিতে ছিলেন। দোয়াল গাই ছইয়া রাখিয়া গেল। একটা বিড়াল চক্ষু বুজিয়া ছ'এক বার শূন্যে নাকটা তুলিয়া সে হৃদয় অনারাস-লভ্য কি না বিচার করিয়া লইল, কিন্তু, কত্রীর হস্ত তাড়নার কথা স্মরণ হওয়ায় বিষম মনে এক পার্শ্বে গিয়া চুপ করিয়া বসিল। মাথার উপর একটা টিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—‘ও বোঁ খেলে, খেলে।’ বাড়ীর বোঁটা তখন ম্যালেরিয়া স্তন্দরীর কবলে পড়িয়া অসহ পল্লবায় ছটফট করিতেছিল। পাণীর ডাকে সাড়া দিতে পারিল না। পিসীমা নিজেই ‘দূর, দূর’ করিয়া উঠিলেন এমন সময় ভুবন বাড়ী ঢুকিয়া বলিল,—আজ বনগা পেকে দণ্ডে আস্ছে দিদি, কিছু ফল-টেলের যোগাড় আছে ত ?

দিদি—খুব, খুব, বাড়ীতে আম-কাঁঠাল আনরসের ছড়াছড়ি; খায় কে, তার ঠিকানা নেই। কথায় বলে ওই যে, বাড়ীর গাছা, আর পেটের বাছা থাকতে বিপদ কিসের ?

ভুবন—পেটের বাছায় যে পথে টেনে নিয়ে চলেছে তাতেই অস্থির। ভাগ্যে বাড়ীর গাছের জন্তে বরের বাপের খোসামোদ করতে হয় না, তাই রক্ষে !

দিদি—কি যে বলিস্ ! দেখে নিস্, দেখে নিস্ মিহ্ন আমার রাজরানী হবে। হ্যাঁয়ে, ছেলেটা কেমন কিছু পাশ-টাশ ?

ভুবন—তা আছে দিদি, ভাবনা নেই। মদ-গাজা-চণ্ড-চরসে পয়লা-নম্বর সার্টিফিকেট আছে।

দিদি—সে কি রে ! জেনে-শুনে বাপ হয়ে এমন ছেলেতে মেয়ে দিবি ?

ভুবন—কি করব দিদি, আমি যে অর্থহীন ! তোমাদের দয়াল সমাজ কি বলেছেন জান—হর ঠাকুরের সপ্তম সংসারটা থালি হয়েছে, ঘর-বর ছই ভাল, মেয়ে খেয়ে-পরে স্বর্গে থাকবে।

দিদি—বলিস্ কি, হরজ্যোষ্ঠা আবার বিয়ে করবে ! এমন বাটের মড়ার হাতে মেয়ে তুলে দিতে বললে ! সমাজের কারুর কি ছেলে-মেয়ে নেই ?

ভুবন। আছে দিদি, সেই সঙ্গে আরও একটা আছে যেটা তোমার আমার ঘরে অভাব। ওদের সঙ্গে আমার তুলনা কর না, আমি লক্ষ্মীভাড়া !

এই সময় কতকগুলি যুবক গান করিতে-করিতে প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল।

“.....মামুষ আমরা নহি ত মেধ !”

দিদি—কি রে, কি হয়েছে রে, সবাই যে একেবারে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিচ্ছিস্ দেখছি ?

যুবক—দেশের এ ছাঁদিনে না বেরিয়ে আর করি কি ! জাপানের মত অতবড় একটা দেশ ভূমিকম্পে ওর নাম কি একেবারে পঙ্গ হয়ে গেছে ! এগন না দেখলে—

দিদি—ও মা, কি সর্বনাশ ! এমন কাণ্ড ত কখন শুনিনি ! হবে না, যেস্তর ব্রহ্ম শাপ লেগেছে নিশ্চয়। —কোথায় বললি ?

যুবক হাসিয়া কহিল—সে দেশ তোমার ও বামুন-ফামুন মানে না, সে স্বাধীন জাত পিসী, টিকিগুলো একদিনেই শেষ করে মাথাটা হাক্কা করে দেবে, যত.....

দিদি—ঘাট, ঘাট ! মার একটা ছেলে তুই, আর ও কথা মুখে আনিস্ নি ! সে স্নেহের জন্তে, তোদের এত মাথা ব্যথা কেন বল ত ? আমাদের

মিষ্টুর জন্তে একটা ভাল বরটর দেখনা বাবা, ভুবন আমার ভাবনায়-ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছে !

অন্ত একটা বুঝক—এই সেরেছে ! কেবল বিয়ে আর বিয়ে ! এই সব কারণেই ত এদেশ এত পিছিয়ে আছে । চল হে, চল, আমাদের যে ‘রেজিলিউসন’ ক্লাব থেকে পাস হয়েছে, তার এক চুল এদিক করলে চলবে না ।

( সকলে “মানুষ আমরা নহিত মেঘ” গান

করিতে—করিতে চলিয়া গেল )

ভুবন—দেখলে দিদি, স্বাধীনতার হাওয়া কেমন বইছে ! আর ভাবা নয়, ওই বনগাঁর ওদের ওখানেই মেয়ে দেবো । তবু ত ছুদিন মাছ-ভাত খেতে পাবে !

### তৃতীয় দৃশ্য

চ’থের উপর চসমা লাগাইয়া বর পক্ষীয় একজন মেয়ের রঙ পরীক্ষা করিতেছিলেন ; যদিও তাঁহার নিজের রঙ পোড়া ইঁড়ির তলা অপেক্ষা অধিক পরিষ্কার ছিল না । আর কয়জন তাঁহারই পার্শ্বে বসিয়া পরীক্ষকের কিছু ভুল-চুক থাকিয়া যায় কি না তাহাই লক্ষ্য করিতেছিলেন । পরণে কাহার ছিটের জামা, তাহাও তিন স্থানে তালি দেওয়া ; কাহার একখানি চাদর, কাপড় অপেক্ষা সেখানি বেশী রকম উজ্জ্বল, কিন্তু দু-একস্থানে ইন্দুরে কাটা । ইত্যাদি ।

বর পক্ষীয় পরীক্ষক—যাক, এত গোলমালে কায় কি ? এখনই সব সন্দেশ মিটে যাবে, এক বালতি জ্বল, আর একখানা সাবান আনিব ত

ভুবন—আজ্ঞে, শেষের ও জিনিষটার পয়সা জোটান আমার মত ঘরে অসম্ভব । যদি বলেন ত চারটা খোল আনিরে দি ।

বঃ পঃ পঃ - থাক, বুঝছি, এতেই কোনো রকমে চলে যাবে । তবে দেনা পাওনার কথাটা মেটাতে হয় ।

ভুবন—আজ্ঞে বলেছি ত, শুধু হরতকীর বেশী আমি আর কিছুই দিতে পারব না ।

বঃ পঃ পঃ—তার গায়ের এ গুলো ?

ভুবন আজ্ঞে এগুলো আমাদের নয় । আর আপনারা আসছেন বলে পাশের বাড়ীর গুঁরা দয়া করে পাঠিয়ে দিয়েছেন ।

বঃ পঃ পঃ—সেই রকম পাঁচ জনে দয়া করে ওগুলো নয় দানই করলেন ।

ভুবন—এই হাজার দেড় হাজার টাকা দামের গয়নাই যদি ঘোটাতে পারব মশাই, তবে মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে অমন সাটিককেটওয়ালা ছেলের হাতে দিতে যাব কেন ?

বঃ পঃ পঃ—কি ! বাড়ীতে এনে অপমান ! চল হে, চল চল ! এখানে ভদ্র লোক আসে ! ( সকলে ক্রোধে অন্ধ হইয়া স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ) ।

দিদি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন .

ভুবন একবার সেই দিকে চাহিয়াই হাসিয়া উঠিল ।

তারপর ধীরে ধীরে কহিল—শেষে হক্কাবুরের পায়েই পড়তে হ’ল দিদি । নিজের মুখে যখন সে দুখানা গিনির লোভ দেখিয়েছে, তখন ছাড়ি কি করে ? তা ছাড়া, পেটে না ধরে মজা আমার একপাল বুড়ো বুড়ো ছেলে মেয়ের মা হয়ে দাঁড়াবে, সেইটাই কি কম লাভ ?

দিদি আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—  
তো’র এত দিনের শিব পূজোর ফল কি এই হলোরে মজা !

ভুবন—আমার মেয়ের অকল্যাণ করো না দিদি, শিব আরাধনার ফল এর চেয়ে আর ভাল কি হবে, তাই বল ? নিজের যেমন বয়সের গাছ-পাখর নেই, বরও ত তেমনই জোটাবেন ? দেখো, দেখো, দু’দিনেই মায়ের আমার হাতের মালা আর রুদ্রাক্ষ সার হবে । বেশ হবে ! বেশ হবে ! ( বলিতে-  
বলিতে উত্তেজিত ভাবে সে বাহির হইয়া পড়িল )

চতুর্থ দৃশ্য

বহিবাটীতে সকলেই কশ্মে ব্যস্ত। ভুবন চোরের মত চাহিতে চাহিতে ঢেঁকি শালের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। মাথার উপর দিয়া একটা কালাপেঁচা সশব্দে ডাকিয়া উড়িয়া গেল। মেয়ে তবু পাইয়া বাপের বকের ভিতর মুখ লুকাইল।

ভুবন—এটুকু খেয়ে নে ত মা! কাবের ভিড়ে সবাই খাস্ত আছে, কেউ দেখতে পাবে না! এই বেলা খেয়ে নে, খেয়ে নে!

মিন্নু—এ কি বাবা?

ভুবন—জিজ্ঞাসা করিস্ নি, মুখ বুজে খেয়ে নে! বাবা হয়ে তোর অমঙ্গল দেখতে পারব না রে, নে-খা!

মিন্নু—গলা যে জলে উঠল বাবা, না আমি খাব না!

ভুবন—অনুক, অনুক, কিন্তু চিরদিনের জালায় থেকে এটা তোকে শাস্তি দেবে! নে, দেবী করিস্ নি; এ টুকু চোঁ করে টেনে নে! আমি চোক বুজে আছি, খা. খা! সোন খায়, যাহু খায়, মা খায়!

এমন সময় কে একজন সেই গৃহে প্রবেশ

করিলেন। ভুবন একবার সেই দিকে চাহিয়া ‘হো-হো’ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর বলিল, আমি মেয়েকে শস্তর-বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করাছি মিত্রির!

মিত্রজা—ওকি, তুমি কি ক্ষেপেছ! বাপ হয়ে বিষ মেয়ের মুখে তুলে দেয়! জান, তোমাকে আমি পুলিশে দিতে পারি!

টিকু সেই সময় বিষের জালা সহ্য করিতে না পারিয়া মিন্নু ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। ভুবন সেই দিকে চাহিয়া ধীরে-ধীরে কহিল—চুপ, চুপ, কথা বল না, মা আমার শস্তরবাড়ী চলেছে! এ যার সঙ্গে বিয়ে দিলাম তাতে চিরআরতি আর গৃহে না, দেখে নিও বরং! (পুনরায় উন্মাদের মত অটহাস্য করিয়া উঠিল)

মিত্রজা সে দিকে আগ্না না চাহিয়া ছুটিয়া বাহিরে গিয়া ডাকিলেন—ডাক্তার! ডাক্তার! শীগৃগির একজন ডাক্তার!

নিকটস্থ থিয়েটারের আৰুড়া হইতে তখনও গানের সুর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল “ধন ধাত্তে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা!.....

## সন্ধ্যা

### শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য

সন্ধ্যা এলো মন্দ ধীরা চিত্ত-জুড়ানী  
ঘরে ফিরলো রাখাল ধেনুর সনে,—ফিরলো কুড়ানী!  
খেলাভাঙার বাজলো বাকী  
ছেলের দলে কী উল্লাসী,  
ধরলো ঘরের পথ :—  
ধীর স্নিগ্ধ হাওয়া বইলো,—ফুলের পরাগ-উড়ানী!  
গুঞ্জিত কোন্ কুঞ্জভবন পুষ্প-শোভনা!  
কোন্ দূরের আলো আবছায়া-লীন, দৃষ্টি-লোভনা!  
দূর-আকাশের তীরে তীরে  
আল্ছে তারার দীপালি রে  
দিগ্বরা সব :—  
কোন্ পথ-হারাগো আপনজনের বেদন-কোভণা!

পড়েছে ওই পথের’পরে কেমন লতা’য়ে  
কোন্ অজান-ফুলের অব্য-স্রাগে সবুজ-লতা এ!  
বাস্ত-চপল চরণ তলে  
কোন্ সে নিদয় পাথক চলে  
অঙ্গ দ’লে তা’র :—  
ও সে জানলো না তা’র বৃষ্টি কেমন উঠলো ব্যথা’য়ে।  
অন্ত-অরুণ-অঙ্গ মাথা রক্ত-লালিমা!  
ছার বসুন্ধরার অঙ্গকারের কোন্ সে কালিমা!  
শ্রান্ত শিথল পক্ষে ধীরে  
সাঁঝের পাখী বাচ্ছে নীড়ে  
কী-সুর ছড়া’য়ে :—  
তোরা পথহারাদের পথ দেখা—সাঁঝ প্রদীপ জালি’ মা!

## দীপ্তি

(পুলকপ্রকাশিতের পর)

### শ্রীমতী শরৎকুমারী সেন

সন্ধ্যার পর বিছানায় শুইয়া জননী স্নেহভরে পুত্রের মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—  
“মাথাটা ভাল করে বালিশে তুলে নে নারে? কি শোবার শ্রী দেখ। এখনো তুই কচি খোকা নাকি?”

অরুণ মাথাটা বালিসে উঠাইয়া বলিল “আমার ত তাই মনে হয় মা।” “বা, বা—ছেলেমী রেখেদে, এখন কয়টা কাজের কথা বলি—লক্ষ্মী ছেলেটীর মতো জবাব দাও ত? এখন তোমার বিয়ে কয়টা দরকার। কোথায় ‘বে’ করবে—এ সম্বন্ধে তোমার মতামতই প্রধান। তোমাকে অস্থগী দেখলে আমি স্থগী হ’তে পারবো না।

অরুণ চোখ মুদিয়া একবারে চুপ।

মা, পুত্রের মাথাটা নাড়া দিয়া বলিলেন—“স্বমূলি না কি রে?” “না,—বিয়ে বিয়ে করে কি আলাতনেই ফেলেছো মা! আমি যদি বলি আমি ব্রাহ্ম পরিবারে বিয়ে করব তোমার কি আপত্তি”—

“ওকি কথা বলিস্নে? ব্রাহ্ম কেন? কেন হিন্দু ঘরেও কি এখন মেয়ে কোন অংশে অযোগ্য আছে বলিস্ন? মলিনার মত কয়টা মেয়ে ব্রাহ্ম পরিবারেও খুঁজে মেলে কিনা সন্দেহ। কত সম্ভ্রান্ত সমাজের উপযুক্ত ছেলে এখন তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত। কেবল ওর বাবা, মা, এখনো আমার আশা পথ চেয়ে বসে আছেন।”

অরুণ এক চোট হাসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, “মলিনা? ওকে বিয়ে করবার কথা একদিনও ত আমার মনে আসেনি মা।” সেই যে একটা কাঁছনে মেয়ে, আমার সাথে ঝগড়া করে মরতো, ওকে আমি কখনো

বিয়ে করব না, আমার পিঠে যে আঁচর মেরেছিল, এখনো তার দাগ স্পষ্টই আছে।”

ছেলের কথা শুনিয়া জননী ভিতরের হাসি চাপা দিয়া, যথাসম্ভব সংযত হইয়া বলিলেন “সে ছোট্ট মেয়েটা এখনও আর অবুঝ নেই, এখন সে প্রশংসার সহিত আই, এ পাশ করেছে। কোন গুণে সে শ্রেষ্ঠা নয়?”

অরুণ পাশ ফিরিয়া বলিল—“সে দেখা বাবে। তবে এই জেনো মা, তোমার ছেলে কখনো তোমাকে আঘাত দেবে না।”

মা পুত্রকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন—  
“অরুণ, বাবা আমার! তোর যা ভাল মনে হয় তাই করবি।”

ভৃত্য আসিয়া জানাইল ডাক্তার বাবুর মেয়েরা সব আসিয়াছেন। মলিনার হাত ধরিয়া তার মা ধরে প্রবেশ করিলেন।

মলিনার সাজ-সজ্জা আজ পৃথক রকমের। পরিধানে গেরুয়া রংএর শাড়ী। ব্লাউসে ঐ রং, জড়ির পাড়। পায়ে সাদা জুতা।

ধোয়ানো চুল গুলি সারা পৃষ্ঠে এলায়িত। অরুণ আজ মলিনাকে যেন নূতন করিয়া বিশেষ ভাবে দেখিয়া লইল।

মনে ভাবিল—মলিনা স্কুলের বটে। কোন উচ্চ শিক্ষিত যুবকই তাকে অপছন্দ কর্তে পারে না ঠিক। তবে আমি.....আমিতো মলিনাকে তেমন ভাবে কখনো চেয়ে দেখিনি। মলিনাকে বউ করলে মা যদি অতই স্থগী হন, আমারই বা এতে আপত্তির কি কথা থাকতে পারে? যাক একটু বাইরে আসি ঘুরে।

ফিরিয়া আসিয়া সে ঐ উচাটন মনে হ'ল ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মা তখনো মিসেস্ চ্যাটার্জিকে নিয়ে গল্পে ব্যস্ত। নিজের রিডিং রুমের দিকে দৃষ্টিপাত করে' মলিনা কার একখানি ফটো গ্যাসের আলোতে খুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছে।

চেয়ারে উপবিষ্টা ঐ নারীকে সহসা রাজরানীর মতই ঐ গৃহ ঋণির অধিস্থরী বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

অরুণকে ঐ দিকেই অগ্রসর হইতে দেখিয়া মলিনা হাতের মধ্যে ফটোখানি তাড়াতাড়ি সামনের টেবিলক্লথটার নীচে লুকাইয়া রাখিল।

অরুণ হো, হো করিয়া হাসিয়া বলিল—কি চালাকি কত্তেই শিখেছ মাণ? তুমি তো সেই ব্রষ্ট্র মলিনাই র'য়ে গেছ দেখচি। বলিয়া ফটোখানি টানিয়া বাহির করিল।

“এই যে, এতো আমারি বিলেত বাবার সময়-কার ফটো? কেন তুমি আর দেখনি নাকি? আমাকে দেখে লুকানো হচ্ছে কেন? এর মানে?”

মলিনা বিষম অপ্রতিভ হইয়া বলিল—“আপনিই বা এ জন্তে আমাকে অনর্থক জ্ঞদ কচ্ছেন কেন? এতে এমন কি দোষ হয়েছে?”

মাথা চুলকাইয়া অরুণ বলিল—“ওরে বাবা, আমি আবার আপ'নি সম্বোধনে সম্মানিত হ'লেম কবে হ'তে মলিনা?”

মলিনা মুখ নীচু করিয়া বলিল—“তা করতে হয় বৈকি, বিলেত যুড়ে এলেন বড় বড় কামিলীতে মেলা মেশা কচ্ছেন, সম্মান না রাখলে চলবে কেন?”

এটা কোন্ ফ্যামিলীর ইঙ্গিত,—অরুণ বুঝিল। পরে বলিল “এত পর মনে কচ্ছো যে মলিনা? মাইরি, আমি কিন্তু তোমার সে অরুণদা'ই আছি। আমার উপর রাগ করেছ কি?”

মলিনা বিশেষ কোন কথাই বলিল না। একটু চুপ থাকিয়া—পরে বলিল “না আমি কিচ্ছুই

আপনাকে ভাবিনি। আচ্ছা তবে আসি—বলিয়া অরুণকে কোন একটা কথা বদিলার অবকাশ না দিয়াই চঞ্চল পদে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

অরুণ চেয়ারে বসিয়া ছ'টা নারীর বিষয় মনে আলোচনা করিতে লাগিল।

একটা মলিনা!—অপরটা মিলি!...

শৈশব হইতে এই মলিনা তার মঙ্গিনী। মলিনা কি মতি! তাকে ভালবাসে?

মিলি কে?.....

স্নেহময়ী জননীর আগ্রহ অরণ করিয়া ভাবিল, বতটা সম্ভব সে রায় পরিবারের ঘনিষ্ঠতা হইতে দূরে থাকিবে।—

অরুণ এখন বাকুড়াতে জয়েন্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট। আজ এক বছর সে এখানে। মার মনিস্কর অচুরোধ পর আসিয়া পৌঁছিয়াছে—ছমাসের ছুটা নিয়ে বাড়ী চলে এসো, আমার শরীর, মন উভয়ই অসুস্থ। কয়েক দিনের ছুটা নিয়া অরুণ বাড়ী চলিয়া গেল।

\* \* \* \*

মাকে অনমনসে শবায় শয়ান দেখিয়া অরুণ মার শিয়রে গিয়া হাত পাখাখানা তুলিয়া বলিল—“মা, তোমার কি—অসুখ করেছে?”

মা একটু ক্লান্ত স্বরে জবাব দিলেন—“আজ বিকেলে ডাক্তার চ্যাটার্জিকে ডেকে আনিম্ ত? তিনি সব বুঝতে পারবেন।” অরুণ মনে ভাবিল—মলিনার বাবাকে কি প্রয়োজন? তেমন রোগ ত মা'র দেখতে পাইনে।

চারটে বাজিতে অরুণ ডাঃ চ্যাটার্জির বাড়ী উপস্থিত। দালানের সিঁড়িতে পা দিতেই স্মৃষ্টি গানের সুর শুনিতে পাইয়া থম্কিয়া দাঁড়াইল—কে গায়?.....

“বদি পরানে না জাগে আকুল পিয়াস!—

চোখে দেখা দিতে স্তধু এসো না”——



গানের বর্ণে বর্ণে গায়িকার সক্রিয় হৃদয় বেদনার স্রব ভাসিয়া আসিয়া অরণের হৃদয়-তারে মুহু মুহু আঘাত করিয়া উঠিল।

অগ্রসর হইয়া অরণ মলিনার কক্ষে ঢুকিয়া মুহু হাত্রে বলিল—“মলিনা! থেমে গেলে কেন? সবটাই গাওনা শুনি?”

মলিনা একটু লজ্জিত কণ্ঠে বলিল—“আপনি কখন এলেন? জানতেও পারিনি। বসুন।”

“তোমার বাবা কোথায় মলিনা? তাঁকেই নিতে এসেছি।” “বাবা, মা, মামাবাবুর বাসায় গ্যাছেন।”

“সেখানে কোন দরকার আছে নাকি?” “হাঁ, মণ্ডাহের মধ্যেই আমরা দার্জিলিং যাচ্ছি।”

“দার্জিলিং কেন?” “চেঞ্জে যাচ্ছি মনটন ভাল না।”

“তোমার পড়াশোনা ছেড়ে দিলে নাকি?” “এক রকম ছাড়ার মতো।”

অরণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিল—“এই কি তোমার ঠিক মত নাকি?”

“তা একটা গ্যারাণ্টি দিয়ে ফেলতে পারিনে সত্য, তবে ইচ্ছা। আপনি কি বলেন?”

উদাস কণ্ঠে অরণ উত্তর করিল—“আমি—?”

“আমি কেন বলতে যাব মলিনা! আমার বলাও ত অনধিকার চর্চা।”

মলিনা কপালের ঘাম কমালে মুছিয়া, চেয়ারটায় ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

অরণ নিঃশব্দ।

খানিক পরে মলিনা নিজেই প্রশ্ন করিল—“আপনি ক’দিন বাড়ী থাকবেন?” “খুব শীগ্গীর যাব। আর হয় তো শীগ্গীর তোমাদের সাথে দেখাই হবে না—আচ্ছা আসি—” বলিয়া অরণ একটা ছোট্ট নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

এ নিশ্বাসের জোয়ারটুকু মলিনা লক্ষ্য করিল। পরে অগ্রসর হইয়া অরণের পায়ে প্রণাম করিয়া

বলিল—“দোষ ক্রটি আপনার পায়ে অনেক দিন—অনেক করেছি, আজ মাংপ চাচ্ছি।”

বিদায় কালে.....

আর একটা কথাও মলিনা বলিতে পারিল না। একটা উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ দমন করিতে গিয়া—ঝর্ঝর্ করিয়া তার অশ্রু বরিয়া পড়িল। এ লজ্জা ঢাকা দিতে, মুখ ফিরাইয়া, দ্রুত পদে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। অরণ ক্যান্স ফ্যান্স করিয়া চাহিয়া রহিল।

( ৮ )

“নমস্কার মিষ্টার রায়! আপনারদের সাথে, বছর পরে দেখা।” “এঁা, অরণ নাকি? অনেকদিন তোমার খবর পাইনি।”

“মিস্ রায়কে দেখতে পাচ্ছি নে যে?”

মিঃ রায় বলিল “মিলি তার বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গেছে। শুনে সুখী হবে যে, আমি ছে মাসের দশ তারিখে মিলির বিবাহ। শীগ্গীরই আমরা বোম্বে চলে যাচ্ছি। অমর ছেলের চমৎকার! বেশ সুখী, সবল চেহারা। অল্প দিন হয় ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছে।” একটু কাশিয়া পরে আবার বলিলেন—“কি আশ্চর্য! ভবিষ্যৎ বলতে যে একটা কথা আছে,—ঠিক। পুরীতে যখন অমরদের সহিত পরিচয় হয় তখন অমরের বয়স অল্প। মিলিও ছোট। ছ’জনাতে বেশ ভাব ছিল। কিন্তু কে জানতো এ ছুটিতে ‘বে’ হবে। বিয়ের কথা তখন মনেও আসেনি। সেদিন অমরের বাবা যখন হঠাৎ এসে বলেন—আমার অমর একমাত্র মিলির পাণি প্রার্থী। সহসা, কি যে বলব বাবা, ভেবেই পাচ্ছিলুম না। কারণ ছ’মাস আগে মেয়ে আমার জানিয়েছে সে কথখনো বিয়ে করবে না। শুনে মাথা আমার গরম হয়ে গিয়েছিল—”

অরণ আগ্রহ ভরে মিঃ রায়ের সব কথা শুনিতে-ছিল, বলিল “তার পর?”

“তারপর বাবা, মেয়েকে অনেক বুঝিয়ে বললুম

—দেখ, মা, লেখাপড়া তোমরা যতই শিখে থাক, প্রকৃতির রাজ্যে, তার নিয়ম লঙ্ঘন করা ঠিক নয়। আর আমরা কি চিরদিনই বেঁচে থাকব? তোমাকে একটা নির্ভরে, সহজ, সংসারী দেখে যেতে পারলেই শান্তি, এবং আমাদের অবসর। কি বল অরুণ ঠিক, কিনা?

অরুণ অত্যন্ত মনস্তভাবে জবাব দিল—“হাঁ তাতে নিশ্চয়ই।”

“দেখ অরুণ, পরে ওর বন্ধু মিসেস্ মিত্রকে এনে সব কথা বল্লুম। মিলির ঘর হ’তে বেরিয়ে যাবার সময় তিনি, বিয়ের ঐ তারিখই ঠিক রাখতে বলেন। বাবা, বিয়ের দিন তোমার কিন্তু উপস্থিত থাকতে হবে।”

বিনীত স্বরে অরুণ উত্তর করিল—“আমি সেদিন উপস্থিত থাকতে পারলে খুবই সুখী হতুম বটে, কিন্তু সে ঘটে উঠবে না। সপ্তাহের মধ্যে আমাকে কাজে জয়েন্ কৰ্ত্তে হবে।”

“ওঃ—তাইত বড় দুঃখের বিষয়।” “এখন উঠি, নমস্কার।”

“কাল সকালে এসো বাবা, মিলির সাথে তো দেখা হল না তোমার।” “আচ্ছা”—বলিয়া অরুণ চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে অসময়ে অরুণকে এন্ডিনের পর নিজেদের বাসায় দেখিয়া মিলি যথার্থই বড় আনন্দিতা হইল। কাছে আসিয়া বলিল—“কি মিষ্টার ব্যাণার্জি! এতকাল পরে মনে করে এসেছেন? পরম শোভাগ্য!” অরুণ চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিল—“মাপ করুন মিস রায়! সে অনেক কথা—বলবার সময় নেই। আমাকে এখনুনি বেরুতে হবে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি, তাই আসা—” একটা সুন্দর কাস্কেট বাহির করিয়া অরুণ মিলির হাতে দিতে গেল—মিলি বলিল—“এ কি দিচ্ছেন আমাকে?” “আপনাকে দেবার উপযুক্ত কি সম্বল আছে আমার! আপনার জীবন-প্রভাতের উৎসব

উপলক্ষে, গরীবের সামান্য তি-উপহার গ্রহণ করণ।”

হাত পাতিয়া মিলি অরুণের দান গ্রহণ করিল। খুলিয়া দেখিল মুক্তা বসানো একটা নেক্লেস্। মুহু হাসিয়া মিলি বলিল,—“কি ভাবছেন মিষ্টার ব্যাণার্জি! আমি যে আপনাদের বাড়ী গিয়ে নেমস্তন্ন পেয়ে এসেছি, সে খবর পেয়েছেন ত? বড় ভাল আপনার মা। শীগ্গীর আপনার বিয়ে করাতে তিনি ইচ্ছুক। আপনি স্পষ্ট জবাব দিলেই ত, বিয়ে হয়ে যায়। মলিনাকেও দেখে ভারী সুখী হলুম, এমনি স্বভাব একদণ্ডে আমাকে আপনার করে ফেলে। আপনার পত্নী হবার সম্পূর্ণ যোগ্য বটে অরুণ চুপ করিয়া দেয়ালে টানানো তৈলচিত্র গুলি দেখিতে লাগিল।

“একটু দাঁড়ান, এই আমি আসছি।” একটু পরে এক ছোড়া মূল্যবান ব্রেস্লেট্ সযেত একটা রূপার বাক্স হাতে নিয়া মিলি অরুণের হাতে দিয়া বলিল—“আমার এই ‘প্রোজেক্ট’ মলিনাকে দেবেন। প্রার্থনা করি আপনাদের ছুটিতে শুভমিলন সুসম্পন্ন হোক।”

অরুণ এই উচ্চ শিক্ষিতা উদার হৃদয়া নারীর মুখ পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল শিক্ষায় মানুষকে কি পরিমাণে সুসংবৃত্ত করিতে পারে।

অরুণ মুহু কণ্ঠে বলিল—“এ প্রোজেক্ট আপনি নিজ হাতে দিলেই ভাল হয় না কি? আর আমার ইহা নেবার অধিকারই বা কি?”.....

মিলি স্থির দৃষ্টিতে অরুণের মুখপানে চাহিয়া রহিল। বিচলিত চিত্ত লইয়া অরুণ আর যেন বসিয়া থাকিতে পারে না। অন্তর মধ্যে প্রবল ঝড় বহিতেছিল। একবার নিঃস্বপ্নে স্তম্ভ মনে, একটা অবলম্বনে দাঁড়াতে পারলে সে যেন বাঁচে। ভাড়াভাড়ি কাজের দোঁহাই দিয়া অরুণ বিদায় চাহিল—মিলি কাতর কণ্ঠে বলিল—“আর কি আসবেন না?” এই বেদনা জড়িত স্বর অরুণের

নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“বাবা ও মার সঙ্গে আজ প্রায় বছরখানি ধরে দেখা-শুনা হয়নি। তাঁরা বর্তমানে কোথায় আছেন, তাও জানিনে।”

উৎকল বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাত ছ’খানি ধরিয়া বলিলেন—এখন বাবা ও মাকে দেখা দেবার দরকার নাই—তোমার চরিত্র সম্বন্ধে তাঁরা সমস্ত সংবাদই রাখেন।” চারু স্থির দৃষ্টিতে বিমলের মুখের প্রতি চাহিলেন, সে দৃষ্টি বিমলের বক্ষ ভেদ করিয়া হৃদয়ের অন্তরালে গিয়া পৌঁছিল।

চারু একটু স্লেষের স্বরে বলিল—গিছামিছি এসব বাজে বকুনি বকে বিমলকে অবুঝের মত অপমান করতে কুন্তিতও হ’লে না। মাহুষকে কি এমন ধারা অপমান মুখের সামনে করতে হয়।”

উৎকল বিরক্তির সঙ্গে সুরটাকে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় চড়াইয়া বলিল—“বিমলকে আমি অত্যাঁয় কিছুই বলিনি—চারু।” এই বলিয়া উৎকল ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরিয়া যাইতে ছিলেন—মাঝখানে বিমলের কথায় বাধা পাইয়া কহিল “আপনি যেসব সন্দেহ করছেন—সব ভুল ও মিথ্যে কথা—তবে এখন আসি দাদাবাবু। উৎকল বিকট ভাবে হাসিয়া উঠিয়া কহিল—রাত্রি এখন প্রায় এগারটা, ক্ষুদ্র গলি রাস্তা প্রায় জনশূন্য—তুমি এখন পাগলের মত কোথায় যাবে বিমল—বাবা ও মার কাছে আমি যা শুনেছি—তা যদি সত্যি না হয় ভালো কথা, ভগবান করুন সবই যেন মিথ্যে হয়। বিমল অল্প দিকে চোখ শুস্ত করিয়া বিনম্র ভাবে উত্তর দিল—আপনি আমার দাদা, আমার অপবাদের কথা শুনেই আপনি আমাকে শাসন কর্তে পারেন,—সত্যি কিন্তু অত্যাঁয় অপবাদ আমার প্রাণে বড়ই বেজেছে। উৎকল কহিল, এখন দেখছি তায়-অত্যাঁয় তোর কাছে আমার শিখতে হ’বে বিমল?”

চারু বিমলের হাত ছ’খান ধরিয়া অপর কক্ষে নিয়া গেলেন। বিমল যন্ত্র চালিতের মত বোদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

“আচ্ছা বোদি, বাবা ও মা কোথায় বাসা করেছেন, আপনি কি সে বাসার নম্বরটা জানেন?”

চারু বলিল “ভবানীপুরই বাসা করে থাকবেন—আমি বাবাকে বাসার নম্বর জিজ্ঞেস করতে তিনি কোন সারা দিলেন না। বিমল বড়ই করুণ দৃষ্টিতে চারুশীলার মুখের দিকে চাহিল—বিমল প্রতিমার চিন্তা হৃদয় হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল—কিন্তু বিমলের পক্ষে তাহা যেন অসম্ভব হইয়া উঠিল।

চারুশীলা হৃৎগত ভাবে বলিল—“তাকি করব বিমলাবাবু, সংসারে সব রকম দুঃখ সহ্য কর্তে পারা যায় কিন্তু মা ও বাবার চোখের জল যে আর দেখতে ইচ্ছে হয় না। এখানে তাঁরা যে কয় মাস ছিলেন—আমাদের যথাসাধ্য যত্ন নিতে ত্রুটি হয়নি—বাবা শত দুঃখ দৈন্তে পীড়িত হয়েছেন বলেও কিছুতেই আত্ম মর্যাদা নষ্ট করিতে চান না।”

বাপ দরিদ্র হ’লেও মেয়ের স্তখে স্ত্রী হওয়া যে বিধাতার নিষ্ঠুর অভিশাপ! বাবা ও মা যে তোমার ও অমলার এক মাত্র—তা ত আমরা একদিন ও মনে স্থান দেইনি—বাবা মনের দুঃখে আমাদের কহিলেন—আমরা যে গবীর—গবীরের ধাঁতে অতটা সহিবে কেন মা? তোমরা বেঁচে থাকো, সংসারে যশ খ্যাতি নিয়ে স্তখে ঘর করা করো।”

\* \* \* \*

বিমল ঘড়ীতে চাহিয়া দেখিল—বারটা বাজিতে বিশ মিনিট দেবী আছে—উৎকল দরজার পর্দা সরাইয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া চারুর কথায় যোগ দিল। চারুশীলা অবগুণ্ঠন একটু টানিয়া অতি মুহূর্তে বলিতেছিলেন—“মা ও বাবার মত লোক বলিতে কয়জন জন্মায়?”

বিমলের মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে মাথা বাড়াইয়া জানালায় ভিতর দিয়া আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল—পশ্চিমের চাঁদ বেশ হেলিয়া পড়িয়াছে।

( ২ )

স্বর্দীর্ঘ তিন মাস কাটিয়া গেল—প্রতিমা ও বিমলের সঙ্গে দেখাশুনা, চিঠি আদান-প্রদানও হয় নাই। প্রতিমা বিমলের অনেক অন্তঃসন্ধান করিয়াছিল কিন্তু কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

প্রতিমা কেমন জোর করিয়া হৃদয় হইতে বিমলের স্মৃতি একদিনে মুছিয়া ফেলিবে? বিমল যে এত বড় বিশ্বাস ঘাতক তাহা ত প্রতিমা আগে জানিত না—কেমন করিয়া সে তাঁহার প্রাণের কথা খুজিয়া পাইবে?

কি নিদারুন অপমান—

প্রতিমা যে মনে মনে বিমলকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া আসিতেছে! তবে আজ কেন অকস্মাৎ তাহার কোমল অন্তর বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল!

ডাঃ বোস সাহেব যে চিন্তাটাকে হৃদয় হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন—সে চিন্তা এমনি ভাবে জমাট হইয়া তাহার মনকে বাস্তব করিয়া তুলিল।

কয়েক বছরের মধ্যেই ডাঃ বোসের মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন একটা উদাস ভাব আসিয়া জুটিল। তিনি প্রায়ই নিঃশব্দ বসিয়া নিবিষ্ট মনে—রেখা ও প্রতিমার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবিতে ছিলেন। রেখার জীবনের হৃৎকেন্দ্র স্মৃতির কথা মনে উঠিলে তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিতেন না—সবেমাত্র সতেরোর ঘরে পা দিয়েছে—কাষ্টইয়াই পেরে।

নীরব সন্ধ্যার সময় দরজার কড়া বেজে উঠল প্রতিমা অনিচ্ছা সত্ত্বে নীচে নামিয়া গিয়া দোর থলে দেখিল—জগদীশবাবু ও অমলা একখানা খার্ড ক্লাশের গাড়ীতে বসা—

প্রতিমা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অমলার পানে চাহিয়া রহিল। অমলার চোখ দুইটা সজল

হইয়া উঠিল সে মুখখানা কালো করিয়া অন্ধ দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল—

জগদীশবাবু শোকতাপ ছুপ দৈন্তকে বুকের মধ্যে চাপিয়া এক হাতে অমলাকে ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন

তখন সন্ধ্যা তার কালো সাড়ীর আঁচলখানি বিছাইয়া দিয়া জগদীশের হৃদয়ে সেই শুভ্র বসনা মনোরমার সেই মুখখানার কথা ভাবিতে লাগিলেন।

ডাঃ বোস এতদিন পর জগদীশবাবুকে দেখিয়া—হঠাৎ আর চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—এয়ে জগদীশবাবু, আপনার দেখুছি সমস্ত মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে—বাসার সব ভালো ত?

জগদীশবাবু অকৃত্রিম শুষ্ক শ্লান মুখে হাসিয়া মুগ্ধ কণ্ঠে কহিল হাঁ, বোস সাহেব—চিরদিনের জন্ম বাসার ভালো...এই বলিতে জগদীশের বুকে চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। সে আর একটা কথাও বলিতে পারিলো না। বোস সাহেব পুনরপি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—

টেবিলের সামনে লেগা দাঁড়াইয়াছিল, সে উত্তর দিল দাঁদাবাবুর মাথায় যে বাজ ভেঙ্গে পড়েছে—দিদিমণি যে গঙ্গা পেয়েছেন...

বেথার কথা শুনিয়া বোস সাহেবের চোখ চটী যেন জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি আর একটা কথাও বলিতে পারিলেন না।

জগদীশ চুপ করিয়া থাকিয়া চোপের জল সামলাইয়া লইয়া অন্ধদিকে মুখ ফিরাইয়া—মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন।

সামনে একখানা ইজিচেয়ারে তাহার দেহখানা এলাইয়া অনেক কিছু ভাবিতেছিলেন।

প্রতিমা অমলার নিকট বাবার ও মাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিতেছিল—প্রতিমা নিঃশব্দে অমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—তারপর অমলার বড় বড় জঁ ফোঁটা চোখের জল এসে পড়ল—প্রতিমা

তার কাপড়ের আচল দিয়া অমলার চোখের জল মুছাইয়া ফেলিয়া বলিল—“ভাই ছুঃখ করে আর মনটাকে কষ্ট দিও না। যা হবার তা ত হয়ে গেছে—এখন কাঁকাবাবুর দিকে চেয়ে থাকো। বিমলদাদাও আমাদের বাণা ছেড়ে আজ তিনমাস যাবৎ অগ্ন্য গিয়েছেন—বাবা ও মা, অনেক খোঁজ খবর করলেন ; কোথায়ও সন্ধান মিলল না।” জয়ন্তী দরজার পর্দা সরাইয়া বারাণ্ডায় আসিলেন—অমলাকে বুকের উপর টানিয়া লইলেন। প্রতিমা জলখাবার আনিতে অগ্ন্য কক্ষে চলিয়া গেল—জয়ন্তী একে একে বাসার সকল সংবাদ জিজ্ঞেস করিলে—কিন্তু অমলার মুখে থেকে একটা শব্দ বাহির হইল না—দেহের সমস্ত রক্ত যেন শুকাইয়া আসিল। সে নিঃশব্দে খুন্সী আশামীর মত দাঁড়াইয়া রহিল। কতখানি ব্যথা যে তার বুকে জমে ছিল—তা কত দূর মর্মস্পর্শী ছবি।

অমলা জয়ন্তীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কানিয়া উঠিল—রেখার প্রাণে তখন ছঃস্বপ্নের স্মৃতি যেন কে আগিয়ে দিল।

তারপর জগদীশবাবু ডাঃ বোস সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“বোস সাহেব জীবনের বড় একটা ছঃসংবাদ সহ আজ আপনার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি। জীবনে অনেক বিপদে পড়েছি—কিন্তু কোন্ দিনও সেসব বিপদকে হৃদয়ে স্থান দেইনি.....আজ দেখছি নিরন্তর নির্মম উপহাস—বিমলও দেখছি শেষটা শত্রু হ’য়ে দাঁড়াল—ভগবানের অপূর্ণ ব্যবস্থা আজকে বিপদের পাহাড় চাপা পড়ে প্রাণ হীন হয়ে পড়েছি... বোস সাহেব সংসারে সকল কষ্টে নীরবে সয়েছি কিন্তু এই নূতন সমস্তার মীমাংসার ভার সম্পূর্ণ আপনার হাতে.....মান মর্যাদা এখন আর জগদীশ চন্দ্রের নেই—আছে মাত্র একটা পিশাচের ছবি।”

জগদীশ বাবুর কথায় ডাঃ বোস খালিকণ চুপ করে থেকে তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলিলেন—“যদি জানতুম আপনি স্নেহে আছেন, কিষ্কা স্থায়ী হ’বেন তাহ’লে হয়ত মনকে সাধনা দিতে

পারতুম—কিন্তু.....তারপর ডাঃ বোস স্পষ্ট দেখিতে পাইল জগদীশবাবুর মুখখানি যেন শাদা হয়ে গেছে। জগদীশবাবু কি যেন বলিতে ছিলেন কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার চোখের কোণ থেকে বহিয়া বড় বড় ছ’ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল। অতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন—মান মর্যাদাটুকু বজায় রাখবার মত সাহস আর আমার নেই—টানে বেটানে এই জীবনটা চালিয়ে দিয়ে এসেছি। ছ’চার দশমাস একতীর্থে গিয়ে কাটিয়ে দিয়ে আসবার ইচ্ছে। অনেক তপস্তায় আপনাদের আশ্রয়ে এসে বিশ বছর যাবৎ বেশ স্নেহই ছিলাম, কখনো এভাবে যে চিরকাল কাটাতে পারবো না—তা আমি বেশ বুঝেছি। মনোরমা শাখু সিন্দুর বজায় রেখে স্বর্গে চলে গেছেন আর আমি মর্তে বসে চলার দিনগুলি পাহাড়া দিচ্ছি। অনেক ছুখে.....বিমলের কথা মনে হ’লে—পরকালে বসেও আমার বুকের মাঝে যে শেল বাজবে বোস সাহেব! আমি যে সবংশে ধ্বংশ হয়ে গেলাম.....বিমল যে এমনি ধারা লক্ষ্মীছাড়া হবে তা আমি একদিনও মনে স্থান দেইনি! অকৃতজ্ঞ পুত্রের জন্ত আর আমি এক মুহূর্ত ও.....ভাববার সময় কোথায়? তবে আর দেবী করে কোনই কল হ’বে না—এই নিম্ন বোস সাহেব উইলখানা, আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি—অমলের”—

এই বলিতে বলিতে তাহার ছই চোখ বহিয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

ডাঃ বোস পাথরের মত স্থির নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন—পর্দার আড়াল থেকে জয়ন্তী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—“উঃ কি ভয়ানক ছঃখ! ছঃখ পেলেই মা’হুষ লোকালয় হ’তে সরে পড়তে চায়—মা’হুষ কত ছঃখের ঘর পেরিয়ে সংসারের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেও যখন স্থায়ী হ’তে পারে না তখন আপনা হ’তে ম্লানি এসে ভবিষ্যতের সকল গাঢ় অন্ধকার চোখের উপর স্পষ্ট দেখায়।” সে সময় আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাটতেছিল.....

জগদীশ বাবু আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। একবার এদিক ওদিক চাহিয়া তারপর পাগলের মত চোখের নিমিষে অন্ধকারে কোথায় চলিয়া গেলেন।

পরদিন সকাল বেলা বোস্ সাহেব কলেজে বিমলের খোঁজে লোক পাঠাইলেন—কিন্তু কোনই খোঁজ হইল না।

( ৩ )

জগতের কোন জিনিষই চিরস্থায়ী নয়,—বিমল সভ্য জগতের উজ্জ্বল জীবন প্রবাহ হইতে কতদূর সরিয়া পড়িয়াছে—প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইবার লোক অনেকই আছে.....সন্ধ্যার সময় একথানা সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া বোস্ সাহেবের গেটের সামনে দাঁড়াইল—প্রতিমা ব্যতীত গাড়ীর আরোহীর জন্ত কাঁহারো উৎসুক দৃষ্টি ছিল না বস্তুতঃ সে সময় বাসার সকলেই এদিক ওদিক কাজে ব্যস্ত ছিল।

বিমলের-দৃষ্টি কিছু য়ান ও ব্যাথার—তাড়াতাড়ি গেটের নিকট আসিতেই বিমলের চোখ হইতে গোটা কতক অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল প্রতিমাকে গাড়ীর ভিতর টানিয়া লইয়া..... ধৈর্যের-সীমা অতিক্রম করিয়া—ভালোবাসার গভীরতা হেতু পরস্পর পরস্পরকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া প্রানের আবেগ চালিয়া দিল, কোচম্যান গাড়ী হাঁকিল—গাড়ী অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গাড়ী যথাস্থানে পৌঁছিয়া মাত্র—চারুশীলা উচ্চ হস্ত-ধ্বনি করিয়া নবাগত যুবতীকে নিয়া ড্রয়িংরুমের

মেঝের উপর বসিয়া হাসি ঠাট্টায় অনেক গল্প গুজবের বৈঠক জমিয়া গেল.....

এমন সময় বিমল অতি ধীরে দরজার পর্দা সরাইয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া একথানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বৌদি ও প্রতিমার পার্শ্বে বসিল।

চারু বিমলের দিকে চাহিয়া বলিল বিমলবাবু— আজ দেখছি একটা রোম্যান্টিক ব্যাপার করে বসলেন .....বিমল নগ্নের কোটা হাতে একটিপ নস্ত নাকে দিতে দিতে কহিল .....আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে যখন, আপনার বাড়ীতে নেমস্তন করে বেড়াতে নিয়ে এসেছি.....তখনত বৌদি এটা যে একটা বড় রকমের রোম্যান্টিক ব্যাপার হ'বে তা ত আমি গোড়া থেকে ভেবে আসছি. ....এবে প্রথম থেকে বরফ সরবৎ বিতরণ কচ্ছেন—শেষে কি অর্ধ চন্দ্র অদৃষ্টে আছে নাকি ?

চারু বিমলের কণায় বড় রকমে একগাল হাসি হাসিয়া ফেলিল—তারপর সে প্রতিমার নিকট হইতে ব্যঙ্গ কোতুকের ছ'চারটা কথা আদায় করবার জন্ত নানা প্রকার হাস্ত ব্যঙ্গ করিতে ছাড়িল না।

তারপর বিমল বলিল, বৌদি আমার যে কুণ্ডল উপস্থিত হয়েছে - আজ ত দাদাবাবুর নিকট যোড়শোপচারে না ইউক দশোপচারে অনেক কথাই শুনতে হ'বে, নয় কি ?

চারুশীলা বলিল—বিমলবাবু তোমার যদি কথা শুনতে ভয় করে তবে এক কাজ কর না কেন ? আজকার রাত্রির জন্ত তুমি অস্ত্র চলে যাও.....কাল তোমার দাদাবাবু চলে গেল বাসায় এসো।

বিমল চারুশীলার কথাটা সত্য ধরিয়া সে রাত্রির জন্ত অস্ত্র চলিয়া গেল।



## দৃষ্টিহীনার মর্শ্বকথা

শ্রীম্মালিনী গুপ্তা

ভাই নীলা—

অন্ধ আমি, দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছি আজ তিন বছর হোল। আশ্চর্য্য হচ্ছি'স্ নিশ্চয় খুবই কিস্ত সত্যিই আজ আমি দৃষ্টিহীনা অভাগিনী; বলবার এতে কিছুই নেই; নিজের অদৃষ্ট দোষে নিজেই ভুগছি। জীবনের দিন ঘনিষে এসেছে, ওপার হ'তে অসীম অনন্ত নিরন্ধু আঁধার ব্যগ্র বাহু মেলে দাঁড়িয়ে আছে শুধু আমারই জন্তে। কি করে যাবো নীলা? উনিশ বছরের এই তরুণ জীবন যে আজ কেঁদে ফিরছে—বার্থ কাদনে। কোন আশাই তো মিটলো না ভাই এ ক'দিনে! জীবনজোড়া এ কি অভিশাপ আজ আমার চারিধারে বন্ধুতে পারিস্ নীলা কোন্ সময়ে আমার এ জীবন যাত্রা শুরু হয়েছিল? কী মহাপাপে আজ আমার এ দুর্দশা ভাই? উঃ পারি না যে আর! নিশিদিন এ কী ব্যথা আজ আমার তরুণ জীবনকে হুর্দহ করে তুলেছে?

জীবনের অবদান হবার আগে তোকে আমার তরুণ প্রাণের বেদন ইতিহাস জানিয়ে বাচ্ছি নীলা। পড়িস্ ভাই—পড়ে ছকোঁটা চোখের জলও ফেলিস্। তোর এই হুর্ভাগিনী বন্ধুর হৃদয়ের বেদনা স্মরণ করে মনে করিস্ এ তোর বন্ধুর শেষ অহুরোধ। আজ চার বছর আগে স্কুল ছাড়িয়ে যা বাবা যে দিন আমার জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলেন, সে দিন বিরক্তির তিক্ত রসে মন তখন আমার ভরে উঠেছিল। ছেলেবেলা থেকেই আশা ছিল লেখাপড়া শিখে শিক্ষিতা হবো। কিছুই হোল না, উপরন্তু বিয়ে হোল আমার জংলী পাড়াগায়ে। প্রথম প্রথম এম্নি রাগ ধরতো নিজের জীবনে যে আজকাল সে গুলো মনে করলে হাসি পায়।

বিয়ের পর নতুন জীবন যাত্রা শুরু হোল। বর্ষে গন্ধে ছন্দে ছন্দিত হয়ে জীবনের মধ্যে সেই একটা বছর কিছুতেই ভুলতে পারবো না নীলা। কী মাধুর্য্যই না বছরের সেই প্রত্যেকটা দিন তখন আহরণ করে এনেছিলো! অল্পান বিকশিত ফুলের মতো প্রত্যেকটা মুহূর্তের স্মৃতি আজও আমার হৃদয় দ্বারারে উজ্জল হয়ে আছে! অণু পরমাণু দিয়ে আজ আদি তাদের অমূল্যব করতে পারছি—তাদের কি ভুলতে পারা যায়?

স্বামীর সোহাগ প্রেম যে কী বস্তু তা তুই বুঝতে পারবি না নীলা কারণ তোর তো এখনো বিয়ে হয়নি। হবে যখন তখন বুঝবি কী জিনিষ সে। তাই সেই চিরারাদ্য স্বামীর প্রাণ ঢালা আদর সোহাগে একটা বছর আমার স্বপ্নময় সৌন্দর্য্যের ভেতর দিয়ে কেটে গেল। বুঝলুম না ওরই পেছনে লুকিয়ে আছে অমানিশার গভীর আঁধার—অসহায় এ তরুণী জীবনকে গ্রাস করবার জন্তে! সেবার পূজোর পর ঠঠাং রোগে পড়লুম; ডাক্তার দেখে বল্লেন—শক্ত টাইকরেড, বাঁচা হকর।

প্রাণ শিউরে উঠলো। একটা অনির্দিষ্ট ভয় ভাবনার মরুতে আমি পারবো না। গুঁর প্রেম গুঁর সোহাগ চেড়ে স্বর্গে গিয়েও আমি সুখী হতে পারবো না। গুঁকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সে যে একেবারেই অসম্ভব! মনে মনে দিনরাত ভগবানের কাছে মাথা পুঁড়তে লাগলুম, বল্লম—হে ঠাকুর এ যাত্রা আমাকে বাঁচিয়ে দাও, মরুতে এখন আমি কিছুতেই পারবো না।

এখন কি ভাবি জানিস্ নীলা? ভাবি—তখন ওরকম করে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা না কর্নেই হতো।

হুর্কহ এই জীবন কি দরকার ছিলো একে আবার  
বাঁচিয়ে তুলবার—?

সেই উঠলুম ওঁরই প্রাণচালা সেবা যত্নে। শাওড়ি  
বল্লেন—বোমার আমার কপাল ভালো এর আগে  
স্বামী সেবা বোধ করি আর কেউ অতো পারনি—

গর্বে পুলকে বুক আমার ভরে উঠলো। প্রিয়তম  
দেবতা আমার তোমার প্রেম ভালবাসা আমাকে যেন  
অমর করে রাখে। রাত্রে নির্জনে ওঁকে বলুম—দেখো  
সকলে কি বলছে জানো? বলছে—তোমার মতো  
জীকে এর আগে কেউ অতো সেবা যত্ন করে বাঁচিয়ে  
তুলতে পারেনি। সত্যিই তাই আমার যে কী  
আনন্দ হচ্ছে, কি দিয়ে যে তোমাকে সন্তুষ্ট করে  
তুলবো ভেবে পাচ্ছি না—

উত্তরে মিষ্টি হেসে বল্লেন তুমি যে সেয়ে উঠেছো  
এইতেই আমি সন্তুষ্ট। শাস্তা, এর বেশী আর তো  
আমি কিছুই চাই না।

বোলব কি নীলা ওঁর মুখের ওই ছোটো মিষ্টি কথা  
শুনে আনন্দে যেন দিশেহারা হয়ে গেলুম। রোগ  
থেকে অনেক কষ্টে সেয়ে তো উঠলুম, সেই সঙ্গে  
জন্মের মত হারলুম দৃষ্টিশক্তি, অন্ধ অসহায়্য দৃষ্টিহীন  
নারী উঃ কী হুর্কহ বেন্দনাময় জীবন! তারই  
সঙ্গে সঙ্গে হারলুম কি জানিস্ নীলা? স্বামীর  
প্রাণভরা প্রেম, সোহাগ, শাওড়ির স্নেহ, যত্ন  
সমস্ত নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেল এই জীবনের  
ওপর দিয়ে! সেই একটা বছর নীলা মধুময় সেই  
একটা বছর—আমার জীবন বসন্তের রঙ্গীন স্বপ্নের সেই  
দিন গুলি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হয়ে রইল, বন্ধিতার এই  
জীবন ইতিহাসের খাতায়—আঁধার এলো ঘনিয়ে,  
অস্তরে বাহিরে চারিদিকে জমাট বেঁধে তাদের ঠেলে  
সরিয়ে ফেলবার মতো শক্তি আমার ছিলো না তাই  
ছ'হাত মেলে অন্ধকারকেই আঁকড়ে ধরলুম নিরিঝ  
ভাবে। মাস ছ'য়েকের মধ্যেই এ গৃহে আমারই  
অধিষ্ঠিত আসনে নূতন গৃহিণী এলো বিছাৎ—আমার  
সতীন—শুনলাম বিছাতের মতোই সে রূপসী এবং

সর্ববিষয়ে সুশিক্ষিতাও...বিধাতা দৃষ্টিশক্তি কেড়ে  
নিয়েছে তাই তাকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হোল  
না। না হোক তবু সে যে রূপসী সুন্দরী সেটা  
নিঃসন্দেহেই বুঝলাম—কারণ আমার স্বামী তার রূপে  
মুগ্ধ হয়েই নাকি তাকে বিয়ে করেছেন—। দৃষ্টিহীন  
পক্ষু কুৎসিৎ আমার এই তরুণী জীবন—কি দিয়ে আর  
ওঁকে সন্তুষ্ট করে রাখতে পারবে—? তাই তিনি  
বিয়ে করলেন নূতনের মোহে প্রলুব্ধ হয়ে। জীবনের  
স্বপ্ন সাচ্ছন্দ্যও তো একটা প্রয়োজনীয় জিনিস—?  
সুখী হোন্ উনি, সখী হোক বিছাৎ কিন্তু দৃষ্টিহারা  
বাঁধতার এই যে আর্ন্ত বেদনা সে কি কেউ বুঝবে  
না নীলা—? সর্বহারা রিক্ত বেদনায় প্রাণ তার  
কান্দবে চিরদিনই? জানি না এ কান্নার নিবারণ  
কবে হবে?

বিছাৎ এলো হাসি গান গল্পে কাজে কষ্টে বাড়ী  
একেবারে সরগরম করে জাঁকিয়ে তুলে; শাওড়িও  
মুগ্ধ হয়ে গেলেন তার ব্যবহারে—আর স্বামী? তিনি  
তো বিভোর হয়ে রইলেন বিছাতের প্রেমে। তার  
মাঝে তলিয়ে গেলুম আমি দৃষ্টিহীন অন্ধ নারী কে  
আর তার কথা ভেবে মাথা ঘামাবে? অনাহত  
পথের ধুলার মতো পড়ে রইলুম বিজ্ঞ ঘরের একটা  
কোনে। হোক এই খানেই আমার বন্ধিতা জীবনের  
অবসান, মিথ্যা হোক তার জীবনের ভাষা-ভরসা,  
প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্যে জীবন তার ভারবহ হয়ে উঠুক,  
কেউ যেন বুঝতে ও না পারে তার ব্যথাভুরা জীবনের  
রিক্ত বেদনা! নীলা, নীলা জীবনের অবসান আমার  
কবে হবে রে?

বিছাতের খোকা হোল। শুনলাম প্রস্তুতি  
শতদলের মতোই সে সুন্দর দেখতে। একটাবার  
তাকে দেখবার জন্যে আমার এই ভূষিত জীবন উন্মথ  
ব্যগ্র হয়ে উঠলো—কিন্তু মিথ্যা—সে আশা বিলীন  
হয়ে গেল মনের মাঝেই।

বিছাতকে বল্লুম—তোর খোকাকে আমায় দে  
বিছাত। দৃষ্টিহারা অন্ধ জীবন যে আমার হুর্কহ হয়ে  
উঠেছে ভাই। বিছাৎ হাসলে, বল্লেন—তা নাওনা  
দিদি আমি তো তাহোলে বাঁচি—

খোকাকে বুক টেনে নিলুম। আমার মরুময়



জীবনে অমিয়ধারা খোঁকা—তারই জন্তে স্রুখ আবার আমার বাঁচতে ইচ্ছে হোল। স্বাভূক্তি রাগ কর্লে, বলেন—ও কি জ্বাকামি বড় বোমা। ওকে বুকে টেনে নিলেই কি ও তোমার হয়ে যাবে? পরের ছেলে কি কখনো আপন হয়? না-না ওসব আমি ভালবাসি না মোটেই—পর! খোঁকা আমার পর! বেদনার বুক আমার আড়ষ্ট হয়ে গেল। বিদ্যাকে বলুম, নে ভাই তোর খোঁকাকে ফিরিয়েনে—কি হবে মিথ্যে ছ’দিনের জন্তে মায়া করে? বিদ্যাৎ হানুতে লাগলো, কিছু বলেন।

মুখে বিদ্যাৎকে ও কথা বলেন মন আমার কেবলই খোঁকাকে চাইছিল। আমার এ মরুভূমির মতো নীরস বক্ষা জীবন খোঁকার অমৃতসম স্নেহ-রশ্মির আশার উন্মুখ ভূষাতুর হয়ে উঠেছিল, খোঁকাকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি? তাই আমারই স্নেহাশ্রয়ের মাঝে খোঁকা দেড় বছরটা হয়ে, বড় হয়ে উঠল। খোঁকার সেই মিষ্টি আধো আধো বুলি, যা বলে ডাকা আমার বেদনাতুর হৃদয়ে কী অমৃত সিঞ্চনই না করতো। তার উপমা দেওয়া যায় না নীলা। ছেলের মা হবি যখন, বুঝি কি মধুর সেই মা বলে ডাকা তবু খোঁকা সত্যিই আমার ছেলে নয়—বিদ্যাতের। সে আমার সতীন বিদ্যাতের ছেলে। স্বাভূক্তি মায়া গেলেন কার্তিকের মাঝামাঝি। বিদ্যাৎ কান্দলে, উনি কান্দলেন, আমিও কান্দলুম, তবু খোঁকাকে বুকে করে মাতৃসমা স্বাভূক্তির মৃত্যুশোক ভুললাম। বিদ্যাতও ঝেড়ে-ঝেড়ে ছ’দিনের মধ্যে উঠে বসল। স্বামী পুত্রের সংসার তার—তাকেই যে আবার নতুন করে সব দেখতে-শুনতে হবে।

মাস তিনেক বাদে একটা মৃত সন্তান প্রসব করে বিদ্যাৎ পড়লো শব্দ অস্বপ্নে। ডাক্তার দেখে বলেন—অত্যধিক দুর্বলতা বশত: এ যাত্রা বিদ্যাতের বাঁচা দুষ্কর.. এ কথা শুনে উনি পাগলের মতো হয়ে গেলেন। নয়নের ঞ্জবতারা ওই বিদ্যাৎ, গৃহের সর্বময়ী গৃহিণী—তাকে ছেড়ে থাকা ঊঁর পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব। জীবনের একান্ত অবেলার স্বামী সোহাগিনী সতী-লক্ষ্মী বিদ্যাৎ স্বামীর কোলে মাথা রেখে, মৃত্যু-পথে পা বাড়ালে—ওঁকে একেবারে ছন্নছাড়া পাগল করে দিয়ে।

খোঁকা কান্দলো না, ছই হাতে আমাকে আরোও জ্বোরে আঁকড়ে ধরলো।

বিদ্যাতের মৃত্যুর পর বিদ্যাতের মা এলেন—খোঁকাকে নিয়ে যেতে, তাকে মানুষ করে তুলতে হবে তো?

খোঁকাকে ছেড়ে থাকা প্রাণ আমার বেদনার ভেঙ্গে পড়তে চাইলো। পারবো না, খোঁকাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না! উনি এলেন, কর্কশ কণ্ঠে বলেন, দাও খোঁকাকে দিয়ে দাও। বিদ্যাৎকে খেয়েছো, আবার ওকেও গিলতে চাও নাকি?

প্রলয়ের বজ্র হুকারে পায়ের নীচে পৃথিবী ছলে উঠলো! বিদ্যাৎকে আমি খেয়েছি? আর্ন্ত বেদনার লুটিয়ে পড়লুম। ঊঁরই পায়ের তলায় কেঁদে বলুম ওগো না না খোঁকাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না। ভিক্ষা চাইছি আমি—খোঁকাকে আমার কাছে থাকতে দাও। দৃষ্টিহারী অন্ধ জীবনে খোঁকাই যে আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। দয়া করো তুমি, খোঁকাকে কেড়ে নিও না।

নিষ্ঠুর পৃথিবী অল্পপরমাণু তার কঠিনতায় গড়া। তাই দয়া হোল না, খোঁকাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেই দিনই সন্ধ্যা বেলা উনি আর খোঁকার দিদিমা চলে গেলেন স্রুদর এলাহাবাদে—

শেষ! আমার জীবনের শেষ আশাটাও চিরতরে নির্মূল হয়ে গেল—বড় আশা করেই তাকে আঁকড়ে ধরেছিলুম তাই বিধাতার তাও সহ্য হোল না!

বিদ্যাৎ মরে গেছে আমার জীবন বিড়ম্বিত করে দিয়ে। বসে আছি আমি অভিশপ্ত এই জীবনের শূন্য পাত্রখানি নিয়ে স্রুদর ওই ওপার হতে কবে আমার ডাক আসবে এই অপেক্ষায়।

জীবনের আর কোন আশা আকাঙ্ক্ষা নেই নীলা। ফুরিয়ে গেছে সমস্ত নিঃশেষে ধুয়ে-মুছে। বেদনার ভারে প্রপীড়িত এই জীবন, এরই বেদন ইতিহাস তোকে জানিয়ে গেলুম নীলা, জীবন বসন্তে ক্ষণিকের জন্তে যে বসন্ত এসেছিল, উৎসব মাধুর্য্যে রঞ্জিত হয়ে তারই একটা রেখা আজও আমার মনের মাঝে উজ্জল হয়ে আছে। ব্যস, ওই প্রথম—ওই শেষ! তার পরেই আঁধার, নিরঙ্কুশ গভীর আঁধার।

এখনো মাঝে মাঝে খোঁকার আধো আধো মা বলে ডাকা কানের কাছে বেজে ওঠে—বাছারে কোথায় আজ তুই? হেথায় যে তোর অভাগিনী মা বসে আছে—শুধু তোরই কচি টুলটুলে মুখখানি স্মরণ করে। ভুলেও কি একবার আসবি না রে?

মরণ বঁধু ডাক দিয়েছে—আয় আয় আয় আয়...

চলুম নীলা, ভুলিসনি—ওপারের অনন্ত বিশ্রামের জন্তে প্রাণ যে আমার হাঁপিয়ে উঠেছে ভাই...একটু বিশ্রাম।

ইতি, চর্চাগনী বন্ধ শাস্তা।

## সম্পাদকের বার

১২২৬-২৭ সালের বহিতে তিনি মন্তব্য

### বাস্তালায় শিক্ষার নমুনা

কানাডার লোকসংখ্যা ৮৭, ৮৮, ৮৮৩। উহাতে ১২২৪ সালে ১৫৫৪টি খবরের কাগজ ছিল। তন্মধ্যে ১১৯টি দৈনিক, ৬টি সপ্তাহে তিনবার, ২৪৮টি সাপ্তাহিক, ৩২টি সপ্তাহে দুই বার, ৩৫৭টি মাসিক ৩৪টি বার্ষিক এবং বাকী ৫৮টি অল্প রকম প্রকাশিত হইত। বাস্তালায় লোক সংখ্যা ৪, ৬৬, ২৫, ৫৩৬ অর্থাৎ কানাডার পাঁচ গুণেরও অধিক। বঙ্গে কানাডার মত শিক্ষা বিস্তার হইলে খবরের কাগজও পাঁচগুণ অর্থাৎ ৭৭৭০টি থাকিত। কিন্তু ১২২৫-২৬ সালে ছিল মোটে ৬৩২টি।

### বঙ্গে অন্নকষ্ট

বঙ্কিমের ‘সুজলা সুফলা সমুদ্রামলা’ বাস্তালায় আর কিছুই অভাব থাকুক আর নাই থাকুক, অভাব আছে অন্ন ও জলের। নদী-মাতৃক বাস্তালায় জলকষ্ট আর অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে অন্নক্লেশ অবশ্য অকুতী বঙ্গসন্তানের পাপের ফল। বঙ্কিমের পর ৩০৪০ বৎসরের ব্যবধানে সোণার বাস্তালা শ্মশানে পরিণত হইতে বসিয়াছে। এবার বঙ্গের নানা জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। দিনাজপুর, নদীয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, বাকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে লোকের অন্নাতাব ঘটিয়াছে। একরূপ অন্নান্নিক পরিমাণে দুর্ভিক্ষ প্রায় লাগিয়াই আছে। অথচ ভারত গবর্ণ-মেন্টের জৈনিক মোটা মাহিনার কর্তৃচরী বলিতেছেন— ভারতবর্ষে আর দুর্ভিক্ষ হয় না! তিনি সকল বিষয়েই সরকারী খবর যোগাইয়া থাকেন এবং প্রতি বৎসর ভারত সম্বন্ধে একটী বহি বাহির করেন। বর্তমানে

যিনি একাজ করেন তাঁহার নাম মিঃ কোটম্যান। সম্প্রতি ১২২৬-২৭ সালের বহিতে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন :—

“Fortunately one of the grimmest of the spectres, which formerly dogged the Indian agriculturists’ footsteps, has now been laid. Famine is no longer the dread menace it used to be.....Even the well-marked areas of constant draught are now secure against famine by reason of the extension of we’ll and canal irrigation and facilities for the use of river bed moisture.”—*India in 1926-27, P 114.*

অর্থাৎ যে ভীষণ ভূত পূর্বে ভারতীয় কৃষিজীবীগণের অধুনাগণ করিত তাহাকে এখন ময়মুগ্ধ করা হইয়াছে। আগের মত দুর্ভিক্ষের আর সেই ভীষণতা নাই। যে যে স্থলে অনাবৃষ্টির মূলক বলিয়া প্রসিদ্ধ সে সে স্থলে কৃপ ও খাল খনন করিয়া এবং নদীর অভ্যন্তর হইতে জল গ্রহণ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়া দুর্ভিক্ষ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে।

### অধ্যাপক ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু

ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু কুমিল্লা কলেজের অধ্যক্ষ ত্রীমুখ সত্যোক্তনাথ বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি অপরিশ্রুত বয়সে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে গমন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়া তথাকার কোন কলেজের শিক্ষকতা করিতেছেন। তিনি অগাধি নানী জৈনিক মার্কিন মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পত্নীও যুক্তরাজ্যের এক কলেজের শিক্ষয়িত্রী। তিনি

ল্যাটিনে এম্, এ এবং ফরাসী, ইটালিয়ান, স্পেনিস ও জার্মান ভাষার ব্যুৎপন্ন। বর্তমানে তিনি সাগ্রহে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছেন

ডাক্তার বসু সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল প্রবাসে বাপন করিয়া তাঁহার বর্ষায়সী জননীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া মাত্র ছয় মাসের জন্ত বঙ্গজননীর ক্রোড়ে পদার্পণ করিয়াছেন। দেশবাসী সর্বত্র তাহাকে সমাদরে অভ্যর্থিত করিয়াছে। ডাক্তার বসু আমেরিকা রাজ্যের অভিজ্ঞতার কথা নিবেদনচ্ছলে বলিয়াছেন, “আমেরিকার শিক্ষাদান প্রণালী অতীব সুন্দর। অধ্যাপক ছাত্রের জ্ঞানস্পৃহা এবং স্বাধীন চিন্তার উন্মেষে সর্বদা যত্নবান থাকেন। আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতা মূলক। তাহার শিক্ষা সম্পর্কে উচ্চনীচ ও ধনি দরিদ্রের মধ্যে কোনও তারতম্য করা হয় না। সেখানে অন্ধ, মূক ও বধির সকলেরই সমান প্রবেশাধিকার আছে।”

শ্রীমতী অ্যানি ভারত মাছলার মত সাড়ী পরিধান করেন। এদেশের প্রতি তাঁহার বেশ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছে। তিনি মিস্ মেয়োর কুৎসার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, ভারতের জননী আদর্শরূপে সকল দেশে গৃহীত হইতে পারেন।

### মেঘনার উপর সেতু

ভৈরব আশুগঞ্জে মিলিত করিয়া মেঘনার উপর একটা পুল নিৰ্ম্মাণের পরামর্শ চলিতেছে। পুল কত খানি উচ্চ হইলে জাহাজ যাতায়াতের কোন অসুবিধা না হয় তদ্বিষয়ে এখন কোনও মীমাংসা হয় নাই।

### কচুরি পান

বঙ্গালার নদী নালা সকলই কচুরি পানার ভরিয়া বাইতেছে। খাল, বিলাদিতে নৌকা চলাচল এক-প্রকার বন্ধ বলিলেও চলে। মেঘনা বঙ্গালার শ্রেষ্ঠ নদী। উহার উপর দিয়া প্রত্যহ শত শত জাহাজ

নৌকা লক্ষ লক্ষ মানবের পণ্য বহন করিয়া যাতায়াত করিতেছে। কিন্তু সেই বিশাল মেঘনা বন্ধ আজ কচুরি-পানার করাল আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতেছে না। পরীগ্রামে কৃষকগণের মুখে শুনিতে পাই কচুরি পানার অল্প নাম ‘জার্মানি’। জার্মান সেনা যখন গত ইরোপীয় মহাসমরের সময় জার্মার মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিপুল মিত্র-বাহিনীর অদম্য শক্তি উল্লেখন পূর্বক চারিদিকে বিভীষিকা ও আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছিল সেই সময়ে এই দেশে কচুরি পানার আবির্ভাব হয়। একজুই সাধারণ লোকের নিকট ইহার ‘জার্মানি’ আখ্যা লাভ হয়। যাহা হোক দুর্ভিক্ষ জার্মান সেনা মিত্র সেনার নিকট পরভূত হইয়া বহুদিন হইতে ‘good boy’ এর মত স্বীয় শিবিরে আশ্রয় লাভ করিয়াছে, কিন্তু তদানীন্তন বঙ্গের উপদ্রব কচুরি-পানা আজিও দিনের পর দিন স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া সন্মুদয় সলিলের বিশাল কলেবরে রক্তচোষা জ্বকের মত উহাকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিতেছে। কিন্তু এযাবৎ ব্রিটিশ সিংহের সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় নাই বলিলেও চলে। মাত্র দুই চিরদিন স্থখ এবং শান্তির জন্ত অর্থ ও দেহত্যাগ করিয়াও শত্রু ধ্বংসের চেষ্টা করিতেছে কিন্তু এমন মহাশত্রুর কবল হইতে আজ বঙ্গজননীর উদ্ধার করিবে কে? বাঙ্গালী যদি নিজের বিপদ দূরীকরণে নিজের শক্তি প্রয়োগ না করে তবে আর রক্ষা নাই। অদূর ভবিষ্যতে দেশ ঋশানে পরিণত হইবে। আজ-কাল যত প্রকার দুরারোগ্য ও হুচিকিৎস্য ব্যাধির আবির্ভাব দেখা যায়, ২০২৫ বৎসর পূর্বে তাহার কিছুই ছিল না। ম্যালেরিয়া এখন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে, সাধারণ অর রোগের আজকাল আর হুচিকিৎসা হয় না, বসন্ত, কলেরার আর কালা-কাল নাই, ইন্ফ্লুয়েঞ্জা, উদরাময় বাঙ্গালীর পরিবার ভুক্ত। আমাদের মনে হয় কচুরি জনিত আবর্জনাই এ সকল রোগের মূল। যদি প্রাচীন প্রবাদ বাক্য Prevention is better than cure একবার

যথার্থ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে সর্বরোগের মূল কচুরি-পানার ধ্বংস অচিরে আবশ্যক। পল্লীগ্ৰামের কথা ছাড়িয়া দিলেও মফঃস্বলের সহরগুলিও ঐ দারুণ দানবের হস্ত হইতে পরিত্যাগ পায় নাই।

আমাদের মনে হয় বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট ডিস্ট্রিক্টবোর্ড লোক্যালবোর্ডের সাহায্যে প্রজাকে আশু বিপদ হইতে পরিত্যাগ করিতে পারেন। ইউনিয়নবোর্ড গুলিতে আজকাল প্রচুর আর হইতেছে, শুনা যায় সেই আর হইতে স্থানীয় ইউনিয়নের জলকষ্ট নিবারণ রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার, কুপ খনন প্রভৃতি সাধারণের হিতকর কার্যে ব্যয়িত হইবে। কিন্তু এ যাবৎ সর্বত্র এ সকল বিষয়ে বিশেষ উদ্যম দেখা যাইতেছে। সহরের মিউনিসিপ্যালিটি গুলি যদি বার্ষিক আয়ের টাকা হইতে অপ্ৰয়োজনীয় বা অল্পপ্রয়োজনীয় কার্যের জন্ত এক বৎসর অর্থ ব্যয় না করিয়া জন-সাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করেন এবং আবশ্যক বোধে স্থানীয় জমিদারগণকে উৎসাহিত ও বাধ্য করেন তাহা হইলে সহর হইতে কচুরি দানবের

নির্কাসন অবশ্যস্বাভাবী। পল্লীগ্ৰামেও সেইরূপে জন-সাধারণকে সাহায্যে ও উৎসাহিত করিয়া এবং আবশ্যক হইলে বাধ্য করিয়া নিজ নিজ অধিকারভূক্ত স্থানগুলির সংস্কার করাইলে দেশের কল্যাণ সুনিশ্চিত। আমরা জানি এ সকল চীৎকার অরণ্যে রোদন মাত্র। ‘কার বা গোয়াল কেবা দিবে ধূয়া!’ বাঙ্গালী, এখনও সাবধান হও, আর আত্মবিশ্বাস করিওনা, যুগা আত্মকলহে স্বীয় শক্তির আর অপব্যবহার করিও না, যাহাতে ভাই ভাই প্রেমের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া সকলে সমবেত ভাবে শুদ্ধ, অশুদ্ধ, ছোট বড়, উচ্চ নীচ তুলিয়া সুখে ও শান্তিতে গণাধিন কয়টা কাটাইতে পার তজ্জন্ত যত্নবান হও। মনে রাখিও, সুখ, তোমার সুখে কেহ অন্ন তুলিয়া দিবেনা—নহি সুপ্ত সিংহ প্রবিশক্তি সুখে মৃগাঃ। সুতরাং আত্মশক্তি দ্বারা নিজকে বাচাইতে চেষ্টা কর—কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা! মনে রাখিও—নাশমান্না বলহীনেন লভ্যঃ।

## অভাব ও স্বভাব

শ্রীসারদাচরণ রায় বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যভূষণ

অভাব কাহছে ডাকি স্বভাবেরে ‘ভাই’  
দাস তুই চিরকাল, মোর দুখ তাই  
আমি যবে নৃত্য করি, তোর মৃত্যু হয়  
অভাবে স্বভাব নষ্ট, মিথ্যা কত নয়।  
শত্রু ভাবি মোরে তাই, তোর দাস যত  
আঁখি জলে ভাসে সদা নরনারী কত  
স্বভাব অমনি হানে, বিদ্রোহের আঁখি  
মরণের দাস তুমি, দেবী কত বাকী।  
গরীবের কুঁড়ে ঘরে, বিরাজিছ নিতি  
ধনীর দুয়ারে তুমি লভিছ যে ভীতি  
যুগে যুগে তোমা লাগি, বিদ্রোহের গান  
মানীরে কাদাও তুমি, রাখো নাকো মান  
কেন তুমি বেঁচে আছ, অপমান সাধে  
আমারে করিও সাথী, হৃদ্বিনের রাতে।’

## বীণার নিবেদন

আগামী ১লা আশ্বিন “বীণা” চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিবে। বীণা শৈশবে নিত্য সহায়হীন হইলেও সহৃদয় গ্রাহক অসংখ্যগ্রাহকগণের অশ্রুস্রাব্য আজ উহার তৃতীয় বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে। আমরা আশা করি বাঙ্গালার পাঠক-পাঠিকাগণের সহায়ত্ব হইতে ‘বীণা’ আগামী বর্ষও বক্ষিত হইবে না।

‘সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।’ ‘বীণা’র প্রচার দ্বারা আমরা লাভবান হইব এ আশা আমরা কখনও করি নাই, এখনও করি না। সংসাহত্যের প্রচার, বিশেষতঃ স্থানীয় ছোট বড় সকল সাহিত্যিকগণের দ্বারা সাহিত্য-চর্চার নিমিত্ত উৎসাহ প্রদানই আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্র হইতেই বৃহত্তর উৎপত্তি, যিনি আজ নগণ্য বা অজ্ঞাত লেখক, কালে তিনি একজন সুসাহিত্যিক হইতে পারেন। কিন্তু সুযোগ অভাবে কত সুপুংপ না জানি কালের মরু-কাঙ্ক্ষারে কোথায় হারিয়া যায়। যদি আমাদের প্রচেষ্টার সাহিত্যের এবং সাহিত্যিকের কল্যাণের উপকার হয় তাহা হইলে আমাদের প্রচেষ্টা সাক্ষ্য মণ্ডিত হইয়াছে মনে করিব।

কলিকাতা হইতে প্রচারিত দুই চারি খান বা শত দুই শত সাহিত্যিক পত্রে আট কোটি বাঙ্গালীর সাহিত্য-তৃষ্ণা মিটাইতে পারে না। সাময়িক পত্র লোকশিক্ষার প্রথম উপাদান। জেলায় ২, মহকুমায় মহকুমায়, এমন কি পল্লীতে পল্লীতে সাময়িক পত্রিকার আবির্ভাব ও প্রচার হইতে পারিলে বাঙ্গালার প্রকৃত লোকশিক্ষা হইবে। ফলে, পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রধান ২ সাময়িক পত্রগুলির পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে এবং ক্রমে ২ দেশের ত্রিবিধ অবশুস্তাবী। এরূপ উদ্দেশ্য নাই হইয়া বীণা আজ বৃদ্ধবাসীর দ্বারে প্রতিধ্ব। অতিথির সংস্কার করিতে বাঙ্গালী জানে।

বীণা পত্রিকাখানি ছোট হইলেও ইহার একটা বিশেষত্ব আছে—এই সম্বন্ধে অনেক পাঠক-পাঠিকা-বর্গের নিকট হইতে অনেক প্রকার লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। অক্ষমতা দূরণ যে সকল ক্রটি বিচ্যুতি ঘটয়াছে তাহাও আমরা অবগত আছি। প্রথমতঃ পূর্ববঙ্গে পত্রিকা চালান যে কতদূর কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য তাহা আমরা এই তিন বৎসরের অভিজ্ঞতার বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

বীণার বয়স মোটে তিন বৎসর এবং ইহার প্রায় অনেক লেখক ও লেখিকারাও অল্পদিন যাবৎ লেখনী ধরিয়াছেন, তাই তাহাদের লেখাতে অভ্যাস বা অসঙ্গতি থাকিবে অসম্ভব নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কেবল খাতনামা লেখক ও লেখিকাদের রচনা দ্বারাই যে বীণা পূর্ণ থাকিবে আর নূতন লেখকেরা রচনা স্থান পাইবে না এইরূপ সংকীর্ণতা যেন আমাদের মনে কখনও না আসে। এইজন্য এই তিন বৎসর যাবৎ আমরা যে কত গালমন্দ পাইতেছি এবং যদি ভবিষ্যতেও এইজন্যই পাইতে হয় তবু ছুঃখ নাই বরং মনে একটা অপরিণীত তৃপ্তি আসিবে যে অখ্যাত লেখক লেখিকারা বীণা দ্বারাই সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটু পরিচিত হইবার সুবিধা লাভ করিলেন।

নূতন লেখকদের বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গবাসীদের ইহা মন্ত অভিলাষ যে, কলিকাতার নামজাদা কাগজে লিখিবার বড় একটা সুবিধা বা সুযোগ তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

বীণার দাবী সামান্য। এবার ‘বীণা’ বার্ষিক সভাক ২১০ আড়াই টাকার আশ্রয়ক্রয় করিতেছে। কারণ, ‘বীণা’ জানে বাঙ্গালীর ধনভাণ্ডার অটুট নহে। তাই ‘অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা’ করিয়াছে।

আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা বীণার দাবী পূর্ণ করিয়া উহার মঙ্গল কামনা করিবেন। বর্ষ শেষে আগামের সমস্ত অদ্বিগত গ্রহণ করুন।















